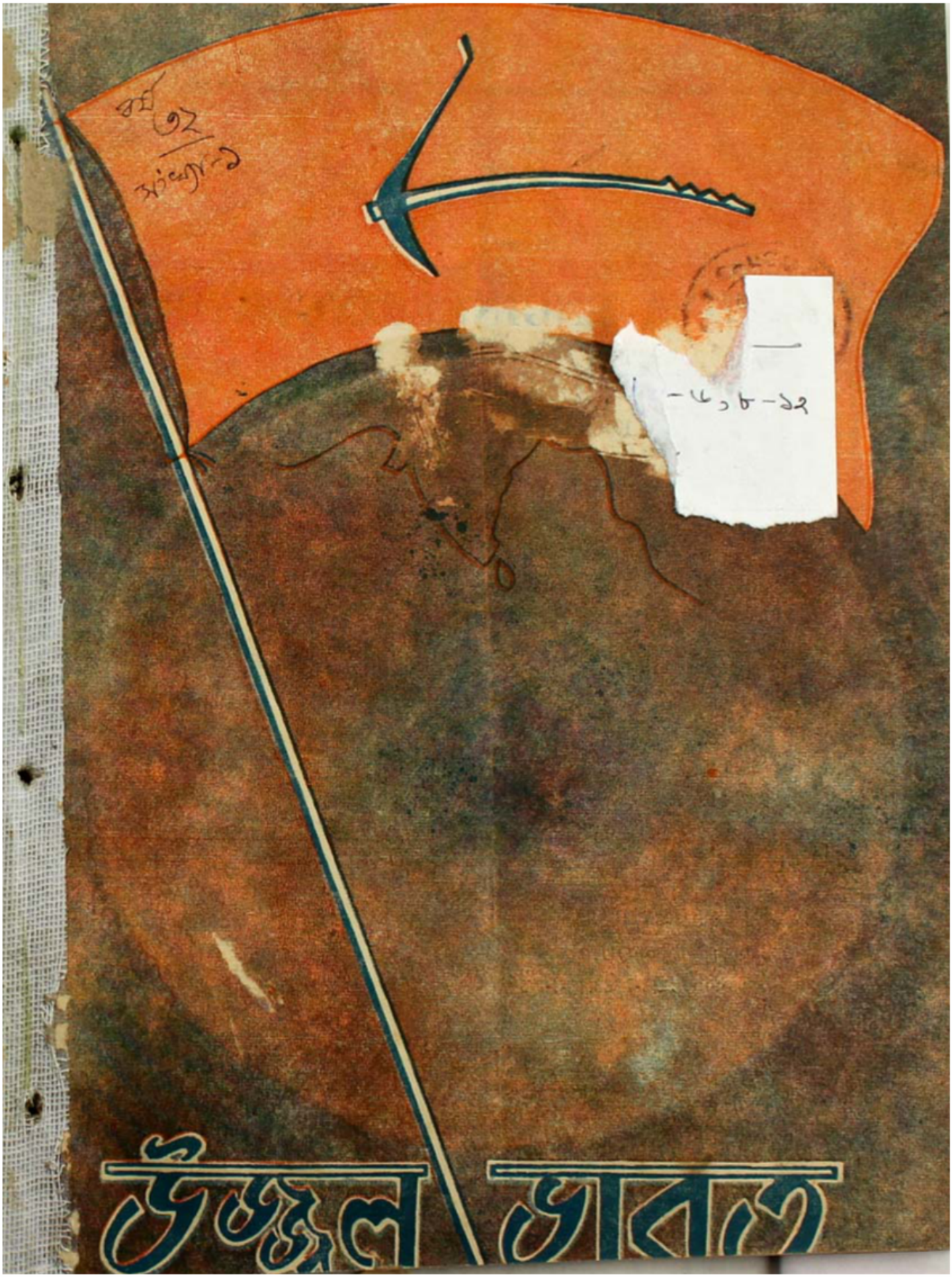
উজ্জ্বল ভারত

SHIVA ENGINEERING WORKS

ENGINEERS & CONTRACTORS

2, INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA-700001

Telex : 021-3474
Cable : HINDEQUIP
Telephone : 22-7383,22-1315

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প বিভাগ

তাঁত ও বস্ত্র শিল্প অধিকার

নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্, কলিকাতা-১

বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের যে সকল তন্তুজীবী বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হইতেছে এবং তাহাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তাঁত সারাই, সরঞ্জাম ক্রয় এবং আংশিক প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তন্তুজীবীদিগকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হইবে।

এতদ্বারা বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সকল ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃত তন্তুজীবীকে জানানো যাইতেছে যে, তাহারা যেন আপনাপন গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রয়োজনবোধে নিকটস্থ তাঁত উন্নয়ন আধিকারিক (Handloom Development Officer)-এর অফিসেও যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

স্মারক নং 12-45/G. 8. তাং ২-২-৭৯, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ২৪ পরগণা।

'মনে করো, জুতো হাঁটছে পা রয়েছে স্থির.....

Bata understands shoes

সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি!
কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের
কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে
দিতে পারিনা। সেজন্যই আপনার
মনোমত, রুচিমাফিক, হালফ্যাশানের
জুতোর জন্য সর্বদা বাটায় আসুন।

Bata

একটি তারার পাঁচটি ফলক

ফসল তোলার ক্ষেত্রে

- বর্গাদার-পাট্টাদারদের স্বার্থ রক্ষা করুন
- স্থানীয় ভূমি-সংস্কার আধিকারিকদের নিকট সমস্যাদির কথা বলুন
- বিরোধ-বিসম্বাদ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিন
- নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সাহায্য নিন
- ঐক্যবদ্ধ শক্তির দ্বারা মাঠে মাঠে শান্তি ও আইন বজায় রাখুন

সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দুর্বল শ্রেণীর নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার॥

গীতাগতপ্রাণ মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা	২·০০			**শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.**	
ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০	সদা পাঠ্য গীতা	১·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	২·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৮·০০	মানুষের মত মানুষ	১·০০
সুলভ পকেট গীতা	১·৫০	কর্মবাণী	২·০০	বিদ্যাসাগর	৩·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০	**ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের**	
নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০	Soul of India Speaks	7·00	শরীর ও শক্তি	৩·০০
সুলেখক শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.				নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র	৪·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের	
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য	৩·০০
বাংলার কবি	৬·৫০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক অভিধান ১৫·00

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ● ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

গ্রামে গ্রামে বর্গাদার রেকর্ডের কাজ চলছে

এই কাজের পাঁচটি ভাগ :— (১) বিপুল সংখ্যক বর্গাদার বাস করেন এমন গ্রামগুলিকে আগে চিহ্নিত করণ : (২) কাজের জন্য ছোট স্কোয়াড গঠন : (৩) গ্রামে গ্রামে বর্গাদারদের নিয়ে সান্ধ্য বৈঠক : (৪) মাঠে মাঠে যাচাই : (৫) প্রকৃত বর্গাদারদের নাম রেকর্ডভুক্তি।

কোন জোরজুলুম নয় শান্তিপূর্ণভাবে একাজ আরম্ভ হয়েছে।

মনে রাখবেন : —

- বর্গাদার নাম রেকর্ডে ছোট ও মধ্য জোতের মালিকের কোন ক্ষতি নেই :
- ভয় ভীতি ত্যাগ করে প্রকৃত বর্গাদার তার নাম রেকর্ডভুক্ত করলে প্রথমে সার্টিফিকেট পরে পরচা পাবেন :
- জমি চাষের বহু ঝুট ঝামেলা কমে যাবে :
- কৃষকেরা চাষের স্থায়ী নিরাপত্তায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে :
- জমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কৃষির অগ্রগতির স্বার্থে সরকার এবং বর্গাদারদের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান সফল হোক।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

উজ্জল ভারত ৩২ বর্ষ
১ম সংখ্যা
মাঘ, ৮৪

সূচীপত্র

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা | ৫
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৫
নবপর্য্যায় | সম্পাদকীয় | ৬
উজ্জল ভারতের আদর্শ |
রেজাউল করিম | ৭
সোনার অন্নপূর্ণা/৮হারীত কৃষ্ণ দেব/৯
দীপক যন্ত্র | প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৯
অভিজ্ঞতা | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ৯
কোর্ট চুনার | গৌরচন্দ্র সাহা | ১০
সুন্দরবনের মানুষ। শক্তিপদ রাজগুরু।১১
নিরস্ত্রীকরণই বিশ্বশান্তির পথ |
দক্ষিণারঞ্জন বসু | ১৬
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ২০
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ২৬
কুটির শিল্পে আধুনিকীকরণ | শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | ২৮
খেলা ও ছুটাখেলা | আরবি | ৩১
উজ্জল ভারত | স্বপন বুড়ো | ৩৩
আমবার কথা | গণেশ চক্রবর্তী | ৩৩
চীনের খুদে বিজ্ঞানীশরদিন্দু সাহা।৩৪
নতুন বিমান বন্দরে অপমানিতা ভারতীয়
নারী | সুনীতি দাস্তাল | ৩৬
শিশুর প্রতি কর্তব্য | রেণুকা সেন | ৩৭

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)
বিমান ডাকে : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কাল'-চক্র ও চক্রী 'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ হইতেছে চক্রবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষ-প্রধান ভারতীয় কৃষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে, পাশ্চাত্যের কাল-প্রধান সভ্যতা চক্রন বাহিরে যন্ত্রতন্ত্র-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোনও একটি একান্ত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথা স্থানে ও যথা মানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বসংঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তিপত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোষ্ঠে মাঠে স্বরাজ-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজবৃত্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাঁহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভব হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপসংবৃত। কৃষি-ক্ষেত্র বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণসঙ্ঘেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'। উজ্জলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে। আমরা অবনত মস্তকে তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা' নরনারায়ণ আশ্রম' তথা 'উজ্জলভারতে'র পতাকা। প্রতি বৎসর যাত্রারম্ভ ক্ষণে আমরা ইহাকে অভিবাদন জানাই। তাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেদিন সংক্ষেপে ইহার যে-অর্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান করিতে উন্মুখ হইয়া উহা এইখানে আমরা প্রকাশ করিলাম। সকলের সাথে মিলিত হইয়া একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান—গৈরিক যাহার চিহ্ন—আর একদিকে বাস্তব জগতের অন্নাদ্যম—লাঙ্গল যাহার দ্যোতক—সমন্বয়-ঘন তত্ত্ব-প্রকাশক এই পতাকাকে নূতন দিনের যাত্রাপথে আমরা অভিবাদন জানাইতেছি। ভবিষ্যৎ ভারত তথা ভবিষ্যৎ বিশ্ব একই সঙ্গে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং 'আমি বিশ্বনাগরিক' এই দুই-ই আস্বাদন করিবে।—সঃ—উঃ ভাঃ।

সম্পাদকীয়

নবপর্যায়

উজ্জয়ভারত দীর্ঘ বার বৎসর পরে তাহার ৩২-তম বর্ষে মাঘ ১৩৮৫, ইংরাজী জানুয়ারী ১৯৭৯ হইতে নব কলেবরে মাসিক পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। নব কলেবরে তাহার কাঠামোই শুধু অনেকাংশে বদলে নাই, বিভিন্ন বিষয়ে সমৃদ্ধ হইয়া বহুমুখী রুচিকে তৃপ্ত করার যোগ্যতাও সে অনেকখানি লাভ করিয়াছে। আজ তাহার এই নূতন সমৃদ্ধতর রূপে যাত্রার দিনে উজ্জয় ভারতের প্রাণ পুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রণতি জানাইয়া সে তাঁহাদের এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছে যে তাঁহাদের যে সার্বিক জীবন-তত্ত্ব মানুষের কাছে উপস্থাপিত করিবার দায়িত্ব লইয়া একত্রিশ বৎসর আগে সে শুরু হইয়াছিল, নূতন পর্যায়ে সে দায়িত্ব সে যেন আরও অধিকতর দৃঢ়তায় পালন করিতে পারে।

সামগ্রিক জীবন তত্ত্বে সর্ব উপাধি বিনির্মুক্ত প্রতিটি মানুষ জীবনের সকল স্তর ও বৃত্তিকে যথাযথ ও যথাযোগ্য দিয়া সর্বক্ষেত্রে পারস্পরিকতার মাধ্যমে 'সহবং সাম্যম্ উপৈতি'। মানুষে মানুষে উচ্চনীচ ছোট বড়র ভেদ লক্ষ্য করিয়া শোষণের কারণ হয় যখন স্তর বা বৃত্তিতে ঐ কৌলীন্য ব্যবস্থা গোড়ার কারণ থাকে। উজ্জয়ভারত শাস্ত্রদ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বিভেদের ভিৎকে শাস্ত্রদ্বারা ধূলিসাৎ করিয়া অধিরাজত্বের যন্ত্র ছড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। সে পথে সে দূরের কাছের অতীতের বর্তমানের সকলের প্রাণভরা সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে একথা যদি বলি তাহা হইলে ভুল বলা হয় না যদিও একথাও সত্য যে জ্ঞান বিজ্ঞান সমুদ্রের তল নাই, শেষ নাই। কিন্তু বিশ্বের যে ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হইয়াছে তাহা হইতেছে সততা, পারস্পরিক প্রীতি ও কল্যাণ-বুদ্ধি এবং কথায় ও আচরণের দৃঢ়তা। তাই এত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও কাহারো সুখ নাই, আনন্দ নাই, সোয়াস্তি নাই। এ আনন্দ সোয়াস্তি আসিতে পারে একমাত্র প্রাণের পথে যে প্রাণ উপনিষদাদির মতে বায়োলজিকালি এবং সাইকোলজিকালি জোর ও শ্রেষ্ঠ। মানুষের বাসস্থান হৃদয়ে; হৃদয়ের স্পর্শেই শুধু আনন্দ ও সোয়াস্তি সম্ভব—মানুষে মানুষে পারস্পরিকতা শুধু বৈষয়িক হিসাবে না হইয়া যখন হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে হইবে—যাহা হইবে একই সঙ্গে বিশ্বজনীন—কোন দল বা গোষ্ঠীগত নয়—তখনই মানুষ তৃপ্ত, আনন্দিত। সমাজের সর্বস্তরে সকলের জন্য এই তৃপ্তি ও আনন্দ পরিবেশন করিবার মূল চিন্তাধারা বহন করিয়া উজ্জয়ভারত চলিয়াছে, চলিবে। সে পথে সে দূরের কাছের, অতীতের বর্তমানের সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল বাণী ॥

'আমি বিশ্ব নাগরিক'
'এই বিশ্বই আমার মহামঠ'

'নিত্য-অনিত্য সমন্বয়। আত্ম-অনাত্ম সমন্বয়। জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়। সাকার-নিরাকার সমন্বয়। আকার নিরাকার সমন্বয়। আকার-সাকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়-অজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব সমন্বয়'।

উজ্জ্বল ভারতের আদর্শ

রেজাউল করীম

দেশ ও জাতির এক মহাসন্ধিক্ষণে 'উজ্জ্বল ভারতের' জন্ম। অনেক আশা, উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়েই উজ্জ্বলভারত কর্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই উজ্জ্বলভারত সাধ্যমত তার ব্রত পালন করে আসছে। এই সুদীর্ঘ বছরের মধ্যে দিনেকের তরেও এই পত্রিকা তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নি। কোন প্রকার বাদানুবাদে অংশ গ্রহণ করে নি। দেশে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কত দলাদলি হয়েছে; কত দল উঠেছে, আবার বুদ্বুদের মত বিলীন হয়ে গিয়েছে। আবার দেখেছি কোন কোন পত্রিকা এক উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মলাভ করেছে, পরে তার আদর্শ ত্যাগ করে অন্য প্রকার বিপরীত আদর্শ প্রচারের বাহন হয়েছে। কোন একটা নির্দিষ্ট আদর্শের উপর স্থির হয়ে থাকে নি; যাকে বলে 'রোপ বুঝে কোপ মারা' কতকটা সেই রকম আচরণ অনেকেই করে থাকে। কিন্তু উজ্জ্বল ভারত কখনই তার আদর্শ ত্যাগ করে নি। তার কত আর্থিক সংকট হয়েছে, আরও নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু কখনও এই পত্রিকা তার আদর্শ ত্যাগ করে নি। একটা মহান আদর্শকে কেন্দ্র করে এত কাল ধরে এই পত্রিকা আজিও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দিক দিয়ে উজ্জ্বলভারত সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের প্রেরণা ও আশীর্বাদ নিয়ে এই পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। তদবধি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই পত্রিকা তার আদর্শ পালন করে আসছে। দেশে বহু পত্রপত্রিকা আছে। তাদের মধ্যে এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য কোথায়? এটা মূলতঃ ধর্ম পত্রিকা। তবে এ পত্রিকা যে ধর্মমত প্রচার করে তা উদার ও ব্যাপক। কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ অর্থে ধর্মকে এ বুঝে না। ধর্ম এক ব্যাপকতর অর্থে এতে গৃহীত। সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি সবই 'ধর্মে'র সংজ্ঞায় পড়ে। কোন দলগত রাজনীতি ও মতবাদের বাহনও এ পত্রিকা নয়। দেশের ও মানবজাতির সর্বব্যাপী কল্যাণই হল এর রাজনীতি ও ধর্মনীতি। এর মূল আদর্শ হল সমন্বয়। কি ধরণের সমন্বয় সাধন করতে চায় তা এই পত্রিকার প্রচ্ছদপটে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। এই সমন্বয়ের মূল প্রেরণা দিয়েছেন স্বামীজির মহান গুরু শ্রীবিত্তাগোপাল। "নিত্য-অনিত্য সমন্বয়, আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়, জ্ঞান-অজ্ঞান সমন্বয়, সাকার নিরাকার সমন্বয়, আকার নিরাকার সমন্বয়, আকার সাকার নিরাকার সমন্বয়, ভক্ত-অভক্ত সমন্বয়, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়, দ্বৈত-অদ্বৈত সমন্বয়, সর্ব সমন্বয়"।

BANERJEE BROTHERS

MECHANICAL & STRUCTURAL
ENGINEERS AND FOUNDERS

Office :
28, STRAND ROAD,
CALCUTTA-700001

Works :
69, COLLEGE ROAD, SHALIMAR
HOWRAH-711103

এর চেয়ে মহৎ আদর্শ আর কি হতে পারে? এই সমন্বয়ের বাণীই এই পত্রিকার মূল মন্ত্র। এমন ভাবে এই প্রকার সমন্বয়ের বাণী আর কেউ প্রচার করে না বা সেই আদর্শকে দেশের সামনে তুলে ধরে না।

উদ্বোধন ভারতের আবির্ভাবের সময় থেকেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর রচনা ও প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাঁর সে সব বাণী ও ভাষণ নানা উপদেশে পূর্ণ। কত মূল্যবান সে সব উপদেশ। সমাজ রাজনীতি ধর্মনীতি অর্থনীতি ইত্যাদি কত বিষয় নিয়েই না তিনি লিখেছেন। তাঁর বহু বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী। ভবিষ্যৎ ভারতের যে স্বপ্ন তিনি উপস্থিত করেছেন তা প্রত্যেক দেশবাসীর অনুধাবন করা কর্তব্য। তাঁর সেই সব বাণীর অনেকগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে; তাছাড়া এই পত্রিকায় আছে বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি। সেগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সেই সব বাণী সমন্বয়ের পথ ছেড়ে আগামী যুগের জন্য বহু সাবধান বাণীর ইঙ্গিত প্রদান করে। তাঁর প্রার্থনাকালীন ভাষণ ও দিনপঞ্জী দুইটীও অত্যন্ত মূল্যবান। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে এই সব ভাষণ ও বাণী অত্যন্ত সাময়িক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ সবের মধ্যে আছে একটা চিরন্তন আদর্শের ছাপ। স্বামীজীর জ্ঞান প্রজ্ঞা ও ভবিষ্যদর্শনের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বাণীর মধ্যে। একটা শাশ্বত আদর্শের বাহন রূপে ওগুলি উত্তরকালে দেশে সমাদৃত হবে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর রিপাবলিকের মত তাঁর বাণীর মধ্যে মানব সমাজের বিবিধ প্রকার সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত আছে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে বলতে পারি যে এই অধম লেখক এই সব বাণী থেকে বহু প্রেরণা লাভ করেছে। এসব বাণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে দেশবাসী অত্যন্ত উপকৃত হবে। ভবিষ্যতের মানুষ দেখবে আমাদের দেশের একজন বিদ্বান ও সাধু প্রকৃতির মানুষ দেশ জাতি ও বিশ্বের জন্য তাঁর সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁর এই বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করবে।.....

আমি আশা করব উদ্বোধন ভারত আরও বড় হবে, আরও উজ্জ্বল হবে, আরও বৃহৎ হবে। দেশের বর্তমান অবস্থায় এই উদার পত্রিকার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। সমন্বয় এই পত্রিকার মূল আদর্শ। প্রার্থনা করি দলাদলিতে ছিন্ন-ভিন্ন দেশ উদ্বোধন ভারত থেকে সমন্বয়ের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করুক।—সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

———

সাম্প্রতিক প্রেস ও সংস্থাই নিয়ে বর্ষারম্ভের জন্য নবপর্যায়ে উদ্বোধন ভারতের ৩২ বর্ষ ১ম সংখ্যা স্বাভাবিক সময়সূচী অনুযায়ী মাঘ মাসের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি শীঘ্রই আমরা প্রকাশনার সময়সূচী রক্ষা করতে পারব।

প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅমিল নিয়োগী (বরুণ বুড়ো)-র লেখা "সেই সুন্দরের মধুর স্মৃতি" আগামী ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

কথাসাহিত্যিক অখিলরঞ্জন রায়ের ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস "সুরের আকাশ" আগামী চৈত্র সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

কবিতা

দীপক মন্ত্র ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র

হে ভারত, শোন, শোন দীপক মন্ত্র!
জড়ত্ব দূর হোক্
কেটে যাক তমসা নীরন্ধ্র—
ডাকে সেই মহা সন্ন্যাসী
নিখিল হৃদয় উন্মাদী
জ্যোতির্ময় বাণী আপার
জীবনের সাধনা অতন্দ্র।
নাই, নাই, আর সংশয়
নাই ক্ষীণ দৃষ্টির দ্বন্দ্ব
ভারতের প্রাণশিখা মূর্ত
দিশারী যে বিবেকানন্দ।
কোথায় কেবা দরিদ্র দীনহীন?
নারায়ণ হেরো সব দেহে লীন।
বীর্যাবন্ত গড়ো নির্মল
মানব সমাজ স্বতন্ত্র।

সোনার অন্নপূর্ণা ॥ ৺হারীতকৃষ্ণ দেব

পুণ্য বরুণা অদি সহরে ছিলনা কি কোন শিল্পী আর
হস্ত মূর্তি গ'ড়িয়া নয়নে মরিত্ত সঁপিতে স্বর্ণ ভার?

• • •

শূন্য হৃদয়ে পূজিব কিরূপে, দেখিতে নয়নে লাগে যে লাজ
ছাড় ওই বেশ, পর গো স্ববেশ, চিরন্তনীর সাজে কি সাজ?

• • •

স্বর্ণ, তোমার বর্ণে ভুলিয়া জগৎ ছিন্ন হস্তশ্রী।
আজ তোমার পুরোভাগে দিয়া পূর্ণ হইবে অন্নশ্রী।

অভিজ্ঞতা ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ

সংসারের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে বুকেছি এখানে
একটিও অদৃষ্ট সত্য হয় না সফল।
প্রত্যাশা মানেই দুঃখ, প্রাপ্তি মানে কী যন্ত্রণা—জানে
অন্ধকার। তবু রাখো, রাত্রির অতল
মায়া-পরিবৃত হয়ে জগৎ সংসার
চুপ করে থাকে। আর আমাদের রক্তের বিপন্ন উচ্চার
মাঝে মাঝে শুনতে পাই, কোনো চেতনার জলে
রক্ত পদ্ম ফোটে—, আমরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।
ধরতে গেলে স'রে যায়—, দুরন্ত কলস কোলাহলে
ভেসে যায়। তবু সেই যন্ত্রণার আলো
আমাদের চারিদিকে স্বরচিত সম্মোহকে ভাঙে বারে বারে।
শূন্য পিঞ্জর তবু প'ড়ে থাকে। উড়ে গেছে পাখী।

প্রচলিত পথগুলি হয়তো বা সঙ্কেত জানালো,
বহু দূর পথ চ'লে শেষে দেখি রূপের সংসারে
অন্ধকার নেমে আসে, দুঃখেরা মিলালো
ছায়াবৃতা অরণ্যের অন্তরালে, ধীরে।
মুখ দেখতে গিয়ে আমরা পরাজিত। জীবন-মিহিরে
আর আলো বেঁচে নেই। এবং সে যৌবন-দর্পণ
টুকরো টুকরো ভেঙে গেছে। পলাতক প্রশ্নের ব্যথায়
অগত্যা প্রব্রজ্যা শরণ:
এই তো জীবন
এবং এই শেষ সত্য; অভিজ্ঞতা সবাইকে সযত্নে শিখায়।

কোর্ট চুণার ॥ গৌরচন্দ্র সাহা

ট্রেনে যেতে যেতে একদিন
চুণারের দুর্গ দেখলেম।
পরিত্যক্ত প্রান্তরের মাঝে
স্মৃতির গৌরব নিয়ে একাকী দাঁড়ায়ে
বিবর্ণ পাটল গাত্রে প্রাচীন চুণার।

বেশী নয় একটি বলক
কয়েকটি পলকের পরমায়ু নিয়ে
আমার জীবনে এসেছিল
চুণার—কোর্ট চুণার।

এমনি আশ্চর্য করা একটি বলক
এসেছিল ইতিহাসে—
কালের আঁখির পাতে একটি পলক—
এক পাশে পরবী চুণার
অন্য পাশে দূর কালিঞ্জর—
মাঝখানে ব্যবধান পাঁচটি বছর।

রাজ্য ভাঙে, রাজ্য গড়ে, রাজা রাজা বড়ই পরমায়ু।
দিল্লী সিংহাসন ছেড়ে,
হাওয়াই বলকে ভাসে সম্রাট হুমায়ুঁ।

চুণারের পাষাণ প্রাচীরে
শিলালিপি যেন প'ড়লেম—
ক্ষুদ্র কণু তুচ্ছ নয়। অতি ক্ষুদ্র সামান্য করিম্
কোন দিন হ'তে পারে
মহামান্য সম্রাট দিল্লীর।

আবার এসেছে কাল।
ঘরে ঘরে জেগেছে করিম্
কালের বিচার ঘরে দুপায়ের ফরিয়াদ্ নিয়ে।
অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলে ইরফান্ বেগে
নূতন যুগের বার্তা বহনের সীমায়।
নয়া পাটা কবুলতি এসেছে যে নেবার সময়—
হাজার করিম্ হাঁকে,
অশ্ব ক্ষুর ধ্বনি তার
শোনা যায় চুণারের পাষাণ প্রাকারে
শৈল সানুতটে।

Phone : 239282

LILY TRADING CO.

27 B CHITTARANJAN AVENUE

CALCUTTA-13

Manufacturers of :

ALL TYPES OF WIRE NETTING,
CHAIN LINK FENCING,
GARDEN FENCING
AND
ALL TYPES OF WIRE PRODUCTS.

সুন্দরবনের মানুষ

শ্রীপদ রাজগুরু

একদিকে ছুচারটে ঘর বাড়ি, আর ধানখেত। অন্যদিকে সুন্দরবনের ঘন বন—ওপাশে সেই বনের খানিকটা কাটাই করে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সুন্দরবনের নোনা মাটিতে কেরালার নারকেলগাছ এর আবাদ করা হয়েছে। চারদিকে বড় বড় গাং—সেই নদীর জল নোনা, ধানখেতে ঢুকলে ধানের গাছ মরে হেজে যাবে। এ জলে চাষ আবাদও হয়না। ওই নারকেলগাছগুলোকে বাঁচাবার জন্য করেই ডিপার্টমেন্ট নৌকায় করে মিঠা জল এনে চালছে।

যতদূর চোখ যায় সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা সেই নোতুন আবাদে মাথা তুলেছে ছোট ছোট নারকেল গাছ। ওদের সবুজ চিরল পাতাগুলো বাতাসে মাথা নাড়ে। সন্ধ্যের পর ওর নীচে আসে ডোরাকাটা বাঘ। ওই গাছের গুড়িতে গা ঘসে যায়। মাঝে মাঝে নদীর এপারেও গাং সাঁতরে বাঘ দু'একটা চলে আসে। গরু ছাগল—হয়তো গ্রামের মানুষকেই—ধরে নিয়ে যায়।

ফরেস্ট অফিসার পরেশ নাথই জানান।

এখানের বনকে বিশ্বাস নেই। এই নদী দেখছেন এর জলে কুমীর আর কামট। মানুষ পেলে কেটে কুরে নেবে তার মাংস। আর ওই বনে বাঘ।

পরেশবাবু এই অঞ্চলের মানুষ।

এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। পরেশবাবুও এসেছেন আমাদের সঙ্গে। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামছে। সুন্দরবনের মধ্যে ছোট ছোট আলোর মত বালব জ্বলছে। পরেশবাবু বলেন হরিণের চোখ জ্বলছে।

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাঘের ডাক শোনা যায়। সেই নীল চোখগুলো কোথায় হারিয়ে গেল। হরিণের দল বাঘের আনার খবর পেয়েই কোথায় পালিয়ে গেছে বনের গভীরে।

…পরেশবাবু বলেন—ওই বনেই আমার সব হারিয়ে গেছল একদিন। আজ আবার সব ফিরে পেয়েছি শুধু আশা আর বিশ্বাস হারাই নি বলে। হয়তো পরিশ্রমও করেছিলাম।

পরেশবাবু ওই বনের ধারের আবাদের ছেলে। সেই আগেকার দিনগুলোর ছবি তার চোখে আজও ফুটে ওঠে।

…ছোট ছেলেটা বাবার সঙ্গে গাং এর ধারে এসে

দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে, এদিকে বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে, ওপারের সীমা দেখা যায় না। ঢেউগুলো গর্জে ওঠে। উথাল পাথাল পানি, তার থেকে এই নদীটা বের হয়ে এসেছে। এটা কিন্তু ছোট, শাখানদী। ওপারেই ছায়াসুনিবিড় বন বন। সুন্দরী, গেওঁ, গরাণ, কেওড়ার গাছে জঙ্গল। দিনের বেলা ঢোকে না।

পল্লীবের সংসার। পরেশের বাবা গতিলাল এর সামান্য কুড়ার বিঘে ধান জমি আছে। তাতে কোনরকমে খাওয়াটা জোটে মাত্র, তাই বাড়তি পয়সার দরকার। নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরে। মহাজনের নৌকায় সেই মাছ বিক্রী করে। না হয় বন অফিস থেকে পারমিট কাটিয়ে ছোট নদীটা ডিঙি বেয়ে পার হয়ে গিয়ে কিছু কাঠ কেটে এনে বিক্রী করে দিন চালায়।

গতিলাল তবু আশা করে তার একমাত্র ছেলে পরেশ গ্রামের ইস্কুলে পড়ছে, সে ভালো ভাবে লেখাপড়া শিখবে; বসিরহাট ইস্কুলে পাঠাবে তাকে। গ্রামের স্কুলের নবীন মাষ্টারও বলে, পরেশের খুব বুদ্ধি; গতিলাল, ওকে পড়াবার চেষ্টা করো। এবার বৃত্তি পরীক্ষা দিক—তারপর ভাবো ওকে যদি বড় ইস্কুলে পাঠাতে পারো।

পরেশও জানে নবীন মাষ্টার চান সে পড়াশোনা করুক। নিজেরও ভালো লাগে পড়তে। গতিলাল তবু ছেলেকে সব সময় পড়তে দিতে সময় পায় না। অনেক কষ্টে দিন চালাতে হয়। তাই মাঠের কাজেও নিয়ে যেতে হয় ছেলেটাকে।

মাছ ধরার সময় ডিঙি বাইতে হয় পরেশকে। গতিলাল জাল ফেলে, ও নৌকা ধরে থাকে। বাদাবনে কাঠ কাটতে যায় তখনও পরেশকে নিতে হয় সঙ্গে।

পরেশের মা বলে—দুধের ছেলেটাকে ওই গাঙে বনে নিয়ে যাও যদি কোনদিন কিছু হয়ে যায়?

গতিলাল শুকনো মুখে জানায়, সব তো বুঝি পরেশের মা, কিন্তু পেট তো মেনে না। এ সব না করলে খেতে পাবো না যে।

পরেশই বলে—কেন এসব পারবো না মা? দিব্যিতো গাঙে পাড়ি দিতে পারি। আর বাদাবনেও যাবো না কেন?

ওর করেনা তোর? মা ওধায়।

ও দেখেছে ওই গাঙে দুধীর কামটকে, জানে ওরা বাদাবনে বাঘের আনাগোনা। সেই বাঘ মাঝে মাঝে এসে এখানেও হানা দেয়। সেবার গোবিন্দ নস্করকে তুলে নিয়ে চলে গেল। সারা বনভিতে বাঘটা গর্জন করে ফিরতো। ওরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে মারতে পারে নি। সকলেই বলে কেদো দাঁত ভাঙা বাঘটা ওই বনেই থাকে।

পরেশ বলে—ওরা করবে কেন? আমরা তো দাঁড় মুড়ুল নিয়ে যাবি। সামনে পড়লে ঘোর না ঘুসিয়ে শেষ করে।

ছেলেটাও এই নদী বনকে ভয় করে না। গতিলাল বলে। ভয় করবে কেন?

—তাই বলে এই সব নিয়েই থাকবে নাকি? পরেশের মা পছন্দ করে না ছেলে বনে নদীতে ঘুরুক।

গতিলাল বলে, ওকে পড়াবো পরেশের মা। নবীন মাষ্টার বলেছে ও জলপানি পাবেই। পরেশও মনে মনে আশা করে সে বসিরহাটের স্কুলে পড়বে। বাবুদের মত চাকরি করবে। মা বাবার এই দুঃখ কষ্ট দূর করবে। দেখেছে পরেশ তার জামা প্যান্টও জোটে না। ছেঁড়া জামা-প্যান্ট পরেই স্কুলে যায়। বৃষ্টির দিন মাঠে বাদায় জলে ধান পাছ পোতে। না হয় ওই বর্ষার বানডাকা নদীতে ডিঙি নিয়ে বের হয়। ঢেউগুলো যেন নৌকার উপর দিয়েই বয়ে যাবে।

গতিলাল বলে—ভালো করে হাল ধরবি পরশা, নাহলে ঢেউয়ে ওলিয়ে যাবে। পরেশের বুক কাঁপে। তবু শক্ত হাতে হাল ধরে থাকে। বাবা জাল ফেলছে। কুটিতে ভিজে গেছে সারা গা। বনের দিক থেকে বাঘের ডাক ভেসে আসে।

কেঁদো বাঘগুলো কুটিতে ভিজে ভিজে যেন ক্ষেপে উঠেছে।

পরেশ দেখেছে বনবাবুদের। উঁচু সুন্দর বাংলোয় থাকে—বই খাতাপত্র নিয়ে হিসাব করে। পতিলাল বলে—বাবুরা অনেক পড়াশোনা জানা লোক কিনা।

পরেশের মনেও অমনি একটি ভাবনা জাগে। সেও অনেক পড়বে, অমনি বাবুদের মত ভালো চাকরী করবে। বন-গাং এর সবকিছুই ওরা জানে।

সেবার ওদের ধান ক্ষেতে পোকা লেগেছে। সবুজ ধানগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। পতিলাল মাথায় হাত দিয়ে বসে। কি হবে পরেশের মা। এবার উপোস দিতে হবে। সব ধান মরে গেল।

পরেশ বাবুদের অফিসে যায় মাঝে মাঝে। বাবুরা তাকে ভালো বাসে। পরেশ আর কোনো পথ না পেয়ে ফরেষ্টার বাবুর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে।

সব ধান এবার মরে যাবে বাবু, না খেয়ে মরতে হবে আমাদের।

ফরেষ্টার বাবু ওকে কাঁদতে দেখে বলেন কোথায় তোদের ধান খেত চল দেখে আসি।

পরেশ ওকে নিয়ে গেল। ফরেষ্টার বাবু দেখে শুনে সঙ্গের লোকটাকে বলেন, একটু স্প্রে করে দাও ভালো ভাবে।

পরেশ অবাক হয়ে দেখে। ক'দিনের মধ্যেই তাদের মরা ধান গাছ আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। পতিলাল অবাক হয়। পরেশ বলে—পড়াশোনা করলে এ সবও দেখা যায় বাবা।

পতিলাল খুশী হয়ে বলে তাই করবি বাবা। যেমন করে হোক পড়াশোনা।

পতিলালের তাই কিছু পয়সার দরকার। ফরেষ্ট থেকে পারমিট নিয়ে বাপ বেটায় গেছে জঙ্গলে ভালো কাঠ কেটে আনলে বেশী দর মিলবে। তাই ডিঙি রেখে ওরা দুজনে বনের মধ্যে ঢুকে কাঠ কাটছে। গভীর বন। সূর্যের রোদও ঢোকে না এই বনে। ঘন গাছ।

ওদের দুজনের কুড়লের ঘা পড়ছে গাছে।...গা ছম ছম করে।

পরেশ দেখছে চারদিকে সাবধানী চোখ মেলে। পতিলাল ভালো গাছটাই কাটছে। টাকার দরকার। পরেশকে স্কুলে ভর্তি করতে হবে।

হঠাৎ বাতাসে বোটকা গন্ধ ভেসে আসে। হলুদ একটা রেখা গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসছে।

বাবা! পরেশ চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গেই গাছপালা কাঁপিয়ে হুঙ্কার ওঠে—একটা আর্তনাদ করে সব যেন চুপ-চাপ হয়ে গেল। পরেশ এর চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে গেল।

বাবার ছেঁড়া কাপড় আর রক্তের দাগ রয়েছে। নিমেষের মধ্যে কেঁদো বাঘটা মিলিয়ে গেছে। বাবারও আর কোনো পাত্তা মেলে না। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে পরেশ। বনে সে একা—চোখের সামনে তার সর্বনাশ ঘটে গেল।

...কোনরকমে ডিঙিটা বেয়ে গ্রামের দিকে এগে পড়েছে। তার কান্নায় এসে পড়ে অনেকেই। পরেশের মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

কেউ বলে—কেঁদো বাঘটারই কাজ। ওটা আমাদের সবাইকে খাবে। ওকে শেষ করতে পারিস না?

পরেশ চুপ করে ওদের কথাগুলো শুনছে। ওই বাঘটা তার সব ভবিষ্যৎকে শেষ করেছে।

নবীন মাষ্টারও এসে পড়ে। পরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে—কাঁদিস না পরেশ। তুই মানুষ হবি—তোকে বড় হতেই হবে।

গ্রামের লোক অনেক চেষ্টা করে যখন পতিলালের দেহটা খুঁজে বের করলো তখন আর তাকে চেনার উপায় নেই। বাঘের খাবার সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত। বিকৃত গলা এক তাল রাংতাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে সেটা। পরেশ চুপ করে দেখছে—মনে মনে সে শপথ করে এর বদলা নিতেই হবে।

সামনে পরীক্ষা। ঘরে খাবার নেই। কোনমতে মা এর বাড়ি ওর বাড়িতে কাজ কর্মো করে দিন চালায়। পরেশ বলে, আমিও খেতে কাজ করবো মা, তবু চায় সের ধান পাবো। মা কান্না সামলাতে থাকে

ছেলের কথায়। ও বলে—

তুই পড়াশুনা কর। পরীক্ষা দিতে হবে।

নবীন মাষ্টারকে দেখেছিল পরেশ। সদা আনন্দময় একটি মানুষ। তিনি বলেন, তুই যা করছিস, কর পরেশ। এবার ক্লাসের মধ্যে ফার্ষ্ট হবি তুই। তোকে আরও বড় হতে হবে।

নবীন মাষ্টারের বাড়ি থেকে দান-দুধ-এটাসেটা আসতো তা জানে পরেশ।

নবীনবাবু বলেন—বসিরহাটে আমার বন্ধুবান্ধব আছে, সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুই পড়বি।

নবীনমাষ্টারের কাছে ও কৃতজ্ঞ। বাবা মারা যাবার পর পরেশকেই কাকো ক্ষেতে দিন মজুরী করতে হতো। না হয় ভিক্ষি বাইতে হতো, হয়তো বা বাদাবনেই কাঠ কেটেই দিন চালাতে হতো। পড়াশুনার কোন সুযোগই পেত না সে।

…পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে পরেশ। সেবার প্রথম বসিরহাট সহরে গেছল, পাকা রাস্তা—বিজলী বাতি। বড় বড় কোঠাবাড়ি গাড়ি দেখে অবাক হয়ে যায় সে। নবীনবাবুই তাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ওরই বন্ধু স্কুলের মাষ্টার যাদববাবুর বাড়িতে উঠেছিল।

যাদববাবুও পরেশকে দেখে খুশী হন।

তোমাকে ফার্ষ্ট হতে হবে এবার।

পরেশ বলে—চেষ্টা তো করবো স্যার।

পরেশের ভয় ভয় করে। সহরে কখনও আসে নি। তাদের বসত থেকে টাপুরে নৌকায় এসেছিল সন্দেশখালি একযোগের পথ। তারপর প্যাসেঞ্জার লঞ্চে এসে হাসনাবাদ নেমে আবার বাসে করে এসেছে সহরে। এখানের ছেলেদের দেখেছে। তাদের সঙ্গে সুন্দরবনের গভীরের একটি বনতির ছেলেকে লড়তে হবে। তবু পরেশ মনে মনে সাহস আনার চেষ্টা করে। দুর্গম বনে সে যোরে, বিরাট ঢেউ ভেঙে তাদের ডিঙ্গি বাইতে হয়। এত বড় বিপদ জয় করে দিন কাটায় তারা। এত সহজে ঘাবড়ে না।

বাবার কথা মনে পড়ে। ওই সহরে বাবি পরেশ, মানুষ হবি। পরেশ মনে মনে জোর খুঁজে পায়।

পরীক্ষা দিয়ে ফিরেছে।

ক'দিন ধরে বৃষ্টি নেমেছে। গাং ফুলে উঠেছে। জোয়ারের জল বাঁধে এসে লেগেছে। দিনরাত বাতাসে ওঠে নদীর গর্জনের শব্দ। ওপার থেকে সোঁসো বাঘের ডাক ভেসে আসে—পরেশ এর মনে হয় তার বদলা নেওয়া হয় নি।

রাতে ঘুম আসে না। মনে হয় যে কোন মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে যাবে, নদীর বিরাট জলস্রোত তাদের সব কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। লোকজন অনেকেই বাঁধে পাহারা দিচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ ওঠে।

রাতের অন্ধকারে বাঁধে সজাগ মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছেন নবীনমাষ্টার, পরের বিপদে তিনিই আগে আসেন। তার ডাকেই লোকজন এসেছে বাঁধে। নদীর জল এসে বাঁধে আছড়ে পড়ছে। ওরা মাটি ফেলে চলেছে। পরেশও থাকতে পারে নি। সেও এসেছে বাঁধে।

হঠাৎ ওদিকে একটা শব্দ ওঠে।

কে চীৎকার করে—বাঁশিয়ার।

আবছা আলোয় দেখা যায় লম্বা বিরাট কুমীরটা ছুটে এসেছে ওদিক থেকে, নবীনবাবু সামনের লোকটাকে বাঁচাবার জন্য বাঁধ থেকে ক্ষেতের দিকে ঠেলে ফেলে দিতে বিরাট কুমীরটা রাগের চোটে ওর শক্ত ল্যাজের ঝাঁপটা মেরে নবীনমাষ্টারকেই ছিটকে ফেলে দিয়ে ওকে লম্বা চোয়ালে ধরে ফেলে নদীর জলেই লাফ দিয়েছে।

হায় হায় করে ওঠে সকলেই। পরেশও ডিঙিতে উঠে কুমীরটাকে বৈঠা দিয়ে মারতে থাকে। কুমীরটা তবু নবীনমাষ্টারকে নিয়েই ওই গহন নদীতে ডুব দিল, আর কিছু দেখা যায় না।

আর্তনাদ করে ওঠে পরেশ—মাষ্টার মশাই!

লোকজন শিউরে ওঠে ভয়ে। পরেশ কাঁদছে। তার

সামনে থেকে বারবার ওই বাদাবনের বাঘ, আর গাং-এর কুমীর তার আপনজনদের নিয়ে চলে যাচ্ছে? বাবাকে মেরেছিল কেঁদো বাঘটা—আজ আবার নবীনমাষ্টারকেও নিয়ে গেল কুমীরে! ওপারে বাদাবনে বাঘটা ডেকে ডেকে ফিরছে।

লোকজন জমে গেছে, পরেশ কাঁদছে। তার আপন জন হারিয়ে গেল।

ওর চোখের জল শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে।

পরেশের মনে জেগেছে একটা কাঠিন্য। এর বদলা নিতে হবে। বাদাবনের বাঘ আর কুমীরের জবাব সে দেবেই একদিন।

আর সেই কথাটা বোধহয় ভুলে গেছল পরেশ।

তার ওই ঘটনার কিছুদিন পরই পরীক্ষায় ফল বের হয়েছিল, ফার্স্ট হয়েছে পরেশ বসিরহাট মহকুমার মধ্যে। যাদববাবুও চিঠি দিয়েছেন ওকে। বলেছেন তার বন্ধু নবীনবাবু তাঁকে বলে গেছলেন ওর কথা, সুতরাং পরেশ এখানে এলে তার পড়ার থাকার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

মা ছাড়া আর কেউ নেই পরেশের।

তাই মন কেমন করে। মা-ই বলে তুই মানুষ হবি, ওরা সবলেই তাই চেয়েছিলেন। তুই চলে যা বাবা।

পরেশ বলে—তোমার দিন চলবে কি করে মা?

মা বলে—যা জমিটুমি আছে তাতে চলে যাবে।

পরেশ চোখের জল মুছে ওই বনের গায়ের গ্রাম ছেড়ে সহরে এসেছিল। প্রতি নিয়তই তার মনে হয়েছে ওই বাবা আর নবীন মাষ্টারমশাই এর কথা—তোকে মানুষ হতে হবে।

যাদববাবুও মুগ্ধ হয়েছেন পরেশের ব্যবহারে। আর তেমনি বুদ্ধিমান—মেধাবী ছাত্র। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে চলেছে। আর খেলাধুলাতেও তেমনি। ফুটবল ক্লাবের সেরা খেলোয়াড়। সাঁতারে এ দিককার চ্যাম্পিয়ন। ওকে সাঁতারে কেউ পারে না। বলে—সুন্দরবনের গাং ও নাকি সাঁতরে পাড়ি দিতে পারে।

বলিষ্ঠ একটি কিশোর।

সেবার পুজোর সময় ঘাটের নৌকায় লোকজন পার হচ্ছে। এস-ডি ও সাহেব এর বাড়ির ছেলে মেয়েরাও নৌকায় করে বাঁধ দেখতে এসেছে। নদীতে নৌকা নিয়ে বের হয়েছে তারা।

হঠাৎ কলরব ওঠে। ইছামতীর মাঝ নদীতে তেমন স্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোতের মধ্যে নৌকাটা পড়ে কেমন বেসামাল হয়ে গেছে। হাপাদাপি করছে ওরা প্রাণ ভয়ে। মাঝি চীৎকার করে—ঠাঁসিয়ার!

কারা ছিটকে পড়েছে। গেল গেল রব ওঠে। এস-ডি-ও সাহেবের ছোট ছেলেটা জলে পড়ে ডুবছে আর চীৎকার করছে। ওই স্রোতে কেউ যেতে সাহস করছে না। হঠাৎ তার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়েছে পরেশ।

স্রোত কাটিয়ে এগিয়ে চলেছে। ছেলেটা যেন তলিয়ে যাচ্ছে। পরেশ তীর বেগে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে ফেলে একটা নৌকার দিকে এগিয়ে যায়। নৌকায় তুলে দিয়ে নিজে কোন রকমে উঠে হাপাতে থাকে।

এস-ডি-ও সাহেব ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

—তুমি ওকে বাঁচিয়েছো।

যাদববাবুও এসেছেন, তীরে সহরের অনেক লোক এসে জমেছে।

পরেশ রাতারাতি সহরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। তখন সে ক্লাশ 'টেনে' পড়ছে। স্কুলের সেরা ছাত্র। তাই নিয়েই স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় তার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থাও হয়েছিল।

হঠাৎ এমনি দিনে খবরটা আসে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নিরস্ত্রীকরণই বিশ্ব-শান্তির পথ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

'বিশ্বের প্রতিটি মানুষ সুখী হোক, সব মানুষ আনন্দে থাকুক, সকলের সত্তা উপলব্ধি ঘটুক এবং কাউকেই যেন দুঃখ পেতে না হয় বা বিষণ্ণতা অনুভব করতে না হয়।'

এ একেবারে খাঁটি গান্ধীবাদী-সুলভ শুভ-কামনা।

সত্যি সত্যি তাই। গান্ধী-শিষ্য শ্রীযোশ্রারজী তাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী হয়ে প্রথম বিদেশ যাত্রা করেন শান্তিবাদী বন্ধু রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় যেখানে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যেন তিনি স্বদেশেই আছেন।

সোভিয়েতের 'শান্তি ও সহযোগিতার পররাষ্ট্র নীতি' এবং তার নতুন সংবিধান প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে গান্ধী-নীতিতে পূর্ণ আস্থাশীল তাঁর মন মুখর হয়ে উঠে, এই শান্তি ও সহযোগিতার পথই যে বিশ্ব-মানবের সুখী হবার, আনন্দে থাকবার ও সকলের পক্ষে সত্তা উপলব্ধির একমাত্র পথ সেটাই তিনি প্রথমে উদ্ধৃত উক্তিতে ব্যক্ত করেন।

এই 'শান্তি ও সহযোগিতার পররাষ্ট্র নীতি'রই স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় রাশিয়ার নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধে আন্তরিক আগ্রহ ও প্রয়াসের মধ্যে। বর্তমান নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনেই যে তার আগ্রহ প্রকাশ পেলো তা নয়, বহু ত্যাগ ও দুঃখবরণে এবং বহু রক্তক্ষরণের পর জারের পৃঙ্খলমুক্ত নতুন রাশিয়া যখন আত্মসংগঠনে ব্যস্ত সে সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হলে লেনিন যুদ্ধবিহীন শান্তির পৃথিবী গঠনে আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন বিশ্ববাসীকে। কিন্তু পরেই লেনিন অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁরই নির্দেশিত পথায় সেরাপি চিচেরিনের নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী রুশ প্রতিনিধিদল ইতালির প্রাচীন নগরী জেনোয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থ নৈতিক সম্মেলনে যেরূপ জোরের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন চৌত্রিশ রাষ্ট্রের সেই সমাবেশ তাতে রীতিমত চমকিত হয়ে উঠেছিল। সকলের বাধার প্রথম মহা যুদ্ধের পরেকার ১৯২২ সালের জেনোয়া সম্মেলনে উত্থাপিত নিরস্ত্রীকরণের সে প্রস্তাব ভেস্তে গেলেও সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতা পেরাপি চিচেরিনের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ক বক্তৃতায়, বৈষয়িক অগ্রগতির জন্যে যুদ্ধরোধের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে যে সমস্ত জোরদার যুক্তি দেখিয়ে-ছিলেন তা সমাগত রাষ্ট্রনেতাদের মনে নিশ্চয় একটা অনুরণন তুলে থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টায় তাই হয়তো এত ব্যাপক সমর্থন!

হবেই বা না কেন, প্রথম মহাসমরে যেখানে এক কোটি লোককে সারা বিশ্বে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং আরো এক কোটি মারা গেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে সেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে দু'কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে বিজয়ী হতে হয়েছে শুধু নিজের জন্যে নয় মিত্রশক্তি সমূহের সহযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীকে ফ্যাসের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে। এবার তো আর একা নয় রাশিয়া আগের বারের নবজাত সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী পৃথিবীতে কেবলমাত্র অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই আবির্ভাব ঘটেনি, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় বিস্তার ঘটেছে সারা দুনিয়া জুড়ে, এমন কি ধনবাদী দেশগুলিতেও কোটি কোটি মানুষ আজ মানবিক এই নবভাবে প্রভাবিত। ইয়োরোপের অর্ধেক দেশে যখন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং শান্তিকামী নিরপেক্ষ দেশগুলিও যখন তাদেরই মতো যুদ্ধবিরোধী ও তা'ছাড়া যুদ্ধের প্রতি একটা ঘৃণা ও চূড়ান্ত বিরূপতা যখন দেখা দিয়েছে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের মধ্যে তখন যুদ্ধাস্ত্র অর্থাৎ মৃত্যু ব্যবসায়ী ধনবাদী রাষ্ট্রগুলির সামনে একটা বড়ো রকমের প্রশ্ন দেখা দেবে বৈকি? সে প্রশ্ন এই—যুদ্ধবর্জন নীতিই যদি গ্রহণ করে চলে দেশের পর দেশ তা হলে অস্ত্র নির্মাণে আর লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে যাওয়া কেন? দেশে দেশে যেভাবে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটে চলেছে তাতে লেনিনের 'নিরস্ত্রীকরণ স্লোগান' প্রবন্ধে বর্ণিত

আদর্শের একদিন রূপায়ন ঘটবেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে। লেনিন সেই প্রবন্ধে লিখেছেন, 'নিরস্ত্রীকরণ সমাজতন্ত্রের আদর্শ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কোনো যুদ্ধ থাকবে না; বস্তুত সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণ অর্জিত হবে।' বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে আমরা কি সেই অবস্থাই লক্ষ্য করছি না? যুদ্ধের ভয়াবহতা গভীর বেদনার সঙ্গে এবং গভীর দুশ্চিন্তার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়েছিল বিপ্লবী মহানায়ক লেনিনকে। রাশিয়ার অবস্থা তখন সঙ্গীন। সেই বিপর্যয়কর পরিবেশ থেকে প্রথম বিশ্বসমরে লেনিনেরই সংগঠিত লাল ফৌজ নতুন সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করেছিল। বিশ্ব-কল্যাণে সমাজতন্ত্রের বিস্তার এবং যুদ্ধ বর্জনের আবশ্যকতা সে সময় থেকেই অনুভূত হয়ে আসছে।

একটি কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বশান্তি আন্দোলন শক্তিহীনের আবেদন নিবেদন নয়। পরমাণু বোমা নির্মাণই শুধু নয় হিরোসিমা নাগাসিকিতে তার বিস্ফোরণও ঘটানো হয়েছিল সোভিয়েত বিজ্ঞকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে। সেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী আজ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, রাশিয়া সহ আরো তিনটি রাষ্ট্র। শুধু তাই নয় আরো দু'ডজন রাষ্ট্র নাকি এই পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের জ্ঞান সঞ্চয় করে বসে আছে। জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে একটি এটম বোমা বর্ষণ করে হিরোসিমা-নাগাসিকিতে আমেরিকা আশি হাজার লোকের জীবনহানি ঘটিয়েছে এবং আরো অসংখ্য নরনারী ও শিশুকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তেত্রিশ বছর আগের এই একটি মাত্র ঘটনাই কি অস্ত্র-বর্জন তথা যুদ্ধ-বর্জনের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নয়! পাঁচটি পরমাণু-শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে বিকাশশীল দেশগুলি ১৯৯০ সাল থেকে প্রতি বছর তিন হাজার করে হিরোসিমা-টাইপের বোমা তৈরি করতে সমর্থ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন। বার বছর পর এই গ্রহের মানুষ কী অবস্থায় সম্মুখীন হবে সহজেই অনুমেয়।

স্মরণ করা যেতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দশ বছর অতিবাহিত হতে না হতেই আবার দিকে দিকে যুদ্ধায়োজন লক্ষ্য করে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত আঠারো জন বিশ্ব-বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'We saw with horror that science is giving mankind the means with which it can destroy itself'। ১৯৫৫ সালে ১৫ই জুলাই প্রচারিত আঠারো জন বিজ্ঞানীর বিবৃতির এই অংশটুকুর সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি বক্তব্যাংশ এখানে উল্লেখ করে দেখানো চলে আজকের পৃথিবী একটা ভয়ঙ্কর রকমের বারুদের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। স্যার রাসেল বলেছেন, 'Eight ounces of a substance I know can wipe out all life on earth, including animal life.'. ঘটনাচক্রে ১৯৫৫ সালে স্যার রাসেলের এই ভয়াবহ উক্তির পরেও মৃত্যু-ব্যবসায়ীদের মারণাস্ত্র নির্মাণের উদ্যম হ্রাস পায় নি। বরং নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি করে একের পর এক যুদ্ধ তারা বাধিয়েই চলেছে এবং প্রায় সমস্ত সংঘর্ষ বা গোলযোগের দায়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা দোষমুক্ত বলে নির্লজ্জের মতো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যদিও ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮—এই ত্রিশ বছরকে দীর্ঘতম শান্তির কাল বলা হয়ে থাকে তথাপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ছোট বড়ো যুদ্ধ বা সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে এবং যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসাও অবিরাম চলে আসছে। এমনি একটা পরিস্থিতি ঘনিয়ে আসতেই সোভিয়েত সরকার-নেতৃবর্গ লেনিন বর্ণিত সেই নিরস্ত্রীকরণের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সার্থক করে তুলতে একেবারে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁদের এ প্রয়াসের পূর্ণ সমর্থনে এলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিচয় এবং বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলি যার ফলে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ নিরস্ত্রীকরণ অধিবেশন আহূত হয়েছে পাঁচ সপ্তাহের আলোচনায় এ বিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব নির্ণয় করার জন্যে যাতে তা প্রস্তাবিত বিশ্ব নিরস্ত্রী-

করণ সম্মেলনে উত্থাপন করা যেতে পারে। আনন্দের কথা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না হলেও আরো দু'দিন সময় নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমেই একটি খসড়া প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে এবং সে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমিকো।

প্রস্তাবটির চারটি ভাগই খুবই সাধারণ ধরণের এবং সমগ্র মানব সমাজের পক্ষে একান্ত কাম্য ও কল্যাণকর। প্রস্তাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৪৯টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে: (১) সর্বপ্রকার নিউক্লিয়র অস্ত্রের উৎপাদন বন্ধ রাখতে হবে, (২) গণধ্বংসকারী অন্য সমস্ত অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ রাখতে হবে, (৩) ব্যাপক ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন যান্ত্রিক ধরণের অস্ত্র নির্মাণও বন্ধ রাখতে হবে এবং (৪) নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণকে এবং তাদের সঙ্গে সামরিক চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলিকে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যও পরিত্যাগ করতে হবে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে গ্রোমিকো বলেছেন, অন্য সব রাষ্ট্র নিরস্ত্রীকরণের জন্যে প্রস্তুত থাকলে আমরা পিছিয়ে থাকবো না। সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে আমরা চলছি না। এমন কোনো কাজ নেই আমাদের যা সামরিক পন্থায় সম্পন্ন করতে চাই। আমরা মনে করি অস্ত্রপ্রতিযোগিতা হ্রাস করে, নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এবং সকল পক্ষের স্বার্থ সমভাবে বিবেচিত হবে এরূপ ন্যায়সঙ্গত চুক্তির মাধ্যমেই আমাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সমগ্র বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত হতে পারে'। একই সঙ্গে গ্রোমিকো আরো বলেছেন, 'আমরা মনে করি, বেশি সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও সশস্ত্র বাহিনীর পরবর্তী যাবতীয় পরিমাণগত ও গুণগত বৃদ্ধি বন্ধ রাখার কথা ভাববার সময় এসেছে।' এই কথা বলেই তিনি পূর্বোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন জানান পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পথে প্রথম পদক্ষেপে এই দলিল গ্রহণের জন্য। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীতও হয়। এবং এই খসড়া প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বানের দাবী উঠেছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্যে ও নিরস্ত্রীকরণের সাধু উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব প্রস্তাবই সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে, এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর করা হলে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদ রোধে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হবে। শান্তির পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়াসী জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি যে রাশিয়ার এ প্রস্তাবের উচ্চ প্রশংসা করবে, সে বিষয়েও শ্রীবাজপেয়ী তাঁর নিভুল ধারণা আগেই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে কথিত চীনের দিক থেকে বাধা আসছে আন্তর্জাতিক অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ বা নিরস্ত্রীকরণের পথে। অভাবনীয় বলে মনে হলেও সাধারণ পরিষদের নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হুয়াং হুয়া পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আর আমেরিকা, এ দুটি রাষ্ট্রকেই নিরস্ত্রীকরণ কার্যকর করতে হবে আর নাটো জোটের সদস্য দেশগুলিকে ভাঙাচোরা করে কোনোরূপ সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে না নিয়ে অস্ত্রসজ্জা বাড়িয়ে যেতে হবে কারণ তারা এখনো পর্যন্ত আত্মরক্ষার অতি সামান্য শক্তিরই অধিকারী। ওয়াশিংটনে যখন নাটো গোষ্ঠির সম্মেলন চলছে তাদের অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির উদ্যোগকে সফল করার চেষ্টায় সে সময়ে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে বসে নিউইয়র্ক থেকে তাতে প্রয়োচনা জোগাচ্ছেন, এ শুধু অভিনব নয় অভাবনীয়ও বটে। চীনের দিক থেকে এ যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক সৃষ্টির চেষ্টা, হুয়াং হুয়ার ভাষণ সেটাই প্রমাণ করে এবং রাশিয়া ও আমেরিকা নিরস্ত্র হয়ে গেলে বিশ্ব-নেতৃত্বে আসবার একটা সুযোগ ঘটবে চীনের, তেমনি একটা চাপা ইচ্ছাও যেন সচেই হয়ে ওঠে তাতে।

মহাচীনের মনোভাব আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে

সে দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী তেঙ হিয়াও পিঙের এক বক্তব্যে যেখানে তিনি বলেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য এবং সে যুদ্ধ আরম্ভ করবে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন না হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের মোকাবিলার জন্যে চীনও সে প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে অকুণ্ঠভাবেই তা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং অন্তত দশ বছর তাঁকে তৈরি হতে আসানও জানিয়েছেন। ৯ জুন তারিখে হংকং এ এফ পি প্রচারিত একদল সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে। এভাবে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি-প্রচেষ্টায় এবং আমেরিকা ও সোভিয়েতকে এক ব্রাকেটভুক্ত করায় বিশ্ববাসীর কাছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চীনের মর্যাদা কি ক্ষুণ্ণ হয়নি?

একটা বুঝাপড়ায় আসার জন্যে কম-বেশি এরকম আলোচনা বেশ কিছুকাল ধরেই চলছে। চীন সেটা ভালো চোখে দেখে না এবং যাতে সে আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায় সেটাই তার কামনা। তা হলেও নিজের স্বার্থ আমেরিকা নিশ্চয়ই বেশি বোঝে। তাই যখন তখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করলেও এই সেদিন, গত ৭ জুন মেক্সীকোতে নৌ-নিরস্ত্রীকরণের এক সভায় বলেছেন, 'We will continue to negotiate constructivety and persistently for a fair strategic arms limitation agreement. We know that no idiological victories can be won by either side by the use of nuclear weapons.'

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফর শেষে দেশাই কাউন্টের যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে (১৩ জুন ১৯৭৮) বিশ্বশান্তি বিষয়ে সেই একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'They agreed that world peace can only be assured through effective measures to halt the arms race, particularly in the nuclear field, including the the prevention of the prolifieration of nuclear weapons and their ultimate elimination..'

চীনও যদি এ বিষয়ে একমত হতে পারতো তাহলে কত সহজে নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠতো!

Phone : Res. 550417

HANUMAN STEEL PRODUCTS

222, GIRISH GHOSH ROAD
BELUR, HOWRAH

Manufacturers :
STEEL WASHERS & BUCKLES ETC.

Dealers of :
BLACK PIPE, BLACK PIPE PLATE MELTING SCRAPS, M. S. SCELP & BLACK SHEET CUTTINGS ETC.

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

রাত গভীর। কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘন অন্ধকার নবদ্বীপকে গ্রাস করেছে। পথ-ঘাট, গাছ-গাছালি সে অন্ধকারে একাকার।

শুধু দূরে মঙ্গলচণ্ডীর থানে একটি আলো জ্বলছে। মঙ্গলচণ্ডীর থানে আজ যেন কিসের একটা উৎসব। সে উৎসবে অনেক লোক হয়েছে। মিলেছে বহু নরনারী। মদ-মাংস খেয়ে তারা নাচ-গান করছে। এ ওর গায়ে চলে পড়ছে। এ ওর প্রতি ইঙ্গিত করছে। বিকৃত ইঙ্গিত। একটা উন্মত্ত দমকা বাতাসে ভর ক'রে ছড়িয়ে পড়ছে দূর দূরান্তে।

অদ্বৈতাচার্য এখনও ঘুমোন নি। অনেক রাতই তাঁর এমনি কাটে। ঘুম আসে না। কী একটা জ্বালা যেন তাঁর বুকের ভেতর গভীর ব্যথায় জ্বলে। তিনি ঘুমোতে পারেন না। তাঁর চোখে ঘুম আসে না। ঘুম যেন তাঁর দু চোখ থেকে কোথায় উড়ে পালায়।

অদ্বৈতাচার্য তখন ঠাকুর ঘরে আসেন। ঠাকুরের সামনে বসেন। ঠাকুরের নাম করেন। গান করেন। নাম-গানেই রাত কেটে যায়।

অদ্বৈতাচার্য আজও ঘুমোন নি। ঠাকুর ঘরে বসে-ছিলেন। ঠাকুরের নাম করছিলেন।

কিন্তু আজ যেন সে নামে মন বসাতে পারছেন না অদ্বৈতাচার্য। ভাবের ঘরে মন রাঙাতে পারছেন না। মঙ্গলচণ্ডীর থানের উন্মত্ত কোলাহল বাতাসে ভেসে আসছে। তা শুনে নারীটা যা যেন খাঁ খাঁ ক'রে উঠছে অদ্বৈতাচার্যের। দু চোখে জল আসছে তাঁর। একটা মহাশূন্য যেন পাথরের ভার নিয়ে তাঁর বুকে চেপে বসছে।

'গেলো, গেলো, সব গেলো। সব রসাতলে ডুবলো। গোটা নবদ্বীপ, গোটা নদে তলিয়ে গেলো পাপাচারে।' বলতে বলতে আসন ছেড়ে উঠলেন অদ্বৈতাচার্য। অনমনা হয়ে ঘরময় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। একবার গিয়ে জানলায় দাঁড়ালেন।

জানলার বাইরে অন্ধকার। ছেদহীন অন্ধকার। বিরাট আকাশের নীচে বিরাট পৃথিবী যেন অন্ধকারে স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

না, পৃথিবী একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে নেই। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। গাছ-গাছালির মাথাগুলি, পাতাগুলি নড়ে উঠছে ধীরে। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া পৃথিবী যেন শিউরে উঠছে বারে বারে। দূরে কি একটি গাছের ডালে রাত-জাগা কোন্ পাখী যেন চেঁচিয়ে উঠছে মুহুর্মুহু। বড়ো করুণ সে চীৎকার। ও যেন অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া পৃথিবীর বুক-ফাটা কান্না। বুকে তার যেন আলোর অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ঐ মঙ্গলচণ্ডীর থান। ওখানে যেন এ অনুভূতি নেই। এ গভীরতা নেই। একটি টিমটিমে আলোর নীচে মিলেছে একপাল নর-নারী। ঢোলের বোলে তাদের পা পড়ছে। গান ধরছে তারা। মঙ্গলচণ্ডীর গান। একটা হাল্কা ঢঙে, হাল্কা ঢঙে তারা চেঁচিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

'বীভৎস! বীভৎস!'

অতর্কিতভাবেই যেন কথা ক'টি উচ্চারিত হলো অদ্বৈতাচার্যের কণ্ঠে। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি। আবার ঘরময় পায়চারি করলেন। আবার এসে আসনে বসলেন। দু চোখে ধারা বইছে। ঘনঘন পড়ছে দীর্ঘশ্বাস।

মানুষের পাপাচার তাঁর মনে যেন তীরের মতো এসে বিঁধেছে। কান্নায় তাই হৃদয় তাঁর উথলে।

দীপ জ্বলছে। ধূপ পুড়ছে ঠাকুর ঘরে। সারা ঘর ধূপের গন্ধে আমোদিত। সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আজ যেন অনেক বেশী উজ্জ্বল।

অদ্বৈতাচার্য একবার চাইলেন সে বিগ্রহের দিকে। চেয়ে চেয়ে চোখের জল ফেললেন।

বললেন, 'এসো প্রভু, এসো দয়াল। এসো গোলোক-বিহারী নারায়ণ। আজ যে তোমার বড়ো প্রয়োজন। এ ধরা পাপে ভরে গেছে। অন্যায় ন্যায়ের বুকে চেপে বসেছে। অসত্য সত্যের টুঁটি চেপে ধরছে। আজ যে তোমায় আসতেই হবে।

তুমি না বলেছো, তুমি আসবে। যুগে যুগে আসবে। ধর্ম যখন গ্লানিগ্রস্ত, অধর্মের দম্ভ যখন আকাশস্পর্শী, জগতের সেই নিদারুণ দুঃখের দিনে এখানে তোমার আবির্ভাব ঘটবে। তুমি আসবে, সাধুদের রক্ষার জন্যে, দুষ্টদের বিনাশের জন্যে, জগতে প্রেমের রাজ্য, ধর্মের রাজ্য স্থাপনের জন্যে।

তবে এসো প্রভু, এসো পতিত উদ্ধারণ পতিতপাবন, ধরা আজ পাপের অতলে ডুবতে বসেছে। তুমি এসে তাকে উদ্ধার করো।'

আচার্যের কণ্ঠে বড়ো করুণ হ'য়ে বাজলো কথা ক'টি। কথা নয়, এ প্রার্থনা। এ প্রার্থনা ঠাকুর ঘরের চার দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ঝন্‌ঝন করে বেজে উঠলো।

আচার্যের চোখে তখনও ধারা বইছে। ধারা নয় এ অশ্রুর অর্ঘ্য। কোথাও এর শেষ নেই।

ভোর না হতেই শ্রীবাস এসে হাজির।

বললেন, 'আচার্য, ও আচার্য'।

আচার্য ঠাকুর ঘরেই ছিলেন। সেখান থেকেই উত্তর দিলেন। বললেন, 'কে? শ্রীবাস?

'হ্যাঁ আচার্য। একবার বেরিয়ে এসো দেখি। এ দেশে যে বাস করা দায় হলো।'

'কেন গো? কি হলো আবার?'

বলতে বলতে অদ্বৈতাচার্য ঠাকুর ঘর থেকে বেরুলেন। আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি হয়েছে শ্রীবাস?

'রোজ যা হয়, আজও তা-ই হয়েছে।'

'আজও ওরা এসে হামলা করেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ আচার্য। রাতে ঘুমোতে দেয়নি। আমরা চার ভাই। প্রাণ খুলে নাম-গান করছি, ওদের আজও তেমনি লাফালাফি। বলছে, আমাদের ওরা গ্রাম ছাড়া করবে। বাড়ী-ঘর ভেঙে গঙ্গায় ডোবাবে। নইলে নাকি হবে এ গ্রামের অমঙ্গল। যবনে এ গ্রাম গ্রাস করবে।'

শ্রীবাসের কথা শুনে একবার হাসলেন আচার্য। আনমনে আঙিনায় পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। তারপর শ্রীবাসের কাঁধে একবার কাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ভয় করো না শ্রীবাস। ঘরে যাও। ঘরে যেয়ে নাম করো। প্রভু আসছেন। প্রভু আসবেন। তিনি আমায় কথা দিয়েছেন। বলেছেন, অদ্বৈত, আমি আসছি। তোমরা তার আয়োজন করো।'

অদ্বৈতের কথা শুনে একেবারে নির্বাক হ'য়ে রইলেন শ্রীবাস। আচার্য আবার বললেন, 'ঘরে যাও শ্রীবাস। তাঁর প্রেমের ভুবন পাপে পূর্ণ না হলে যে তিনি আসেন না। সে ভুবন আজ অনাচারে ছেয়ে গেছে। ধরার ব্যথায় মা রেখে অন্যায় মাথা তুলেছে। তাই না তিনি আসছেন শ্রীবাস।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'সাজাও শ্রীবাস, পূজার অর্ঘ্য সাজাও। বলো শ্রীবাস, শতমুখে বলো 'হরি বোল, হরি বোল।' বলতে বলতে আচার্য দু' বাহু তুলে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীবাসের চোখে জল। মুখে প্রসন্নতার আলো। সেও আচার্যের সঙ্গে বাহু তুলে নৃত্য শুরু করলে। এখন মনে তার কোন ক্ষোভ নেই।

কিন্তু এ অবস্থা সাময়িক। অদ্বৈতাচার্যের মনে যে বিশ্বাস, সে বিশ্বাস শ্রীবাসের নেই।

কাজেই বাড়ী ফিরে তার সে বিশ্বাস আবার ভেঙে

পড়ে। ভাতে যে, তারও কারণ আছে।

বাড়ীর একটু দূরেই কুলদা চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। হরিনাম কানে গেলেই তার প্রাণে আলা ধরে। সে বলে, ব্যাটাদের নিয়ে যে ভারি মুস্কিল হলো হে। নবদ্বীপকে যে এরা রসাতলে দেবে। দেশের মালিক যবন। যবনের কানে এ কথা গেলে যে গাঁয়ের আর রক্ষে নেই।'

তাঁতাতঙ্কের একজন বলে, 'তা হলে কি করা যায় চক্কোত্তিমশাই?' কুলদা চক্রবর্ত্তী একেবারে যেন খেঁকিয়ে ওঠে। বলে: করবে আবার কি? ব্যাটাদের গ্রাম ছাড়া করো। ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যাও। নবদ্বীপের পাপ দূর হোক।'

আসলে কুলদা চক্রবর্ত্তীর ভয়টা যবন রাজকে নয়, ভয়টা বৈষ্ণবদের। দিনে দিনে নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা বাড়ছে। কুলদা চক্রবর্ত্তীর কাছে এটা দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদ, কারণ সে ভয়ে বিষালী। তান্ত্রিক শিরোমণি। নবদ্বীপে বৈষ্ণবের সংখ্যা বাড়লে যে তান্ত্রিকদের প্রভাব কমবে, সে হিসেব করবার মতো হিসেবী বুদ্ধি তার আছে। সে তাই সে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করলে। তার গুহ্য সাধনা জোর পেলো।

রাতে হয় এ উপাসনা। গভীর রাতে।

সারা নবদ্বীপ ঘুমায়। চারদিকে স্তব্ধতা। শুধু মাঝে মাঝে কি কি পোকার ডাক গভীর রাতের বুক চিরে বাজে।

কুলদা চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তখন উৎসব।

মদ-মাংস আছে। আছে সুবাসিত দ্রব্যাদি। উপরন্তু আছে পাঁচটি কুমারী কন্যা। সকল উপলক্ষের লক্ষ্য।

মদ মাংসের পাট শেষ হলে সুরু হয় রমণ লীলা। কুলদা চক্রবর্ত্তী মদ পড়ে প্রথমে পরিতৃপ্ত করে নেয় পঞ্চ কন্যাকে। বিচিত্র বসন পরায়। সুবাসিত দ্রব্যাদির সৌরভে ঘর ম' ম' করে।

তারপর সুরু হয় কুমারী সাধনা। মাঝে মাঝে একটা উন্মত্ত চীৎকার বাতাসে লেগে খান্ খান্ হ'য়ে যায়। খান্ খান্ হ'য়ে আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়ে।

কোন কোন দিন শ্রীবাসের ঘুম ভাঙে ভাঙে।

শ্রীবাস উঠে বসে। দক্ষিণের জানলাটা বন্ধ ক'রে দেয়।

মনে মনে বলে, 'প্রভু, নারীর মাংস নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করছে। তাকেই ওরা প্রচার করছে ধর্ম বলে। বাভিচারের নাম করেছে ধর্মাচার। ওদের তুমি সুমতি দাও। ওদের তুমি সত্যের পথ দেখাও।'

কোন কোন দিন এমনও হয় কুলদা চক্রবর্ত্তী তার স্যাঙাতদের নিয়ে একেবারে শ্রীবাসের আঙিনায় এসেই হাজির।

ডাকে, 'ছিবাস ঠাকুর, অ ছিবাস ঠাকুর।'

শ্রীবাস শোনে সব। কিন্তু উত্তর দেয় না।

কুলদা চক্রবর্ত্তী আবার বলে, 'দরজা খোল ছিবাস-ঠাকুর, ছাখো তোমার জন্যে কি অমৃত এনেছি। 'ম'-আকারে মা, অনুস্বারে, দন্ত্য'স', মাংস।

মাংস কথাটা সে বানান ক'রে বলে।

তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে। হাসে স্যাঙাতরাও। তবে হাসির আগে তারা ক'টি অশ্লীল শব্দ যোগ ক'রে দেয়। হাসিটাকে তারা আরও কাঁকালো করে নেয়।

শ্রীবাসের কাছে সে হাসি বীভৎস বলে মনে হয়। সে ওঠে। জানলার কাছে যায়। জানলা খোলার চেষ্টা করতেই এক টুকরো মাংস জানলার পাল্লায় এসে লাগে।

শ্রীবাস জানলাটা আবার বন্ধ করে দেয়। সারা গা তার ঘী ঘী ক'রে ওঠে। মুখে 'হরি' 'হরি' বলে।

ভাবে সে, 'না, আর আশা নেই। নবদ্বীপ নরকে ডুবছে। সে নরক থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না!'

॥ দুই ॥

'পারবে।'

শ্রীবাস অদ্বৈতাচার্যের কাছে এসেছিল। সব কথা

খুলেও বলেছিল। শুনে আচার্য চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। কি যেন ভাবলেন তিনি। তন্ময় হয়ে ভাবলেন।

তারপর বললেন, পারবে শ্রীবাস, পারবে। তোমায় তো কতোদিন বলেছি আমি, শাস্ত্রের কথা বলেছি, পাপ যখন পুণ্যের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ায়, তখনই গোলোকের সিংহাসন নড়ে। তখনই তিনি আসেন। নবদ্বীপে তো আজ তাই হয়েছে। তাই তিনি আসছেন। তাই তিনি আসবেন।

শ্রীবাস বলে, 'কিন্তু আর যে পারি নে আচার্য।'

'পারতে হবে শ্রীবাস। সইতে হবে সব। বৈষ্ণবের আদর্শের কথা কি ভুলে গেলে তুমি? শাস্ত্রকারগণ কি বলেছেন? তাঁরা বলেছেন 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা'—তৃণের চেয়েও বিনয়ী, তরুর চেয়েও সহিষ্ণু হতে হবে তাদের। রাগকে করতে হবে অনুরাগ, ঘৃণাকে মজাতে হবে প্রেমে। তবেই না তাঁরা বৈষ্ণব।

শ্রীবাস মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচার্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আচার্য আবার বললেন, 'বাধা আসবে সহস্র, বিপদ আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে। কিন্তু তাই বলে তো হাল ছাড়লে চলবে না শ্রীবাস। জীবের কল্যাণে সে হাল আমাদের শক্ত হাতে ধরতে হবে।

শ্রীবাসের মুখে আর কথা নেই।

আচার্যের বাণী মনে তার সাহস এনে দিয়েছে।

শুধু কি রাতেই? দিনেও নবদ্বীপের পথে বৈষ্ণবের নিস্তা হয়। ঠাট্টা বিদ্রূপের হাজার ফলা বুকে সেঁধে সেঁধে বৈষ্ণবকে পথ চলতে হয়। আর এই বিদ্রূপের বাণ আসে শাস্ত্রকার ও শাস্ত্রের কারবারীদের কাছ থেকে।

এই সব পণ্ডিতের মতে, ভক্তি নয়, যুক্তিই হলো বড়ো কথা, বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো জ্ঞান। সেই জ্ঞানের আলোতে যা প্রতিভাত নয়, তা অসত্য।

বৈষ্ণবেরা বলেন, 'না হে না, তা নয়। জ্ঞান বড়ো কথা নয়। জ্ঞানের পথ সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট সীমার এসে জ্ঞানের পথ শেষ হতে বাধ্য। তারপরই অজানার অগাধ সমুদ্র। সেখানে পৌঁছতে হলে বিশ্বাসের নৌকোয় চড় করতে হয়। ভক্তি দিয়ে পাল উড়াতে হয়। এই ভক্তি আর বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই মানুষ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু শাস্ত্রের কারবারীদের বড়ো গলা। সংখ্যায় তারা বেশী। নানা দেশ থেকে এসে নবদ্বীপে তারা বসতি করেছে। নবদ্বীপে তারা টোল খুলেছে। সে টোলে দেশ বিদেশের পড়ুয়া। অধ্যাপক ও পড়ুয়ার এক কণ্ঠ, 'ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়ো। ভক্তি অন্ধ, জ্ঞান জ্যোতিষ্মান'।

বৈষ্ণবেরা বলেন, জ্ঞানের রাজ্যে শুধু তো তর্কের ধূলি, শুধুই কচকচি। সেখানে আস্বাদন নেই, উপলব্ধি নেই। আছে শুধু সূত্রে সূত্রে ঘষাঘষি। আছে বাগাড়ম্বর। আছে অহংকার। জ্ঞানের অনেক উঁচুতে রয়েছে রস। সেই রস আস্বাদনের জন্যে চাই ভক্তি।

জ্ঞানবাদী আর ভক্তিবাদীদের এ তর্ক শেষ হয় না। জ্ঞানবাদীদের মতে যা অপ্রত্যক্ষ তা-ই অসত্য। ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ, জ্ঞানবাদীদের অনেকের মতে ঈশ্বরও তাই অসত্য। ঈশ্বরের নামে যারা পাগল হয়, তারা মূর্খ। মানুষই সর্বশক্তিমান্। মানুষেরই কল্পনা একটা মিথ্যা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। আসলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই।

বৈষ্ণবেরা এ মতের বিরুদ্ধে। জ্ঞানবাদী আর ভাগবত-বাদীদের মধ্যে তাই এতো বিরোধ।

অদ্বৈতাচার্য চলেছিলেন পথ দিয়ে।

বেলা অনেক হয়েছে। সূর্যটা মাঝ আকাশে ঝিকমিক করছে। বাতাসে রোদের উত্তাপ। পথে দাঁড়ানো যায়।

তবুও থমকে দাঁড়ালেন আচার্য। পাশের এক ঘরে ভীষণ গোলমাল। প্রথমে আলোচনা দিয়ে সুরু, পরিণতিতে গালাগালি।

ব্যাপার কি? আচার্য পাশের ঘরে তাকালেন।

কোন্দল বেধেছে তর্কবাচস্পতি আর তর্কচূড়ামণিতে।

খানিকক্ষণ আগে ও পাশের বাগানে একটি তাল পড়েছিল।

তর্ক বাচস্পতি বললেন, 'তালটা ঠাস করে পড়লো।' তর্ক চূড়ামণি তাতে বাধা দিলেন, উঁহু, তাল ঠাস করে পড়েনি, পড়ে ঠাস করেছে।'

চূড়ামণি মশাই, আপনার কথা মোটেই সত্যি নয়। তালটা ঠাস করেই পড়েছে।' বললে তর্ক বাচস্পতি।

শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠলেন তর্ক চূড়ামণি।

বললেন, মানে? আমার কথা মিথ্যে, আমি অসত্য ভাষণ করেছি? তাল পড়ে ঠাস করেনি? বলতে বলতে তর্ক চূড়ামণি মশাই গলাটা বেশ চড়িয়ে এক পাশা লোক আউড়ে গেলেন।

বিপদ হলো তার উত্তরে তর্ক বাচস্পতি মশাইও লোকের কাড়ি উপঢৌকন দিলে।

তাল প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গাল প্রসঙ্গ এলো।

উভয়েই উভয়কে আক্রমণ করে গালাগালি সুরু করলে। অদ্বৈতাচার্য তখন এগিয়ে গিয়ে দু'জনের মাঝখানে পড়লেন।

বললেন, তাল ঠাস ক'রে পড়লো না পড়ে ঠাস করলো তার সঙ্গে জীবের কোন্ কল্যাণ জড়িয়ে আছে গো বাচস্পতি মশাই? তাল ঠাস করেই পড়ুক বা পড়েই ঠাস করুক তাতে জীবের কি এসে যায়? তার জন্যে আবার কোন্দল কেন?'

আচার্যদেবের উপস্থিতি যেন অঘটন ঘটালে। তর্ক চূড়ামণি আর তর্ক বাচস্পতি এতক্ষণ কলহে লিপ্ত ছিল। অদ্বৈতাচার্যকে দেখেই যেন সাপের মাথায় ধূলি পড়লো। দু' তার্কিকের তর্ক হলো বন্ধ। তাদের ক্রোধ এক হয়ে এবার গিয়ে পড়লো আচার্যদেবের উপর।

বাচস্পতি বললে তুমি কে হে? আমাদের নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে, তাতে তুমি মোড়লি করবার কে?'

তর্ক চূড়ামণি এক টিপ নস্যি নাকে ঠেসে নাকটাকে মুছতে মুছতে বললে, 'তাই যে তোমার বাড় হয়েছে হে, কেই ভদ্রা বোষ্টম হয়ে এয়েচো আমাদের উপদেশ দিতে? যাও বেরোও, বেরোও এখান থেকে। আমরা তর্ক করি গালাগাল করি, তাতে তোমার কি? তোমার কোন্ গেরাহ্যি বধে যায় তাতে?'

আচার্য বললেন, 'তোমরা অহেতুক তর্ক করে মরছো, তাই না—আচার্যের কথা শেষ হলো না, তিড়িং করে উঠলে তর্ক চূড়ামণি।

বললে, তা আমরা মরছি, আমরা মরবো। তাতে তুমি মাতব্বরি করতে আসবে কেন? না, ষাঁড়-নেড়ির দল করে সাহস তোমার বেড়ে গেছে? সব কিছুতে নাক না গলালে নয়।

আচার্যদেব কথা বাড়ালেন না। চলে এলেন সেখান থেকে। মনে মনে বললেন, প্রভু এরা অন্ধ। নিজেরা কি করছে নিজেরাই তা জানে না। তুমি এদের সুমতি দাও। এদের তুমি উদ্ধার করো।

দু'টি চোখ জলে ভিজে এসেছিল। আচার্য দেব আঁচলের খোঁট দিয়ে চোখ দু'টিকে একবার মুছে নিলেন।

'অদ্বৈত আমি যাচ্ছি। ধরা আজ পাপে ভরে গেছে। অনাচার—ব্যভিচারে জীব আজ ডুবে আছে। তাদের উদ্ধারের জন্যে আমি ধরায় অবতীর্ণ হচ্ছি। অদ্বৈত আমি যাচ্ছি, আমি আসছি।'

রাতের শেষ প্রহরে স্বপ্ন দেখলেন আচার্য। স্বপ্ন দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠলেন। এ-দিক সে-দিক তাকালেন। কিন্তু কৈ? কেউ তো কোথাও নেই। তবে কে শোনালে তাঁকে সে কথা, অদ্বৈত আমি আসছি? কে বলে, অনাচার ব্যভিচারে জীবকুল ডুবে আছে, তাদের উদ্ধারের জন্যে আমি যাচ্ছি?

আচার্য বুঝলেন, তিনি স্বপ্ন দেখেছেন।

স্বপ্নে প্রভুই তাঁকে বলে গেলেন, 'তিনি আসছেন।'

আনন্দ—আনন্দ—একটা অসীম আনন্দে তাঁর প্রাণ-মন ভরে গেলো। পাগলের মতো ঘরময় পায়চারি করলেন তিনি। নিজের মনে নিজেই বলে চললেন, 'আসবেন আসবেন। তাঁকে যে আসতেই হবে। জীবের দুঃখে

তিনি যদি না আসেন, যদি না আসেন, তাহলে যে তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক হবে।

তিনি কি না এসে পারেন? তিনি কি না এসে পারেন গো'! মনের আনন্দে আচার্য যেন শিশুর মতো লাফিয়ে উঠলেন।

কিন্তু এ আনন্দ তো আর চেপে রাখতে পারছেন না আচার্য। আনন্দ ধারা তাঁর মনের দু'কূল ছাপিয়ে উঠেছে।

এ আনন্দ যে আর চেপে রাখা যায় না।

আচার্য ঘর থেকে বেরুলেন। রাস্তায় এলেন। শেষ রাতের তারাটা পূব আকাশে জল-জল করে জ্বলছে। একটা পা ভসা আষাঢ়ের চাঁদর মোড়া নবদ্বীপের পথ-ঘাট-গুলি। সে পথ দিয়ে গিয়েই দাঁড়ালেন শ্রীবাসের অঙ্গনে।

ডাকলেন, 'শ্রীবাস।'

শ্রীবাসও জেগে ছিল। হরিনাম করছিল।

বাইরের ডাক শুনে সে যেন একটু বিস্মিতই হলো।

বললো, 'কে?'

শ্রীবাস? এসো, এসো, বাইরে এসো। আজ যে ঘরে থাকার দিন নয় গো, আজ বাইরে বেরুবার দিন। আজ আনন্দের দিন। আনন্দ করো শ্রীবাস, আনন্দ করো। প্রভু আসছেন। এই নবদ্বীপেই তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

শ্রীবাসের আরও তিন ভাই—শ্রীরাম, শ্রীরাম, শ্রীপতি। আচার্যের কথায় সবাই বাইরে আসছে।

অদ্বৈতাচার্য বললেন, শোন শ্রীবাস, শোন শ্রীরাম, শ্রীরাম, শ্রীপতি, আজ রাতের শেষ প্রহরে প্রভু আমায় বলে গেলেন, তিনি আসছেন। গোলোক ছেড়ে তিনি নবলোকে নামছেন। বাসর দাজাও শ্রীবাস, দীপ জ্বালাও। হরিবোল হরিবোল কথা জন-গণকে শোনাও। প্রভু আসছেন, আর কি আমাদের দেরী করার সময় আছে?

সময় নেই।

'হরি বোল, হরি বোল' বলো ভাই হরি হরি।

শ্রীবাস-অঙ্গনে হরি নামের ঢেউ উঠলো।

বাতাসে সে ঢেউ ছড়িয়ে গেলো দিগদিগন্তরে।

ভোরের লাল সূর্য ভক্তবীথির শিরে এতক্ষণে তার আলোর চুম্বন পাঠিয়ে দিয়েছে। (ক্রমশঃ)

PREMIER
EARTH MOVER (P) LTD.

1, BRITISH INDIAN STREET
(2nd Floor)
CALCUTTA-700069

Holders of :

DGS & D Rate Contract For Avelling Jessop, Britennia, Marshall and Agrind Moore Road Roller Spares.

Stockists spare for :

Caterpillar, P, & H, Allischalmer, Letourneau, Euclid, Cummins, Lima, International, Michigan, Skoda, Excavator etc.

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৫৬

বাঙ্গলার যদি 'অসেম্বলি' ঘটে যাহা বামপন্থিগণ বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি উপলক্ষে বার বার বলিতেছে—তবে তাহা ইতোমধ্যেই ঘটিয়াছে। বাঙ্গলায় বিহারী, উড়িয়া, মারোয়াড়ী, পাঞ্জাবী, শিখ, মাদ্রাজী, গুর্খা এমন করিয়া ভিড় জমাইয়াছে, সকল কার্যক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়াছে, বাঙ্গালী আজ কোথায়? বাঙ্গালীর বুদ্ধির দৈন্য আজ সর্বজনবিদিত। তবুও যে বাঙ্গলার 'কৃষ্টি' মরে নাই, মরিবে না, তাহার কারণ এই দেশে ৪০০ বৎসর পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মিয়াছিলেন যিনি ছিলেন একাধারে রাধাকৃষ্ণ, প্রকৃতি পুরুষ, পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয়ের বীজ। তাঁহারই বুক চিরিয়া বাহির হইয়াছে বাঙ্গলার বর্তমান অবতার, মনীষীকুল। বাঙ্গালীর culture, ভারতের culture মরিবে না। পুরুষোত্তম আছেন ভারত-ঋষের নাভিতে। ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের সহায়ে ভারতের Truth-in-itself ও পাশ্চাত্যের Truth-for-us-এর সমন্বয় করিয়াছে। ইহাই বর্তমান ভারতের culture। Culture ফুটিয়া উঠে জীবনের সকল স্তরকে ছাপাইয়া। আমি এই সমাধান—সকল 'কল' পাইয়াছি। সমস্যা তাই আমার শিছনে পড়িয়া আছে। সমস্যা আসিবে এবং এই কলের সহিত টক্কর খাইয়া সমাধান প্রাপ্ত হইবে। আমি বাঙ্গলাকে চিনিয়াছি, ভারতবর্ষকে চিনিয়াছি। তাহারা আমার বুকের মাঝে ধরা দিয়াছেন। সিন্ধি বুকে লইয়াই তাই আমি সাধনা করি। বর্তমান সমাজ কম্যুনিষ্টদের স্পর্শে আরও ভাঙ্গিবে, উচ্ছৃঙ্খল হইবে। তখন সমাজপতিগণ অবহিত হইবেন ও সমন্বয় চাহিবেন। বিভাগোপাল অবসর গ্রহণ করুন। রেণু বাহির হইয়া যাক রাইটার্স বিল্ডিং ঘুরিয়া ১টায় আসে। সন্ধ্যার পূর্বে মাখনবাবু আসে। লোকসভায় যে রাজ্য পুনর্গঠনের খসড়া বিল উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বঙ্গবিহারের সম্বন্ধে কমিশন ও ভারতসরকার যে পরিকল্পনা দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। আজিকার আনন্দবাজারে অন্নদাশঙ্কর রায় 'মার্জার' নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আগামী বুধবার প্রতিষ্ঠার বাগইআটি যাইবার কথা। ১৭ই মার্চ

গণতন্ত্রের কি অর্থ হয় কিছু? গণেশের মাথা হস্তীর। গণ চিরদিন চালিত হয় হৃদয় আবেগে; বিচারশক্তি তাহার নাই। চিরদিন শাসন করে একজনই। সেই 'একজন' যদি হৃদয়বান, জ্ঞানবান হয়, সর্বভূতাধিশয় হয়, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা হয়, তবেই তাহা প্রশাসন পদবাচ্য 'গণ' তো সংখ্যাবাচক শব্দ হওয়া উচিত ছিল না। পাশ্চাত্য সংখ্যাবাচক গণতন্ত্রের আমদানী করিয়াছে। তাই brute majority র চাপে বুদ্ধিমান হৃদয়বান নেতাও পিষ্ট হন। গণের কি চক্ষু আছে, বিচার শক্তি আছে? অন্ধ আবেগে সে চলে। গণের হৃদয় ও যোগ্যের বুদ্ধির সমন্বয়ই সত্য বাস্তব গণতন্ত্রের রক্ষক। জীবনে বার বার দেখিয়াছি—গণকে 'হাঁ' বলানই বা কত সহজ, 'না' বলানই বা কত সহজ। বরিশালে যখন চাঁদপুরে কুলী হত্যার প্রতিবাদে অশ্বিনীবাবু, প্রতাপ গুহরায়, সুরেন বিশ্বাস প্রভৃতি কিছুতেই চকবাজারের দোকানদারদের দিয়া 'হরতাল' করাইতে পারিতেছেন না, আমার এক বক্তৃতায় তাহা সম্ভব হইয়াছিল। ভবিষ্যৎ দুষ্টি 'গণ'-এর

নাই, থাকিতে পারে না; অথচ দেওয়ার তাহা চাই-ই। গণ বর্তমানে নিয়া ব্যস্ত। বর্তমান বাঙ্গলা বামপন্থীদের হাতে কি নাজেহালই না হইতেছে? ইহারা যে-কোন গঠনের বিরোধী। ইহারা দেশের শত্রু। দেশের প্রাণপুরুষ ইহাদের বরদাস্ত করিবে না। ইহাদের হাতে প্রতিভা, যোগ্যতা লাঞ্ছিত। নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল, রক্ষা কর। রাত্রের বিশ্রাম ৯টার আগে। দুপুরে প্রসাদ পায়। আলোচনার পর যায়। উপরে পত্রিকাগুলি গুছায়। নীলু আসে ১২টায়, ৮টায় যায়। চিনু টিউবওয়েলের খবর দিল না। পুরুষোত্তম magnet, তাঁহার সঙ্গে লোহা যুক্ত থাকিলে লোহাও magnet হয়। এইভাবে জীব পরমাত্মাতিমুখী বলিয়া। পরমাত্মাতিতে কাম প্রেম হয়। কাম অশুচি, যখন সেখানে আন্তরিকতার অভাব, আবেগের অভাব, বিশ্বাসের ও বিশ্বাসহীনতা থাকে। কামে দায়িত্ব জ্ঞান থাকে না। প্রেম আন্তরিকতায় পূর্ণ, এমন আবেগ আর কিছুতেই নাই, প্রেমে বিশ্বাসের নাই। বিশ্বাসই প্রেমের প্রাণ। প্রেমে এই তিনটি থাকিলে তাহাই হয় ব্রজের প্রেম। ১৮ই মার্চ

শ্রীনিত্যগোপাল 'জড়াজড় সমন্বয়'-তত্ত্বমূর্তি হইয়া আসিয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করিবার মত তথ্য পাইয়াছি। অথচ কেন ইহা তেমন দাড়া আনিতে পারিতেছে না, তাহা বুঝিতেছি না। এখনও কি তাহার উপযুক্ত কাল হয় নাই? সমাজের কি আরও ভাঙ্গিবার প্রয়োজন আছে মানুষের eye-opener হিসাবে? এখনও মানুষ ঠিক ঠিক বাস্তব চিত্রটি ধরিতে পারিতেছে না। এবটা সমাজ-ব্যবস্থা যে ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে মানুষ বাস করিবে কি করিয়া? মানুষের কোন হুঁস-বোধ নাই, কোনও ভাবনা নাই। গড্ডালিকা স্রোতে চলিয়াছে। কোথায় ইহার পরিণতি? যুবক ছাত্রসমাজ দিশেহারা, উচ্ছৃঙ্খল, কেয়ারলেস; গুরুজন বলিয়া কেহ তাহাদের নাই, পুরাপুরাব্যতিক্রম তাহারা পদে পদে করিতেছে। বাঁচিবে কেমন করিয়া? পুরাতন ব্যবস্থাকে নূতন করিয়া চালিয়া সাজানো কি সহজ? মনের ভুলে নোংরোহনকে বদাইবার স্থান রূপে গড়িয়া তুলিতেই হইবে। অন্তঃকেন্দ্রিক হইলে মনের যে arrangement, পুরুষোত্তম-কেন্দ্রিক হইলে মনের সেই arrangement হয় অন্য। উপনিষদের 'যত্র সর্বমি ভূতানি' মন্ত্রে এই arrangement-এর কথাই আছে। অন্ত হইতে তেতন (চাষাক, মাইন্) এবং তেতন হইতে অন্ত (বেগেল, বস্তু) দুই-ই পুরুষোত্তমে সমন্বিত। নিত্যগোপাল অযথা যুক্ত হউন। রেণু সকালে বাগুইআটি যায়। ফেরে ৩টার পর। মেঝেতে সিমেন্ট দেওয়া হয় নাই। টালিও আসে নাই। অথচ দুধবার (পরশু) যাইতেই হইবে। না গেলে কাজ হইবেই না। কবে টানিতেছে। সন্ধ্যায় চিনু আসে। সে টিউবওয়েল লইয়া কাল ২।৩ টায় বাগুইআটি পৌঁছিবে বলিয়া গেল। তাহাকে ২৫ টাকা দেওয়া হয়। গতকাল রাজেনকে সাইকেল মেরামতের জন্য ২৫ টাকা দেওয়া হয়। রেণু কালে বাগুইআটি যাইবে।

১৯শে মার্চ

(ক্রমশঃ)

With best compliments of :

GENERAL STORES & ENGINEERING CO.,

Mechanical Engineers,
Govt. & Rly. Contractors.

Manufacturers of :
Railway Carriage & Wagon Components,
Steam, Electric & Diesel Loco Spares.

Office :
10, Lalbazar Street,
Mercantile Building (1st Floor)
Calcutta-700001.
Phone : 23-2717
Factory :
Baltikuri,
Kalitola,
Howrah.

ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিকীকরণ

শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত*

এই জগৎ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতাই জীবন, তা ব্যক্তি-জীবনেই হোক বা বৃহত্তর সমাজ-জীবনেই হোক। আজ যা নবীন, কাল তা প্রাচীন। নবীন এসে আবার প্রাচীনের স্থান দখল করে নেয় বলেই জগৎ গতিশীল। এই ভাবেই জীবনের আবর্তন ঘটে চলেছে। এর বিপরীত চিত্র হলো স্থবিরতা যা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। তাই প্রগতি চাইলে, গতিকে এবং পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হবে। শিল্পোদ্যোগ যেহেতু সমাজ-জীবনের অঙ্গ, সেই হেতু এই চিত্রটি শিল্পের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

এমন একদিন ছিল যখন ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এই পণ্য বিক্রী করে ভারতীয় বণিকেরা বিদেশ থেকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করে নিয়ে আসতো। ভারত তখন ছিল সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির অন্যতম। কিন্তু ইউরোপের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বণিককুল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলো না। শিল্প-বিপ্লবের পরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে তারা এই চিত্রটি পাল্টে দিতে সচেষ্ট হ'লো। তাই আমরা দেখি, যে চাকাই মসলিন উৎকর্ষে এবং মানে কিংবদন্তীতে পরিণত হ'য়েছিল, সেই চাকাই মসলিনের সম-মানের বস্ত্র তার থেকে ২০ শতাংশ কম দামে ১৮শ শতাব্দে ম্যানচেষ্টারের উৎপাদকেরা বাজারে বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছিল। এ সবই শিল্পে আধুনিকীকরণের ফল।

আধুনিকীকরণের এই ঢেউ ভারতের তটে এসে যথা সময়ে পৌঁছে গেল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও বহু বৃহৎ শিল্প অনেক স্থাপিত হ'লো। দেশের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরীকে কেন্দ্র করে বহু ক্ষুদ্র শিল্প এই সময় এবং এর পরে স্থাপিত হ'লো। কিন্তু কালের প্রবাহে প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন যে সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প-সংস্থা গ্রহণ করতে পারে নি এবং অচল যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম আর সাবেক আমলের প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে কাজকর্ম চালাচ্ছে তারাই নড়বড়ে অবস্থায় প'ড়ে প'ড়ে মার খাচ্ছে। অবস্থার পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে এই শিল্পগুলি দীর্ঘ দিন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ বার করার জন্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মানোন্নয়নের উপায় নিরূপণের জন্য ভারত সরকার শ্রী জি, বি, মেওয়ালকারের নেতৃত্বে একটি কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বহু ক্ষেত্রে অবক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম এবং অচল প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যবহারের জন্য ভুগছে। এই কমিটীর সমীক্ষায় প্রকাশ যে অবক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন্-টুল্ শিল্পে ২৪ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ, পেন্সী শিল্পে ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ, রী-রোলিং মিল্ এবং ঢালাই (কাউণ্ডি) কারখানাগুলিতে ৩৫

---

* অধিকর্তা, ক্ষুদ্রশিল্প সহায়ক সংস্থা, ভারতসরকার।

শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে, মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ তৈরী কারখানাগুলিতে ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পে ২৪ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশে। এইসব শ্রেণীর ক্ষুদ্র শিল্প থেকে বেছে বেছে ক্রমে ক্রমে, সুপরিকল্পিতভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচী গ্রহণের আবশ্যকতার কথা এই কমিটী বলেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত আধুনিকীকরণের জন্য স্থায়ী কমিটীও আধুনিকীকরণের বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত-ভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এই সব পর্যালোচনা ও রিপোর্টের মর্ম অনুধাবন ক'রে ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিকীকরণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রেছেন।

আধুনিকীকরণের লক্ষ্য-বস্তুর মধ্যে আছে ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো, উৎপাদনের ব্যয়-উন্নয়ন তথা ব্যয়-সংকোচন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক শক্তি বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি আধুনিক করে তোলা হবে এবং সেই সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্তরের কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতাকেও আধুনিকতার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতা অক্ষুণ্ণ রেখেও ব্যয় কমানোর জন্য প্রযুক্তি-বিদ্যায় আধুনিকতা আনা হবে। যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জামগুলিতেও করা হবে আধুনিকীকরণ। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যে থাকবে আধুনিকতার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

আধুনিকীকরণের কর্মসূচীর জন্য প্রতি বছর দশটি করে শিল্প বেছে নেওয়া হবে। এ বিষয়ে যে স্থায়ী কমিটী গঠন করা হয়েছে সেই কমিটী দেশের প্রয়োজন অনুসারে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিল্পগুলিকে বাছাই ক'রবেন। এ পর্যন্ত ২০টি শিল্প এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি হল :—

১) মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ ও সাজ-সরঞ্জাম।
২) বাইসাইকেল ও তার যন্ত্রাংশ।
৩) ঢালাই শিল্প।
৪) পারিবারিক ব্যবহার যোগ্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।
৫) সেলাই, বোনা প্রভৃতি হোসিয়ারি দ্রব্য।
৬) হ্যাণ্ড-টুলস্।
৭) চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী।
৮) মেশীন টুলস্।
৯) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।
১০) স্টোরেজ ব্যাটারি ও তার যন্ত্রাংশ।
১১) লোহার আসবাবপত্র।
১২) পারিবারিক ব্যবহারযোগ্য বাসনপত্র।
১৩) রং, পালিশ ও এনামেল।
১৪) প্লাস্টিকের জিনিষপত্র।
১৫। তৈরী পোষাক।
১৬) ইমারতী লৌহদ্রব্য (Builders' Hardware)
১৭) প্যাকেজিং।
১৮) অয়্যারস্ এণ্ড কেবলস্।
১৯) কৃষির সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি।
২০) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাস্নার্স।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাবলী দেশ-ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে এই কর্মসূচী রূপায়নের জন্য ভারত সরকারের শিল্প বিভাগের অধীন কলিকাতায় দপ্তর ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থার (বা SISI নামে পরিচিত) ১১১/১১২ নং বি. টি. রোডে একটি বিভাগ গঠন করা হয়েছে। রাজ্য কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকারেও অনুরূপ একটি সেল্ গঠন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের নির্দেশে এ রাজ্যে একটি State Level Committee on Modernisation গঠিত হয়েছে যার সভাপতি হচ্ছেন রাজ্য কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের সচিব এবং সম্পাদক হচ্ছেন SISI এর অধিকর্তা। প্রতিটি শিল্পে কর্মসূচী দেখার জন্য একটি করে Industry Panel-ও গঠন করা হয়েছে।

কোন শিল্প সংস্থাকে এ পরিকল্পনার সুযোগ নিতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারে ৫০০ টাকা Central Registration Fee জমা দিতে হয়। রাজ্য শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ঢালাই কারখানাগুলিকে এই ৫০০ টাকার রেজিষ্ট্রেশন ফি থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

যন্ত্রপাতিকে স্বয়ংক্রিয় করা (automation) কিন্তু এই আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য নয়। আধুনিকীকরণ হ'ল অধিকতর উৎপাদনের জন্য নবাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন। এ কথা জোরের সঙ্গে বলা বিশেষ প্রয়োজন যে আধুনিকীকরণের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে না। শুধু কোন কোন দীর্ঘিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নতুন অবস্থানে পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে মাত্র।

কোন সংস্থা এই পরিকল্পনার আওতায় এলে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের সরকারী খরচে নিয়োগ করে সেই সংস্থার কারখানা ও পরিচালন পদ্ধতি পরীক্ষা ক'রে সময়োচিত পরামর্শ দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই মর্মে আধুনিকীকরণ কর্মসূচীর অধীন একটি বিশেষ গোষ্ঠী (Panel of Experts)ও গঠন করা হয়েছে

প্রযুক্তিবিদ্‌গণের নিজেদের মানোন্নয়নের জন্য উচ্চ-মানের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাও SISI করে থাকে। এ পর্যন্ত পাদুকা শিল্প, স্টোরেজ ব্যাটারী, চশমার ও চামড়াই শিল্পে এ ধরণের modernisation course সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে কোনও বিশেষ শিল্পে প্রযুক্তিবিদ্যার যে মানোন্নয়ন হয়েছে তা সমষ্টিগতভাবে সেই শিল্পের পরিচালক ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অবগত করার জন্য Industrial Clinic ও Industrial Workshop প্রভৃতি কর্মসূচীও পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া আধুনিকীকরণ বিষয়ে সস্তায় অন্যান্য পরামর্শ এবং সাহায্য দেবার ব্যবস্থাও SISI থেকে করা হ'য়ে থাকে। আধুনিকীকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন এবং ক'রবেন। এটি নিঃসন্দেহে এক বিরাট অগ্রগতির পরিচয়।

ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলি আধুনিকীকরণের এই সুযোগ-সুবিধেগুলি ব্যাপকভাবে গ্রহণ ক'রলে ভারতের শিল্পজগতে এক নব যুগের সূচনা হবে। তখন আন্তর্জাতিক বাজারেও আমরা উন্নত মানের পণ্য নিয়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতায় নামতে পারব। সেখানে আমাদের শিল্পজাত পণ্য বিপণনের এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

———

UJJWAL BHARAT

Form VI (See Rule 8)

1.	Place of Publication	—Naranarayan Ashram Vill. Baguiati, P. O. Ashwininagar, Calcutta-59, West Bengal
2.	Periodicity of its Publication	—Bi-monthly
3.	Printer's Name	—Bimal Kumar Chakraborty
	Nationality	—Indian
	Address	—Rabindra Pallee, P. O. Jangra, 24 Pargs.
4.	Publisher's Name	— Bimal Kumar Chakrabarty
	Nationality	—Indian
	Address	—Rabindra Pallee, P. O. Jangra, 24 Pargs.
5.	Editor's Name	—Renu Mitra M. A.
	Nationality	—Indian
	Address	—Naranarayan Ashram, P. O. Ashwininagar Calcutta-59, West Bengal
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than one percent of the total capital	—Naranarayan Ashram P. O Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal

I, Bimal Kumar Chakrabarty, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 24th February, 1979

Sd / Bimal Kumar Chakrabarty
Signature of Publisher

ক্রীড়া-জগৎ

খেলা ও জুয়াখেলা

রাখাল ভট্টাচার্য (আরবি)

আমাদের সমাজে যখন সংচিন্তা, আদর্শ ও বৈদগ্ধ্যের মূল্য ছিল সেই যুগের এক প্রধান মননশীল ব্যক্তি প্রমথ চৌধুরী মশায় একটি উক্তি ক'রেছিলেন, সেটি সে যুগে সার্থক ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকলেও আজকে একটি ধ্রুপদী উক্তি ব'লে ব্যবহারিক জীবন থেকে বহুদূরে আমাদের মননশীলতার মোড়াকলে নিছক পুরস্কৃত হ'য়ে র'য়েছে। তিনি ব'লেছিলেন দেহ মনের সকল প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ আনন্দ ব্যতিরেকে তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে ব'লেছিলেন, ক্রীড়ার পুরস্কার প্রত্যাশা যদি আনন্দ ছেড়ে লাভের কোঠায় পৌঁছায় তা'হলে সে খেলা আর খেলা থাকে না, হ'য়ে পড়ে জুয়াখেলা। অথচ আজ ক্রমে ক্রমে সব কটি খেলাই সেই বিচারে জুয়াখেলায় পরিণত হ'চ্ছে।

আদি যুগে মানুষকে অনেক কিছু দৈহিক কসরৎ ক'রতে হ'য়েছে কেবলমাত্র বাঁচার তাগিদে এবং সেই সব কসরতের জন্য দেহকে সচল এবং সক্রিয় রাখবার জন্য ক'রতে হ'য়েছে অনুশীলন। জীবন যখন ছিল শিকার-নির্ভর তখনকার দৌড় লাফ ঝাঁপ এবং বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ প্রভৃতি সেদিন শিকারের প্রয়োজনেই মানুষকে ক'রতে হ'য়েছে এবং সে বিষয়ে উৎকর্ষ অর্জন ক'রতে হ'য়েছে বাঁচার প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে। জীবনযাত্রার ধরণ যেমন বদলাতে শুরু ক'রল —শিকার থেকে পশুপালন এবং যাযাবরত্বের অন্তে বসতি স্থাপন ক'রে চাষবাস, সঙ্গে সঙ্গে অনেক দৈহিক কসরৎ অবান্তর হ'য়ে গেল জীবনের প্রয়োজনে। কিন্তু অনুশীলনের আনন্দে এবং দেহকে সচল ও সজীব রাখবার দায়ে মানুষ একদিনের অতি প্রয়োজনীয় কসরৎগুলিকে পরিণত ক'রল জীবনের অলঙ্কারূপে: যুদ্ধক্ষেত্রে যেগুলি কাজে লাগত বিভিন্ন ধরণের খেলায়। প্রয়োজন ফুরিয়েছিল ব'লেই সেগুলি অনুশীলনের প্রধান প্রেরণা হ'য়ে উঠে আনন্দ। আর সেই সঙ্গে দৈহিক উৎকর্ষ ছাড়াও এক ধরণের মানসিক তথা চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ জীবনের নানান স্তরে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সেই মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভকে লক্ষ্য ক'রে খেলাধূলা বিষয়টি শিক্ষার অঙ্গীভূত হ'য়ে উঠেছে। সামাজিক সমর্থনের উপরে রাষ্ট্রিয় সমর্থন এসেছে তার প্রসারে। বস্তুতঃ আজ শিক্ষার স্তরের দিক থেকে খেলাধূলাকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লেই ঘোষণা করা হ'য়ে থাকে। সেই মূল্যায়নে পুরস্কারের আর্থিক তথা ব্যবহারিক মূল্য বিবেচ্য নয়। খেলাধূলার উৎকর্ষকে ভাঙিয়ে কোনও রকম সুবিধা আদায় করা যে কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে নিন্দনীয়। খেলার আনন্দে খেলার আদর্শকে উচ্চে তুলে ধ'রে খেলার মাধ্যমে বন্ধুত্বমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা এই হ'ল পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন অলিম্পিকের সুপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ। তাই খেলাধূলার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বলা হ'য়েছে—"সংঘাতে নির্মল তুমি, চিত্তে তবু স্নেহের বিস্তার।"

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সব সর্বাত্মক ক্রীড়া-লীলা প্রকট হ'য়ে উঠেছে তাতে বলি হ'য়েছে নীতিবোধ, রূপবোধ ও চারিত্র্যবোধ। এ যুগের দেবতা হ'য়েছেন সবকিছু কিনে রাখা যেতে পারে যার জোরে সেই অর্থ। অবশ্য সব কিছু ব'লতে আজকে বোঝা হ'চ্ছে পশুর সঙ্গে সবপ্রয়োজনের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন। জীবনে আর কিছুর প্রয়োজন আজ আর যেন স্বীকৃত নয়।

এককালে খেলোয়াড়ী মনোভাব ব'লে একটা কথা

বিশেষ গুরুত্ব লাভ ক'রেছিল এবং সেই মনোভাবটির সার কথা ছিল—"জয়েতে উদ্যত নও পরাজয়ে নও ম্রিয়মান"। সেই মনোভাব আজ বোধ হয় একেবারে লোপ পেয়ে না গিয়ে থাকলেও অবলুপ্তির পথে।

ক্রিকেট বলে একটি খেলা ভদ্রতা ভব্যতা ও স্পোর্টস্‌ম্যানশিপ্‌-এর প্রতীক ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে একশো বছর ধ'রে। আজ তাকে ধাঁড়িপাল্লায় চড়ানো হ'চ্ছে নগদমূল্য স্থির করার জন্য। ফুটবল কমার্সিয়াল মার্কেটে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু ক্রিকেটকে সেই পরিণতির দিকেটেনে আনার জন্য তার মহৎ মাধুর্য্য সব কিছুকে চেঁটে ফেলতে হ'চ্ছে। যে ক্রিকেট এককালের সূর্য্য অস্ত না যাওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিতে আজও জীবনযাত্রার এক মূল্য রূপায়ন সেই ক্রিকেট দ্রুতগতিতে লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং নিজের জাত সম্পূর্ণ খুইয়ে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে নবরূপ লাভ ক'রছে।

টেনিস ব'লে একটি খেলা ছিল। মখমলি সবুজ ঘাসের চিকণতায় মসৃণরূপ নিয়ে সে টেনিস সারা পৃথিবীময় আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রেছিল। আজ সিমেন্টিক ঘাসে এয়ারকণ্ডিশনড্‌ ঘরের তীব্র বিজলী আলোয় সে খেলা আর বাগানের শোভা নয় যেন কিউটিও সপের কাঁচের আধারে সজ্জিত পণ্য। যারা খেলে তাদের উদ্দেশ্য লক্ষ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার।

এই বৈশ্য যুগে কোন খেলোয়াড় কোন খেলায় পুরস্কার হিসেবে কত টাকা পেতে পারে তাই হ'ল খেলাটির মূল্যায়নের একমাত্র নিরিখ। দর্শন-আনন্দ সৃষ্টিরূপ সৃষ্টি এবং রস পরিবেশনে যে সব খেলা এককালে জনপ্রিয় হ'য়েছে সারা পৃথিবীময়, আজ সেখানে রূপরসের বিচার অবান্তর।

এখনও হয়তো সব খেলার সমান জাতিপাত ঘটেনি। যে খেলার জাত ছিল যত উঁচু সেগুলির দিকেই তত লক্ষ্য আজকের বৈশ্য বৃত্তির আসুরধারী অসুর শক্তির। ভাবগতিক দেখে মনে হ'চ্ছে এই অনিবার্য্য ধারাকে ঠেকানো যাবে না, যতই আমরা দেকেলেরা কপাল চাপড়ে মরি না কেন। তবে একথা আমাদের স্বীকার ক'রে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন যে খেলাধূলা ব'লতে যে উচ্চ আদর্শ সম্মত একটি জীবনকৃত্যকে আমরা জানতে ও বুঝতে শিখে এসেছি এতদিন, আজকের প্রচলিত মূল্যসম্মত খেলাধূলাকে সেই উচ্চ আসনে বসিয়ে রাখা অসম্ভব এবং একান্ত অনুচিত। আজকে তাই ফুটবলের খেলোয়াড় জোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে মহার্ঘ মূল্য দাবী করে, আর কোটি কোটি বাক্তিগ্রস্ত দর্শক সেই টাকার জোগান দেয়। যে খেলে সে খেলোয়াড় নয় সে খেলার মার্কেটে কসরৎওয়ালা। আর যে দর্শক হিসাবে মাতামাতি করে সেই নিজে নিজেকে খেলোয়াড়ী মনোভাবের ধারক ব'লে দাবী করে। আজকের কমার্সিয়াল যুগে সবচেয়ে ভূমিকা যার বড় সে হ'ল সেলস্‌ম্যান। খেলাধূলো সংক্রান্ত সেলস্‌ম্যানশিপ্‌-এ প্রয়োজনীয় মসলা যোগাচ্ছে সংবাদপত্র ছাড়াও অজস্র বই, পত্রপত্রিকা, রেডিও টেলিভিসন ইত্যাদি। এই কলকাতার কথাই ধরা যাক। ধারাবাহিক বেতার ভাষ্য ক্রিকেট খেলাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে সমাজের প্রতিটি গৃঢ় কোণে। যার ফলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম কলকাতার টিকেট চাহিদা একাংশও মেটাতে পারছে না। কারণ ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্য আজ তারাই আগ্রহী যাদের কাছে ক্রিকেটের রস রস চরিত্র কোনও কিছুরই মূল্য নেই। আছে শুধু কতকগুলি বাহ্যিক প্রয়োচনার সৃষ্ট উত্তেজনা ও উন্মাদনা।

এতক্ষণ যা ব'ললাম তার মধ্যে সর্বগ্রাসী অন্ধকার ছাড়া আর কিছুরই আভাস দিতে পারিনি। যে সব উপাদানে ও উপাদানে উজ্জ্বল ভারত গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা যায় তার মধ্যে খেলাধূলাকে গণ্য ক'রতে হ'লে তাকে আজকের প্রচলিত রূপরসে গ্রহণ করা যাবে না। আধুনিক খেলাধূলার আদর্শটা পুরোপুরি পাশ্চাত্য। কাজেই পশ্চিমে যে আদর্শ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে সে আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস এদেশে কি ক'রে হ'তে পারে তার হদিস কোনও মতেই ভেবে পাচ্ছি না। যাঁরা খেলাধূলার আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরবার জন্য সারা জীবন নিরলস প্রয়াস ক'রেছেন তাঁদের মনে তাই আজকে জেগেছে এক চূড়ান্ত নৈরাশ্য। এই কথাটা বলার জন্য এত বড় প্রবন্ধের অবতারণা হয়তো নিরর্থক। খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সকল মূল্যবোধই যেখানে জুয়াখেলায় পরিণত হ'য়েছে সেখানে অর্থমূল্যের নিরিখ ছাড়া বিশেষ আনন্দ কেই বা চায় আর কেই বা তার জোগান দেয়।

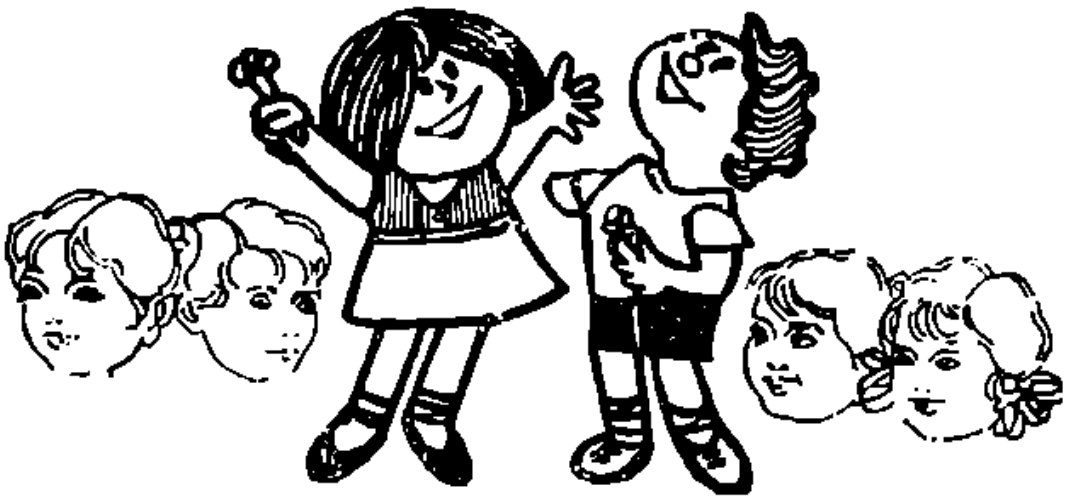

শিশু জগৎ

উজ্জ্বল ভারত

॥ স্বপন বুড়ো ॥

তোদের ভারত দেশের সেরা, সোনার চেয়ে দামী
সবার বড় করবো সে দেশ জন্ম নিলাম আমি।
এই ভারতের ধূলি-কণায়
লক্ষ শহীদ নিদ্রা যে যায়
সবার ঘরে ডাক দিয়ে যাই, প্রাণ যে প্রীতিকামী।

পাহাড় যাহার রয় প্রহরী, সাগর ধোয়ায় পা—
সেই ভারতের প্রাণের গাঙে সবাই ভাসা না!
লক্ষ প্রদীপ জ্বালবি যদি—
জ্বাল হোমানল নিরবধি
পথ চলা তোর কয় না সুরু, থাকিস নে আর থামি,
সবার সেরা সেই সোনা দেশ, জন্ম নিলাম আমি।

জেনে রাখা ভাল

গণেশ চক্রবর্তী

তোমরা জান বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেন আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে। যন্ত্রের সাহায্যে তাকে প্রমাণও করেন। কিন্তু তোমরা কি জান তারও হাজার হাজার বছর আগে গাছেরও প্রাণ আছে এই সত্য প্রকাশ করেন আমাদের একজন আর্যঋষি! সেই ঋষির কি নাম জানো? তাঁর নাম উদ্দালক। তিনি তাঁর ছেলে শ্বেতকেতুকে শিক্ষা দিতে এই সত্য প্রকাশ করেন। উপনিষদের গল্প পড়লেই তোমরা তা জানতে পারবে। এ সম্বন্ধে বেশী জোরে জানতে ইচ্ছা হলে বড় হয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আট থেকে ষোল খণ্ড পর্যন্ত পড়ে দেখো।

• • •

তোমরা কি কখনও ১০৩ ইঞ্চি লম্বা গোঁফওয়ালা কোন লোক দেখেছ? সে রকম গোঁফ ছিল কাথিওয়াড়ি পুলিশ বিভাগের একজনের। নাম তাঁর অর্জুন ডাঙার।

• • •

কখন কি শুনেছো বৃষ্টির সাথে মাছ পড়ে? বিহারে কিন্তু একবার পড়েছিল। তোমরা ভাবছ সে আবার কি? হ্যাঁ সেটা হতে পারে। জলস্তম্ভ দিয়ে যখন জলাশয়ের জল আকাশে তুলে নেয় মেঘের রাজ্যে তখন তার সাথে ছোট ছোট মাছ আকাশে উঠে যায়। পরে সেই মাছ বৃষ্টির জলের সাথে নীচে পড়ে।

• • •

প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম "বাঙ্গালা গেজেট"। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের প্রথম ইংরাজী সংবাদপত্রের নাম 'হরকরা'।

বাংলাভাষায় প্রথম মাসিকপত্র 'দিক্-দর্শন'। শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনায় এটা প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাংলা ছাপা বই বাংলা ব্যাকরণ। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড, নামে একজন ইংরেজ সইবানি ছাপেন।

———

চীনের ক্ষুদে বিজ্ঞানী

শরদিন্দু সাহা

নাবালকের পরিচয় নিয়ে বিচরণ করে বালক। পদে পদে বড়দের মর্জি মতো তাকে চলতে হয়। অবাধ বিচার করার জন্মগত অধিকার অবশ্য তার আছে। কিন্তু সেই কাজ করার অবাধ সুযোগ। বড়দের বেয়াদবী শাসন নয় মাত্রাহীন আদর তার স্বজনী প্রতিভার বিকাশ-পথ অবরোধ করে রাখে। সুযোগ পেলে বুদ্ধির খেলায় প্রতিভাধর বালক বড়দের ওপরেও যে টেক্কা দিতে পারে এ তারই একটি কাহিনী।

আজ থেকে প্রায় আঠারো শো বছর আগে চীনের সম্রাট ছিলেন "সীয়েন টী"। যে সব মন্ত্রী ও আমলা তাঁর শাসন পরিচালনা করতেন তাঁরা ছিলেন জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রধান মন্ত্রী "ইৎ-সাউ" ছিলেন খুব রক্ষ ও অনপ্রিয়। সুদূর বনাঞ্চলে কর্মরত জনৈক সরকারী আমলা একবার প্রধান মন্ত্রীকে একটি হাতী উপহার পাঠান। জীবনে প্রধান মন্ত্রী ইৎ-সাউ হাতীর মতো বিরাটকায় জন্তু দেখেন নি। অবাক বিস্ময়ে হাতীটি দেখতে দেখতে এর সঠিক ওজন জানতে তাঁর মনে কৌতূহল জাগে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঐ হাতীর সঠিক ওজন নির্ণয় করতে আমলাদের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়ে বিজ্ঞ আমলাদের তো মাথায় হাত। তাঁরা ভেবেই পেলেন না হাতীর মতো বিশাল-দেহী জন্তুকে কিভাবে ওজন করবেন। কেন না সেকালে চীনের হাটে-বাজারে এমন কোনও দাঁড়ি-পাল্লা বা বাটখারা ছিল না যার সাহায্যে হাতীর মতো বিরাট জানোয়ারকে ওজন করা চলে। প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশ পালনে তাঁদের অক্ষমতা কবুল করে তাঁরা হাতী ওজনের চেষ্টা ছেড়ে দিলেন।

প্রধান মন্ত্রীর নাবালক পুত্র "ইৎ-সাউ চুং"-এর বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। বড় ঘরের ছেলে হলেও আলালের ঘরের দুলালদের মতো সে বুদ্ধিতে কিছু মাত্র খাটো ছিল না। বরং বুদ্ধির খেলায় বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে তার উদ্যমের অভাব হোত না। নতুন কিছু করে সবাইকে অবাক করে দিতে সে খুব মজা পেতো।

হাতীর মতো এত বড়ো জন্তুর সঙ্গে বালক চুং-এর এটাই প্রথম পরিচয়। এর স্থূলোর মতো মস্ত দুটি কান, ইয়া বড়ো এক জোড়া বাঁকা দাঁত আর অদ্ভুত লম্বা নাক (শুঁড়)—সব মিলে চুং-এর মনে অবাক বিস্ময়ের চমক জাগায়। এমন একটি প্রকাণ্ড জানোয়ারের ওজন জানতে

তার মনেও সীমাহীন আগ্রহ জাগে। হোমরা-চোমরা বিচক্ষণ আমলাদের ব্যর্থতার কাহিনী জেনে শুনেও হাতীটির ওজন জানতে তার কৌতূহল কিছুমাত্র কমে না। বরং সে পণ করলো যেমন করেই হোক হাতীর ওজন তাকে জানতেই হবে। তখন থেকে তার শিশু-জীবনের আমোদ-প্রমোদ হৈ-হুল্লোড় ভুলে দিন-রাত শুধু সে হাতী ওজনের চিন্তায় মশগুল হয়ে থাকতো। এ ভাবে দিন যায় মাস যায়, হাতী ওজনের কোন কৌশলই তার চিন্তায় আসে ধরা পড়ে না। তবু বার বার ব্যর্থতায় মুষোমুষী হয়েও নাছোড়বান্দা চুং পরাজয়কে মানতে রাজী হয় না। পণকে সফল করার চেষ্টায় তার উদ্যমের জোয়ারেও ভাটা পড়ে না।

একদিন বাড়ীর পাশে নদীর জলে একটি খেলনা-নৌকা ভাসিয়ে তার মধ্যে কিছু ভারী জিনিষ রাখতেই চুং দেখতে পায় ঐ জিনিষটার ভারে নৌকার কিছু অংশ জলে ডুবে যায়। এ ভাবে জলে ভাসমান নৌকায় রাখা জিনিষের ভার কম-বেশী হ'লে নৌকার গায়ে জলের সীমারেখারও হের-ফের ঘটে। এক জিনিষের বদলে অন্য জিনিষ রাখায় নৌকার গায়ে সীমারেখার যদি পরিবর্তন না হয় তবে উভয় জিনিষের ওজন সমান দাঁড়ায়। এই খেলার ঘটনা থেকে বুদ্ধিমান বালক চুং-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত করতে অসুবিধে হয় না—একটা বড় নৌকার সাহায্যে হাতীকেও ওজন করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

এভাবে বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক ভেবে-চিন্তে একদিন চুং তার পিতার সামনে বুক ফুলিয়ে দাবি জানায় হাতী ওজনের কৌশল সে জানে। নাবালক ছেলের মুখে এরূপ অভাবিত দাবি শুনে প্রধান মন্ত্রী প্রথমটা অবিশ্বাসের হাসিতে ফেটে পড়েন। পরে পুত্রের দৃঢ় প্রত্যয়ের মুখে পিতৃ স্নেহের আবেগে তিনি কবুল করেন—বেশ, আমার বিজ্ঞ বিচক্ষণ আমলারা যে কাজ করতে পারে নি, তোমাকে সে কাজ করার একটা সুযোগ দিলে ক্ষতি নেই। তখনি তিনি আমলাদের ডেকে চুং-এর নির্দেশ মতো হাতী ওজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন।

আমলাদের মনে কিন্তু সংশয় থেকেই যায়। তাদের মতো অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব হয় নি, চুং-এর মতো আদালের ঘরের দুলাল একটা পুঁচকে ছেলের পক্ষে সে কাজ করা কি সম্ভব? তবু প্রধান মন্ত্রীর হুকুম তাঁদের তামিল করতেই হয়।

রাজধানীতে হাতী আসার পর থেকেই এই বিরাট জন্তুটিকে নিয়ে সেখানে ঘরে ঘরে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। সবারই মনে এর ওজন জানার জন্য সীমাহীন কৌতূহল জন্মা হ'তে থাকে। এমন সময় একদিন শহরময় রটে যায়, যে হাতীকে ওজন করতে গিয়ে সম্রাটের বিজ্ঞ আমলারা ব্যর্থ হয়েছেন, তাকেই ওজন করবে প্রধান মন্ত্রীর নাবালক পুত্র চুং। আর সে কাজ করবে তারই নিজের পরিকল্পিত নতুন কৌশলে। অবাক বিস্ময়ে শহরবাসীরা গভীর আগ্রহে হাতীর ওজন দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো।

কিছুদিন আগে চুং-এর পরিকল্পনা মতো তৈরী একটি বড় নৌকা সরকারী আমলারা এনে হাজির করেন প্রধান-মন্ত্রীর বাড়ীর পাশে নদীর ঘাটে। হাতী ওজনের দিন সেখানে কৌতূহলী জনতার বিপুল ভীড় জমে। চুং-এর নির্দেশে হাতীটিকে ঐ নৌকায় তোলা হয়। হাতীর ভারে নৌকার গায়ে জলের সীমারেখা বরাবর চুং একটা দাগ চিহ্ন আঁকার পর হাতীটিকে নৌকা থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তারপর খালি নৌকায় পাথর কুচি বোঝাই করা হয়। পাথর কুচির ভারে যখন নৌকার গায়ে জলের সীমারেখা চুং-এর আঁকা দাগ বরাবর দাঁড়ায় তখন পাথরগুলিও নৌকা থেকে তুলে নেওয়া হয়। তারপর সেগুলি সাধারণ দাঁড়ি-পাল্লায় ভাগে ভাগে ওজন করে চুং দাবি জানালো হাতীটির ওজন পাথর-কুচি গুলির মোট ওজনের সমান।

নতুন কৌশলে এভাবে হাতীর মত বিরাট জন্তুকে

(শেষাংশ ৪০ পৃষ্ঠায়)

নারী জগৎ

লণ্ডন বিমান বন্দরে অপমানিতা ভারতীয় নারী

সুনীতি সান্যাল

সভ্যতা গর্বে গর্বিত ব্রিটিশ জাতির সভ্যতার যে রূপ অতীতে ভারত-শোষণের মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম সেই স্মৃতি মন্থর থেকে ম্লান হতে না হতেই আমরা আবার নূতন করে তার যে পরিচয় পেলাম তা যে বর্তমান যুগে, যেদিন মানবতাবাদ বিশ্ব-সভ্যতার মূলমন্ত্ররূপে ঘোষিত হয়ে গেছে, সমগ্র মনুষ্য জাতির কাছে কত বড় লজ্জা বা ঘৃণার বস্তু তা বলার ভাষা কোথায়?

গত জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে একজন ব্রিটেন-বাসীকে বিয়ে করবার জন্য ব্রিটেনে আগত এক ভারতীয় মহিলার লণ্ডন বিমান বন্দরে কুমারীত্ব পরীক্ষার খবরে আমরা হতবাক হয়ে ভাবছি দীর্ঘ দুই শত বছর ধরে ভারতে যারা দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়ে গেছে, সেই কূট নীতিতে পক্ক ব্রিটিশ জাতির চোখে দ্বিজাতি-তত্ত্ব ধরা পড়েছিল, কিন্তু ভারতের নারী জাতি কোন্ উপাদানে গঠিত, ভারতের নারী গৌরব বিষয়ে তাদের দেশের তুলনায় কত খানি সংযমের অধিকারী বিষয় অন্যরকম, সে চিত্রটি তো তাদের চোখে ধরা পড়ে নি? তাদের দেশবাসীকে বিবাহ ব্যাপারে ভারতীয় নারীদের কুমারীত্ব পরীক্ষার প্রথা নাকি ব্রিটেনের ঘরাট্ট পথরে চালু। এখন নগ্ন ও কুৎসিৎ প্রথা সভ্য দেশে চলতে পারে, না চলতে দেওয়া উচিত? যেহেতু তাদের জাতির মানুষকে (তিনি একজন বিপত্নীক) বিয়ে করবার জন্য একজন ভারতীয়া গেছেন তাদের দেশে তাকে ব্রিটিশ সরকার অভিনন্দিত করলেন বন্ধ ঘরে একজন পুরুষ চিকিৎসক দিয়ে কুমারীত্ব পরীক্ষার মাধ্যমে এবং সাথে ঘণ্টা তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে? সভ্যতার এ কী চিত্র? এই যদি হয় বর্তমানকালের সভ্যতার নমুনা, তাহলে তথা-কথিত প্রাক্ সভ্যতার মানুষদের অসভ্য বলার অর্থ কি হয়? তাদের অন্ততঃ আমার দেশ, তোমার দেশ, আমার জাতি তোমার জাতি এ ভেদ বুদ্ধিটুকু তো ছিল না! আজ ভারতবর্ষের তো বটেই, বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন নারীর এই অপমান বিশ্বের নারী সমাজের অপমান। তাই সমগ্র নারী জাতির পক্ষ থেকে আমাই ধিক্কার দাও, বিচারে চাই ঐ কুৎসিততম প্রথার

বিরোধ সাধন এবং যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-করণ। ব্রিটিশ সরকারের জানা উচিত ভারতীয় নারী-সমাজ সাধারণতঃ যৌন প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগে নিজের দেহকে অবলীলাক্রমে বিলীন করে না। পাশ্চাত্যের মত 'ডেট' করার প্রেরণা ভারতের পক্ষে সাধারণ ও স্বাভাবিক নয়। যদিও একান্ত অন্ধভাবী হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় নিছক জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে আমরা আজ অনেকখানি উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হয়ে পড়েছি, তথাপি ভারতের যে ঐতিহ্য নারীসমাজের রক্তে বিদ্যমান, সে-নারী অন্য দেশের তুলনায় যৌন ক্ষুধার মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন এবং অনেকখানি সংযমের অধিকারিণী। সংযম-ভিত্তিক যৌন সম্বন্ধ বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষেই আদর্শগত শিক্ষা। ভারতের এই স্বরূপের খবরে অন্ধ ব্রিটিশ সরকার কোন্ বিবেচনায় এই অপমানকর ব্যবস্থা চালু করলেন? বিশেষতঃ যে সময় সকল স্তরে নারী-কর্মীর অভাব নাই সেখানে এই গোপনতম ও পবিত্রতম ব্যাপারে পুরুষ চিকিৎসকের বন্দোবস্ত কেন করা হল? ঈষৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত লিখেছেন, 'ভারতের যে মান আছে, তার মানেই যে বিশ্বকে মানী হতে হবে, তাকে অপমান করলে বিশ্বই অপমানিত হবে এ কথা গর্বের সঙ্গে বলা চলে'। ভারতের সেই মানদণ্ড আমাদের উপনিষৎ বেদান্ত গীতা ভাগবতে ঘোষিত থাকলেও আমরা তার যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারি নি বলেই অপরে আমাদের অপমান করবার স্পর্ধা রাখে। তবু বলব ভারত সভ্যই সব মানবিক আদর্শে জগতের গুরু হবার দেশ। তার মর্যাদাহানির প্রয়াস অসভ্যতারই প্রতিচ্ছবি।

তাই ভারতের তথা বিশ্বের নারী সমাজের পক্ষ থেকেই শুধু নয় সমগ্র মানবজাতির হয়ে এই অপমানকর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা এর বিলোপ-সাধনের দাবী জানাই। জাতিতে জাতিতে এই বিভেদের অপমানও বিশ্বের অন্তরাত্মা আজ আর নিঃশব্দে মেনে নেবে না এ কথা ব্রিটিশ সরকারের এখনও বোঝা উচিত।

শিশুর প্রতি কর্তব্য

রেণুকা সেন

শিশুর প্রতি কর্তব্য কথাটি বললে প্রথমেই মনে আসে মাতা-পিতার কর্তব্য। পিতা-মাতা আত্মীয় পরিজনের কর্তব্য তো আছেই। কিন্তু আজকের দিনে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা ও বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশের শিশুর প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, সমাজের, সরকারের বা রাষ্ট্রের এমনকি প্রতিটি নাগরিকেরই কিছু না কিছু কর্তব্য রয়েছে; আর সেটিকে অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে মেনে নিয়ে সেইভাবে কাজ করতে হবে। কারণ মনুষ্য-জীবনের ভিত্তি হল 'শিশু,' তাই ভিত্তিকে আগে না গড়ে আমরা কখনই একবারে মানুষ গড়তে পারবো না।

আজ ছাত্র সমস্যা জীবনের অন্যান্য সকল সমস্যারই মত প্রকট হয়ে উঠেছে, এমনকি মনে হয় বেশিই হয়েছে। আজ-কাল প্রায়ই শোনা যায় রাস্তায়, খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে পরীক্ষা হলে, সিনেমা লাইনে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কিরিস্তি! গুরুজনদের কথা অমান্য করা, শিক্ষকদের প্রতি অশালীন ব্যবহার, কথাবার্তায়, চলাফেরায়, পোশাকে সাজ-সজ্জায় সব বিষয়েই ছেলেমেয়েদের অভদ্রজনোচিত এবং অমার্জিত মনোভাবের প্রকাশ। মুদুমায়মতি বালক থেকে শুরু করে যুবা পর্যন্ত কেউই বোধহয় বাদ যাচ্ছে না। তাই আজ অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় ছাড়াও যে সমস্যা আছে, শিশুর শিক্ষা সমস্যা, বালকের জীবন-প্রস্তুতি সমস্যা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়!! মানব শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, তাকে কল্যাণের পথে চালনা করা আরও প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ এ কথা আজ ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না। দেশের ভাবী নাগরিকগণ, প্রতিটি

মূল সমাজ জাতির মেরুদণ্ড, তারাই যদি নিজের সঙ্গে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তা হলে দেশের আর বাকী রইল কি?

বর্তমান সমাজের ভয়াবহ রূপের মূল কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন এবং এই মূলেই সংশোধনের বীজ বপন করতে প্রয়াস পেতে হবে। শৈশব থেকেই চোখের সামনে "সত্য-শিব-সুন্দরের" আদর্শ তুলে ধরতে পারলে এবং সেই সঙ্গে সন্তানের মন ও আত্মিক ভালবাসার সংমিশ্রণে শিশুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে ভবিষ্যৎ জীবনে কখনই উচ্ছৃঙ্খল বা অমানুষ হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা।

কোন শিশুই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে জন্মায় না। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে, বয়স্কদের অমনযোগিতায় (অভ্যন্তরিক স্নেহে অথবা স্নেহের অভাবে), অনুপযুক্ত পরিবেশে শিশু ধাপে ধাপে উচ্ছৃঙ্খল হতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ শিশু সব সময়েই বাবা-মা, দাদা-দিদি, আত্মীয়স্বজনকে অনুকরণ করে চলেছে এ কথাটি আমরা কখনই মনে রাখিনা। আমাদের অর্থাৎ বড়দের এটি মারাত্মক অপরাধ; তাই এই অপরাধ বা ভুলের মাশুল আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সুদূরতর জীবনে অবশ্যই দিতে হয়। মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া ও অন্যান্য কথাবার্তা, ভাইবোনে মারামারি, প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং নানারকম অশান্তি শিশুমনকে সহজেই দূষিত করে। অজানা কৌতূহল নিয়ে শিশু নানা প্রশ্ন করে ও কাজ করতে যায়। হয়তো তাড়াতাড়ির সময় যাকে রান্না করতে দেখে শিশুর খেয়াল হোল সেও রান্না করবে, হাতের কাছের যন্ত্রপাতিটা নিয়ে সে চললো, মা দিলেন এক ধমক বা এক চড়। এইভাবে ধমক খেতে খেতে শিশুমনে জন্মায় অজানা ভয়, তখন সে কোন কাজই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করতে চায়না বা তার মাকে না জানিয়ে করতে সাহস হয়, অথচ মিষ্টি কথায় প্রথম থেকেই মা যদি একটু বুঝিয়ে দেন এবং শিশুর কাজ করার উপযোগী বাসন-পত্র সামনে রেখে দেন তবে তার লুকিয়ে কিছু করবার আর প্রবৃত্তি জাগেনা! শিশু দেখলো তার বাবা সিগারেট বা বিড়ি খাচ্ছেন, কেমন টানলেই ফুক ফুক করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। কৌতূহল বশেই সেই সিগারেট বা বিড়ির টুকরা মুখে পুরে দেয়। আর অমনি বাবা-মার শাসন করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। "এখন থেকেই এই শিক্ষা হচ্ছে?" দোষটা বা শিক্ষাটা যে কার তা একবারও ভেবে দেখেন না। দু তিন বছরের শিশু হয়তো কোনদিন সন্ধ্যা বেলা হঠাৎ বিছানায় প্রস্রাব বা পায়খানা করে ফেলেছে আর অমনি মা তাকে এক চড় কষিয়ে বলে বসলেন—"বদমাইস আমার হাড় জ্বালাতে এসেছে।" দুদিন বাদে হয়তো অন্য কোন পরিস্থিতিতে শিশু বললে—"বদমাইস···। অমনি মায়ের চোখ কপালে উঠলো। "তুই এসব গালাগাল কোত্থেকে শিখেছিস?" বলে দিলেন মার। অথচ দোষী কে?

প্রায়ই মায়েদের মুখে শোনা যায়—"আজকালকার ছেলেমেয়েরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, হিন্দীগানের সঙ্গে 'টুইস্ট' নাচতে আরম্ভ করেছে।" অথচ ঐ মায়েদেরই হয়ত কেউ একদিন ছেলের সামনেই কোন প্রতিবেশির কাছে তার টুইস্ট নাচের প্রশংসা করে বললেন, "খোকা, দেখাও তো মাসীমাকে একটু টুইস্ট করে।" ছেলের বাহাদুরিতে মা তখন গর্বিত হয়ে ওঠেন। সেই মায়েরই ছেলেমেয়ে যদি বড় হয়ে নানা রকমের আধুনিক চটুলতায় এবং অশ্লীলতায় আশ্রয় নেয় তবে দোষ দেব কাকে?

সংসারের কাজের প্রতিটি পদে পদে আমরা (মা বাবা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্যরা) শিশুদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!! তাদের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অবহেলা করে বড় বড় বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—বড় বড় বুলি বলছি আর ভবিষ্যৎ নাগরিককে মানুষ করছি মনে করে আত্মপ্রবঞ্চনা করে চলেছি। "জীবনস্মৃতিতে" কবিগুরু বলেছিলেন, "ইস্কুল বাড়িটা ছিল যেন একটা খোপওয়ালা বড় বাক্স। কোথাও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভালোমন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব বড় জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সে চিন্তা একেবারে

নিঃশেষে নির্বাসিত।" সত্যিই, যে বিদ্যালয়ে কেবল মাস মাস মাহিনা চুকিয়ে দেওয়াই একমাত্র সম্বন্ধ, সেখানে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষক বা শুরুর মনের কোন আদান প্রদানই নেই সেখানে ইস্কুলের ঘরগুলি যে নির্মম ও বেয়ারাগুলি পাহারাওয়ালার মত—তার মধ্যে, গৃহের লেশের পরিবেশ যে কোথাও দেখা যেত না, এতে আর বিচিত্র কি? কবি তাঁর শৈশব সম্বন্ধে আরও বলেছেন, "আমি বেশ বুঝতাম ভদ্র সমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল জাতীয় নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।" শৈশবের এই তিক্ত অভিজ্ঞতাই কবিকে ভবিষ্যতে শিশুদের সম্বন্ধে এতখানি চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ করে তুলেছিল, আর তারই ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে তাঁর ধ্যানের ও আরাধনার 'শান্তিনিকেতন'।

সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার অভাব, শিক্ষকের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকৃত শিক্ষা থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আমাদের দেশে শিশু চলচ্চিত্রেরও একান্ত অভাব, উপরন্তু এমন সব চলচ্চিত্র দেখানো হয় যার ফলে সুন্দর শিশুমন সহজেই অসুস্থ ও বিকৃত হয়ে পড়ে। কারণ আমরা জানি চলচ্চিত্রের প্রভাব তো কম নয়।

জাতীয় শিক্ষায় ভিত্তিমূল শিথিল হলে মানুষ কখনই তার সাহায্যে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। প্রচলিত শিক্ষা যে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করতে পারেনি তার কারণ দেশের মাটির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। বর্তমান শিক্ষার দুর্বলতা এখানেই। শিক্ষা এখন একান্তভাবেই বাইরের জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্তরের জিনিষ নয়। কিন্তু যে শিক্ষা কেবল বাইরের উপকরণ মাত্র, সে শিক্ষার বোঝা বহন করে আমরা কিছুতেই বাঁচবো না; যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তারই সাহায্যে আমরা মৃত্যুর হাত এড়াতে পারি। সেই-জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের শিক্ষাতন্ত্রে, বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্শী সমবেত চেষ্টায় আনুষঙ্গিক ভাবে যুগোপযোগী বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে। দেশের শিক্ষককে মূল আশ্রয় করিয়া অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ করতে হবে।" 'রামায়ণ' 'মহাভারতের' রস শৈশব থেকেই পান করতে হবে।

'আনন্দময় শিক্ষাই' হোল শিশুর চরিত্র গঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান। এ শিক্ষা নিজেকে আবিষ্কার করার শিক্ষা। প্রত্যেকটি শিশুর প্রত্যেকটি কিশোর কিশোরীর যে বিশেষ ক্ষমতা আছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তার একীভূত মুক্তির আস্বাদ পাবে, তার শক্তি বিচিত্র দিকে বিকশিত হয়ে ক্রমে ঐক্যলাভ করবে—এটাই 'আনন্দময় শিক্ষার' মূলকথা।

নিষ্পাপ শিশুমনকে যদি উপযুক্ত পরিবেশ ও সতর্ক দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং সমবেদন মন নিয়ে পালন করা হয় তবে সে শিশু কোন দিনই বিপথগামী হতে পারেনা। শিশুকে যাঁরা মানুষ করেন অর্থাৎ পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজন, তাঁদেরই পরিচর্যা ও আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শিশু-মনের গঠন, শরীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হতে থাকে। তাই এইসব পরিবার বর্গের প্রত্যেকের নিজের নিজের সুখ-সুবিধা ও আরামের কথা ভুলে শিশুর প্রতি নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, প্রতি পরিবারে যদি একটি শিশুকেও ঠিকমত মানুষের মত 'মানুষ করে গড়ে তোলা যায় তাহলে দেশের এই দুর্দিন হয়তো অচিরেই কেটে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে শিশুর মনের পরিপূর্ণ প্রকাশ বুঝতে পারা না গেলেও শিশুর অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে শিশুর আশেপাশে যারাই থাকে তাদের মনের প্রতিফলন তার মনের গঠনের কাজে সাহায্য করে, শিশুকাল থেকেই যদি শিশু বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত মন নিয়ে বড় হতে থাকে তবে ভবিষ্যৎ জীবনে এই বিক্ষোভই ছেলে-

মেয়েদের চরিত্রের মূল ভিত্তি হয়ে থাকে, তাই তার মনের ও চরিত্র-গঠনের পরিপন্থী কোনরকম আচরণ শিশুর সামনে করা উচিত নয়। এই কথাটি দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক-কেই আজ মনে রাখতে হবে।

শিশুর চরিত্র গঠনে আবার মায়ের দায়িত্ব সকলের চেয়ে বেশী। স্নেহ-ভালবাসা-শাসনের নিগড়ে তিনি যেমনভাবে শিশুকে মানুষ করে তুলতে পারেন আর কারও পক্ষেই তা সম্ভব নয়। এই মায়ের সঙ্গ যদি ঠিকমত না পায় তবে তার মধ্যে একটা অশান্তভাব সদা জাগ্রত থাকে। শিশুকালে এর বহিঃপ্রকাশ কম থাকলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার চলায় বলায় ও আচরণে সর্বত্রই অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সমাজের সকল স্তরে মায়েদের সচেষ্টভাবে শিশুর ভবিষ্যত গঠনের জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসিতা অমানীনতাকে বিসর্জন দিয়ে শিশুদের প্রকৃত মানুষ করার দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। মাতা উদাসীন হলে শিশু বিপথে চালিত হতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে মায়ের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে মা যদি অগ্রণী হয়ে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োগ করেন তবে সে শিক্ষা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করে মা যদি শিশু শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তবে শিশু নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠবে। মাকে হতে হবে সংযত, রুচিসম্পন্না দৃষ্টিভঙ্গিকা আদর্শ মহিলা। কারণ আদর্শ মহিলা না হলে আদর্শ সন্তানের জননী হওয়া সম্ভব নয়। আর তখনই তিনি সন্তানের তথা সমাজ ও রাষ্ট্রের হৃদয়-সিংহাসনে "স্বর্গাদপী-গরিয়সী" দেবী জননীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

অপার বিস্ময়, অগাধ প্রীতি, অজানা কৌতূহল নিয়ে অনুভব পথ ভুলে শিশুরা আমাদের কাছে আসে পরম বিশ্বাসে একান্ত নির্ভরতায়। সংসারের কঠিন কাজে তারা এগিয়ে যাবে আমাদের হাত ধরে, আমাদেরই নির্দেশে—জীবনের পথে আমরাই তাদের যাত্রা করিয়ে দেব—কত বড়, কতখানি গুরুদায়িত্ব আমাদের। এর জন্য চাই শিশু মনস্তত্ত্বের জটিল তথ্যগুলি বোঝবার মত গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নিজে শিশু হয়ে শিশুর ঠিক মনের মানুষটিকে সযত্নে করে বলতে না পারলে তার সহজ সরল রূপটিকে ধরতে পারা সম্ভব নয়। তাই কবি বলেছেন :-

"খোকার মনের
ঠিক মানুষটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।"

শিশুকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে যদি প্রতিটি দেশবাসী শিশুর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করেন তবেই ভবিষ্যতে আমরা অর্থাৎ মাতা-পিতা, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী ও বিশ্ববাসী সকলে তার কাছ থেকেও যথার্থ কর্তব্যের দাবী করতে পারবো।

চীনের ক্ষুদে বিজ্ঞানী

(৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সঠিক ওজন করার ফল দেখে উপস্থিত জনতা মূক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে। বিস্ময়ের চমক কেটে যাওয়ার পর একবাক্যে সকলেই চু-এর দাবী মেনে নিয়ে তার জয়ধ্বনিতে মেতে ওঠে। পুত্রের অভাবিত কৃতিত্বে গর্বিত প্রধান মন্ত্রীকেও উল্লসিত জনতা অভিনন্দন জানাতে ভুলে যায় না। কেননা তিনি সুযোগ না দিলে ক্ষুদে বিজ্ঞানী চু-এর প্রতিভার সার্থক বিকাশ সম্ভব হোত না। সেখানে আবাল-বৃদ্ধ জনতার মধ্যে উল্লসিত বালক বীর চু-এর পাশে দাঁড়িয়ে সরকারী আমলাদের মাথাই শুধু নীচু হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞান জগতে আজ কতো না চমকপ্রদ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে যার ফলে মানুষ আকাশে চাঁদের বুকেও বিচরণ ক'রে এসেছে। তবু চীনের জনগণ আজও তাঁদের ঐ ক্ষুদে বিজ্ঞানীকে ভুলে যায় নি। শিশুদের মনে নতুন কিছু আবিষ্কারে উৎসাহ দিতে আজও চীনের ঘরে-ঘরে চু-এর কৃতিত্ব কাহিনীর উল্লেখ করা হয়।

Phone : { 35-3556
Works : 52-3473
Resi : 52-4012

VICKERS MACHINE TOOLS

ENGINEERS. FABRICATORS. FOUNDERS

Office & Factory No. 1
1, SITALAMATA LANE
CALCUTTA-700050
WEST BENGAL

Factory No. 2
22B, D. L. ROY STREET.
CALCUTTA-700006
WEST BENGAL

কমলা

বিস্কুট

ফোন : ২২-৩৮৫৫

কমলা বিস্কুট কোম্পানী

১১৩বি রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগমারি পো: অফিস বগুরা, কলিকাতা-৫৯ ফোন : ৫৭-২১৮০ হইতে প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্ট হাউস ২১৯এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭ হইতে মুদ্রিত।

উদ্বোধন

বিপ্লবী আধ্যাত্মিক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

PHONE : 26-8731

Balaji Ram Wire Industries (P) Ltd.

Manufacturers of M. S. Wires

29, Ganesh Chandra Avenue,
3rd. Floor, CALCUTTA-13

: FACTORY :
S, Haren Mukherjee Road,
BELUR, HOWRAH.

স্বল্প সঞ্চয় আয়ের পথ, লটারীর সুযোগ ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য।

১) ১, ২, ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী পোষ্ট অফিস টাইম ডিপোজিট প্রকল্প :- বার্ষিক সুদ যথাক্রমে ৭%, ৭½%, ৮% ও ১০%

২) ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ২য় পর্য্যায়ে সুদ ৬% (চক্রবৃদ্ধিহারে), ৩য় পর্য্যায়ে সুদ ৬% (সরল); উভয়ই করমুক্ত। ৭ বছর মেয়াদী জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ৪র্থ ও ৫ম পর্য্যায়ে সুদের হার যথাক্রমে ১০·২৫% ও ১৪·৩০% (সরল)।

৩) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট করমুক্ত বার্ষিক সুদ ৫%= এছাড়া কমপক্ষে ২০০ টাকা জমা থাকলে বছরে ২বার লটারীর সুযোগ।

৪) ৫ বছর মেয়াদী রেকারীং ডিপোজিট প্রকল্প :—সুদ ৯·২৫% (চঃ বৃঃ হারে) (বীমা প্রকল্পের সুযোগ সহ)

৫) ১০ বছর মেয়াদী কিউম্যুলেটিভ টাইম ডিপোজিট প্রকল্প ঃ— করমুক্ত সুদের হার ৬·২৫% (চক্রবৃদ্ধি হারে) (রিবেটের সুযোগ সহ)

৬) ১৫ বছর মেয়াদী পাবলিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রকল্প ঃ- করমুক্ত সুদ ৭½% (চক্রবৃদ্ধিহারে)।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিস বা জেলাসঞ্চয় আধিকারিকের ৮০,সি ডাঃ সুধীর বোস রোড। কলিকাতা ২৩, ৩২ রিভারসাইড রোড, ব্যারাকপুর, ২২, ইউ, কে, দত্ত রোড, দমদম কলিকাতা-২৮ এবং অতিরিক্ত জেলা শাসকের অফিস বারাসতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।

মেমোনং ১৩৫—৭০—ডি. তাং ২৪।২।৭৯

With Best Compliments From :

CALOREX INDIA PRIVATE LIMITED

Manufacturers of : INDUSTRIAL BOILERS

Registered Office :

13, CAMAC STREET (2nd Floor)
CALCUTTA-700017
Phone : 43-4112

Works :

PLOT-7 BLOCK-D
27 & 28 Industrial Estate
KALYANI 741235
Phone : 377 & 705

With Best Compliments of :

M/s Electromech Industrial Corporation

Office :
3, HARE STREET, CALCUTTA-700001
Factory :
18/4. RAJA RAM DAS LANE,
HOWRAH-1
Manufacturer of :
Railway Carriage & Wagon Component.
P & T Stores & other Govt. Contracts.

Phone | Office : 54-3493
Works : 66-3219

CHANDRA ENGINEERING WORKS

Manufacturers of :
Gear, Gear Box, Gear Coupling
&
Other Precision Spares
Office :
4/1 A BRINDABAN BYSACK STREET
CALCUTTA-700005
Works :
72/1, 'O' ROAD
HOWRAH-711108

গ্রীষ্মের গরমে বাটা পায় হাঁটা যায় আরামে

কুাওড়াদিস্ ০১
সাইজ ৫-১০
টা ৪১.৯১

চন্দ্রা ৪৯
সাইজ ৬-১০
টা ৩৫.৯১

কোমাবস ৫৩
সাইজ ছোট/মাঝারি/বড়
টা ২৯.৯৫

বাটার আকর্ষণীয় সব নতুন চপ্পলের সারি। হাল্কা, অথচ মিস্ত্রি ব্রাউন টেঁকে অনেকদিন। খোলামেলা এই আরামটুকুইতো চাই গরমের ভীষণ দিনগুলিতে।

Bata

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১। ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩। শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪। ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫। কেনোপনিষদ্	১·০০
৬। কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭। প্রশ্নোপনিষদ্	১·০০
৮। ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০। তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

৺প্রতিভা রায় রচিত

১। নারীপ্রগতির ভূমিকথা	৩·০০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

রেণু মিত্র রচিত

১। সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	১·০০
২। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৭·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩। রবীন্দ্র হৃদয়	৭·০০
৪। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২০·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০	সদা পাঠ্য গীতা	১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৮·০০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	কর্মবাণী	২·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
বাংলার কবি	৬·৫০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·00

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ● ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

উজ্জ্বল ভারত ৩২ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক '৮৫

সূচীপত্র

আটের ব্যভিচার | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ১৫
সমস্যার গোড়ায় | সম্পাদকীয় | ১৬
তুমি | কৃষ্ণ ধর | ১৭
ঘর | সুচন্দ্র ভট্টাচার্যচৌধুরী | ১৭
বলাইচাঁদ অন্তাচলে | ভবতারণ কাব্যতীর্থ | ১৮
সুন্দরবনের মানুষ। শক্তিপদ রাজগুরু ১৯
দিব্য বর্ণাশ্রম প্রথা | দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ২৩
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতিরঞ্জন বুড়ো।। ২৬
শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ৩০
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ৩২
বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন প্রসঙ্গে | সুনীতি দাস্তাল | ৩৮
পশ্চিমবঙ্গে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণ | গৌরচন্দ্র সাহা | ৭০
স্বপন বুড়োর অভেচ্ছা। স্বপন বুড়ো।। ৭৩
জানবার কথা | গণেশ চক্রবর্তী | ৭৩
আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে যুব-সংযোজনের প্রচেষ্টা | দুলালকুমার সাহা | ৭৩
হিমালয়ের আহ্বান | অনুপমা সেনা ৭৩

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা

মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (ডাকে)
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

আটের ব্যভিচার

হাসিতে আট আছে, চোখের জলেও আট আছে। জীবনে আট আছে, মরণেও আট আছে, ফুল শয্যায় আট আছে, শ্মশানে আট আছে। কিন্তু সব সময় সব দেশে সব পাত্রে সব আট শোভা পায় না। ইংল্যাণ্ড জার্মানী প্রভৃতি দেশ যুদ্ধও করে, আমোদ প্রমোদও করে।...বিজ্ঞান তাদের গোলাম, তাই তারা বিজ্ঞানের সাহায্যে অন্য জাতির রক্ত শোষণও করতে ও সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা তুলতে পারে। ভারতবর্ষ কি ইংলণ্ড বা জার্মানী ?...বাহিরের প্রবল পাশ্চাত্য প্রকৃতিকে লুট করছে, তাতে সে ভারতের চেয়ে অধিকতর দক্ষ হলেও অচিরাৎ প্রকৃতির সামনে তাকে মাথা হেঁট করতে হবে, প্রকৃতির প্রতিশোধ তার দর্প চূর্ণ করবে। প্রকৃতির সর্বোচ্চ বিলাসই আট। কিন্তু সেই প্রকৃতিকে বিদ্বেষের কিম্বা বিশ্বের সেবায় না লাগিয়ে নিজের ভোগে লাগাবার জন্য মানুষ যখন বদ্ধপরিকর হয়, তখন সে প্রকৃতিকে অসতী বানাতেই চায়। প্রকৃতি দীর্ঘকাল তার কাম ভোটায় না, তার কুত্রাপি মূর্তি একদিন তার সবল বিজ্ঞানকে ভেঙে চুরে একাকার করে দেয়, এবং সেই শ্মশানের উপর সে সেবাময় বিজ্ঞান স্থাপন করে। নারীত্বের যেমন ব্যবসা চলা উচিত নয়, জগৎ যত সভ্য হবে আর্টের ব্যবসাও তত চলবে না। ইংলণ্ড জার্মানী যতই সভ্যতার দাবী করুক, ভারতীয় আদর্শের কাছে তারা শিশু। আর্ট মানুষের মধুরতম প্রকৃতিকে সেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, তবেই সে সতী, সে সর্বমঙ্গলা। তাকে নীচে নামিয়ে কেবল দু মুঠো অন্নের জন্য কিংবা পরের রক্ত শোষণ করবার জন্য কিংবা আর একটা জাতিকে নেশার মাতাল করে রাখবার জন্য প্রয়োগ করলে আর্ট ব্যভিচারী হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের মত কলাবিৎ দ্বিতীয়টি নেই। তিনি আর্টকে শোষণের পথে না লাগিয়ে ত্যাগের পথে, মরণের পথে লাগাতে পেরেছিলেন। যা সত্য আর্ট, তাতে শোষণের গন্ধ থাকবে না। থাকবে শুধু পোষণ। যারা আর্ট নিয়ে ব্যবসা করছেন আর যারা সেই ব্যবসায়ের যোগাক যোগাচ্ছেন, উভয়ই তুল্য অপরাধী।...

স্বামী ভক্তিবেদান্ত অবধূত

সম্পাদকীয়

সমস্যার গোড়ায়

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ কথাটি আনন্দদায়ক। আন্তর্জাতীয়তা যতটা বাড়াতে পারব জাতীয়তা বজায় রেখে, ততটাই সার্থকতা। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালন করতে অবশ্যই বহু শিশুর বিভিন্ন সমাবেশ বেশী সার্থক হোত যদি কত উলঙ্গ অনাহারী অর্ধাহারী বে-শিশুরা লেখাপড়া না করে পথে ঘাটে মাঠে সারাদিন ঘুরে বেড়ায় এবং বলা যেতে পারে বংশগত তিনেক বয়স থেকেই যারা অপরাধ-প্রবণ হয়ে গেছে, সমাজের গোড়ায় সেই শিশুগুলির জন্যও কিছু করা যেত। তাদের জন্য কিছু করা সহজ নয় জানি, তবু তাদের জীবনের মান বাড়াতে না পারলে শিশুবর্ষ পালন কাজটি বুঝি বা নিতান্ত ফ্যাশান ছাড়া আর কিছু হবে না। সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুরাই আরও খানিকটা অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় করবে, কিন্তু তাতে সমাজের গোড়ায় বুদ্ধুরা মিটবে না, সামাজিক মানদণ্ডের উন্নতি হবে না।

আজ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে সমাজের নিম্নস্তরের শিশু বা কিশোরদের সভ্যতার উন্নতি কিছু করা যায় কি না সেইটে ভাবা দরকার। খাতায় পত্রে নয়, বোধ হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে মাইনে করা লোক এনেও নয়, দলের ক্ষমতা দিয়েও নয়, প্রাণবান মানুষ যদি পাওয়া যায়—যারা কাজ করবে প্রাণের তাগিদে—এই কত উলঙ্গ শিশুগুলিকে বা সিগারেট বিড়ি বা গাঁজা খেয়ে দিনের অনেকটা সময় কাটানোর কিশোরগুলিকে যারা ভালবাসা দিয়ে অথচ শক্ত হাতে দৃঢ়তার সঙ্গে টেনে তুলবে মনুষ্যত্বের স্তরে—সে চেষ্টা কি করা যায় না? সমস্যার সেই খেকে আমরা ভাবতে চাই।

দ্বিতীয় কথা, আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালন করে শিশুরা আরও একটু মনুষ্যোচিত গুণাবলীর অধিকারী হবে কি না। বর্তমানে সমাজের আর সকলের সঙ্গে সমানতালে শিশুদের বুদ্ধিও বেড়ে যাচ্ছে এবং ভালবাসার দিকটা কমে আসছে। অথচ 'মানুষ' হতে হলে শুধু বুদ্ধিমান হলেই চলবে না, ভালও বাসতে হবে। ভালবাসতে হবে দু'জন পাঁচজনকে নয়, ভালবাসতে হবে সকলকে। শিশুর বুদ্ধির প্রখরতায় আজ আমরা কৌতুক বোধ করছি বটে, কিন্তু সব রকম বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই মানুষ হওয়ার পক্ষে প্রয়োজন এ কথা মনে রাখতে হবে। ভালোবাসার স্বতঃসিদ্ধ প্রবণতা নষ্ট হয়ে গেলে সেটা সমাজের পক্ষেই দারুণ ক্ষতি। পিতামাতা বা ভাইবোনের প্রতি যে নাড়ীর টান সেটা ছাড়াও মানুষের মধ্যে আর একটা কিছু আছে যেটা সব মানুষেরই জন্যে—সেই বৃত্তিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এটা সকলেরই প্রতি একটা সহজ প্রীতি—নিজের অস্তিত্ব বোধের স্বার্থবোধের বাইরে নিজেকে দেবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা। 'চোখে যেমন প্রাণে কাঁপা, হৃদয় মাঝে দেখ না ধরে ভুবনখানা'—কবি-কথিত এই হৃদয়ের দরকার আছে সভ্যতার মূলমন্ত্র হিসাবে। প্ল্যান প্রোগ্রাম প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গে যদি এই হৃদয়-বৃত্তি বা সহজ প্রীতি না থাকে তাহলে সেটা মানুষের সভ্যতা হয় না, সে যন্ত্র-সভ্যতা অনেক বাড়লেও তাতে সত্যিকার সভ্যতার মানদণ্ডের উন্নতি হয় না। এই সহজ প্রীতির আজ বড় অভাব হয়ে পড়েছে। এই ভালবাসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুকে বুদ্ধিমান করতে হবে।

ছোট ছোট সংসারের ছোট পরিধিতে থেকে আজকের শিশু আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে, অথচ ব্যাপকতা তার জীবনে শিশু বয়স থেকেই প্রবেশ করাতে না পারলে বিশ্ব সংসারকে ভালবাসার প্রবণতা তার আসবে কোথা থেকে? নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি শিশুর মধ্যে আছেই। কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা না করলে বাইরে থেকে সে শুধু নেবে, দিতে পারবে না; অথচ দেওয়া নেওয়া মিলিয়েই জীবন। সে বোধটা খুব অল্প বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে ঢোকাতে হবে আচার আচরণের মধ্য দিয়ে। পরিবার সমাজ দল গোষ্ঠী নিরপেক্ষ একটি সামগ্রিক চেতনা—সকলকে নিয়ে আমি আছি—এই বোধ শিশুর মধ্যে প্রবেশ না করালে, চিত্তের ব্যাপকতা আনবার চেষ্টা না করে শুধু জুতোজামা পরিয়ে টিফিন দিয়ে ইস্কুলে পাঠানো ছেলেমেয়েরই মুখ্যতঃ নিয়ে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পালনদ্বারা জাতি বা সমাজ সামগ্রিক ভাবে লাভবান হবে না, হচ্ছে না।

কবিতা

তুমি ॥ কৃষ্ণ ধর

বসন্তের ফোটাফুল তুমি বৈশাখের অমল বকুল
তোমাকেই খুঁজি সারাদিন পথে পথে
খুঁজি আকুল মনে শ্রাবণেও
কোথায় লুকিয়ে থাকো তুমি
নিঃসঙ্গ আকাশে একা একা
আজও পাইনি দেখা।

পদ্মার প্রথর জলে খুঁজেছি তোমাকে
খুঁজেছি শহরে গ্রামে জনারণ্যে এবং নির্জনে
প্রতিদিন জন্মদিনে
খোঁজাতেই বুঝি সার্থকতা।
তোমাকে স্বপ্নে দেখি যেন মহানদী
দুরন্ত আবেগে যাও অতলস্পর্শে সমুদ্র অবধি
কখনও তোমাকে যেন মনে হয় খর মরুভূমি
কখনও বা থাকো ওয়েসিসে
নীলিমায় আছো তুমি
আছো তুমি পৃথিবীর ঘাসে ॥

ঘর ॥ সুচন্দ্র গুহঠাকুরতা

ইট, কাঠ, ঘর আর ঘরের আসবাব,
ওরা যেন সব মানে বুঝতে পারে।
ছবি, বই, তালপাতার হাতে-বোনা ফুল,
ছোট ছোট পাখি, পট, দেবতার মুখ,
কাচের আধারে সুন্দর মৃত প্রজাপতি।
শাদা ফ্রীজের উপরে খাড়া
রাঙা নারিকেল গাছ—
কেরলা-থেকে-আনা
জীবনের টুকরো টুকরো প্রতিরূপ—
অনুভূতি, প্রীতি, স্মৃতির সঞ্চয়।

• • • •

দীপের ছায়া এসে পড়ে
বর্ণাঢ্য পর্দায়, কার্পেটের 'পরে।
বদলে যায় ঘরের চেহারা,
নূতন লোক আসে ঘরে।
ওরা কান পেতে শোনে সব কথা।
অবশেষে যখন মানুষেরা চুপ করে,
সবার হয়ে ওঠে ইঁট, কাঠ, ঘর :
প্রাজ্ঞ, ভীত অথবা বিদগ্ধ হয়ে
ওরা আজীবন কমে এবং বাড়ে।

BIDYUT UDYOG

Specialist in : TRANSFORMER REPAIRING

Factory

BEHALA KRISHNAGORE CHANCHAL
MALDAH and SELIGURI

Office

3, CANAL EAST ROAD,
(Near Moulali)
CALCUTTA

বলাইচাঁদ অস্তাচলে ॥ হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

মাঘের আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা কভু ঝরে বারি বিন্দু।
নিখিল বঙ্গ বাথায় বিধুর উথলিল শোকসিন্ধু
সে যে বনফুল পুত সুরভিতে দিত আনন্দ সকলের চিতে
মৃত্যু রাহু সে বাচ বেলে আসে—বিলীন বলাই-ইন্দু।

কালের বক্ষে কীর্তির স্মৃতি—কত না অমর সৃষ্টি।
হৈম রেখায় আলপনা আঁকা যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি ;
তবুও যত ভাঙি স্বপ্নাভয়ে সরল পাপীকে নাও বুকে ব'য়ে
বাগ্‌বাগিতায় তুমি যুগ ধ'রে করেছ অমৃত বৃষ্টি।

শাল প্রাংশু মহাভুজ তবু, কান্তি কনকতুল্য
কবি সদৃশ সৌম্যমূরতি আনন নিয়ত ফুল্ল ;
গল্পোদক সম প্রাণবানি শুচি রচনায় তাই হেরি তো মুকুটি
গল্প যে মণি মুক্তোর কুচি—উপন্যাস অমূল্য।

যোগীর মতন ধ্যানাসনে বসি নিরালায় নিজ কক্ষে
তুমি ভগীরথ বিজ্ঞানধারা আন সাহিত্য বক্ষে ;
তব উপন্যাস 'অগ্নি' জ্বালায় বহে দুই ধারা কানায় কানায়
'মহন্নুত্ব' হয়ে মোরা তাই দেখি বিস্ময় চক্ষে।

অল্প কথায় ছোট পরেতে তুমি যে অগ্রগণ্য
মানুষের মন আঁতি-পাঁতি খোঁজ বৈচিত্র্যের জন্য।
নিত্য যে টান নতুনের প্রতি দেবরূপে কর ভারতী-আরতি
সাহিত্যাঙ্গন পেয়ে তব জ্যোতি হ'ল আলোকিত ধন্য।

তাকর সেজে বিনিদ্র চোখে কেটেছ প্রহর রাত্রি
পড়েছ নাটো জীবন্ত করে প্রতিটি পাত্রপাত্রী ;
'কল্কি' 'রূপান্তর' 'শ্রীবসুসূদন' 'বিদ্যাসাগর' তোলায় নয়ন
'বৈতরণী তীরে' মধু বিরচন, শেষে দে পথের যাত্রী ;

লেক টাউনের প্রাসাদে কত না সাক্ষাত তব সঙ্গে
ধূলর হয়েছি পাদপদ্মের ধূলি মেখে সারা অঙ্গে ;
ভিরোধানে তব শুধুই শুধুই অশ্রুনীরেতে তর্পণ করি
অস্ত গেলেও বলাই চাঁদের বিভা রবে এই বঙ্গে।

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (ডাকমাশুল)। প্রতিমাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৫৯০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed A/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানেরনবাগত লেখকলেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বলভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সুন্দরবনের মানুষ

শ্বাপদ রাজ্যের

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শুনে শিউরে ওঠে পরেশ। কিছুদিন ধরে ওদের গ্রামের দিকে বাঘের উৎপাত বেড়েছিল। নদীর জল বেড়ে গেলেই বাঘগুলো সুন্দরবন থেকে বের হয়ে মানুষের বসতের দিকে এগিয়ে আসে। গরু বাছুর ছাড়া কখনো কখনো শিকার করে নিয়ে যায়। কোনো বাঘগুলো আরও শয়তান। তারা সুযোগ খোঁজে কখন মানুষ মিলে যায়। না পেলেও তারা সন্ধ্যার পর ধান ক্ষেতে না হয় জোপে বসে থাকে, কোন লোক জল বের হলেই বিরাট বাঘগুলো লাফ দিয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে তাকে তুলে নিয়ে বনে গিয়ে ঢোকে।

প্রায়ই মানুষ মারা পড়ছে মানুষ খেকো বাঘের জন্য। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহকুমা শহরেও খবর এসেছে। কিন্তু বাঘকে কায়দা করা যায় নি। বরং এ গ্রাম সে গ্রামে তাদের উৎপাত বেড়ে চলেছে। ওদিকের লোকজন ভয়ে আধমরা হয়ে আছে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় পরেশের মা অন্য বাড়ি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল। একদিকে নদী অন্যদিকে ধান ক্ষেত। আশপাশে বাড়িঘরও রয়েছে। কিন্তু দুষ্ট বাঘটা ঠিক তাক বুঝে তাকে তুলে নিয়ে বনে চলে গেল। মাটিতে আঁকা রইল রক্তের দাগ।

...পরেশ এবার গ্রামে এসেছে সব হারিয়ে।

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে বনের দিকে। ওই বনে তার বাবা বাঘের খাবার হয়ে দিয়েছে, তাদের বাড়ির পরজা থেকে মাকে নিয়ে গেছে বাঘে। পরেশের মনে পড়ে নবীন মাষ্টার মশাই-এর কথা।

সবাই ওই সুন্দরবনের ভয়াবহ বিভীষিকার কবলে প্রাণ দিয়েছে। আজ বলিই একটি কিশোর অনাথা হয়ে ওঠে।

সারা গাঁয়ের মানুষ-এর চোখে ঘুম নেই। অনেকেই বলে—এখান থেকে পালাবে। ধান জমিতে চাষ দিতেও সাহস করে না। মাঠ থেকেই মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে বাঘে।

পরেশ বলে—ওটাকে একবার দেখবো।

মদন বাওয়ালী প্রবীণ লোক। সে বলে, তুই যাসনি পরেশ। তোর বাবা মাকে ওই বাঘে নিয়েছে। তোর উপর তার রাগ আছে।

পরেশ আজ নবীন। ও সব মুনিঋষিদের সে বিশ্বাস করে না। তার সাথী মনে জেগেছে দুর্জয় সাহস। প্রতিশোধ সে নেবেই। এ অঞ্চলের মানুষের চাঁদ ওই বাঘটাকে মারতেই হবে তাকে।

বেজায় সাহেবও তরুণ, এতদিন সেও চেষ্টা করেছে, কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। পরেশকে দেখে তারও ভরসা হয়।

পরেশ বলে—আমি পারবো তার ওকে মারতে। হয় মারবো, নয় মরবো। আপনি—

তিনিও রাজী হন, আমি থাকবো তোমার সঙ্গে।

রাত হয়ে গেছে। সারা গ্রাম নিঝুম। মানুষ জন ভয়ে কেউ বের হয় না। ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কোন সাড়া শব্দ নেই। এক ফালি চাঁদের আলো মেঘের মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে আবার মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেল।

কয়েটার ভদ্রলোক আর পরেশ দুজনে নদীর ধারে একটা গাছের উপর বসে আছে। পরেশই লক্ষ্য করেছিল বাঘটা যেন বন থেকে একটা পথ ধরে বের হয়ে আসে, আর একটা জায়গাতে নদী সাঁতরে পার হয়ে বসতির দিকে আসে। এতক্ষণ বসে থাকার পরও কোনোও সাড়া নেই।

কয়েটার বিমলবাবু বলে—আজ আর আসবে না।

পরেশ গাছের মাথায় এতক্ষণ অবধি বসে থেকে হতাশ হয়েছে। মশাও তেমনি কামড়ে সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়েছে। তাছাড়া ভাওয়ালি-এর কামড়ও তেমনি যন্ত্রণাদায়ক।

ওরা নেমে আসছে। চারিদিক ঘনঘোর অন্ধকার। বিমলবাবু আগে আগে চলেছে পিছনে আসছে পরেশ। হঠাৎ ওপাশের ঝোপটা নড়ে ওঠে, পরেশ কিছু বলার আগেই বিরাট বাঘটা প্রায় সোজা লাফ দিয়েছে বিমলবাবুর দিকেই। আর সেই মুহূর্তে বিমলবাবুও কিসে হোঁচট খেয়ে উঁচু বাঁধ থেকে ছিটকে পড়েছে নীচে, বন্দুকটা পড়ে গেছে ওপাশে। বাঘটাও তারই জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে ওদিকে পড়েছে একটা ছোট ডোবায়।

···পরেশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাবা-মায়ের মুখগুলো। ওই বিরাট বাঘটাই তাদের শেষ করেছে। আজ সেই শয়তানকে পেয়েছে হাতের নাগালে।

বাঘটাও ভাবতে পারে নি যে শিকার ফসকে যাবে—সে পড়বে নীচে একটা ডোবার জল-কাদায়। ওখানে পড়ে তাই হকচকিয়ে গেছে।

কিন্তু শয়তান-এর দুটো চোখ জ্বলছে—ও দেখেছে ওপাশে আর একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে। ক্রুদ্ধ বাঘটার চোখ জ্বলছে—জল থেকে উঠে আসছে। আবার আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছে।

পরেশ এর সারা শরীরে কি উত্তেজনা। হাতের বন্দুকটা শক্ত করে ধরে। এর আগে ওই দিয়ে পাখী মেরেছে। আজ বিমলবাবু ওই বন্দুকে ছররার বদলে একনম্বর বুলেট দিয়েছে।···দুটো নীল চোখ-এর মাঝখানে কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান।

বিমলবাবুও বিপদটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ওর হাতে আর বন্দুক নেই—পরেশ—ভায়ার—

বিমলবাবুর মনে হয়, বাঘ-এর সামনে যেন পরেশ হকচকিয়ে গেছে। জানোয়ারটা জল থেকে উঠে গুঁড়ি হয়ে বসেছে, লম্বা ল্যাজটা আছাড়াচ্ছে—

পরেশ আজ ওকে চরম আঘাত হানতে চায়···বাঘটা স্থির চাহনিতে দেখছে ওকে—এইবার ওর বিরাট দেহটা আসমানে লাফ দিয়ে উঠবে—ঠিক সেই মুহূর্তেই পরেশ-এর বন্দুকটা গর্জে ওঠে, একটা গুলি বিঁধেছে ওর দুচোখের মাঝখানে—মাথায়। প্রচণ্ড আঘাতে বাঘটার উৎক্ষিপ্ত দেহটা ছিটকে পড়ে বাঁধের উপর, গর্জন করছে সে। ওর বিকট গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠে। পরমুহূর্তেই মস্ত গুলিটা ওর বুকের কাছে বিঁধেছে। বাঘ-এর ফুসফুসই বোধহয় ভেদ করে গেছে গুলিটা। দু-একবার নড়বার চেষ্টা করে বিরাট দেহটা স্থির হয়ে আসে।

—পরেশ!

···পরেশও ভাবতে পারে নি যে ওই বাঘটাকে সে

শেষ করবে। আজ তার বাবাযাদের মৃত্যুর শোধ সে নিয়েছে। সারা গ্রামবাসীর লোক এসে পড়েছে তাদের এতদিনের শত্রুকে পরেশ শেষ করেছে। আবার ওদের মুখে হাসি ফোটে। বিমলবাবু পরেশকে জড়িয়ে ধরেন।

খবরটা এস-ডি ও সাহেবের অফিসেও পৌঁছে দেন বিমলবাবু।

তিনিও ডেকে পাঠান পরেশকে। ওই অঞ্চলের এতদিনের আতঙ্কটাকে দূর করেছে পরেশ। পরেশও দেখেছে তার গ্রাম ও অঞ্চলের লোকের মুখে খুশির সাড়া।

এস-ডি ও সাহেব বলেন—সত্যিই একটা বিরাট কাজ করেছো তুমি।

পরেশ জানায়—আমার গ্রাম—এই লোকার মানুষের জন্য এটা করেছি স্যার। তাছাড়া এই বাঘটাই আমার বাবা-মাকেও খেয়েছিল। আর একটা কাজ বাকী আছে স্যার।

পরেশ-এর মনে পড়ে নবীন মাঝির মশাই-এর কথা। ওখানের খাড়ে পাশে কুমীরের উপদ্রবও রয়েছে। নদীর জলে মাছ ধরে ওদের দিন চলে, আর কুমীরটা সেখানে এখনও হাঁ করিয়ে বসে আছে।

এস-ডি-ও সাহেব বলেন—গ্রামের লোক-এর জন্য সত্যিই কিছু করবে তুমি।

পরেশ বলে—সুন্দরবন নিয়েও অনেক কিছু করা যায় স্যার। ওখানে এতো জমি পড়ে আছে, মানুষগুলোর অভাব দূর হয়—শান্তিতে থাকতে পারে।

এস-ডি ও সাহেব তরুণ কিশোরের কথাগুলো শুনছেন।

পরেশ নানা কথাই ভাবে। এস-ডি-ও সাহেব বলেন, —তোমার কথাও রিপোর্টে লিখবো পরেশ। ভালোভাবে পড়াশোনা শেষ করো, তখন হয়তো সত্যিকার কিছু করতে পারবে দেশের মানুষের জন্য।

নবীন মাঝিমশাই-এর কথা সে ভোলে নি। বাবা—মাঝিমশাই এদের কথা সে রাখবে। গ্রামের মানুষ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। বাঘ এর উপদ্রব আর নেই। কিন্তু হঠাৎ যেন সেই কুমীরটা আবার উপদ্রব শুরু করেছে।

নদী পার-এর ধারে মাছ-এর জন্য যেতে হয় তাদের। গরু-বাছুরও চরতে যায় নদীর ধারে।

বিরাট কুমীরটা মাটির রং-এ রং মিলিয়ে উপরে উঠে এসে পড়ে থাকে, তাক্ করে ওই রাখাল ছেলেটাকে গাছের কাপটা মেরে ফেলে মুখে করে ধরে গাঙে নেমে যায়। কখনও গরুটাকেই ধরে নিয়ে চলে গেল। চাষীর মাথায় হাত।

এইভাবে কুমীরটার সাহস বেড়ে গেছে। জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসে সে আক্রমণ শুরু করেছে। বাঘ এক আধ মানুষ পেলেও সে চলে যায়। ওই বাঘই ওদের বন্ধু। সেখান দিয়ে যাতায়াতও নিরাপদ নয়।

পরেশও সন্ধানে ছিল। কিন্তু কুমীরটা আরও চতুর। মাঝে মাঝে গায়ের দেখা যায়—বিরাট একটা কাঠের গুঁড়ির মত ভাসছে সেটা। রাইফেলের গুলি দিয়েও তাকে তখন কিছু করা যাবে না। ঘুরেই সেটা পরক্ষণে চারফুট লেজে ছিটকে যায়। কুমীরকে মারা তাই কঠিন।

পাড়ার সেদিন কলরব শুনে সেও দৌড়ে যায়। বাঁধের ওদিকে একটা মালোর ধারের মাঠে লম্বা লাফল দিয়েছে কারা। গরু চরছিল—কুমীরটা একটা গরুকে ধরে নদীর দিকে নিয়ে চলেছে। কিন্তু লোকজন তাড়া করতে কুমীরটা দৌড়চ্ছে মাঠ দিয়ে, ল্যাজের ঝাপটায় চাষ দেওয়া ক্ষেতের বড় বড় মাটির ডেলা ছিটকে চলেছে বাজনের গোলার মত। লোকজন তাইই ধারে পড়ে যায়। কুমীরটাও ধুলো উড়িয়ে একটা ঝড়ের মত গিয়ে পাকে পড়লো।

পরেশও সন্ধানে রয়েছে।

বিমলবাবু বলেন—অতবড় কুমীরটাকে সামনে ভিজ মোড়ার বন্দুক নিয়ে যেও না পরেশ। চোট পেলে ব্যাটা তোমাকেই মরীয়া হয়ে এ্যাটাক করবে। দরকার হয়

আমায় হেডি রাইফেল দিয়ে যেত। পরেশকে তিনি ছোট ভাই-এর মত ভালোবাসেন। জানেন ওর সাহসের কথা। কাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে এসেছে পরেশ। পাড়া-সম্পর্কে পোদ্দিকাকাই ওর বাড়িতম অভিভাবক দেখে। কাকীমাও ওকে নিজের ছেলের মত ভালোবাসে।

কাকীমা বলে—আবার ওই দামোদর পিছনে কেন যাস বাবা?

পরেশ হাসল, বলে—আমাদের দরোয়ান করে ও রেখে থাকবে তা হয় না কাকিমা।

…দস্যি ছেলে যা হোক বাবা!

পরেশ সেদিন ভোরে একটা কোপের ধারে বসে আছে সবুজ চাদর জড়িয়ে। শীতের শেষ। তখনও কুয়াশার আভাষ আছে। ভোরের বেলা পাখির ঝাঁক আসে। আর কুমীরটাও তাক্ করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় অনেকেই মারা পড়েছে ওর হাতে।

পরেশ কোপের ধারে বসে আছে চুপ করে। হঠাৎ দেখে বিরাট একটা ছোট ডিঙি যেন চার পায়ে ভর করে এগিয়ে চলেছে ডাঙার দিকে জল ছেড়ে। দুর্ত শয়তানের আসার কোনো শব্দ নেই। অতিকায় একটা টিকটিকি শিকারের দিকে এগিয়ে চলেছে—ওপাশে একটা গরু চরছে, ওর নজর সেই দিকে। পিঠের ওপরটা কালচে—শেওলা পড়ে গেছে।

পরেশ চমকে ওঠে। হাতে ওর বিলেতযাত্রার কোম্পেডেন ফাইভ এম্প্রেস রাইফেল। দুইকি গুলি পোরা দুটো ব্যারেল। পরেশ শক্ত হয়ে ওর দিকে নজর রাখছে, কুমীরটা জল ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা ঘুরে যেতে সেও কোপ থেকে বের হয়ে এগিয়ে যায়। সর্বাঙ্গ ওর পুরু চামড়ায় ঢাকা, গুলী করতে হলে একমাত্র সামনের পায়ের গোড়ার বুকের কাছে করতে হবে—নয়তো একেবারে চোখের মধ্যে—নইলে ওকে কাবু করা যাবে না।

হঠাৎ শব্দ উঠতেই কুমীরটা এদিকে চাইল। চোখ যেন চ্যালার মত ঠেলে বের হয়ে আসছে। বীভৎস কদাকার একটা বিশাল দেহ। চোখ দুটোয় পৈশাচিক ভাব।

কুমীরটা বিদ্যুৎ বেগের মত পিছন ফিরে ছিপ্রি একটা লম্ফ করে ওঠে। সামনে ওই এই পাশের দিকে যাবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে পরেশ। কুমীরটা সামনের শিকারকে দেখে হিংস্র হয়ে উঠেছে।

বিকট হাঁ করে আর মাটিতে লাঙ্গ মেরে সাড়া শরীরটাকে একটা চলন্ত সরলরেখায় পরিণত করে এগিয়ে আসছে বুকে ভর দিয়ে। পরেশ ভাবতে পারে নি একেবারে ওর মুখোমুখী হয়ে যাবে এইভাবে। কয়েকটি মুহূর্ত! বিরাট হাঁ করে এগিয়ে আসছে কুমীরটা। ধারাল দাঁতগুলো রোদে ঝকঝক করছে। ওই হাঁ-এর মধ্যে একবার পড়ে ফেললে আর ছাড়াবার সাধ্য নেই। কুমীরের ছোট লক্ হয়ে যায় খাজে খাজে।…পড়ে যাবারও পথ নেই।

পরেশ চকিতের মধ্যে রাইফেল তুলেছে—আজ আর একটা শয়তানকে সে সামনে পেয়েছে। ওর গলার লালচে মাংসগুলো দেখা যায়,…পরেশের রাইফেল গর্জে ওঠে। হেডি রাইফেলের সেলের মত বড় বুলেটটা গিয়ে কুমীরটার যাবার ঘুলিয়েই লেগেছে! সামনে যেন একটা বাজ পড়েছে। সারা জায়গাটায় বিরাট কুমীর চকিবাজীর মত ঘুরছে। ওর লাঙ্গটা দাপাচ্ছে—দাপাদের মধ্যে পেলে হাড়গোড় গুড়ো করে দেবে। পরেশ দৌড়ে ওর সীমানার কাছ থেকে সরে এসেছে। ততক্ষণে ঘাট গ্রাম থেকে লোকজনও দৌড়ে এসেছে মুগুর, সড়কী নিয়ে।

কুমীরটার সেই আলোড়ন কমে এসেছে। সুযোগ পেয়ে আর একটা গুলি করেছে পরেশ ওর বুকের নীচেই।

বিরাট একটা ডিঙি যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকজন ওর পায়ের ওপর উঠে লাফাচ্ছে, আনন্দে চীৎকার করছে পাগলের মত।

সেই সময় কলজারভেটার অব্ ফরেষ্টস্, মিঃ মিত্রও গিয়ে পড়েছিলেন ইন্দপেকশনে। তিনি চমকে ওঠেন কুমীরটাকে দেখে। ওজনের আন্দাজটাকে শেষ করেছে ওই বলিষ্ঠ তরুণটি।

(শেষাংশ ৮০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দিব্য বর্ণাশ্রম প্রথা

শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই সংসারকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য ভগবান দিব্য বর্ণাশ্রম প্রথা সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতা মুখে তিনি বলিলেন,

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১

—হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্মসমূহ পুরুষোত্তম-স্বভাবজ গুণসমূহদ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি-সম্ভূত সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ গুণসকল দেহী বা আত্মাকে দেহের সঙ্গে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই গুণ সকল পুরুষোত্তম-ভাবে ভাবময়ী সর্বাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। পৃথিবীতে এমন কেহই থাকিতে পারে না যাহারা প্রকৃতি-জাত গুণত্রয় হইতে মুক্ত। এই গুণসকল তখনই নির্গুণ হয় যখন উহাদের মধ্যের পুরুষোত্তম-গুণ ফুটিয়া উঠে। পুরুষোত্তম-গুণ সকল গুণে প্রকাশ হওয়ায় ফলে প্রতি গুণ অপর দুইটি 'তদ্ভূর ভূত্বা' ফুটাইয়া তোলে। এই গুণ-ত্রয়ের লীলাভূমি এই সংসারকে নির্গুণ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য এই বর্ণাশ্রম বিভাগ। দেহ-যন্ত্রের প্রতি ইন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয় সকলের সাথে এক হইয়া থাকে—বাক যখন কথা বলে, অপর ইন্দ্রিয়সকল তাহার মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া বাক-ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে, চক্ষু বা কর্ণ তখন নিজেদের জাহির করে না। অনুরূপভাবে গুণত্রয় পরস্পরের মধ্যে আত্মনিলয় করিয়া নির্গুণ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র গড়িয়া তোলে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ছাঁচে এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার নিগূঢ় উদ্দেশ্যে ভগবান বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে এই সব বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন।

যদিও সমাজের ধারণ পোষণ এবং অগ্রগতির জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের প্রয়োজন রহিয়াছে তথাপি এই বর্ণাশ্রম বিভাগ এক বর্ণের দ্বারা অপর বর্ণের শোষণ বা বর্ণবিভাগের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ স্থাপনের জন্য নয়। প্রতি বর্ণই স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং অপর বর্ণকে তাহার অপরার্ধ বলিয়া গণ্য করিবে। প্রতি বর্ণ নিজে যোগ্য হইয়া অপর বর্ণ সকলকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব শূদ্রত্ব এবং বৈশ্যত্ব পুরুষোত্তম-জীবনের এক একটা দৃষ্টিকোণ মাত্র। এই দৃষ্টিকোণে পুরুষোত্তম প্রত্যেকের ঘনিষ্ঠ প্রতিভাত হন। তিনি প্রত্যেককে প্রত্যেকের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে গলাইয়া দিয়া গুণ-কৌলীন্য এবং গুণ-বৈশ্য ঘুচিয়া ফেলেন। তখন প্রত্যেক গুণকে নির্গুণ রূপে পড়িয়া তুলিয়া এক অখণ্ড পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে লীলা বিস্তার করেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র। তিনি ব্রহ্মদেবের রূপে নমস্কৃত হইয়া দ্বিজ ব্রাহ্মণ, বসুদেবের পুত্র হইয়া তিনি ক্ষত্রিয়, নন্দ-নন্দন এবং গো-গোপসমাবৃত হইয়া তিনি বৈশ্য, রাজসূয় যজ্ঞে সকলের পা ধুইয়া তিনি শূদ্র।

যোগ্য ব্রাহ্মণ যোগ্য ক্ষত্রিয় যোগ্য বৈশ্য যোগ্য শূদ্র সমাজ সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাদের যোগ্যতার জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করিয়াছেন, কালক্রমে তাহাদের বংশধরগণ যোগ্য না হইয়াও কেবল মাত্র জন্মগত অধিকারের দাবীতে এই সকল পদ জোর করিয়া দখল করিয়া বর্ণে বর্ণে উচ্চ নীচ ভেদ স্থাপন করিল এবং এক বর্ণ অপর বর্ণকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখনই সমাজ ছাড়িতে চড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা-কুলীন হইল, ক্ষত্রিয় তাহা হইতে কম কুলীন, বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে কম, সর্ব নিকৃষ্ট হইল শূদ্র। এই বিভেদ হইতে অস্পৃশ্যতা দেখা দিল, মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতে ও শোষণ করিতে থাকিল।

ব্রাহ্মণের যোগ্যতার স্বভাবজ গুণ ও কর্মের নির্দেশ দিয়া ভগবান বলিয়াছেন,

শমো দমোস্তপ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম স্বভাবজম্। গীতা ১৮।৪২

শম দম তপঃ শৌচ ক্ষমা আর্জব এবংজ্ঞান বৈদিকজ্ঞান এবং অস্তিত্ব ভাব ব্রাহ্মণের স্বভাবজ গুণ ও কর্ম। এই গুণ ও কর্মের যোগ্যতার মানদণ্ডে ব্রাহ্মণের যোগ্যতা নির্ণীত। যাহারা শমদমান্বিত হইয়া পুরুষোত্তম নিরাকার প্রেমত্ব লাভ

করিয়াছেন এবং এই দেহেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় পৃথিবীতে অবস্থান করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য। ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচর্য আচরণের সঙ্গে আচরণ মিলাইয়া ব্রহ্মচারী এবং জিতেন্দ্রিয় হইতে হইবে, দেহ ও আত্মার শুচিতা রক্ষা হইতে হইবে, অকপট হইতে হইবে। তাহাদের বিশ্বসেবায় নিজেদের বিলাইয়া দিয়া সমাজের দুরাচার ব্যক্তিদের প্রতি কৃপাশীল হইয়া তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া সমাজকে দুরাচার মুক্তিযুক্ত করিয়া পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র গড়িবার জন্য সেবাপরায়ণ হইতে হইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণের একত্ব এবং বহুত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইতে হইবে। এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণের সুযোগ সুবিধা এবং অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। এইরূপ ব্রাহ্মণগণ পুরুষোত্তম-আদর্শের ধারক বাহক এবং পোষক রূপে নিজেরা যোগ্য হইয়া অপর বর্ণ সকলকে যোগ্যরূপে গড়িয়া তুলিবেন, ধরার ধূলিতে তুবি বৃন্দাবন গড়িয়া তুলিবেন। অন্তরা পুরুষোত্তম-আদর্শ ব্রাহ্মণের মাথায় অথবা পুস্তকে লেখা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ধরার ধূলিকে স্পর্শ করিবে না।

যাঁহারা এইরূপ গুণান্বিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁহারা পারমার্থিক যে কোন জাতিসম্ভূত হউন না কেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। পক্ষান্তরে যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া পণ্ডিত আখ্যাধারী হইয়াও বাহ্যিক, অপরের কল্যাণকামী নয়, পাপপরায়ণ, অসৎ কাজে অভ্যস্ত, তাহাকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। পণ্ডিতের মূর্খ পুত্রকে স্কুলের দাবীতেপণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিবার দাবী যেমন অবাস্তব এবং অযৌক্তিক, ইহাদেরও তদ্রূপ। তথাকথিত শূদ্রবংশে জাত ব্যক্তি যদি সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সর্ব বিষয়ে ঊর্ধ্বগামী হন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ তথাকথিত শূদ্রবংশ জাত হইলেও তাঁহার ন্যায় ব্রাহ্মণের গুণ এবং যোগ্যতা কয়জনের আছে? অনুরূপ ভাবে শ্রীনিত্যগোপালদেব এবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ব্রাহ্মণের গুণ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়াই যোগ্য ব্রাহ্মণ, সকলের পূজনীয়।

শৌর্যং তেজো ধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্। গীতা ১৮।৪৩

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ গুণ এবং লক্ষণ হইতেছে শৌর্য তেজ ধৃতি দক্ষতা যুদ্ধে অপলায়ন দান এবং ঈশ্বরভাব।

ক্ষত্রিয় হইবেন শূরের ভাবসম্পন্ন, শক্তিশালী বলবত্তরকে আঘাত হানিবার ক্ষমতাসম্পন্ন, তেজস্বী, নিজেকে ও অপরকে ধৈর্য-প্রতিরোধে সমর্থ, ধৈর্য ও দৃঢ় কর্তব্য জ্ঞান-সম্পন্ন এবং তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে কখনো প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিবেন না। তিনি মুক্তহস্তে দান করিবেন এবং ঈশ্বরভাব প্রকাশে সমর্থ হইবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্র ক্ষত্রিয়ের। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য এবং এই কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা এবং গুণাবলী তাহার স্বভাবজ। পুরুষোত্তম-আদর্শের ধারক বাহক পোষক ব্রাহ্মণ হইলেও তাহাকে কার্যাত্মক রূপ দিবার পরিবেশ এবং আবেষ্টন সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব ক্ষত্রিয়ের। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যোগ্যতার অপরার্ধ, অনুরূপ-ভাবে ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের যোগ্যতার অপরার্ধ। ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রকে পদদলিত করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের রক্তাক্ততিতে পৃথিবী নরকে পরিণত হইবে। ক্ষত্রিয়কে পরিচর্যাত্মক ভাবে বিশ্বকে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিতে ব্রাহ্মণের ন্যায় নিজকে বিলাইয়া দিতে হইবে।

কৃষি গৌক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। ১৮।৪৪

বৈশ্যের কার্য গোরক্ষা এবং বাণিজ্য, শূদ্রের স্বভাবজাত কার্য পরিচর্যাপরায়ণ হইয়া সেবা করা। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্র বৈশ্যের। বৈশ্যশক্তি সমাজের অর্থনীতির ধারকবাহক এবং পোষক। এই অর্থনীতি পোষণযন্ত্র হইলেই সমাজের উন্নতি সাধিত হয়। এই পোষণ নীতিতে অর্থকে বিশ্ব-সম্পদরূপে গণ্য করিয়া পরস্পরের তুষ্টি এবং শক্তিবৃদ্ধির মাধ্যমেই অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে। পারস্পরিক পোষণের দ্বারা সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নতি বিধান করিয়া

বৈশ্যগণের নিজেদের অবস্থার উন্নতি এবং স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিতে হইবে। সামগ্রিক শোষণ নীতিই অর্থনৈতিক উন্নতির মূল ভিত্তি। ইহা ভাগবতের এবং বর্তমান বিজ্ঞানের শিক্ষা। ইন্দ্রদত্ত ভক্ত প্রসঙ্গে ভগবান ত্রিশঙ্কু নন্দ মহারাজকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই শোষণ নীতির পরিবর্তে বৈশ্য যদি অর্থ দ্বারা অপর সকল বর্ণকে ক্রয় করিয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে সে শোষণ চরম অবস্থা আনিবে। বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের মর্যাদা না দিয়া নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তাহা হইলে সে সমাজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে। পুরুষোত্তম-আদর্শহীন বৈশ্যশক্তি ধনকে বিশ্ব সম্পদরূপে গণ্য না করিয়া এবং বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত না করিয়া ব্যর্থ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রশক্তির বিধি নিষেধ সত্ত্বেও করিলে রাজনীতি অর্থনীতিতে বিরোধ দেখা দিবে। শূদ্রশক্তিকে মর্যাদা না দিলে উৎপাদনে অশান্তি প্রভৃতি জাগিয়া উঠিবে। বর্তমানে চলিতেছে এই শোষণনীতি। আজ অর্থের নিকট সকলই বিক্রীত। সকল ষষ্ঠ মন্ত্রির ক্রিয়া চলিতেছে অর্থের পদ-রেণু বহিয়া। আজ আদর্শ-হীন অর্থ চলে, কিন্তু অর্থের অভাবে আদর্শ অচল। ধনক আজ আদর্শের কৌলীন্য কাড়িয়া লইয়াছে। আজ স্বর্ণের অঙ্গুলি হেলনে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ওঠানামা করে। কৃষি আজ স্বর্ণের কাছে অপমানিত। স্বর্ণ করিতেছে কৃষি এবং শ্রম লুণ্ঠন। বৈশ্য-কবলিত বৃটিশ শাসনে স কাড়িয়া লইয়াছে আদর্শ, কৃষি এবং শ্রমের মান। স্বাধীনতা লাভের পর স্বর্ণের মান আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

স্বর্ণের এই লুণ্ঠন ও শোষণ বন্ধ করিতে হইলে সর্বক্ষেত্রে —জমি, শ্রম ও ধনের—সমমান স্থাপন করিতে হইবে— তাহা হইলেই শোষণমুক্ত অর্থনীতি গড়িয়া উঠিবে। ভারতীয় কৃষি-প্রধান অর্থনীতিতে পূর্বকালে এই শোষণ নীতির মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্য এবং সহজ জীবনযাত্রা বিরাজ করিত। কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই স্বর্ণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায়, শ্রমের মূল্যমান এবং কৃষিজাত পণ্যের মূল্যমান স্বর্ণের সাথে বাঁধা না থাকায় সমাজ-দেহে চলিতেছে অর্থনৈতিক শোষণ এবং তাহার পরিণতি সর্বত্র শ্রেণী-সংঘর্ষ, শ্রমে অশান্তি, উৎপাদনে ক্ষিপ্ত এবং সর্বোপরি অশান্তি। স্বর্ণমান আনিয়াছে সমাজ-দেহে নানা-বিধ ব্যাধির আসার বিশ্ব জুড়িয়া পুঁজিবাদ আজ বিশেষজ্ঞ। মান বাঁধিয়া দিতে হইবে স্বর্ণের অন্তরঙ্গলবর্তন। কৃষি ক্ষেত্রেই ধনিক শ্রমিক এক। কৃষি এবং স্বর্ণের সমমান প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পারস্পরিক সহযোগের অবসান ঘটাইয়া বৈশ্য শক্তিকে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের উপযুক্ত আবেষ্টন গড়িয়া তুলিতে সমর্থ করিবে। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত স্বর্ণমানের এই প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়া বহু বৎসর পূর্বেই স্বর্ণমানকে কৃষি এবং শ্রমের মানের সাথে বাঁধিয়া দিবার সুপারিশ করিয়া গিয়াছেন।

শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি হইল পরিচর্যা করা। এই পরিচর্যাত্মক বৃত্তিই প্রতি বর্ণের মুকুটমণি। প্রতি বর্ণকেই অপর বর্ণসকলকে পরিচর্যা করিয়া যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই পরিচর্যাত্মক বৃত্তির সঙ্গে প্রতি বর্ণ যখন নিজেকে এবং অপর বর্ণকে নিজের অপরার্ধ বলিয়া বুঝিবে তখনই দিব্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সার্থক। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত যদি প্রেমধারা বিশ্বজীবনে প্রবাহিত হয় তাহা হইলে ধনিক ধনদ্বারা, শ্রমিক শ্রমদ্বারা বিশ্ব সেবা করিবে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রত্যেকেই ক্ষেত্র, প্রত্যেকেই পরিধি। কোনটাই কাহারো একচেটিয়া অধিকার নহে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রাণ ঢালিয়া সেবা করিয়া সভ্য সার্থক হইবে।

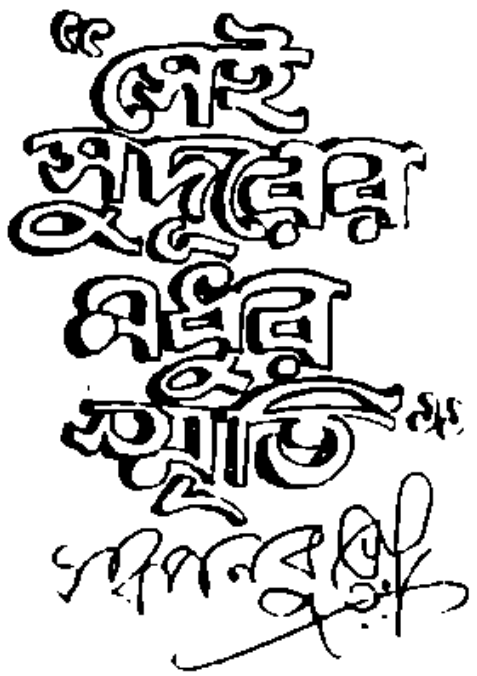

সারা গাঁয়ে রটে গেল সেই অঘটন।

জাতক নাকি সত্যি অপয়া।

নইলে বাপ ছেলের মুখ দেখতে গেল—

তার পরই বাপের প্রকাশ অসুখ—।

ডাক্তার-বৈদ্যি দিনরাত পরীক্ষা করে কইলে—

একেবারে নিবের অসাধ্য ব্যাধি!

মুখ বাঁকা করে চিকিৎসক দল পেছন ফিরে চলে গেল।

জ্যোতিষীরা নাকি পই-পই করে বারণ করেছিল—

এখন লগ্ন শুভ নয়, ছেলের মুখ এখন দেখোনা।

কিন্তু তরুণ জমিদার বাপ হেসে উত্তর দিয়েছিল,—

আমি আমার ছেলের মুখ দেখবো তার আবার অসময় শুসময় কি? বাপ কারো বাধা নিষেধ শোনে নি।

তারপরই এই বিপত্তি।

ভূমণ্ডলে তখন নবগ্রহের কি যোগাযোগ হয়েছিল—

কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না।

কোন্ সে অশুভ গ্রহের দৃষ্টিতে বাপ দেহ রক্ষা করল গণৎকাররাও তার সন্ধান দিতে পারলে না।

জাতক সেই অপয়া ছেলে।

তারই জীবনের স্মৃতি চারণ।

প্রথম স্মৃতি যে মধুর নয়—সে কথা পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছেন।

সেই যে কিছু মাসের ছাসির গান আছে না?

"পায় ও জন্ম না কেউ বিয়াদবারের বার বেলা
জন্মালে পারবে না ক' ঠেকাতে ভাই তার ঠেলা"।

অবশ্যি জাতক বিয়াদবারের বারবেলা জন্মায় নি।

একটু বড় হয়ে তার মায়ের মুখেই সেকালের চালচলন দেখে জানতে পেরেছিল—রবিবার ১৯ কার্ত্তিক, বেলা দশটায় ১৩০১ সনে তার জন্ম।

এই জন্মের জন্য ঢাক-ঢোল বাজে নি। রসুন চৌকি বসে নি। মঙ্গল শঙ্খও হয়ত বাজে নি। নিতান্ত অনাড়ম্বর এই শিশুর জন্মগ্রহণ।

সেকালে বাঙলাদেশের গ্রামে এ পাড়ায় ও পাড়ায় বিয়ে হত।

জাতকের মা-বাবার বিয়েও অনেকটা ঠিক সেই ধরণের। ময়মনসিংহ জেলার লাকহাইল গ্রামের পূর্ব পাড়া আর পশ্চিম পাড়া নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত।

পূব পাড়ার তরুণ জমিদার দীনবন্ধু নিয়োগী চৌধুরীর বাড়ীর নাম মুন্সী বাড়ী। বারুদ রমরমা গমগমা দরোজা। তিন তাই কর্তা। বাড়ীর সামনে নহবৎ খানা। সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় নহবৎ বাজে। ভেতর বাড়ীতে যেতে হলে অনেকগুলি দেউড়ি পার হয়ে যেতে হয়। নহবৎখানা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে বিরাট পুষ্করিণী। তার উত্তরে শিব মন্দির। সেখানে এক ফটক। সেটা পেরিয়ে গেলে দপ্তরখানা ছাড়িয়ে আর এক ফটক। ওখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি ভোরণদ্বারের মাথায়। সেই ফটক পেরিয়ে গেলে মস্ত বড় ঘরের প্রাঙ্গণ। মুন্সীবাড়ীর গোপীনাথ দাসেদের নিত্য পুজো পান।

এ ছাড়া দোল, দুর্গোৎসব, বাসন্তীপুজো, সরস্বতীপুজো কার্ত্তিক পুজো নিযুক্ত পুরোহিত সমাধা করে।

এই প্রাঙ্গণে এক কালে মুকুন্দ দাসের যাত্রাও হয়েছে। সারা গাঁয়ের মানুষ এসে দেখে ধন্য ধন্য করেছে।

বাড়ীর অন্দরে যেতে আরো একটা ফটক পার হয়ে যেতে হবে। মুন্সী বাড়ীর দোতলা দালান। দোতলা

বাড়ী গাঁয়ে আর একটিও নেই।

এই তরুণ জমিদারের কনে হচ্ছে পশ্চিম পাড়ার আনন্দ নাথ সেনের একমাত্র কন্যা—ভবতারিণী দেবী। আনন্দ নাথ সেকালে প্রগতি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সেই আমলে গ্রামে বসেও নিত্য ডায়েরী লিখতেন। তাঁদের জমিদারীর বেশীর ভাগ ছিল দিনাজপুর অঞ্চলে। ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত না হয়েও তিনি কেশব সেনের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। গ্রামে বসেও বহু বই আনিয়ে পড়তেন। তাঁর সত্যবাদিতা আর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারে গ্রামের সকলেই তাঁকে আন্তরিক সম্মান করতেন।

তাই যখন আনন্দনাথ সেনের একমাত্র কন্যার সঙ্গে গ্রামের পূর্ব পাড়ার ঘুলীবাড়ীর তরুণ জমিদার দীনবন্ধুর বিবাহ সম্পন্ন হল তখন গ্রামের মানুষেরা পুলকিত মনে এই দুই ভবনেই নিমন্ত্রিত হয়ে পাত পেড়ে মহা আনন্দিত মনে বর-কনেকে আশীর্বাদ করে ঘরে ফিরে গেল।

সবাই বললে, এ একেবারে রাজযোটক—যাকে বলে শিব-দুর্গার বিয়ে।

গ্রামের প্রায় সকলেরই সচ্ছল অবস্থা।

বৈদ্য প্রধান গ্রাম। নিয়োগী চৌধুরীরা—ধানকল।

সেনেরাও বৈদ্য—সবাই বৈষ্ণব ঘর।

গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে।

গ্রামের লোকেরাই চাঁদা করে চালায়।

কিছুদিন পরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল।

জনসাধারণের চাঁদায় একটি কালীবাড়ীর পূজো সম্পন্ন হয়। বছরে একবার মেলা বসে। তাতে অন্যান্য অঞ্চলের দোকান পশারীরা এসেও যোগদান করে।

গ্রামে একটি সাব-পোষ্টাপিসও আছে।

বাইরে থেকে চিঠি পত্র আসে—সঞ্জীবনী হিতবাদী কাগজও ডাকে আসে। গ্রামের মানুষরা সেই কাগজ পড়ে বাইরের জগতের খবর জানতে পারে।

গ্রামে কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বসতি আছে।

গ্রামের সীমানার চারদিকে মুসলমানদের বাস। তারা নিরীহ ও শান্ত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বেশ সদ্ভাব আছে।

হিন্দুদের দুর্গাপূজোয় মুসলমান ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে এসে প্রসাদ গ্রহণ করে।

আবার মহরমের সময় হিন্দুবাড়ীগুলি থেকে চাঁদা দেওয়া হয়। হিন্দু বাড়ীর উঠোনে এসে পাশীর মুসলমানেরা মহরমের লাঠি খেলা দেখায়। নতুন মুড়ি, গামছা, চিড়ে-মুড়কি কেনী বাতাসা উপরি লাভ করে।

এমনি ভাবে শান্তিতে গ্রামের দিন কেটে যায়।

গ্রামের আশে-পাশে জোলাদের বাস।

তারা দিন রাত তাঁতের সাড়ী বোনে।

টাঙ্গাইলের তাঁতের সাড়ী সেকালে বিখ্যাত ছিল। জোলাদের বোনা সেই সব সাড়ী ঢাকা ও কলকাতায় চলে যেত। ব্যাপারীরাই এই ব্যবস্থা করত।

জোলাদের যে খুব লাভ থাকত তা মনে হয় না। তবে কষ্টে সৃষ্টে তাদের সংসার চলে যেত।

এই গ্রামে কলুদের চালানো ঘানি ছিল। তাতে সরষে পেষাই করা হত। তার ফলে গ্রামের লোক খাঁটি সরষের তেল পেতো। সীতানাথ গোয়ালা খাসা ঘি তৈরী করত। সে ঘিয়ের ভাঁড় উপুড় করে ধরলে এক ফোঁটা ঘি পড়ত না।

এই গ্রামের মিষ্টান্নের ব্যাপারে বৈশিষ্ট্য ছিল চমচম্ তৈরী করা। সাকরাইলের চমচম্ পরবর্তী যুগে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এখন কলকাতা ও ঢাকাতেও সেই চমচমের অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চমচম্ প্রথমে আবিষ্কার করে এই সাকরাইল গ্রামের এক হালুইকর। সাকরাইল গ্রামের গোয়ালারা খাঁটি গব্য ঘৃত তৈরী করতে পারত। সেই ঘি বাড়ীতে এনে, কিম্বা পাতে গরম ভাতের ওপর ঢেলে দিলে এমন চমৎকার গন্ধ বেরুতো তার বুঝি তুলনা নেই। আজকের দিনে আর সেই খাঁটি গব্য ঘৃত পাওয়া যায় না। দেশ থেকে সে জিনিস একেবারে উবে গেছে।

এইবার মাছের কথা বলা যেতে পারে।

সাকরাইল গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে দু'তিনটি করে

পুকুর ছিল। সেই পুকুরে অঢেল মাছ পাওয়া যেত। বাবুরা সখ করে বড়শীতেও মাছ ধরত। গাঁয়ে যখন বর্ষার জল ঢুকত তখন অঢেল মাছ লোকে ধরত। পল, বৈষা, ট্যাটা ছোট জাল প্রভৃতি মাছ ধরতে ব্যবহার করত। রাত জেগে- মশাল জ্বালিয়ে গাঁয়ের সবস্তরের মানুষ এই মাছ ধরার কাজে এগিয়ে আসত। এ ব্যাপারে ধনী দরিদ্র বাছ-বিচার করা হত না।

গ্রামে বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত।

আর সেই সব পার্বণে গাঁয়ের আবালবৃদ্ধ বনিতা যোগ-দান করত। গাঁয়ের ছেলের দল কখনো পয়সা দিয়ে ফল-ফলারি কিনে খেত না। এই গ্রামে প্রচুর আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, জামরুল, লিচু, গোলাপ জাম প্রভৃতি পাওয়া যেত। ছেলেরা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাই যোগাড় করে দিব্যি ফলার করত। আষাঢ় মাসে রথের সময় লটকা নামে এক রকম ফল পাকত। টক্ টক্ মিষ্টি মিষ্টি। এই লটকা ছেলেদের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। এই গাঁয়ের এক অঞ্চলে বেতের বন ছিল। সেই কচি বেত কেটে এনে বেতের আগা দিয়ে বাড়ীর গিন্নিরা ডেঁতো ডাল রান্না করত। খুব তার তুলনা নেই। এই ভাবে শিউলী পাতা দিয়ে তেঁতো ডাল রান্না করা হত। কচি কাঁঠাল দিয়ে যে ঘেঁচোর রান্না হত তা মাংসের চাইতেও উপাদেয় হত। বিভিন্ন বাড়ীর গিন্নিদের রান্নার খুব সুনাম ছিল। কোনো বাড়ীতে যদি বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিম্বা শ্রাদ্ধ হত তবে বিভিন্ন বাড়ীর গিন্নিরা পাছ-কোমর বেঁধে নিজেরাই রান্নার কাজে লেগে যেতো। সে ছিল এক সত্যিকারের মহোৎসব।

কোনো বাড়ীতে যদি নতুন জামাই আসতো, তবে নানা বাড়ীর গিন্নিরা জুটে নানারকম মুখরোচক খাদ্য তৈরী করত। কার খাবার কি রকম হয়েছে—তাই নিয়ে আবার প্রতিযোগিতা চলত।

কোন অনুষ্ঠান কিম্বা ভোজের ব্যাপারে গ্রামশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করতে হত। এ ব্যাপারে কাউকে বাদ দেয়া চলত না। গ্রামে এক পণ্ডিতমশাই ছিলেন তাঁর নাম তীর্থবাসী। তিন পুরুষ ধরে তিনি লেখাপড়া শেখাতেন। সব বাড়ীতেই তাঁর বাঁধা নিমন্ত্রণ ছিল। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

গ্রামের মাইনর স্কুলের সামনে নয়াবাড়ীর বিল ছিল। তারই ধারে একটা লম্বা মাঠ ছিল।

সেই মাঠে প্রতিদিন বিকালবেলা গাঁয়ের ছেলের দল হাডুডু আর গোল্লা-ছুট খেলত। তখনো দেশে-গাঁয়ে ফুটবল খেলার প্রচলন হয়নি। তাই সেই খেলা নিয়েই ছেলেরা মেতে থাকত।

জাভেদ জন্মেছিল তার মামা বাড়ীতে।

উঠোনে জানালা আঁতুর ঘর তৈরী করা হয়েছিল।

তখনকার দিনে গ্রামদেশে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল। বসত বাটি কিম্বা বসত ঘরকে কোনো মতেই আঁতুর ঘর করা চলত না। জাভেদের একটি বড় ভাই ছিল—তার নাম রাখাল বন্ধু নিয়োগী। জাভেদের নাম রাখা হয়েছিল অখিলবন্ধু নিয়োগী।

জাভেদ যে ভাবে মামাবাড়ীতে মানুষ হয়ে উঠতে লাগল তার একটা বিবরণ দেয়া প্রয়োজন।

জাভেদের দিদিমা এই ছোট্ট শিশুটিকে তাঁর আদর আর যত্ন দিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন। তিনি যেন পলকে প্রলয় দেখতেন। সেই যে কথায় বলে না—মাথায় রাখলে উকুনে খাবে, আর মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে খাবে—দিদিমার সেই ভয়। শিশুকে কোলে রেখে স্বস্তি পান না। সব সময় চোখে চোখে রাখেন। একমাত্র আদরিণী মেয়ের অনাথ শিশু, তাই আদরটা একটু বেশী। দিদিমার চোখে নাভি ছুটি যেন কানাই আর বলাই।

এ ছাড়া আরো একটি ঘরের কি রাখা হয়েছিল—শিশুদের খাওয়াতে স্নান করাতে আর কোলে কোলে মানুষ করতে। এই ঘরের কাম করনীর নাম ছিল—দাদি বাগী। সবাই তাকে ওই নামেই ডাকত। শিশুদের জন্য দাদী বাগীর অন্তরে যেন এক স্নেহ ধারা লুকোনো ছিল। দলতে পাকাতে বসেও শিশুকে কোনোমতে কোল ছাড়া করত না।

ঘর রাজ্যের ছড়া বলা, আকাশের চাঁদকে ডেকে দুটো দেয়া—সব দাদী মাসীর কাজ।

আর এক বাইরে কাজের লোক ছিল—তার নাম হরি দিদি। সে বাইরের কাজ করত আর বাসন মাজত।

এই সংসারে এক উড়িষ্যাবাসী পাচক রান্না করত। তার নাম আত্মারাম ঠাকুর।

কালো দৈত্যের মত চেহারা ছিল এই আত্মারাম ঠাকুরের। দারুণ পরিশ্রম করতে পারত এই আত্মারাম ঠাকুর। সন্ধে বেলা গণগণে উনুনের আঁচে সে যখন বাপা-দাপি করে রান্না করত, আগুনের আঁচে তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত, আর তাকে সত্যি দৈত্যের মত দেখাতো।

কিন্তু এই আত্মারাম ঠাকুরের মনটা ছিল ভারী কোমল। গল্প আর রূপকথা বলে শিশুদের ভুলিয়ে রাখতে তার জুড়ি ছিল না। শিশু না খেয়ে ঘুমে ঢলে পড়বে সেই ভয়ে আত্মারাম ঠাকুর তার চোখ মুখ ঘুরিয়ে নানা আজগুবী কাহিনী শোনাতো শিশুদের।

আত্মারাম ঠাকুর কখনো নাক দিয়ে গিয়ে ঘসনা পিষে আনত, কখনো ছুটে গিয়ে কড়াইতে তেল ঢেলে দিত—কখনো মাছের মুড়ো সেই ফুটন্ত তেলে ছেড়ে দিত—আবার খুন্তীটা উঁচু করে ধরে কি দেখতো—গল্প বলার চাইতে আত্মারাম ঠাকুরের দৈত্যের মতো এই রকম দাপা-দাপি কম আকর্ষণের জিনিস ছিল না।

এই আত্মারাম ঠাকুর তার ভীষণ দর্শন চেহারা, অক্লান্ত ছুটোছুটি করবার ক্ষমতা ও রূপকথা বলবার খুন্তীধারার শিশু-চিত্তকে একেবারে জয় করে নিয়েছিল। আত্মারাম ঠাকুরের হাতের রান্নাও ছিল মুখরোচক।

ওদিকে দাদিমাণী নানাভাবে শিশুকে কত কথা জানাবার সুযোগ করে দিচ্ছিল। তা যেমন বিচিত্র, তেমনি শিশুমনে নানারূপ কল্পনা জাগাবার ক্ষেত্রে অভিনব ও মজাদার।

দাদিমাণী বলত,—রোজ বিছানে ঘুম থেকে উঠে যদি পদ্মফুলের দেখা মেলে, আর তাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করা যায় তা হলে সারাটা দিন খুব ভাল যাবে। ঘুম থেকে উঠেই যদি শুক আর বাদুর এক সঙ্গে দেখা যায়—তা হলেও দিনটা শুভ। পুকুরে গিয়ে মুখ ধোবার সময় যদি মাছের লেজ চোখে পড়ে তা হলে আর ভাবনা নেই। সারা দিন ভালো যাবেই।

পল্লী অঞ্চলে খুব ভোর থেকে কত রকম পাখীর ডাক শোনা যায়। সেই ডাকগুলির কি মানে তাও দাদি মাসীর ব্যাখ্যা থেকে শিশুরা জানতে পারত।

ভোরের পাখীর কূজন, শান্ত নীরব দুপুরে এক ঘেয়ে ঘুঘু ডেকে ওঠে, কিম্বা সন্ধ্যা রাতে শেয়ালের ওঙ্কা ওয়া ধ্বনি অথবা গভীর রাতে কুকুরের ডাক—এদের প্রত্যেকের সঙ্গের একটা করে অর্থ আছে। গোধূলি বেলায় শুক বাদুর যখন হাসা করে ঠাক দেয়—তখনো তার একটা অর্থ আছে। নিঝুম সন্ধ্যায় যখন 'কুটুম এলো,' অথবা 'একটি খোকা ছোক্' পাখীর ডাক শোনা যায়—তখন তার মানে আরো শুকতর। গভীর রাতে সারা গ্রাম যখন ঘুমে নিঝুম তখন ফুত-ফুত্তুম পাখীর ডাক শুনলে আপনা থেকেই শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ ছাড়া আরো ভয়ের কথায় দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে—দাদা বাড়ীর বেল গাছটার একটা পা—আর উই মুরের আম্, স্যাওড়া গাছের ডালে একটা পা রেখে যখন ব্রহ্মদত্যি দাঁড়ায় তখন সমস্ত হাতোল চুপ মেরে যায়। তখন কোনো কথা বলতে হয় না। শুধু আপন মনে মন্ত্র জপ করতে হয়—

ফুত আমার পুত পেত্নী আমার কি
রাম লক্ষণ বুকে আছে করবি আমার কী ?

খুব ভোরে উঠে দাদিমাণীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ী থেকে ফুল তুলে আনতে হত। সেই ফুল দিয়ে কখনো মালা গাঁথতে হত, কখনো মাটির শিব বা কোন ঠাকুর তৈরী করে তার পূজো করতে হত।

রাত্রিবেলার যত অদ্ভুত কল্পনা, যত নিশাচর পাখীর ডাক, যত ব্রহ্মদৈত্যি, শাকচুন্নি আর পেত্নীদের মরা কান্না প্রভাতের প্রখর আলোতে একেবারে দূর হয়ে যেতো। মনে হত আলোকের এই বর্ণা ধারায় সারা জগৎ যেন অবগাহন করে উঠত। মন-প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠত। মনে হত সারা সংসারে যেন দুঃখ-কষ্ট নেই—কোনো মালিন্য নেই। উষার শুভ্র আলোকে সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের আর রেখা মনের কোণে বাসা বাঁধতে পারত না। চারিদিকে পাখীর কূজন মনে এক আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিত—

[চলবে]

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী ১৯৫৬

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীনিত্যগোপাল যেদিন পুরুষোত্তম রূপে পদার্পণ করিয়াছেন, সেদিন হইতেই শুদিন দুর্দিন, দিন ক্ষণ সব একাকার হইয়াছে। তিনি একাধারে ব্রহ্ম মায়া, Satan ও God. তিনিই দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্রাচার্য। তিনি মঘা, ত্রাহস্পর্শ, শনি ও রাহু। আমার জীবন তো দুর্যোগের মধ্য দিয়া সুযোগ লাভ করিয়াছে। 'সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—সকল কালে আমার অনুস্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। দিন ক্ষণ বাছিয়া যুদ্ধ বাঁধে না, দিন ক্ষণ বাছিয়া যুদ্ধই বা করা যায় কেমন করিয়া? যুদ্ধই তো দুর্দিনের দ্যোতক। তাহার আবার ভাল দিন ক্ষণ কি? মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে। যুদ্ধের যাত্রাই পুরুষোত্তম-যাত্রা। পুরুষোত্তমকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরাদি তাহাই করিয়াছিলেন। এই বিশ্বে কোন গ্রহই একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ নয়। সবই যে পুরুষোত্তম-সত্তা। শনি-রাহু সবই পুরুষোত্তম-সত্তা। আমি তাঁহারই উপাসক। কর্মীর জীবন, জ্ঞানীর জীবন বা ভক্তের জীবন যাপন করিতে দিন ক্ষণ মানিয়া চলা সম্ভবই নয়। যাহারা চরমে বিভূতির উপাসক, তাহারাই দুর্দিন বাদ দিয়া সুদিনের, যারা ছাটিয়া ব্রহ্মের পূজা করেন। আমি পুরুষোত্তম-ভজনের জন্য পথে বাহির হইয়াছি। রেণু ৭টায় বাগুইআটি যায়। কাল 'ত্রাহস্পর্শ', প্রতিভা যেন না যায়—ইহা বলিতে সত্যেন মাস্টার আসে। পুরুষোত্তম-যাত্রায় দিন ক্ষণ মানে না, বিচার আলোচনা হয়। রেণু ৭টায় ফেরে। ঘাড়ে আসিয়া বাগুইআটিতে রেণুকে খবর দেয় টিউবওয়েল তোলা হয় নাই। ভিতরে কাটিয়া গিয়াছে, যদি তুলিতে পারে কাল আসিবে। নিষেধই দেওয়া হইয়াছে। — বিনয় (আমার স্বামী) আসিয়া মুটের চার্জ দিয়া যায়। ২০শে মার্চ

'দিন দেখা'র বহু পদ্ধতি—জটিল, সহজ, সহজতর। পঞ্জিকা অবলম্বনে দিন দেখিতে হইলে তাহাতে রাশি নক্ষত্র অবশ্য থাকা চাই। শুধু পঞ্জিকায় দেখায় কুলায় না। ইহা জটিল। পরে দিন জানা হইতে যায়। তাহাতে ত্রাহস্পর্শ দিনেও যাইতে যোগ আসে। পরে উষা যাত্রা। শ্বাস প্রশ্বাস লক্ষ্য করিয়া যাত্রা। সহজতম' ভোরে পড়ে যা। মন চলে তো যা'। কাজেই জীবনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে বিধির যখন বদল হয়, তখন কি বা একান্ত ভাল, কি বা একান্ত মন্দ? মনের যদি তীব্র বাসনা থাকে যাইবার জন্য, ঘটনা যদি গুরুতর হয়, তখন বিধির কোনও মূল্য নাই। কর্মবহুল জীবনে পুরুষোত্তম-যাত্রাই উত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠতম। 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'—মহা ব্যাপ্তি জটিল কুটিল সংসারে কর্মীর পক্ষে অন্য কোন যাত্রা সম্ভব নাই। যাত্রি পুরুষোত্তম শুধু, দিন ক্ষণ নয়। পুরুষোত্তমই আমার সকল হু ও হু। নিত্যগোপাল অমুক্ত হউন। সত্যেন মাস্টার আসে যাবেন ও বিষ্ণুপদকে দেখিবার জন্য। তাহারা আসে ৯টায় পর। আজ ত্রাহস্পর্শ। প্রতিভা যাবেন বিষ্ণুপদসহ আজই বাগুই-আটি যায়। ১১টায় রেণু ট্যাকসী নিয়া আসে। আমিও ইহাদের সঙ্গে ১০।০টায় যাই। ১১টায় রেণুসহ ইহারা রওয়ানা হইয়া যায়। রেণু ফিরিয়া আসে রাত্রি ৮টায়। ইটের ঘরের মধ্যেই ইহারা রাত্রিতে থাকিবে। জিতেন বাবু সকাল হইতে ১২টায়, আবার ২।০টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঘরের জন্য খাটিতেছেন। জলের বন্দোবস্ত রেণু করিয়া দিয়া আসিয়াছে। ভগবানের রাজ্যে সেবা-বুদ্ধি থাকিলে অসুবিধা কি? আকাশের তলে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে দাঁড়াইব, ইহাই ছিল জীবনের লক্ষ্য। 'দল' আমি চিনি না, দল করিতে পারিব না। বাঙ্গালী 'দল' ছাড়া চলিতে পারে না। বাড়ী ঘর ছাড়া যাহারা তাহারাও এখানে আসিয়া 'দল' করিতেছে। সব গিয়াছে, 'দল' যায় নাই। ঠাকুর, দল হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি তোমাকে চাই। বাগুইআটিতে 'অশ্বিনীনগর'

নাম লইয়া বল। ঠাকুর, এইবার তোমাকে বুকে লইয়া বাগবাজারে থাকিতে চাই। উহা বিশ্বের কেন্দ্র হউক। উপেন বসু ৪টায় আসে। ৩টি কমলা আনে। **২১শে মার্চ**

বৃক্ষ যেমন মূল দিয়া মাটি হইতে রস গ্রহণ ও আলো-বাতাস হইতে হজম করিবার উপাদান লাভ না করিলে মরিয়া যায়, আমরাও যদি তেমনি ঈশ্বরের পুরুষোত্তম বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর হইতে রস ও বহিঃপ্রকৃতি হইতে পরিপাক করিবার শক্তি আহরণ না করিতে পারি, তবে শুকাইয়া মরিয়া যাইব। আমি সন্দুল, পুরুষোত্তম মূল, আমার আশ্রয়ও পুরুষোত্তম-মূল হইতে চায়। আমার আশ্রয় মূলত্বের বাহ্যী নয় বলিয়া উহা অহংকৈন্দ্রিক নয়। আমার ধাত্রী দুর্যোগের, বলদবাবে আশ্রয় করিয়াছিলাম, হয় নাই। এইবারও তো যাইব। ঠাকুর জানেন। আমার আবার সুদিন দুর্দিন কি? আমার ধাত্রী স্বয়ংই ব্রাহ্মস্পর্শে। তিনের ধারা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ধারা—আমার জীবনের বহু অর্থাৎ দিনগুলি পুষ্ট হইয়া আছে। আমি তাঁহাদের কোলেই আছি। সাংসারিক লোক ইহা চায় না। এ যে নির্গুণ সত্তার স্পর্শ! অহঙ্কার হয় সাত্ত্বিক, নয় রাজসিক, নয় তামসিক। যাহা অহংকৈন্দ্রিক, তাহাই সগুণ। পুরুষোত্তম নির্গুণ, তাঁহার আশ্রয়-বর্ণ-কর্ম সব নির্গুণ। যাহা হয় এই ধারা হইবে। তোমার প্রতিষ্ঠার এই শেষ প্রচেষ্টা। সত্তোন দুই বেলা আসে। রেণু ১০টার পর যাক, সাকেশ্বরী, বাসন্তী বাইসিং ও পুরাণ প্রেস হইয়া বাগবাজার যায়। সেখানে প্রসাদ পায়। এখানে ফেরে ৭টায়। ওখানে কোন অসুবিধা হইতেছে না। ফুলতিবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সোমবারের সভার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। জিতেনবাবুকে ঘরের বাবদ ২০০ টাকা দিয়া আসে। সুব্রত আসে। টিউব-ওয়েলটা নাকি ৩ ফুট উঠিয়াছে। উঠানো যাইবে আশা করা যায়। পুরাণ প্রেস বলে ৩৪ মাসের টাকা জমা রাখিতে হইবে। অসম্ভব। বিশ্বাস যাহারা করিতে পারে না, তাহাদের সঙ্গে কাজ করা যাইবে না। বীরেনবাবুকে (আর্থিক জগতের) উজ্জ্বলতারও পাইবার পূর্বেও টাকা দিয়াছি। সিনিয় ব্রহ্মচারীর সঙ্গে কথা বলিয়া আনন্দময়ী আই প্রেসেই দিব।...গ্রামের কল্যাণ ব্যাহত হইবে। মানুষের চেয়ে কি নাম বড়? **২২শে মার্চ**

বর্ণাশ্রম জোর দিয়াছে quality-র উপর, যোগাতার উপর, শুচির উপর; ভাগবত ধর্ম জোর দিয়াছে quantity র উপর, অশুচির উপর, অশুচির অন্তরে প্রভাব জাগ্রত করার উপর। বর্ণাশ্রম তাই যোগ্য অযোগ্যের ভিতর এক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। যোগ্যেরা অযোগ্যদের উপর কর্তৃত্ব করে, অযোগ্যের মানুষ করিল না। ধীরে ধীরে অযোগ্যদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগ্রত হইল। বিদ্রোহী অযোগ্যদের পক্ষে দাঁড়াইল ভাগবত ধর্ম মানুষ করিবার দায়িত্ব লইয়া। বর্ণাশ্রম হইল প্রজ্ঞাযোগীদের ব্যবস্থা। ভাগবতধর্ম হইল ভক্তদের ব্যবস্থা। দুই-ই একদেশদর্শী। ভাগবতধর্ম গ্রহণকারীরা কিন্তু সংহত হইতে পারিল না, বর্ণাশ্রমবাদীদের হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল। বর্তমানে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যরাই অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলন করিতেছে, অস্পৃশ্যেরা নয়। ভাগবত ধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছে বর্ণাশ্রম, বর্ণাশ্রমে ভাগবত ধর্ম! কেহই একা সমাজ সংগঠন করিতে পারিবে না। চাই দুইয়ের সমন্বয়, প্রজ্ঞা-ভক্তির সমন্বয়, শুচি-অশুচির সমন্বয়। কবিদের শুচির সাধনা না মিলে ভাগবত ধর্মে পচন আসিবেই। আসিয়াছেও তাই। ভাগবত ধর্ম mob এর, জনতার ধর্ম, বর্ণাশ্রম chosen few-এর ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ-শিব দুইয়ের সমন্বয় করিয়াছেন। শ্রীবিভাগোপাল তাহারই দিব্য ছবি। দ্বিতীয় রায় সকালে ও রাত্রি ৮টার পর আসে। কাল ১টার পর বাগবাজার যাইবার কথা ছিল, তাহা হইবে না বলিতেই ৮টায় আসে। সত্তোন শাস্ত্রী সকাল বিকাল আসে। রেণু রাইটার্স বিল্ডিং ও সিনিয় ব্রহ্মচারীর ওখানে ঘুরিয়া ৪টায় ফেরে। ব্রহ্মচারী আগামী বৃহস্পতিবার আসিলে তাহার সঙ্গে প্রেস সম্বন্ধে শেষ কথা হইবে। নকুলেশ্বর চট্টোপাধ্যায় আসেন ৪টায়। Divine psychology দ্বারা আমাদের মনস্তত্ত্বকে বদলাইতে হইবে। ইহাই হইল দিব্য রূপান্তর। দিব্য রূপান্তরের একটী মনস্তাত্ত্বিক ছবি না থাকিলে পরিবর্তনের সাধন চলিবে কেমন করিয়া? কৃষ্ণ-লীলায় এই ছবি ফুটিয়াছে। রেণু ক্যাম্প খাটটা লইয়া আসে। টিউবওয়েলের কি হইল জানা গেল না।

২৩শে মার্চ (ক্রমশঃ)

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(তিন)

এতোক্ষণ চাঁদ ছিল গ্রহগ্রস্ত। এখন তা কেটেছে। একটা গাঢ় পর্দার আড়াল থেকে চাঁদ এখন বেরিয়ে এসেছে। হাসছে, নবদ্বীপের মাথার উপর থেকে। পথে-ঘাটে তাই জ্যোছনার ঢল।

গঙ্গায় বেজায় ভীড়। গ্রহণ শেষে গঙ্গায় এসেছেন পুণ্যার্থীরা। স্নান করছেন। মুখে 'হরি বোল' বলছেন। কারো বা উচ্চারিত মন্ত্রে গঙ্গার বাতাস মুখরিত।

এটা ১৪০৭ শকের ২৩শে ফাল্গুন বা ইংরেজী ১৪০৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর কথা।

নবদ্বীপের বাসিন্দা এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। নাম জগন্নাথ মিশ্র। কেউ বলে পুরন্দর মিশ্র।

এই জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে হঠাৎ হুলুধ্বনি উঠলো। শাঁখ বাজলো।

গঙ্গা স্নান থেকে কিরতি পথে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়লো মিশ্রের বাড়ীর সামনে ?

বললে, 'কি গো, ব্যাপার কি ? এ সময়ে হুলুধ্বনি কেন ? শাঁখ বাজলো কেন ?'

ব্যাপার আর কিছু নয়। মিশ্র-পত্নী শচী দেবী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন। তারই ইঙ্গিত এ হুলুধ্বনিতে। শাঁখের শব্দে।

লোকে বললে, 'বেশ, বেশ। এ সন্তান বড়ো ভাগ্যবন্ত হবে গো, মস্ত ধার্মিক হবে।'

শচী দেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী। ভট্ট-জ্যোতিষী। চারদিকে তার নাম।

সেই নীলাম্বর চক্রবর্তীও ছক কেটে গুণে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লক্ষণ সবই ভাল। বিরাট পণ্ডিত হবে এ ছেলে। মস্ত ধর্মপ্রচারক হবে। এ থেকে ধরার উদ্ধার হবে।'

শুনে জগন্নাথ মিশ্রের মনে একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। আহা, পুত্রের পিতা হলে কোন্ বাপের না আনন্দ হয় ! পুত্রের ভবিষ্যতের কথা শুনে জগন্নাথ মিশ্রের মনেও তাই আনন্দ।

বিশ্বরূপ।

জগন্নাথ মিশ্রের আগের একটি ছেলে আছে, বিশ্বরূপ, এ ছেলের নাম বিশ্বম্ভর।

বিশ্বম্ভর নাম রাখলেন নীলাম্বর চক্রবর্তী।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর ধারণা হয়েছিল, এ ছেলে সামান্য নয়।

এ ছেলে মস্ত বড়ো হবে। বিশ্বকে সে ধারণ করবে। তাই তার নাম বিশ্বম্ভর।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিলে, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো, ঠিকই তো। অমন নাম না হলে কি আর এ-কে মানায় ? বিশ্বখ্যাত যে হবে, তার তো বিশ্বম্ভর নামই ঠিক।'

শচী দেবী নিজে যেন কি ভাবলেন। শুধু বিশ্বম্ভর নামেই তিনি খুশী নন। ছেলের আরও একটি নাম চাই। পোষাকী নয়, ডাক নাম। নামকরণ উপলক্ষে মিশ্রের বাড়ীতে অনেক মহিলা এসেছিলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী, শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। সীতাদেবী বলেন, 'বিশ্ব-ভরণ তবে অন্ন, কাজেই ছেলের নাম রেখে নিমাই।'

'তা মন্দ কি ?' কথার সঙ্গে কথা যোগ করলেন

মালিনীদেবী। বললেন, 'নিম তেঁতো। নিমের নামে ছেলের নাম রাখলে অপদেবতা-কুদেবতাদের চোখ পড়বে না ছেলের উপর। পর পর আটটি মেয়ে হয়েছে। পরে এসেছে বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের পরে এই নিমাই। এ ছেলের নাম নিমাই থাক। তেতো নাম কু-দেবতাদের মনে ধরবে না।'

শচীদেবী তাঁদের কথাই মেনে নিলেন।

'আহা, দেখো গো, দেখো গো, নিমাই কি ধরেছে? ধান, খড়ি, সোনা, রূপো কতো কি ছড়ানো। কিন্তু ওগুলির দিকে একবার ফিরেও তাকাল না নিমাই। সোজা গিয়ে ধরলে কি না ভাগবতের পুঁথিখানি!'

নামকরণের পর ধরার পালা। ও শিশু কোঁক কোন্ দিকে হবে তা দেখবার জন্যেই এ 'ধরা'র আয়োজন।

নিমাই-এর বেলায়ও সে আয়োজন হয়েছিল।

ঘরের মেঝেতে সোনা, রূপো আরও নানা রকমের জিনিষ ছড়িয়ে রাখা হলো। কাকনের পাশে অকিঞ্চিন।

জগন্নাথ মিশ্র বললেন, 'বাবা নিমু, একবার ধর দেখি কি তোমার ধরতে মন চায়।'

নিমাই হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ভাগবতের পুঁথিখানি ধরলে। ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সব উল্লাস ক'রে উঠলেন। একজন বললেন, 'ওগো, কে কোথা আছো গো, একবার এসে দেখে যাও, নিমাই ভাগবত ধরেছে। সোনা-রূপো ছেড়ে ভাগবতে হাত দিয়েছে।'

বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দৌড়ে এলেন ঘরে।

কেউ কেউ বললেন, 'নীলাম্বর চক্রবর্তি কি আর মিছে কথা বলেছেন? এ ছেলে বড় মানুষ হবে। মস্ত বড়ো মানুষ। একদিন এর নামে ভুবন ভরবে।'

কেউ বললেন, 'এ ছেলে পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব হবে গো, নইলে কি আর সব জিনিষ ফেলে ভাগবতে হাত দিয়েছে?'

শচীর মনে আনন্দ। জগন্নাথ মিশ্রের মনে আনন্দ। আনন্দ অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের মনে।

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ এখন আনন্দ-নিকেতন।

(৩)

নিমাই-এর রূপ অপরূপ।

গায়ের রং কাঁচা সোনা। মাথায় কুঞ্চিত মনোহরণ কেশ। দু'টি আঁখি দীঘল—মায়াময়। যে দেখে তারই ভালো লাগে নিমাইকে। ভালো লাগে বলেই ভালোবাসে।

ভালোবেসে ডাকে, 'নিমাই, ও নিমু, এসো, এসো।'

নিমাই দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। কখনো বা নাচে। কখনো বা দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়।

কেউ তবু ধরে ফেললে নিমাই খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বলে, 'না, না, আমি যাবো না। আমি যাবো না।'

ছিঃ, এ কি করছো নিমু? ঘরে যাবে না কি? সন্দেশ খাবে না? কলা নেবে না?

'না, না, ও আমি চাইনে।'

নিমাই না চাইলেও প্রতিবেশীরা ছাড়ে না। ঘরে নিয়ে যায় তাকে। কলা দেয়, সন্দেশ দেয় তার হাতে।

বলে, 'খাও নিমু, খাও। কেউ কিছু বলবে না। আমি তোমার পর নই। তোমার বাবা যে আমার দাদা হন'।

নিমাই তবুও খায় না। কলা-সন্দেশ বাড়ী নিয়ে আসে। বন্ধুদের ভেতর বিলিয়ে দেয়।

কোন কোনদিন এমনও হয়।

নিমাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। আকাশে গ্রীষ্মের সূর্য জ্বলছে। ঘর রোদ্দুরে পুড়ছে সারা নবদ্বীপ। আগুন, আগুন বাতাস। মানুষের মনে একটা ক্লান্তির ভাব।

সে ক্লান্তিতে দুপুরেই শয্যা নিয়েছে অনেকে। ঘুমিয়ে পড়েছে। নিমাই চুপি চুপি তাদের ঘরে যায়। এটা-ওটা সরায়। এটা-ওটা ভাঙে। আবার চুপি চুপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

গৃহস্থরা ঘুম থেকে উঠে অবাক!

এ কি ছিরি হয়েছে ঘরের! ঘরের ভেতর দিয়ে হঠাৎ যেন একটি ঝড় বয়ে গেছে। সব কিছু তছনছ ক'রে গেছে! এতো ঘুণও পেয়েছিল তাদের? এই উঠানটাতে কোন কিছুই যে টেঁকে পারনি তারা। তবে কি এ কাণ্ড কোন অপদেবতার?

অপদেবতার কথা মনে আনতেই যেন তাদের রোমাঞ্চ হয়। একটা প্রবল ভীতি তাদের মনকে ঘিরে ধরে। কিন্তু ব্যাপারটা স্পষ্ট হয় ক'দিন পরেই।

সেদিন দুপুরে নিমাই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। শচীদেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। জগন্নাথ মিশ্র, বিশ্বরূপও বাড়ী নেই। নিমাইকে আর আটকায় কে?

নিমাই চুপি চুপি এক প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রতিবেশীর চোখে ঘুম। মন তার অন্য জগতে।

নিমাই ভাবলে, এই তো সুযোগ। এই সুযোগেই হবে তার ভাঙা ভাঙা খেলা।

নিমাই সে খেলা আরম্ভও করলে।

একটা দরালে। ওটা পড়ালে। সেটা ভাঙতে যেতেই ঝনাৎ ক'রে একটা শব্দ।

সে শব্দে ঘুম ভাঙলো প্রতিবেশীর। চোখ খুললে সে। দেখলে, নিমাই তাকে জাগতে দেখেই দৌড়ে পালাচ্ছে।

কিন্তু নিমাইয়ের পালানো আর হলো না। প্রতিবেশী তাকে ধরে ফেললে, বললে, 'ওরে দুষ্টু, এ কীর্তি তোমার? তুমিই আমার ঘরে ঢুকে ঘর-বাড়ী তছনছ করে যাও? হুঁ, আজ তোমায় মজা দেখাচ্ছি!'

'না গো, আর করবো না গো! এবারের মতো ছেড়ে দাও আমায়। আর কোনদিন তোমার ঘরে ঢুকবো না।' বলতে বলতে নিমাইয়ের চোখে জল এসে পড়ে।

প্রতিবেশী বলে, 'না, না, তোমার চোখের জলে আর ভুলছি নে বাপু। আজ এর একটা হেস্তনস্ত না করে আর ছাড়ছি নে।' বলে প্রতিবেশী নিমাইকে টেনে শচীদেবীর কাছে নিয়ে চলে।

'বৌদি, কৈ গো!'

'কে?'

বাইরের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় শচীদেবীর। একটু তিনি বিস্মিতই হন। এ সময় আবার ওঁকে কে ডাকতে এলো।

তাই দু'টি বিস্ফারিত চোখে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

লোকটি আবার ডাকে, 'বৌদি!'

'কে?'

শচীদেবী এবারে উঠে আঙিনায় আসেন।

লোকটি বলে, 'আমি জনার্দন। শোন বৌদি তোমার দুপুরের খাওয়া।' বলতে বলতে জনার্দন নিমাইকে নিয়ে শচীদেবীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

জনার্দনের সঙ্গে নিমাইকে দেখে শচীদেবীর বিস্ময় যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'কি, কি করেছে নিমাই?' জনার্দন সব কথাই খুলে বলে।

বলে, 'শুধু আজই নয় বৌদি, মাঝে মাঝেই এমনি হয়। মাঝে মাঝেই নিমাই সারা ঘর তছনছ ক'রে আসে। আমরা তো প্রথমে ঘরে নিয়েছিলাম, এ সব হলো ছেলেমানুষের কাণ্ড। আমরা তাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ওকে শাসনও লাগিয়েছিলাম। আজ বুঝলাম, এ সব অপকর্মের মূলে হলো তোমার নিমু। ওঃ, কি দুরন্ত যে হয়েছে ছেলে, কোনদিন আবার না কোন্ বিপদ বাধিয়ে ফেলে!' বলে জনার্দন শচীদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শচীদেবীর মুখ বিবর্ণ। কে যেন সবটুকু রক্ত চুষে দিয়ে উটিয়ে নিয়েছে সে মুখ থেকে। গভীর আবেগে ঠোঁট দু'টি কাঁপছে থরথর করে।

জনার্দন আবার বলে, 'না, এ সব ভালো কথা নয় বৌদি, এখন থেকেই ছেলেকে শাসন করো। আজ নয় সে আমার ঘরে ঢুকেছে, কিন্তু কাল? কাল যদি সে অন্যের ঘরে ঢুকে এমনি কাণ্ড ক'রে বসে, তা হলে উপায়টা হবে কি? তখন যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না কোথাও।' বলতে বলতে জনার্দন মিশ্র-নিবাস থেকে বেরিয়ে যায়।

মা আর ছেলে। শচীদেবী আর নিমাই। দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন দুটি পাথরের মূর্তি। দু'জনেরই মুখ বিষণ্ণ। চোখ জলে টলমল। একজনের অভিমানে, অন্যজনের অনুশোচনায়।

এবারে সে মূর্তি নড়ে ওঠে। চোখের জল উপচে পড়ে। শচীদেবী বলেন, 'নিমু রে।'

লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না নিমাই। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের আঙুলে মাটিতে দাগ কাটছে।

শচীদেবী আবার বলেন, 'নিমাই!'

'মা!'

'তোর জন্যে কি কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না বাপ? তুই কি শুধু আমায় জ্বালাতেই জন্মেছিস্ রে।' বলতে বলতে শচীদেবী নিমাইকে বুকে টেনে নেন। দু'চোখে জল গড়ায় অঝোর ধারায়।

মায়ের বুকে মুখ রেখে নিমাই চুপি চুপি বলে, 'আর, করবো না মা, আর কোথাও যাবো না।'

শচীদেবী ছেলেকে নিয়ে ঘরে চলে যান।

'আর কোথাও যাবো না মা।'

নিমাইয়ের কাছে এটা কথার কথা।

দু'দিন পরেই সে কথা ভাঙে। নিমাই আবার বাইরে বেরোয়। বাইরের দিকে তার প্রবল আকর্ষণ। নবদ্বীপের তরুলতা, খোলা মাঠ, গঙ্গার ধার তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বলে, 'আয়। ওরে আয়।'

সে ডাকে ঘরে থাকে না নিমাই। শচীদেবী একটু নজর কেয়ালেই সে বাইরে বেরোয়। যে দিকে মন চায়, ছুটে যায়। একদিনের ঘটনা।

শচীদেবী যেন কি কাজে ছিলেন। নিমাইয়ের দিকে তাঁর চোখ ছিল না। নিমাই দেখলে, এই তো সুযোগ। এ সুযোগেই যে তাকে বাইরে যেতে হবে। সে বাইরে বেরুলে।

কিন্তু আজ আর অত কোথাও গেলে না। সোজা চলে এলো গঙ্গার ধারে।

গঙ্গা বয়ে চলেছে। যেন ক'খানি নৌকো ছেড়ে চলেছে তার উপর। কেউ কেউ স্নান করছে গঙ্গার ঘাটে।

নিমাইয়ের বড় ভালো লাগে এ ছবি। ভালো লাগে গঙ্গাকে। শিশু মনের কৌতূহল কতো কি যেন আবিষ্কার করে গঙ্গার বলতানের মধ্যে। কিন্তু তা কতক্ষণ?

একটু পরেই গঙ্গা তার চোখে রয় শুধু নদী। তার সব কৌতূহল যায় ফুরিয়ে। বন্ধনার মন যায় শুকিয়ে।

তখন সে বাড়ী ফেরে।

সেদিনও গঙ্গা থেকে বাড়ী ফিরছিল নিমাই।

কিন্তু সেদিন কেন যেন তার পথ ভুল হয়ে গেলো। পথ ভুলে সে একটি বড় রাস্তার উপরে এসে দাঁড়ালো। নবদ্বীপে সেদিন যেন কিসের উৎসব। পথে বহু লোকের ভীড়। অনেক রং-তামাসা।

নিমাই বাড়ীর কথা ভুলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

পথের রং-তামাসা তার মনেও রং ধরিয়েছে।

অন্যদিকে মিশ্র-গৃহে তখন কান্নার রোল উঠেছে। 'নিমাই, নিমাই, নিমুরে।'

নিমাইকে ঘরে না পেয়ে শচীদেবী রাস্তায় বেরুলেন। পড়শীদের বাড়ী বাড়ী গেলেন। ডাকলেন, 'নিমাই, নিমাই' করে।

কিন্তু না, কোথাও নিমাইয়ের সাড়া মিললো না।

শচীদেবী তখন ঘরে ফিরে এলেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। খবর গেলো বিশ্বরূপের কাছে, জগন্নাথ মিশ্রের কাছে।

জগন্নাথ মিশ্র এলেন। বিশ্বরূপ এলো। পড়শীরা এসে মিশ্র-গৃহে ভীড় জমালো। অনেক হলো খোঁজাখুঁজি।

কিন্তু নেই। নিমাই নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না!

শচীদেবী ধূলায় গড়িয়ে পড়লেন। জগন্নাথ মিশ্র মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

বিশ্বরূপের মনে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, 'তবে কি? তবে কি? তবে কি নিমাই পণ্ডিত—

বিশ্বরূপ আর ভাবতে পারলে না। বুকটা তার পভীর ব্যথায় কেঁদিয়ে উঠলো। চোখের জল গড়িয়ে পড়লো অজ্ঞাতে ধারায়।

সে আর দাঁড়ালো না। নিমাইয়ের খোঁজে আবার পথে বেরুলো।

নিমাই হাসছে।

পথের ধারে তামাসা দেখে হাসছে। বন্ধু দোকের সঙ্গ তার ভালো লাগছে। বাড়ীর কথা আর তার মনে নেই।

পথের ও-পাশে দু'টি চোর। দু'টি পাকা চোর। মেছুনী আর তার এক সঙ্গী।

উৎসব-মুখর নবদ্বীপ। এই উৎসবের ভীড়ে শিকার খুঁজতে তারা পথে বেরিয়েছে।

পথের ও-পাশে নিমাইকে দেখে থমকে দাঁড়ালো দুজনে। নিমায়ের গায়ে ঝলমলে রঙগুলি দুপুরের রোদে ঝিলমিল করছে। মেছুনী সঙ্গীকে বললে, 'ছেলেটির সঙ্গে কেউ নেই—না রে?'

'তাই তো মনে হয় ওস্তাদ।'

'নেই। দেখছিস না, সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। কেউ আর ওর পাশে দাঁড়াচ্ছে না!'

'ছেলেটি বোধ হয় পথ হারিয়েছে।'

'বোধ হয় কি রে? ও নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছে। দেখছিস্ না। মাঝে মাঝে ওর চোখে কেমন একটা আতঙ্কের ভাব। মাঝে মাঝে ওর বাড়ীর কথা মনে পড়ছে। দাঁড়া, আজ মোটামুটি পান পাবো মনে হচ্ছে। মা চণ্ডী বোধহয় আজ মুখ তুলে চেয়েছেন।'

'কিন্তু এতো ভীড়ের মধ্যে—'

সঙ্গীর কথায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো মেছুনী।

বললে, 'বোকাপাঁঠা কোথাকার! এতো দিন ধরে আমার সঙ্গে আছিস, তবুও বুদ্ধিসুদ্ধি দেখছি তোর কিছু হলো না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'ভীড়ের মধ্যেই যে ঢুকিবে তে, এতো লোক, কে আর কতক্ষণ ওর দিকে লক্ষ্য রাখতে পেরেছে। আমরা ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে আমাদের আড্ডায় নিয়ে যাবো। তারপর গয়না ক'খানা হাতে করে, ব্যস্—'

মেছুনী হাতের ছোটোটা একবার নিজের গলার কাছ দিয়ে ঘুরিয়ে আনলে।

চমকে উঠলো সঙ্গীটি। বললে, 'মেরে ফেলবে? অমন সুন্দর দুটফুটে ছেলেকে তুমি একেবারে খতম করবে ওস্তাদ!'

'ধোৎ শালা, মেরে না ফেললে গয়না পাবো কি করে? ওকে ছেড়ে দিয়ে গয়না নিলে যে কাজীর দরবারে পড়তে হবে। ধরা পড়তে হবে। কাজী তখন আমাদের হাত-পা কেটে ঘানিতে পিষিয়ে দেবে না!'

ওস্তাদের মুখের উপর আর কথা বলতে পারলে না সঙ্গীটি। চুপ করে রইলো।

ওস্তাদ দোকান থেকে সন্দেশ কিনলে দুটি।

তারপর সঙ্গীকে বললে, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয় আমার সঙ্গে।' সঙ্গীটি ওস্তাদকে অনুসরণ করলো।

'এই খোকা।'

নিমাই ভয়ে ভয়ে পথের দিকে তাকিয়েছিল। মেছুনীর ডাকে সে দৃষ্টি ফেরালে।

মেছুনী বললে, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ী যাবে না?'

নিমাই এতক্ষণ বাড়ীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। মেছুনীর কথায় সে কথা তার মনে পড়লো। মায়ের মুখ মনে পড়লো।

বাড়ী ফেরার জন্যে এবারে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো নিমাই। বললে, 'তোমরা আমায় বাড়ী নিয়ে যাবে?

'হ্যাঁ, সেজন্যই তো আমরা এসেছি।' জবাব দিলে মেছুনী। বললে, 'ইস্, কতোক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছো। খিদে পায় নি?'

নিমাই বললে, 'বিয়ে পেয়েছে গো, খুব পেয়েছে। তুমি আমায় খেতে দেবে?'

'এই নাও। সন্দেশ নাও। সন্দেশ খাও। সন্দেশ খেতে খেতে বাড়ী চলো।' বলতে বলতে মেয়মালী নিমায়ের হাতে সন্দেশ দু'টি তুলে দিলে। তারপর নিমাইকে কাঁধে নিয়ে রওনা হলো নিজের আস্তানার দিকে।

সঙ্গীটিও চললো পিছু পিছু।

কিন্তু একি হলো মেয়মালীর?

তার মনটা আজ হঠাৎ এমন চঞ্চল হ'য়ে উঠল কেন? জীবনে সে সংসার করেনি। সংসার ধর্মকে মানেনি। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা কোন দিনই তার মনে বাসা বাঁধতে পারেনি।

কিন্তু নিমাইকে কাঁধে নিতেই যেন সে ভালবাসার স্বাদ পেলে সে।

ভাবলে, আহা তার যদি সংসার থাকতো! যদি তার এমনি একটি ছেলে থাকতো!

আজ এই প্রথম সংসারের জন্য মনটা হাহাকার করে উঠলো মেয়মালীর। একটা গভীর ব্যথায় তার লাল লাল দু'টি চোখ ভিজে এলো।

পথ চলতে গিয়েও সে থমকে দাঁড়ালো বারে বারে। সঙ্গীটি বললে, 'ওর হাতের তাবিজ দুটি কেমন চক্‌চক্ করছে গো ওস্তাদ। একেবারে খাঁটি সোনা। আমার কিন্তু ও দুটি চাই।'

'চুপ কর্ বদ্‌মাস!'

সঙ্গীর কথায় মেয়মালী একেবারে যেন খেঁকিয়ে ওঠে।

বলে, 'আহাহে, রাজপুত্তুর এয়েছেন। তাবিজ চাই। তাবিজ উনি হাতে পরবেন। জীবনে যে কামাকড়ির মুখ দেখলে না, তার চাই তাবিজ!'

একটা বিদ্রূপের ঝাঁঝ মেয়মালীর কণ্ঠে।

সঙ্গীটি দেখলে তার ওস্তাদের চোখে জল। মেয়মালী কাঁদছে। বললে, 'কাঁদছো কেনে গো ওস্তাদ? চোখে তোমার জল!' হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ফেললে মেয়মালী। কেমন একটা লজ্জা করে গলাটাকে করলে পরিষ্কার।

বললে, চুরি আর করবো নিয়ে, জীবনভরই তো চুরি করলাম, কিন্তু কি পেলাম বল্? কিছুই না। ফাঁকা, বুঝলি, জীবনটা একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই, আমার চারপাশে কেউ নেই। একেবারে কিছু নেই।'

বলতে বলতে মেয়মালী একেবারে হু হু করে কেঁদে ফেললে।

একটা বাড়ীর সামনে এসে নিমাই হাততালি দিয়ে উঠেছিল।

মেয়মালী তাকিয়ে দেখলে, বাড়ীর ভেতরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। এতো লোক। তবু যেন কারো মুখে কথা নেই।

মেয়মালী বুঝলে, তার কুঁড়িয়ে পাওয়া ছেলেরই বাড়ী এটা। সোনার চাঁদ ছেলেকে না পেয়ে সবাই মুষড়ে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে নিমাইকে নামিয়ে দিলে সে।

নিমাই হাতে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে ভেতরে চলে গেলো। যতক্ষণ দেখা যায় মেয়মালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তাকে। তারপর এক সময় বাতাসে একটি দীর্ঘশ্বাস উড়িয়ে দিয়ে আবার চলতি পথে পা বাড়ালে।

মেয়মালীর মনে হলো তার বুক থেকে কে যেন একখানি পাঁজর খুলে নিয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বহিন্দু সম্মেলন প্রসঙ্গে

সুনীতি সান্যাল

কিছুদিন আগে প্রয়াগে বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে স্বাধীন ভারতের বুকে দ্বিতীয় বার এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সভাপতিত্ব করলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। "বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক" মতবাদে তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর সম্প্রদায় একদিন হিন্দু ভারত থেকে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। কাল বিবর্তনে বুদ্ধ-শিষ্যের হিন্দু সম্মেলনে সভাপতিত্বের সম্মানে আমরা আনন্দিত বোধ করছি। একদা বর্মার বৌদ্ধ ভিক্ষু উত্তমকেও হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে দেখেছিলাম।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী '৭৯ "আনন্দ বাজার" পত্রিকার সম্পাদকীয় বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন নিবন্ধে পড়লাম "ভারতে উদ্ভূত সকল ধর্মই হিন্দু ধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ এবং আর্য্য সমাজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের ব্যক্তি প্রত্যেকেই তাহার বৃহত্তর স্বকীয় পরিচয় হিসাবে হিন্দু বলিয়া বিবেচিত হইবেন।...যদিও ইহা প্রকৃত অর্থে ধর্ম-সম্মেলন নহে—লক্ষ্য করিতে হইয়াছে যে, এই সম্মেলনে প্রধানত যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা ধর্মগত কোন তত্ত্বের বিচার নহে। তাহা সামাজিক আচরণের একাধিক অবাঞ্ছিত-ঐতিহ্যের অবসান সম্ভব করিবার জন্য অগ্রপ্রাপিত অধ্যবসায় আগ্রহ করিবার সংবেদনশীল কর্তব্যের আলোচনা"।

সম্মেলনে বিশ্ব-হিন্দু চেতনা জাগ্রত করবার এ প্রয়াস সাধু-অন্তর দিয়ে অভিনন্দিত। অতীতের হিন্দু-ভারতের করুণ ছবিতে দেখেছি ধর্মের নামে, ভাষান্তরে ধর্মের সংস্কারের অত্যাচারে, নিম্নবর্ণীয়েরা শত শত সংখ্যায় হিন্দুত্ব হারিয়েছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। অপমানিতের প্রাণের বেদনায় প্রলেপ দেবার সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা গ্রামবাংলার বহু নরনারীকে হিন্দুত্বাভিত্ব পরিত্যাগ করিয়ে খৃষ্টান করেছেন। জাতি-ভিত্তিক দেশকে বিভক্তিত করার কথা সবাই জানি। পূর্ববাংলার পরিসংখ্যানে যেখানে হিন্দুর ভাগই ছিল বেশী সেখানে আজ মুসলমান সংখ্যাধিক্য আর সে মুসলমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই converted Hindu family। সতীদাহ প্রথার পৈশাচিক অত্যাচারে রহ নারী প্রাণরক্ষার তাগিদে খৃষ্টান অথবা মুসলমান হয়ে সে জাতির জন সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়তা করেছে। এমনি করে অন্তঃ-ধর্মী হিন্দু সেদিন তার জাতির ক্রমিক্ষু অবয়বে প্রতিরোধ করতে সামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক বিন্যাসের জন্য মাথা ঘামান নি।

তাই যুগ যুগ ধরে যে ভিত্তিকে বেত্র করে একই জাতির অন্তর্গত মানুষে মানুষে সৃষ্ট অস্পৃশ্যের শক্ত ব্যবধান গড়ে উঠেছিল তাকে নির্মূল করবার প্রচেষ্টা খুবই সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু বুদ্ধদেব থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতাব্দীর ও মহাত্মাজী পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা করে গেছেন আজও কি তা সাফল্য লাভ করেছে? এই স্বাধীন ভারতের মাটীতেই কি আজও হরিজন বলে চিহ্নিত মানুষকে অস্পৃশ্যের অপরাধে অপরাধী হয়ে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে না? উচ্চ বর্ণীয় বলে পরিচিত হিন্দু সমাজের বহুলাংশ এখনও অস্পৃশ্য নিম্ন বর্ণীয় হতে নিজেদের জাত রক্ষার জন্য সচেষ্ট নন? যদিও সহরাঞ্চলে কতগুলি অসুবিধা থাকায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছাবাছি কিছুটা শিথিল হয়েছে এবং অনেকে অস্পৃশ্যতা বোধের কুফল ও অসারতা বিষয়ে উপলব্ধি করেছেন কিন্তু কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই স্পৃশ্য চিহ্নিত মানুষেরই ডাক পড়ে অনুষ্ঠান কর্ম সম্পাদনের জন্য। আইনের বলে ভারতের বহু মন্দিরে হরিজনেরা, কর্ম হিন্দুর মত প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন কিন্তু মন্দিরে ভোগ রন্ধনের ব্যাপারে কোন ব্রাহ্মণেতর হিন্দু কি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অধিকার পেয়েছেন? একমাত্র অপরাধ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। সেখানেও একমাত্র কর্ম সংস্কারের ভিত্তিতেই চণ্ডালের স্পৃষ্ট অন্নে উচ্চবর্ণীয়ের জাত যায় না। স্থানান্তরে আবার অস্পৃশ্যতার ভূত ঘাড়ে যথারীতি চেপে বসে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারীর 'আনন্দবাজার' লিখছে

সম্মেলনে অস্পৃশ্যতা এবং বিভেদমূলক জাতপাতের প্রকোপ দূরীভূত করিবার জন্য যে আগ্রহ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা বস্তুত সামাজিক অনাচার দূরীকরণের প্রস্তাব, যদিও এই অনাচারের সমর্থনে ধর্মের দোহাই মুখরিত হইতে দেখা যায়।" যুগ যুগ ধরে যারা সমাজের এই বিভেদমূলক সামাজিক অনাচারকে ধর্মীয় আচার হিসাবেই এতদিন দেখেছেন তারা কিভাবে এই সাধু সংকল্প মনে প্রাণে মেনে নেবেন? ১৩৪৪ সালে ভারতের গণ-পরিষদ আইন প্রয়োগে অস্পৃশ্যতা বর্জন করেছিল—এই আইনে মানুষের জন্মগত ও কর্মগত উচ্চ-নীচ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ দিনেও হিন্দু সমাজের সেই অস্পৃশ্যতা নির্মূল হয়নি। কলযী লতার মত সে তার অস্তিত্ব ঠিকই রক্ষা করে চলেছে। কয়েক যুগের সঞ্চিত বদ্ধমূল সংস্কারের পরিবর্তন আনতে হলে উচ্চ নীচ সিঁড়িতত্ত্ব মতবাদে পরিপূর্ণ ধার্মিক ভাবধারারও পরিবর্তন দরকার। মাটিকে অপরিবর্তিত রেখে উন্নত ধরণের ফসল লাভের আশা যেমন সফলতার অন্তরায় তেমনি ধর্মক্ষেত্রকে Staticই রেখে হিন্দুর এই সংস্কারের নূতন সংকল্পের উদ্যমের ও সাফল্য সম্বন্ধে পূর্ণ পূর্ণ আশ্বস্ত ভাবে কলে নিশ্চিন্ত হওয়া কঠিন।

বিপ্লবী দার্শনিক শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ লিখলেন—"...একটি heirachy করিয়া একটিকে রাখিয়াছে সিঁড়ির উর্ধ্বাগে কুলীন করিয়া, আরগুলিকে পর পর নীচে নামাইয়া রাখা হইয়াছে। এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চস্তরের চাপে নিম্নের সবগুলি ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিল তখনই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ছোটরা, নীচের দল সব বড়দের, উঁচুদের সমকক্ষতার দাবী করিল। ভাগবত বলিলেন, বড়, ছোট, উচ্চ, নীচ সকলের সঙ্গে পুরুষোত্তমের direct and equal relation। গায়ত্রী জপ ও যূচির জুতা সেলাই যদি বিশ্বের কাছে সমভাবেই প্রয়োজন, তবে কেন একটি কুলীন অপরটী অকুলীন হইবে? ঘর ঝাঁট না দিলে যখন ঠাকুর পূজাই হয় না তখন ঠাকুরের কাছে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও পূজা কি সমভাবে পূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন? এত দিনের সাধনা সব minus এর সাধনা। কৃষ্ণের সাধনা positive সবকে রাখিয়া সবকে হজম করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। ছোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে। তাই আজ নূতন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে। New social order, new religious order সৃষ্টি করিতে হইবে।" আমরা আশা করব অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন new social order-এর সঙ্গে সঙ্গে new religious order সৃষ্টি দ্বারা সর্বজাতি সমন্বিত মানুষ-হিন্দু গড়ে তুলুন।

আমরা যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখি তবে কি দেখতেপাই না যে বিশ্ব-পিতা ব্রহ্মার অঙ্গীভূত মানব জাতির প্রকৃতি-লব্ধ সব গুণ তমোগুণের বিকাশ প্রত্যেক মানুষেই তারতম্যানুসারে সমভাবে বিদ্যমান? নীচ বলে যারা আখ্যাত তাদের মধ্যে মানুষ উচ্চশ্রেণীদের চেয়ে কত বহু গুণের অধিকারী দেখা যায়। ভারতের হিন্দুর তো কেবল ব্রাহ্মণ, কেবল ক্ষত্রিয়, কেবল শূদ্র বা কেবল বৈশ্য হলে চলবে না—তাকে যে একাধারে সব হয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হবে। এই পরিপূর্ণ মানুষই সমগ্র জগতের স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদের, কালো সাদার ভেদাভেদের বহ্নি জ্বালা নির্বাপিত করে জগতের মানুষকে তাপমুক্ত করতে পারবে। ভারতের দেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত বিশ্ব-ধর্ম, বিশ্ব প্রেম, বিশ্ব-মানবতার শীতাবারীতে ভারতের হিন্দু নতুন করে উদ্বুদ্ধ হোক্, হিন্দু সম্মেলনের সার্থকতা হোক প্রতি মানুষের হৃদয়কে মানব ধর্মে, মানব প্রেমে বিগলিত করে।

পশ্চিমবঙ্গে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্ম্মাণ

গৌরেন্দ্র সাহা

যদি বলি বর্ত্তমান সভ্যতার গতি অনেকাংশে নির্ভরশীল মোটর গাড়ীর গতির উপর তবে সেটা হয়তো খুব বেশী বলা হবে না। কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলি একতরফা ঘোষণায় পেট্রোলের দাম হঠাৎ বাড়িয়ে বসায় তাবৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির কি হাঁড়ির হাল হয়েছিল সে কথা বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে। শিল্প হিসেবে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ সারা পৃথিবীতেই অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ছোট গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্ম্মাণ শিল্পও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের সময়ও যেমন তাদের প্রয়োজন, আবার সেই গাড়ী চালু রাখতেও উপযুক্ত যন্ত্রাংশের প্রয়োজন। কাজেই মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্ম্মাণ শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য।

ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, ইটালী, ফ্রান্স জাপান প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতে মোটর গাড়ী তথা তার যন্ত্রাংশ নির্ম্মাণ শিল্প একান্তই অর্ব্বাচীন। তার কারণও প্রায় সবারই জানা। প্রথম মোটরগাড়ী ভারতবর্ষে আমদানী হয় ইংরেজ শাসনের আমলে ১৮৯৮ সালে। যন্ত্র থাকলেই সম্ভাবনা থাকে যান্ত্রিক বিকলতার। কাজেই ঐসব আমদানী করা মোটরগাড়ী চালু রাখতে যন্ত্রাংশও আমদানী হ'তে থাকে বিদেশ থেকে—বলা বাহুল্য, ঐসব মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের দেশগুলি থেকেই। এই আমদানী অব্যাহতই থাকতো যদি না বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিরাট পট পরিবর্ত্তন ঘটত। এর সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। ইংরেজের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ তখন মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের সমর ক্ষেত্রের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। কিন্তু শাসক ইংরেজের মর্ম্মে তখন ভারতবর্ষ তু দুপিয়ে চলেছে কাঁচা-মাল আর যাবতীয় তৈরী জিনিষ আদায়ে হয় ইংলণ্ড অথবা তার মিত্র দেশ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে। বাদ সাধল জার্ম্মানী। তার সাবমেরিন আর টর্পেডোর দাপটে পশ্চিমে আটলান্টিক আর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে উঠল বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের পক্ষে অযোগ্য। অথচ যুদ্ধের রসদ যোগান চাই-ই। তাই শাসক ইংরেজের মাথায় চিন্তা নড়ল। বাধ্য হয়েই তারা ভারতীয়দের আহ্বান জানালেন শিল্প প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার জন্য। মোটর গাড়ী সামরিক সরবরাহের তা সকার এক বিশিষ্ট বস্তু। তাই মোটর গাড়ী তৈরীর জন্যও আহ্বান এল ভারতীয়দের কাছে। ভারতীয় শ্রেষ্ঠীরাও এগিয়ে এলেন—তাঁদের কপাল্যর হ'ল শিল্পপতি হিসেবে।

এই সময় ১৯৪২ সালে ভারতে প্রথম মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ শিল্প হিন্দুস্থান মোটরস্ লিমিটেডের গোড়া পত্তন হয় হাওড়ায়। তার দু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্। অবশ্য আমদানী করা ও অংশতঃদেশী যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরী প্রথম মোটর গাড়ী "হিন্দুস্থান" বেরোয় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার দু বছর পর এই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই। এর পর ধীরে ধীরে এখানে আরও কয়েকটি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। মোটর গাড়ী ছাড়াও জীপগাড়ী, তিন চাকার

টেম্পো ও দুই চাকার স্কুটার প্রভৃতিও তৈরী হওয়ার আশা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগের নিজস্ব গাড়ী নির্মাণের কারখানা সহ বর্তমানে ভারতে মোটরগাড়ী তৈরীর কারখানার সংখ্যা ১৭টি।

এই সব গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে তার যন্ত্রাংশ নির্মাণও চলছে। সারা ভারতে প্রথম মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণ সুরু হয় চল্লিশের দশকে এই পশ্চিমবঙ্গেই। মোটর গাড়ী নির্মাণ ও তার ব্যবহার যত বাড়ছে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ততই বেড়ে চলেছে। একটি পরিসংখ্যানে তা খানিকটা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১৯৭০ সালের ১, ৭০, ৫৭৬ থেকে বেড়ে ১৯৭৬ সালে হয়েছে ২, ১৭, ৫৬৩। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ১৬,০০০ গাড়ী বেড়েছে। এই গাড়ীগুলিকে সচল রাখতে কি পরিমাণ যন্ত্রাংশের ব্যবহার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া আছে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিযুক্ত গাড়ী।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে ভারতে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানার সংখ্যা ছিল একান্তই নগণ্য। তখন মোটরগাড়ী নির্মাতারাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বাজারে ছাড়তেন। কিন্তু দিনে দিনে গাড়ীর সংখ্যা যতই বাড়তে থাকল এই ব্যবস্থা চালু রাখা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। বরং তাদের নিজেদের উৎপাদিত মোটর গাড়ীর জন্যই মূল উপাদান হিসেবে তারা ছোট ছোট নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের নিজস্ব নক্সা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ কিনতে শুরু করলেন। জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত মোটর গাড়ী নির্মাণকারী দেশে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ যন্ত্রাংশ সহযোগী নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা হয়। বিলম্বে এবং খানিকটা বিলম্বিত লয়ে হ'লেও ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যবস্থার প্রসার ঘ'টেছে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা ছিল মাত্র ৪৫টি। সেই সংখ্যা বেড়ে ১৯৭৬এ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০০ এর কাছাকাছি।

ভারতের তৈরী মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের চাহিদা এখন শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশেও এর চাহিদা বেড়ে চ'লেছে। ভারতে আশ্চর্য্য লাগে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইংরেজ শাসনের কালে যে ভারতবর্ষে স্যার-কাঁটার মত একান্ত সাধারণ শিল্পদ্রব্য জিনিষও আমদানী ক'রত ইংলণ্ড থেকে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই সে রপ্তানী ক'রছে জটিল নির্মাণ কৌশলে প্রস্তুত মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের মত শিল্প সামগ্রী সেই ইংলণ্ডে তথা জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্সের মত শিল্পোন্নত দেশে। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল সমগ্র ভারতের হিসেবে ৭ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২১ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকার মত। অর্থাৎ তিন বছরে প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটা মোটেই পক্ষ দিয়ে এবং কাজের প্রবাহ বাধোর মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই রপ্তানীর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা একান্তই নগণ্য। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ৭লক্ষ টাকার কাছাকাছি। অর্থাৎ সারাভারতের রপ্তানীর ০.৩ শতাংশের মত। ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হ'য়েছে ৫০ কোটী টাকা।

আর একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'চ্ছে এই যে পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত যন্ত্রাংশের প্রায় পুরোটাই মূলত মোটর গাড়ীর মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্রাংশের বাজারে তা একান্তই দুর্লভ। সেখানে র'য়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে তৈরী যন্ত্রাংশ। এর একটি কারণ হ'ল এই যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বেশীর ভাগই পঞ্চাশের দশকে প্রতিষ্ঠিত। তাদের যন্ত্রপাতি বহুদিনের পুরোনো ও পুরোনো ধাঁচের। এতে উৎপাদন খরচ আনুপাতিক ভাবে বেশী পড়ে। অপরপক্ষে অন্যান্য রাজ্যের কারখানাগুলি তুলনামূলকভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ। তাই তাদের উৎপাদন খরচও হয় প্রতিযোগিতামূলক।

কিন্তু এটাই সব নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়

বেশ কিছু নিম্ন মানের মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ প্রধানতঃ মোটা কমিশনের লোভে কলকাতার বাজারে ছেড়ে আছে। এদের দাম স্বভাবতঃই খুব কম। অবশ্য গুণও অনেক কম। এছাড়া অতিরিক্ত আছে বিদেশের ঝুঁকি। কিন্তু কেনার সময় সেটা আর কজনে দেখে। সেখানে ঠকাটাই মূল বিচার্য্য বিষয়। একটু নজর দিলেই দেখা যায় কলকাতার বাজারের এই সব সস্তা নিম্নমানের যন্ত্রাংশ বেশীর ভাগই বহিরাগত। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু নূতন গাড়ীর যন্ত্রাংশ তৈরীতে অভ্যস্ত, ও রূপ নিম্নমানের জিনিষ তারা তৈরী করতে পারে না বা চায় না। তাই এই দুরবস্থা। বাজারে ভেজাল ও নিম্ন মানের যন্ত্রাংশের ব্যাপক অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্রাংশ শিল্পের পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর পৃষ্ঠপোষকতা এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের মত গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ব্যাপারে ভেজাল নিরোধের জন্য কঠোর আইন ও তার যথাযথ প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ নিম্ন-মানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার ক'রলে গাড়ীর পরমায়ু ক'মতে পারে এবং দুর্ঘটনা ঘ'টতে পারে। দুইই সামগ্রিক ভাবে জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। বাজার থেকে ভেজাল যন্ত্রাংশ বিদায় নিলে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত যন্ত্রাংশ আবার স্বাভাবিক ভাবে স্বদেশীয় বাজারে ঢুকতে পারবে ব'লে আশা করা যায়।

ভারতের মোটর গাড়ীর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ নির্মিত হয় যে দুইটি সুবৃহৎ কারখানায়, তার একটি র'য়েছে কলকাতার সন্নিকটে হিন্দুস্থান মোটরে আর একটি পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছাকাছি শহর জমশেদপুরে। কলকাতা সমগ্র পূর্ব ও পূর্বোত্তর ভারতের কেন্দ্রীয় বাজার। পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শ্রমিকদের কারিগরী কুশলতাও সুবিদিত। তবুও কেন যে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হ'তে পারেনি এটা বিশেষ ভাববার কথা। আমার মনে হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি, মোটরগাড়ী শিল্পের বৃহৎ শিল্পপতিগণ ও যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ীদের সমবেত প্রচেষ্টায় এক সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ ক'রলে অচিরে এই শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শিল্প মানচিত্রে তার উপযুক্ত স্থান ক'রে নিতে পারবে।

Phone 33-8389
33-6368

PRECISION HAND GLOVES FACTORY

Premier Manufacturers of :

HAND GLOVES & SAFETY MATERIALS

and *Exporter* :

A SMAL SCALE UNIT REGISTERED WITH SISI AND SSI, Calcutta

MANDAL—ABAS
19A BHAGAWAN BANERJEE LANE,
CALCUTTA-700005

শিশু জগৎ

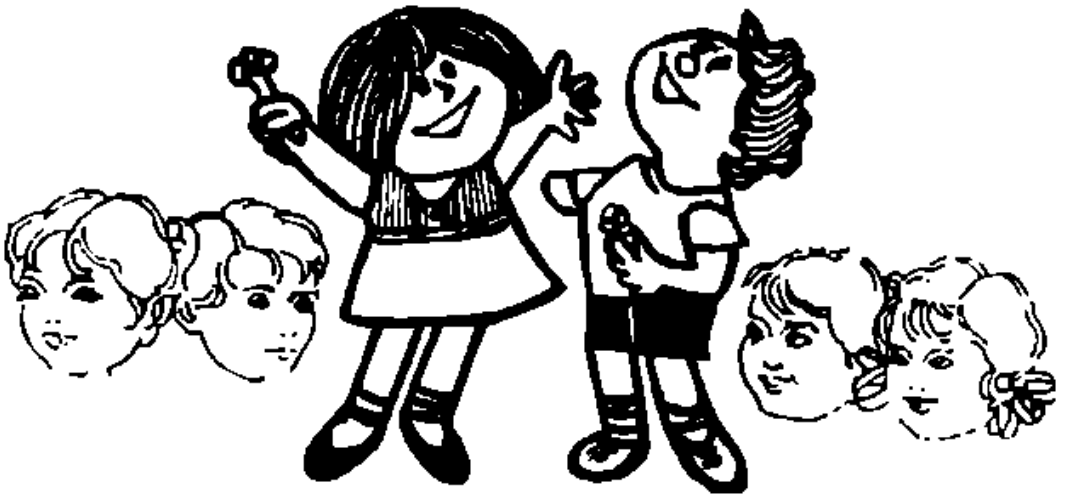

স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা

হাসি আর খুশী দিয়ে ভরা বুকখানি
রোজ ভোরে ডাকে মোরে কচি হাত তুলি !
তাহাদের কলরব ভাসে বাতাসে—
তাদেরই ত' মিঠে গান জাগে আকাশে !
তারা হাসে, তারা গায়, তারা নাচে গো—
তাদের না পেলে মোর প্রাণ বাঁচে গো ?
ধরাধরি করে হাত সরাসরি আর—
সবাকার কাছে তারা ভালোবাসা চায়।
যত কিছু খুনসুটি তাদের সাথে—
সকাল-বিকাল তারা হেথায় মাতে !
ফুল তুলে, গান গেয়ে মিটি মিটি চায়—
আনন্দ বয়ে আনে মোদের ধরায় !
হাসি আর খুশী দিয়ে ভরা সব মন—
তারাই জাগালো মনে প্রীতির প্রাবন ॥

শুভাশী
স্বপন বুড়ো

জেনে রাখা ভাল

গণেশ চক্রবর্তী

(১) তোমরা জান কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁরই লেখা 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ কোরে বিখ্যাত 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছিলেন ? এই 'নোবেল পুরস্কার' কি জান ?— সুইডেনের একজন ধনিক ইঞ্জিনীয়ার এবং রসায়নে বিশেষজ্ঞ আলফ্রেড্ নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কারের দ্বারা যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তা থেকে তিনি পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করে যান—(১) পদার্থবিদ্যা, (২) রসায়ন, (৩) শরীরতত্ত্ব ও ভেষজবিদ্যা, (৪) সাহিত্য, (৫) শান্তি। এই পুরস্কারের পরিমাণ এখনকার দিনে প্রায় দুই লক্ষ টাকা।

(২) রবীন্দ্রনাথের নামেই আমাদের রাজ্যে একটা পুরস্কার আছে। তার নাম রবীন্দ্র-পুরস্কার। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করেন তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

(৩) পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস নগরে তৈরী ১ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ¾ ইঞ্চি, ১২০ পাতা বিশিষ্ট একখানি বই পাওয়া গেছে। বলা হয় এইখানি আকারে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বই।

(৪) ফরাসী ঔপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল্' নামে যে সুবিখ্যাত বই আছে তার মধ্যে একটি দীর্ঘ বাক্য আছে। এই বাক্যটিতে ৪২৩টি শব্দ, ৯৩টি কমা, ৪১টি সেমিকোলন ও ৪টি ড্যাশ আছে। বলা হয় এইটিই সাহিত্যে সবচেয়ে লম্বা বাক্য।

আলোক-তরঙ্গের মাধ্যমে দূর-সংযোজনের প্রচেষ্টা

দুলালকুমার সাহা

দূরপাল্লার যোগাযোগ বা দূর-সংযোজন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গের ব্যবহার সুবিদিত। ভূপৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রের প্রেরক-যন্ত্র থেকে অ্যানটেনার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট কোণে এই তরঙ্গকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। আয়নমণ্ডল এই তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে এবং তা পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। উপগ্রহের মাধ্যমে দূর-সংযোজন ব্যবস্থায় আরও ক্ষুদ্র তরঙ্গ অর্থাৎ মাইক্রো-ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গতঃ কোন তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 1000 মেগা হার্ৎজের (1 মেগাহার্ৎজ, $=10^6$ হার্ৎজ) বেশী হলে তাকে মাইক্রো-ওয়েভ বলা হয় (এক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 0.3 সেন্টিমিটারের কম)। তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো 'সংবাদ' আদানপ্রদান। এখানে 'সংবাদ' কথাটি আক্ষরিক অর্থে সংবাদও হতে পারে কিংবা যে কোন ধরণের শব্দ—গান-বাজনা, চিত্র—এমনকি চলচ্চিত্রও হতে পারে।

আমরা জানি ট্রান্সমিটার যন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ উৎপাদন করা হয়। নিম্ন কম্পাঙ্কের সংবাদ বা সিগ্‌ন্যাল এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মডুলেশন। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত মডুলেশন করা তরঙ্গ প্রেরক-অ্যানটেনার মাধ্যমে আবহাওয়ামণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ, যার মধ্যে নিম্ন কম্পাঙ্কের সিগ্‌ন্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় বাহক-তরঙ্গ।

বাহক-তরঙ্গের কম্পাঙ্ক যত বেশী হবে, তার মধ্যে তত বেশী সিগ্‌ন্যাল প্রেরণ করা সম্ভব। কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ অনুনাদ্র কথা এবং গান-বাজনার সঙ্কেত বহন করতে পারে। কিন্তু উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গ গান-বাজনা ছাড়াও চিত্র ফুটিয়ে তোলবার মত যথেষ্ট সঙ্কেত বহন করতে পারে।

কোন প্রচার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের বাহক-তরঙ্গের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সেই কম্পাঙ্কের তরঙ্গ অন্য কোন কেন্দ্র ব্যবহার করতে পারে না, কেন না তাহলে কোন গ্রাহক-যন্ত্রে একাধিক সংবাদ একই সঙ্গে ধরা পড়বে।

আলোক-তরঙ্গের অর্থাৎ অতিউচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের দৃশ্যমান অংশের অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের কথা চিন্তা করে দূর-সংযোজন প্রযুক্তিবিদেরা এই তরঙ্গকে দূর-সংযোজনের কাজে লাগাতে চাইলেন। তাঁদের অনেকেই ভাবলেন এ ব্যাপারে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করবার জন্যে। কিন্তু সঙ্কেতবাহী লেসার তরঙ্গকে আবহাওয়ামণ্ডল বেশী দূর যেতে দেবে না। দেখা গেল, অল্প কয়েক কিলোমিটার পথ যেতে না যেতেই আবহাওয়ামণ্ডলের বৃষ্টিপাত, মেঘ, ধূলিকণা—এদের মাধ্যমে প্রেরিত লেসার রশ্মির অধিকাংশ শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য বায়ু লেসার তরঙ্গের মধ্যে নিহিত সঙ্কেতের উপর অবাঞ্ছিত-ভাবে পরিবর্তন এনে দেয়। উপরন্তু বক্রপথেও লেসারকে পাঠানো সম্ভব নয়—আয়নমণ্ডল লেসার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে না। এই সব বিভিন্ন কারণে লেসার তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যমরূপে আবহাওয়ামণ্ডলের উপর ঠিক নির্ভর করা যায় না। কাজে কাজেই প্রয়োজন দেখা দিল এমন একটি মাধ্যমের, যার মধ্যে দিয়ে লেসার রশ্মি যাওয়ার সময় শক্তিহীন হয়ে পড়বে না বা অবিকৃত হয়ে যাবে না।

মাধ্যম খোঁজবার চেষ্টার ফল হিসাবে প্রথম এল এক ধরণের বায়ুমুক্ত নল, যার মধ্য দিয়ে সঙ্কেতবাহী আলোক তরঙ্গ প্রেরণ করা যাবে। প্রয়োজনমত এই নলের মধ্যে আয়না ফিট করা যাবে। এর পর এই নলেরই এক পরিবর্তিত রূপ পাওয়া গেল, যার আর নাম গ্যাস-লেন্স। নলের মধ্যকার গ্যাসকে বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক কুণ্ডলীর সাহায্যে তাপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ফলে

নলের মধ্যেকার গ্যাসের প্রতিসরাঙ্ক নলের অক্ষ অঞ্চলে বেশী হয় এবং অক্ষ অঞ্চল থেকে যতই বাইরের দিকে যাওয়া যায়, তাপমাত্রা বেশী হওয়ার জন্যে প্রতিসরাঙ্ক ততই কমতে থাকে। এই ব্যবস্থা আলোক-তরঙ্গকে নলের অক্ষীয় অঞ্চল দিয়ে চলতে সাহায্য করে। কেউ কেউ ভিতর দিকে পালিশ করা নলও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত প্রচেষ্টা গুলির কোনটাই যথাযথভাবে কার্যকরী হয় নি।

ইংল্যাণ্ডের স্ট্যাণ্ডার্ড টেলিকমিউনিকেশন লেবোরেটরীর চার্লস কাও এবং জি. এ. হকহ্যাম সর্বপ্রথম 1966 সালে একটি সম্ভাবনাময় পদ্ধতির কথা প্রচার করলেন। তাঁদের মতে আলোক-তরঙ্গকে দূর দূরান্তে প্রেরণ করতে হলে কাঁচের তৈরী তন্তু (Optical fibre) ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কাঁচের তৈরী তন্তু দিয়ে কি ভাবে তা সম্ভব? যখন একটা বেশী প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসরাঙ্কের মাধ্যমের দিকে আলো যায়, তখন আপতন কোণ যদি সেই মাধ্যমদ্বয়ের সঙ্কট কোণের বেশী হয়, তখন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে; অর্থাৎ আলো প্রথম মাধ্যমেই ফিরে আসে। কোন কোন কাঁচের তৈরী তন্তুর উপরে একটা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিসরাঙ্কের কাঁচের আস্তরণ থাকলে উপরিউক্ত ঘটনা ঘটা সম্ভব; অর্থাৎ একপ্রান্ত দিয়ে সেই তন্তুর অক্ষ বরাবর কোন আলোক রশ্মি ঢুকলে তার পৃষ্ঠতল দিয়ে তা বেরোতে পারবে না। কেননা বের হতে চাইলেই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে। এখানে দুই রকমের কাঁচের তন্তু দেখানো হয়েছে (১নং চিত্র—ক ও খ)।

তন্তুর মূল অংশটিকে বলা হয় কোর এবং বাইরের আস্তরণকে বলা হয় ক্লাডিং (Cladding)। চিত্রে খ-চিহ্নিত তন্তুটি এমনভাবে তৈরী হয়েছে যে, অক্ষীয় অংশ থেকে যতই তার পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যাবে, ততই প্রতিসরাঙ্ক কম হবে, অর্থাৎ অনেকটা গ্যাস-লেন্সের

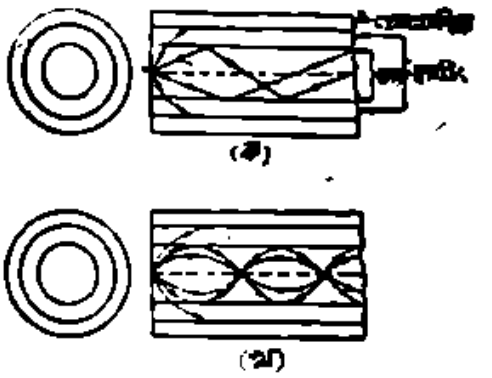

১নং চিত্র ক ও খ

মত। আজকাল চুলের চেয়েও সরু কাঁচের তন্তু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, যাতে আলোক-তরঙ্গ দোলিত হয়ে চলতে পারে।

নির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধানে কাঁচের তৈরী লেন্স রেখে সুসংবদ্ধ আলোক-তরঙ্গের মাধ্যমে যুগ্ম-সংযোজনের কথাও কেউ কেউ ভেবে থাকেন। এ ক্ষেত্রে লেন্সগুলি মাটির নীচে বায়ু নিরোধক নলের মধ্যে রাখবার কথাই তাঁরা বলে থাকেন। এ ব্যবস্থায় প্রতি কিলোমিটারে প্রায় সাত-আট-শ' ভাল লেন্সের প্রয়োজন; ফলে আলোক-তরঙ্গ খুব দ্রুত দোলিত হয়ে যায়। তাই এ ব্যবস্থায় আজকাল আর কেউ আগ্রহ দেন না।

যুগ্মপাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আলোক-তরঙ্গ ব্যবহার করতে হলে সুসংবদ্ধ লেসার রশ্মি ব্যবহার করবার কথাই সবচেয়ে বেশী ভাবা হচ্ছে। কিন্তু এর জন্যে এই কাঁচের তন্তুর উপরই নির্ভর করতে হবে বলে প্রযুক্তিবিদ্‌দের অভিমত।

নারী জগৎ

হিমালয়ের আহ্বান

অনুপমা সেন

[কেদারনাথে লিখেছেন বয়স খুব বেশী হ'লে তার দাঁত থাকে না, দৃষ্টিহীন হয় এবং একরকম বর্ষকরতা থাকে না। লেখিকার বর্তমান বয়স ছিয়াশি, তাঁরও হয়তো ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি সবকরিপুণা। এখনো তিনি বড়ি দিয়ে থাকেন থেকে শুরু করে মোগলাই খানা পর্যন্ত রান্না করতে সমান পটু। বাড়ীতে থাকলে তিনি রান্নাঘর থেকে নড়েন না। একলাই তিনি সারা ভারত ঘুরে বেড়ান। অল্প কিছুদিন আগে তিনি একলাই আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তার মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন। যাতায়াতে তিনি একটুও ঘাবড়ান নি। বছর ছয়েক আগে অর্থাৎ আশি বছর বয়সে তিনি কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ ধাম ভ্রমণ করেছিলেন। এ তারই কাহিনী।]

১৯৭৩ সন ২০শে মে আমরা হাওড়া হইতে শ্রীকেদার ও বদ্রিনারায়ণ দর্শনে রওনা হইলাম রাত ১০।০ টায় সময়। সঙ্গে আমার আত্মীয় ২ জন ছিলেন। গোয়া রহা আমাকে ষ্টেশনে তুলিয়া দিয়া গেল।

২২শে মে হরিদ্বার পৌঁছিলাম, তথায় ট্রেনেই আমাদের একদিন থাকিতে হইল। হৃষীকেশে ধর্মশালায় স্থান ছিল না শুনিলাম। আমরা হরিদ্বার হইতে টাঙ্গা ভাড়া করিয়া হরিদ্বার শহর দেখিতে গেলাম। রামকৃষ্ণ মিশন, ভেলানিবি আশ্রম কনখল লছমনঝোলা সব স্থানে হাটিয়া দেখিলাম। হরকে পৌড়ীতে সব দেবদেবী দর্শন করিলাম, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিবার সময় হরিদ্বারের গঙ্গায় মাছের খেলা দেখা হইল, এত বড়বড় মাছ সামনে আসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। এখানে মাছ মারা নিষেধ, সেইজন্য মাছও ভয় পায় না, স্নান করার সময় মনে হয়, মাছ সব গায়ে ধাক্কা দিয়া চলিয়া যায়। ভাগিরথীর পাড়ে মাছের খাওয়ার জন্য আটার গুলি করিয়া নিয়া বসিয়া আছে, আর "মছিকে খানা" মছিকে খানা বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ১০ পয়সার খানা নিয়া সকলেই জলে ফেলিতেছে। সেই খাওয়ার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় কই কাতলা মুড়িয়া বেড়াইতেছে—এ প্রকার দৃশ্য আর কখনো দেখি নাই, দেখিয়া খুব মজা লাগিতে লাগিল। লছমন ঝোলা পার হওয়ার আগে লছমন মন্দিরে পূজা দিয়া ও দর্শন করিয়া সব দেখিয়া লছমন ঝোলা পার হওয়ার সময় একটী অপূর্ব দৃশ্য দেখিলাম। একটী ছেলের দেহ দেখিয়া মনে হইল অল্প বয়স। উপুর হইয়া শুইয়া আছে, সমস্ত শরীর মাটীতে ঢোকা, গলা হইতে মাথা পর্যন্ত মাটীর নীচে, সম্পূর্ণ মাথা

মাটির নীচে। কোথা দিয়া নিঃশ্বাস নেয় বুঝিলাম না। হাতে একটি মালা অনবরত ঘুরিতেছে। সকলেই সেখানে পয়সা ফেলিতেছে। রাস্তার দুধারে ভিক্ষুকের শেষ নাই, খুঁড়ি রোগীর সংখ্যাই বেশী। লছমন ঝোলা পার হইয়া স্বর্গদ্বারে আসিলাম, এখানকার মোটামুটি সব দর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় আমরা লক্ষে এপারে আসিলাম। ভাগীরথীর কি স্রোত। সেদিন আমরা হরিদ্বার স্টেশনে রহিলাম। পরদিন ট্রেনে আমরা হৃষীকেশ আসিলাম, এখানে ভগবান ধর্মশালায় উঠিলাম।

হৃষীকেশে গীতাভবন গীতা মন্দির সব দর্শন করিয়া কনখল্ গেলাম। দক্ষযজ্ঞ যেখানে হইয়াছিল ও সতী যেখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন পণ্ডিত নিন্দা শুনিয়া সে স্থান দেখিয়া এখানে ভাগীরথী স্পর্শ করিয়া আমরা হৃষীকেশে আসিলাম। হৃষীকেশে গঙ্গা বা ভাগীরথী বলা হয় না, এখানে গঙ্গাকে বলা হয় "নীলধারা" আর হরিদ্বার আসিলে নাম হইয়াছে গঙ্গা বা পুণ্যতোয়া। যেমন স্রোত তেমনি ঠাণ্ডা। এই হৃষীকেশে বসিয়া কবে কোন যুগে মহাকবি বেদব্যাস কেদারখণ্ড ও শিবপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন ভাবিতেও অবাক হইতে হয়।

হৃষীকেশে রাস্তার ২ ধারে কেবল আমগাছ। এবার আমও খুব হইয়াছে এদিকে। প্রত্যেক গাছে অজস্র আম ধরিয়া আছে। সব আশ্রমেই দেখিলাম সব গাছ ফলে ফুলে ভরা। দেখিয়া বড় তৃপ্তি লাগিল। গীতা-ভবনে সর্বদা স্তোত্র পাঠ হইতেছে, ভবনের সমস্ত গায়ে গীতার শ্লোক! প্রকাণ্ড বাড়ী, কত লোক যাদের পর যায় এখানে আশ্রয় নেন। পাশেই গীতা মন্দির। সামনে নীলধারা বহিয়া যাইতেছে—সিঁড়ি বাঁধান ঘাট. আমরা সেখানে স্নান করিলাম। ২০ বছর আগে এখানে সিঁড়ী বাঁধান ঘাট ছিল না, তখন আমরা বড় বড় পাথরে বসিয়া স্নান করিয়াছিলাম। তাতেই যেন বেশী আনন্দ পাইয়াছিলাম। এই সভ্যতার ঐশ্বর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নাশ করিয়া দিতেছে।

কনখলে সতী কুণ্ডের কাছেই আনন্দময়ী মার আশ্রম।

হরিদ্বারে প্রতি সন্ধ্যায় গঙ্গা পূজা হয়, সে এক দর্শনীয় বস্তু! পুলের উপর দাঁড়াইয়া আমরা সে সৌন্দর্য উপভোগ করিলাম।

২৩।২৪শে আমরা হৃষীকেশে রহিলাম, আমাদের ২৬শে রওনা হওয়ার কথা ছিল, 'বাস' না পাওয়া যাওয়াতে আমাদের ২৭শে ভোরে রওনা হইতে হইল।

২৭শে ভোর ৭টায় ২খানা বাসে আমরা ৯০ জন যাত্রী দুই স্পেশালে শ্রীকেদার নাথ দর্শনে রওনা হইলাম। আমাদের মালপত্র ওজন করা হইল। জন-প্রতি ২০ সেরের বেশী নেওয়া নিষেধ। আমরা বেশী জিনিষ হৃষীকেশে ধর্মশালায় রাখিয়া দিলাম। আমার বিছানা কম্বল অতি ভারি ছিল, সেজন্য আমার সব মালের ওজন ২৭ সের হইল।

আমরা হৃষীকেশ হইতে রওনা হইয়া ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিলাম, লছমনঝোলা হৃষীকেশ হইয়া নীচে হরিদ্বার দেখিয়া জনপদী গ্রাম হইয়া দেবপ্রয়াগ পৌঁছিলাম। বাস থামিল; যাত্রীরা সকলে নামিয়া চারিদিক বেড়াইতে লাগিল, কেহ ফটো তুলিতে লাগিল। এখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। বাস যেখানে দাঁড়াইল বেশ খানিকটা সমতল স্থান, অনেক নীচে অলকানন্দার পাড়ে দেবপ্রয়াগ শহর, আমরা উপর হইতে দেখিতে লাগিলাম, বড় শহর—স্কুল কলেজ মন্দির ইত্যাদি সব আছে। উপর হইতে দেখিলাম ২দিক হইতে ২টি নদী—খড়স্রোতা নদী—এইখানে আসিয়া মিশিয়াছে, তার কি গর্জন কি ফেনা!! এই সঙ্গমের জল নিতে ইচ্ছা করিল, সামনেই দেখি ১০।১২ বছরের একটি ছেলে, ব্রাহ্মণ দেখিলেই বুঝা যায়, ফুটফুটে ছেলেটি। তাহাকে বলিলাম সে আমাকে গঙ্গা জল আনিয়া দিতে পারে কিনা, সে তখনই পাত্র চাহিল। পাত্র নিয়া সে নীচে চলিয়া গেল, ২০।২২ মিনিট পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে আমাকে পাত্র ভরিয়া জল আনিয়া দিল। আমি তাহাকে ১ টাকা দিলাম। তাহাতে সে আমাকে বলিল আমি ষষ্ঠ ক্লাসে পড়ি, আমাকে কেতাব কিনিতে পয়সা দেও। আর ১টি

টাকা দিলাম, বলিলাম ইহাতে হইবে? সে খুশী হইয়া বলিল, "খুব হোগা"।

সামনে ছোট ছোট আর ৫টি পাহাড় আসিয়া হাত পাতিল, ৫টি মুড়া পয়সা পাইয়া খুশী হইয়া চলিয়া গেল। পাহাড়ের উপর ধেনুবাহনীর মন্দির আছে, এখানে রাবণ বধ করিয়া রাম স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন। এরপরই ২টি ক্যানেল পার হইতে হইল। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। ভীষণ অন্ধকার ভিতরে।

তারপর কীর্তিনগর আসিলাম, পারোয়াল রাজ্য, পারোয়ালের রাজধানী কীর্তিনগর। এখানে দুপুরের আহারাদি করিয়া রওনা হইলাম বেলা ২টায়।

২টায় রুদ্রপ্রয়াগে আসিলাম, এখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। এখানে আমরা নামিলাম না, বাস থামিলে উপর হইতে দেখিলাম ছোট সহর, তারপর তিনধারা পার হইয়া আসিলাম অগস্ত্যমুনীর আশ্রম। দূর হইতে দেখিলাম উহা মঠ। এখান হইতে বৃষ্টি সুরু হইল। ৪॥ টায় গুপ্তকাশী আসিলাম। কেহ বলেন এখানে গুপ্তভাবে পাণ্ডবদের মহাদেব দর্শন দিয়াছিলেন; আবার কেহ বলেন ভীমের ভয়ে মহাদেব এখানে গুপ্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য গুপ্তকাশী নাম হইয়াছে।

আমরা সকলে নামিয়া গুপ্তকাশী দর্শন করিতে চলিলাম। পাথরের সিঁড়ী প্রায় ১০ তালার মত উঁচু, অল্প বৃষ্টি হইতেছিল। খানিকটা উঠিয়া আর উঠিতে পারি না, ডাক্তার আমার হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে উঠিতে লাগিলাম। খানিক পরে আমার কানে তালা লাগিল, ভয় পাইলাম। ডাক্তার বলিলেন ওরকম হয় বেশী উঁচুতে উঠিলে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আর যেন উঠিতে পারি না, এমন হয়রান মনে হইতে লাগিল, খানিক বিশ্রাম নিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। ২টা বাজের যাত্রীরা দর্শন করিতে নামিলাম। উপরে উঠিয়া আবার ৭৮টা সিঁড়ী—নীচে নামিলাম, খানিকটা পাথরের বাঙ্কার চক্র তার মধ্যে একটি ছোট কুণ্ড, একদিক হইতে ২টি পিতলের গোমুখ দিয়া জল পড়িতেছে, এখানে পূজা দিতে হয়। পূজা করিয়া আমি এক আঞ্জলি জল পান করিলাম। কি মিষ্টি ঠাণ্ডা জল। পান করিয়া যেন আমার সব ক্লান্তি দূর হইয়া গেল। বড়ই তৃপ্তি পাইলাম। আবার তিন-চারিটা সিঁড়ী উঠিলাম, আবার কয়েকটা সিঁড়ী নামিয়া নীচে মন্দির গর্ভে দেবতার দর্শন পাইলাম। অন্ধকার, চোখে দেখা যায় না, দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই বড় আলো জ্বালাইয়া দিলেন পুরোহিত, সুন্দর শিবলিঙ্গ সোনার গৌরীর পাট ঝকঝক করিতেছে, দুর্গা মূর্তিও আছে।

সোর গোড়ায় পাণ্ডা ছিলেন, ১ টাকা পূজা দিলাম পুরোহিত টাকাটি হাতে নিয়া সঙ্গে সঙ্গে রসিদ দিলেন, ইহা আর কোথাও দেখি নাই। আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—"তোমার যাত্রা সুফল হোগা"।

গুপ্তকাশী হইতে নামা হইয়া রামপুর আসিলাম, এখানেই রাত্রি বাস করিলাম ধর্মশালায়, বহু পুরানো মাটির দোতালা ঘুপ্সা ভরা; হোমবাতি জ্বালাইয়া রাত্রির আহার শেষ করিয়া শুইলাম, বেশ শীত। পরদিন সকালে ভাতিতে ত্রিযোগী নারায়ণ দর্শনে রওনা হইলাম। রামপুর হইতে সীতাপুর, গাড়াগড় আসিলাম এখানে শাকম্ভরী দেবী আছেন। যাত্রীরা সকলে নামিলাম। শাকম্ভরী দেবী দুর্গামূর্তি—এখানে পূজা দিতে হয়, বহুত দান করিতে হয়। ছোট ছোট বালুর রঙ্গের রঙ্গীন কাপড় ওখানে কিনিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডা বলিলেন এ স্থানটাও একটী পীঠস্থান, পুণ্যভূমি। কলিকাতা কালিঘাটে দেবীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলী পড়িয়াছিল, এখানে দেবীর অনামিকা অঙ্গুলী পড়িয়াছিল। শাকম্ভরী দেবী পাথরের গায়ে খোদাই করা দুর্গামূর্তী।

এর পর ত্রিযোগী নারায়ণ আসিলাম। ত্রিযোগী নারায়ণ বড় মূর্তি, নারায়ণ মূর্তি। নারায়ণের নাভি হইতে সামনের কুণ্ডে জল পড়ে। এখানে হর পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল, এই নারায়ণ তার সাক্ষী ছিলেন। তিন যুগ হইতে এখানে আছেন, তাই নাম হইয়াছে

ত্রিযোগী নারায়ণ। এখানে ৪টী কুণ্ড আছে ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতীকুণ্ড। কোনটাতে তর্পণ, কোনটাতে স্নান, কোনটাতে জলপান করার বিধি আছে। মন্দিরের ভিতর অন্ধকার। সরস্বতীকুণ্ডে সাপ আছে শুনিলাম, দেখি নাই। পার্বতীর বিবাহের যজ্ঞকুণ্ড এখনো জ্বলিতেছে, যাত্রীদের সকলকে আট আনায় একখানা কাঠ কিনিয়া উহাতে ফেলিয়া দিতে হয়। কাঠ ওখানেই কিনিতে পাওয়া যায়। পাইন গাছের ছোট একটী টুকরা। যে স্থানে পার্বতীর বিবাহ হইয়াছিল তাহা দেখানে হইল।—খানিকটা সমতল পাথরের চত্বর—মাঝখানে খানিকটা স্থানে গর্ত কাটা আছে, সেখানটাই বিবাহের হাতমাতলা। এখানে ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিতে হয়। ডাল চাল ওখানেই কিনিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ডাণ্ডিতে গৌরীকুণ্ড আসিলাম, সন্ধ্যার সময়। গৌরীকুণ্ডে রাত্রি বাস করিলাম। গৌরী এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাই গৌরীকুণ্ড নাম। গৌরীকুণ্ডে ঠাণ্ডা জল, তাহা স্পর্শ করিতে ও পূজা করিতে হয়। ইহার ২৪।৩০ হাত দূরে "তপ্তকুণ্ড", ইহার জল ভীষণ গরম, ধোঁয়া উঠিতেছে, ২টি নলের মুখ দিয়া গরম জল পড়িতেছে। এত গরম প্রথমে হাত দিতেই ভয় করে। সেখানে যাত্রীরা সকলে স্নান করিয়া পরম আরাম উপভোগ করে। গৌরীকুণ্ডে কালী কম্বলীবালা ধর্মশালায় উঠিলাম। 'কালী কম্বলীবালা ধর্মশালা'—যে মহাপ্রাণ বা মহাপুরুষ স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি সর্বদা একটী কালো কম্বল গায়ে দিয়া থাকিতেন বলিয়া তার নাম হইল—কালীকম্বলীবালা ধর্মশালা। এদিকে যত চটী আছে সব স্থানে এই ধর্মশালা আছে। বহু পুরাণ; লেপ কম্বল ভাড়া পাওয়া যায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য, রান্নার জন্য বাসনও ভাড়া পাওয়া যায়। শুনিলাম কালো কম্বল গায়ে দেওয়া সাধুটী বাঙ্গালী ছিলেন।

গৌরীকুণ্ডে রাত্রি বাস করিয়া—পরদিন ভোর ৬টায় রওনা হইলাম। একসঙ্গে ২৭ খানা ডাণ্ডি, তার উপর দোড়া, পদব্রজে চলাতেও অনেক যাত্রী ছিলেন, পদব্রজের যাত্রীরা লাঠি হাতে সামান্য জিনিষ সহ একটী ব্যাগ হাতে নিয়া পর্বের সঙ্গে হাঁটিয়া দেব দর্শনে চলিলেন; আমরা অনেক, সন্ধ্যায় মাথা হেঁট করিয়া অন্যের পিছে দেবদর্শনে চলিলাম।

গৌরী কুণ্ড হইতে ত্রিযুগা ভৈরব হইয়া জঙ্গলচটী কিংবা জিলিপী চটীতে আসিলাম, জিলিপী চটীতে নাকি জিলিপী খাইতে হয়। ডাণ্ডিওয়ালা ৪ জনে দেড়শ পয়সা নিল। জিলিপী চটী হইতে রামপুর চটীতে আসিলাম। এখানে ১ রাত্রি বাস করি; এখানেও কালীকম্বলীবালা ধর্মশালায় উঠিলাম।

রামবাড়া চটী হইতে রওনা হইলাম; চারিদিকে অপূর্ব দৃশ্য; যেমন অপূর্ব, তেমন ভীষণ। চারিদিকবরফে ভরা, সমস্ত পাহাড়ের গা হইতে বরফ গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে, এক এক স্থানে মনে হইতেছে পর্বতসব সাদা কুলের মালা পরিয়া আছেন। কখনও বৃষ্টি কখনও রোদ, রোদের সময় বরফ ঝলমল করিতেছে সূর্যের কিরণে, এক এক সময় এক এক রং পর্বত গায়ে পড়িতেছে, অবাক হইয়া দেখিতেই হয়, বলা যায় না। ভগবানের প্রধান সৃষ্টি হইল সমুদ্র ও পর্বত—রূপের খনি!

নীচের দিকে তাকাইলে হিমালয়ের ভীষণ মূর্তিও চোখে পড়ে। বিরাট খাদ। শত শত ফুট নীচে অলকানন্দা কাপড়ের ফালির মত সাদা আঁকিয়া বাঁকিয়া ভীষণ গর্জন করিয়া কার উদ্দেশে চলিয়াছে, কোন বাধা মানিতেছে না!

তারপর ছোট ছোট ৩টী, তোলাপাণী, মুখটা গণেশ। কেন এ স্থানের এ নাম হইল কেহ বলিতে পারিল না। আমার মনে হয়, শনিঠাকুরের দৃষ্টিতে যখন গণেশ-ঠাকুর মুণ্ডহীন হইয়াছিলেন তার সঙ্গে এ স্থানের কোন যোগ হয়তো ছিল।

২৬শে ১২টায় আমরা সুমেরু পর্বত ডাইনে রাখিয়া শ্রীকেদার দর্শনে রওনা হইলাম। পথে যত যাত্রীর সঙ্গে দেখা হইতেছে, সকলের মুখেই এক কথা—বিশাল কেদার

নাথের জয়, "জয় কেদার বদ্রীনাথের জয়", সকলেই যেন সকলের তালভাবে দর্শন কামনা করিতেছে। অতি সরু রাস্তা ২টি লোক পাশাপাশি চলিতে পারা যায় না, বিপরীত দিক হইতে যাত্রী আসিলে পাহাড়ে গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে হয়। চারিদিকে বরফে সব পর্বত ঢাকা, কোথাও ছাদের মত বরফ পড়িয়াছে ও এখন গলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে ঝরণার আওয়াজ—কত ছোট বড় ঝরণা যেখা গেল তার ইয়ত্তা নাই। দেখিলাম পাহাড়ী কুলিরা রাস্তার চলিতে চলিতে বরফ খাইতেছে। আমি ভাতিওয়ালাকে বলিয়া খানিকটা বরফ লইলাম। আমরা যে রকম বরফ দেখি, এ বরফ সে প্রকার নয়। ছোট ছোট দানা, দানুবাবার মত, নরম, ইচ্ছামত গোল করা যায়।

এদিকে কোন পাখী কিংবা পশু দেখিলাম না। হিমালয়ের গম্ভীর স্তব্ধ ভাব, কেবল অলকানন্দার গর্জনের শব্দ যেন হিমালয়ের প্রাণের সাড়া দিতেছে। একদিকে অভ্রভেদী পর্বত, অন্যদিকে শত শত ফুট নিচে অলকানন্দা চলিয়াছেন গর্জন করিতে করিতে।

শোনপ্রয়াগ—এখানে শোনগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থল। আরোহের ভাতি পর্বতের ভিতরে ঢুকিয়াছে, অলকানন্দার দেখা নাই কিন্তু তার গর্জন শোনা যাইতেছে। কি চড়াই রাস্তা খানিকটা ডাইনে আসে আসে উপরে উঠিতেছে, আবার বাঁয়ের দিকে আসে আসে উপরে উঠিতেছে। যাত্রীদের উপরে উঠিতে এই রাস্তায় খুব কষ্ট, দামান্য ব্যাগ নিতেও কষ্ট হয়। অনেক উপরে উঠিয়া নিচের দিকে তাকাইলে এই রাস্তাটি সিঁড়ীর মত দেখায়।

কেদার পর্বতে উঠিতে দারুণ কষ্ট, তাই সেখানে মানুষ ঘোড়া নিয়া ভাড়া দেওয়ার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। যাহারা হাঁটিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা চলিতে অপারগ হইলে ঘোড়া ভাড়া করিতেছেন। ভাড়া অত্যন্ত বেশী—৩০।৪০ টাকা হাঁকিতেছে শুনিলাম, ২ মাইল রাস্তা মাত্র বাকী।

শ্রীকেদার এখান হইতে মাত্র ২ ফার্লং রাস্তা বাকী। এখানে পঞ্চম চটী হইতে ঢোল বাজাইয়া যাত্রীদের যে আর চড়াই রাস্তা নাই তাহা জানাইয়া দেয়। অনেক দূর হইতে ঢোলের আওয়াজ শোনা যায়। ঢোল বাদক সামনে একটি থালা রাখিয়াছে, যাত্রীরা তাহাতে পয়সা দিতেছে। রাস্তার কঠিনতা কমিয়া গেল, এত নিকটে শ্রীকেদারনাথ! এখানে ভাতিওয়ালারা বিশ্রাম নিল, তখনও বেলা আছে, মনে হইল এখন একটু হাঁটিয়া যাই, নামিয়া হাঁটিতে লাগিলাম, খানিক যাইয়া পারিলাম না, গা বমি বমি করিতে লাগিল। একটু বেলা থাকিতেই শ্রীকেদারে পৌঁছিলাম আবার সেই কালী-কম্বলী ধর্মশালায় উঠিলাম। খুলো পায়ে ওরা সকলে দর্শন করিতে গেল, আমার নিশ্বাসের কষ্ট হইল, তারপর কোয়াধিন খাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সুন্দরবনের মানুষ

(৪২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

বিমলবাবুই পরিচয় করিয়ে দেন—এর আগে ম্যানেজারকে এ-ই মেরেছিল প্রায়। খুব ভালো ছেলে—পড়াশোনাতেও ভালো।

মিঃ মিত্র ওকে দেখছেন। বলেন—সুন্দর বনের মানুষ তুমি, এখানের মানুষের জন্য, এই সুন্দরবন এলাকার জন্য সত্যিকার কিছু করতে পারো।

...রাত হয়ে আসছে।

পরেশবাবু বলেন—কলেজের চাকরীই নিলাম। সুন্দরবন ভীষণ ভয়াবহ। পদে পদে এখানে বিপদ—মৃত্যু। তবু এখানের মানুষ বেঁচে থাকে। এর থেকেই বাঁচার চেষ্টা করে।

সুন্দর বনের মাটিকে তাই সুন্দর করে তোলার জন্যই সেখানে ওই হাজার হাজার নারকেল গাছ-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। পরেশবাবু বলে—এ পরীক্ষা সার্থক হলে সুন্দরবনের মানুষের রূপ আরও খুলবে। এর মাটিতে সোনা ফলবে। আর ভয় বিপদ—এ সব জয় করেই মানুষকে বাঁচতে হয়।

ওই শুকনটির কথায় কি সতেজ ভাব ফুটে ওঠে। এরা সত্যিকার মানুষ। বিপদকে ভয় করে নয়, জয় করে নোতুন এক জগৎ গড়ে তুলতে চায়।

এরাই আগামী দিনের তরুণ।

Telephone No. : 22-4616
Telex : (021) 2754

Sawalka KEL Private Limited.,

OLDEST MANUFACTURERS OF ORIGINAL EQUIPMENT FOR CARS & TRUCKS

23A, Netaji Subhas Road,
7 TH. FLOOR. CALCUTTA-700 001.

PHONE : 33-5676

TRIPTI BISCUIT AND LOZENGE CO.

Manufacturers of

BARON BREAD

CAKES
and
BISCUITS

OFFICE & WORKSHOP

156/157 AHIRITOLA STREET

CALCUTTA-700005

শ্রীবিমলকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ মুদ্রণালয়, গ্রাম : বাগুইআটি পো: অধিনী নগর, কলিকাতা-৫৯ (ফোন : ৫৭-২১৯০) হইতে প্রকাশিত এবং মিটি প্রিন্ট হাউস ২১এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত। কার্যালয় : ৩৭বি, বি. কে. পি. রোড, [illegible] ৭ ডি, [illegible] লেন, কলিকাতা-৬।

উজ্জ্বল ভারত

With Best Compliments From :

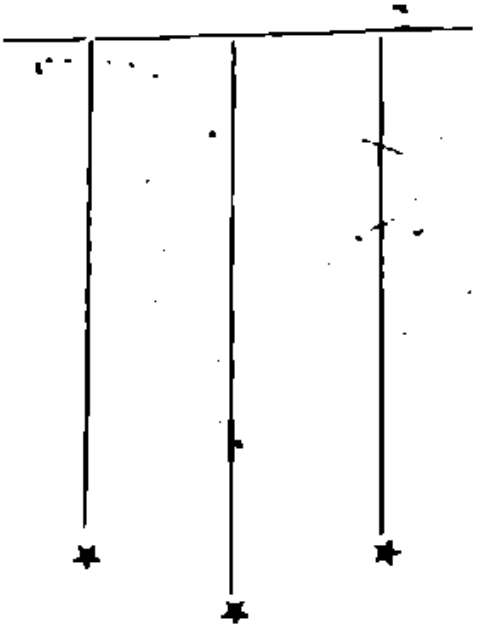

S. N. Sen & Co.

Manufacturers of Unparalleled
'SENCO' Conduit Pipes.

18/1, SHIBNARAYAN DAS LANE,
CALCUTTA - 700 006

Gram : CONAX

Phone : 35-3097

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১। ব্রহ্মসূত্র ত্রিখণ্ডে	১৬·০০
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪। ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫। কেনোপনিষদ্	৩·০০
৬। কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭। প্রশ্নোপনিষদ্	৩·০০
৮। ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	১·০০
৯। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৭·০০
১০। তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৭·০০

শ্রীপ্রতিভা রায় রচিত

১। নারী প্রগতির ভূমিকথা	৩·০০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

রেণু মিত্র রচিত

১। সনয় স্মৃতি শ্রীনিত্যগোপাল	১·০০
২। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩। রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
৪। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১১·০০	সদা পাঠ্য গীতা	১·০০
বৃহৎ পকেট গীতা	৭·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	১৮·০০
সুলভ পকেট গীতা	২·৫০	কর্মযোগী	২·০০
পদ্য গীতা	২·৫০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০
নিত্য পাঠ্য গীতা	১·৫০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৭·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৩·৫০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
বাংলার ঋষি	৬·৫০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৩·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৩·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৩·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য	৩·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৩·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক অভিধান ১৫·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ● ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

Gram : "STAYWIRE"

Showroom : 22-9515
Office : 33-8005
Works : 69-2011

B. P. TRADING CO.

Office :

42, Strand Road, Calcutta-700007

Show Room :

24, Raja Woodmunt Street, Calcutta-700001

Works

34, Sri Kisen Vakat Lane, Howrah-711101

Dealers in

Ropes of all Sorts, Chains & Fittings, Lifting Tackles, Marine Stores & General Hardware.

Manufacturers of :

Overhead Transmission Line Equipments,-Stay Materials & lifting Tackles.

Phone : 22-3401

ALLIANCE MILLS (LESSEES) Private Ltd.

18, NETAJI SUBHASH ROAD,
CALCUTTA-700001

With the compliments of

MAJESTIC INDUSTRY

MECHANICAL ENGINEERS

131/D Acharya Profulla Chandra Road
CALCUTTA-700006

DESAI MOTORS

Specialist in Jeep, Ambassador and T. M. B. Spares.

8, PRINCEP STREET
CALCUTTA

জনগণই আমাদের উক্তির উৎস

বামফ্রন্ট সরকার ৩৬ দফা কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

গ্রাম শহরের শ্রমজীবী মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করছেন। ক্ষেত মজুররা বিধিসঙ্গত নিম্নতম মজুরী আদায় করছেন। বর্গাদাররা 'অপারেশন বর্গায়' পাচ্ছেন বর্গার স্বত্ব। নির্বাচিত পঞ্চায়েত-গুলির মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে আজ এসেছে এক নতুন আত্ম বিশ্বাসের জোয়ার।

শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে হচ্ছেন জয়যুক্ত। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার।

বামফ্রন্ট সরকার শিল্প ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে দৃঢ় সংকল্প।

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যা ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার।

গ্রাম-শহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের শত্রুরা গণআন্দোলনের আঘাতে আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ো তুলছেন আইন ও শৃঙ্খলার।

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন পশ্চিমবাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চান। এই সরকার একান্তভাবেই বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির উৎস।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With the compliments of

TATA STEEL

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও গ্রন্থ প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম: বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা: ২৪ পরগণা (ফোন: ৫১-২৪৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed A/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানেরনবাগত লেখকলেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বলভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

উদ্ধার ভারত ৩২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা চৈত্র '৮৫

সূচীপত্র

সবার উপরে মানুষ সত্য | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৮৫
নূতন যুগের নূতন মানুষ | সম্পাদকীয় | ৮৬
প্রসঙ্গ বঙ্গীয় স্বাধীনতা | গৌরচন্দ্র সাহা | ৮৭
মূর্তিপূজার দিন | নচিকেতা
ভরদ্বাজ—৮৮
পরমধনি। সত্যোষকুমার অধিকারী।৮৮
অমৃতের খোঁজে | গোপা মজুমদার।৮৯
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি | স্বপন মুন্সী | ৯০
বহৎ শিক্ষায় মহান পরিণতি | নরদিন্দু সাহা | ৯১
ভাষা-প্রসঙ্গ। ডাঃ ধীরেন চৌধুরী। ৯৮
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ৯৯
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী।১০৭
সুরের আকাশ। অখিল রঞ্জন রায়।১০৯
বন্যার গান | মৌসুমী সাহা | ১১৩
বালক শিবনাথ শাস্ত্রী | দীপেন সাহা | ১১৪
হিমালয়ের আহ্বান। অনুপমা সেন।১১৬

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
মুখ্য সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা

মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)
বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

সবার উপরে মানুষ সত্য

সবার উপরে মানুষ সত্য। হিন্দু তখনই সত্যকার হিন্দু, যখন সে 'মানুষ'; মুসলমানও তখন সত্যিকার মুসলমান যখন সে 'মানুষ'। 'মানুষ' একাধারে হিন্দুরও উপর', একাধারে মুসলমানেরও 'উপর'। হিন্দু যখন সঙ্কীর্ণ হিন্দু উপাধি ডিঙাইয়া 'মানুষের' স্তরে আসীন হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব হিন্দু; মুসলমানও যখন সঙ্কীর্ণ মুসলমান উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'মানুষে'র স্তরে উন্নীত হইবে, তখনই সে সত্য বাস্তব মুসলমান। দুই দুই থাকিয়া, দুইয়ের বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া এবং তিন তিন থাকিয়া, তিনের বিশেষত্ব অটুট রাখিয়াও যেমন ছয় এর মাঝে এক হইতে পারে ঠিক তেমনই মানুষের মাঝেই হিন্দু মুসলমান স্ব স্ব পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক হইতে পারে। হিন্দু মুসলমান যদি এই কৌশলের খোঁজ না রাখে, বুকে বুক মিলাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণ না করে, তাহা হইলে হিন্দু মানুষও নয়, হিন্দুও নয়; মুসলমান মানুষও নয়, মুসলমানও নয়। সহজ মানুষকে জানিয়া, সহজ মানুষ বনিয়া গিয়া হিন্দু মুসলমান নিজেকে জানো, আত্মস্থ হও। মানুষ-রাজ প্রতিষ্ঠাই আজ ধ্যানের বস্তু—হিন্দু-রাজও নয়, মুসলমান-রাজও নয়।···

হিন্দু যদি এখনও আত্মশক্তির উদ্বোধনে দৃঢ়-সঙ্কল্প না হয়, তাহাকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইতেই হইবে। হিন্দু তাহার বেদ বেদান্ত, তাহার জগদ্বিজয়ী আধ্যাত্মিকতার গর্ব করেন, কিন্তু সে গর্ব করিবার অধিকার তাহার আছে কি? সে যদি অন্যান্যবলেই বলী, তবে কেন সে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে 'আত্মঘেরাঘনাকুই' হইতে পারিল না? যেদিন হইতে হিন্দু আত্মা বলিতে পরিবার সমাজ ও জাতি-বর্জিত আত্মা বুঝিয়াছে, সেদিন ধর্ম ও সংসারের মাঝে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া উঠিয়া পরস্পরের মিলন-সূত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সেদিন হইতে ধর্মও গিয়াছে, সংসারও ডুবিয়াছে। আজ চাই সেই স্রোতকে ফিরাইয়া হিন্দুর যথার্থ শিক্ষা সভ্যতা ও মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। ভারতের আদর্শ রাজর্ষি জনক। জনক ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী ও কৃষক একাধারে। কৃষি বর্জন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান আজ নিরাশ্রয়, কৃষিক্ষেত্র হিন্দুর হাত-ছাড়া; এই সুপ্ত কৃষিক্ষেত্রকে আবার উদ্ধার করিতেই হইবে।···

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়

নূতন যুগের নূতন মানুষ শ্রীনিত্যগোপাল

বর্ণাশ্রমীয় সিঁড়িতত্ত্বের উচ্চ নীচ ভেদবাদ না মেনে সমস্ত মানুষকে যিনি মানুষ হিসেবে তাঁর প্রাণের ঐশ্বর্যের মধ্যে গ্রহণ করে ছিলেন, ভারতীয় প্রচলিত দৃষ্টি-ভঙ্গিতে অবহেলিত নারী ও শূদ্রকে যিনি সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে সমান মান ও মর্যাদায় গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী হয়ে প্রায় আট বছর আগে যিনি তাঁর মঠে নারীকে উচ্চ জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছিলেন, একদিন রচনার মূলসূত্র সকল বিরুদ্ধতার সমন্বয় স্বীকার করে যিনি নিজেকে বিশ্বনাগরিক বলে ঘোষণা করে গেছেন, জগৎ মিথ্যাবাদের মানসিকতা তথা দর্শনকে ভুল প্রমাণিত করে তার স্বরূপে 'এই বিশ্বই আমার মহামঠ' বলে যিনি ঘোষণা করে গেছেন, মানুষে মানুষে সম্পর্ককে যিনি পারস্পরিক independent at the same time' inter-dependent বলে প্রমাণন করেছেন, অত্যাধুনিক এই সব মানসিকতার অধিকারী হয়েও যে সন্ন্যাসী নির্বিকল্প সমাধিতে মুহুর্মুহু জাগ্রত জীবনকে ছাড়িয়ে কোথায় চলে যেতেন, সেই পরম আশ্চর্য পুরুষোত্তম সমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল—যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূতকে এই চৈত্র বাসন্তী অষ্টমীতে তাঁর ১২৬-তম জন্মবাসরে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। সত্যের সর্বাঙ্গীণ রূপ আজ সর্বত্র প্রকাশ পেতে চাইছে, তাই শ্রীনিত্যগোপালকে আজ বড় প্রয়োজন। মানুষ সর্ব কুসংস্কার-মুক্ত বিপ্লবী সামগ্রিক জীবনকে পেতে চাইছে—তাই শ্রীনিত্যগোপালকে আজ বড় প্রয়োজন। মানুষই ভাগবতী সত্তায় রূপান্তরিত হতে পারে এই মাটিরই বুকে এ কথা জানিয়েছিলেন বলে শ্রীনিত্যগোপালকে আজ বড় প্রয়োজন। কিন্তু এ প্রয়োজন আজও চেতনায় এখনও ব্যক্ত হয়ে ওঠে নি। কেননা মানুষের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভের আহ্বান, আবার মানুষই বেছে নেয় একদেশদর্শী সত্যের খণ্ড খণ্ডতা, রচনা করে মানুষে মানুষে ভেদ। এই একদেশদর্শিতা ভেদবাদের কুসংস্কারের শেকড় আজও অনেক গভীরে, তাই আজও শ্রীনিত্যগোপাল অপ্রকাশিত। একান্ত অদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষকে নিয়তির হাতের পুতুল করেছিল, তার পৌরুষ ও কর্মশক্তি কেড়ে নিয়ে পরের দাসত্ব করেও আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায় এই শিখিয়েছিল—তারই প্রতিক্রিয়ায় আজ সত্যের অপর দিক একান্ত জড়বাদ মানুষকে চূড়ান্ত সুবিধাবাদী করে তুলে ব্যক্তি ও সমাজের সত্তা শান্তি সৌন্দর্য সব নষ্ট করে দিয়েছে। এই উভয় সংকট থেকে আত্মরক্ষার পথ শ্রীনিত্যগোপাল তাঁর জীবনের আচরণে ও তাঁর প্রদর্শিত ভবে রেখে গেছেন। এতদিনকার মুখস্ত করা অধ্যাত্মবাদে ও তাঁকে বোঝা যাবে না, একান্ত জড়বাদের প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী সত্যের মাপকাঠি দিয়েও তাঁকে পাওয়া যাবে না। তাই তিনি একক, একেবারে একলা সকলের বাইরে পড়ে আছেন। বিরুদ্ধ ধর্ম তাঁর মধ্যে অতি সহজ ছিল বলেই তিনি যেমন সুন্দর তেমনি দুর্বোধ্য—তাই তিনি এত অপরিচিত। তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নন, তাঁর পরিচয় শুধু একজন সহজ প্রাণবান মানুষ হিসাবে—তিনি সর্ব জাতীয়, তিনি নিপুণ গৃহস্থ, তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন সন্ন্যাসী, তিনি নিজ দেশকে ভালবাসেন, তিনি সকল দেশকে ভালবেসে বিশ্বনাগরিক, তিনি সমাজের সর্বস্তরের গ্লানি দূর করে সুস্থ জীবন-চেতনা আনতে প্রয়াসী হয়ে বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক, তিনি বন্ধু, তিনি পরম আপন জন। তাই তিনি কারোরই কিছু নন। তিনি সকলের হয়েই একক।

নূতন যুগের নূতন মানুষ সর্বক্ষেত্রের বিপ্লবী এই শ্রীনিত্যগোপালকে নমস্কার।

প্রসঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা

গৌরচন্দ্র সাহা

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিল ('Freedom of Religion Bill') নামে একটি বিল আনা হ'য়েছে। বিলটি হ'লেও এই বিলটি উত্থাপনের জন্য সংসদ সদস্য ওমপ্রকাশ ত্যাগী মহাশয় এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে ধন্যবাদার্হ। এই বিলের মূল ধারায় আছে যে প্রয়োচনা, প্রতারণা, ছলনা, বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন দ্বারা ধর্মান্তর করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। যদিও আমাদের সংবিধানের ধারা অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণের স্বাধীনতায় কোনও রূপ বিরোধিতা এই বিলে করা হয়নি তবুও এই বিল উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কোনও কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এত প্রতিবাদের ঝড় উঠছে কেন? তবে কি ধ'রে নিতে হবে যে এই সব ধর্মীয় নেতারা চান যে উপরোক্ত পদ্ধতিতে ধর্মান্তরের কার্যকলাপ অবাধে চ'লতে থাকুক? তাঁরা কি এই অসাধু পদ্ধতিতেই এ যাবৎকাল ধর্মান্তর করিয়ে এসেছেন?

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ভারতীয় সংবিধানে আছে যে ভারতে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকবে। ব্যক্তির পক্ষে কোনও ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেক ধর্মের জন্য প্রচারের স্বাধীনতাও থাকবে। কিন্তু এই শেষোক্ত ধারার রন্ধ্র পথেই শনি প্রবেশ ক'রেছে। প্রচারের স্বাধীনতার নামে হ'য়েছে অপপ্রচার। এবং সেই অপপ্রচার ভারতবর্ষের মূল ধর্মমতের বিরুদ্ধেই হ'য়েছে। তার শিকার হ'য়েছে আমাদের অসংখ্য দেশবাসী বিশেষ ক'রে সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বলতর অংশ। তাদের অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে অপপ্রচারে মুখর হ'য়েছে বহিরাগত বিশেষ কয়েকটি ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীরা। এদের পিছনে রাজনৈতিক তথা আর্থিক মদত জোগাচ্ছে অনেক বৈদেশিক রাষ্ট্র। আমাদের দারিদ্র্য ও সহিষ্ণুতার ফলে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। যে বিপদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়ের পর্বত বন্দরে, কাশ্মীরে, কন্যাকুমারিকায়, ছোট নাগপুর—মধ্যপ্রদেশের মালভূমি অঞ্চলে। প্রচারের চটকে বা প্রলোভনে ভুলে সেখানে হাজার হাজার মানুষ বীন খৃষ্টপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে।

কিন্তু এই ধর্মান্তরের প্রয়োজন কেন? কোনও ধর্মের প্রবর্তকের নিশ্চয়ই এমন নির্দেশ ছিল না যে প্ররোচনা, প্রতারণা, ছলনা, বলপ্রয়োগ বা প্রলোভন দ্বারা তাঁর মতবাদ প্রচার বা তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রতে হবে। মনুষ্য জাতির সামগ্রিক কল্যাণেই ছিল তাঁদের কামনা। প্রতিটি ধর্মের মূল নীতিগুলি মোটামুটি একই রূপ —উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ। তবুও এটা দুর্ভাগ্যজনক যে দেশে দেশে যুগে যুগে অত্যুৎসাহী প্রচারকেরা ছলনীতি অনুসরণ ক'রে তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচারে ব্রতী হ'য়েছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মহাপুরুষেরা ব্যক্তি, সমাজ তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য বহু নীতি নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভক্তি স্মৃতি পরম্পরায় সেই সব নীতি বাক্য অনুসৃত হ'য়েছে দেশে দেশে। কালক্রমে সেগুলি লিপিবদ্ধ হ'য়ে ধর্মশাস্ত্ররূপে স্থায়িত্ব লাভ ক'রেছে। নিছক পরিচয়ের প্রয়োজনেই ইতিহাসে এই সব বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী কালক্রমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব'লে চিহ্নিত হ'য়েছে। নীতিগুলি যখন একই রূপ তখন এক ধর্মের পরিচয়ধারীরা নিজের অজান্তে নিশ্চয়ই অপর ধর্মের আদর্শও অনুসরণ ক'রে এসেছেন। তা হ'লে ধর্মান্তরের প্রয়োজন কোথায়? মূল আদর্শ এক অথচ পরমত-সহিষ্ণুতা নেই। তাই যুগে যুগে ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে হ'য়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। হ'য়েছে ক্রুসেড, জেহাদ। সেই বিকৃত নীতির জের আজও চ'লেছে দেশে দেশে। আমরাও তার শিকার হ'য়েছি। বহু শতাব্দীর এই সমস্যা এক দিনে সমাধান করা যাবে না। তবে বোধ হয় দিন এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রধান ধর্মগুরুদের এক সঙ্গে ব'সে একটা নীতি শৃঙ্খলা গ্রহণের যাতে ধর্মান্তর চিরতরে বন্ধ হয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই সকল

(৮৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কবিতা

মূর্তি-পূজার দিন ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ

জীবনের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার
এখনো তো সময় হয় নি।
কারণ দু'চোখ থেকে যৌবনের দুরন্ত বিস্ময়
মোছে তো হয় নি শেষ। এখনো অনেকগুলি
জানালা দুয়ার
খুলে রাখতে হবে এই ঘরে : হাতুড়ি ও ছেনি
হাতে নিয়ে কোনো মূর্তি,—মহৎ হৃদয়ের
প্রস্তর অথবা হিরণ্ময়,
গ'ড়ে তোলা—এখন তা সম্ভব নয়।
কেউ কোনোদিন তা পারে নি,
পারে না।
সময়ের চতুরঙ্গ সেনা
তাদের সঙ্গে বহু কুরুক্ষেত্রে মুখোমুখি হতে হয়,
… …অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা
প্রায়শঃ নির্মূল হয়; তারপরও জীবন রচনা।
এবং তখনই এ জীবনের স্থায়ী প্রয়োজনা
সম্ভব হতে পারে, হয়।
এবং তখনই শুধু যথার্থ সিদ্ধান্তের প্রশ্নই সময়
এবং তখনই মাত্র লৌকিক ভাস্করের হাতে
অলৌকিক মূর্তির বিস্ময়
ফুটে উঠতে পারে!
এবং তাহাই মাত্র রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ের আঘাতে
বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকতে পারে সূর্য করোজ্জ্বল প্রশ্ন
পৃথিবীতে।
…তা না হলে জীবনকে কে রাখিতে পারে!
শুধু আজীবন খুঁজে সেই অনাহত উদাত্ত সঙ্গীতে
বার বার। অতএব আপাততঃ খোলা থাক স্টুডিওর
সমস্ত দুয়ার।

পদধ্বনি ॥ সন্তোষকুমার অধিকারী

সব শব্দ থেমে গেলে একটি নির্জন মন কান পেতে শোনে
পদধ্বনি তার;
দিন হ'য়ে এলে শেষ সব আলো দূরিয়ে আকাশে
যখন আঁধার,—
নিঃশব্দ চরণ তার ধীরে এসে শিয়রে আমার।
সমস্ত জীবন ঘুড়ে আর্তনাদ;
সহসা মত্তন দিন ছিঁড়ে নিয়ে যায়
হৃদয়ের সুধা,
আরো আরো আয়ো চাই—
অমের আকাংক্ষা আর অন্তহীন ক্ষুধা।
দুই মুঠি ভরে ওঠে সোনায় সম্ভারে,
চোখে শুধু দুরন্ত বাসনা
তবু দিন শেষ হয়, রাত্রি নামে; ঝরে যায় সোনা।
নির্জনতা ডেকে যেয় আমার হৃদয়,
শুধু শূন্যতার হাহাকার জাগে,
আমি নীল অন্ধকারে চেতনাকে হাতে ধরে রাখি।
জানি এইবার
সমস্ত আকাশ ভরে বেজে উঠবে পদধ্বনি তার,
সে আসবে আমার।

প্রসঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা

(৮৭ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠিত ধর্মের দুর্নীতি সম্বন্ধে সাধারণকে অবহিত করার এক কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক যাতে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ স্বীয় ধর্মে অবিচল থেকেও অপর ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-শীল হ'য়ে উঠতে পারে। এতে করে একদিন বিশ্ব থেকে ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে যে অশান্তি সৃষ্টি হ'য়েছে তার অবসান ঘ'টবে।

কিন্তু যতদিন তা না হ'চ্ছে ততদিন আমাদের দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থের এবং এই অশান্তির প্রতিষেধক হিসাবে বর্তমান ধর্মীয় স্বাধীনতা বিল কার্যকরী করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যতদিন পরধর্ম-সহিষ্ণুতা একটা অভ্যাসে পরিণত না হ'চ্ছে ততদিন এইরূপ একটা অনুশাসন চালু রাখতেই হবে। এ বিল তাই নিঃসন্দেহে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠির পক্ষেই পরিণামে কল্যাণকর ব'লে পরিগণিত হবে।

অমৃতের খোঁজে

গোপা মজুমদার

বুড়ো শ্যামাচরণের অস্তিত্বের পাঁজরাগুলো তখন কেবল ওঠানামা করছিল, প্রাণপণে কাশছিল শ্যামাচরণ। কাশির চোটে যেন দমবন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। ঘরে আলো জ্বালেনি কল্পনা। বুড়োর ঘোলাটে চোখে তালতাল অন্ধকার চালিয়ে দিতে চায় মেয়েটা, তাই কখন কখন বুড়োর নিজেকে মরার মতো ঠাণ্ডা মনে হয়। বুকের ভিতর বাতাসের পেছনের ঝোপটা নড়ে ওঠে, বুড়োর ঘোরানি শুরু হয়, কষ বেয়ে ফেনা উঠতে থাকে।

কল্পনা ভাবে বাপটা আজকাল ঘোটেই চোখে দেখেনা, তাই ও বাবার হাতঘরে কলতলায় নিয়ে যেতে যেতে বলে "বাবা, আস্তে পা ফেল, এখানেই সেই গর্তটা।" "খুব জানি" হাত ছিনিয়ে নেবার ভঙ্গিতে রেগে ওঠে শ্যামাচরণ, "মেয়েটা কি ভাবে আমি ঘোটেই চোখে দেখিনা?" বুড়ো এবার আপনমনে বিড় বিড় করে বলতে থাকে, তোর থেকে ঢের বেশী জানি, এই যেন পৃথিবীটাতে চলার দিতে দিতে পায়ের রগগুলোর আজ এই অবস্থা, গর্ত দেখলে পা তুলেই দিতে হয়, আর যারা জেনে শুনে পা দেয়··· ওয়াক ওয়াক করে শব্দ তোলে বুড়ো, অজীর্ণ বদহজমের জিনিসগুলো থু, থু করে ফেলে কলের ড্রেনটায়, কল্পনা জল ঢালে বাপের মাথায়। ভেজে যাওয়া শরীরে ঠাণ্ডা জল পড়ায় শীতলোভে আওয়াজ ওঠে বুড়োর মনে, কল্পনা তাড়াতাড়ি পরম তুলিতে কাপড়ের আঁচল দিয়ে বাপের দাড়ি গলের মত চুলগুলো মোছে।

ঘোলাটে চশমাকে বেলকরে কাপড়ের খুঁটে দিয়ে মুছল শ্যামাচরণ, তারপর গর্তে যাওয়া চোখগুলোর উপর বসালো ওটাকে, ধুধাই চেষ্টা কিছুই দেখতে পাচ্ছেনা ও অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে বাড়ীর পেছনের ঝোপটা যেন আবার নড়ে উঠল ভূতের মত। ঐ যে পালাচ্ছে সেই বদমাইশটা, সেই পিশাচটা, সব দেখেছে বুড়ো ; তখন দিনের আলো খট খট করছিল, চিনতে একটুও কষ্ট হয়নি। রাগে কাঁপতে

কাঁপতে বুড়ো চেঁচিয়ে উঠল "কে কে ওখানে?" বাইরের বারান্দায় 'ঝন' করে শব্দ হলো, 'কেন আমি কল্পনা' ভাঁজ মেশানো গলায় বলে ওঠে। এক গাদা বাসন মাজতে নিয়ে গিয়েছিল ও বাইরের ডোবাটায়, আসবার সময় গা ধুয়ে এসেছে। বুড়ো এবার স্বর নীচু করে বলে "ও তুই?" কল্পনা ভেজা কাপড় চিপতে চিপতে বলে 'হ্যাঁ আমি' তা অত চেঁচাবার কি আছে? "চেঁচাবো না, এ রাতে তুই কোথায় ছিলি?" বুড়ো আবার গলা চড়ায়। "এখন আবার রাত কোথায়?" অন্ধকারে বাইশ বছরের চোখদুটো

শঙ্খিনীর মত জ্বলে ওঠে। "কাল থেকে তোকে আর তোমার গিয়ে বাসন মাজতে হবে না, কলে কি জল নেই ?" বাপের কথায় এবার আপনমনে গজগজ করে কল্পনা। ছুড়ো এখন চলতে চলতে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। তাই কাকের মত চোখবোজা ছুড়ো, পায় ধরে চায় উঁচুনীচু পথটা। হুকোয় গড় গড় শব্দ তোলে শ্যামাচরণ, সে সাথে দেখতে পায় অনেককিছু। তুষের আগুনে পুলাপো পৃথিবীটা কপিকের জন্যে কলসে ওঠে। সমস্ত শরীরটা তখন ছিল শক্ত সমর্থ। এক মাসের মা-মরা মেয়েকে গলায় কাকড়া জড়িয়ে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াতো শ্যামাচরণ, তখন এই চামড়া ঝোলা হাতগুলোয় মাসল ফুলে উঠত। চোখের মণিদুটো ছিল কুঁচের কালো অংশের মত। দূরসম্পর্কের এক পিসী অবশ্য ধরপাকড় করেছিল আরেকবার বিয়ে করতে, তা আর হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে মেয়েটা বাপের সমস্ত গায়ে বমি করে ভাসাত। ভাপ্‌সা টকগন্ধ উঠত তার থেকে। সারাদিন নাকে লেগে থাকত সেই টকগন্ধ। ভাতগুলো পচে থাকত হাঁড়িতেই। একটু বড় হতেই মেয়েটা লুকোচুরি খেলা শিখল। পাশের বাড়ীর সুবল ময়রার ছেলে আরও কিছু সাঙ্গ পাঙ্গ জুটিয়ে পিছনের খোপটায় লুকোচুরি খেলে ও। রান্না করতে গিয়ে মেয়ে উঠেছিল শ্যামাচরণ। এমন সময় হাপাতে হাপাতে রান্নাঘরে উঠে এল কল্পনা, পরণে শুধু একটা নীলরঙা প্যান্ট। খালি গায়ে খোপে ছুটোছুটি করতে গিয়ে পিঠ বুক ছড়ে টপ টপ করে রক্ত ঝরছে। খুন্তি ফেলে ছুটে এল শ্যামাচরণ। বিশল্যকরণীর রস করে লাগিয়ে দিল মেয়েটার বুকে পিঠে। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে আগুন জ্বালতে চেষ্টা করল ও, দাড়া আজই গিয়ে আমি সুবলকে বলব, তোমার ছেলেটা আমার মেয়েকে বন বাদাড়ে তাড়িয়ে কেমন ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে।

সারা গায়ে তিলক আঁকা শ্যামাচরণ ভবনদীর দোকানে খাতা লেখে। মেয়েটা আজকাল রান্না শিখেছে। শুনগুনিয়ে গান গায় শ্যামাচরণ। কালো কষ্টিপাথরে খাদবর্জহীন তরকারিগুলো যেন চোখ পাকায়। তবুও মেয়ের হাত তরকারির স্বাদ পায়। ফিরতে রাত হয় শ্যামাচরণের। নিজের বাড়ীঘরও পা-দুটোর উপর ভেঙে যায় ও। গায়ের আরশোড় ভেঙে খোলা খাড়িকেন তুলে মেয়েটা হয়ত তখন বলছিল, "আজ এত দেরী হল কেন বাবা ?" পাট-ক্ষেতের আলঘরে বাছিল শ্যামাচরণ, হঠাৎ ক্ষেতের ভিতর থেকে কিস কিস শব্দে সেই স্বপ্ন জালটা ছিঁড়ে গেল, সেদিকের হাতের টর্চের সমস্ত আলোটুকু ফেলতেই পৃথিবী ফুড়ে নরক বেরিয়ে এলো। বাসুদেব রায়ের বউ ছেলে দেবু প্রাণভয়ে ছুটে পালালো সেই অন্ধকারে যেন একটা জ্যান্ত পিশাচ। আর কাস্ত কামারের মেয়েটা অবিন্যস্ত শাড়ী গায়ে জড়াতে জড়াতে অসহায়ের মত তাকালো শ্যামা-চরণের দিকে। পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। "কাকাবাবু, ও আমায় লোভ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, আমার দোষ নেই ; পায়ে পড়ি আপনার কাউকে বলবেন না।" আকাশে মেঘ নেই তবুও বাজ পড়ল, সামনের মাঠটা পুড়ে খাক হল। সেই কালো পোড়া, মাঠের উপর দিয়ে অতিকষ্টে বাড়ী ফিরল শ্যামচরণ। তার কিছুদিন পর শ্যামচরণও গিয়েছিল আমগাছে ঝোলা কাস্ত কামারের মেয়েটাকে দেখতে। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে বীভৎস চোখগুলো, তবুও সে চোখ থেকে এক করুণ বিলাপ ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সমস্ত আম-বাগান জুড়ে। দুহাতে নিজের কানগুলোকে চেপে ধরে ছুটে চলে এসেছিল শ্যামাচরণ।

কিছুদিন পর আবার চোখাচোখি হল। চোখদুটো জ্বলে উঠল দুর্বৃত্ত শেয়ালের মত। হাতের চায়ের কাপটা কোনমতে ফেলে রেখে চা-ষ্টল থেকে বেরিয়ে এল 'দেবু', দাঁতে দাঁত ঘষে দোকানে ঢুকে শ্যামাচরণ অর্ডার দিল "এদিকে এক কাপ চা আর দুখানা বিস্কুট···

মেয়েটা আজকাল ডাগর ডোগর হয়েছে, তাই প্রাণপণে খাতা লেখে শ্যামাচরণ। বেশী বয়েসেই বিয়ে করেছিল ও তাই মেয়েটা একটু বড় হতেই বাপের আর খাঁচা চুল দেখল না। কল্পনা বসে ভব নদীর। প্রচণ্ড গরমে হাতপাখা চালাতে চালাতে বলে, আমি বলি কি,

শ্যামাচরণ, এবার তুমি কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বসে বিশ্রাম নাও গে ··

সেই থেকে শ্যামাচরণ মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে থাকে। মাদুরের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল কল্পনা। ছিন্ন-মাথা বাতাস বইছিল, বুড়োর মন ভিজিয়ে দিয়ে গেল। তাই জপের মালাটাকে বালিশে লুকিয়ে এগিয়ে এল বুড়ো, লম্বা ঘন কালো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালালো, তারপর সমস্ত শরীরে। চমকে উঠেছিল কল্পনা। কাটা-ব্লাউজের ফাঁকে ওর রক্ত-সাদা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। বুড়ো ভিজে ভিজে গলায় বলল "যা কাল পেওলের কলসি বেচে তোর শাড়ী আর ব্লাউজ নিয়ে আসিস।" "না বাবা তবে আমি বাবার জল রাখব কিসে? তাছাড়া ওটাই তো মায়ের স্মৃতি।" "না না আগে তোর শাড়ীর প্রয়োজন" বুড়ো দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করে। "কিন্তু এভাবে আর কয়দিন চলবে বাবা?" কল্পনার ভাসা নয়ন পালগুলো বেয়ে দুফোঁটা মোনাজল এসে পড়ল শ্যামাচরণের হাটুতে। বুড়োর দুধড়াবো পেটে একটা বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়, একটু পর তা আবার মিলিয়ে যায়, বুড়োর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রকৃতিও যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

মাঝে মাঝে সারাদিন পর ক্লান্ত মেয়েটা যখন মাদুরের উপর এপাশ ওপাশ করতে থাকে বুড়ো ফিরে যায় অনেক পেছনে। মনে হয় মেয়েকে বুকের খুব কাছে টেনে এনে সেই ঘুমপাড়ানী গানটা গায়। "আয় ঘুম আয় বাগদী-পাড়া দিয়ে, বাগদীদের ছেলে ঘুঘোয় জাল বুড়ি দিয়ে।" কিন্তু মেয়েটা তখন সাপের মত হিস্ হিস্ করে ওঠে বুকের মধ্যে আগুন ধরে যায় শ্যামাচরণের। সেই আগুন হাতে করে শ্যামাচরণ উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, তবুও সাবধান করে দেয় বুকের রক্তগুলো। ওদের মধ্যে একটা হিমেল স্পর্শ, তাই অনেক কিছু ভেবেও চুপ করে যায় শ্যামাচরণ।

আজকাল বুড়ি বুড়ি বাজার করে আনে মেয়েটা, জিজ্ঞাসা করলেই গোঁয়ারের মত উত্তর দেয়, "হারান বুদির বউয়ের কাছ থেকে ধার করে এনেছি," তখন চারপাশ থেকে এলোপাতাড়ি বাতাস বইতে থাকে। বুড়ো বোঝে ঘুনি-ঝড়ে পৃথিবী তছনছ হয়ে যাচ্ছে। পোষা পাখিটা খাঁচা-ফেলে পালাচ্ছে অনেক অনেক দূরে। তাই মেয়ে যখন সুন্দর করে সাজিয়ে ভাত বেড়ে দেয় তা খেয়েই বদ হজম হয় বুড়োর।

উনুনে পোড়া তরকারির গন্ধে বাড়ী ম-ম করে। ওদিকে উঠান হয় মেয়েটা, বুড়ো প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, "কল্পনা কল্পনা"; ছুটতে ছুটতে ও উঠে আসে বারান্দায়। "কি আমি ঘরে গেছি নাকি, ওভাবে চেঁচাচ্ছ কেন?" জ্বলে ওঠে কল্পনা। কিন্তু এত ঘটঘটে দিনের আলোতেও মেয়েটাকে বড্ড ফ্যাকাসে দেখায়। বুড়ো যদি এখন চিৎকার দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তোকে বলতে হবে এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?" সে প্রশ্নের উত্তর দেবে না কল্পনা তা শ্যামাচরণ ভালোভাবেই জানে, তাই শ্যামাচরণের ইচ্ছে হয় অজীর্ণ বদহজমগুলো উগরে দেয় মেয়ের গায়ে। উঁচুনীচু পথে চলতে গিয়ে মুখ থুবড়ে দাঁত মুখ দিয়ে রক্ত বরে শ্যামাচরণের।

মালা জপতে জপতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুড়ো। কানের কাছে ফিসফিস আওয়াজে আবার জেগে যায়। ওর চোখে অন্ধকার। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। বাড়ীর পেছনে বুনো গাছ জন্মে জোপ হয়ে আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু ডুটো আগাছার মাথা সমানে দুলে চলেছে। চারপাশে একফোঁটা বাতাস নেই। কাঁচের চুরির রমঝম মিষ্টি শব্দটা বিষাক্ত বলিয়ে দিতে থাকে বুড়োর হৃদপিণ্ডে। বুড়োর মরণ যন্ত্রণা শুরু হয়। শ্যামাচরণ শেষ শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, "কল্পনা"···গলাটা কেঁপে যায় বুড়োর। আশ্চর্যভাবে আগাছা ডুটোর আন্দোলন থেমে যায়, একটু পরই মানুষের পায়ের শব্দ ওঠে, বুড়োর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একরাশ দুর্গন্ধ স্মৃতি। সেই বাঁকড়া বাঁকড়া চুলওয়ালা দীর্ঘাঙ্গ নরপিশাচটা ছুটে পালাল জোপের ভিতর থেকে। ঘটঘটে দিনের আলোয় বুড়োর চিনতে একটুও কষ্ট হলোনা।

একটুপর বাড়ীর পেছন দিয়ে লম্বাছায়া ফেলে ঘরে এল কল্পনা। শিউরে উঠে বুড়ো, জোরে চোখ বোজে। এতক্ষণ

নিজের দিকে লক্ষ্যই করেনি কল্পনা, ওর নতুন ব্লাউজটার বুক-পিঠ ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে, গায়ে জায়গায় জায়গায় কাঁচের ধারের উপর চোপ চোপ রক্ত; তাড়াতাড়ি কল্পনা খড়িতে ঝোলানো গামছাটা গায়ে জড়িয়ে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে চলে গেল ডোবার ধারে। বুড়োর চোখে তখন আবছায়ায় কোনো কাজ কামারের মেয়ের পা দুটো হাওয়ায় দুলছে। কানের কাছে কথার কথার শব্দ ঝুলে চলে গেল ঘেঁটুর। বুড়োর দেহের সমান দুটো ডাল ছিটকে পড়ল দু'দিকের দুদিকে। এবার উঠে দাঁড়াল ভাষাচরণ। এর আগেও ওর আরেকটা কর্তব্য আছে। শেষ সময় পুজোর ঘটটা বিক্রি করে দিয়ে এল সেই অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটা।

বিছানার শুয়ে ঘামছিল ভাষাচরণ, কাঁচের চুড়ির সেই টুং টাং মিষ্টি শব্দ ভেসে আসছে তারপর সব নিস্তব্ধ, "এতক্ষণে তাহলে যাওয়া শেষ হয়ে গেছে।" আপনমনে বিড়বিড় করে বুড়ো। কিছুক্ষণ পরেই সেই প্রত্যাশিত আর্তনাদ, "উঃ মরে গেলাম বুক জ্বলে গেল"। চীৎকার করে ওঠে কল্পনা। দিগবিদিগ হারিয়ে ছুটে আসে ভাষাচরণ। নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে মেয়েকে। ইচ্ছে হয় গনগনে উনুনটা চাপিয়ে দেয় নিজের বুকের উপর। জ্বালায় যদি জ্বালা মেটে, বুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে "মা রে তুই ওগুলো খেলি কেন, আমি তো নিজহাতে ওতে বিষ মিশিয়েছি, আমি যে সব জানি। লক্ষ্মীটা তোকে ঘুমলে ঘুমলে খাবে এ আমি বাপ হয়ে কিভাবে সহ্য করি বল? এক বুক যন্ত্রনা নিয়ে কল্পনা বলল "দেবু তো বলেছিল আমায় বিয়ে করবে।" ধমকে উঠল ভাষাচরণ মৃত্যু পথযাত্রী মেয়েকে, "চুপকর; নরকের কুত্তা ওটা, তোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে পালাত ও, আমি ওকে খুব চিনি।" বুড়োর চোখে জলের কণাগুলো যেন কেমী হিমে জমে বরফ হয়ে গেছে। কল্পনার দুদিকের কষ বেয়ে উথলে উঠছে রক্তগুলো কেনা। ততক্ষণে ভাষাচরণ দুহাতে দুয়ারের আবরণ ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে দুরকচি মেয়েটার শিয়রে। তাই উথলে পড়া ফেনাগুলো থেকে অনেক দিন আগের সেই দুধ-দুধ গন্ধ এসে লাগল ভাষাচরণের নাকে।

মৃত্যু বিষের যত প্রাণটুকু তখন বিষের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারপর হয়ত বা অমৃতের সন্ধানেই ওটা ছুটে চলল মহাশূন্য আকাশটার পথ ধরে। সেদিকে পাথরের মত কঠিন চোখে তাকিয়ে থেকে ভাষাচরণ আপন মনে বিড়বিড় করে, "সেই ভালো, যা, যা, যা, যার সন্তান তাঁর কাছেই ফিরে যা। এই গলা পচা নরকটা থেকে তো অব্যাহতি পেয়ে যাবি।" সঙ্গে সঙ্গে যেন বুড়োর পাঁজরা দুটো করে এক ঝাপট মরুঝা হাওয়া বয়ে গেল।

কল্পনা শোকাচ্ছে আর বুড়ো ভাষাচরণের মনে হচ্ছে মেয়ে যেন অনেকদিন আগের হারিয়ে যাওয়া বাপের সেই ঘুমপাড়ানী ছড়াটা গেয়ে চলেছে, "আয় ঘুম যায় ঘুম বাপধী পাড়া দিয়ে, বাপধীদের ছেলে ঘুমোয় জলমুড়ি দিয়ে...

Phone : 23-4302

UNIQUE MACHINE CO.

'COMMERCE HOUSE" 4th Floor,
Room No. 10A,
2, GANESH CHANDRA AVENUE,
CALCUTTA-700013

Manufacturers of : 'Unimac'

Industrial Sewing Machine for
Bag Closing & Bag Making.

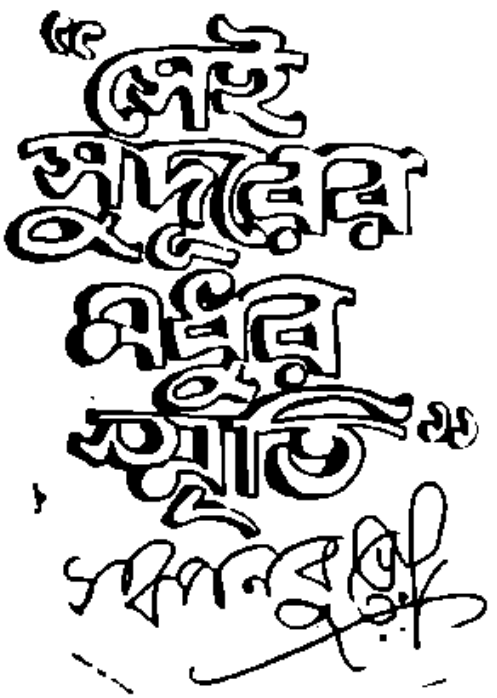

॥ দুই ॥

দক্ষিণেশ্বরেরমা কালীর যে নাম—
আমার মায়েরও সেই নাম।

খুব অল্প বয়েসে দুটি শিশু সন্তানকে বুকে নিয়ে মা দুঃখে ও বেদনায় যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল।

ওই যে কথায় বলে না, অল্প দুখে কাতর
অধিক দুখে পাথর···

আমার ভবতারিণী মায়ের অনেকটা সেই দশা হয়। কিন্তু আমাদের দিদিমা স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখলেন।

আমাদের দিদিমা অতি স্নেহময়ী গৃহিণী ছিলেন। একমাত্র কন্যার অকাল বৈধব্যে তিনি ভেঙে পড়েন নি। কি করে নাবালক নাতি দুটোকে মানুষ করে তুলবেন—তাই যেন ছিল তাঁর জীবনের সাধনা।

তাই অতি আদর দিয়েছিলেন—তাঁর দুই নাতি রাখাল অখিলকে। আমাদের দেশে চলতি কথায় বলে,—মাথায় রাখলে উকুনে খায়, আর মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে খায়—সেই দশা হয়েছিল আমাদের দুই ভাইয়ের।

আমাদের পল্লী অঞ্চলে দিদিমাকে বলে আজিমা। আমরাও সেই স্নেহময়ী দিদিমাকে 'আজিমা' বলেই ডাকতাম। এক মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে দিদিমার সংসার।

আমার একমাত্র মামা জমিদারের ছেলে হলেও খুব শান্ত ও সাত্বিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কলকাতায় শ্যামাপদ কবিরাজের কাছে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র শিক্ষালাভ করতেন। তিনি মাঝে মাঝে দেশের বাড়ীতে আসতেন। তখন আমাদের জন্য কলকাতা থেকে নানা রকম খেলনা নিয়ে আসতেন। তাই অতি শিশুকাল থেকেই আমরা দুই ভাই মামার আসা-পথ চেয়ে থাকতাম।

আজিমা তাঁর একমাত্র বিধবা কন্যাকে পরঘরণী যেতে দেন নি। পক্ষীর মতো নিজের বুকের কাছে আগলে রেখেছিলেন। যদিও আমাদের মামা বাড়ী আর নিজের বাড়ী এপাড়া ওপাড়া, তবুও আমরা শিশু বয়েসে নিজের বাড়ী মুন্সীবাড়ীতে যেতে পারতাম না।

পর পর তিন কর্তার অকাল মৃত্যুতে আমাদের নিজের বাড়ী মুন্সী বাড়ী যেন একেবারে শ্মশানের মতো হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার টাকা যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল—কেউ তার সন্ধান দিতে পারে নি। লোকে বলত মুন্সীবাড়ীর গোপন টাকা কোথায় যেন পোঁতা আছে। সেই ধনধন একদিন না একদিন কোনো বংশধর ঠিক খুঁজে পাবে।

অনেকটা গল্প কথার মতো ছিল—মুন্সীবাড়ীর সম্পদ।

আজিমার পরেই আমাদের আগলে রাখত—দাদি মাসি। তার স্নেহ যেমন ছিল অসীম, সতর্ক দৃষ্টিও ছিল তেমনি সুদূর প্রসারী। আমি ও সব সময় তার কোলে কোলে ফিরতাম। কখনো কোল থেকে নামতে চাইতাম না।

একটু বড় হয়ে আমরা মাঝে মাঝে মুন্সীবাড়ী যাবার অনুমতি পেতাম। কিন্তু সেখানে রাত্রি বাস করবার অনুমতি আজিমা কখনো দিতেন না।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে যখন পৌঁছলাম—তখন মুন্সীবাড়ী গিয়ে দেখতাম ওখানে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। আমাদের বড় তরফ ছাড়া মুন্সীবাড়ীর আরো তিনটে হিস্যে ছিল। মেজ তরফ, ছোটা তরফ আর ছোট তরফ।

ছোটা তরফের কাকা নাটুকেসিক মানুষ ছিলেন। বাড়ীর ওপরই পাকা মঞ্চ তৈরী করেছিলেন। সেখানে গ্রামের তরুণ দল মিলিত হয়ে মাঝে মাঝে নাটক অভিনয় করতেন।

ছোট তরফের কাকা কাশীতে ওস্তাদের কাছে গান শিখতেন। মাঝে মাঝে বাড়ী আসতেন।

মেজ তরফের শিবেনদাই বর জামাই ছিলেন। তিনি সেনহাটির মানুষ। গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না।

ছেলেবেলায় রজনী পণ্ডিত আমার অক্ষর পরিচয় করিয়েছিলেন। গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় ছিল। সেখানে তিনি পণ্ডিতী করতেন।

এই ছেলে বয়েসেই আমি মুখে মুখে অনেক ছড়া শিখেছিলাম। অধিকাংশ ছড়া শিখেছিলাম—দাদি মাসি আর আত্মারাম ঠাকুরের কাছ থেকে।

আমাদের মুন্সীবাড়ীর মস্ত প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সময়ে নানা উৎসব হত। আমরা ছেলে বয়েসে এই প্রাঙ্গণে যাত্রার পালা শুনেছি। একবার কি উপলক্ষে এখানে সার্কাসও হয়েছিল দেখেছি। মুকুন্দ দাসের বদেশী যাত্রা আমরা এই মস্ত প্রাঙ্গণে বসেই উপভোগ করেছি। তখন মনে হত—এই সারা উঠোন জুড়ে রাশি রাশি মাথা। কত লোক এসে জড় হয়েছে এখানে। গ্রামের কেউ বোধহয় আর ঘরে বসে নেই। সবাই এসে এখানে হাজির হয়েছে।

একটু বড় হতেই আমরা এঁটেল মাটি ছেনে ঠাকুর দেবতা গড়তাম—নানা রকম পুতুল গড়তাম। সেই ছিল আমাদের এক রকম খেলা।

আমাদের গ্রামটা ছোট ছিল বটে—কিন্তু সারা বছর ধরেই পালা পার্বণ চলত।

নতুন বছর পড়বার আগেই চৈত্র মাসের শেষে গাজনের চাকের বাদ্যে সারা গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত। গাজনের সন্ন্যাসীর দল বাড়ী বাড়ী ঘুরে হর-গৌরীর গান শোনাতো, ভিক্ষে করত। আর রাত্তির বেলা এক এক বাড়ীতে পালি জাগানো হত। তাতে কালী নাচ, শিবের নাচ, নন্দী ভৃঙ্গীর নাচ দেখানো হত। নানা রকম সং সেজে গাঁয়ের লোকেরা ছড়া কেটে কত অঙ্গভঙ্গী করত। তাই দেখবার জন্য পাশের গাঁয়ের মানুষেরাও এসে হাজির হত। এ ছাড়া আমাদের গাঁয়ে চড়ক পুজোর মেলা বসত।

নানা অঞ্চল থেকে দোকানী ব্যাপারীরা এসে নানা রকম পসরা নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসত। কতকগুলো লোক পিঠ ফুঁড়ে চড়ক গাছের ওপর উঠে বোঁ বোঁ করে ঘুরত। আর সেই মজা দেখতে অসংখ্য মানুষ এসে জড় হত।

আমরা নানা দোকান ঘুরে পসরা করতাম। কোনো দোকান থেকে চিনির মঠ, কোনো দোকান থেকে রঙীন বাতাসা, আর অন্য দোকান থেকে ছোট ছোট ছুরি কিনে নিতাম। পেন্সিল আর কল টানা খাতা কিনতাম এই মেলা থেকে।

মুন্সী বাড়ীতে একটা চোঙাওয়ালা কলের গান ছিল। নববর্ষের দিন সন্ধ্যেবেলা সেই কলের গান বাজানো হত। যত সব পুরোণো দিনের গান বাজত।

"দিনতা দিনা পাকা নোনা—
খুচল ভবের আনাগোনা"

অথবা—"তুমি কাদের কুলের বৌ
যমুনা জল আনতে যাচ্ছ—সঙ্গে নেই ও' কেউ!"

নববর্ষের সন্ধ্যায় সবাইকার হাতে সরবৎ মিলি করে দেয়া হত। আর একটা করে লাল রসগোল্লা।

বড়রা কেউ কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাতো কিংবা যাত্রা দলের মতো অ্যাকটিং করত। তখনকার দিনে আবৃত্তি বলে কিছু ছিল না।

জৈষ্ঠ মাসে বাড়ীর গিন্নিরা ষষ্ঠিব্রত করত। মা ষষ্ঠির পুজো দিত। পুজোর শেষে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে প্রসাদ বিলি করে দিত।

গ্রামে খুব ধুম হত শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। এই তিনটিতে মনসা ভাসান হত।

হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে নৌকো বাইচের আয়োজন করত। বহু দূর দূর গ্রাম থেকেও বাইচের দল আসত। খুব হোইগোল করে বাইচ খেলা হত। লম্বা লম্বা ছিপের নৌকোয় লোকে পাশাপাশি বসে খুব জোরে ছোট ছোট বৈঠা চালাতো।

এই নৌকো বাইচে যে দল জিততো গাঁয়ের মোড়লরা সেই দলকে নতুন ধুতি, গামছা, আবার টাকা কড়িও দিত।

সে এক মহা উত্তেজনার বিষয় ছিল।

নৌকোর ওপরেই মনসা ভাসানের গান হত।

অনেক নৌকোয় সং সেজে নানা রকম ছড়া কাটত।

ভাদ্র মাসে বাড়ী বাড়ী তালের বড়া ভাজা হত। দেশে গাঁয়ে দুধের অভাব ছিল না।

ক্ষীর দিয়ে ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ঠাকুমা দিদিমার হাত থেকে তালের বড়া খেতো।

এর পরেই দুর্গাপুজো এসে পড়ত।

অনেক বাড়ীর চণ্ডী মণ্ডপের বারান্দায় কাঠাম তৈরী করে প্রতিমা গড়া সুরু হয়ে যেতো।

কুমোর ভায়ারা তখন নানা বাড়ীতে এসে ঠাঁই নিতো। প্রতিমা গড়া যত এগিয়ে যেতো—ছেলে-মেয়েদের উল্লাস ততই বেড়ে যেতো। সিংহ অসুরকে কিভাবে কামড়ে ধরবে—অসুর এবার কিভাবে যুদ্ধ করবে, —মা দুর্গা কিভাবে অসুরের বুকে ত্রিশূল বসিয়ে দেবেন এই নিয়ে ছেলে মহলে দারুণ আলোচনা সুরু হত। অনেক সময় তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতিও আরম্ভ হয়ে যেতো।

তখন কুমোর ভায়া এগিয়ে এসে ছেলেদের মারামারি থামিয়ে দিত।

—আরে, আগে দেখ, অসুর এসে কেমন যুদ্ধ করে—তারপর ত' তোমাদের যুদ্ধ সুরু হবে—

কুমোর ভায়ার কথায় তখন সবাই শান্ত হত। লক্ষ্মী, সরস্বতী কোথায় বসবে, আবার কার্ত্তিক, গণেশ এবার কি পোষাক পরে আসবে—তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়। আলোচনার যেন আর শেষ নেই!

যে বাড়ীর কর্ত্তা বা চাকুরে বাবুরা অন্যত্র থাকতেন, তাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এখন থেকেই দিন গুণতে সুরু করত। কবে কোন বাড়ীতে নৌকো আসবে তাই নিয়ে দিন রাত আলোচনা—পুজোতে কার জন্যে কি আসবে কার ধুতি, কার শাড়ী, কার আবার নতুন জুতো আসবে—মনে মনে তারই কর্দ তৈরী করা হত। অনেক বাড়ীর কর্ত্তারা কেউ থাকতেন কলকাতায়, কেউ ঢাকায়, কেউ দিনাজপুর, কেউ আবার খুলনায়। অনেকেই ট্রেণে, ষ্টীমারে এসে নৌকো করে একেবারে বাড়ীর ঘাটে উপস্থিত হত। সঙ্গে থাকত নানা রকমের পুজোর সওগা।

ইতিমধ্যে কুমোর ভায়াদের প্রতিমা গড়ার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রতিমা দেখার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা যেত। কোন বাড়ীর অসুর সত্যিকারের লড়ুয়ে, কোন বাড়ীর সিংহ ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়েছে এসব কথা নিয়েও রীতিমত আলোচনা চলত।

দুর্গা পুজোর সময় দুর্গা বাড়ীর পুজো প্রাঙ্গণ আবার নতুন চঙে সাজানো হত। চারদিকে বাঁশের উঁচু বেড়া তৈরী করে তার সঙ্গে নারকেল, বাতাবী লেবু, কলা প্রভৃতি ফল ঝুলিয়ে দেয়া হত। পুজোর কয়টা দিন সেই ফলগুলি পূজা প্রাঙ্গনে শোভা পেত। এই ধরণের পুজো প্রাঙ্গন সাজানো আর অন্য কোনো বাড়ীতে দেখা যেত না।

প্রতিমা তৈরীর ব্যাপারেও বৈচিত্র্য ছিল।

সব বাড়ীতেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ নিয়ে মা দুর্গা বাপের বাড়ী বেড়াতে আসতেন। কিন্তু আমাদের মামা বাড়ীতে আবার তিন পুরুষের প্রতিমা।

মা দুর্গা,—সেই সঙ্গে অসুর আর সিংহ।

পূজোর ক'টা দিন খুব ধুমধাম হত।

সকাল থেকে ঢাকের বাদ্যে কান পাতে কার সাধ্যি!

পূজোর বাদ্যি, ভোগের বাদ্যি, বলির বাদ্যি, আরতির বাদ্যি। সে বাজনা শুনেই বোঝা যেত এখন কোন বাদ্যি বাজানো হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই বলি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বাইরের জমিদারী থেকে কিম্বা হাট থেকে মোষ বোকাই করে বলির পাঁঠা কিনে আনা হত।

কোনো কোনো বাড়ীতে আবার মোষ বলিও হত।

সেখানে আবার এক নতুন উত্তেজনা।

সারা গাঁয়ের ঢাক জড় করে এই মোষ বলির সময় বাজানো হত।

এই দুর্গা পূজোর সময় কোনো কোনো বাড়ীতে আবার যাত্রা গান হত। একবার আমরা কংস বধ পালা দেখেছিলাম।

ছোট দুটি ছেলে কানাই, বলাই সেজেছিল।

তাদের গলার গান শুনে সারা গাঁয়ের মানুষ একেবারে অবাক হয়ে গেল। ওদিকে কংসের কি দাপট আর চড়চাপড়। সকলেই ভয়ে একেবারে থর থরি কম্প।

এই দুটো বাচ্চা ছেলেকে ও' কংস একেবারে টিপে মেরে ফেলবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ঐ পুঁচকে দুটো ছোড়া—কৃষ্ণ, বলরাম—কংসকে একেবারে কাবু করে ফেললে!

ওদের হাতেই হল কংসের মরণ।

তখন চারদিক থেকে সবাই আসরে হরিধ্বনি দিয়ে উঠল।

সারা রাত জেগে এই পালা গান শোনা! কী উল্লাস! পালা গানও শেষ হল, ভোরও হয়ে গেল।

সবাই হরিধ্বনি দিতে দিতে বাড়ী ফিরে গেল।

দুর্গোৎসবের পর আরো অনেক পালা পার্বণ সারা বছর ধরে চলে।

আছে কার্তিক পুজো।

কার্তিক পুজো অবশ্য প্রত্যেক বাড়ীতে হয় না। গোষ্ঠীভুক্ত কয়েকটি বাড়ীতে কার্তিক পুজো হয়ে থাকে।

পৌষ পার্বণের দিন ছেলেমেয়েদের সকাল থেকেই আনন্দ। ঠাকুমা-দিদিমা-মা-মাসি পিসিরা পাহু-কোহর বেঁধে নানা রকম পিঠে পায়েস তৈরী করতে লেগে যায়। ছ্যাঁক ছ্যাঁক কল্ কল্ শব্দে সারা বাড়ী মুখর হয়ে ওঠে। সারাদিন ধরে ছেলেমেয়েদের ঘুর ঘুর চলে। আবার পরের দিন বাসি পিঠে খাওয়ারও ধুম পড়ে যায়।

আবার বালক বালিকাদের আনন্দ উপচে পড়ে সরস্বতী পুজোর সময়।

সারা বছর ধরে এই সরস্বতী পুজোর জন্য ছেলে-মেয়েরা দিন গোনে।

ভক্তি করে সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি না দিলে লেখাপড়া হবে না। পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। সেজন্যে সকলের মনেই দারুণ ভয়।

আবার বড়রা বলে দিয়েছে, সরস্বতী পুজোর আগে কিছুতেই কুল খাওয়া চলবে না। তাহলে মা সরস্বতী রাগ করবেন।

এই সরস্বতী পুজোর জন্য ছেলেমেয়েদের দল প্রত্যেকেই প্রস্তুত হয়। আগে থেকে খাগের কলম জোগাড় করে রাখতে হবে। দোয়াতের কালি ফেলে ফেলে দিয়ে একেবারে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সেই দোয়াত কাচা দুধ দিয়ে ভরতি করতে হবে। যার যার পাঠ্য বই দেবীর পায়ের কাছে গুছিয়ে রাখতে হবে। নইলে বিদ্যে হবে কি করে?

পুজোর দিন সকাল থেকে একেবারে উপোস করে থাকতে হবে। এই সরস্বতী পুজোর দিন অতি ভোরে উঠে নানা বাগান থেকে ফুল চুরি করে আনতে হবে।

আজকের দিনে পুজোর ফুল চুরি করে আনলে নাকি কোনো পাপ হয় না।

তাই অন্ধকার থাকতেই ছেলেমেয়েদের দল সাজি হাতে ছুটোছুটি সুরু করে দেয়। যে বেশী ফুল দিয়ে মা সরস্বতীর

(শেষাংশ ১২০ পৃষ্ঠায়)

মহৎ শিক্ষার মহান পরিণতি

শরদিন্দু সাহা

সারা দুনিয়ার আর্ত ও ক্ষুধা মানুষের সেবায় অকুণ্ঠ চিত্তে শত শত কোটি টাকার ট্রাস্ট তহবিল প্রতিষ্ঠা করে যে কয়জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইতিহাসে প্রথম সারির দানবীর রূপে বরণীয় ও স্মরণীয় হয়েছেন আমেরিকার জন, ডি, রকফেলার তাদেরই একজন। আজকের পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাঁর মহান দানের স্বাক্ষর পড়ে নি। অথচ বৈষয়িক জীবনের সূচনায় ব্যক্তিগত উদ্যমের অভাবিত সাফল্যে গর্বিত এই মানুষটি এমন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন যে তাঁর কষ্টার্জিত আয় ত্যাগের বিনিময়ে সঞ্চিত অর্থ অপরে ভোগ করবে এটা যেমন তিনি চাইতেন না তেমনি এ বিষয়ে কারও অযাচিত পরামর্শও তিনি বরদাস্ত করতেন না। এ হেন আত্মগর্বী ধার্মিক ব্যক্তি কীভাবে বিশ্ব মানব কল্যাণে দানব্রতে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন সে কাহিনী বেশ চমকপ্রদ। বিশেষ করে এ কাহিনী জেনে প্রত্যেক ভারতীয় মাত্রেই গর্বিত না হয়ে পারবে না। কেননা একজন মহান ভারতীয় সাধুই তাঁকে পরহিতে অকুণ্ঠ দান করার প্রেরণা দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আমেরিকার চিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সভায় প্রজ্ঞাদীপ্ত ভাষণে অনন্য ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সে দেশে বহু অনুরাগী বন্ধু লাভ করেন। এই সব বন্ধুদের আমন্ত্রণে স্বামীজীকে মাঝে মাঝে তাঁদের গৃহে অতিথি রূপে বাস করতে হোত। অনুরূপ এক বন্ধু বাবসা সূত্রে ছিলেন বিশিষ্ট মার্কিন ধনপতি জন, ডি. রকফেলার-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর গৃহে অতিথি ছিলেন তখন এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর অসাধারণ প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে তিনি সস্ত্রীক রকফেলারকে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। কিন্তু বিপুল বিত্তের অধিকারী ধার্মিক রকফেলার-এর পক্ষে কারও উপদেশ গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি না থাকায় তিনি নানা অজুহাত অনুরূপ আমন্ত্রণ এড়িয়ে চলতেন।

স্বামীজীর প্রতি ধনকুবের রকফেলারের যদিও কোন আকর্ষণ ছিল না তবু এই ভারতীয় সাধুর সম্মোহিনী শক্তির দুর্বার আকর্ষণকে উপেক্ষা করে তিনি চলতে পারেন নি। তাই মেয়ারের তাড়নায় একদিন অতর্কিতে হাজির হলেন সেই বাড়ীতে যেখানে স্বামীজী ছিলেন মাননীয় অতিথি। তাঁরই সৌজন্যের বাড়ী। বাড়ীর ভৃত্য দরজা খুলতেই তিনি ভারতীয় সাধুকে দেখতে চাইলেন। ভৃত্য যথারীতি তাঁকে বৈঠকখানায় অপেক্ষা করতে বলায় তিনি কোনরূপ সৌজন্যমূলক আগাম সংবাদ না দিয়েই অতর্কিতে সটান স্বামীজীর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়েন। নিবিষ্ট মনে পাঠরত স্বামীজী তাঁর ঘরে অনুপ্রবেশকারী আগন্তুকের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করায় রকফেলার বিস্ময়ে অবাক হয়ে যান।

কিছুক্ষণ পরে যখন উভয়ের বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায় তখন আলোচনা প্রসঙ্গে সূচনায় স্বামীজী তাঁর জীবনের কিছু স্মৃতি চারণ করার পর রকফেলারকে জানিয়ে দিলেন—"তাঁর হাতে যে ধন সঞ্চিত হয়েছে সেটা কিন্তু তাঁর নিজস্ব সম্পদ নয়। তাঁর মাধ্যমে পরহিতে দান করার জন্যই ভগবান তাঁকে বিপুল অর্থ অর্জন ও সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়েছেন। বিশ্ব মানবের কল্যাণে তাঁর সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করাই হবে তাঁর প্রধান কর্তব্য।"

কেউ তাঁকে এভাবে অযাচিত উপদেশ দেবে এটা আত্মকেন্দ্রিক ধার্মিক রকফেলার-এর মোটেই ভাল লাগে নি। বিরক্ত হয়ে কোনরূপ বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই তিনি তড়িঘড়ি স্বামীজীর ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু অলক্ষ্যে ভারতীয় সাধুর আকর্ষণ তাঁকে রেহাই দেয় না। এক সপ্তাহ পরে আগের মতোই আবার তাঁকে স্বামীজীর কাছেই আসতে হয়। এবারও তিনি কোনরূপ আগাম সংকেত না দিয়ে স্বামীজীর পড়ার ঘরে অতর্কিতে প্রবেশ

করে দেখতে পান স্বামীজী নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন। তাঁর আচম্‌কা উপস্থিতি তাঁকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি। মুক্ত রকফেলার স্বামীজীর টেবিলের ওপর একটা কাগজ ছুঁড়ে দিলেন। ঐ কাগজে জন-হিতকর একটি সংস্থায় মোটা অর্থদানের পরিকল্পনা ছিল। তার পরই তিনি সদম্ভে স্বামীজীকে লক্ষ্য করে বললেন—"এবার খুশী হয়ে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ দিবেন।" স্বামীজী নির্বিকার চিত্তে রকফেলারের দিকে না তাকিয়েই টেবিলে রাখা তাঁর কাগজটা বেশ শান্তভাবে পাঠ করে শুধু বললেন—"এর জন্য আপনারই তো আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।" ব্যস, আর কোন কথা হয় নি। এই ঘটনার পর তাঁদের মধ্যে আর মোলাকাৎও হয় নি। এখানে উল্লেখ্য, ঐটাই ছিল মানবীয় রকফেলারের মোটা অঙ্কের প্রথম দান পত্র। পর জীবনে মানুষের কল্যাণ করে তিনি শত শত কোটি টাকা দান করেছেন।

পরিণত বয়সে মানব দরদী বিশ্ব-বরেণ্য রকফেলার তাঁর বিপুল ধনাঢ্যতার স্বস্তিচারণ করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন—"জীবনে অর্থ সঞ্চয়ই শেষ কথা নয়। মানুষ তার হাতে সঞ্চিত অর্থের অছি মাত্র। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় মহাপাপ। পরার্থে জীবন যাপনের মাধ্যমেই মানুষ চরম পরিণতির পথে শ্রেষ্ঠ পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। আমি সে ভাবেই চলার চেষ্টা করেছি।" এ যেন মানব-গুরু স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে আত্মস্থ করে তারই রোমন্থন। প্রথম সাক্ষাতেই ধনদণ্ডী রকফেলার অনিচ্ছায় বিবেকানন্দের কাছ থেকে মানব্রতের যে মহৎ শিক্ষা লাভ করেন তাঁর জীবনে চলার পথে সেটাই তাঁর পরম পাথের রূপে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবীর রূপে বরণীয় করে রেখেছে।

ভাষা-প্রসঙ্গে

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

শুধু ভাববিনিময়ের জন্যই যে ভাষার প্রয়োজন তাহা নহে। জাতীয় সংস্কৃতি, সংহতি ও একজাতীয়তাবোধ সৃজনে ও সংরক্ষণে ভাষার প্রভাব অপরিসীম।

গান্ধীজী বলতেন—"মাতৃদুগ্ধ যেমন একান্ত প্রয়োজন দৈহিক পুষ্টি বিধানের জন্য, তেমনই প্রয়োজন মাতৃভাষার সম্যক মানসিক বিকাশের জন্য।"

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, চিন্তাবিদ শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী মহাশয় বলেন—"What is man if he is not an employer of language? His mind is formed by his language, his life is controlled by it, and his culture is dependent on it." অর্থাৎ মানুষের (তথা জাতির) পরিচয় তার ভাষা। ভাষার দ্বারাই তৈরী হয় মানুষের মন, জীবন হয় নিয়ন্ত্রিত। মানুষের কৃষ্টি নির্ভর করে তার ভাষার উপরে।

মহাত্মা গান্ধীর ও নীরদ বাবুর অমূল্য কথাগুলি দিক্‌দর্শন রূপে গ্রহণ করিয়াই তবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে ভাষার আলোচনায়, নচেৎ দাসমনোবৃত্তি-প্রসূত ভাবের আবেগে ভাষা চিন্তা করিতে গেলে যে কেবল ভুলই হইবে তাহা নহে, সর্বনাশ হইবে দেশের ও জাতির। তারপর কোন্ শ্রেণীর লোকের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সূত্র হইতে চলিল বা কোন্ প্রদেশের প্রভুত্ব লোপ পাইতে বসিল, এই সব ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ভাষা চিন্তা করিলে চলিবে না, ভাষার সমস্যা সমাধান করিতে হইবে

দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের পারিপ্রেক্ষিতে।

আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে কিন্তু মানসিক দাসত্বের কবল হইতে এখনও মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই এবং এই কথা যে সত্য বর্ণে বর্ণে তাহা পরিস্ফুট আমাদের মানসিক গঠনে, কথাবার্তায়, চালচলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে, বলিতে গেলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। এই জাতিভেদের দেশে আরও একটি অবশ্য জাতিভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে ইংরাজী জানা ও অজানার মধ্যে।

শিশু যদি বলিতে পারে হেড্, নোজ, ইয়ার তবে আমরা কতই না পুলকিত হই, মাথা নাক, কান বলিতে পারুক বা নাই পারুক তাতে কিছু আসে যায় না। যদি বালক, বালিকারা ইংরাজীর মাধ্যমে পড়ে তবে তাহা বলিয়া মাতাপিতারা কতই না গর্ব অনুভব করেন। পক্ষান্তরে কেহ বাংলার মাধ্যমে পড়ে শুনিলে মনটা যেন দমিয়া যায়। কেহ ইংরাজীতে এম, এ, পাশ করিয়াছে শুনিলে বাহবা দেই কিন্তু বাংলায় পাশ করিলে তাকে দেখি কৃপার দৃষ্টিতে। বাংলা কথোপকথনের মধ্যে দুই চারটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার না করিলে কেহ শিক্ষিত বলিয়া গণ্য হয় না। ইংরাজি শিক্ষার মানদণ্ডই হয় আমাদের সভ্যতার স্তর বিন্যাস। কোন রৈমিকধারী, ব্যক্তি যদি বক্তৃতা দেন ইংরাজিতে তবে তাকে বলি মস্তবড় সাধু। সাধুত্বের শ্রেষ্ঠ ডেগ্রীও হয় ঐ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমেই হয় আমাদের সামাজিক স্তর বিন্যাস। এমন কি কোন পাগল যদি গালাগালি দেয় ইংরাজি ভাষায় তবে আমাদের মন ভরিয়া উঠে সম্ভবেদনায় পক্ষান্তরে পাগল যদি গালাগালি দেয় বাংলায় তবে আমরা বিরক্তি বোধ করি কিংবা একটা ঢিলই ছুড়িয়া বসি। তারপর ধরুন পোষাকের কথা, নানা অছিলায় আমরা এখন এই গরম দেশে কোট পাতলুন পরিয়া নকল সাহেব সাজিয়া বিশিষ্ট ভদ্রলোক হইলাম বলিয়া মনে মনে গর্ব অনুভব করি। অথচ মাত্র কিছুদিন পূর্বেই কৃষ্টীল আমলে এই পোষাককে বলা হইত 'গোলামী পোষাক' এবং মুষ্টিমেয় যাহারা ঐ পোষাক পরিত তাহাদের বলা হইত কৃষ্টীলের 'খাস গোলাম'। একমাত্র সৈন্য, পুলিশ ও কলকারখানার শ্রমিক ভিন্ন অপর কাহারও ঐ পোষাক পরিবার প্রয়োজন আছে কি? ডাক্তারদেরও নাই, পরন্তু এখন কি শৈল্য চিকিৎসকদেরও আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু ঐ পোষাক না পরিয়া যদি কোন পাশ করা অভিজ্ঞ ডাক্তার জাতীয় পোষাক পরেন তবে তো তিনি ডাক্তারই নন। হাতুড়ে ডাক্তার গোলামী পোষাক পরিলে বরং অধিক সম্মান পায়—সে হয় বড় ডাক্তারবাবু। জাতীয় পোষাককে আমরা দেখি কৃপার দৃষ্টিতে।

নাইট ক্লাবে যোগ না দিলে বা সুরাপান না করিলে না কি আমাদের আভিজাত্য বজায় থাকে না। তাই বোধ হয় দেখিতে পাই দেশের ভবিষ্যৎ এক শ্রেণীর যুবক এমন কি যুবতীরা পর্যন্ত মদ্য পানে আসক্ত হইতেছে এবং ব্যয়বহুল নাইট ক্লাবে যোগ দিতে না পারিয়া ফেরের ধারে গাছের আড়ালে 'নাইট ক্লাব' সৃষ্টি করিয়া নিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর যুবক যুবতীদিগের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তাহারা এখন অন্যায়ের বোধ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর কত উদাহরণ দিব? ইংরাজি শিক্ষার মৌলতে আমাদের মানসিক স্তর কোথায় আসিয়া নামিয়াছে? এখন তো শতকরা একজন মাত্র ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত। ইংরাজি শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় কৃষ্টী ও সভ্যতা যে একেবারে লোপ পাইয়া দেশ দুর্দশাগ্রস্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন সর্বপ্রথমেই আমাদিগকে ঠিক করিতে হইবে আমরা কোন্ আদর্শের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাই। আমরা কি জাতীয় কৃষ্টী ও সভ্যতার ভিত্তিতে বর্তমান জ্ঞান বিজ্ঞানের সহায়ে দেশ ও সমাজ গঠন করিয়া বাঙালী ও ভারতীয় হিসাবে জগৎ সভায় সম্মানিত আসন লাভ করিতে চাই, না আমাদের মাতৃভূমিকে একটা 'ফিরঙ্গ ভূমি'তে পরিণত করিয়া বহুরূপীধারী 'ঝাঁড়কাকের' ন্যায় জগৎ-সভায় নৃত্য করিয়া একটা হাস্যাস্পদ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তুষ্ট থাকিতে চাই। যদি প্রথম আদর্শটিকেই

আমরা বরণীয় বলিয়া মনে করি তবে অন্যান্য আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন দেশের ন্যায় আমাদিগকেও বিদেশী ভাষার মোহ ত্যাগ করিয়া মাতৃভাষাকেই বরণ করিয়া নিতে হইবে শিক্ষা ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে।

নবসৃষ্ট দেশ ইস্রায়েল তাহার মৃত প্রায় জাতীয় ভাষা হিব্রুকেই পুনরুজ্জীবিত করিয়া সর্বস্তরে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছে। এমন কি ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেন ঐ দেশে হিব্রুভাষায় যাদবেই উচ্চাঙ্গের গবেষণার কাজও পরিচালিত হইতে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীবৃন্দ অধিকাংশই বহিরাগত ইহুদি এবং ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ তথাপি তাহারা ইংরাজি বা জার্মান ভাষাকে গ্রহণ না করিয়া হিব্রুকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিয়াছে কারণ জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা বা একজাতীয়ভাবোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। রোমানগণ বৃটেন ত্যাগ করিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তথাকার অধিবাসীবৃন্দ রোমান ভাষা হইতে তখনকার ইংরাজি ভাষা অনেক নিম্নস্তরের হইলেও তাহাদের জাতীয় ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই জন্যই ইংরাজ একটা বৃহদাকার জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়া সর্বক্ষেত্রে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) তার জাতীয় ভাষা বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন দিয়াছে এবং ফল স্বরূপ লাভ করিয়াছে স্বাধীনতা। নানা রাজনৈতিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহারা বাংলাভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনলস প্রয়াস করিয়া যাইতেছে এবং সফলকামও হইয়াছে অনেকাংশে। দীনেবার কবলমুক্ত হওয়ার অনতিকাল মধ্যেই সুকার্ণো তাহাদের জাতীয় ভাষা 'বাসা'র প্রচলন করিয়াছেন সর্বক্ষেত্রে। চীনের সর্বত্র প্রচলন চীনা ভাষার। জাপানও ইংরাজি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া সর্বক্ষেত্রে জাপানী ভাষা প্রচলনে ব্রতী হইয়াছে। রাশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক ভাষাতেই সব কাজ চলে। ব্যতিক্রম শুধু ভারতবর্ষ (বিশেষ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ)। (ইলাসট্রেটেড উইকলী মার্চ ৪-১০।১৯৭২)

এখন ইংরাজি ভাষাকে বহাল রাখিবার জন্য যেই সব যুক্তি দেখান হয় সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা হয় (১) ইংরাজি একটি উন্নত ভাষা (২) ইংরাজি আন্তর্জাতিক ভাষা (৩) ইংরাজির দরজা খোলা না রাখিলে আমরা বিশ্বের জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত হইব (৪) ইংরাজি ভাষার প্রভাবেই একদা ভারতে ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল (৫) ইংরাজি ভাষার মাধ্যম ব্যতিরেকে উচ্চস্তরের শিক্ষা বিশেষ ভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে (৬) ইংরাজি বাদ দিলে আমাদের শিক্ষার মান নীচু হইবে।

আর একদল ইংরাজির সমর্থক আছেন যাহারা অন্য কোন যুক্তি দেখাইতে না পারিয়া ইংরাজি ভাষাকে একেবারে জাতীয় ভাষা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, যদিও ১৯৭১ সনের আদম সুমারিতে দেখা যায় ৫৮ কোটী ৮০ হাজার ভারতীয়ের মধ্যে মাত্র ১২১৪৯। জনের মাতৃ ভাষা ইংরাজি এবং সব ভারতীয় হিসাবে ভাল ও কোন প্রকার ইংরাজি জানে তেমন লোকের সংখ্যা মাত্র একজন সত্তরজন, তাহাও আবার প্রায় দুইশত বৎসরের চেষ্টার ফলে। (ইলাসট্রেটেড উইকলী, ৪-১০ মার্চ '৭২)

বাংলা, সংস্কৃত, জর্মন, ফরাসির ন্যায় ইংরাজিও যে একটি উন্নত ভাষা সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বিদেশী ভাষার অতি সাম্রাজ্যতত্ত্ব প্রবর্তনের ফলেই জাতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই ভাষাকে ব্যাপক ভাবে প্রচলন করিবার পক্ষে কোন যুক্তি আছে কি? কৃষ্টিই যদি লোপ পাইল তবে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় থাকিবে কেমন করিয়া?

বাংলাদেশ, ইসরাইল, ইন্দোনেসিয়া সহ অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্র যদি নিজ নিজ জাতীয় ভাষাদ্বারাই সকল কাজ চালাইতে পারে তবে আমরাই বা পারিব না কেন? বাংলা ও অন্যান্য গুটি প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষা কি উন্নত নহে? বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলিতেন 'যাহারা বলে বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা

দেওয়া সম্ভব নহে, তাঁহারা বাংলাও জানেন না বিজ্ঞানও জানেন না।' রসায়নবিদ ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেন "সততার সহিত চেষ্টা করিলে মাত্র পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় বাংলা মাধ্যমে উচ্চ স্তরের রসায়ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া খুবই সম্ভব। পদার্থবিদ্যাবিদ স্বর্গত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তো বাংলায় পদার্থ বিদ্যার বই লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। আসল কথা হইতেছে আমরা দেশাত্ম-বোধ বর্জিত সুতরাং আমাদের চেষ্টাও নাই। আমরা এখনও দাসমনোবৃত্তি আর হীনমন্যতার রোগে ভুগিতেছি এবং এই রোগ সারিবে না যতদিন না আমরা ইংরাজির মোহ ত্যাগ করিতেছি।

ইংরাজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা এই কথার মূলে কোনই সত্য নাই। ইংরাজ অধ্যুষিত কয়েকটি দেশ ভিন্ন পৃথিবীর কুত্রাপি ইংরাজি ভাষার প্রচলন নাই বলিলেই চলে, যাহা আছে তাহা অত্যন্ত সীমিত। আর থাক, ইংলণ্ডের অদূরবর্তী কন্টিনেন্টের দেশসমূহে চলনসই ইংরাজি জানে এমন লোক মিলিবে কদাচিৎ—হাজারে একজনও আছে কিনা সন্দেহ। ইংলণ্ডের ওয়েলস্ প্রদেশেও ইংরাজি জানে তেমন লোকের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৩০ জন। (ওয়ার্ল্ড এণ্ড দি পিপ্‌ল্‌স) ইংরাজ ভিন্ন অন্যান্য দেশের প্রধানগণ কেহই ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা কাজ চালান দোভাষীর মাধ্যমে। ইউ, এন, ওতে ইংরাজি বক্তৃতাকে অন্ততঃ আরও ছয়টি ভাষায় ভাষান্তরিত করিলে তবে সেখানে কাজ চলে। তবু কি বলিব ইংরাজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা?

প্রত্যেক দেশেই হাজারে দুই চারটি ছেলেমেয়ে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে কোন না কোন একটি বা ততোধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষা করে। কেহ পড়ে দোভাষীর বা পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করিবার জন্য, কেহ পড়ে ব্যবসা বাণিজ্যের তাগিদে, কেহ পড়ে নিছক সাহিত্য রস আস্বাদনের জন্য আবার কেহ পড়ে অন্যদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া জাতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবার জন্য, কিন্তু তাই বলিয়া চালাও ভাবে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিবার মত দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না এক ভারতবর্ষ ভিন্ন। অন্যান্য দেশে বিদেশী ভাষার জন্য যতটুকু দরজা খোলা আছে আমাদের দেশে ঠিক ততটুকুই খোলা রাখা প্রয়োজন ইংরাজি ভাষার জন্য। দরজা বেশী খোলা থাকিলে বিদেশী হাওয়ার বেগে যে আমাদের ঘরে টাঙান জাতীয় মানচিত্র খানাও উড়াইয়া নিয়া যাইবে সেই বোধ আমাদের কবে হইবে? সেখানে হাজারে দুই তিনটি মাত্র ছেলে বা মেয়ে ইংরাজি অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে শিখিলেই কাজ চলিয়া যায় সেখানে কোটী কোটী ছেলে মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়া সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় ঘটাইবার এবং জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা ধ্বংসের ব্যবস্থা করিবার পক্ষে কোন নৈতিক যুক্তি আছে কি? বলি, অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে আমরা কি বেশী বুদ্ধিমান?

তারপর ইংরাজি শিক্ষার জন্য মোটেই নহে, একদিকে সমগ্র ভারতের উপরে একই ইংরাজ সরকারের কঠোর শাসন ও শৃঙ্খলা এবং অপর দিকে ইংরাজ-বিদ্বেষ ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এই তিনে মিলিয়া একটি ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল; তাই দেখিতে পাই ইংরাজ শাসনের অবসানের এবং স্বাধীনতা লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিয়াছে আবার প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে অনৈক্য, অথচ এখন ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা কিন্তু বাড়িয়াছে বহুগুণ।

উচ্চস্তরের শিক্ষার স্তরে ইংরাজির পরিবর্তে প্রাদেশিক ভাষা প্রবর্তন করিতে গেলে প্রথমাবস্থায় কিছু অসুবিধা নিশ্চয়ই হইবে কিন্তু তাই বলিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। ইংরাজির মোহমুক্ত মন নিয়া দেশাত্ম বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনলস চেষ্টা করিলে কোন বাধাই পথ রোধ করিতে পারিবে না। ভাবিতে অবাক লাগে এবং লজ্জাবোধ হয় যখন দেখি গণতন্ত্রের দাবীদারী জনসংখ্যার মাত্র একাংশ লোক শতকরা ১৯ জন লোকের ঘাড়ে, অগণতান্ত্রিক উপায়ে ইংরাজির বোঝা চাপাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

বলি, ঐ দাসমনোবৃত্তির কাল কৃষ্ণটা কবে আমাদের স্কন্ধচ্যুত হইবে, কবে দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পাঁচ

বয়েস তো আর কম হয় নি। চার পেরিয়ে পাঁচ। জগন্নাথ মিশ্র ভাবলেন, এবার পুত্রের হাতে খড়ি দিতে হয়। এবার থেকে ও লেখাপড়া করুক। ওর মস্তিষ্কনা তাহ'লে খুলি হবে।

যেমনি ভাবনা, তেমনি কাজ।

জগন্নাথ মিশ্র শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে নিমায়ের হাতে খড়ি দিলেন।

মিশ্র বললেন, 'পড়ো বাবা, ক খ।'

নিমাই এ দিক চেয়ে, সে-দিক চেয়ে, মিশ্রের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ক খ।'

মিশ্র বললেন, 'খ-খ।'

নিমাই পাখীর মতো তা উচ্চারণ করে গেলো।

কী আশ্চর্য!

আশ্চর্য নিমায়ের স্মৃতি শক্তি।

সে যা শোনে, তা-ই শেখে। শোনা কথা একেবারে যেন মনে গেঁথে যায়।

মিশ্র ভাবেন, না, যা ভেবেছিলুম, তা নয়। মূর্খ হবে না এ ছেলে। বেঁচে থাকলে পণ্ডিত হবে। বংশের মুখ রাখবে।

কিন্তু দুরন্ত, বড়ো দুরন্ত নিমাই। বড়ো সে অভিমানী।

আকাশের চাঁদ দেখে বলে, চাঁদ দাও আমাকে। গাছের ডালে পাখী দেখলে বায়না ধরে। পাখী চাই তার। পাখী তাকে ধরে দাও।

শচী দেবী বলেন, 'সে কি রে! পাখী পাবো কোথায়! উড়াল পাখী কি ধরা যায়? তুই চুপ কর বাছা, মেলায় যখন টিয়ে আসবে না, তখন সুন্দর দেখে একটি টিয়ে কিনে দেবো তোকে।'

না, নিমাই টিয়ে চায় না। যে পাখীটি এসে গাছে বসেছে, মাঝে মাঝে শিস্ দিচ্ছে, সেই পাখীটি, সেই হলুদ রঙের পাখীটিই তার চাই।

সে পাখীর জন্যে কান্না সুরু করে নিমাই।

শচী দেবী বলেন, 'কি বোকা ছেলেরে বাবা। কোথায় টিয়ে। আর কোথায় ময়না! টিয়ের কাছে কি ময়না দাঁড়ায়? টিয়ে কতো সুন্দর। তার সবুজ পালক। গলায় লাল ঘের। ঠোঁট দু'টিও টুকটুকে লাল।'

একটু থেমে আবার বলেন, 'জানিস্ খোকা, টিয়ে পাখী কথা বলে। পড়িয়ে শিখিয়ে নিলে সে কৃষ্ণ নাম বলে।'

শচী দেবী যেন একটি টিয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বলো পাখী হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম, রাম, হরে হরে।'

টিয়ে পাখীর জন্যে এখন লোভ হয়েছে নিমায়ের।

টিয়ে পাখী ভারী মজার পাখী তো! মানুষের মতো সে পড়তে পারে। সে কৃষ্ণ নাম বলে। তার টিয়ে পাখীই চাই।

শচীদেবীকে বলে, 'বলো আমায় টিয়ে কিনে দেবে! সুন্দর একটি টিয়ে। আমি তাকে পড়াবো, গান শেখাবো।'

শচীদেবী হাসেন। ছেলেকে তবে ওষুধে ধরেছে।

বলেন, 'দেবো রে, দেবো। সামনে ঐ যে ষষ্ঠীর মেলা আসছে না, সে মেলা থেকে তোকে সুন্দর একটি টিয়ে কিনে দেবো।'

নিমায়ের চোখে তখন একটি টিয়ে পাখীর ছবি ভাসছে। টিয়ে পাখীর, একটি সুন্দর টিয়ে পাখীর। সে টিয়েকে সে যেন এক্ষুনি কাছে পেয়ে গেছে।

পাড়ার ছেলেদের নিয়ে দল করেছে নিমাই। ছোট ছেলের দল।

সে দলের পাণ্ডা সে নিজে।

মাঠে, পথে, ঘাটে সব জায়গায়ই এদের দেখা যায়।

সব জায়গায়ই এদের থানা। সব জায়গায়ই এদের হানা।

এদের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে প্রতিবেশীরা।

কেউ এসে নালিশ জানায় জগন্নাথ মিশ্রের কাছে।

বলে, 'নিমাইকে একটু সামলাও দাদা, আর যে পারছি নে। লঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল বাঁদরদের দ্বারা। নিমাইদের জ্বালায় আমাদের না নবদ্বীপ ছাড়তে হয়।'

জগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হন। অতটুকু ছেলে নিমাই, সে এমন কি করেছে যে এদের নবদ্বীপ ছাড়তে হবে?

বলেন, 'কি হয়েছে সনাতন? কি করেছে নিমাই?'

'আর করেছে!' বলে সনাতন একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে। বললে, 'করবে আবার কি? আমার প্রাণটা তুলে এনেছে দাদা। অমন সাধ করে পুঁতেছি মালতী ফুলের চারা। কেমন সুন্দর লতিয়ে লতিয়ে গেছে। ফুলও ধরেছে বেলা। সেই লকলকে, থকথকে গাছটাকে মূল সুদ্ধ উপড়ে আনলে গা। বলে, কেষ্ট পুজো করবে। কেষ্ট পুজোয় খান মাজাবে।'

সনাতনের কথা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন জগন্নাথ মিশ্র। কি যেন ভাবতে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলের রং বদলালো। গৌরবর্ণ হলো রক্তাভ। দু'টি চোখের তারা উঠলো ধক্ ধক্ করে।

বললেন, 'আমায় তুমি মাপ করো সনাতন। আসুক আজ হতচ্ছাড়া বাড়ীতে—'

মিশ্রের কথা শেষ হলো না। সনাতন জিভ কাটল। জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ ছিঃ। ওটি বলো না দাদা! মাপ করবো কি? আমি মাপ করার কে? তা ছেলে বয়সে এক আধটু দুষ্টুমি করবে বৈ কি! আমরা করিনি? ও দাদা, বলো না কেন। আমরা করিনি? নষ্ট চন্দ্রে এর হাড়ি ওর বাড়ীতে, ওর চেঁকি তার চাতালে নিয়ে রাখি নি? দল বেঁধে গিয়ে এ বাড়ী সে বাড়ী লাউ কুমড়ো সব চাঁক করিনি? করিচি। নইলে ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!'

একটু থেমে আবার বললে, 'তবে কি জানো দাদা, নিজ হাতে পোতা গাছ কিনা—তাই তাতি বই হয়। প্রতিদিন আমার মালতীকে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি। ওর মূলে জল দিয়েছি। ওর নতুন পাতা গজালে আমার আনন্দ হয়েছে। ওর মাথায় প্রথম যে দিন কুঁড়ি এলো, তোমায় বলবো কি দাদা, সে দিন যেন আমি বেই বেই করে নেচে ফিরেছি। মনে হয়েছে, আমার ঘরে যেন নাতি এয়েছে। আমার মালতীমা'র ছেলে।' বলতে বলতে সনাতনের চোখে জল এসেছিল।

সনাতন দু'হাতে তা মুছে নিলে। একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তারপর বললে, 'সেই মালতীকে আজ যখন দেখছিনে, তখন বুকটা একেবারে খা খা করছে। মনে হচ্ছে, মালতী যেন আমার মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটি আজ মারা গেছে।'

সনাতনের চোখ থেকে এবারেও কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। চোখে সেই জল নিয়েই মিশ্রের হাত দু'টি জড়িয়ে ধরলে সনাতন।

বললে, 'যে গেছে, সে তো আর ফিরবে না দাদা, আমায় তুমি কথা দাও, সে জন্যে নিমুকে তুমি বলবে না। আরে জলজ্যান্ত গাছটা গেছে। বুকে আমার খুব লেগেছে। তাই তো তোমায় বলতে আসা। বুকটাকে একটু হাল্কা ক'রে নেয়া। তার উপর এ নিয়ে নিমুকে

যদি তুমি বাড়াবাড়ি করো, তা হ'লে এ সনাতন তোমায় উঠোনে আর কোন দিনই পা দেবে না। হুঁ, সনাতনের এক কথা। দাক কথা।' বলতে বলতে সনাতন বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

মিশ্রের চোখ দুটি হঠাৎ কেন যেন জলে ভরে উঠেছে।

ছয়

সে রাতের স্বপ্নের কথা ভোলেন নি অদ্বৈতাচার্য।

প্রভু বলেছেন, তিনি আসছেন। সে কথা কি মিথ্যে হতে পারে? না হ'লে পয়াল নামে কলঙ্ক হবে না তাঁর? জীব তাঁর উপর বিশ্বাস হারাবে না?

না, না। তা কখনো হয়? তিনি এসেছেন। নিশ্চয়ই তিনি এসেছেন। পরম বিশ্বাসে পথ চলেন আচার্য।

নবদ্বীপের ঘরে ঘরে খোঁজেন।

কে, কে সে ভাগ্যবতী, যে আজ যা যশোদা হয়েছে! যে ক্ষীর, সর, নবনীতে তার গোপালকে বড়ো করছে?

চাই, চাই, একবার তাকে দু'চোখ ভরে দেখতে চাই। তার চরণধূলি চাই। তার চরণতলে এসে যে আজ সকল তীর্থ এক হয়েছে। সে তীর্থরাজ যে না পেলেই নয়।

মিশ্র গৃহেও যাতায়াত আছে আচার্যের।

একই দেশের লোক। আচার্য পত্নী সীতা দেবী শচীদেবীর সখী। তার উপরও সেতু আছে। যোগ-সেতু। মিশ্রের জ্যেষ্ঠ নন্দন বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপ পরম বৈষ্ণব। পরম ভাগবত।

আচার্যের ভাগবতমণ্ডলের বিশ্বরূপও একটি নক্ষত্র। উজ্জ্বল নক্ষত্র।

অদ্বৈতাচার্য সেই কথাই বলেন।

মিশ্রভবনে আজকাল যাকে মাঝেই আসেন অদ্বৈতাচার্য। ঘন ঘনই আসেন। এসেই খোঁজেন নিমাইকে। নিমাই কোনদিন বাড়ী থাকে। কোনদিন আবার থাকে না।

যেদিন থাকে, সেদিন তাকে নিয়েই মেতে ওঠেন আচার্য। তাকে কাছে ডাকেন। গায়-মাথায় হাত বুলোন। একটা বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন নিমাইয়ের মুখের দিকে।

আহা, কী অপরূপ রূপ নিমাইয়ের। গায়ের রং কাঁচা সোনা। সুঠাম, সুন্দর মুখমণ্ডল। সেই সুন্দর মুখমণ্ডলে আবার দু'টি ভাব-তন্ময় আঁখি। মাথায় ঘন কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম।

আচার্য নিমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যেন কোথায় হারিয়ে যান। যেন কোন্ গভীরে তলিয়ে যান। সেখানে আরও একটি মুখ তাঁর মনে ভেসে ওঠে। সে তাঁর সেই স্বপ্নে দেখা ঠাকুরের মুখ। যে মুখের অমৃত বাণী তিনি শুনেছেন। যিনি বলেছেন, 'অদ্বৈত, ভয় নেই, আমি আসছি।' তবে, তবে প্রভু কি নিমাই হয়েই নবদ্বীপে এসেছেন? মিশ্র গৃহে ঠাঁই নিয়েছেন? জগন্নাথ মিশ্র আজ নন্দ, শচীদেবী যা যশোদা?

শ্রীবাস, শ্রীকান্ত, শ্রীরাম, আমি পেয়েছি। আমি পেয়েছি। গোলোকের নারায়ণকে আমি ধরার ধূলিতে খুঁজে পেয়েছি।

মনের আনন্দে নিজের মনেই যেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন অদ্বৈতাচার্য। তিনি যেন চীৎকার ক'রে ক'রে শোনাতে চান, 'যাঁর জন্যে এ্যাদ্দিন আমি কেঁদেছি, চোখের জলে এ্যাদ্দিন আমি যাঁর অর্ঘ্য সাজিয়েছি, তিনি এসেছেন তো, ধরার ধূলায় গোলোকের নারায়ণ এসেছেন।'

কিন্তু নিমায়ের চাপল্যে আচার্যের এ ভাব আবার ছিঁড়ে যায়। তাঁর দৃষ্টি আকাশ থেকে আবার মাটিতে নামে। নবদ্বীপের পথে-ঘাটে, রোপ জঙ্গলে ফেরে।

সেখানে নিমাই অতি সাধারণ। অতি সাধারণ। নবদ্বীপের আর দশটি বালকের মতোই একটি বালক। সেখানে সারাদিন সে দুষ্টুমি ক'রে ফেরে। বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হল্লা করে। তার দুষ্টুমিতে পাড়া পড়শীরা অতিষ্ঠ।

জগন্নাথ মিশ্রের এ দুষ্টু ছেলে কি গোলোকের নারায়ণ

হ'তে পারে ?

না, না। এ নয়, এ নয়। এ কখনো নয়।

একটা হতাশার মেঘ আচার্যের মনকে ঘিরে ধরে আবার। তাঁর চোখে আবার সেই সন্ধানী দৃষ্টি : কোথায় কোথায় তুমি এসেছো প্রভু। কোথায় ব্রজের হাট বসিয়েছো ? কোথায় শ্রীবাস, সুধাম, বলরামকে নিয়ে তুমি লীলায় মেতেছো ?

কোথায় ? তুমি কোথায় গো ?

মনে এমনি অনেক প্রশ্নের ঝলা খেলে আচার্য আবার বাড়ী ফিরে আসেন।

শ্রীবাস আসে। ডাকে, 'আচার্য !'

'কে ? শ্রীবাস—এসো, এসো, বসো শ্রীবাস।'

শ্রীবাস বসতে বসতে বলে, 'দিনের পর দিন গেলো, প্রভু তো এলেন না আচার্য !

'এসেছেন, এসেছেন। এই নবদ্বীপেই তিনি এসেছেন। তিনি আমাদের নিয়ে খেলছেন শ্রীবাস, আমরা তাঁকে ধরতে পারছিনে।'

একটু থেমে, কণ্ঠটা আরও গম্ভীর করে আচার্য বলেন, 'কিন্তু আমি তাঁকে ধরবো। তাঁকে আমি খুঁজে বের করবোই শ্রীবাস, নইলে তাঁর জন্যে এতদিন ধরে আর কাঁদলাম কেন ? তাঁকে আমার ধরতেই হবে।' বলতে বলতে আবেগে আচার্যের দু'টি চোখ যেন জ্বলজ্বল করে ওঠে।

শ্রীবাস বলে, 'তুমি বলছো, তাইতো আমি বিশ্বাস ক'রে বসে আছি। তাঁর পথের দিকে চেয়ে আছি। নইলে আর এ মুলুকে থাকতাম না আচার্য, এ মুলুক ছেড়ে কবে আমরা চলে যেতাম। এ মুলুকে কি মানুষ থাকে ? মানুষ বাস করতে পারে ?'

শ্রীবাসের কথায় মিত কাটেন আচার্য।

বলেন, 'ছিঃ, ও কথা বলো না। অমন ক'রে বলো না ? পালাবে কি গো ? পালাবে কেন ? নদীর ঢেউ দেখেই নৌকো ডুবিয়ে দেবে ? ঝড় দেখেই উড়িয়ে দেবে ঘর বাড়ী ? এ কি বৈকুণ্ঠের কথা ? এ কি মানুষের কথা ?

একটু থেমে আবার বলেন, 'শ্রীবাস, রাতের পর দিন, অন্ধকারের পর আলো, দুঃখের পরে সুখ—এই গুটা নিয়ার দোলনাতেই না সৃষ্টি চলেছে। নবদ্বীপের আজকের বীভৎসতায় তবু তুমি ভয় পাবে ? ভয় পেয়ো না শ্রীবাস, ভয় করো না। অন্ধকারের শেষেরই একদিন সুপ্ত বাজবে, পদ্ম থেকেই জন্ম নেবে পদ্মজ। নবদ্বীপেরও আবার দিন ফিরবে।'

বলতে বলতে আচার্য একটি গানের কলিতে টান দেন।

শ্রীবাস তাঁর মুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন।

'রূপ, অরূপ, রূপরে—'

বেলা বেড়েছে। বিশ্বরূপ এখনো ঘরে নি। সেই সকাল থেকে কোথায় গেছে ছেলে, এখনো বাড়ী এলো না।

শচী দেবী খোঁজ করলেন বিশ্বরূপকে।

বিশ্বরূপ এলো না, এলো নিমাই।

শচীদেবী বললেন, 'এই যে নিমাই, ভাই রে, দাদাকে দেখেছিস ?'

নিমাই বললে, 'না তো।'

'তা দেখবি কোত্থেকে ? সে কি আর বাড়ী থাকে ? দিন-রাত গিয়ে পড়ে থাকে আচার্য ঠাকুরের বাড়ীতে। কি পেয়েছে ওখানে। সে-ই জানে। বলে, আচার্যের কাছে ধর্ম কথা শোনে। লেখে পড়ে না হয় পণ্ডিতই হয়েছে, তাই বলে এই কি তার ধর্ম কথা শোনবার বয়েস ? বে-সাদি করতে হবে না ? সংসার করতে হবে না ?' উত্তেজনার মুখে শচীদেবী এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে ফেলেন।

নিমাই বলে, 'দাদাকে ডেকে আনবো মা ?'

'তুই তাকে আনবি কোত্থেকে ? আচার্য ঠাকুরের বাড়ী তুই চিনিস্ না কি ?'

'হুঁ চিনি, খুব চিনি।' বলে নিমাই আর দাঁড়ালে না। তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে আচার্য ঠাকুরের বাড়ীর

দিকে চললে।

পথ থেকেই সে ডাক সুরু করেছে, 'দাদা, দাদাগো, বাবে এসো গো।'

আবার সেই নিমাই।

অপরূপ লাবণ্য-মাখা জগন্নাথ মিশ্রের সেই দুষ্টু ছেলে।

আচার্য্য অনিমেষ তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে।

আহা, আহা, কী রূপ মাধুরী! আকাশের চাঁদ যেন ধরায় ধূলায় নেমে এসেছে। কতো কীর নবনী দিয়ে যেন গড়া তার বর বপু। এতো রূপ কি মানুষে সম্ভব?

না, না, নিমাই সাধারণ শিশু নয়। সে-ই শিশুবেশী নারায়ণ।

আচার্যের মনে এমন অনেক জিজ্ঞাসা ঢেউ খেলে চলেছে। তিনি যেন ডুব দিয়েছেন অনেক গভীরে। সেখানে নিমায়ের মুখ আর একটি মুখের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সে মুখ তাঁর ঠাকুরের।

নিমাই ডাকলে, 'দাদা, ও দাদা, বাড়ী এসো। মা ডাকছেন।'

বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সভাতেই ছিল। নিমায়ের ডাকে সে ফিরে তাকালে। বললে, 'নিমু? আয়, এ দিকে আয়। বোস এখানে।'

'না, না, আমি বসবো না। একটুও বসবো না। মা ডাকছেন। তুমি বাড়ী এসো।'

'বোস, আমি যাচ্ছি।'

'না, যাচ্ছি নয়, তুমি এক্ষুনি চলো।' বলে নিমাই দৌড়ে এসে বিশ্বরূপের হাত ধরে টানাটানি সুরু করলে।

বিশ্বরূপ হেসে বললে, 'দাঁড়া, দাঁড়া, যাচ্ছি রে, যাচ্ছি। তুই যখন এসেছিস্, তখন কি আমার রেহাই করবার উপায় আছে?' বলে বিশ্বরূপ আচার্যকে প্রণাম করে সভা ছেড়ে উঠলে।

আচার্যের দৃষ্টি তখনও নিমায়ের মুখের উপর ঘুরছে।

পথে যেতে যেতে কথা হলো দু ভাইয়ে।

বিশ্বরূপ বললে, 'নিমাই, তুই দুষ্টুমি করিস্ কেন রে? দুষ্টু ছেলেকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ না।'

দাদার কথায় কান নেই নিমাইয়ের। পথের পাশে ফড়িং উড়ছে। চোখ তার সেই দিকেই।

সেই দিকে চোখ রেখেই সে বললে, 'দাদা, দাদা, ভাখো, ভাখো, কী সুন্দর ফড়িং। আমায় ফড়িং ধরে দাও। আমি ফড়িং নেবো।'

বিশ্বরূপ বললে, 'ছিঃ, ফড়িং ধরতে নেই। ফড়িং ধরলে ফড়িংরেরা ব্যথা পায়। কাউকে ব্যথা দিতে নেই।'

'বা-রে, ফড়িং ব্যথা পাবে কেন? আমি কি তাকে মারবো? ফড়িং ধরে আমি তাকে খাওয়াবো। আদর করবো।'

'তবু ও সে ব্যথা পাবে। ধর্, তোকে যদি কেউ নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে খেতে দেয়, আদর করে, তা হলেও কি তুই ব্যথা পাবিনে?'

'তা পাবো না কেন? নিশ্চয়ই পাবো। সেখানে তোমাদের দেখবো না যে। তোমাদের না দেখলে আমার দুঃখ হবে।'

'ফড়িংয়েরও তেমনি। ওদেরও তো মা-বাপ আছে, ভাই বোন আছে।'

'ও, তাই বুঝি? তাহলে আর আমার ফড়িং চাইনে। মা-বাবাকে না দেখলে ফড়িংয়ের কষ্ট হবে। তাকে আমি কষ্ট দিতে চাইনে।'

নিমাই এবারে ফড়িংয়ের প্রসঙ্গ ছাড়লে।

বিশ্বরূপ আবার বললে, 'নিমাই, আর দুষ্টুমি করবি নি বল্? দুষ্টুমি করলে লোকে মন্দ বলে। কারো দুষ্টুমি করতে নেই।'

নিমাই তার ডাগর ডাগর দু'টি চোখের দৃষ্টি দাদার মুখের উপর ফেলে বললে, বা রে আমি দুষ্টুমি করি বুঝি?

'এই যে তুই এর গাছ ভাঙিস্, ওর গাই ছেড়ে দিস্। যখন তখন হলবল নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াস্—এর নাম বুঝি দুষ্টুমি নয়?'

(শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায়)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শরণাগতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ। মনের স্তরে হয় শরণাগতি, নয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অথচ শরণাগতি ছাড়া, সাগরের মধ্যে নদীর মাঝ-জল ত্যাগ করিয়া নদ হইয়া যাওয়ার মত না হইলেই কি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়? প্রেম ছাড়া এই দুইয়ের সমন্বয় হয় না। আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর খুব জোর দেই। তাই মনের স্তরে দাঁড়ানো মানুষ শরণাগত হইতে পারে না। শরণাগত হইতে না পারার ফলে বাস্তব ভীষণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কোটে না, একটা বিকৃত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, আমাকেই আঘাত করে, পীড়িত করে। আবার শরণাগত না হওয়া সত্ত্বেও সে অনেক ভক্ত কথা আমার কাছে বক্তৃতায়, কথাবার্তায় শোনে। তাহাতে সে মনে করে অনেক কিছু শিখিয়াছে। ইহাতে অহঙ্কার আরও বাড়ে, শরণাগত হইবার আরও অসুবিধা হয়। শরণাগত না হইলে বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা কিছুই বোঝানো যায় না। তাই 'সমিৎপাণি ব্রহ্মনিষ্ঠং শ্রোত্রিয়ং গুরুং অভিগচ্ছেৎ'—শ্রুতি বলিয়াছেন। কিন্তু শরণাগত না হইলে কানের শোনা তো শোনা হয় না, বরং 'জানিয়াছি' এই ব্যর্থ একটা প্রত্যয় জন্মে। লোক যে আসে না তাহার কারণ এইখানে। একান্ত শরণাগত হইলে লোক ঘাসের মত নিত্য হইত। তাহা তো আমি চাহি নাই। ঠাকুর, তোমার জয় হউক। রেণু ১টায় বাওইআটি যায়, ফেরে প্রায় ৭টায়। বাওইআটির মাঠটা পরিষ্কার করিয়াছে রাজেন ও বিষ্ণুপদ।...মাটির ঘরটায় গোবরাট চৌকাঠ হইয়া গিয়াছে, বেড়াও আসিয়াছে। দোলের দিন আশ্রমে যাওয়া উপলক্ষে রেণু কিছু নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। প্রতিভাকে ২০ টাকা দিয়া আসিয়াছে সেদিনের চাউল ডাইল কিনিবার জন্য। মাখনবাবু বিকালে আসে। প্রেস হইতে কোন খবর নাই। **২৪শে মার্চ**

আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের প্রতি মোহ না থাকিলে আদর্শনিষ্ঠা মানুষ হইতে সরাইয়া আনিবে। কেননা মানুষ তো আদর্শ কখনও ঠিক ঠিক রক্ষা করিতে পারে না। মোহহীন আদর্শনিষ্ঠার মানুষ bard, mechanical, soul-less হয়। মোহ-ই আদর্শ-নিষ্ঠাকে রসাল করে, রস যোগায়। এই মোহ থাকিলে আদর্শ-নিষ্ঠা লইয়াই মানুষের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয়, মানুষকে গড়িয়া তোলা যায়। মোহের স্পর্শহীন আদর্শ নিষ্ঠার ফলে আদর্শবাদী মানুষ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মোহমুক্ত আদর্শ-বান কখনও creative নয়। আদর্শের গতি ভিতরের দিকে, মোহের গতি বাহিরের দিকে। আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে মোহের যোগ ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ মদনমোহন। মোহ না থাকিলে মদনকে মোহিত করিতে পারিতেন না, মদন আদর্শের ভাবে ভাবিত হইতে পারিত না। স্বয়ংহীন মোহনও হইতে পারিতেন না। মদনের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মোহন না করিতে পারিলে মদন মদন হিসাবে বাহিরেই পড়িয়া থাকিত, শ্রীকৃষ্ণের মদন-ভস্ম থাকিত। কোনও বস্তু হইতে অভক্ত হইতে হইলে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, এড়াইয়া বা ঘুরে সরিয়া গিয়া তাহাকে এড়ানো যাইবে না। পরিপাক করাই হইতেছে বস্তুকে পাওয়া। নিত্যগোপাল অমুক হউন। সকালে সকলে জিনিষপত্র গুছায় বাওইআটি যাওয়ার জন্য। ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। গৌর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। 'অনর্পিত চরীম্'—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা'—'অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য'—ব্রহ্মসূত্র ও 'অভিধ্যোপদেশাচ্চ' সূত্র আলোচিত হয়। রাজেন ৩-৪৫ মিঃ যায়... নারিকেলডাঙ্গায় বাজার করিবার জন্য ও সাইকেল লইবার জন্য। সাইকেল বাওইআটি আনিতে পুলিশে ধরে ও বার বার পড়িয়া যায়। উহাতে কি কি আছে ছিল না। **২৫শে মার্চ**

বাগেরহাটি নরনারায়ণ আশ্রমে আগমন ও ঠাকুর প্রতিষ্ঠা

রাত্রি ৩টায় ট্যাক্সীওয়ালা আসিয়া হাজারা আষ্ট করে. ৪-১৫মিঃ কলিকাতা ৮এ রাসবিহারী এভিনিউ হইতে রওয়ানা হই। ট্যাক্সীওয়ালা সারাটা পথ খ্যাচাখ্যাচি আরা লইয়া করে। আটটাকা দেওয়া হয়। ২ টাকা কাটিয়া রাখিতে চুল হয়। কলিকাতা আশ্রমের বহু জিনিষ স্থায়ীভাবে এখানে আনা হয়। ভোর পাঁচটায় বাগেরহাটি পৌঁছি। গত রাত্রিতে চিনু-পরিমল-বাচ্চু, নীলু-সুব্রত-সুরভি আসিয়াছিল। ৮।৯টায় নিত্যগোপাল ভক্ত, নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁহাকে বুকে লইয়া বিগ্রহের বুকে প্রতিষ্ঠার অভিযান লইয়া থাকায় আলোচনা চোখের জলে করি। শ্রীনিত্যগোপালের পট বুকে লইয়া, উষাঙ্গিনীর সঙ্গে, আসনে প্রতিষ্ঠিত করি। প্রার্থনা ও কীর্তন চলিতে থাকে। এই আলোচনায় এখানের নিজন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে ঠাকুরের ভোগ হয়। নীরদবাবুর বাড়ীতে অহোরাত্র কীর্তন, আমি ও চিনু একবার ঘুরিয়া আসি। নীরদবাবু তাহাদের বাড়ীতে প্রসাদ পাবার কথা বলিয়াছিল। আজ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিন আমার আপন জনদের লইয়া আশ্রমেই প্রসাদ পাইব বলিয়া দেই। ১টায় ভূপতিবাবু, বিজনবাবু ও বরিশালের এক ভদ্রলোক প্রসাদ পান। বৈকালে জিতেনবাবু প্রসাদ পান। রাজেন ও বিষ্ণুপদ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। ৪টায় সভার কার্য আরম্ভ হয়। নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা ও তাহার দেবতা নিত্যগোপাল সম্বন্ধে প্রাথমিক একটু আলোচনার পর পতাকা উত্তোলিত করি 'ওঁ আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। সভায় বেশ লোক হইয়াছিল। হিন্দু বিদ্যাপীঠের বহু শিক্ষক, বাসুদেববাবু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। এত দেব-দেবী ছাড়িয়া শ্রীনিত্যগোপালের কটো কেন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার ব্যাখ্যা করা হয়। পতাকার তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করি। মাটি বেড়ার ঘরটাতে উষাঙ্গিনী-পদ্ম-পদ্ম, রেনু-গোপা, বিনু-বন্না শোয়। আমি পাকা ঘরটায় শুই। প্রতিভা-মনুরা এই ঘরে শোয়। প্রসাদের অবস্থা একটু ভাল বলিয়া মনে হয়। চিনুরা ও নীলুরা সভার পর প্রসাদ পাইয়া চলিয়া যায়। **২৬শে মার্চ ১৯৫৬**

আজ বাগেরহাটি নরনারায়ণ আশ্রমে প্রথম দিন উষাঙ্গিনী, প্রতিভা, রেনু, বিনু, মনুরা গোপা বন্না সহ প্রার্থনা করি। রাধারাণীকে বুকে লইয়া চলিয়াছি বহুদূর বুকে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। প্রতিষ্ঠিত হও, সাথ মিটাইয়া তোমার সেবা করিব। আমি তুমি বনিয়া যাইব। নিত্যগোপাল, আপো, আপো সব বিগ্রহ হৃদয়ে।...আমি এমন করিয়া তুমি বনিয়া যাইব যাহাতে মানুষ আমাকে দেখিয়া তোমাকে দেখিবে, আমাকে ছুঁইয়া তোমাকে ছুঁইবে, আমাকে পাইয়া তোমাকে পাইবে। এই অকলে তুমি তোমার মহিমায় ও মাধুর্যে প্রকাশিত হও। আমার তুমি ছাড়া কিছু নাই। বিশ্বসমস্যার সমাধান তুমি। আজ হউক কাল হউক তোমাকে মানিতেই হইবে 'তত্ত্বমসি' বলিয়া। ওঁ নমঃ তত্ত্বমসিরূপে ভক্ত ভগবন্তে জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি—তুরীয়-তুরীয়াতীতব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় শ্রীনিত্যগোপালায় নমঃ। সকলকে লইয়া প্রার্থনা করি। এখানে এই প্রথম প্রার্থনা।...আমার প্রস্রাবের অবস্থা ভাল। ৯।৯টায় শুই, উঠি ৪টায়। দিনের উদ্বেগ কম। জিতেনবাবু সকালে ১২টা, বিকালে ৬টা পর্যন্ত থাকেন। ভূপতিবাবু আসেন তাঁহার পরিবারের মেয়েদের লইয়া। পাশের বাড়ীর মেয়েরাও আসেন। সন্ধ্যার পর জলধর চট্টোপাধ্যায় আসেন। কালী-কৃষ্ণ-বুদ্ধ আস্তিকতা-নাস্তিকতা লইয়া যখন দলাদলি, তখন এমন একজনের প্রতিষ্ঠা করিলাম যিনি সব দলাদলির উর্ধ্বে অথচ সকলের মধ্যে আছেন। এই আশ্রমে কেবল বরিশালের লোক নাই, পাবনা-ঢাকা-ময়মনসিংহ-খুলনা-নবদ্বীপ প্রভৃতির লোকও আছেন। কোন্ নাম নিব? 'নরনারায়ণ আশ্রম' এই পরিচয় ছাড়া অন্য পরিচয় আমাদের নাই।...

২৭শে মার্চ

(ক্রমশঃ)

দূরের আকাশ

অখিলরঞ্জন মাইতি

সৈকতের মাথাটা একটু ঝিমঝিম ক'রে উঠল। সকালে কটা শুকনো রুটি কোনরকমে পেটে দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ও। উদ্দেশ্য, যদি কোনো একটা ব্যবসা টাবসার পথ খুঁজে পায়। সরকার রোজই রেডিওতে আশা দিয়ে বলছে যে ব্যবসা করার সমস্ত সুযোগই তারা আজ সকলের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে চায়।

সৈকত গিয়েছিল বিজনের বাড়ীতে। বিজন বাড়ীতেও অফিস রেখেছে। ব্যবসা সম্বন্ধে যুক্তি দেয় বেকারদের। সোজা বিজনদের বাড়ী থেকে নিউ সেক্রেটারীয়েট হয়ে আবার বড়বাজারের দিকে চলেছে সৈকত।

বিজন বলেছে ব্যবসা করতে হোলে কোথায় কি হচ্ছে যেমন জানা দরকার তেমনি বুদ্ধিটুদ্ধিগুলোও একটু জানা দরকার। আপরওয়ালার সঙ্গে ওর একটু জানা শোনা ছিল। সৈকতের লক্ষ্য তাই আপরওয়ালার গদি।

ট্রাম থেকে নামল সৈকত। পকেট থেকে একটা পোড়া বিড়ি বের করল। বিড়িটায় কয়েকটা ফুঁ দিল। বেশ খেড়ে ঝুড়ে মুখে লাগাল। তারপর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল দড়ি কড়ি কোথাও আছে কিনা দেখতে। একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বিড়ি সিগারেটের দোকানের কাছে এলো। আড়চোখে বিড়িটা লুকিয়ে একটু দম নিল। পকেটটা আরেকবার একটু কেড়ে টেড়ে দেখল। দেখল সামান্য কিছু গুঁড়ো পড়ে আছে। থুথুও মন চাইল না। ভাবলো যতক্ষণ চলে চলুক। তার পরে তো হবটন।

এই নিয়ে ও নিউসেক্রেটারীয়েট বন্ধ করেও পাঁচ ছ'বার এলো। একটা ব্যবসা টাবসার অফিস খুলবে। কাঁচের আগেও এ নিয়ে মাথা টাথা ঘামাতে না। বিজনের অফিসের কথা জানার পর থেকেই ওর মতিগতি পালটাতে সুরু করে।

বিজন কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্সে। বাঙালীর ছেলেরা আজ কিছু হটছে। পাত্তা পাচ্ছে না কোথাও। তাই দশটা পাঁচের চাকরী ছেড়ে ব্যবসা করার জন্যে মরিয়া হয়ে। বিজন পয়সা অবশ্য নেয়। কেননা এটাই ওর উপজীবিকা। কিন্তু উপজীবিকা হলেও ওরই মধ্যে বাঙালী ছেলেদের সমস্যার কিছুটা ফয়সালা ও ক'রে চলেছে। নতুন ছেলেরা এলেই তাদের পাঠায় বাগরী কিংবা বড়বাজারে। বাজারের হাল চাল দেখতে।

সৈকত এ যুগের ঠোক্কর খাওয়া যুবক।

টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবা রিটায়ার করে এখনও মাড়োয়াড়ী অফিসে খাতা দেখে যাচ্ছেন দিকে। মাইনে যৎসামান্য। বাবা রিটায়ার করে যা টাকা পেয়েছিলেন তা দিয়ে পর পর দুটো বোনকে পার করেছে ওরা। জামাইরা বাইরে থাকে। বাইরে মানে একজন উড়িষ্যায় ও অন্য জন বোম্বে।

বিয়ে করে কিছু বাড়তি হাতিয়ে সরে পড়েছে জামাইরা। কচিৎ শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সম্পর্কটা চিঠির আদান প্রদানেই সীমাবদ্ধ। এ নিয়ে অবশ্য বেশী ভাবে না সৈকত।

ওর ভাবনা কি করে একটা ছোটখাটো ব্যবসা দাঁড় করায়। ব্যবসা করা তো আর মুখের কথা নয়। বেশ মেহনত ও ধকল আছে। তারপর এমন একটা সুস্থ জাল

ছকানো চারদিকে যে এগিয়ে যেতে চাইলেও কোথায় যেন টান পড়ে।

চীনাবাজারে ঘরে একটু এগিয়ে গিয়ে পেছনে দৃষ্টি ফিরিয়ে ধরলো ও।

এখানেই শোভনলাল আপয়ওয়ালার গদি। দুবিঘাজমে মাল কিনে কাঁক মতো বেচে দেয় শোভনলাল। এ দুনিয়ার প্রায় সবকিছু জিনিষই কেনে। শোভনলাল জাত ব্যবসায়ী। সুদূর মারোয়াড় থেকে এসে জমিয়ে বসেছে। বাড়ী কাছেই। কটন ষ্ট্রীটে। সকাল আটটায় গদিতে আসে। বাড়ী ফেরে রাত বারোটায়।

—গদিই বাড়ী। গদিই ধ্যান। গদিই ওর জীবনের একমাত্র পরম আরাধ্য বস্তু।

সংসার আছে ও থাকবে। এ নিয়ে ভেবে লাভ কি? বরং অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় মন প্রাণ ঢেলে দেওয়াই উচিত মনে করে শোভনলাল।

করেও তাই। ফলও পেয়ে আসছে। গদির পাশেই একটা ছোট্ট টেবিল ও একটি চেয়ার। সরকারী অফিসের লোকেরা মাঝে মাঝেই উদয় হয়। ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্ট, সেলস্ ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ডিপার্টমেণ্ট, কিংবা খোদ ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে বিভিন্ন ধরণের ইনস্পেক্টররা আসে।

ডিপার্টমেণ্ট অনুযায়ী মাসোহারা ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে প্রচুর জলপান ও আদর আপ্যায়ন।

সেদিনও দেখল নৈকত একজন ভদ্রলোক এসেছেন ইনকামটেক্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে।

বয়স বেশী নয়। রংটা ফর্সা হলেও কেমন যেন তামাটে হয়ে গেছে। বোধহয় ঘুরতে ঘুরতে আসল রংটা বদলে গেছে। চোখে চশমা। প্যাণ্টটা টেরিলিনের কিন্তু সার্টটা কম দামের কটনের। পায়ে চপ্পল। বেশ পুরোপো। মুখে চোখে একটা বিরক্তি।

সাধারণতঃ এরা ওই বয়সের হয় না। মনে একটু খটকা লাগে নৈকতের। ভেতর থেকে শোভনলাল বলে—

"বাবুকে সেবা করো ছোটনলাল। উনকে দিয়ে মিঠাই লেয়াও। হাম পুজা করকে আতে হ্যায়। বাবুলোগকো কই তকলিফ নেহি হো।"

এমন ভাবে জোরে জোরে কথাগুলো বলে শোভনলাল যাতে ইন্সপেক্টর সাহেবও বুঝতে পারেন যে দোকানের মালিকের সম্ভাব আছে সরকারী লোকেদের প্রতি। কিন্তু ইন্সপেক্টর সাহেব একটু বিরক্ত। খাতা পত্তর আনতে বলেন তিনি। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। মানে, ছোটনলাল খাতাপত্র দেখাবার কোন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। বরঞ্চ কেমন যেন চাউনি দিয়ে ভদ্রলোককে নিরীক্ষণ করছে। ভেতর থেকে শোভনলালের গলা আবার শোনা গেল।

—কৈ, গয়া হ্যায় ছোটনলাল? জলদি মুহ লেয়াও। বাবু কেতনা দুরসে আয়ে হ্যায়। বাবুকি খাতির করো। হাম আতা হ্যায়।

ইন্সপেক্টর সাহেবের মাথায় কি একটা বিলবিল করছিল।

বড় বাজার এলাকা।

লোকে লোকারণ্য। এখানে অর্থের ঘন ঘনানি আর কথাবার্তার ফুলঝুড়ি। এখানে মুখে মুখেই নাকি লক্ষ লক্ষ টাকার বিজনেস চলে।

এমনি একটা জায়গায় এসেও ভদ্রলোকের দম আটকে আসছে।

আবার তাড়া দিলো সে। বললো, রেজিষ্টার নিয়ে আসুন, আমাকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

এবার শোভনলাল বেরিয়ে এলেন। দারুন ফুর্তি। মুখে মোলায়েম হাসি। চোখ দুটো ছোট হলেও শিকারী শিকারী। শরীরে মেদ থাকলেও রংটা এখনও ধোলতাই। মনে হচ্ছে বিরাট একটা হাতী যেন আস্ত আস্ত করে এগিয়ে আসছে। ওরাই নাকি এখনকার ডেইলিনেকেসার অর্থাৎ ওদের কথাতেই এ দুনিয়াটা উঠছে বসছে। তবুও ইন্সপেক্টর নিরঞ্জন সেনের মনটা প্রসন্ন হলো না।

প্রসন্ন না হয়ে বরঞ্চ আরও একটু ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

ছোট বেলা থেকেই নিরঞ্জন এক রোখা।

সবাই যখন ক্লাসে টেকো মাষ্টার কিংবা বেতো মাষ্টারকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতো ওপর ওর ভাল লাগত না। ভাল লাগত না বা পড়ে ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার সময় টুকে পাস করে সবাইকে অবাক করে দিতে।

এজন্য শিক্ষকরা কেউ কেউ ভাল বাসলেও ছাত্ররা ওকে মোটেই দেখতে পারত না। ছাই গরোত না করাটা ওদের মনে হত ভীষণ খারাপ ছেলের লক্ষণ। মানে তারা ভিতরে ভিতরে এক একটি আস্ত শয়তান। ওদের কথা গ্রাহ্য করত না নিরঞ্জন।

চিরকালই ও যা ভাল বুঝতো তাই করত। কারো তা ভাল লাগুক বা না লাগুক। এক রোখা বলেই অনেকের অপছন্দ ওকে। ও গায়ে মাখতো না। অনেক লোকই দেখা যায় যারা নিজেরাই নিজেদের বন্ধু। অর্থাৎ আপন মনে আপনার জগৎ তৈরি করে ওরা বাস করে।

নিরঞ্জনের বয়স হয়েছে। বিয়ে থা করেছে। সংসার হয়েছে, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ভাড়া বাড়ীতে বাস করলেও ওর স্ত্রী বেশ গোছালো। একটা ঘরের মাঝে পর্দা টাঙিয়ে একটা ছোট ড্রইং রুমের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। ওর স্ত্রী মিনতি ওকে প্রায়ই বলে মাঝে মাঝে, "তুমি যদি একটু অন্যদের মত চোখ খোলা রেখে চলতে তাহলে দেখতে পাশের বাড়ির বেহারিকেও চমক লাগিয়ে দিতে পারতুম আমি। সে সুখ তো আর তুমি বুঝলে না।

আপরওয়ালা হঠাৎ বললো—

—আপ কি নয়া আয়ে হ্যায় ডিপার্টমেন্ট মে? হামকো তো সব আদমী জানতে হ্যায়। কোই আ কে খাতাপত্তর এ্যাইসি নেহী মাংগতা হ্যায়।

অবাক হয়ে নিরঞ্জন তাকায়।

অমন ভাবে তাকিয়ে থাকায় অর্থ বুঝে ফেলেছে আপরওয়ালা। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখেই চেনে ওরা। নিরঞ্জন অন্য ধাতের। বুঝে ফেলেছে ও। তবুও নিরঞ্জনকে আর একটু খোলাসের করা দরকার। ভাবলো সে। খোলাসের করতে যে জিনিষ দরকার তা অফুরন্ত মজুত আছে ওর পকেটে। কত চাই—শ' হাজার কিংবা আরও। যার যেমন চাহিদা তাই দিয়েই দিব্যি ব্যবসা চালিয়ে আসছে তো এতদিন।

এ ব্যাপারে ওরা দারুণ চতুর।

ব্যবসায়ে ঐ ওদের মূলধন।

মেয়েরা যেমন শরীরকে বাঁকায়, ঘোরায় কিংবা কুঞ্চ করে ছেলেদের কথা বলতে তেমনি ওরাও সরকারী লোককে ঘুষের চাকতি দিয়ে নিজেদের পথে সুপথ মেলাতে বাধ্য করে। অন্য পথ দিয়ে ওরা হাটে না যতক্ষণ ঐ লোকগুলো ওদের কথায় বশ হয়। অন্য সুর ধরলে তার দাওয়াই ওরা জানে।

নিরঞ্জনকেও একটু দেখিয়ে দেখতে চায়।

বিনয়ের অবতার হয়ে হাতজোড় করে সে বললে

—খাতাপত্তর তো দেখেঙ্গে হী। উসকে আগে হামারে পাস পহেলীবারই আয়ে হ্যায়। থোড়া মিঠাই খাইয়ে যায়। তব মালুম পড়ী হোঙ্গে। কারবার করতে করতে ভদ্রতা নেকী শিখা দিয়া।

হে হে করে এমনভাবে হাসতে লাগল আর ঘুষি খোলাতে লাগল যেন এমন ভদ্রলোক আজকাল হয় না।

নিরঞ্জন তবুও ভিজলো না।

চড়া সুরেই বললো, "দেখুন আমাকে এখান থেকে আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। অথথা সময় নষ্ট না করে যদি এ্যাকাউন্টস্‌টা দেখান ভাল হয়।

—আপরওয়ালা একটু আড় চোখে তাকাল আবার। বেটা তো দেখছি ফুঁড়ে শয়তান নয় এক নম্বরের ফেরেববাজ। সিধে কথায় কাজ হবে না। তাই বললো—

—আজ তো নেহী হোগা হ্যায়। মুন্সীজী আনেসে এ্যাকাউন্টস ঠিকঠাক করকে আপকো খবর দেঙ্গে। আপকা কোই অসুবিধা নেহী হোগা। পাড়ী ভেজ

হেঙ্গে। আপকী মেহেরবানীসে হামারা গরীবকে সামনে গাড়ী খাড়াই রহতা হ্যায়। আপকা কাম হী মেরা কাম। এক গাড়ী তো স্রিফ সাহেব লোগকো আউর উনকো বিবিলোগকো বাজার করনেকে লিয়ে হী রহতা হ্যায়। আপকো কই জরুরত হো তো বলিয়ে গা। আপকা সেবা মে হী মেরা কারবার চলতা হ্যায়।

—থাক, তার প্রয়োজন হবে না—আমি নিজেই আসবো—বললো নিরঞ্জন।

—এক বাত বলেঙ্গে স্যার।

—বলুন—বিরক্ত নিরঞ্জন।

—আপকা যো তন্থা মিলতা হ্যায় উসমে কেয়া চল যাতা হ্যায়?

—মানে

—মানে কুছ নেহী হ্যায়। আপলোগ তো হামারা মোস্ত মালিক হ্যায়। আপলোগ নোকরী করতে হ্যায় আউর হামলোগ কারবার করতে হ্যায়। ইস বাজারমে কিতনা মিলতা হ্যায় নোকরীমে। উসমে কেয়া সংসার চল্ যাতা হ্যায়। আপ বাঙ্গালী লোগ বাইসা সৌদীন হ্যায়!

পরের বারে এবার খানিকটা কাঁক নিরঞ্জনের। পয়সার মালিক বলেই মাথা কিনে নেয়নি। পয়সা তো রিক্সা-ওয়ালারা বা ঠেলাওয়ালারাও রোজগার করে অনেক চাকরীওয়ালার থেকেও বেশী। তাই কি ওদের সমীহ করতে হবে?

কক্ষণই নয়।

মানুষকে জাবা যায় তার পয়সা দিয়ে নয়।

তার মানসিকতা দিয়েই তাকে বিচার করে এসেছে এতদিন নিরঞ্জন।

বাকী জীবনটুকুও তাই-ই করবে।

এতে কেউ বেজার হয় হোক, কেউ চটে চটুক, ও পরোয়া করে না। এ দশকের ঘোঁয়াশে আকাশে ও একতারাকেই লক্ষ্য করে চলেছে চলবে।

আগরওয়ালার মনের ভাব আঁচ করতে পারে ও। ওকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের কাজটুকু করিয়ে নেওয়ার কিকিরে আছে নিশ্চয়ই।

ব্যাটা এ পর্যন্ত কত টাকা যে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে তা বোঝা যায় ওর টাকাকড়ির লেনদেন কিংবা আয়ের অংকটুকুর হিসাব নিলেও। হিসেব এতদিন নিশ্চয়ই দেয়নি কিংবা কেউ নেয়নি। নিরঞ্জন ছাড়বে না। কথায় ভুলবে না। নিজের ডিউটিতে ফাঁকি দেবে না।

চাকরীর ব্যাপারে অনেকের সাথেই ও মিশেছে। অনেকেরই অবশ্য ধরি মাছ না ছুঁই পানি। এড়িয়ে এড়িয়ে সাবধান থেকে যা কিছু কাজিয়ে নেওয়া যায়।

এ মতবাদকে সায় দেয় নি মনের দিক থেকে নিরঞ্জন কোনও দিন। বরং উল্টোটাই করেছে। মানে যতটা সম্ভব এ ফাঁকিফুকিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

চাকরীতে লাভ হয়নি। বরং ক্ষতিই হোয়েছে। ওর জুনিয়াররা ওকে ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠেছে।

টাকা পয়সায় ওর সুরাহা হয়নি কোনও দিন। এ মাগ্‌গিভাতার বাজারে হিমসিম তো খাচ্ছেই, কোনও কোনও সময় বেতালও হয়ে পড়ে। তবুও নিজের গোঁ ছাড়তে পারে নি। এবার আগরওয়ালাও সোজাসুজি পথে বললো—

—আপ যো বড়িয়া সমঝেকে ও চি করিয়ে গা। আপ লোগোকা বাত সোচকে বহুত দুখ হোতা হ্যায়। ছুটা টাঙ্ক ভি নিয়ে পেটপর গামছা বাঁধনেমে কেয়া ফয়দা হ্যায়?

লাভ ব্যাটা তুমি বুঝবে না। সুদূর রাজস্থান থেকে এসে যতো টাকাকড়িই অড়ো করো না কেন তোমাদেরও দিন ফুরিয়ে আসছে বাবা। তার প্রমাণ তোমাদের বাড়ীর ছেলেদেরকে দেখলেই টের পাবে। বাঙ্গালী ইয়ার বন্ধুরা তাদের যোগ্য বন্ধুদের সাথে হাত মিলিয়েছে। পয়সা ওদের যখন আছে তখন ওদের দলে টেনে এক দিকে দেশের উপকারই করছে ওরা। ওদের উদ্ধারে যাওয়ার পথে হাত ধরে ঐ ছেলেরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাপেরা যতই ঘর শক্ত করুক ওর খুঁটি আলগা হয়ে এল

বলে।

নিরঞ্জন তবুও ভাবে ওদের বাঁধন আরও আলগা করে দেওয়া দরকার সমস্ত দিক দিয়ে।

হঠাৎ এ ধরণের কথাটার জন্য তৈরী ছিল না নিরঞ্জন।

—এক রাত স্যার। ইনক্রিমেন্ট ট্যাক্স, সেলস্ ট্যাক্স, এক্সসাইজ ডিউটি যেভনা কামেলা কাম দেখনেকে লিয়ে এক আচ্ছাওয়ালা আদমীকা জরুরত হ্যায় মেরা। তাঁহা স্যার অচ্ছাই লেগা।

এরপর এমনভাবে তাকাল নিরঞ্জনের দিকে যেন আর একবার টোপ ফেলার চেষ্টা করে দেখা যাক—এমনিই ভাব।

নিরঞ্জন শুধু বললো—পেপার-এ এ্যাডভারটাইজ করুন, ওতে যারা আসে ওদের থেকেই বেছে নেবেন।

—স্যার এক্সিপিরিয়েন্ট আদমী চাহতা হ—

ইক্সিপিরিয়েন্ট যে কতটা চায় তা ভালই জানে নিরঞ্জন। এক ঝটকায় এটাচিটা হাতে নিয়ে নিরঞ্জন বললো—

—যত তাড়াতাড়ি পারবেন খাতা রেডি করে আমাকে জানাবেন। আপনার একাউন্ট এমনও রেডি হয় নি এরকম যুক্তিতে ছাড় পাওয়া যায় না। যতই কন্সিডিকিয়ে করুন না কেন আপনাকে জালে জড়িয়ে পড়তে হবেই। এই কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে চলতে চেষ্টা করবেন।

আর সহ্য হলো না আগরওয়ালার। তবুও নরম সুরটুকু বজায় রাখলো সে। বললো—

—আপকো আউর একদিন তকলিফ করনা হী পড়েগা।

ভেতরে ভেতরে ভাবলো এর শুধও ওর জানা। একটু দাওয়াইর ব্যবস্থা করতেই হবে।

নিরঞ্জন আর কথা বাড়াল না। বেরিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ছোটনলাল বলল, সাহেব যদি রিপোর্ট করে দেয়।

—রিপোর্টকা খোড়াই কিকির করতে হ্যায় ই মর্দা। কেত্তনা হী সাহেবকো দেখে হ্যায়। উনকা রিপোর্ট পহচনেকে পহলে হামারা রিপোর্ট পহচ যায়েগা। উনকো কলকত্তা ছোড়না হী পড়েগা। উনকো বদলী হয় দেখে মালদা বা দিনাজপুর।

বলে সত্যিই টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ডায়েল করতে থাকলো আর গজরাতে লাগলো—

—আজকা দিনহী মাটি কর দিয়া এ ছোড়কা। রিসিভারে মুখ এনে বলল,

—ক্যায়া মিঃ সেন বলতে হ্যায়।

ওদিক থেকে মিঃ সেনই কথা বলছেন মনে হল—

আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে চললো ছোটনলাল আজকের ব্যাপারটার। হঠাৎ মুখটা ভক্তিতে ভরে উঠল মিঃ আগরওয়ালার। মনে হলো ভীষণ একটা বাজী জিতেছে। আনন্দের দ্যুতি ওর চোখে মুখে—

আর হাসতে লাগল হেঃ হেঃ করে—

নৈকতের ঐ হাসিটা বড় বিশ্রী লাগছিল। ঐ হাসিতে যে একটা তাচ্ছিল্যভাব দেটা একটা ভয়ানক বর্শার ফলার মতো হয়ে ওর যেন বুকে বিঁধছে। (ক্রমশঃ)

নিমাই তার নাম

(১০৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

'বা-রে, ও দুষ্টুমি হতে যাবে কেন? ও তো খেলা। আমরা তো খেলি।'

'ওর নামই দুষ্টুমি। দুষ্ট ছেলেকে কেউ ভালোবাসে না। দুষ্টুমি করলে তোকেও কেউ ভালোবাসবে না। বল্, আর দুষ্টুমি করবিনি!'

নিমাই বললে, তাহ'লে আর সে দুষ্টুমি করবে না। এবার থেকে সে একেবারে ভালো হ'য়ে যাবে। ভালো ছেলেকে সবাই ভালোবাসে। তাকেও সবাই ভালো বাসবে।

কথায় কথায় দু ভাই বাড়ী এসে গিয়েছিল। নিমাই এবার দৌড়ে ঘরে ঢুকে শচীদেবীকে বললে, 'মা মা, ভাখো, ভাখো। দাদাকে আমি ধরে এনেছি। দাদাকে আমি টেনে এনেছি।'

নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে শচীদেবী বিশ্বরূপ দু'জনেই হেসে খুন। হাসি নিমাইয়ের মুখেও।

(ক্রমশঃ)

শিশু জগৎ

বন্যার গান

মৌসুমী সাহা

সাদা পাখীর ডাকে আমার ভয়ে যেত প্রাণ।
আজ সে পাখীর কণ্ঠে শুধু বন্যার ভরা গান।
চমকে উঠে হঠাৎ শুনি
কানে আসে কিসের ধ্বনি
ভুকরে কেঁদে মরে সবাই কে কার করে ত্রাণ।
বাংলাদেশের বুকে এলো সর্বনাশা বান।

সাদা পাখির ডাকে আমার ভয়ে যেত প্রাণ।
আজকে শুধু হাহাকারে উঠছে ভরে বান।
সাদা পাখী কোথায় গেল?
মিললো কি হায় সাদার কালো?
নীথর জলে এখন শুধু পানকৌড়ির গান।
আবার কবে শুনতে পাবো সাদা পাখীর গান?

বালক শিবনাথ (শাস্ত্রী)

দীপেন রাহা

প্রখ্যাত পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭ সালের ৩১শে জানুয়ারী রোববার পশ্চিমবঙ্গের চাংড়িপোতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চাংড়িপোতা তাঁর মামার বাড়ী। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ী। শিবনাথের নিজের বাড়ী ছিল ২৪ পরগণার মজিলপুর গ্রামে। কিন্তু তাঁর বাল্যকাল কাটে মামার বাড়ীতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। শিশু শিবনাথের কপাল দেখে বিদ্যাভূষণ বলেন, "এ ছেলে বেঁচে থাকলে বড় লোক হবে"। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। শিবনাথ ভট্টাচার্য পরবর্তী কালের শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাংলার কৃতি সন্তান হন। কথায় বলে, "সকালেই দিনের অবস্থা বুঝতে পারা যায়"। শিবনাথের বেলাও এই উক্তি প্রযোজ্য। তাঁর পড়াশোনার দিকে খুবই মনোযোগ ছিল। তিনি নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে নিত্যকার পাঠ তৈরি করতেন। একদিন স্কুলের গুরুমশাই জিগগেস করলেন, শিবে, তুই যাসা পড়া বলিস, তোর পড়া কে বলে দেয়?

উত্তরে বালক শিবনাথ বলে, 'আমার মা আমায় পড়া শিখিয়ে দেন'।

সহপাঠীরা শিবনাথের উত্তর শুনে তাদের মাকে গিয়ে বলে, পড়া শিখিয়ে দিতে হবে। শিবের মা শিবেকে পড়া বলে দেয়। তখনকার দিনে গ্রামের মহিলারা লেখা-পড়া জানতেন না বললেই হয়, অবিশ্যি শিবনাথের মার মত কয়েকজন মহিলা ছাড়া। শিবনাথের সহপাঠীদের মাতারা পুত্রদের আবদারের কথা শুনে নাকি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "শিবের মা ভাল আলা শুরু করছে, আমরা কি ছাই লেখাপড়া জানি।"

শিবনাথ শিশুবেলা খুব দুষ্টু ও একগুঁয়ে ছিলেন। তিনি যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন, তাকে নিরস্ত করা কারো

সাধ্য ছিল না। তবে তিনি পিতাকে যমের মত ভয় করতেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হরানন্দ শর্মা। তিনি খুব রাশভারী ছিলেন। তাঁর ভয়ে বাড়ীর লোকেরা তটস্থ থাকতো। তিনি লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু শিবনাথের পশুপাখী পোষার সখকে তিনি কখনও বাধা দেন নি। শিবনাথ অত্যন্ত পশু-পাখী প্রিয় ছিলেন। টুনটুনি, বুলবুলি, দোয়েল, শালিক, ছুছুর, বিড়াল ইত্যাদি পুষতেন। পাখী ও ফড়িং ধরা তাঁর সখ ছিল। তাঁর পোষা শালিক পাখী 'টুনো'কে তিনি অনেক ভাল ভাল কথা শিখিয়েছিলেন। পাখীটি মানুষের কণ্ঠস্বর হুবহু অনুকরণ করে কথা বলতে পারত। এ সব খেয়াল সত্ত্বেও তিনি কখনও পড়াশুনায় অবহেলা করতেন না। পড়ায় এমন নিষ্ঠা ছিল তাঁর, কেউ ডাকলেও শুনতেন না, সাড়া দিতেন না। তাই তাঁর বাড়ীর লোক ভুল বুঝতেন। মনে করতেন, শিবনাথ বুঝি কালা। একদিন তৎকালীন মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত ডাক্তার গুজি চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তার নানা ভাবে তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন, শিশু শিবনাথের কানে কোন দোষ নেই।

শিবনাথের কবিত্ব শক্তির পরিচয় শিশুবেলায় পাওয়া যায়। তিনি কবিতা ও ছড়া ফরমাস মত বা ফরমায়েস অতি অল্প কলের মধ্যে তৈরি করতে পারতেন। তাঁর এই ক্ষমতা দশ বারো বছর থেকেই প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর এক সহপাঠীকে ঠাট্টা করে লেখেন,

"ইজার চাপকান পায় ইস্কুলেতে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতী,
বড় তার অহংকার, দয়া দেখে সদাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।"

শুধু কবিতা বা ছড়া বানাতেন না, ছোট বোন উমাদিনীকে নানা রকম গল্প তৈরি করে শোনাতেন।

শিবনাথ তাঁর ভাই বোন ও প্রতিবেশীদের খুব ভালবাসতেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁকে তাঁর মা মিছরি মিষ্টি খুলে খাওয়ার জন্য দিতেন। তিনি ও সব মিষ্টি সহপাঠীদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন।

তাঁর ছাত্র জীবনের পোষাক ছিল অনেকটা মেকেলে মেয়েদের মত। ১৮৫৬ সালে তিনি যখন আট নয় বছরের বালক তখন সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তখন হাতে ছিল বালা, গলায় সরক, কোমরে কোমর পাটা। দুই সহপাঠীরা তাঁর জামার নীচে হাত গলিয়ে ও-সব গহনার টান দিত।

মেকালের চলতি নিয়মে শিবনাথের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়। তাঁর যখন প্রায় চৌদ্দ বছর বয়স তখন তাঁর বিয়ে হয়। অর্থাৎ ১৮৬০ সালে রাজপুর গ্রামের নবীন চন্দ্র চক্রবর্তীর কন্যা প্রসন্নময়ীর সঙ্গে। তখন প্রসন্নময়ীর বয়স ন' দশ মাত্র। বিয়ের পোষাকটা শিবনাথের ছিল অদ্ভুত। কাণে মাকরী, গলায় হার, হাতে বাজু ও বালা। শুধু পোষাক নয় শিশু-বয়েসে আচরণও ছিল অদ্ভুত। তিনি যে বর, বরের মত ধীর ও স্থির হয়ে থাকা তা তিনি মানেন নি। পাল্কী করে শিশু বর বৌ বাড়ী আসছে। বৌ ক্রমাগত কেঁদেই চলেছে। পথে একটা বাগান পড়ে। বাগানে পাল্কী নামানো হল। বর শিবনাথ পাল্কী থেকে নেমে নিকটস্থ একটা লিচুগাছে গিয়ে উঠে পড়লেন। বেশ কিছু পাকা মিষ্টি লিচু নিয়ে আসলেন। নিজে খেতে খেতে কিছু লিচু বৌ-এর কান্না থামাবার জন্য পাল্কীর মধ্যে ঢুকে দিলেন। সত্যিই কচি শিশু বৌ-এর লিচু পেয়ে কান্না থেমে গেল। লিচু পেয়ে যে প্রসন্নময়ী প্রসন্ন হলেন তাতেই শিবনাথ খুশী।

বাড়ীতে এসে পাল্কী থেকে নেমেই বর শিবনাথ এলেন তাঁর প্রিয় কুকুর 'রবার'-এর খোঁজে। সর্ব জীবের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিল। ১৮৬৪ সালে কোন একজন অপরাধীর বিচারে ফাঁসীর হুকুম হয়। এই সংবাদে শিবনাথ বিচলিত হয়ে সহানুভূতি সূচক একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতাটি বহুল প্রশংসিত হয়।

নারী জগৎ

হিমালয়ের আহ্বান

অনুপমা সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীকেদার সমুদ্র হইতে ১১৭৪২ ফুট উঁচু। গৌরীকুণ্ড হইতে ৯ মাইল, কালীমঠ ও ওঙ্কারী হইতে ত্রিযোগী নারায়ণ হইয়া আসিলে যথাক্রমে ৩৩ ও সওয়া ৩২ মাইল হইবে। এই পথ অতিক্রম করিতে ৩ দিন সময় লাগে। শ্রীকেদারের মন্দিরের পাশে ৫টী ঠাণ্ডা জলের কুণ্ড আছে—সূর্যকুণ্ড, অমৃত কুণ্ড, হংস কুণ্ড, রেত কুণ্ড, উদয় কুণ্ড। রেত কুণ্ড চত্বরের বাহিরে। রেত কুণ্ডের বিশেষত্ব এই—কুণ্ডের ধারে দাঁড়াইয়া "বোম বোম" কিংবা "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করিলে কুণ্ড হইতে "বুদ্‌বুদ্‌" উঠে। রাস্তার ধারে উদয় কুণ্ড, ইহার জল পান করিতে হয়। শ্রীকেদারের মন্দিরের উত্তর পূর্ব দিকে বিশাল বিশাল পর্বত দেখা যায়। এখানে পর্বতে একটাও গাছ নাই। ৬ মাস বরফে ঢাকা থাকে তাই গাছ উঠিতে পারে না হয়তো। যেটী মহাপন্থ ভৃগু পর্বত স্বর্গারোহণ নামে প্রসিদ্ধ—কথিত আছে—নারায়ণের ষষ্ঠ অবতার মুনানাথী শ্রীপরশু রামের পতন এখানে হয়।

কথিত আছে স্বর্গারোহণে পাণ্ডবদের মধ্যে কেবল যুধিষ্ঠির ছাড়া আর সকলের এইখানেই পতন হইয়াছিল।

কথিত আছে—আদি গুরু শঙ্করাচার্য সিদ্ধুদের এইখান হইতে তাঁর অন্তর্ধান করিতে নিষেধ করিয়া এইখান হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীকেদারনাথ যে ছয়মাস বরফের নীচে থাকেন এই ছয় মাস উখিমঠে তাঁহার পূজা হয়।

এখানে অনেকের নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। শ্রীকেদারনাথ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। পাণ্ডবরা যখন যুদ্ধে গুরু, জ্ঞাতি, গো হত্যা করিয়া মহাপাপ করেন, পাপ ক্ষয় করিবার জন্য সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীকেদারে আসেন। শ্রীকেদারনাথ দর্শন করিলেই সকল পাপ ক্ষয় হইবে। কিন্তু মহাদেব দর্শন দেন না, তিনি মহিষের রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ভীম তাহা যোগ বলে জানিতে পারিয়া —দুই পাহাড়ে ২ পা রাখিয়া সমস্ত পশুকে তাঁহার নীচে দিয়া যাইতে বাধ্য করেন,—সকল পশু তাঁহার পায়ের নীচ দিয়া চলিয়া যায়, একটী মহিষ আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন ভীম বুঝিলেন এই মহাদেব। ভীম শীঘ্র আসিয়া "এই কি শিব" বলিয়া গদা দিয়া মহিষের পিঠে আঘাত করেন—সঙ্গে সঙ্গে মহিষ ভূগর্ভে প্রবেশ করে কিন্তু তাহার পশ্চাৎ ভাগ পাষাণরূপ ধারণ করিয়া উপরেই থাকিয়া যায়—তিনিই কেদারনাথ। পাণ্ডবগণ সেই পাষাণমূর্তির উপর এই বিশাল মন্দির

স্থাপন করেন। এই মহাদেব মনেহয় একটী বহির উপর হইয়া আছেন। পিঠের ওজনটী পর্যন্ত আছে। গলায় আঘাতের দাগও নাকি আছে। এরপর পাণ্ডবেরা পঞ্চকেদারে মহাদেবের দর্শন পান। মন্দিরের ভিতরে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিও আছে। ত্রিকেদারনাথের ঘারে গণেশের মূর্ত্তি আছে সেখানে আগে পূজা করিয়া মন্দিরে ঢুকিতে হয়। আমি যখন গেলাম তখন ভীড় ছিল না, নীচ হইতে পঞ্চফল ও বেলপাতা চন্দন মাখাইয়া নিয়াছিলাম, সাথী অনিলের মার নিকট হইতে ঘৃত মধু সংগ্রহ করিয়া পূজা দিলাম, ঘি মধু মহাদেবের গায়ে মাখাইয়া দিলাম। মূর্ত্তির চারিদিকে ঘুরিয়া পূজা দিলাম, বেশ তৃপ্তি অনুভব করিলাম পূজার পর। মন্দিরের ভিতরে ঘৃত প্রদীপ ছাড়া অন্য আলো জ্বালা হয় না। ১ রাত্রি কেদার ধামে বাস করিলাম। পর দিন ১২টার মধ্যাহ্নে সব কাজ সারিয়া আবার আমরা ডাণ্ডিতে রওনা হইলাম। কেদার ধাম ছাড়িয়া বদ্রিনাথ ধামের উদ্দেশে রওনা হইলাম।

কেদার ধামে সাধারণ দুই ছাড়া আমরা আর কোন কষ্ট পাই নাই। আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল। ম্যানেজার বলিলেন—আপনাদের খুব সৌভাগ্য কেদারের রূপ মূর্ত্তি দেখিতে হইল না। শুনিলাম আমাদের ২।৩ দিন আগে যে দল আসিয়াছিলেন তাঁহারা বরফের ঝড়ে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন, অনেকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কখন কি রূপ হয় কেদার ধামের বলা যায় না, সেই জন্য ১ রাত্রির বেশী বড় কেহ থাকে না। আমরাও ১ রাত্রি বাস করি।

আবার পঞ্চ ৮টী, রাসবাড়া পৌরীকুণ্ড শোন প্রয়াগ পার হইয়া রামপুর ৮টীতে আসিলাম। এখান হইতে ডাণ্ডিওয়ালাদের বিদায় দিতে হইল—এই ছয় দিনে ২০০ টাকা দিতে হইল। এই কয় দিনে পথের যে কষ্ট দেখিয়াছি, সে আন্দাজে এ ভাড়া খুব বেশী নয়। এরা বড় গরীব, পায়ে শত ছিন্ন জামা, দেখিলে কষ্ট হয়। পায়ে জুতা পরিয়া বাধা, এত ছেঁড়া। রামপুর ৮টীতে আসিয়া শুনিলাম, গতকল্য একটি মহিলা আসিয়াই মারা গিয়াছেন। মহিলাটীর বয়স ৪৫র মত, খুব বড় ঘরের বৌ, 'বাস' হইতে নামিয়াই পায়খানায় গেলেন, আসিয়াই নাড়ি পড়িয়া যান সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ যায় কোন কথাও বলিতে পারেন নাই। শুনিলাম তাঁর মৃত দেহ হরিদ্বারে নিয়া যাওয়া হইয়াছে সেখানে তাঁর শেষ কাজ হইবে। স্বামী পুত্র কেহ সঙ্গে ছিল না। এই সব শুনিয়া আমাদের সকলেরই মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। একজন সাথীর হইতে চির বিদায় নিলেন, তাঁকে কখনো দেখি নাই, জানিতাম না তবু।

সন্ধ্যার পর অথচ সময়, আলো নাই, সামান্য মোম-বাতিতে পড়াশুনাও করা যায় না। সময় আর কাটে না। সেদিন সকলেরই মন খারাপ, মেয়েরা গান গল্প বন্ধনা ইত্যাদি কিছুই করিতে পারেন না। ম্যানেজার আসিয়া এখানে এই প্রকার দুর্ঘটনার মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা তাঁর অভিজ্ঞতা আছে তাহা বর্ণনা করিলেন—

একবার এক ভদ্রলোক বিবাহের পর স্ত্রী ও ভাই নিয়া কেদারে বেড়াইতে আসে। তিন জনই অল্প বয়স্ক। কেদারে পথে কোন কোন স্থানে উপর হইতে পাথর পড়ে, কখনো বড় কখনো ছোট, সেজন্য ঐ রাস্তায় যাত্রীরা একটু সতর্ক ভাবে চলে। তারা তিনজনে যখন ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল আগে পাছে ২ ভাই আর মধ্যখানে বৌটী, এমন সময় উপর হইতে একটী বড় পাথর পড়িয়া মেয়েটিকে নিয়া একেবারে শত শত ফুট নীচে মন্দাকিনীতে চলিয়া যায়। তার মৃত দেহও দেখা যায় নাই। তাই ২টীর কিছুই হইল না।

আর একবার একটী ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়া এখানে বেড়াইতে আসেন—কেদারে উঠিয়াই ভদ্র মহিলার নিঃশ্বাসের কষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে ভদ্রমহিলার চেহারা নীল হইতে লাগিল, তাড়াতাড়ি তাহাকে নীচে পাঠাইয়া দেওয়া হইল কিন্তু সফল হইল না—ভদ্রলোক বলিলেন ১৬ বছর আগে নাকি তাহার সুরেসি হইয়াছিল।

আর একবার একটী যাত্রোয়ারী ভদ্রলোক ডাণ্ডি করিয়া যাইতেছিলেন ঐ রাস্তার উপর হইতে পাথর পড়িয়া

ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়া পাখর একেবারে অতলে চলিয়া গেল। আর্ত্তা ভাতিয়ালকদের কিছুই হইল না।

'বাসের' রাস্তার এমন সব শক্ত রাস্তা স্থানে স্থানে আছে, যেখানে যদি এক চুল গাড়ী এদিক ওদিক হয় তবে একেবারে অতলে, সেইজন্য ঐ সব রাস্তায় পায় হাঁটার জন্য বাস চালককে বহুবার ও নিষেধ দেওয়া হইয়াছে, রাস্তার স্থানে স্থানে কাঁচ ফলকে লেখা আছে খাদস্, খ্যাদ ঈউ, সোড্রাইভ, হর্ন দেও।

আমরা রামপুর চটীতে রাত্রি বাস করিয়া পর দিন শ্রীবদ্রিনাথ উদ্দেশে রওনা হইব আশায় আছি, এমন সময় ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন কি যাত্রিবাবু আপনারা ভাল করিয়া বদ্রিনাথকে ডাকিতেছেন না, তাই আমি "বাস" পাইতেছি না। রাস্তায় ধস্ নামিয়াছে—সেই জন্য ওদিক হইতে 'বাস' আসিতেছে না। রাস্তা মেরামত হইবে তারপর 'বাস' আসিবে। আমাদের সকলেরই মন খারাপ, কয় দিন এখানে থাকিতে হইবে কে জানে।

এদিকে রাস্তা সরু বলিয়া একমুখী 'বাস' যায়, ওদিক হইতে তখন 'বাস' আসা বন্ধ থাকে সেজন্য তাহাকে "বাস সিস্টেম" বলা হয়। গেট না খুলিলে কোন গাড়ী কিংবা পায়ে হাঁটা যাত্রীও যাইতে পারে না, সব আসিয়া গেটে জমা থাকে। সময় নির্দ্দিষ্ট করা আছে, সেই সময় সকলে তথায় অপেক্ষা করেন। ওদিক হইতে একেকবে বাস আসিতে সুরু করে,—সমস্ত গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে শেষ গাড়ীখানাতে সবুজ পতাকা লাগান থাকে। সবুজ পতাকা নিয়া গাড়ী আসিলে এ দিককার গেট খোলা হয়। এ দিককার সব গাড়ী রওনা হইলে আবার সবুজ পতাকা নিয়া চলিয়া গেলে গেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

আমরা ২ রাত্ত পৌরীকুণ্ডে কাটাইয়া রামপুর হইতে 'বাসে' শ্রীবদ্রিনাথ রওনা হইলাম—৩১শে বেলা ১২টায়। ক্রমে নন্দ প্রয়াগ আসিলাম, এখানে মহারাজা নন্দ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এখানে নন্দা আসিয়া মিলিয়াছে অলকানন্দায়। নন্দাপ্রয়াগ তীর্থ। তারপর চামোলী হইয়া ২১টী ছোট চটী পার হইয়া আসিলাম পিপুল কোটি। এখান হইতে ১১ হাজার ফুটে ৭ মাইল শ্রীকেদার নাথ। এ রাস্তারও মেরামত শেষ নাই, ছোট বড় অনেক।

নন্দ প্রয়াগের আগে কর্ণ প্রয়াগ পার হই, এখানে কর্ণ সূর্য্যের তপস্যা করিয়াছিলেন ও কর্ণ কবচ লাভ করেন, সেখানে মন্দির আছে।

পিপুল কোটি হইতে টাঙ্গারী আসিলাম, তারপর 'যোশী মঠ' পৌঁছি, অতিসংক্ষেপে মধ্যাহ্ন কাজ সারিয়া, তখনই আবার রওনা হই। বিষ্ণু প্রয়াগ সেতুবাহা বহুমান চটি পার হইয়া শ্রীবদ্রীধাম পৌঁছিলাম প্রায় সন্ধ্যায়।

আমরা বালানন্দ ধর্মশালায় আশ্রয় পাইলাম। সুন্দর নূতন হালক্যাশানের বাড়ী, ঘরে ঘরে বাথিন পাতা। ১৯৭১ সালে শ্রীযোগানন্দ স্বামী এই বাড়ী নিজ গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। এখানে অনেক ধর্মশালা আছে, বিড়লাদের ধর্মশালা আছে, সব সময় গীতা পাঠ হইতেছে, কিন্তু সেখানে গেলেই পয়সা দিতে বাধ্য করে। এই আশ্রমের উঠান হইতে মন্দির দর্শন হয়। মন্দির ধর্মশালা হইতে অনেকটা নীচে। মন্দিরের নীচে গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহাতে যাত্রীরা স্নান তর্পণ করিয়া ৩৬টা সিঁড়ি উপরে উঠিয়া প্রবেশ করে। তর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণকে গুপ্তদান করিতে হয়। একটী মুঁদি নারিকেলের মধ্যে সোনা, রূপা, টাকা যাহা দিতে ইচ্ছা হয় ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। আমরা ১টি করিয়া টাকা দিলাম। ব্রাহ্মণের কাছে নারিকেলের স্তূপ।

মন্দিরের দ্বারে পুলিশ ২ জন দাঁড়ান। এক একটি করিয়া যাত্রী যাইতেছে আর দর্শন করিয়া অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইতেছে তবু ঠেলাঠেলি চলিতেছে। কি লোকের ভীড়! এত দূর দেশ, কষ্টসাধ্য রাস্তা, তবু লোকের কমতি নাই। সব দেশের লোক আছে। শ্রীবদ্রিনাথকে কেহ ছুঁইতে পারে না এক পূজারী ছাড়া। পুরোহিতকে এখানে 'রাউল' বলা হয়। রাউলকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দেশ থাকে যে ভবিষ্যতে রাউল হইবেন, সেই অনুসারে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান 'রাউল' অল্প বয়সী, ৩০-এর বেশী হইবে না, দেখিতে সুন্দর, কর্ণা,

দশা, আধা বেহাল। বেশ ইংরাজী জানেন, সকলের সঙ্গে অমায়িক ভাবে কথাবার্তা বলেন। তনিলাম বাড়ী মাদ্রাজে। হাউসকে নিষ্ঠার সহিত জীবনযাপন করিতে হয়।

আমরা শ্রীবদ্রিনাথ খুব ভালভাবে দর্শন করিলাম, নারায়ণ চতুর্ভুজ বসা মূর্তি। ২টি হাত কোলের উপর রাখা। রাত্রিতে পূজার বেশ দেখিলাম। হীরার ছড়াছড়ি—কানে মাথায় গলায় সব ঝকঝক করিতেছে। রাশি রাশি তুলসীর মালা বিক্রী হইতেছে, ফুল এখন এখানে পাওয়া যায় না।

এখানে শ্রীবদ্রি শত ও সহস্র নাম শুনিতে যথাক্রমে ১০ ও ১৫ টাকা দিতে হয়।

আরতি দিলেও টাকা দিতে হয়। আমাদের বাঙ্গালী পাণ্ডা বীরেন ভট্টাচার্য্য সব কাজ করাইলেন।

মন্দিরের চারদিকে অনেকটা চত্বর আছে তার চার দিকে অনেক ঘর ও শ্রীলক্ষ্মী দেবীর মন্দির আছে। গোপের ঘর, আরও অনেক ঘর আছে।

পঞ্চতীর্থ মন্দির যথা—নারদশীলা, বরাহশীলা, গরুড়শীলা, মণিশীলা, নৃসিংহশীলা। মন্দিরের নীচে যে গরম জলের কুণ্ড আছে, তাহার নাম 'ব্রহ্মকুণ্ড'। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান তর্পণ করিতে হয়। মন্দির হইতে ৪০০ গজ নীচে, চালুরাস্তা, আস্তে নামিয়া একেবারে অলকানন্দার পাড়ে পৌঁছিতে হয়। এখানে প্রকাণ্ড একটি শ্বেত পাথরের চত্বর আছে নামতল, তাহার নাম "ব্রহ্ম কপালী"। এখানে পিতৃ-পুরুষদের 'পিণ্ড' দেওয়ার রীতি আছে। এইখানে পিণ্ড দিলে তাহার আর জন্ম হয় না।

এখানকার উচ্চতা ১০০০ ফুটেরও বেশী। শ্রীবদ্রিনাথের চারিদিকে অভ্রভেদী সব পর্বত—নরনারায়ণ পর্বত,—নীল কণ্ঠ পর্বত। নীলকণ্ঠ পর্বতটি তুষারময়। এখান হইতে একেবারে নাকি মাত্র ২২ মাইল দূরে, কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা এত বেশী, তাই ঘুরিয়া আসিতে হয়।

এখানে পুলিশের ব্যারাক আছে। বাস, লরি, মটর গাড়ী ট্রাক কিছুরই অভাব নাই। কত দর্শনার্থী হইতেছে, উহার জন্য লোহা লক্কর বহন করিয়া কত ট্রাক আসিতেছে। তনিলাম বাড়ী তৈয়ারের জন্য রাজমিস্ত্রী সব নীচে হইতে আনিতে হয়। এখানকার লোক পাথর ভাঙ্গা ছাড়া অন্য কাজ করিতে পারেনা।

শ্রীবদ্রিনাথ ধাম।

১লা জুন, দিনটি বড় সুন্দর, রোদ উঠিয়াছে; চারিদিকের পাহাড়ে রোদ পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলাইতেছে।

যাত্রীরা সকলেই বেড়াইতেছেন, চারিদিকে সুন্দর ছোটবড় নানা রকমের পাথর; আমি তাহা হইতে ছোট ছোট পাথর তুলিতে লাগিলাম—সাথীরা বলেন পাথর দিয়া কি করিবেন। আমি বলিলাম কেন, ওঁরা চাঁদ হইতে মাটি আনিতে পারেন, আমি এখান হইতে পাথর নিতে পারিব না। আমার পক্ষে ওঁদের চাঁদে যাওয়ার মত শ্রীবদ্রিনাথ দর্শন দুঃসাধ্য ও কঠিন। সকলে হাসিতে লাগিল।

আমরা ২ রাত ৩ দিন শ্রীবদ্রিধাম বাস করিলাম। আমরা যখন সহস্রনাম শুনিতেছিলাম, মন্দিরের গর্ভে আলোর অভাব মনে হইল, মূর্তি যেন ভাল দেখিতে পাইতেছি না, এর মধ্যে পাণ্ডা বলিয়া উঠিলেন সাহেবা বাই আরতি দিতেছেন" অমনি শঙ্খ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, খুব সুন্দর বেশ দর্শন হইল, মনের ক্ষোভ মিটিয়া গেল। আরতি দিতেও টাকা দিতে হয়।

শ্রীবদ্রিনাথের পূজা আমরা অমাবস্যা তিথিতে দিলাম, ভাল কিংবা মন্দ জানি না।

২রা জুন বেলা ২টায় শ্রীবদ্রিনাথ প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। পাণ্ডবেশ্বর বিষ্ণু প্রয়াগ হইয়া বেলা ৩-৩০ মিনিটে যোশীমঠে পৌঁছি, ৪-১০ মিনিটে পিপুল কোটিতে পৌঁছি, পিপুল কোটিতে রাত্রিবাস করিয়া ভোরে রওনা হই। পিপুল কোটিতে লেদিকা আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা হইল। আমরা শ্রীবদ্রিনাথ ধাম হইতে আসিলাম, তিনি শ্রীবদ্রিনাথ যাইতেছেন।

৩রা জুন ভোরে আমরা রওনা হইলাম বিরহী গঙ্গা, চামৌলী, নন্দ প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ হইয়া রুদ্র প্রয়াগে

আশ্রমে বেলা ১০টায়। ১টায় শ্রীনগর আশ্রমে। এখানে দুপুরের খাওয়াদাওয়া হইল।

শ্রীনগর সহর সুন্দর, সাজান, হাল ফ্যাসানের সব জিনিষ পাওয়া যায়। সাজান সহর শ্রীনগরে সুন্দর নতুন ধর্মশালা, সামনে গোলাপ বাগান। কিন্তু বাথরুম্ ইত্যাদি ২য় তালার মত উঁচুতে উঠিয়া তবে পাওয়া যায়, সে বড় অসুবিধা। একটা নল আছে তাহা হইতে কোন স্থান হইতে অনবরতঃ জল পড়িতেছে। যদি এই নলটি বন্ধ হয়, তবে খুব অসুবিধা হইবে।

এ দিকে এবার খুব আম হইয়াছে। শ্রীনগরে ঠেলাগাড়ী করিয়া আম ওজনদরে বিক্রী করিতে আসিল।

আমরা শ্রীনগরে দুপুরে আহার করিয়া আবার রওনা হইলাম।

দেব প্রয়াগ হইয়া লছমন ঝোলা নীচে দেখিতে দেখিতে ঋষিকেশ সহরে পৌঁছিলাম। ভগবান ধর্মশালায় উঠিলাম। এখানে আমাদের বেশী মালপত্র যাহা রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা কেহই পাইলাম। সন্ধ্যার সময় হৃষীকেশ পৌঁছি। ট্রেনের কি গোলমালে আমাদের ২ দিন ভগবান ধর্মশালায় থাকিতে হইল। আমরা ফিরিয়া আসি ৩রা জুন, আর ৮ই জুন হৃষীকেশ হইতে রওনা হই, ৮ই জুলাই ১টা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছি।

২০ দিনে ঘোর বিদেশে থাকিয়াও কোন কষ্ট পাই নাই। সহযাত্রীদের নিকট হইতে অযাচিত কত উপকার পাইয়াছি। সকলের নিকট অতি সুন্দর ব্যবহার পাইয়াছি।

হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া সকলেরই দৃষ্টি বাড়ী হইতে কেহ আসিয়াছে কিনা, তখন একটু একটু বৃষ্টিও পড়িতেছিল, ষ্টেশনে নামিয়া কে কোথা দিয়া চলিয়া গেলাম। কারো কাছ হইতে শেষ বিদায় নেওয়া হয় নাই সে কথা মনে হইলে মনটা খারাপ হইয়া যায়।

২০ দিন এক সঙ্গে থাকা, এক সঙ্গে খাওয়া, একত্রে বেড়ান নানা সুন্দর দৃশ্য দেখা,—কতই আপনজন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর জীবনে হয়তো দেখাই হইবে না। সর্বদা ওদের কথা মনে হয়।

২০ দিনের সম্পর্কও কম নয়!! (সমাপ্ত)

সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি

(১৯ পৃষ্ঠার পর)

পায়ে অঞ্জলি দিতে পারবে তার বেশী বিছে হবে— এ ত' সবাই জানে।

ইতিমধ্যে গ্রামের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেছি। সেখানে আমরা পেয়েছি তীর্থবাসী পণ্ডিতকে। পণ্ডিতমশাই বলছেন, হাতের লেখা মুক্তোর মত করতে হবে তবে ত' মা সরস্বতী কৃপা করবেন।

ছেলেদের মনে আরো একটা সমস্যা দেখা দেয়। ওরা বাড়ীর পুজোয় অঞ্জলি দেবে—না, ইস্কুলের পুজোতে গিয়ে মায়ের পায়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে আসবে?

দু জায়গায় অঞ্জলি দিলে বোধকরি বিদ্যে বেশী হবে।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুজো এক সময় সমাধা হয়। পল্লী গ্রামে রাত্রি নেমে আসে। ছেলের দল প্রসাদ পায়। ওরা যখন ঘুম চোখে বাড়ী ফিরে আসে মা সরস্বতী হয়ত সবার আড়ালে বিদ্যের বোঝা দিয়ে ওদের এগিয়ে দিয়ে যান।

[সমাপ্ত]

Gram : "Involute"

Phone : 47-5934

Works : 38/1, PANDITIA ROAD
CALCUTTA-700029

S. P. Roy Machine Tools Corporation

Office : 28, DOVER ROAD, Calcutta-700019

MACHINE TOOL MANUFACTURERS

Standard Machines ● Special Purpose Machines ● Re-Conditioned Machines
Plant & Machinery Spares
Conveyors ● Gears ● Hops ● Special Tools

BUY IIIKKS or EEM braud

MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS

DERRICKS	:	up to 25 Tons, Mast 60M Boom 20M.
WINCHES	:	up to 150 Tons lifting capacity.
HAULAGES	:	up to 1000 Tons Haulage capacity.
CRANES	:	E.O.T., H.O.T., P.F. Gantry and Swing Jib.
CONVEYORS	:	Belt types Fixed & Portable.

TRANSPORT EQUIPMENTS

TRAILERS	:	up to 100 Tons payload capacity.
TANKERS	:	up to 24000 litres capacity.
TRACTORS	:	up to 700 Bhp—Imported Canadian.
DUMPERS	:	5, 9 & 15 Tons capacity.
TIPPERS	:	up to 5 Tons Payload—Rear & Side.

HANDLING PLANTS (on turn key basis)

To Process : Lime, Ash, Oils, Ores, Chemicals etc.

Contact :

HIKKS ENGINEERING INDUSTRIES

10A, CHANDNI CHOWK STREET.
CALCUTTA-72

PH : 23-7770/23-9954 GRAMS : HIKKSWALAS

TELEX : 021-7571

Diamond

RANGE OF PRODUCTS FOR TUBE LIGHT

MANUFACTURED BY :-

DIAMOND ELECTRICAL INDUSTRIES

13, COLLIN STREET

[illegible]TTA-16, PHONE : 24-1405

ভারত

দার্শনিক ধর্মা পুরুষোত্তমদেবপ্রভৃত প্রতিষ্ঠিত

PHONE : 67-4873

EXPECT ENGINEERING CONCERN

ENGINEERS & FOUNDERS

Manufacturers of :

QUALITY COCKS & VALVES

Specialist in :—BUTTERFLY VALVES

11/1, Baindabon Mullick Lane
Kadamtala, HOWRAH-711101

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্যে সেপ্টেম্বর মাসে কি করতে হবে

১। পুকুরে চারা পোনা ছাড়ার সময় আরম্ভ হয়েছে।

২। তাই মহুয়ার খৈল প্রয়োগে মৎস্যভুক মাছ ও আগাছা নির্মূল করে পুকুর তৈরি করে নিন। বেশী জল থাকার জন্য খৈল ৩/৪ গুণ লাগবে। যদি টাকায় না কুলোয় তবে ৪"—৫" আকারের চারা পোনা ছাড়ুন। আগে বিঘে প্রতি ১০/১২ কেজি কলিচুন ছড়ান। তার এক সপ্তাহ পর কাঁচা গোবর দেবার ৪/৫ দিন পর পোনা ছাড়বেন।

৩। নিবিড় চাষের জন্য বিঘা প্রতি ৩"—৪" পোনা ছাড়ুন। নিয়মিত সার, পরিপূরক খাদ্য, পুকুর পরিষ্কার—এ বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

৪। যে কোন জলাশয়ে মাগুর মাছ চাষ করা চলে তার জন্য তৎপর হোন।

মাছ চাষের বিস্তৃত তথ্যের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

নং ১১৬৫-৯৬ ডি. আই. ও, তাং ৫।৯।৭৯

নরনারায়ণ আশ্রম-রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১। ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩। শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪। ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫। কেনোপনিষদ্	২·০০
৬। কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭। প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮। ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০। তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

শ্রীপ্রতিভা রায় রচিত

১। নারীপ্রগতির ভূমিকথা	৩·০০
২। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

বেণু মিত্র রচিত

১। সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	২·০০
২। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩। রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
৪। প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৫৭-২৫৪০

গ্রাম : বাগুইআটি / পোঃ অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সদা পাঠ্য গীতা	১·৫০
বৃহৎ পকেট গীতা	৯·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০
সুলভ পকেট গীতা	৩·০০	কর্মযোগী	৩·০০
পদ্য গীতা	৩·০০	ভারত আত্মার বাণী	১·৫০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২·০০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
বাংলার কবি	৬·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীলীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৪·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য	৪·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৮·০০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·00

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ● ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

With
Best Compliments
of

VARAT MACHINERY

**Manufacturers of Plywood, Match &
Wood Working Machinery.**

*28/B, Shakespeare Sarani,
Calcutta-700017.*

Telephone : 44-4025, 43-4258, & 43-4259.

Phone : 67-4074

Free India Machinery Co. Private Ltd.

Manufacturers of all kinds of Weighing Scales, Various types of Valves, Cocks and Pipe Fittings and General Order Suppliers.

Office & Workshop :

38, KALACHAND NANDI LANE, HOWRAH-1

JAY BEE TEX

Manufacturers Of :
C. T. Box & DYE STUFFS

10, WATERLOO STREET CALCUTTA-700069

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২২৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed % Payee Payable to UJJWAL BHARAT

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখকলেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বলভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

উত্তরণ ভারত

৩২ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ '৮৬

সূচীপত্র

ধর্ম এক বিশ্ব সংসারময় জীবন |
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ১৬৪
শিক্ষাকালের গুরুত্ব |
সম্পাদকীয় | ১৬৬
রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে |
ডঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী | ১৬৭
সৃষ্টির নবনাট্যে |
নচিকেতা ভরদ্বাজ | ১৬৯
প্রতীক্ষা | শান্তনীল দাশ | ১৬৯
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি |
স্বপন বুড়ো | ১৭০
বিদায়ে তারে নাম | পরেশ সাহা | ১৭৪
পরলোকের পথে আত্মার বিড়ম্বনা |
শরদিন্দু সাহা | ১৭৯
ইন্দ্রিয় | মুক্তা দে | ১৮১
বিদ্যাসাগরের সমাজ-ভাবনা |
সন্তোষ কুমার অধিকারী | ১৮৪
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ১৮৭
ঘুমের আকাশ। অমিল রঞ্জন রায় |১৮৯
উনখাশি | অসীমা গাঙ্গুলী | ১৯১
বোকারায় | গৌতম সাহা | ১৯১
জেনে রাখা ভাল | রতন রায় | ১৯৩
পাহাড়ে ভ্রমণ | অংশুমান মিত্র | ১৯৪
বীণা দাস | রেনা চৌধুরী | ১৯৫
প্রদর্শিনী বহুনাথ রায় |
আর্যভূমায় মুখোপাধ্যায় | ১৯৮

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা

মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

ধর্ম এক বিশ্ব সংসারময় জীবন

যাহারা ধর্ম চান, রাষ্ট্র চান না, অর্থ চান না, বিশ্বপরিচর্যা চান না, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেও পশু। যাহারা রাষ্ট্রই চান, ধর্ম অর্থ সেবা চান না তাঁহারাও পশু। যাহারা অর্থনীতির উপর বিশ্বারাধ্য চান অথচ ধর্ম মানেন না, তাঁহারাও পশু। যাহারা শূদ্রই থাকিতে চান তাঁহারাও পশু। অর্থকে 'অনর্থক' প্রচার করিয়া যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অনর্থ দূর করিবার পথে সব শাস্ত্র ধর্ম আজ অর্থের দুয়ারে ধরা দিয়াও অর্থের বাধা দূর করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষ চায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের যুগপৎ সমাবেশে বিশ্বগঠন। ধর্ম বলিতে হিন্দু খৃষ্টান ইসলাম কিছুই বোঝায় না। যাহাকে ধরিয়া ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সত্তা চৈতন্য আনন্দ যথার্থ সমন্বয়ভাবে সার্থক হইতে পারে তাহাই ধর্ম। ...যাহা দুনিয়ার সকলকে এক সূত্রে গাঁথিতে পারিবে তাহাই পরম ধর্ম। ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী স্থাপন ও তাহা লইয়া রক্তারক্তি বর্তমানে পুরুষোত্তম-যুগে চলিবে না। অনন্ত জগতে অনন্ত ধর্ম প্রচলিত, চাই সব ধর্মের সমন্বয়তা—নতেৎ তাহা অপধর্ম, অধর্ম। ...

সংসারে কাহাকেও বাধা দেয় নাই, সংসার সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা বিভীষিকাই আমাদের বাধা দেয়, দিতেছে। বিশ্বকে ভালবাসাই যে সংযম, ব্রহ্মচর্য ; অথচ এ ব্রহ্মচর্যে শুষ্কতা নাই, যে অর্থে 'নিরোধ' আমরা বুঝি সে নিরোধও নাই। উপনিষদ বলিয়াছেন, অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিতে হয় ; 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা' সংসার-বিস্মরণই মরণ জয়। যাহারা অবিদ্যার ক্ষেত্র হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সরাইয়া লইবার জন্য কাম ক্রোধের সঙ্গে যুদ্ধ করিল, তাহারা লৌকিক চক্ষে বড় ব্রহ্মচারী হইলেও পুরুষোত্তম-রাজ্যে 'মরা', সন্দেহ নাই। সংসারময় জীবন ছড়াইয়া না দিলে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মচর্য বজায় থাকিবে না। চিত্তকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে চাহিলেই সে বিদ্রোহ করে, তখন তাহাকে নিরোধ করার চেষ্টা ব্যর্থ। ...খাইতে পরিতে না দিয়া কাহাকেও পোষ মানানো যায় না। ইন্দ্রিয়ের বাস্তু স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। তুমি যদি বিশ্বরূপের বাস্তু না দাও সে মরিবে বটে কিন্তু তাহার ভূত তোমায় ছাড়িবে না—নরনারায়ণের কাজ গুরুতর, গুরুতম।...জীবনহীন ব্রহ্ম নরনারায়ণের উপাস্য নয়। ভারতবর্ষ তাইতো ব্রহ্মেরও পর পর-ব্রহ্মের স্তর স্থাপন করিয়াছেন।...

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়

শিক্ষা-কালের শুদ্ধতা

রেণু মিত্র

শিক্ষাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে, বিজ্ঞানকে গ্রামীণ উন্নতির কাজে লাগাতে হবে, সমাজের প্রতি স্তরে নিয়ত পৃথলা বজায় রাখতে হবে এ রকম সত্য ও প্রয়োজনীয় উপদেশ অনেকেই দিয়ে থাকেন যেমন সেদিন মোরারজী দেশাইও বলে গেলেন। কিন্তু বাস্তবে অনেক কিছুই হচ্ছে না অথচ শিক্ষাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা সত্যিই খুব প্রয়োজন। শিক্ষা-কালটা রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠার সময়; অথচ সেটা যদি রাজনীতির কোন বিশেষ মতবাদ বা ভাল মন্দ বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহলে সত্যকে জানবার যুক্তবার যাচাই করে নেবার সুযোগ থাকে না। বর্তমানের দলীয় রাজনীতিতে একদল সেটাকে সাদা বলছে, আর একদল সেটাকেই এবং তখনই কালো বলে প্রমাণ করছে। একটা সংস্কারমুক্ত মন বা বুদ্ধি নিয়ে সে সত্য সত্যি কালো বা সাদা তা আর বোঝবার উপায় রইল না। তাই সত্যের আপেক্ষিকতাবাদকে যেমনও তার একটা চিরন্তন চলকে খুঁজে বের করবার প্রয়োজনও সত্য প্রয়োজন এ কথা মানতেই হবে, মানতেই হবে আপেক্ষিকতাবাদ যেন সুবিধাবাদে পরিণত না হয় —যা আজ হয়েছে—তাহলে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া অথচ দলীয় রাজনীতির ছোট গণ্ডীতে আবদ্ধ না হওয়া—এ বড় কঠিন। কঠিন হলেও সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমাদের চলতে হবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন-সাধনা হচ্ছে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠা, সেগুলি সারাবার চেষ্টা করা এবং অপরের দোষ ত্রুটি নিয়ে দলাবাজি না করা। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল এই ভাবটাকেই সুন্দর করে বলেছেন, 'অন্যের সুখে সুখবোধ হইবে, অন্যের দুঃখে দয়া হইবে, অন্যের পুণ্যে হর্ষ হইবে এবং অন্যের পাপে উপেক্ষা করিলে চিত্তে যে অমল ভাবের আবির্ভাব হয় তাহারই নাম চিত্ত-প্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্ত-প্রসাদই সমাধির জনক'। এই হল সত্যিকারে মানুষ হওয়ার সাধনার কথা। আর রাজনীতির সাধনা হচ্ছে আমি সব শুদ্ধ করছি,ভাল করছি আর তুমি সব অশুদ্ধ করছ, অকল্যাণ করছ। অন্যের পুণ্যে হর্ষ হওয়া বা অন্যের পাপ উপেক্ষা করা এখানে তো নাই-ই বরং যে পাপ করা হয় নি সে পাপও একজনের কাঁধে চাপিয়ে তাকে অপদস্থ বিপদগ্রস্ত পরাজিত করাই রাজনীতির সাধনা। তারপর সমস্ত প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে তোমায় নিন্দা করাই রাজনীতির জীবনসাধনা। এই যেখানে অবস্থা সেখানে ব্যক্তি-মানুষ মানুষ হিসাবে সুন্দর হবে, সৎ হবে, মহৎ হবে এ আশা করার কোন অবকাশই রইল না। আজকের সমাজের চিত্র তাই তো এই রকম। শিক্ষা-কালটা যদি একটা উদার ও সামগ্রিক দৃষ্টির ব্যাপকতার মধ্যে অতিবাহিত না হয় তাহলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে একথা মনে রেখে সমাজ চলল না বলেই তো আজ সমগ্র জাতি নৈতিক অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তাই আজ সকলকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতেই হবে শিক্ষা-কালটাকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে একটা মুক্ত স্বচ্ছ পরিবেশে রাখতে। রাজনীতি যত বড় ব্যাপারই হোক সামগ্রিক দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেলে সমাজের সত্যিকার কল্যাণ কোনমতেই করা যাবে না। মানুষগুলিকে আগে মানুষ হতে হবে—তারপর তারা রাজনীতিবিৎ, অর্থনীতিবিৎ, বিজ্ঞানবিৎ, ইতিহাসবিৎ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হবে। কিন্তু আমরা মানুষ না হয়ে শুধু বিশেষের উপর জোর দিয়ে এগোচ্ছি—তাই তো সমাজের আজ এই অবস্থা। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা হারিয়ে ফেলেছি—অথচ শিক্ষা-কালটাকে অন্ততঃ সামগ্রিক দৃষ্টির পরিবেশের মধ্যে না রাখলে জাতি হিসেবে টিকে থাকাই আমাদের দায় হবে—বড় হওয়া মহৎ হওয়া সুন্দর হওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষাকালের জন্য এই শুদ্ধতাটুকু দরকার।

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

ডাঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

ভাষার সঙ্গে মানুষের জীবন-তৃষ্ণা সমাজ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভাষাই মিলিত করে জাতি, সৃষ্টি করে সভ্যতা, কৃষ্টি।

বিদেশী ভাষা ইংরাজির সাময়িকতম প্রসারের ফলেই আমাদের নৈতিক সামাজিক ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে যেই বিপর্যয় দেখা দিয়াছে এবং আমরা জাতি হিসাবে যেমন করিয়া বিলুপ্তির পথে চলিয়াছি, সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি বিশদ ভাবে প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে ভাষা-প্রসঙ্গে প্রবন্ধে। সংবিধান রচনাকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও বলিয়াছিলেন—"No nation can become great on the basis of a foreign language. Why? Because a foreign language cannot be the language of the people." অর্থাৎ "বিদেশী ভাষার মাধ্যমে কোন দেশই বড় হইয়া উঠিতে পারে না কারণ ঐ ভাষা কখনই জনসাধারণের ভাষা হইতে পারে না।" এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা ফ্রাঙ্ক এন্টনী পর্যন্ত বলিয়াছিলেন "I realise that English cannot for many reasons be the national language." অর্থাৎ "আমি বুঝিয়াছি বহু কারণেই ইংরাজি জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।" এখন বলিতে দ্বিধা নাই, কি দেশের কল্যাণ, কি আত্মমর্যাদা, কোন দিক হইতেই ইংরাজীকে রাষ্ট্রভাষার আসনে স্থান দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বাংলা দেশ, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সদ্যমুক্ত দেশগুলির ন্যায় আমাদিগকেও বিদেশী ভাষার মোহ ত্যাগ করিয়া জাতীয় ভাষাকেই গ্রহণ করিতে হইবে রাষ্ট্রভাষারূপে। এখন রাষ্ট্র ভাষা হইবে একটি না একাধিক, এবং তাহাই বা কি ইহাই হইবে আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যখন সমগ্র দেশ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে তখন মহাত্মা গান্ধী, রাজাজী রাজগোপালাচারি, সত্যমূর্তি, বাংলার দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশপ্রাণ, সুভাষচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ সকল দিক বিবেচনা করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করিয়াছিলেন যে স্বাধীন ভারতে হিন্দীই হইবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। উল্লেখ্য যে লোকমান্য তিলকও ছিলেন হিন্দীর সমর্থক।

আজ দেখিতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার সৈন্য বাহিনীর নামকরণ করিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ; এমন কি জাতীয় সঙ্গীতও আদেশ-নামা পর্যন্ত রচিত হইয়াছিল হিন্দী ভাষায়, আর জয়ধ্বনি হইল "জয়হিন্দ"। স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে হিন্দী ভাষাকে স্থায়ী এবং ইংরাজিকে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হয় সংবিধানে। তখন ইহাও ঠিক হয় যে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে ইংরাজি রাষ্ট্রভাষার আসন হইতে অপসারিত হইবে এবং রাষ্ট্রভাষা থাকিবে একমাত্র হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার যখন সংবিধানের নির্দেশ কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন ইংরাজিকে বহাল রাখিবার জন্য এক হিংস্র আন্দোলন আরম্ভ হইল মাদ্রাজে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের অমূল্য প্রাণাগারে অগ্নি সংযোগ করা হইল, আর নিহত হইল অনেক। অচিরেই ঐ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পৌঁছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাংলাদেশের যুবকেরা প্রাণ দিল জাতীয় ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিবার জন্য আর আমরা প্রাণ দিলাম, প্রাণ দিলাম বিদেশী ভাষা ইংরাজিকে বহাল রাখিবার জন্য। ছিঃ ছিঃ। লক্ষ্য করিবার বিষয় ঐ সংবিধান-বিরোধী আন্দোলনে অপর কোন প্রদেশ যোগ দেয় নাই। ভাষাভিত্তিক ভয়ে ভীত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য গোজামিল দিয়া একটা সূত্র বাহির করিলেন যাহার নাম হইল ত্রিভাষা সূত্র। আমার এখন তো মনে হইতেছে অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলি (আসলে পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজ) যতদিন না চাহিবে ততদিনই ইংরাজী বহাল থাকিবে। চমৎকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা! বলি, পশ্চিমবঙ্গ ও মাদ্রাজের বর্তমান ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বাংলাদেশের মত, ইংরাজি ভাষা তাহাদের কাছেরী বর্জনে মোহ ত্যাগ

করিতে পারিবে কি কোন দিন ?

যাহারা বহুভাষার কথা বলিতেছেন তাঁহারাও যে অশান্তির সৃষ্টির ভয়ে ঐ কথা বলিতেছেন তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। অশান্তির ভয়ে ভীত হইয়া বাস্তবকে অস্বীকার করিলে কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্য তাহারা উদাহরণ দেন সুইজারলেণ্ডের ; কিন্তু এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে সুইজারলেণ্ড পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বেষ্টিত দেশ, লোক সংখ্যা মাত্র ৬৩ লক্ষ, তিনটি ভাষা থাকিলেও তাহারা ধর্মে এক। সুতরাং ঐ দেশের ত্রিভাষা থাকিলেও এক জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছে ভৌগোলিক কারণে এবং ধর্মের ভিত্তিতে। তারপর ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া সরকারি কাজকর্ম পরিচালনেও অসুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে ভারত একটি বৃহৎ দেশ এখানে আছে বহু প্রদেশ, বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং লোক সংখ্যাও ৬০ কোটী। এখানে এক জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিতে পারে একমাত্র একটি ভাষার ভিত্তিতে। রাষ্ট্রভাষা বহুভাষা ভিত্তিক হইলে তাহা কখনই সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে আমরা বরং অনুসরণ করিতে পারি রাশিয়াকে। ওখানে আছে বহু প্রদেশ, বহু জাতি, বহু ভাষা কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব বিনিময় ও একজাতীয়তা-বোধ সৃষ্টি করিবার জন্য আছে একটি মাত্র ভাষা—রুশ ভাষা তাদের রাষ্ট্র ভাষা, যাহা অবশ্য পাঠ্য দেশের সর্বত্র, যদিও প্রাদেশিক ভাষাতেই দেওয়া হয় শিক্ষা এবং চলে প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্ম। আমাদেরও ঠিক তাহাই হওয়া উচিৎ। এখন সেই ভাষা হইবে কোনটি ? পূর্বেই বলিয়াছি, দেশের নেতৃবৃন্দ যাহারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের কথা ভাবিতেন, দেশের কল্যাণ কামনা করিতেন তাঁহারা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন হিন্দী ভাষার কথা। তারপর যুক্তি ও গণতন্ত্রের দিক দিয়া বিচার করিলেও বলিতে হয় ঐ একই কথা। হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৪০ জন। ইহা ভিন্ন দেশের আটকোটী মুসলমান ও প্রায় এক কোটী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দী ভাষায় কথা বলিতে পারে। অহিন্দী ভাষীদিগের মধ্যেও অনেক আছে, অন্তত হইলেও কাজ চালাইবার জন্য হিন্দী ভাষায় ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারে। ইহা ভিন্ন বহির্ভারতেও দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এমন কি মাদাগাস্কার, কিওয়াইও প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ও দক্ষিণ আমেরিকায় এমন অনেক লোক আছে যারা হিন্দী বুঝে ও বলিতে পারে। মাদাগাস্কারের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। এখন হিন্দীর বিরুদ্ধে যেই সব বক্তব্য রাখা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথম আপত্তি হিন্দী ভাষা ভাষীদিগের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৪০ জন। অন্য সূত্রে হিন্দী ভাষীর সংখ্যা ৪০জন হইলেও দেশের সর্বাধিক সংখ্যক লোকই হিন্দী বুঝিতে ও বলিতে পারে। শতকরা যাহারা ৪০ জন তাহাদের দাবী যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় তবে ইংরাজি শিক্ষিত লোক যাহারা শতকরা মাত্র ১/২ জন তাঁহারা ইংরাজির পক্ষে ওকালতি করেন কোন অধিকার বলে ? দ্বিতীয় আপত্তি হিন্দী উন্নত ভাষা নহে। রাষ্ট্র ভাষাকে যে একটি উন্নত ভাষা হইতেই হইবে তেমন কোন নজির নাই তবে ঐ ভাষাকে অবশ্যই হইতে হইবে জাতীয় এবং অধিকাংশ লোকের বোধ্য। পৃথিবীতে মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা ২৫০টি, কিন্তু উন্নত ভাষার সংখ্যা আছে মাত্র কয়েকটি। রোমানগণ যখন বৃটেন ত্যাগ করিয়া গেল তখন তখনকার অধিবাসীরা তাদের জাতীয় ভাষা ইংরাজিকেই রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিল যদিও সেই যুগের ইংরাজি ভাষা ছিল অনেক নিম্ন স্তরের রোমান ভাষার তুলনায়। বৃটনগণ জাতির ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিয়া ছিল বলিয়াই ইংরাজ জাতি সর্বদিকে এত উন্নত হইতে পারিয়াছে। বর্তমান ইসরাইল তাহার লুপ্ত গ্রীক জাতির ভাষা হিব্রুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে যদিও সেখানে ইংরাজি ও জার্মান অভিজ্ঞ লোকের অভাব নাই। সংস্কৃত ভাষা যখন উন্নতির চরম শিখরে তখনও কিন্তু রাজকার্য পরিচালিত হইত পালি বা প্রাকৃতী ভাষায়, জনগণের কথা ভাষায়। যাহারা বলেন হিন্দী ভাষা উন্নত নহে তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিতেছেন

(সেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায়)

কবিতা

সৃষ্টির নবনাট্যে ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ

আমার ইচ্ছারা দিয়ে একদিন তোমার শরীরে
রূপ পাবে—স্বপ্নতম কোমল মধুর
ধানের শিষের মত মৃদু অবয়বে।
তারপর একদিন রূপের প্রাঙ্গনে তারা বড় হয়ে
ফিরে আসবে : কতরঙ্গে জীবনের বিচিত্র লীলায়
বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে তারা।
তাদের হৃদয় জুড়ে অনন্ত স্মৃতির আকাশ
হয়তো বলবে কথা। এবং তখন
হয়তো থাকবে তুমি আমি কেউ থাকব না।

• • •

এমনি হয়। পৃথিবীতে এমনি চলেছে চিরকাল।
তারপর তারাও একদিন সৃষ্টির পুনরভিনয়ে
সম্পন্ন উজ্জ্বল হবে,
সৃষ্টির নবনাট্য আন্দোলনে তারা
সমস্ত সূর্যের রঙ পাবে মেখে—কুয়াশা কৌমুদী,
নদীর জলের শিলা, হাওয়ার সংবাদ
সব নিয়ে সম্পন্ন হবে তারাও একদিন।
নারীকে নতুন ক'রে দেখতে পাবে আর
স্পষ্ট হবে সম্পন্ন সহজ দুর্জয়
জীবনের আদি অভিজ্ঞানে।
রূপ-বৃন্দাবনে সেই লীলা অভিরাম
অবিরাম চলে আসো।
অথচ কেউই, কিছু চিরকাল থাকে না এখানে।
তবুও কী যেন এক গভীর বিচিত্র অর্থে
অনন্ত নাম :
উচ্ছ্বাস আনন্দ-স্রোত চলেছে সে নবপ্রাভিমুখে।
যদি চ এ প্রাতিস্বিক জীবনেরা আন্দোলিত
সুখে-দুঃখে ভালো-মন্দে সহস্র ঘাঁধাঁয়।
তবু কিছু কেউ, কিছু থাকে না এখানে।
শিক্ষা পেরিয়ে শেষে আমাদের সকলকে অগত্যার মত
বাস্তিপাতো চ'লে যেতে হয়।
এবং আশ্চর্য তাথো কেউ কিন্তু কখনো ফেরে না।
উত্তরায়ণের থেকে আলোকের আভিজাত্যে
প্রাণ তবু বার বার বিচিত্র রচনা।

প্রতীক্ষা ॥ শান্তশীল দাশ

কত জন প্রতিদিন আসে আর যায় :
অসংখ্য পায়ের ধ্বনি, কত শব্দ, কত কোলাহল—
সব শেষ হয়ে যায় তারা চলে গেলে।
এ মনের পানে চাই, সঙ্গীহীন দেখি সে একাকী
নীরবে একান্তে বসে চেয়ে থাকে কার প্রতীক্ষায়,
চেয়ে থাকে তন্দ্রাহীন দু'টি আঁখি মেলে।
একা সে, নিঃসঙ্গ সাথীহীন ;
তার কানে পশে নাক কোনো শব্দ কোনো কোলাহল।
সেখানে নিঃশব্দ সব : নিরালা নির্জনে
কাটে তার দিনগুলি। আপনার মনে
কত কী-সে গড়ে ভাঙে ; ভাঙে আর গড়ে :
নিত্য চলে এই খেলা—খেলা শেষ হলে
চেয়ে থাকে পথ পানে, কান পেতে থাকে,
বুঝি সে আসবে ; তার দূর পদধ্বনি
শোনার আশায় থাকে—দিন কেটে যায়।
সে আসে না, তবু তার আশা
মনের গোপন কোণে কী উজ্জ্বল হয়ে
তাকে আলোকিত করে ;
কী প্রত্যয় জেগে থাকে অন্তরে অন্তরে ;
সে আসবে, আসবেই, যে আমার প্রিয়
একান্ত আপন জন—
প্রতীক্ষায় দিন কাটে তার।

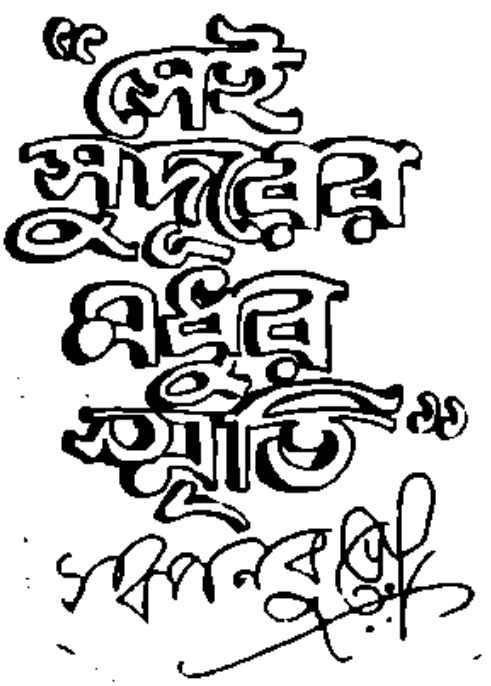

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[১৯]

সাহিত্যের পোকা খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার মাথায় বাসা বেঁধেছিল।

যখন গ্রামের বাড়ীতে থাকতাম, তখনও আপন মনে ছড়া লিখতাম। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে ছড়া আবৃত্তি করতাম। পেছনে কাপড় টাঙিয়ে নিজেদের মধ্যে থিয়েটার করবার আয়োজন করতাম। হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করেছি।

আমার এক ভায়ে ছিল। তার নাম প্রথমানন্দ। সবাই তাকে ডাকত 'গোয়ালন্দ' বলে।

তার খুব থিয়েটার করবার বাতিক ছিল। নানারকম রঙীন কাগজ সাড়ীতে এঁটে আর নিজে সীন এঁকে সে নাটক করবার ব্যবস্থা করত। এ ব্যাপারে তার বোনরা তাকে খুব সাহায্য করত। সবাই মিলে খুব খাটা খাটনি করে মঞ্চ সাজাতো। নিজেরাই মেক আপ করে এক এক জন এক এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হত।

আমাদের মেসবরা করত সেই নাটক দেখতে। আমরা তাদের নাটক দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

গোয়ালন্দ একাই একশ! সে-ই মঞ্চ সাজাতো, সীন আঁকতো, মঞ্চে লণ্ঠন আর চুপি জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করত, সাজ ঘরে মুখে নানা রকম রং মেখে মেক-আপ্-এর আয়োজন করত; আবার মঞ্চে দাঁড়িয়ে নানা রকম মুখ-ভঙ্গী করে 'অ্যাক্টো' শোনাতো। পেছনে থালা, ঘটি, বাটি বাজিয়ে ঐকতানের ব্যবস্থা করতো। সত্যি কথা বলতে কি,—গোয়ালন্দ আমাদের বাল্যকালে দারুণ মঞ্চ পরিচালক ও প্রডিউসার রূপে আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল।

গ্রামে থাকতে আমাদের সাহিত্য চর্চার আরো একটি আকর্ষণ ছিল। সারা গ্রামে একটি মাত্র শিশু পত্রিকা আসত। তার নাম 'শিশু'।

আমার আর এক ভায়ে এই শিশু পত্রিকার গ্রাহক ছিল। ভাগ্নের নাম ছিল মুকুল।

সেই ছিল আমার সম বয়েসী আর খেলার সাথী। মুকুল আমার জ্যাঠতুতো বোনের ছেলে।

এই 'শিশু' পত্রিকাটি কবে ডাক ঘরে এসে পৌঁছবে—তার জন্যে আমরা সবাই দিন গুণতাম।

শুনেছিলাম, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর টাকায় এই 'শিশু' পত্রিকা প্রকাশিত হত।

সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা থাকতো—বরদাপ্রসন্ন মজুমদার। ছোট আকারে ছাপা হত এই শিশু কাগজ।

তাতে পৌরাণিক গল্প, ইতিহাসের গল্প, আবিষ্কারের কথা, বিজ্ঞানের কাহিনী, জীবজন্তু পাখীর কথা সবই থাকতো। কবিতা আর ছড়াও ছাপা হত এই শিশু পত্রিকায়। নানারকম ছবিও ছাপা হত। পেছন দিকে নানা মজার ধাঁধা ছাপানো হত। লেখা থাকত,—যারা সঠিক জবাব দিতে পারবে, পরের সংখ্যায় তাদের নাম ছাপা হবে।

এইটেই ছিল আমাদের—মানে ছোটদের, আসল আকর্ষণ।

গ্রামে পাঠশালার পাশেই ডাক ঘর।

ডাক-পিয়ন আমাদের চেনা। 'শিশু' কাগজ এলেই আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে ঘিরে বসতাম। একজন ধাঁধা-গুলো পড়ে শোনাতো। আর সবাই মিলে সেই ধাঁধার উত্তর বের করার চেষ্টা করতো। যে আগে জবাব খুঁজে পেতো, তার আনন্দের সীমা থাকতো না। সবাই মিলে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠত।

ধাঁধার উত্তর বের করবার সময় একটা গোপনীয়তা থাকত বটে, তবে উত্তরের সমাধা হয়ে গেলে সবগুলি নামই লিখে 'শিশু' কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়া হত।

পরের মাসে যখন চেনা নামগুলি ছাপার হরফে দেখা যেত—তখন বালক দলে আনন্দের আর সীমা থাকত না।

এই 'শিশু' কাগজ আমাদের শিশু বয়সে যে সাহিত্যের বীজ গোপনে অন্তরে রোপণ করেছিল,—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই!

কলকাতায় এসে যখন হাটখোলা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, প্রথমটা যে সুরোর ব্যাঙ সাগরে পড়েছিলাম, সে কথা বুকে হাত দিয়ে স্বীকার করতেই হবে।

ধীরে ধীরে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটে গেলো। তাদের সঙ্গে হুল্লোড়ও জমে উঠল।

আস্তে আস্তে অনুভব করলাম, এদের অনেকের মধ্যেই সেই সাহিত্যের পোকা কিল্‌বিল্ করছে।

আবার দেখলাম, অনেকে বেশ সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। পেন্সিলেও আঁকে, আবার রং দিয়েও বিবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকে ফেলতে পারে।

আমাদের দলে একজন ছিল, তার নাম চিত্ত। সে অতি সহজেই আমার চিত্ত জয় করে নিল।

সে একদিন গোপনে দেখালো—তার আঁকা একটি সুন্দর ছবি। এ কিছু পাখী, বাঘ কিম্বা প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি অপরূপ আলেখ্য।

দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি নিজে এঁকেছ?

সে গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল, আমি নিজে হাতে এঁকেছি। তবে আমার বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না।

আমি নিজেও একটু আধটু ছবি আঁকি।

কিন্তু চিত্তের মতো মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি ত' কিছুতেই আঁকতে পারবো না।

মনে মনে ঠিক করলাম, আমাকেও আর্টিষ্ট হতে হবে। সেই সঙ্গে চিত্তের সঙ্গে আরো একটি গোপন পরামর্শ হল। আমরা একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করবো।

আমি হবো সম্পাদক—চিত্ত হবে কাগজের শিল্পী।

তক্ষুণি আমরা দুই জনে বসে একটা পরিকল্পনা করে ফেললাম। সাদা মোটা কাগজে কাগজ বের করতে হবে।

লেখার মাঝে মাঝে ছবি এঁকে দেয়া চাই।

একটা লেখা যেখানে শেষ হয়ে যাবে—সেখানে ছোট ছবি বসবে। লেখার প্রথমেও ছবি এঁকে দেয়া হবে।

তখন ত' এত নাম জানতাম না।

বড় হলে জানতে পেরেছি—লেখা শুরু হবার মুখে যে ছবি দেয়া হয় তার নাম Top Design.

আর লেখার শেষে যে ছবি বসানো হয়—তার নাম হচ্ছে Tail Design.

পরবর্তীকালে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে কমার্শিয়াল আর্টে এই সব নাম জানতে পেরেছিলাম।

সে সব ত' অনেক দিন পরের কথা।

এখন আমরা কয়েকজন হাতের পত্রিকা নিয়েই মেতে উঠেছিলাম।

প্রথমে মনে প্রশ্ন জাগল—কাগজের কি নাম দেয়া হবে?

যে নামের কথাই ওঠে—নিজেদেরই পছন্দ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে সে নাম বাতিল হয়ে যায়!

অবশেষে অনেক গবেষণার পর নাম ঠিক হল—

"দিবারাত্র"

তখনকার দিনে এত কাগজের অভাব ছিল না। নানা জাতের—নানা রকমের কাগজ পাওয়া যেত। আমরা দু'জনে খুঁজে খুঁজে বেশ মোটা সাদা কাগজ জোগাড় করে ফেললাম।

প্রথমে সেই কাগজ নিয়ে একটা চেনা দপ্তরীখানায়

বাঁধতে দিলাম। যখন খাতাখানা মার্বেল কাগজে বাঁধিয়ে এলো—আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকল না।

মনে হল কাগজ যেন বেরিয়ে গেছে।

ভেল্‌ভেটে সেই মার্বেল কাগজের ওপর হাত বোলাতে লাগলাম।

আহা! এর ভেতর রূপ লাভ করবে কত গল্প, কত কবিতা, কত প্রবন্ধ কাহিনী, ছড়া, হাসির কথা—ধাঁধা, খেলার খবর···আরো কত কি!

তা ছাড়া ছবি··

চিত্তের হাতে আঁকা হবে—রঙীন মলাট···

আজকের দিনে যার নাম প্রচ্ছদপট!

এ ছাড়া বাবার ছবি, ভলার ছবি···গল্পের ছবি··· মনীষীদের জীবনীসহ সুন্দর আলেখ্য।

প্রথমটা আমরা কাগজ বের করার কথা ক্লাসের কাউকে জানাই নি।

ভেবে ছিলাম—'দিবাকরের' উদয়ের পর সবাইকে একেবারে অবাক করে দেবো।

তাই এই গোপন কথাটি দু'জনের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছিলাম।

গোপনেই ছবি আঁকা হতে লাগল।

এ ব্যাপারে চিত্তের অসীম উৎসাহ।

সে নানা রকম ছবি আঁকা সুরু করে দিল।

কখনো পেন্সিলে···

কখনো কালি-কলমে—

আবার কখনো রঙীন ছবি···

ওর হাতে রূপলাভ করতে লাগল।

চিত্ত আমাদের স্কুলোলের শিক্ষক বি, এন, বোসের ভাইপো। পরে এই বি, এন, বোস স্কটিশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

এই বি, এন, বোস বাইবেল এবং স্কুলোল খুব ভালো পড়াতেন সে কথা বোধকরি আগেই একবার উল্লেখ করেছি।

যাই হোক, এইবার দিবাকরের কথা বলি। শুধু ছবি দিয়ে ত' কাগজ বেরুবে না।

ভেতরে চাই নানা জাতের রচনা।

বিভিন্ন নামে নিজেরাই রচনা লিখতে আরম্ভ করলাম। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, খেলার কথা। কোনো ব্যাপারেই আমরা পিছিয়ে থাকবো না।

সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল—লেখা নকল করা। অধিকাংশ রচনা আমাকেই নকল করতে হল। কেননা, আমার বন্ধুদের মধ্যে কারো হাতের লেখাই তেমন ভাল না। কাজেই নকল করবার সব চাপটা এসে আমার ঘাড়েই পড়ল।

এ জন্যে খাটাখাটনি নেহাৎ কম করতে হল না। দিনে নানা পরিশ্রম করে, আবার রাত জেগেও রচনা নকল করতে হত।

এদিকে "দিবাকরের" দিকে বেশী উদ্যম ব্যয় করতে হল বলে রোজকার পড়াশোনার দিকটায় খুব ক্ষতি হতে লাগল।

মাঝে মাঝে ক্লাসে মাষ্টারমশায়দের কাছে পড়া তৈরী না করার দরুণ বকুনিও খেতে হতে লাগলো।

অবশেষে একদিন সেই "দিবাকর" নকল করবার কাজ সমাধা হল।

ছবি আঁকার ব্যাপারটা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এইবার ঝকঝকে দিবাকরকে একটি পাতলা কাগজের মলাট দিয়ে সাজানো হল।

দেখে মনে হল, কোনো সৌখীন বাবু বুঝি আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে।

সেদিন ক্লাসে এই "দিবাকরের" সত্যিকারের উদয় হল—সেদিন ছাত্রমহলে একেবারে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

কেউ বলে, আরে, আমি আগে দেখে নি—কেউ বলে মলাটের ছবিটা কেমন এঁকেছিস দেখি ত—

অপর একজন দিবাকরকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উল্লাসধ্বনি প্রকাশ করে,—আর আমি এটাকে বাড়ী নিয়ে যাবো। সারা রাত জেগে পড়বো কাগজটা। অধিকাংশ ক্লাসের ছেলেরা বললে, অ্যাঁ। তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে

এই সব কাণ্ড করেছিল। কাউকে এতটুকু জানতে দিল না!

তখনকার দিনে লাজুক কবির সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না।

দু' একজন তার মধ্য থেকে চুপি চুপি এসে বললে, আমার খাতায় অনেক কবিতা জমেছে। তোরা নিবি ও?

এই ভাবে দিবাকরের সাজ-সজ্জা আর অলঙ্করণ দেখে অনেকে এসে আমাদের দলে যোগদান করল।

দেখতে দেখতে লেখক ও কবির সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল।

আমাদের ক্লাশে যে এমন স্তব্ধ ও নীরব কবি ঘাপটি মেরে ছিল—সে কথা "দিবাকর" প্রকাশিত হবার আগে আদৌ জানতে পারি নি।

যাই হোক স্কটিশ বিদ্যালয়ে হাতের লেখা কাগজ "দিবাকর" প্রকাশ করে আমরা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলাম।

অন্য ক্লাশের ছেলেরাও হাতের আড়াল দিয়ে মেখিয়ে পাশে দাঁড়ানো বন্ধুকে চুপি চুপি বলত, জানিস,—ওরাই "দিবাকর" নামে হাতের লেখা পত্রিকা বের করেছে। ছবিতে লেখায় কবিতায় দিব্যি সাজিয়েছে।

তখন গর্বে আর আনন্দে যেন আমাদের মাটিতে পা পড়ত না!

মনে মনে ভাবতাম, আমরা একেবারে লেখক বনে গেছি। এরপর আমাদের লেখা অন্য কাগজে ছাপা হবে। চাই কি একদিন আমাদের লেখা বইও বাজারে প্রকাশিত হবে। এক "দিবাকর" বের করেই আমরা আকাশ কুসুম রচনা করতে লাগলাম।

কিন্তু আমাদের এই গর্ব আর অহংকার খুব বেশী দিন টিকলো না।

"দিবাকরের" ঝলকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সেই আকাশেই উদিত হল—"অরুণ"—তার সহস্র কিরণ জাল বিস্তার করে।

আসল ঘটনা হল এই যে, আমাদের ক্লাশের চেতনাই আর একটি দল দিবাকরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে রাতারাতি বের করে ফেলল—"অরুণ"।

একই আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে—এসব সবাই জানে। কিন্তু দুই সূর্য দীপ্ত কিরণ বিকিরণ করছে একই গগনের গায়,এই দৃশ্য দেখে সকলেই একেবারে হকচকিয়ে গেল!

একদিকে "দিবাকর"—অপর দিকে "অরুণ"—কে কত কিরণ জাল বিকিরণ করতে পারে তাই নিয়ে যেন একটা প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল।

অরুণের দলে ছিল—অরুণ দত্ত, অনাদি মুখোপাধ্যায়, বিনয় গুপ্ত, হরেন শীল প্রভৃতি।

ওরাও এক একটি রথী, মহারথী।

নানা রকম লেখা দিয়ে "অরুণের" পাতা ভরতি করতে লাগ্‌লো।

ছবিতে ওরা অবশ্য আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। আমাদের চিত্র একাই একশ।

বিচিত্র সব ছবি এঁকে "দিবাকরের" কলেবর পূর্ণ করতে লাগল।

কিন্তু "অরুণ" একটা ব্যাপারে আমাদের ওপর টেক্কা দিতে সুরু করলে। ওরা "অরুণ" কাগজে "দিবাকরে'র সমালোচনা আরম্ভ করে দিল।

"দিবাকরের" কোন কবিতায় ছন্দ পতন ঘটেছে—

কোথায় কোন খবর একেবারে ভুলে ভরা—

কোন্ পৃষ্ঠায় বানানে প্রমাদ সৃষ্টি করেছে—

বিজ্ঞানের কোন সংবাদ আধুনিক নয়—

এই সব ব্যাপার নিয়ে ওরা বক্রোক্তি সুরু করে দিল।

শুধু কি তাই?

কোন্ ছবিতে আঁকা রাজকন্যা একেবারে চাঁয়া হয়ে গেছে—

কোন নদী চলতে গিয়ে একেবারে আকাশে উঠে গেছে—(তার মানে perspective-এ ভুল আছে)

কোন মানুষের আঙুল ছয়ের অধিকে একেবারে

(বাকীটা ১৮৩ পৃষ্ঠায়)

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

। নয় ।

খবরটা ছড়িয়ে পড়লো পরদিন। পরদিন দুপুরে।

সকাল বেলায়ও বিশ্বরূপের খোঁজ করেছিলেন শচী দেবী। কিন্তু তাকে তিনি পাননি। তিনি ভেবেছিলেন, লোকনাথ আর বিশ্বরূপ হয়তো কোথাও গেছে। আবার এখুণি ফিরে আসবে। এ রকম তো মাঝে মাঝেই ওরা যায়। কোথায় যায়, তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

না, আর দেরী করা নয়, ছেলেকে অবশ্যই এবার ঘরে বাঁধতে হবে। বৌ আনতে হবে ঘরে। যে বৌ শুধু তাঁর ঘরকেই ভরে রেখে না, বিশ্বরূপকেও যে ঘরে ধরে রাখবে।

বেলা বাড়লো। ভোরের সূর্যটা পুবের মাঠ পেরিয়ে মিশ্রের বাড়ীর আম গাছটার মাথায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু বিশ্বরূপ এলো না।

শচীদেবীর মনে নামলো একটা দুশ্চিন্তার ছায়া।

তিনি নিমাইকে ডেকে বললেন, 'হ্যারে, দাদাকে দেখেছিস?'

'কৈ, না-তো।'

'আমার হয়েছে মরণ, সেখায় খুশী যা যাবা, কিন্তু যাবার আগে একবার বলে যাবি তো? না, আমরা কেউ নই। আমাদের বলার কোন প্রয়োজন নেই।' শচী দেবীর কথায় একটা অভিমানের সুর সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

নিমাই বললে, 'দাদাকে ধরে আনবো মা?'

'তা যা না। যাবে আর কোথা? আছে তো ঐ এক অদ্বৈত ঠাকুরের সভা! সে সভা তো তুই চিনিস্‌ই। যা, সেখান থেকে তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই নিমাই ছুট দিয়েছে। ছুট, ছুট, ছুট, এক দৌড়ে সে অদ্বৈতাচার্যের সভায় এসে হাজির।

অদ্বৈতাচার্যও বিশ্বরূপের কথা ভাবছিলেন।

প্রতিদিন যে আসে, আজ সে এলো না কেন, আচার্যের মনে এ জিজ্ঞাসা বারবার ঘুরপাক খেয়ে গেছে।

মনে মনে প্রশ্ন করেছেন তিনি, 'অসুখ-বিসুখ করলো না তো? নিশ্চয়ই অঘটন কিছু একটা ঘটেছে। নইলে বিশ্বরূপহীন অদ্বৈত সভা, আচার্যদেব যে তা কল্পনাও করতে পারেন না।

আশঙ্কাটা পারিষদদের কাছেও তিনি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'হ্যাঁ, হে, বিশ্বরূপের কোন খবর রাখো তোমরা? সে আজ এলো না কেন? কোনদিন তো তার এমন হয় না। নিশ্চয়ই বিপদ আপদ কিছু একটা ঘটেছে।'

কেউ উত্তর দিয়েছে, ব্যাপারটা তো আমাদের কাছেও কেমন কেমন ঠেকছে আচার্য। পরম ভাগবত বিশ্বরূপ, ভাগবত সভায় সে আজ অনুপস্থিত! এ যে ভাবাও যায় না।

'হ্যাঁ, হে। ব্যাপারটা আমাকে আজ উদ্বিগ্ন ক'রে তুলেছে। তোমাদের কেউ একজন মিশ্র ভবনে একবার খবর ক'রে যেয়ো তো। বিপদ আপদের কথাটা তো কিছু বলা যায় না।' বলে আচার্য আবার ভাগবতে মন দিয়েছিলেন।

এমন সময় নিমাই গিয়ে হাজির।

'দাদা, কোথায়?'

নিমাইকে দেখেই আবার সেই ভাববিহ্বল চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন আচার্য। নিমাই যেন আজ আদি তাঁর কাছে এক রহস্য হয়েই আছে। তাকে দেখলেই তাই তিনি যেন কেমন হয়ে যান। অনেক জিজ্ঞাসা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে তাঁর মন ছুড়ে বসে।

নিমাইকে দেখে আজও তাঁর তেমনি ভাব হয়েছিল। নিমায়ের প্রশ্ন তাই তিনি শুনতে পান নি। বিশ্বরূপের কথা জিজ্ঞেস করতেও তাই তিনি ভুলে গেলেন।

নিমাই আবার বললে, 'দাদা কোথায়? দাদাকে দেখছিনে কেন?'

এবারে যেন ধ্যান ভাঙলো অদ্বৈতাচার্যের। ভাবনার কোন্ গভীর তল থেকে এতোক্ষণে যেন তাঁর মন ডুব দিয়ে উঠলো।

তিনি একটু অপ্রস্তুতই হলেন।

বললেন, 'দাদা তো আজ আসে নি নিমাই।

'দাদা নেই, দাদা নেই, দাদা আসেন নি?' বলতে বলতে নিমাইয়ের ডাগর ডাগর দু'টি চোখ থেকে ঝরঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো।

সে আর দাঁড়ালে না। 'দাদা নেই, মাগো, দাদা নেই।' বলতে বলতে সে যেমনি এসেছিল, তেমনি ছুটে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলো।

আচার্য ডেকেছিলেন, 'নিমাই।'

নিমাই সে কথায় আর কোন সাড়া দেয়নি।

কথাটা আর চাপা রইলো না।

লোকনাথের বাড়ী থেকেও লোক এসেছিল। লোকনাথকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তখন আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না যে বিশ্বরূপ আর লোকনাথ সন্ন্যাসে গেছে। যেখানে গেছে, সেখান থেকে কোনদিনই আর তারা ঘরে ফিরবে না। ঘরে ফিরবে না তার কারণ, তারা যে রসাস্বাদনের কাঙাল, ঘর তাদের সে রস দিতে পারবে না। বরং পদে পদে তার প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করবে।

ঘরকে তাই তারা পর করেছে। ঘর ছেড়ে তাই তারা সন্ন্যাসে গেছে।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথায় শচীদেবী একেবারে ধূলায় লুটিয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন; রূপ, রূপ, আমার বিশ্বরূপ, তোর মনে এই ছিল বাবা, তুই আমার এমনি ভাবে কাঙাল ক'রে গেলি! আমার বুকে এমনি শেল দিয়ে গেলি। আট আটটি মেয়ে খেয়ে তোকে আমি পেয়েছিলাম, তুই-ও আমায় এমনি ক'রে ছেড়ে গেলি। রূপ, রূপ, আমার বিশ্বরূপ।'

মনের দুঃখে শচীদেবী মাটিতে মাথা খুঁড়ছিলেন।

প্রতিবেশী যারা এগিয়ে এসেছিল তারা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

'উঃ আমার বুক জ্বলে গেলো। আমার বুক পুড়ে গেলো। তোরা আমায় বাধা দিয়ো না। এ প্রাণ আর আমি রাখবো না।' বলতে বলতে শচীদেবী সংজ্ঞা হারালেন।

মিশ্র শক্ত মানুষ। সংসার অনিত্য, এ জ্ঞানও তাঁর প্রবল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথায় তিনিও আজ ভেঙে পড়েছেন। দু'হাতে মাথা চেপে আঙিনায় তিনি বসে আছেন। তাঁর চোখ দিয়েও গড়িয়ে পড়ছে জল। প্রবল ঝড়ে বিরাট তিনি যেন বিরাট এক শাল বৃক্ষ।

সনাতন, প্রতিবেশী সনাতন এগিয়ে এলো। মিশ্রের কাছাকাছি যেয়ে ডাকলে, 'মিশ্রবা!'

'জানো, বড়ো জানারে সনাতন, বুকে আমার বড়ো জ্বালা।' বলতে বলতে জগন্নাথ মিশ্র হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

সনাতন বললে, 'মিশ্রবা, তুমি তো অবুঝ নও মিশ্রবা, তুমিও এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?'

'আমি যে পিতা, আমি যে পিতা সনাতন। আমি যে বড়ো আশা নিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে তাকে এতোটা বড়ো ক'রে তুলেছি, সে আমার উপর এমনি ডাকাতি ক'রে চলে

গেলো ? আমায় ফেলে গেলো ?'

সনাতন বললে, 'রূপ তো কোন খারাপ কাজে যায়নি মিশ্রজী, সে যে পথে গেছে, সে পথে ক'জন যেতে পারে ? ক'জনের সে মন আছে ? বংশের একজনের সন্ন্যাসে গোটা কুলের উদ্ধার হয়, গোটা কুলের মুখোজ্জ্বল হয়, রূপ তো সেই গৌরবের পথেই পা দিয়েছে। তার জন্যে তোমার এমনি দুঃখ করা কেন ?'

সনাতনের কথায় মিশ্র একটু থামলেন। একটু ভাবলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার শিশুর মতো হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, 'বুঝি, আমি সবই বুঝি সনাতন, কিন্তু মনকে যে কিছুতেই বুঝাতে পারি নে।'

'তাহ'লে আর কি করবে ? তাহ'লে লোক পাঠাও। রূপকে ধরে নিয়ে আসুক। ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। কাল শেষ রাত্রেই তো বোধ হয় বেরিয়েছে। এরই মধ্যে আর কদ্দুর যাবে ? লোক পাঠালে, নিশ্চয়ই তারা তাকে ধরে আনতে পারবে।'

'না।'

মিশ্রের কথাটা এবারে যেন খুবই গম্ভীর শুনালো। তিনি এবারে যেন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। মনের জোর অনেকটা ফিরে পেয়েছেন।

আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে তাই তিনি বললেন, 'না। রূপ যে পথে গেছে, সেই পথেই তাকে যেতে দাও সনাতন, তাকে আর ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো না। আমাদের স্বার্থপরতায় সে তার মহৎ ব্রত ভেঙে ফিরে আসুক, সেটা আমি চাইনে। তার বিরহে যতো ব্যথাই এ বুকে লাগুক না সনাতন, আমি হাসি মুখে সব সহ্য করবো। আমি হাসি মুখে সব সহ্য করবো।' বলতে বলতে মিশ্র আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আচার্যের বাড়ী থেকে ফিরে এসে নিমাই সেই যে আঙিনার এক কোণে বসেছিল, সেখান থেকে আর ওঠেনি।

বাপ মায়ের কান্না দেখে এটাই সে বুঝেছে, তার দাদা চলে গেছে। সে এখন জায়গায় গেছে, যেখানে গেলে মা-বাবা কাঁদেন। যে যায়, সেখান থেকে সে আর ফিরে আসে না।

তার দাদাও আর ফিরবে না। দাদার সঙ্গে জীবনে আর তার দেখা হবে না। দাদা, দাদা গো.....

দাদার জন্যে দু'চোখ ভরে জল আসে নিমাইয়ের। সে খেলা ভুলেছে। সঙ্গী সাথীদের কথা ভুলেছে। আজ সে সব চাপল্য ভুলে চুপচাপ এক কোণে বসে আছে।

আজ সে যেন সুন্দর একটি সোনার মূর্তি। তার সাড়া নেই। স্পন্দনও বুঝি থেমে গেছে।

। দশ ।

নিমাই এবারে নতুন মানুষ।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়েছে। তার অভাবে গোটা মিশ্র পরিবার যে শূন্য হ'য়ে গেছে। একটা গভীর শোকে যেন থমথম করছে সারাটা বাড়ী।

বয়সে কম হলেও নিমাই সবই বুঝেছে।

আর সেটা বুঝেছে বলেই, সে বিশ্বরূপের শূন্যস্থানকে পূর্ণ করার চেষ্টা করছে।

আজকাল সে সব সময়ই বাড়ী থাকে। বাড়ী থেকে বেরোয় না।

সঙ্গী সাথীরা আসে। ডাকে, 'নিমু !'

'কি রে।'

'গঙ্গায় অনেক নাও লেগেছে, চল না ভাই গঙ্গায় যাই।'

'না রে, গঙ্গায় আমি যাবো না। আমার ভালো লাগে না।'

'সে কি রে ? গঙ্গা ভালো লাগে না কি ?'

'হ্যাঁ ভাই, গঙ্গা আর আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। ভালো লাগে শুধু পড়া শুনো। এবার আমি সব ছেড়ে পড়াশুনোয় মন দেবো। পণ্ডিত হবো। জানিস্, আমার দাদা কতো বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। কতো বই তিনি পড়েছেন ?' দাদার কথা মনে পড়তেই নিমাইয়ের চোখ ভরে জল আসে। সঙ্গী সাথীরা বিষন্ন মুখে যে যার ঘরে যায়। নিমাই নেই,

কাজেই কোন খেলাই আর তাদের জমবে না। প্রাণহীন খেলায় আনন্দ কোথায়? নিমাই নেই, তাই তাদের খেলায় প্রাণ নেই। তাই তাদের নিজ নিজ ঘরে ফেরার পালা।

নিমাই এবারে সত্যি সত্যি পাঠে মন দিলে। যে মন তার এ্যাদ্দিন গঙ্গার ঘাটে, নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে ছিল, সে মনকে তুলে এনে এবারে সে পাঠে ডুবে দিয়েছে। জগন্নাথ মিশ্র কিন্তু তাতে খুশী নন।

নিমাই দুষ্টুমি ছেড়েছে। পড়াশুনোয় মন দিয়েছে। এ ঘটনা আগে ঘটলে মিশ্রের আনন্দের অন্ত থাকতো না। কিন্তু বিশ্বরূপের সন্ন্যাস তাঁর মনের রং বদলে দিয়েছে।

নিমাইকে পড়তে দেখলে তাই আজ তাঁর আনন্দ হয় না। আতংক হয়। একটা গভীর দুশ্চিন্তা যেন তাঁর মাথায় চেপে বসে। মনে তাঁর ঝড় ওঠে। তিনি যেন স্থির থাকতে পারেন না।

দুপুরে খেতে বসে শচীদেবীকে বলেন, 'শোনো গো, তোমায় একটা কথা বলতে চাই।'

শচীদেবী হেসে বলেন, 'বলো না, একটা ছাড়া হাজার কথা বলো। তাতে অতো ভণিতা কেন বাপু?'

মিশ্র বলেন, 'শোনো, কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। খুবই ভাবনার কথা। ভেবে ভেবে আমি তো কোন কূল কিনারা পাচ্ছি নে।'

'বা-রে, আমি হাসছি নাকি? আমার মুখে কি আর হাসি আছে? সব হাসি আমার চোখের জলে ডুবে গেছে না?' বলতে বলতে শচীদেবীর দু'টি চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে।

মিশ্র বলেন, 'শোনো, নিমু পড়াশোনো করুক এটা আর আমার ইচ্ছে নয়।'

স্বামীর কথায় চমকে উঠলেন শচীদেবী।

বললেন, 'সে কি গো, নিমু পড়াশোনা করবে না কি!'

'হ্যাঁ। নিমু পড়াশোনো করবে না। পড়াশোনো করবে না। পড়াশোনা করলেই তো সে সত্যিকার জ্ঞান পাবে। সংসারটাকে সে চিনে ফেলবে। এ সংসার মিথ্যা, ঘরোষমতা মনের দুর্বলতা; নিমাই যদি এ কথা জানতে পারে, তাহ'লে কি আর সে সংসারে থাকতে চাইবে? চাইবে না। সে সংসার ছেড়ে পালাবে।'

শচী দেবীর মুখে কথা নেই। একটা গভীর আতংকে তাঁর বুক যেন ক্রত ওঠানামা করছে।

মিশ্র আবার বললেন, 'বিশ্বরূপ কি করলে দেখলে না? তাকে তো বাড়ি বাড়ি শাস্ত্র পড়ালাম। বিদ্যার সাগর বানালাম। কিন্তু কি হলো তাতে? তাকে কি ঘরে বেঁধে রাখতে পারলে? সে আমাদের ছেড়ে পালালো না?

শচী দেবীর চোখ থেকে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে। সংসারের কথা ভেবে, স্বামী পুত্রের কথা ভেবে যে বেদনাকে আড়াল ক'রে রাখতেন তিনি, আজ যেন সে বেদনারই উৎস মুখ খুলে গেছে। সেই বেদনাই জল হ'য়ে গড়িয়ে পড়ছে তাঁর দু' চোখ দিয়ে।

তবুও চোখের জল মুছলেন শচীদেবী।

বললেন, 'নদীতে ঢেউ দেখেই কি কূলে নৌকো ডুবিয়ে দেবে গো?

নিমুকে সারা জীবন মুখ্যু বানিয়ে রাখবে?

'তা হোক, তবুও তো সে আমাদের চোখের সামনে থাকবে। কোনদিন আমাদের ছেড়ে পালাবে না।'

শচীদেবী বললেন, 'এতো বড়ো পণ্ডিতের ছেলে মুখ্যু হলে লোকে বলবে কি গো? তা ছাড়া মুখ্যু হলে সে খাবেই বা কি করে?'

'লোকের কথা রেখে দাও। নিমু সন্ন্যাসী হলে কেউ তো আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের শূন্য ঘর ভরে দিতে পারবে না। তবে লোকের কথায় কি এসে যায়।' বলতে বলতে মিশ্র থামলেন কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবলেন।

তারপর বললেন, 'আর পড়াশোনো করেই বা কি হয় গো! এই তো আমি এতো পড়াশোনো করলাম। পণ্ডিত হলাম। কিন্তু কি হলো আমার তাতে? আমার তো দুর আনতে পান্তা ফুরোয়। আর শোনো তো ঐ একফড়ি দত্তকে। এক পাত লেখাপড়া করলে না। নামটাও সই করতে শিখলে না। অথচ একফড়ির

ঘরে আজ কাড়ি কাড়ি টাকা। তাই বলছিলাম কি, ভালো থাকলে সব হয়। মূর্খের ঘরেও গণ্ডায় গণ্ডায় পণ্ডিত বাঁধা থাকে। নিমুর ভালো থাকলেও হবে। অনেক পণ্ডিত ওর বন্দনা গাইবে। পণ্ডিত করতে গিয়ে আমরা তো আর ওকে হারানোর ঝুঁকি নিতে পারিনে?'

শচীদেবী বললেন, 'তা তুমি যা ভালো বোঝো করবে, সেখানে আমি বাধা দিতে যাবো কেন। একটির শোকই সইতে পারছি নে, নিমুও যদি তা-ই করে, তা'হলে যে আর বাঁচতে পারবো না গো।' বলতে বলতে শচী দেবীর চোখ দু'টি আবার ছলছল করে উঠলো।

মিশ্রের খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। এবারে তিনি পাতে জল ঢেলে উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যায় নিমাই পড়তে বসেছিল।

মিশ্র কাছে এলেন। পাশে বসলেন। মাথায় আলতোভাবে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বইপত্র তুলে রাখ নিমু, আর একটা গল্প বলি।'

'বা-রে, আমি পড়বো না? এ তো পড়ার সময়।'

মিশ্র বললেন, 'না, তোকে আর পড়তে হবে না।'

'পড়তে যে আমার ভালো লাগে। খুব ভালো লাগে।'

'তা লাগুক। তোকে পড়তে হবে না। পড়ে কিছু হয় না।'

'পড়ে কিছু হয় না? তাহ'লে তুমি পড়েছো কেন? এতো বড়ো পণ্ডিত হয়েছো কেন?'

নিমাইয়ের প্রশ্নে একটু যেন মুষড়েই পড়লেন মিশ্র। আমতা আমতা করে বললেন, 'সেই তো আমার দুঃখ রে, পড়ে আমি ভুল করেছি। পড়েছি বলেই আমার কিছু হলো না।'

নিমাই বললে, 'হয় নি মানে? লোকে তাহ'লে তোমায় ডাকে কেন? এতো খাতির করে কেন?'

'ভুল, বুঝলি নিমু, সব ভুল। সব ফাঁকা। পড়লে অর্থ আসে না। পেট ভরে না। সারাটা জীবন দুঃখ ক'রে মরতে হয়।'

একটু থেমে, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিশ্র আবার বললেন, 'তাই, তাই আমি ঠিক করেছি নিমু, তোকে আর পড়াবো না। পড়ে আমি যে ভুল করেছি, সে ভুল আর তোকে করতে দেবো না।'

নিমাই আসন ছেড়ে উঠলে।

মিশ্র বললেন, 'উঠলি কেন রে? গল্প শুনবি নে?'

নিমাই যেতে যেতে বললে, 'না বাবা। গল্প আমার ভালো লাগে না।'

নিমাই চলে গেলো।

মিশ্রের চোখ দু'টি ছল ছল ক'রে উঠলো এবারে। বিদ্যা বড়ো, সবচেয়ে বড়ো। কাঞ্চন নয়, আর কিছু নয়। জগন্নাথ মিশ্র যে সারা জীবন এই কথাটিই মনে মনে পুষে এসেছেন। অথচ নিমাইকে হারানোর ভয়ে আজ ওঁকে তার বিপরীত কথা বলতে হয়েছে। নিমাইয়ের কাছে ওঁকে মিথ্যে বলতে হয়েছে। এই মিথ্যে বলার জ্বালা মিশ্রকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধে মারছে। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে।

মিশ্র যেন স্থির থাকতে পারছেন না।

হোক বালক, তবুও নিমাইয়ের কাছে সব কথা খুলে বলতে না পারলে যেন ওঁর শান্তি নেই।

নিমাইকে তাই তিনি আবার ডাকলেন, 'নিমু, নিমু!'

শচীদেবী ভেতর থেকে উত্তর দিলেন, 'নিমুকে আবার কেন গো।'

'নিমু কোথায়? ওকে আসতে বলো।'

'নিমু শুয়ে পড়েছে।'

'শুয়ে পড়েছে? থাক্, শুয়ে থাক। তবুও একটু শান্তি পাবে। নিজের স্বার্থে ওকে যে বড়ো বাধা দিয়েছি। বড় বাধা দিয়েছি গো, সে বাধা তো ওকে ভুলতে হবে? ওকে ঘুমিয়ে থাকতে দাও। ও ঘুমিয়ে থাকুক।' বলতে বলতে জগন্নাথ মিশ্র উঠে দাঁড়ালেন। উঠোনে পায়চারি করলেন। নিমাইয়ের কাছে মিথ্যে বলে মনে ওঁর যে কাঁটা ফুটেছে, সে কাঁটা যেন তিনি কিছুতেই তুলে ফেলতে পারছেন না। (ক্রমশঃ)

পরলোকের পথে আত্মার বিড়ম্বনা

শরদিন্দু সাহা

সমাজ-চেতনাহীন আদিম মানুষ স্বজনের মৃত্যুকে নির্লিপ্ত উদাসীনতায় যতো সহজে মেনে নিতো সমাজ-সচেতন হওয়ার পর তার পক্ষে সেটা সম্ভব হোত না। স্বজন বিয়োগে যেদিন মানুষ তার মানসিক প্রশান্তি হারাতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে মৃত্যুর পর মানুষের কী হয়? সবার কাছে গ্রহণীয় এর জবাব আজও মেলে নি। তবে প্রচলিত কোন ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা যেমন মৃত মানুষের দেহ-মুক্ত আত্মার অমরত্বকে কবুল করেন তেমনি সেই বিদেহী আত্মার পক্ষে লোকান্তরে আশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করেন না। মৃত ব্যক্তির জীবিতকালে কৃত কর্মানুযায়ী তার অবিনশ্বর আত্মা স্বর্গে নয় নরকে আশ্রয় পাবে এটা প্রায় ধর্মেই নির্দেশিত। তবে চীনে তাও, কনফুসী বা বৌদ্ধ সবাই মৃত মানুষের আত্মা অমর এটা মেনে নিলেও তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস বিদেহী আত্মা লোকান্তরে যায় না, পৃথিবীর বুকেই স্থচর বা খেচর কোন জীব অথবা দেহকে অবলম্বনকরে মৃত ব্যক্তির বাড়ীর আনাচে কানাচে অবস্থান করে পরিজনের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাই ধর্মমত নির্বিশেষে চীনা মাত্রেই পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে কিছু পশু পক্ষীদেরও দেবতার আসনে বসিয়ে ঘটা করে পূজা দিয়ে থাকে। প্রাচীন চীনে মহামান্য কুকুর দেবতার পূজায় নরবলি পর্যন্ত দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন আমেরিকার আদিবাসী আজটেক জাতির ধর্মীয় বিধানে মৃত মানুষের দেহমুক্ত আত্মার অমরত্বে স্বীকৃতি দান ও লোকান্তরে তার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। তবে সেটা মৃতের জীবিত অবস্থায় কৃত কর্ম-নির্ভর ছিল না। মৃত্যুর কারণ অনুযায়ী মৃতের আত্মা নির্ধারিত অমর লোকে আশ্রয় পেতো। পরলোকে অবিনশ্বর বিদেহী আত্মার জন্য তিনটি আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। যেমন উর্ধ্বে সূর্যলোকে, মর্তে "ট্লালোকান" বা বরুণ লোকে আর পাতালে "মিকট্লান" বা নাগ লোকে।

প্রাচীন আজটেক সমাজে "হুনটিকি" বা সূর্য দেবতা ছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁর পূজাই ছিল সবচেয়ে প্রধান জাতীয় উৎসব। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের মূল কথা ছিল যে হেতু সূর্যের অস্তিত্ব হীন জগতে প্রাণের চাঞ্চল্য সম্ভব নয় সে হেতু প্রাণ-স্পন্দনে জীবন্ত যা কিছু সূর্য দেবতার নিয়ন্ত্রাধীন। সূর্য বিহনে জগতের বিলুপ্তি অনিবার্য। তাই মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহ-মুক্ত অমর আত্মার পক্ষে সূর্যলোকে আশ্রয় লাভ ছিল আজটেকদের পরম প্রাপ্তি। তবে যার তার আত্মার পক্ষে সেই পরম কাম্য অমর লোকে আশ্রয় লাভ সম্ভবপর ছিল না। কেন না প্রাচীন আজটেক সমাজে সৈনিক বৃত্তির চেয়ে মহত্তর বৃত্তি কিছু ছিল না। যারা দেশ ও সমাজের সম্মান রক্ষার্থে প্রাণ বিপন্ন করে যুদ্ধ করতো তারাই ছিল সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার হকদার। অনুরূপ যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের বিদেহী আত্মারই ছিল সূর্যলোকে আশ্রয় লাভের অগ্রাধিকার। তার পরে সেই পরম লোকে আশ্রয় পেতো সেই সব সৈনিকের বিদেহী আত্মা যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে বিপক্ষের দেব দেউলে বলিদানের ফলে মৃত্যু বরণ করতো। এখানে উল্লেখ্য প্রাচীন আমেরিকার রণ ক্ষেত্রে শত্রু সেনাদের হত্যা না করে বন্দী করাই ছিল কাম্য। আজটেকদের পূজা পার্বণে প্রচুর পরিমাণে তাজা মানুষের হৃৎপিণ্ড উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। উপাস্য দেবতাদের পূজায় যুদ্ধ বন্দীর মতো যেসব নিরস্ত্র মানুষই সেখানে বলিদানের উপচার রূপে গণ্য হোত।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর বিদেহী আত্মা ছাড়া যে সব নারী গর্ভবতী অবস্থায় জননী হওয়ার পথে মৃত্যু বরণ করতো তাদের আত্মার পক্ষেও সূর্যলোকে যাবার ছাড়পত্র মিলতো।

সূর্যলোক-বিহারী বিদেহী আত্মার পক্ষে সূর্যদেবের সহচর হয়ে প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমার সুযোগ ঘটলেও সূর্য-

লোকের নন্দন কাননে তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে থাকতে দেওয়া হোত এমন নয়। চার বছর পর সূর্যদেব তাদের পৃথিবীর বুকেই ফেরত পাঠাতেন। তবে তারা মানব মানবী রূপে এ জগতে ফিরে আসতো না। সঙ্গীত মুখর পাখীতে রূপান্তরিত হয়ে পৃথিবীতে এসে সকাল সন্ধ্যায় কল গুঞ্জনে তারা আকাশ বাতাস মুখরিত করে সূর্যদেবের উদয় অস্তের মহিমা কীর্তন করতো।

মানুষের দেহত্যাগী যে সব আত্মার পক্ষে স্বর্গলোকে যাওয়ার ছাড়পত্র ছিল না তাদের কেউ কেউ মর্তের বুকে "চাকমুল" বা বরুণ দেবতার "ট্লালোকান" নামে চিহ্নিত ভূ-স্বর্গে আশ্রয় পেতো। প্রাচীন আজটেক সমাজে সূর্যদেবের পরেই ছিল বরুণ দেবতার স্থান। দেশে অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হলে সেখানে [illegible] করে বরুণ দেবতার পূজায় একটি সুন্দরী তরুণীকে বলি দেওয়া হোত। বরুণ দেবতার নির্দেশে যে সব মানুষ বজ্রাঘাতে, জলে ডুবে অথবা কুষ্ঠের মুখে পড়ে মৃত্যু বরণ করতো তাদের বিদেহী আত্মারাই শুধু সেখানে স্থান পেতো।

উপরোক্ত দুইটি বিশিষ্ট মৃত লোক ছাড়া যে তৃতীয় লোকটি আমাদের সর্বসাধারণের অমর আত্মার শেষ আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল তাকে বলা হোত "মিকট্লান" বা নাগলোক। এর অধিপতি "মিক্টালাকৌট্ল কুইট্লী" ছিলেন গ্রীক পুরাণে বর্ণিত "সুটোয়" সম গোত্রীয় দেবতা। মর্যাদার নিরিখে এর স্থান তৃতীয় হলেও পরলোকের পথিক আত্মার সার্বজনিক আশ্রয় হিসেবে এখানেই হোত বিদেহী আত্মাদের বৃহত্তম সমাবেশ। সাধারণভাবে রোগে ভুগে অথবা খুন জখমের ফলে যাদের মৃত্যু হোত সে রাজাই হোক আর ভিখারী হোক, পাপী হোক বা পুণ্যবান হোক সবার দেহত্যাগী আত্মাকেই পাতালপুরীতে শেষ আশ্রয় নিতে হোত। তবে ঐ লোকে মহাপ্রস্থানের পথে বিদেহী আত্মাকে পদে পদে চরম দুর্গতি ও বিড়ম্বনার মোকাবিলা করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হোত।

নাগলোকে যাত্রাপথে প্রথমেই আত্মাকে দুটি অবিরাম সংঘর্ষরত উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ গলি পথে চলতে হোত। তার পর যে দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করতে হোত তার প্রবেশ-পথে একদিকে নিরাটকায় কুমীর আর অন্যদিকে ভয়াল সর্প অত্যন্ত প্রহরীর মতো পথ আগলে থাকতো। এদের অতিক্রম করে বিদেহী আত্মাকে আটে আট আটটি দিগন্ত বিস্তারী বিপুল মরু প্রান্তর আর আটটি আকাশচুম্বী উত্তুঙ্গ পর্বত পেরিয়ে যেতে হোত। তার পরের পর্যায়ে হিমবাহের তুষার কঙ্কর কনকনে শীতের মধ্যে পথ চলতে হোত। এভাবে বিরামহীন অক্লান্ত চলার পথে শেষ অঙ্কে আত্মাকে যে অনতিক্রমনীয় দুর্গম বাধার মুখোমুখী এসে দাঁড়াতে হোত সেটি এমন একটি অতল গভীর পাখার যেখানে আট সমুদ্রের জলরাশি জমে থাকতো। এটি উত্তরণের পর মৃত ব্যক্তির দেহত্যাগী আত্মার পক্ষে নাগলোকে প্রবেশের ছাড় পত্র মিলতো। মহাপ্রস্থানের পথে এভাবে দুর্গম গিরি কান্তার মরু পাথার অতিক্রম করতে বিদেহী আত্মার সময় লাগতো মোট চার বছর।

এখানে স্মর্তব্য দেহধারী মানুষের কল্পনার অনুরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পথ চলা মতোটা ভীতিবহ, অশরীরী আত্মার কাছে হয়তো তেমন নয়। তবে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে দুর্গম পথে অবিরাম চলমান বিদেহী আত্মাকে যে ভাবে বিড়ম্বিত করতো তার তুলনা মেলা শক্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্রাচীন আজটেকদের শবদাহ সংস্কার অনুষ্ঠানে যে সব রীতি নীতি অনুসৃত হোত তার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুদের আচার আচরণের মিল থাকায় কোন কোন নৃতাত্ত্বিক মনে করেন এই দুটি প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। প্রাচীন আজটেকরা মৃতদেহ কবর না দিয়ে দাহ করতো। তা ছাড়া মৃতের স্ত্রীকেও সতীদাহের মাধ্যমে সহমরণে যেতে হোত। মৃতের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে পিণ্ডদান করার রেওয়াজও ছিল। রাজার মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে তার পোষাক আশাকের সঙ্গে একজন মহিষী ও ভৃত্যকেও

(শেষাংশ ২০০ পৃষ্ঠায়)

ইঁদুর

সুব্রতা দে

রাত্রি বেশ্বেতে শুয়ে ছটফট্ করছিল আসুরবালা। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। জ্বালা জ্বালা করছিল চোখ দুটো। লোডশেডিং। কেমন ভ্যাপসা গরম ঘরের ভেতরটায়। জানলা খোলারও উপায় নেই। আড়ন ছোঁয়া হাওয়া। ঘাম পাচ পাচে শরীর। তার ওপর আবার মশামাছির পিট পিটুনি। হাত পাখার হাওয়ায় কোন উপকার পাওয়া যায় না। চোখ বুজে শুয়েও থাকা যায় না। অসহ্য লাগছিল আসুরবালার। তাই উঠে পড়ল সে। কুঁজো থেকে এক গেলাস জল ঢেলে খেল। সামান্য ছিটিয়ে নিল চোখে মুখে। বুকের কাপড়টা সরিয়ে জল হাওয়া বুলিয়ে নিল। হাত পাখাটা আবার নাড়তে লাগল। এবার একটু ঠাণ্ডা বোধ হল। সামান্য একটু তন্দ্রা ভাব আসতেই একটা ইঁদুর ফড়াং করে পায়ের ওপর দিয়ে চলে যেতেই তন্দ্রা ছুটে গেল আসুরবালার।

উঃ, এই ইঁদুরগুলোর জ্বালায় একটুও শান্তি পাওয়া যায়! সুযোগ পেলেই বিষ দিয়ে, কল বসিয়ে কম নিধন করছে তবুও নিস্তার আছে। দুদিন যেতে না যেতেই দুটু ফাড়াং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরময়। আর হবেই না বা কেন? সেই দাদা শ্বশুরের আমলের বাড়ি। ভাগে ভাগে বাড়িটাই তো একটা ইঁদুর কল তৈরী হয়েছে। আসুরবালার স্বামীরা ছিলেন পাঁচ ভাই। উনি ছিলেন সবার বড়। সংসারের সব দায়িত্ব ওনাকেই বইতে হয়েছিল। নিজের জন্যে বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। আসুরবালার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। দু'জনেই নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করেছিল। আপত্তি করে নি আসুরবালা। সবার ঘরেই হচ্ছে। নিজের ঘরে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাই। কিন্তু খুশী হননি আসুরবালার স্বামী। স্ত্রীকে খুশী হতে দেখে নিজের অখুশী মনটাকে ঢেকে দিয়েছিলেন খুশীর ওড়না দিয়ে। ছেলের বউকে বুকভরা স্নেহ দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে ছিল আসুরবালা। অগাধ বিশ্বাসের বেড়া বেঁধে একটা সুখের বাগান তৈরী করেছিল সে মনের ভুবনে। নিজের চরিত্রগুণের সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছিল বউমার হাতে।

কিন্তু কিছুদিন না যেতে যেতেই ঝড় উঠল সংসারে। মন ভুবনের বাগানের বাঁশগুলো ঘুণে খেতে লাগল একে একে। আসুরবালা বিধবা হল। মেয়ে একটি সন্তান নিয়ে ডিভোর্স করল স্বামীকে। বিয়ের আগে বুঝতে পারেনি স্বামীর চরিত্র। যতই দিন যেতে লাগল ততই তার চরিত্রের দরজার খিল খুলে যেতে লাগল। প্রথম

প্রথম অনেক চেষ্টা করেছিল সহজ করতে স্বামীকে। হিন্দু ঘরের কোন মেয়ে কি চায় সহজে স্বামী ছাড়তে? কিন্তু সহজের বদলে আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। দুঃখের যাত্রাটা জোয়ারের মত আছড়ে পড়ছিল বুকের বোতলে। বাইজী বাড়ির চৌকাঠে। তাঁটা পড়েছিল ভাতের হাঁড়িতে। বাচ্চাটাকে মানুষ করতে হবে ভেবেই মেয়েটাকে পরদা রোজগারের জন্য বেরুতে হয়েছিল। তাতেই কি নিস্তার পেয়েছিল মেয়েটা। সারাদিনের খাটুনির পয়সাগুলো তুলে দিতে হত স্বামীর হাতে। প্রতিবাদ করলেই মারধোর। সব সহ্যের একটা সীমা আছে। বাধ্য হয়ে তাই ডিভোর্স করতে হল। বাচ্চাটাকে বাঁচাতেই হবে। অকূল সমুদ্রে পাল ছেঁড়া নৌকো থেকে মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের কাছে রাখার কথা বলেছিল আঙুরবালা বউমাকে। এতেই খোলস খুলে বেরিয়ে এল সৌম্য আসল রূপে। দিবারাত্র কলহ শুরু হল। আলাদা হল হাঁড়ি। বন্ধ হল মুখ দেখাদেখি। 'মা' কথাটি আকার নিল 'বুড়ি'। কলহের মুখে তুমিটাও আবার তুই হতে লাগল। নোংরা ভাষায় গালাগালি এতেও শান্তি পেল না বউ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল শাশুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের হাড় চিবোয়। আঙুরবালার কানে সব কথাই আসে। তবুও চুপ করে থাকে। ছেলেটার কথা ভাবে। ছেলেটা বড় নরম, পেরে উঠেনা বউ-এর সঙ্গে। দিনে দিনে রোগা হয়ে যাচ্ছে মনের অশান্তিতে। বউ বাড়িতে না থাকলে মায়ের কাছে আসে। সান্ত্বনা দেয় মাকে। অনেক থাকা অনেক গল্পই বলে মায়ের পাশে শুয়ে। দুজনেই কিছুটা শান্তি পায়। তখন আঙুরবালার মনে হয় সেই ছোট্ট ছেলেটা, যাকে শোবার সময় রূপ কথার গল্প না বললে কিছুতেই ঘুমোত না। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত অভ্যেসটা ছিল।

আজ হঠাৎ আঙুরবালার রূপ পাল্টে গিয়েছিল। নিজেই জানে না নিজের কি হয়েছিল। ওপরটায় ওরা থাকে। নীচের তলাটায় ভাড়া। বাড়ীর ভাড়াটা প্রথম থেকেই ছেলেটা নেয়। ভাড়াটে বউ ওপরে এলেই ভাড়াটা দিয়ে যান। ঠিক আগের মত আজও এসেছিলেন ভাড়া দিতে ওপরে। ঘরের ভেতরে বসেছিল আঙুরবালা। হঠাৎ বারান্দায় বেড়িয়ে এসে নিজেই ভাড়াটা চেয়ে বলেছিল—এবার থেকে ভাড়াটা আমার হাতে দেবেন। গলার স্বর বড় কঠিন শুনিয়েছিল। ছেলেও বেড়িয়ে এসেছিল। হাসি মুখে বলেছিল—এবার থেকে ভাড়া মায়ের হাতেই দেবেন। বউ ছিল রান্না ঘরে। কথাটা শুনে ছুটে বেড়িয়ে এসেছিল। ভাড়াটে কর্তার সামনেই চিৎকার করে বলতে শুরু করেছিল—"ভাড়াটা নিজের হাতে না নিলে মাংসের হাড় চিবুতে সুবিধে হবে কেন বুড়ির? মরণ কালে বুড়ির সখ দেখনা।" ভাড়াটে কর্তা আর দাঁড়ান নি। আঙুরবালার হাতে ভাড়াটা গুঁজে দিয়েই তড়তড়িয়ে নেমে গিয়েছিল। মাথাটা কেমন ঝিন ঝিন করে উঠেছিল আঙুরবালার। কোন রকমে ভেতরে গিয়ে খিল দিয়েছিল। বুকের ভেতর বিষের সেই একটা ছটফটানি শুনতে পাচ্ছিল। অনেকক্ষণ দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছিল বউ-এর। হঠাৎ ছেলের চাপা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল আঙুরবালা।

"তুমি চুপ করবে?"

'না, কেন চুপ করব? তোমার ভয়ে, না ওই বুড়ির ভয়ে?'

সঙ্গে সঙ্গে দুচড়ের আওয়াজ এসেছিল আঙুরবালার কানে। সারা শরীর কেঁপে উঠেছিল। ছেলের চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। বেড়িয়ে যাও। বেড়িয়ে যাও আমার ঘর থেকে। দিনে দিনে মাথায় উঠে যাচ্ছো। যা খুশী তাই করবে, না? এই বাড়িতে যদি থাকতে হয় মায়ের পায়ে ধরে থাকতে হবে। চল, চল, মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইবে চল। তা না হলে ঘুর করে দেব বাড়ি থেকে। তারপরই আওয়াজ হয়েছিল আঙুরবালার দরজায়। ছেলে ডেকেছিল মাকে। দরজা খোলেনি। দৌড়ে বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে কেঁদেছিল। কিছু পরে ছেলের চলে যাওয়ার আওয়াজ কানে এসেছিল।

এরপর সব চুপচাপ। শুধু বাইরের খুপরীতে পোলা পায়রার বকম্ বকম্ ডাক শোনা যাচ্ছিল।

ইঁদুর মারার কলটা আনার জন্যে এই প্রথম দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল আঙুরবালা। এক ঝলক চারপাশটা দেখে কলটা নিয়ে ঘরে ঢুকে তাতে কয়েকটা বিস্কুট টুকরা দিয়ে অন্ধকারে রেখে দিল। কিন্তু খাওয়া হয়নি। খেতে ভালোও লাগছে না। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে। এসে আবার শুয়ে পড়ল। ঘুম এলোনা। একটা চিন্তায় খুতুনি ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। কি দরকার ছিল এমন কাণ্ড করার, বউটা তাহলে যায় যেত না। হাজার হোক ঘরের বউ তো। খুট করে আওয়াজ কানে এলো। আঙুরবালা উঠে গিয়ে দেখল কলের ভেতর একটা ইঁদুর পড়েছে। ছটফট করছে বেড়বার জন্যে। মনের অতল থেকে একটা ছবি ভেসে এলো। একটা ইঁদুরের লেজ ধরে ছেলেটা বৌমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করতেই বৌমা চিৎকার করে আঙুরবালার গলা জড়িয়ে ধরত। বড় অসহায় দেখাত তখন বউমাকে। ও তখন বকে ছেলেকেই তাড়িয়ে দিত। হাসতে হাসতে ইঁদুরটা নিয়ে বেড়িয়ে যেতো। যেতেও যেতেও পেছন ফিরে মজা করত। আঙুরবালার এখন মনে হল, সবটাই অভিনয় ছিল। সব সময় 'মা' 'মা' ডাকে মন জয় করার চেষ্টা করত। ভাবত বাড়িটা শুধু ওরা একাই পাবে। আরে ছেলেও তার। মেয়েও তার। মেয়ের এখন বিপদ। এখন তাকে না দেখলে সে যে অতলে তলিয়ে যাবে। বউমাকেও মেয়ের মত বুকে টেনে নিয়েছিল। হয় না। হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে আসে বুক থেকে। কপালের রেখা আরও গভীর হয়, মুখটা আরও থম থমে। দরদর্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে কপালের দুপাশ বেয়ে। হাত পাখাটা একটু নাড়ল। ফল হলো না। কলের ভেতর ইঁদুরটা ছটফট করছে পালাবার জন্যে। আঙুরবালার মনে হল, ওর বুকের ভেতর যেন আর একটা ইঁদুর পালাবার জন্য ছটফট করছে। অসহ্য। অসহ্য মনে হল ওর। এখন কি করবে। মেঝেতে মুখটা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। না, তবুও কষ্ট কমছে না আবার উঠে বসল। আনমনে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ নজর গেল টেবিলে টাকা গুলোর ওপর। এগিয়ে এসে টাকাগুলো তুলে নিল হাতের মুঠোয়। আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল ছেলের ঘরকার চৌকাঠে। দেখল বৌমা বসে আছে। মুখটা জানলার দিকে। আরও এগিয়ে এলো। দাঁড়াল বউমার পেছনে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আঙুরবালার প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হল। নজরে পড়ল বৌমার। পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল। টাকা ভর্তি মুঠোটা এগিয়ে দিল আঙুরবালা বউমার দিকে। কিন্তু বলার চেষ্টা করল। শুধু ঠোঁট দুটো নামাত্র নড়ল। কাঁপল হাতটা। বৌ তাকাল শাশুড়ীর দিকে। স্থির দৃষ্টি। আরও হাতটা এগিয়ে দিল আঙুরবালা। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বৌ শাশুড়ীকে। বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল নিতুর মত। আঙুরবালাও জড়িয়ে ধরল বৌমাকে। দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল বৌমার মাথায় আশীর্বাদ হয়ে। আঙুরবালার হঠাৎ মনে হল বুকের ভেতর থেকে ইঁদুরটা ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল।

সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি

(১৭৩-পৃষ্ঠার পর)

বুষ্টরোগীতে পরিণত হয়েছে—

এই সব সমালোচনায় "দিবাকরকে" একেবারে নস্যাৎ করে দেবার জন্যে ওরা একেবারে আদাজুন খেয়ে কোমর বেঁধে কলম চালাতে লাগল!

তখন বাধ্য হয়ে আমরাও সমালোচনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হলাম।

ওই যে কথায় বলে,—"যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা"!

খুঁজে খুঁজে আমরাও ওদের "অরুণ" কাগজের ত্রুটি বের করতে লাগলাম। কবিতাতে, ছড়ায় উত্তর বেরুতে লাগল।

এই ভাবে আমাদের ক্লাসের সাহিত্যের আকাশে "কবির লড়াই" বেশ জমে উঠল।

[চলবে]

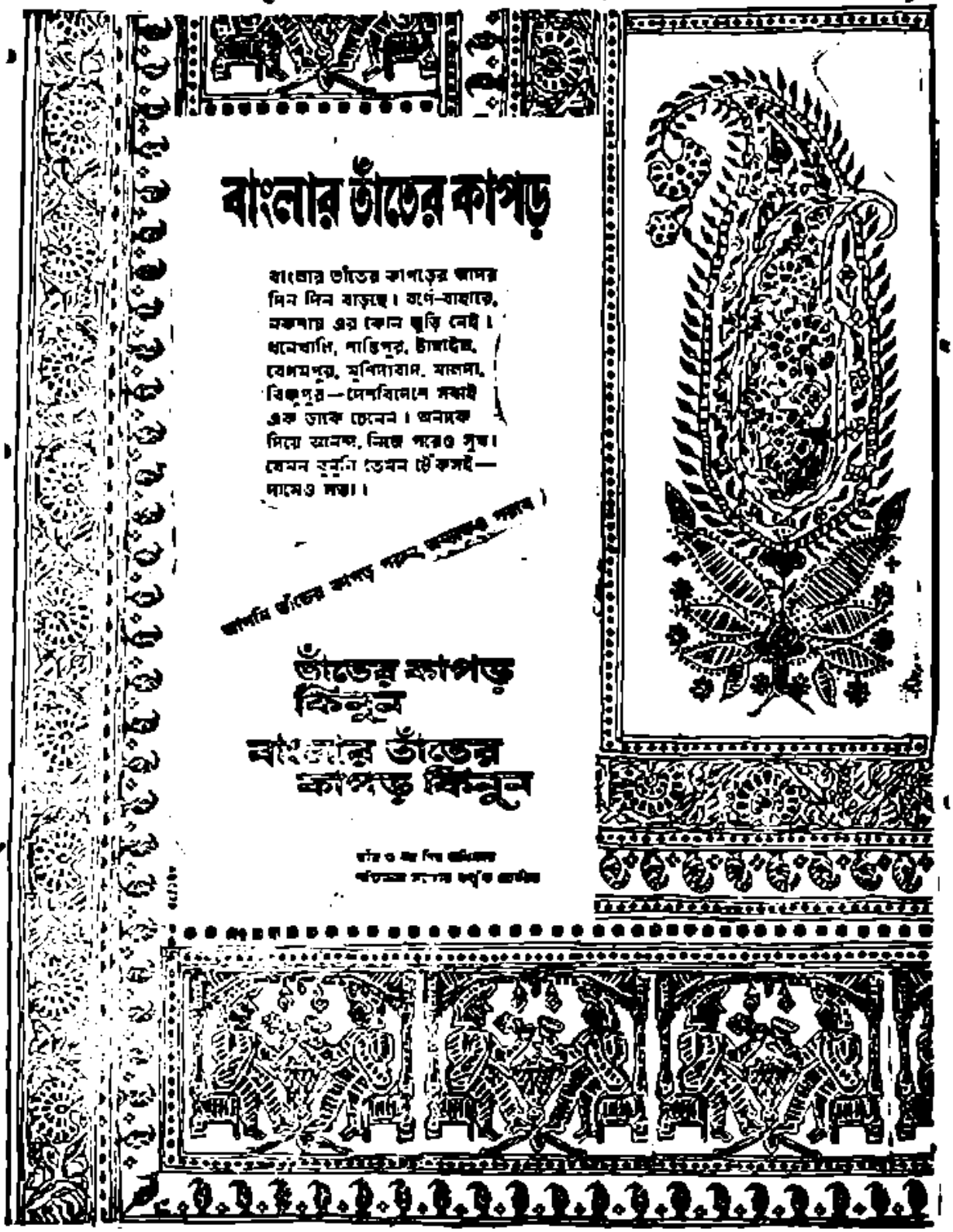
বাংলার তাঁতের কাপড়
বাংলার তাঁতের কাপড়ের আদর দিন দিন বাড়ছে। রঙে-বাহারে, মজবুতে এর কোন জুড়ি নেই। ধনেখালি, শান্তিপুর, ঢাকাই, বেরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, বিষ্ণুপুর—দেশবিদেশে সবাই এক ডাক চেনেন। অন্যদিক দিয়ে সাশ্রয়, নিত্য পরেও সুখ। যেমন বুনুনি তেমন টেঁকসই— দামেও সস্তা।
তাঁতের কাপড় কিনুন
বাংলার তাঁতের কাপড় কিনুন

বিদ্যাসাগরের সমাজ-ভাবনা

সন্তোষ কুমার অধিকারী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে একশ আটান্ন বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই দীর্ঘকাল পরে বিদ্যাসাগরকে শুধু বিদ্যার সাগর বা করুণার সাগর বলে স্মরণ করবার জন্যে মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠতো না, যদি তাঁর সতত বহমান মন কাল গঙ্গার মতই আমাদের সমাজকে আজও সজীব করে না রাখতো। মানুষের সমাজ নদীর মতই প্রবহমান। জীবনের প্রবাহ যখন রুদ্ধ হয়ে যায়, স্বাধীন চিন্তার ধারা যখন 'আচারের মরু বালুরাশি'র মধ্যে পথ হারায়, তখন সমাজে মানুষই হয় সবচেয়ে অবহেলিত। মানুষের অধিকারকে দলিত করে যারা তোলে দেশাচার। আমাদের দেশেও সমাজ এমনি ভাবেই একদিন ধর্মান্ধতা ও মিথ্যা সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। লোকাচারের কাছে মাথা নত না করে তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। অন্ধতা-সর্বস্বতা ও মিথ্যা প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সমাজকে মানুষের সমাজরূপে গড়ে তোলবার জন্যে সেই সংগ্রাম।

বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। তখন পশ্চিম পৃথিবীতে এক নতুন চিন্তা-বিপ্লবের ঢেউ বইতে শুরু করেছে। সংস্কৃত কলেজের জীবনে তিনি যেমন প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং হিন্দুধর্ম ও দর্শনের আদর্শকে জানতে পেরেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সান্নিধ্যে তেমনি অনুভব করেছিলেন মানবতার নবজাগ্রত চেতনাকে। তাই রক্ষণশীল যুগের আচারনিষ্ঠ পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সংস্কার-বিমুক্ত ও মনুষ্যত্বে প্রত্যয়শীল।

অল্প বিদ্যাতে তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি বলে বালিকাবিধবার জীবনব্যাপী মৃত্যু যন্ত্রণা অন্তর সাগর টেনে এনেছে তাঁর চোখে। প্রচণ্ড ঘৃণায় তিনি দেখেছেন, কৌলীন্য রক্ষার নামে কুলীন ব্রাহ্মণের ব্যাবসায়িক নীচতাকে। তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে সমাজের মুমূর্ষু ভবিষ্যৎ। অসহায় যন্ত্রণা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে নারী। নির্দয় সমাজ-ব্যবস্থার সৌহ বেড়ি যারা ভেঙে নিতে পারেনি, তাদের অনেকেই ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে।

অসহায় নারী-সমাজের জীবন-বেদনা ব্যাকুল করে তুলেছিল তাঁর হৃদয়কে। কিন্তু শুধু করুণা বা বেদনাবোধ দূর করতে পারে না জীবনের এই পুঞ্জীভূত দুঃখ এবং নিগ্রহের গ্লানিকে। মানুষের বিবেককে অন্ধতার কারাগার থেকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে কারাগারের বেতাল ভাঙবার মত শক্তির দরকার হয়। যুক্তি ও বিচারের সঙ্গে যোগ করতে হয় প্রবল মনন শক্তিকে। করুণা তাঁর হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল, পাণ্ডিত্য তাঁকে বিচারশক্তি দিয়েছিল, আর তাঁর হৃদয়ের অনমনীয় মননশক্তি তাঁকে এই কুপমণ্ডূক সমাজের সকল বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

বিদ্যাসাগর চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ কি, তা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"তিনি বাঙালী আচারের কুহক, বাঙালী জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের প্রতিভেদ-প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া... ঊর্ধ্বমুখ অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।"

সমাজকে 'অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে' প্রবাহিত করার জন্য যে সমগ্র দৃষ্টির প্রয়োজন, সেই দৃষ্টি বিদ্যাসাগরের ছিল, রক্ষণশীল সমাজের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার মত কঠিন ঋজুতাও তেমনি তাঁর ছিল। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অপার পাণ্ডিত্য ছিল বলেই আচার ও আনুষ্ঠানিকতার পীড়নকে অগ্রাহ্য করার মত প্রবল পৌরুষ তিনি লাভ করেছিলেন। জননীর

কাছে তিনি যেমন করুণাঘন হৃদয়ের অনুভব পেয়েছিলেন, ইতিহাস পাঠ ও ইউরোপীয় দর্শনের অধ্যয়ন তেমনি তাঁকে দিয়েছিল যুক্তিনিষ্ঠা ও মানবিকতার বোধ।

বিদ্যাসাগরের সমাজ-ভাবনার প্রথম কথাই ছিল সমাজে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রথমেই তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার; কারণ তিনি জানতেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই দেশের শিক্ষার সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার জীবন ও সমাজকে এক নতুন চেতনা দিয়ে অনুভব করবে। তাঁর হৃদয়ের করুণা দিয়ে তিনি দেখেছিলেন সমাজে নারীর নিগ্রহ; তাঁর প্রবল পৌরুষ সেই পীড়ন ও শোষণের নির্মমতাকে রোধ করতে চেয়েছিল। তাই একদিকে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্যে তিনি যেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, অন্য দিকে তেমনি কঠিন সংকল্প নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—বহুবিবাহ রোধ ও কৌলীন্যপ্রথার অবসান ঘটাতে এবং বিধবা বিবাহকে সমাজ-গ্রাহ্য করে তুলতে।

এর প্রত্যেকটাই ছিল সেদিন দেশাচারের বিরুদ্ধ অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।

ধর্ম বলতে বিদ্যাসাগর মানুষের ধর্মই বুঝেছিলেন। একথা আজ মনে রাখা দরকার যে, যে দেশে মানুষের মন ঈশ্বরচিন্তা ও দেবদেবীর তুষ্টির ভাবনায় ব্যাকুল, যে দেশে জীবন ও সমাজ লৌকিক ধর্ম ও দেশাচারের অনুশাসনে আচ্ছন্ন, সেই দেশে জন্মগ্রহণ করেও বিদ্যাসাগর সারা-জীবনে একবারও ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা উল্লেখ করলেন না। এক ধর্মযাজক তাঁকে মুক্তির কথা শোনাতে এলে বিদ্যাসাগর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ ইহলোকে যারা মানুষের দুঃখ ও বেদনার নিরসন করতে পারে না, তাদের কাছে পরলোকতত্ত্ব শোনবার কোন আগ্রহ তাঁর ছিল না। বিদ্যাসাগর ধর্ম মানতেন, কি মানতেন না, সেটাই বড় নয়, তার চেয়ে বড় কথা এই যে, তিনিই আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম শ্রেষ্ঠা, যিনি ঈশ্বর-চিন্তার আগে মানবসত্তার চিন্তাকে বসাতে চেয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের সাধনাকে ধর্ম ও আচারের ছায়ায় আচ্ছন্ন হ'তে দিতে তিনি চান নি।

বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না; কিন্তু সমাজের নামে অশুভ ও মনুষ্যত্ব-বিরোধী প্রচারকেও তিনি সহ্য করেন নি। সমাজকে তিনি মানবমুখী করতে চেয়েছিলেন তাই সমাজের নির্মম রক্তিকর প্রথাগুলিকে নির্মূল করবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। অথচ হিন্দু সংস্কৃতি ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি কি অসাধারণ শ্রদ্ধাই না ছিল তাঁর। সারা জীবনে হাতেকাটা সুতোর কাপড় ও চাদর ছাড়া অন্য কিছু পরেন নি তিনি। বিধবা বিবাহকে সমাজ-সম্মত করানোর চেষ্টায় জীবন ব্যাপী সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু হিন্দুবিবাহ পদ্ধতিকে তিনি বর্জন করতে রাজি হন নি।

হৃদয় মানবমুখী ছিল বলেই জাতিভেদ তাঁর দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করতে পারে নি। মাতৃষকে তিনি মানুষ বলেই জেনেছেন। সংস্কৃত কলেজের দ্বার তিনিই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন সকলের জন্যে। বয়েস হ্যাক করতে পারেনি তাঁর চিত্তের প্রসারতাকে। মৃত্যুর এক বছর আগেও সমর্থন করেছেন স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী নারীর অধিকারকে। যাঁরা তাঁকে শুধু করুণাসাগর বা দয়ার-সাগর বলে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি বিদ্যাসাগরের বিশাল হৃদয়ের আধুনিক মানসিকতাকে। শুধু সমকালীন যুগ নয়, এক শতাব্দী পরের ভারতবর্ষকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের অচল পাথর সরাতে তাঁর জেদ দুর্বার হয়ে উঠেছিল। মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথরে তিনি যাচাই করে নিয়েছিলেন হৃদয়ের সত্যবোধকে। মৃত্যুর প্রায় একশ বছর পরেও তাই বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করি বাঙালী সমাজের এক বৃহত্তম পুরুষ বলে।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪। টার পর ননী গাঙ্গুলী আসে, বেলি ট্যাক্সীতেআমি রেণু ও সন্তোষ ভট্টাচার্য নারকেলডাঙ্গা যাই। প্রায় ৭ টায় আলোচনা আরম্ভ হয়। পূর্বে ননী ও হীরালাল সেন আমার পূর্ব জীবনের আলোচনা করে। পরে বর্তমান যুগ-সমস্যায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। প্রাণ-সাধনাই ভারতের সাধনা। স্বরাজ লাভের পূর্বে এই সাধনা ছিল অস্পষ্ট। আজ দেশ স্বাধীন। এখন 'প্রাণ'-ই আমাদের সর্বক্ষেত্র পঠনের পথ দেখাইবে। পরাধীনতা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ মনের স্তর ছাড়িয়া প্রাণের স্তরে পাড়ি জমাইয়াছে। উপনিষদের বাক্-মন-প্রাণের স্তর আলোচনা করি। 'মনসোবা অপি', 'ন কামমেহহম্', 'প্রাণের দেব মুনয়ঃ' শ্লোকগুলি ব্যাখ্যা করি। শ্রীকৃষ্ণ কেবল করিয়া সর্বক্ষেত্রে 'ভিন্নদেহঃ' তাহা বলি। সীমানা বিরোধ প্রাণদর্শনে নাই। 'Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life', 'I am a cosmopolitan'। ১-২০ মিনিট বক্তৃতা হয়। ২।১ জন শ্রোতা হইতে পারে।—বরিশাল কনফারেন্সে বক্তৃতার পর অখিল দত্ত মহাশয়ের টেলিগ্রাম পাইয়া যখন কুমিল্লা যাই, তখন কুমিল্লায়-যে পুলিন গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলাম তাহার সঙ্গে নারকেলডাঙ্গায় দেখা হইল। ভাল লাগিল। ৩১ শে মার্চ

সারা জীবন আমি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি—তা ব্যক্তিগত জীবনেই হউক, সামাজিক জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জীবনেই হউক। শোষণ করি না বলিয়া শোষক বা শোষিতও কেহই আমার সঙ্গে যুক্ত হইতে আসে না। যে শোষিত, সে-ও তো অপরকে শোষণ করে। ব্রাহ্মণ নয়-শূদ্রকে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিতে দেয় না, নমঃশূদ্রও মুচিকে তাহার ঠাকুর ঘরে ঢুকিতে দেয় না। দুই-ই শোষক। কে আমার সঙ্গে থাকিবে? আমি একা, একেবারেই একা। একা থাকা ছাড়া আমার গতি নাই। কে আমার কাছে সব ছাড়িয়া আসিবে? সব ব্রাহ্মিরা যদি 'ভক্ত' হওয়া যায়, তবে সব ছাড়িয়া আসার প্রয়োজন কি? কিন্তু সব ব্রাহ্মিরা 'ভক্ত' হওয়া লোভী মানুষের কাছেই চলে, সত্য ভগবানের দরবারে তাহারা অচল। আজি কূল শীল সব ছাড়িয়া গোপীগণ কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন। মঠের ঠাকুর যদি সারা বিশ্বে না থাকেন বন্দী সেই ঠাকুরে আমার দরকার? আমার দেবতা দিব জীবনে। তিনি জীবন-বল্লভ। জীবন দিয়া জীবন-বল্লভকে পাইব—ইহাই আমার সাধনা। আমার সাধনা জীবন দানের সাধনা। রেণু সকালে প্রেসের খোঁজে যায়। ৩ টায় পর বিষ্ণুপদ আসে। ৭।। টায় পর যায়। পাঠের মধ্যে বিমলা আসে। নরেন সাহা (নিত্যানন্দের শিষ্য) পাঠে আসে। সে একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছে, ঠাকুর কিছুতেই জাগিতেছেন না, আমি তাঁহাকে জাগাইতে সাধ্য সাধনা করিতেছি। আমি ছাড়া আর কেহ সেখানে নাই। শ্রীনিত্যগোপাল যে রূপ প্রকৃতি ও দর্শন নিয়া আসিয়াছেন আমার মনে হয় যেন আমাকে তিনি তাহা বুঝাইয়াছেন। আমি যে রূপে তাঁহাকে বুঝিতেছি, ঐ রূপেই তিনি 'জগন্নাথ' বলিয়া পূজিত হইবেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। প্রতিভা রেণুর কাছে চিরঋণী দেয়—১০৲ টাকা ও মিষ্ট পাউচার ১ পাউচ বিষ্ণুপদর কাছে দেওয়া হয়। ৪টায় পাঠ আরম্ভ হয়। সন্তোষ ভট্টাচার্য আসে নাই। নরেনবাবু খুব appreciate করেন। চলিয়া যাইব ইহাতে দুঃখিত। যাই, এক জায়গায় পড়িয়া থাকি গিয়া। নীলু আসিল না। চিত্তর টিউবওয়েলের খবর নাই। টিউবওয়েল না হইলেও যাইব। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ১ লা এপ্রিল ১৯৫৬

শ্রীনিত্যগোপাল সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে slow but steady wins the race। যাহার যতদূর দৌড় তাহা যত ছুটাইবে, শ্রীনিত্যগোপাল তত প্রকট

হইবেন। তিনি তাঁহার দর্শন লিখিয়া চুপ করিয়া কিছু না বলিয়াই সরিয়া পড়িয়াছেন। আমি সেই দর্শনকে ভারতীয় প্রধান সুরের মধ্য দিয়া সাধারণের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি। উহা কি রস প্রকাশ না প্রচার? কিছু কিছু লোক ইহার খবর জানিতেছে। পাঠ করিতেছে। হৈহৈয়ের মধ্য দিয়া এই organic দর্শন ছড়াইয়া পড়িবে না। Nature is sloth বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। হৈ হৈ সব সময়েই বাহিরকে স্পর্শ করে। জীবন বদলাইবার আলোচনা ও দর্শন প্রচার রাতারাতি হয় না ইহা স্থির। দেখি কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। নিতাগোপালকে বুকে লইয়া ধীর স্থির ভাবে চলিব। তাঁহার প্রকাশিত হইবার পথ কেহ রোধ করিতে পারিবে না—ইহা আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি। তিনি যে বিশ্বের vital problem-এর সমাধান আনিয়াছেন। জড় অজড় সদসৎ ও অসদসৎ যে বিশ্বের vital সমাধান। তাঁহার আশীর্বাদে নিমিত্তমাত্র হইয়া আমাকেই এই ভার বহন করিতে হইবে। আর কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার উপর ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, কেহই যে নাই। বেলু ১০ টায় বাহির হইয়া প্রেস, মেট্রোপলিস ব্যাঙ্ক, ট্রাম্বের হেড অফিস, প্রিন্টার্স, ইউনাইটেড প্রেস, পুরাণ প্রেস ও অবাদি প্রেস হইয়া ফেরে প্রায় ৫ টায়। উপেন ধর ৩ টি কলমা নিয়া আসে। বৃহস্পতিবার চাকুরিয়া কালী-বাড়ীতে আমার আলোচনা করা স্থির হয়। ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য আলোচিত হয়। ইহার পর তারিণীবাবু ও চৈতন্য আসে। ঠাকুরের জন্মোৎসব ২রা বৈশাখ হইতে ৯ই বৈশাখ হইবে। শ্রীসুরেশবাবু সভাপতি ও নির্মল সিদ্ধান্ত প্রধান অতিথি হইবেন। কীর্তনাদি হইবে। কাল আমাকে যাইতে বলিল। সন্ধ্যায় মনোরঞ্জন গুপ্ত আসে …। বঙ্গ বিহার মিলন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। আনুপূর্বিক ঘটনা শুনি। সুরেন ঘোষ, জগজীবন রায়, বিধান রায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সর্বশেষ নেহরুর যুক্ত বিবৃতির draft দেখিয়া দেওয়া পর্যন্ত অবগত হই। আমাকে বক্তৃতা দিবার কথা বলে। আমি পূর্বে তাহাদিগকে আসিতে বলি। কংগ্রেসীদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখিবার জন্য তাহাদের মধ্যে পূর্বে আলোচনা প্রয়োজন। ২রা এপ্রিল।

ভগবানকে যতদিন বিশ্বের ওপারে রাখা হইয়াছিল, ততদিন এই বিশ্বকে গুছাইবার কোনও প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক ভাবেই উপলব্ধ হয় নাই। যেন তেন প্রকারে সংসারের কাজ সারিয়া যাওয়ার দিকেই ছিল সকলের সাধনা। তখন সব কিছুকে সঙ্কোচ করিয়া, চিত্ত নিরোধ করিয়া ভগবানের দিকে যাওয়াই ছিল সাধ্য। এই পথে বিশ্ব, বিশ্বের কামনা বাসনা সকল চিত্তবৃত্তি 'ক্ষুধিত পাষাণে' পরিণত হইল, সংসার ছাড়িয়া পালাইবার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। ভগবান তখন অবতরণ করিলেন বিশ্বের ওপার হইতে বিশ্বের বুকে। তখন ভগবৎ সেবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এই সংসারকে সুসংস্কৃত করার তাগিদ বোধ হইল। জীবের চিত্ত-বৃত্তির প্রসারণ হইতে সুরু করিল, সকল সম্পর্ক ভগবৎ-ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। যাহা যোগমায়ার পরিণত হইল। ভগবানকে প্রতি ঘটনায়, প্রতি ঘটনাকে ভগবানের ভাবে ভাবিত করার সাধনায় মানুষ দীক্ষিত হইল। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর ভেদ বিলুপ্ত হইল। বিশ্ব বিশ্বেশ্বরের অবতরণে গলিল, জমিয়া উঠিল পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে, শ্রীক্ষেত্রে। আজ শ্রীক্ষেত্র রচনার সাধনা গ্রহণ করিতে হইবে।· বেলু প্রুফ দেখিয়া ১-টার পর বাণ্ডইআটি যায়। ফেরে ৫-টার পর। রাজেন বিষ্ণু খাটিতেছে…। উহাদিগকে ১-খানা করিয়া কাপড় দেওয়া হইয়াছে। অমরেশ ৪-টায় আসে। ৫-টার পর যায়। বেলুর সঙ্গে বাণ্ডইআটি সম্বন্ধে কথা হয়। বিনোদ ভুঁইয়া সন্ধ্যার পর আসে। কীর্তনের কথা হয়। 'বৈদিক সংস্কৃতিতে বুদ্ধের স্থান' প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। ৩রা এপ্রিল

(ক্রমশঃ)

দূরের আকাশ

আশিসকুমার মাইতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সৈকতের কাছে মাঝে মাঝে দুঃখ করে জীবানন্দবাবু বলেন, এখন সাদা পথে যে কিছুই হচ্ছে না। চাকরী বা ব্যবসাই বা হবে কেন ? ঘুরছিস তো সারা দিনই। কিছু হচ্ছে ? জানি হবে না। একদল লোক এত উঠে যাচ্ছে অন্য দল পেছনে পড়বেই তো। সৈকত বলে, তবু চেষ্টা না করলে চলবে কেন ? তাতো করবি। কিন্তু এ ভাবে চলতে থাকলে আদৌ কিছু করতে পারবি কিনা তাই ভাবি মাঝে মাঝে। সৈকত ভাবে ওর বাবা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন ওর সম্বন্ধে, ওকে বাঁকা পথে চলতে বলছেন !

এর জন্যে অবশ্য জীবানন্দবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ বেকারত্ব ঘুচাতে কত জায়গায় তো যাতায়াত করছে না ও। কিন্তু লাভ কি হচ্ছে ? ব্যবসা করতে গেলে যাদের সাহায্যে দাঁড়াতে হবে তাদের ধারে কাছে পৌঁছাতেই পারছে না। বিজনের কথামতন বাগরী মার্কেট, বড় বাজার, শিয়ালদাতে ঘুরে ঘুরে ক'দিন দেখলো সৈকত। যা দেখলো তাতে কোনও কিছুতে লেগে পড়তে সাহস পাচ্ছে না। যারা ব্যবসায় জাকিয়ে বসেছে তাদের চলাফেরা তো দু নম্বর পথ দিয়ে। অন্যের কথা ভাববার সময় ওদের নেই। কাদের ভরসায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে ও ?

তবুও এ জায়গায় সে জায়গায় ঘুরে বেড়ায় সৈকত বাজারের অবস্থা জানতে। কোনও কিছু তৈরী করার সমস্যা নেই। আসল সমস্যা তৈরী জিনিষের জন্য উপযুক্ত বাজার তৈরী করা।

বিজনেরও দৃষ্টি এখন এই দিকেই। কি জিনিষ তৈরী করবে তা ঠিক করতে পেলেই আগে জানা দরকার ঐ জিনিষ কোথায় বিক্রি হবে। সুতরাং মার্কেট রিসার্চের দিকে বিজনের বেশী ঝোঁক। এজন্য একটা আলাদা সেল তৈরী করেছে বিজন। যে সমস্ত বেকার ছেলেরা আগে আগে তাদের ঐ দিকে নজর দিতে বলে সে।

সৈকত ভাবে বিজনদের সংখ্যাটা যদি একটু বাড়তো তাহ'লে হয়তো একদিন ওদের সমস্যা একটু কমতো। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে এই ধারণাটা ওর মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বিজনরা বাড়ছে না। বরং বলা যায়, ওরা এখন ব্যতিক্রম।

তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে সৈকতকে। চরকির মতো ঘুরছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

সৈকত যাচ্ছিল টালিগঞ্জের দিকে। বি.এল. পা ছোকে ওর এক বন্ধু একটা ছোট ফ্যাক্টরী করেছে। দেখতে যাচ্ছে। দেখাই তো ওর কাজ। দেখতে দেখতে যদি কিছু একটা ঠিক করে ফেলতে পারে। দেখা হোল বন্ধুর সঙ্গে। আপ্যায়িত করলো সৈকতকে। আন্তরিক ভাবেই। কিন্তু কারখানা দেখে সৈকত আশ্চর্য্য হোল। কারখানার নামে একটা মেশিন এক কোণে পড়ে আছে। তাও পুরণো। তাপস বলেছিল, ব্যাংক থেকে টাকা পেয়ে এই ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু কোথায় কারখানা ? এতো একটা সাধারণ ঘর। কোনও যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল না। একটি অল্প বয়স্কা মেয়ে ঘোরাফেরা করছে। কাই করমাস খাটছে। কখনও কখনও দোকানে টোকানে যাচ্ছে এটা ওটা আনতে। ওদের যাইনে দিতে হয় কম। অনেকেই

তাই আজকাল ওদেরই রাখছে টুকটাক কাজকর্ম করতে। মেয়েরাও আজকাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে যা কিছু উপার্জনের আশায়। সংসার চালাতে ওরাও কিছু বাড়তি আয় করতে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে।

সৈকত বললো—তোর ওয়ার্কাররা কোথায়? একটু হাসলো তাপস। বাঁকা হাসি।

এই হাসিটাই একদম সহ্য করতে পারে না সৈকত। কেন বাবা—যদি হাসতে হয় সোজা ভাবে হাসা যায় না? হাসবে অথচ তার প্রকাশ কোনও একটা বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে কেন?

এই নাকি এখনকার নিয়ম। দিলখোলা হাসি হাসে নাকি শুধু এখন বোকারাই।

তাপস এবার বলল, ওয়ার্কার থাকলে তো আসবে?

মানে—

মানে খুব সোজা। কারখানাটা দেখ। আসল ব্যবসা অন্য।

কী ব্যবসা তাহলে করছিস?

মাছের।

কারখানা করবি বলে টাকা এনে করছিস মাছের ব্যবসা?

হাঁ ভাই—তাছাড়া উপায় কী? সোজা পথে তো কেউ টাকা দেবে না। তাই ওটা দেখিয়ে টাকা বের করে যে ব্যবসা চলে সেই ব্যবসায় নেমেছি। হাওড়ায় আসে নানা জায়গা থেকে মাছ। ফড়িয়ারা ঐ মাছ দরদাম করার সময় কিছু এদিক ওদিক করে। তুলিয়াও হাতায়। আর জলের দামে ঐ মাছ কিনে চালান দিই এ বাজার ও বাজারে। ব্যাংকের লোকের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে নিয়েছি। এলেই হাতে কিছু গুঁজে দিই। ওরাও খুশী মনে চলে যায়। যে যায় 'অংশটুকু' পেলে আর কে ঘাটাতে চায় অন্যকে?

তাই বলে চোরাই মাল বাজারে চালাবি? আলতো ভাবে কথাটা বলে সৈকত।

—এখন সকলেই চুরি করছে বন্ধু। যে করতে পারবে না সে 'রেস' থেকে পিছিয়ে পড়বে।

পিছিয়েই তো পড়ছে সৈকতরা। ফিরতি পথে ট্রামে বসে ভাবছিল সৈকত এবার ও কোথায় যাবে? আজ আবার বড় বাজার গেলে কেমন হয়। ওখানে ওদের পাড়ার অন্য একটি ছেলে ফিফিল বিক্রি করার জন্যে ছোট্ট একটা দোকান নিয়েছে।

সেই দিকেই পা বাড়াল সৈকত ট্রাম থেকে নেমে। গিয়ে দেখলো সোমনাথ দোকানে নেই, একজন কর্মচারী রয়েছে। বলল, সোমনাথবাবু বাদবপুর গেছেন কিছু মাল ডেলিভারী দিতে। আপনি বসুন। দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।

ফিরে এলো সোমনাথ। সৈকত বললো, কেমন চলছে তোর ব্যবসা?

চলছে না ভাই, ভাবছি ব্যবসা তুলে দেব।

কেন?

ব্যাংকে টাকার জন্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। সেও কম দেখালাম, কারখানা দেখালাম, ওভারহেড খরচা খুব কম। বলে, বাড়ী বাঁধা দিন।

আরে, বাড়ীই যদি বাঁধা দিতে পারবো তাহলে আর ব্যাংকে আসবো কেন? পারসোনাল লোন খেটেই তো তাহ'লে টাকা জোগাড় করতে পারতাম। আসলে টাকা না দেওয়ার একটা অজুহাত। ওরা টাকা দেবে তাদেরই যাদের টাকা আছে। তাহ'লে আমাদের মতো যুবকদের ডেকে এনে এ রকম হয়রানি করা কেন?

সৈকত যুবল ওর অনেক অভিযোগ ব্যাংকের বিরুদ্ধে। সৈকত বলল, এদিকেই এসেছিলাম। দেখে গেলাম তার দোকানটা।

—আসিস মাঝে মাঝে। তুই কিছু ঠিক করলি?

—না। এখনও কিছু ঠিক করতে পারছি না। মার্কেট স্টাডি করছি।

—মার্কেট আছে ভাই সমস্ত কিছুরই, দরকার শুধু একটু 'টিপসের'।

—সেইটারই তো অভাব। পকেট যে একেবারে গড়ের

হয়।

—আমি তোকে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। ঐ খানে যা। ভদ্রলোকের কয়েকটা ফ্যাক্টরী আছে। হোলসেল ব্যবসাও আছে। তবলাম ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসটাও শুরু করবে। আমার নাম বলে দেখা করবি। ব্যবসা ট্যাবসা সম্বন্ধে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারবি।

সৈকত দেখলো, বৈজিনাথবাবু ব্যস্তভাবে চার পাঁচটা টেলিফোন নিয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। কখনও এটা কখনও ওটা। কাউকে বলছে কিছু ভাববেন না, সময় মতই আপনার জিনিষ পৌঁছে যাবে। কাউকে বলছে, ট্রেকটা ভাঙ্গাতে লোক পাঠিয়েছি। এলেই আপনার বিলটা তৈরী করে পাঠিয়ে দেবো। কিছু দেরী হোল। তা কী করব বলুন। কত দিক সামলাই। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—আরও একটু জোরে বলুন। শুনতে পাচ্ছি না। অপর দিক থেকে চড়া সুরের আওয়াজ পেয়ে মুখটা পাংশু হল বৈজিনাথবাবুর। কী বললেন, পুলিশ টের পেয়ে গেছে। তাতে হয়েছে কি?

এবার কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বললো, এতো ভয় পেলে ব্যবসা চালাবেন কী করে? অবশ্য যতই জটিল হউক তাকে সামাল দেবার ব্যবস্থা করুন। নইলে মাসে মাসে এত টাকা দিয়ে আপনাকে পুষছি কেন? আমার পক্ষে কী সমস্ত দিক সামলানো সম্ভব? অপর পক্ষ থেকে যা বললো তাতে মনে হচ্ছে বৈজিনাথবাবুর নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। স্বরটা একটু নামিয়ে এনে বৈজিনাথবাবু বলল, যা লাগে লাগুক। ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলুন। দরকার হোলে মাল সরিয়ে ফেলুন।

সৈকত দোকানের এক কোণে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। হঠাৎ একটা ঘটনা ওর মনে পড়ল। ঘটনাটা শুনেছিল রঞ্জত চক্রবর্তীর কাছে।

রঞ্জত একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করত মোহাটীতে। সেবার সেখানে চালের ভয়ানক অভাব চলছিল। বাজারে চাল নেই। দাম চড়ছে। চড়তে চড়তে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যখন সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। লোকে চালের বদলে অন্য কিছু দিয়ে পেট ভরাতে শুরু করে। চাল বাজারে পাওয়াই দুষ্কর। লোকেরা ভেবে পায় না হঠাৎ চাল এত দুর্মূল্য হল কেন?

ক'দিন ধরে একটানা বৃষ্টি শুরু হোল। মোহাটীর এক ব্যবসায়ী চাল কিনে কোনও এক গ্রামাঞ্চলে সরিয়ে ফেলেছিল। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে বেশী দামে বিক্রি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু বাধ সাধল ঐ একটানা বৃষ্টি।

এমন ধারা বৃষ্টি কেউ খোঁজ নিতে পারলে না ঐ চালের গুদামের। গুদামটা ছিল টিনের। তাই যা হবার তাই হোল। সমস্ত চালে জলের ধারটে পচন ধরল। বস্তার উপর বস্তায় সে কী ছাল? কীভাবে যেন পুলিশ ঐ গুদামের সন্ধান পায়। কিছু বস্তায় চাল তখনও কিছুটা অক্ষত ছিল। গুদাম ভেঙ্গে চাল বের করে জনসাধারণের মধ্যে কম দামে সরকার ঐ চাল বিক্রি করল। সেই চাল কেনার জন্যে মোহাটীর লোকেরা সরকারী অফিসে ভেঙ্গে পড়ল। যে ব্যবসায়ী চাল মজুত করেছিল সে অবস্থার গুরুত্ব বুঝে আর ঐ মালের মালিকানা স্বত্ব জানালো না। জানিয়ে আবার ফ্যাসাদে পড়বে নাকি? ওদের তো আর ওরকম একটা পুটো গুদাম নয়।

এমনি অনেক ঘটনাই সময়ে অসময়ে সৈকতের মনে হানা দেয়। এই চিন্তাগুলোর শিকার না হোয়ে উপায়ই বা কী?

এই মুলটাই শুধু ঘুরে ফেরা ঘটনার প্রবাহ। এ প্রবাহ থেকে ছিটকে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় শেষ পর্যন্ত তো শুকনো চড়াতেই ঠাঁই নিয়ে এসেছে ও এতকাল। আজই তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

একটা অদ্ভুত জিনিষ লক্ষ্য করছে সৈকত কিছুদিন ধরে। যখনই কোথায় গেছে সেই জায়গার ঘটনার বৈচিত্র্য ও আকস্মিকতায় ও নিজের সমস্যা ভুলে গিয়ে কেমন যেন একটা অসহায়তার আবরণে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ভুলে গেছে কেন এসেছিল এখানে আর কেনই বা অযথা এতটা দেরী করলো। কাজটুকু হোল না

বলে একটু খুঁত খুঁতি থাকলেও নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেনি। একটা চিন্তা থেকে অন্য একটা চিন্তার জালে আটকে গেছে।

ইচ্ছে না থাকলেও ওকে যেতে হয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। কখনও নিজের দরকারে, কখনো অন্যের দরকারে। কখন কাকে দিয়ে কী হয় কে বলতে পারে? তাই কাউকে হাতছাড়া করতে চায় না সৈকত।

যায় সেলসট্যাক্স অফিসে, টিকেট কাটতে হাওড়া কিংবা এসপ্ল্যানেডে; কখনও কখন হাসপাতালে কিংবা মাদিং হোমে। কখনও বা খেলার মাঠে অথবা সিনেমার বুকিং অফিসের সামনেও ওকে দাঁড়াতে হয় কারও জন্যে টিকেট কাটতে। রেশন অফিস, ব্যাংক, পোস্টাফিসেও তাকে মাঝে মাঝে উঁকি দিতে হয় কারও অনুরোধে ক্রমে। বিচিত্র ঘটনাও তাই তার নিত্য সঙ্গী। বহু ঘটনাই বিল-বিল করে ওকে ক্লান্ত ও বিব্রত করে।

একটু বাদেই বৈজিনাথের দোকানে এলেন এক ভদ্র লোক। তাকে দেখে মোটেই খুশী মনে হোল না বৈজিনাথকে। বৈজিনাথের দোকানের উপর তলায় ওর অফিস ঘর। অফিস ঘরে খুব কম সময়ই বৈজিনাথ থাকে। কারণ ওখানে বিভিন্ন ধরণের কাজ কর্মের হিসেব পত্র লিখতে ব্যস্ত তার অফিসের লোকেরা। অনেক ব্যবসাই তো তার চলে নানা গুপ্ত পথ ধরে। সুতরাং একটু প্রাইভেসী দরকার।

বৈজিনাথ বললো, মজুমদার সাহেবের আবার কী প্রোডের দেখা দিল?

আগড়পাড়ার দু নম্বর ক্যাইরীতে মজুরদা তুমুল ঝামেলা করছে।

মজুমদার ঐ কারখানার ম্যানেজার। যখন কোনও সাংঘাতিক রকমের ঝামেলা দেখা দেয় তখন তিনি স্বয়ং বৈজিনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তার কাছ থেকে পরোয়ানা নিয়ে নতুন উদ্যমে মজুরদের সমস্যার মোকাবিলা করেন।

মজুমদার বললেন, ওয়ার্কারদের দাবী মাছের টুকরো আরও বড় করতে হবে। চালের কোয়ালিটি আরও ভাল চাই।

বৈজিনাথ বললো—মুখকে বলুন রান্নায় কোয়ালিটি আরও বাজে করতে। দেখবেন ওদের দাবীও ঐ সঙ্গে কমে আসবে। রান্নার মান যত বাজে হবে ওদের দাবীও তত কমে আসবে।

অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো বৈজিনাথ।

ইচ্ছে করেই সৈকত সোমনাথের রেফারেন্স দিয়ে বৈজিনাথের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করল না। ভাবলো, অন্য আর একদিন একটু সকাল সকাল চলে আসবে। যেদিন বৈজিনাথের সামনে অন্য ব্যক্তিগত সমস্যা থাকবে না সেই দিনই আলোচনা করবে ব্যবসা সম্বন্ধে। কিন্তু সে মুহূর্তও কী পাবে বৈজিনাথ?

ওরা যে ব্যবসায়ী। টাকার গদিতে শুয়ে থাকলেও সেই শয্যা অনেক সময়ই ওদের কাছে কণ্টক শয্যা। তবুও ওরা হটবে না। আর সৈকতরাও ঠাঁকা জায়গার সন্ধানে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে ফেলবে। তবুও এতটুকু জায়গাও মিলবে না ওদের। বহুদিন ধরেই চলছে ও চলবে ওদের মধ্যে এই কোল্ড ওয়ার যার ফলে আকাশের নীল রংটাই শুধু পাল্টাচ্ছে। যতদিন আকাশে ঝড় না উঠবে ততদিন তো শুধু একটু একটু করে রং বদলের পালাই চলতে থাকবে। আরও কতদিন এমনি চলবে কে জানে?

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সৈকত। পাঁচটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে সিধে শিয়ালদার দিকে পা চালালে। আজ আর শর্টকাট নয়। শর্টকাট করতে গেলে এত ঘিকি এড়িয়া হয়ে যেতে হয় তাতে আরও বেশী ঝামেলা। এক পা এগোলে দুপা পিছিয়ে আসতে হয়। মহাত্মা গান্ধী রোডের লোকের মিছিলে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এক পা দু পা করে এগিয়ে যেতে একটু রোমাঞ্চ ভাব আছে। শর্টকাটে বড় এলো-পাথারি ভাবে লোকে পথ চলে। তার চেয়ে ঢের ভালো ঐ জনসমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া। আস্তে আস্তে তালে তালে তাল মিলিয়ে পা চালিয়ে গেলেই অতি সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় আপন গন্তব্য স্থলে। করলও সৈকত তাই।

হঠাৎ পেছন থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে সৈকত তাকালো আলতো ভাবে।

দেখলো, হাসি মুখে পাশে দাঁড়িয়ে বৈশাখী।

(ক্রমশঃ)

শিশু জগৎ

উনআশি •

অসীমা গাঙ্গুলী

আকাশের কোণে ওই হাসি মুখে দেখা দেয়
রবি মামা হাসি দিয়ে ডাকে সবে ইশারায়,
চলে এসো খোকা খুকু চলে এসো ভাইবোন।
ঘরে কেনো বসে সবে মনে রেখ জানিয়ে।
আলোকের ঝরণায় কোরো স্নান সব।
তোমাদের হাসি দিয়ে সুরু হবে উৎসব।
দুনিয়ার কোণে কোণে যারা কিছু জানবার।
এনেছে যে "উনআশি" তরে দিয়ে খুলি তার।
ঘুরো ঘুরো নিয়ে যাও খুশি, হাসি গল্প।
তাড়াতাড়ি চলে এসো সময় যে অল্প।

বোকারাম

গৌতম সাহা (বয়স ৮ বৎসর)

এক যে ছিল বোকারাম
জানতো না সে নিজের নাম।
দই ভেবে সে খেত চুন,
চিনি ভেবে সে খেত নুন।

• বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ উপলক্ষে

জেনে রাখা ভাল

রতন রায়

• সাপ বিষয়ে তোমাদের অনেকেরই খুব ভুল ধারণা আছে। যেমন—সাপ সংগীত-প্রিয়, সংগীত শুনতে পায়, যে কারণে সাপুড়ে যখন ঝুলে ঝুলে তার বাঁশীটি বাজায়, সাপও ঝুলে ঝুলে নাচে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। সাপের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। বাঁশীর কোন একটি অংশকে object ভেবে সে তার দৃষ্টিকে সতর্ক রাখে। তাই সাপুড়ে বাঁশী বাজাবার তালে তালে নড়াচড়া করলেই সেও ঝুলে ঝুলে নাচে।

সাপ বধির। কান বলে তার কোন পদার্থ নেই। তবে তার চামড়ায় (membrane) কোন কিছুর লঘু এক ধরণের কম্পনের সৃষ্টি করে। যে কারণে সাপ নড়াচড়া করে।

•• দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের নাম র‍্যাটল। এই সাপ চলাফেরা করলে ঝুনঝুন করে আওয়াজ হয়। তখন অন্যান্য প্রাণী সতর্ক হয়ে পড়ে। এই সাপ কামড়ানোর কয়েক মিনিটের মধ্যে পঞ্চর মত বড় প্রাণীও মারা যায়।

••• কোকিলের ডাক শুধু বসন্তকালে শোনা যায়। তোমরা ভাবো কোকিল বসন্তকালে অন্য কোথা হতে বাঙলাদেশে আসে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। কোকিল বারো মাসই বাঙলাদেশে বাস করে। আসলে সে শুধু বসন্তকালেই ডাকে।

পাহাড়ে ভ্রমণ

অংশুমান মিত্র (৯ বৎসর বয়স)

পূজার ছুটিতে—১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে—আমরা খুব আনন্দ করে আলমোড়া, রাণীখেত, কৌসানী ও নৈনীতাল ঘুরে এসেছি। বেড়ানোটা খুব ভাল লেগেছে কারণ ওখান থেকে উঁচু হিমালয়ের যে চূড়া দেখেছি, সেগুলো আগে আর কখনও দেখি নি।

আলমোড়া শহরটা বেশ ছোটো, ওখানে আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক হেঁটে বেড়িয়েছি। ওর চারদিকে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় আছে আর অনেক দূরে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। অনেকদিন আগে আলমোড়ায় যে বাড়ীতে উদয়শঙ্কর থাকতেন, সেই বাড়ী-টা দেখতে একদিন আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে তাঁর কোন জিনিষ এখন নেই, কিন্তু পরে ওখানে একটি মেলায় তাঁর ব্যবহার করা বিছানা এক প্রদর্শনে দেখলাম। ওখানে বাসে করে অনেক ঘুরেছি। রাস্তার এক পাশে উঁচু পাহাড়, অন্য পাশে খাদ। ওখানে পাহাড়ে খাঁজ কেটে চাষ করা হয়েছে, অনেক লম্বা গাছের জঙ্গল আছে, নানা রকম সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাড়ি। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝরণা নেমে এসেছে। মাঝে মাঝেই নদী দেখা যায়—কোথাও সরু, কোথাও চওড়া। চারদিকটা ছবির মত লাগে দেখতে।

রাণীখেত শহরটা বেশ সুন্দর ও সাজানো। অনেক মিলিটারী ক্যাম্প দেখা যায়। ওখানে আমরা চৌগাড়িয়া বলে একটি বাগানে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক পাহাড়ী ফলের গাছ আছে।

কৌসানী খুব নির্জন জায়গা। ওখান থেকে হিমালয়ের বরফে ঢাকা অনেক চূড়া দেখা যায়—নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, নন্দা দেবী, পিণ্ডারী-গ্লেসিয়ার, নন্দাকোট ইত্যাদি।

এই সব জায়গা ঘুরে আমরা গিয়েছিলাম নৈনিতালে। উঁচু পাহাড়ের মাঝে একটি বড় লেকের চারপাশ ঘিরে নৈনিতাল শহর। এই শহরটি বেশ বড়, অনেক দোকান আছে। ওখানে ঘোড়ায় চড়বার ব্যবস্থা ও লেকে নৌকা চড়বার ব্যবস্থা আছে। আমার এই ছুটো খুব ভাল লেগেছে। দুদিন নৈনিতাল কাটিয়ে লখনৌ হয়ে ফিরে এলাম।

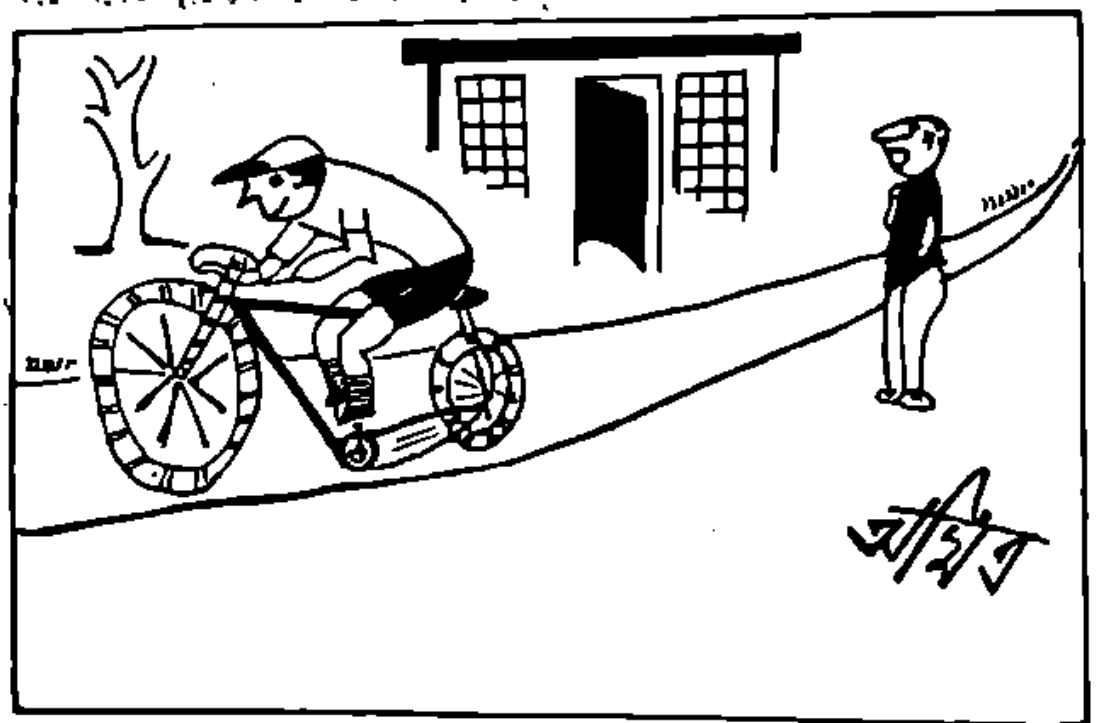

"কোথায় যাচ্ছিস রে পটলা?" "চাঁদে যাচ্ছি।"

নারী জগৎ

মহীয়সী বঙ্গনারী

বীণা দাস

হেনা চৌধুরী

কোন কিছু পেতে গেলে পাগল হয়ে উঠতে হয়, স্বাধীনতার জন্যও আমাদের তেমনি পাগল হয়ে উঠতে হবে, এ সম্পর্কে পথটা বড় কথা নয় বীণা দাসকে একদিন একথা বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র ওঁর বাবা বেণীমাধব দাসের পুত্র-প্রতিম ছাত্র, তিনি জাগিয়েছিলেন কিশোর সুভাষচন্দ্রের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতি, জাগিয়েছিলেন স্বদেশপ্রেম—সেই একই আদর্শের ছায়ায় বড় হয়েছেন সুভাষচন্দ্র ও বীণা দাস। বেণীমাধব দাস সুভাষচন্দ্রের গুরু বা শিক্ষক আর বীণা দাসের বাবা ছেলেবেলায় মেঝেকে পড়ে শোনাতেন—নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ, হেমচন্দ্রের ভারতসংগীত। ছোট্ট মেয়ে বীণা মুগ্ধ হয়ে যেতেন, ভাবতেন দেশের কথা। তারপর পড়েছেন, 'নির্বাসিতের আত্মকথা' 'বাংলার বিপ্লববাদ'। এ সমস্ত বই, বিপ্লবীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী ওঁকে অভিভূত করত।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন "আচ্ছা বাবা, ওরা হলই বা হিংসাপন্থী, ওদের বীরত্বের কথা শুনতে তোমার মনে গর্ব হয় না?"

বাবা চুপ করে থাকতেন। হয়তো বা বুঝতেন এ মেয়ের জীবনের পথ গতানুগতিক ধারায় চলবে না।

এদিকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে দেশ। এ আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন ওঁর দাদা নির্মল দাস।

ছোট্ট মেয়ে দিদি কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে দিদি, অসহযোগ আন্দোলন কিরে?

অসহযোগ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এ সংগ্রামের জনক মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজী বলেছেন তোমরা সবাই চরকা কেটে নিজেরাই নিজেদের কাপড় তৈরী কর, তাহলে আর বিলিতি কাপড় পরতে হবে না।

ঠিকই বলেছেন যে! শুরু করলেন চরকা কাটা। একবার রসা রোডের দেশবন্ধুর বাড়ীতে গান্ধীজী এসেছেন, বীণা গেলেন দিদিকে সঙ্গে করে, খুব সখ একবার গান্ধীজীকে দেখবার।

বীণা চরকা কাটেন শুনে খুব খুশী হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজীর ভাণ্ডারে দিয়ে দিলেন হাতের সোনার বালা। এমনি করে দিন কাটে।

আর সব সময় দেখেন স্বাধীনতার স্বপ্নে পাগল যুবদেবের মত এক সুন্দর যুবককে—তিনি সুভাষচন্দ্র।

ছাত্র হলেই সুভাষচন্দ্র আসতেন মাষ্টারমশাইয়ের স্নেহ-

আসায়। বীণা তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাগল করে তুলতেন। বাবা বলতেন, ও বেচারা ক্লান্ত হয়ে আমার কাছে আসে একটু জুড়াবার জন্য, কিন্তু তোর জন্য তা হবার উপায় নেই। কিন্তু কি করবেন তিনি, মনে যে অনেক প্রশ্নের ভীড়। একদিকে বিপ্লববাদ, আর একদিকে গান্ধী-বাদ। বেছে নেবেন কোন্ পথ? সুভাষচন্দ্র তো দেশের জন্য পাগল হয়েই বেরিয়েছেন, পথের তো নির্দেশ দিলেন না।

রাজনীতির পথ অন্ধেরই যষ্টির পথ নয়, তাই এখানে ঠিক গুরুবাদের স্থান নেই।

নিজের অন্তরের নির্দেশই সবচেয়ে বড় নির্দেশ।

১৯২৮ সালে এলো সাইমন কমিশন, বীণা তখন বেথুন কলেজের আই. এ. ক্লাস-এর ছাত্রী। সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য ওরা ধর্মঘট করলেন। ক্ষেপে গেলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। বীণা দাসের বাড়ীতে এ ব্যাপারে ছোট্ট চিঠি বসে।

বাবা খবর দিলেন সুভাষকে, যদি ওদের একটা পথ বাৎলে দিতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র এসে বেদে বললেন—এই ব্যাপার।

ঠিক আছে তোমরা সব কলেজ ছেড়ে যাও, সরকারী কলেজে আর যেও না, তবেই তো মিটে গেল।

বীণা উত্তর দিলেন কলেজ ছাড়তে রাজী-আছি যদি আপনি আমাদের পড়ান।

আমি? আমি বলে রাজকিয়ে যাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে বসে আছি।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই বসল কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন, সভাপতি মতিলাল নেহরু।

জি. ও সি. সুভাষচন্দ্র পরে তুললেন বিখ্যাত সামরিক বাহিনী, নারী ও পুরুষের। তাঁরা অভিবাদন জানালেন সভাপতি মতিলাল নেহরুকে।

বীণা দাস সে বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিকা, ব্যাণ্ডের তালে তালে পা মিলিয়ে চলেছেন। তবুও মনে মনে একটু হিংসা হচ্ছে অধারোহী বাহিনীকে, মন বলছে সুভাষবাবু যদি আমাদের এই রকম চড়তে দিতেন! বাড়ীর সবাই ঠাট্টা করে বলতেন—যুদ্ধে যাচ্ছেন সব—চলে নেই তরোয়াল নেই নিখিরাম সর্দার। এ ঠাট্টায় চটে উঠতেন বীণা। বলতেন, দেখে নিও, সুভাষবাবু একদিন সত্যিকারের যুদ্ধ করবেনই করবেন।

ছোটবেলা থেকেই বীণা ছিলেন তেজস্বী ও নির্ভীক। এবারে স্কুলে ইন্‌সপেক্টর এলেন। কে যেন তাঁকে বললেন ওর পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম কর। ছোট মেয়ে বীণা দৃপ্ত ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, তা আমি করব না। কারণ ফুল তো শুধুমাত্র দেবতার চরণেই নিবেদন করা যায়।

১৯৩০-৩৪ সাল। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের স্বর্ণ যুগ। হিজলী বন্দীশালায় নিরপরাধ বন্দীদের গুলী করা হোল। এত অন্যায়ের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াল দেশের মানুষ। বর্বরতার নায়ক স্টানলী জ্যাকসনের নাম মানবতার ইতিহাসে একটি ঘৃণিত নজীর সৃষ্টি করল। ১৯৩২ সাল, বীণা দাস বি. এ. পাশ করলেন ডায়সেসন কলেজ থেকে। ওঁদের সমাবর্তনে সভাপতিরূপে আসছেন জ্যাকসন সাহেব। মনে মনে ভাবলেন এই স্বর্ণ সুযোগ। কিন্তু কে দেবে রিভলবার? উপায়ান্তর না দেখে গিয়ে গিয়ে ধরলেন দিদির বন্ধু কমলা দাশগুপ্তকে। জোগাড় হল রিভলভার। আগের দিন রাত্রে তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে এলেন কলেজ-হোষ্টেলে। কারণ মনে মনে ভাল করেই জানেন যে কাজ করতে চলেছেন তার পরিণাম কি। ঘটনার আগের দিন। সারারাত জেগে কাটালেন। কমরেট বান্ধবীকে বললেন ভাল ভাল শাড়ী গায়ে পা না ভাই।

তখনকার দিনে সমাবর্তন উৎসব বর্জন করাই রীতি ছিল। তাই বীণা সমাবর্তনে যাচ্ছেন শুনে একটু অবাক হলো বান্ধবীরা। সমাবর্তনে নামপত্র দেবার পর ষ্টানলী তাঁর ভাষণ পড়ছেন হঠাৎ গর্জে উঠলো রিভলভার। কম্পে সংগে ষ্টানলী আত্মরক্ষার জন্য আসন গ্রহণ করলেন।

সবাই বিস্ময়ে হতবাক! কে এই অগ্নি-প্রতিজ্ঞাভিত অনন্ত যাদব?

আদালত লোকে লোকারণ্য।

বিচারপতির প্রশ্ন : আপনিই কি সেনেট হাউসে বীণা দাস ?

হাঁ।

কে দিয়েছে রিভলভার ?

বলব না।

মেয়ের কাছে ছেলে নিয়ে তখন পড়ল পিতা বেণীমাধব দাসের।

ব্রাহ্ম ও সত্যের পূজারী বেণীমাধব দাস মেয়েকে বললেন, যা করেছ মা তার দায়িত্ব নিজে নিও। আর কাউকে যেন কোন ক্ষতি স্পর্শ না করে।

আত্মবিশ্বাসী মেয়ে রোষদৃপ্ত ভঙ্গীতে পুলিসের লোকেদের বললেন, শুধু শুধু আপনারা বাবাকে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন বলুন তো ? বাবা তাঁর মেয়েকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শেখান নি। আসামীর এ জবানীতে ঘৃণ্য হয়ে যায় বিচারকমণ্ডলী।

ওদিকে পিতা হাত ধরে চলেন মেয়ের জবানী। এক দেশবন্ধু-রচিত অরবিন্দের জবানী ছাড়া বিশ্বের আইনের ইতিহাসে এমন অপূর্ব ও সুন্দর বিবরণ জবানী রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

I confess I fired on the Government on the convocation day at Senate Hall. I hold myself responsible for it. My object is to die nobly fighting against the despotic system of the Government which has kept 300 million of my countrymen in perpetual subjection to its infinite state and endless sufferings. Now I stand alone before the judgement of God and offer myself before Him and pray for his all forgiving love to wash me clean so that I may be worth of suffering to him. May God fulfil himself through my death.

এ অমর উক্তির অনুবাদ হয় না। অল্প শুনে রায় দিলেন আসামী বীণা দাসের ৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

যৌবনের অধিক মেয়ে হারিয়ে বহু করে নিলেন সে কারাদণ্ড।

প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেল—সেখান থেকে বদলী করা হোল হিজলী জেলে। কিন্তু না, তাতেও ওঁরা আশ্বস্ত নন তাই মনে মনে সঙ্কল্প করলেন ওদের আন্দামান কলোনীতে পাঠাবার। এ সংবাদ শুনে পরম বিচলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন লাট বাহাদুরকে। শুধু একটি অনুরোধ এই অল্পবয়সী মেয়েদের যেন আন্দামানে চালান দেওয়া না হয়।

একদিন গান্ধীজী এলেন কারাগারে বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বললেন, বীণা, তুমি জেল থেকে বেরিয়ে আশ্রমে এস আমরা পরস্পরকে জেনে নেব।

বীণা পরম শ্রদ্ধাভরে তাকিয়ে রইলেন গান্ধীজীর প্রশান্ত মুখের দিকে। তারপর বললেন, তা কেমন করে হয়। আমার পথে কি আপনি আসবেন !

১৯৩৯ সাল—সমগ্র বিশ্বজোড়ে মহাযুদ্ধ বাধল। সেই বছরই মুক্তি পেলেন বিপ্লবী বীণাদাস—তারপর কংগ্রেসে যোগদান। জীবন বয়ে চলল অন্যখাতে।

DE ENGINEERING WORKS

Mechanical, Electrical Engineers & General Order Suppliers.

2/3, Lakshmi Narayan Chakrabarty Lane, HOWRAH-1

Factory No.1—2/3 Lakshmi Narayan Chakrabarty Lane, HOWRAH-711101

Factory No.2—Ichapur Road, Sealdanga. P. O. Santragachi HOWRAH-711104

Manufacturers of High Lamp, Paper Base, Cloth Base, Fiber & Bakelite etc.

&

Mechanical Engineers & Specialist of Special Steel Balls.

সঙ্গীত জগৎ

ধ্রুপদশিল্পী যদুনাথ রায়

১৮২০?—১৯১০?

আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়

সংগীত-জগতের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন এক এক সময় আবির্ভূত হ'য়ে, মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দিয়ে কি করে যে হারিয়ে যায় সে কথা ভাবলে আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয়। যদুনাথ রায় ছিলেন এমনি একটি অমূল্য রত্ন। সুরের সন্ধানে তিনি ঘর ছেড়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের পরিত্যাগ করে, বেশ ছেড়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন ভারতের দিক দিগন্তে। কিন্তু আজকের উচ্চাংগ-সংগীত-জগতের অনেক বাঙালী ওস্তাদরা তাঁর কোন খোঁজ খবর রাখেন না। এমন কি তাঁর নামটা পর্যন্ত অনেক ওস্তাদরাই শোনেন নি।

অথচ সেই যদুনাথ রায় ছিলেন এই পশ্চিম বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র উত্তর কোলকাতার ছেলে। তাঁর জন্মের সঠিক সাল তারিখ পাওয়া যায় না। আন্দাজে ঠিক করা হয়েছে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও এক সময় তাঁর জন্ম হয়েছিল এই কোলকাতা মহানগরীতে। ছেলেবেলার জীবনের ঘটনা তাঁর কোনরকমেই জানা যায় নি। শুধু শোনা গেছে, ছেলেবেলা থেকে তাঁর রাগ রাগিণীর ওপর একটা আন্তরিক টান এসে গিয়েছিল। কোলকাতাতে থাকতেই তিনি বড় বড় সংগীতের আসরে উচ্চাংগ সংগীত শুনতে যেতেন। আর তারই ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সুরের ওপর এসেছিল তাঁর অসীম অনুরাগ। আর সেই অনুরাগই তাঁকে ষোলো বছর বয়সে করেছিল ঘরছাড়া।

চোখের সামনে থেকে যে চ'লে যায়, তার কথা আর কে মনে রাখে। তাই গৃহছাড়া যদুনাথের কথা একদিন সবাই ভুলে গেল। কেউ একবার ভাবলো না, সে কিসের টানে, কিসের সন্ধানে কোথায় গেল? সবাই জানলো সে পলাতক। ঘর ছেড়ে বখাটে ছেলে পালিয়েছে।

সেই ঘরছাড়া সংগীতরাগ সহায় সম্বলহীন যদুনাথ কি করে সুরের স্রোতের টানে খড় কুটোর মত ভাসতে ভাসতে একদিন ভগবানের অসীম অনুগ্রহে পেয়েছিলেন তাঁর মনের মত শিক্ষাগুরুকে, সে কথা এখনও অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যাবে যে কী অপরিসীম দুঃখ কষ্টের ভার বয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনের উপর দিয়ে। এমন দিনও গেছে, যেদিন কোথাও আশ্রয় পান নি, জোটেনি আহারের অন্ন, বাস করেছেন পথে ঘাটে গাছতলায়। কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করেছেন তিনি কত জনের কাছে। তারপর একদিন অবর্ণনীয় দুঃখ-নিশির অবসান হ'য়ে তাঁর জীবনে এসেছিল আলোর ঐশ্বর্য। তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষা-গুরু ভারতবিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ মুরাদ আলি খাঁকে।

সেই সময়ে পাঞ্জাবের তিলমণ্ডী ঘরানার ওস্তাদ হিসেবে মুরাদ আলি খাঁ সাহেবের নাম দারুণ ছড়িয়ে পড়েছিল। কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না থাকলেও সংগীত-সমাজের হাজার গল্পের নায়ক তানসেনের জীবনের সংগে মিশে আছে দুটো রাগ। আমরা শুনেছি 'মল্লার' গাইলে নীল আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে গিয়ে বৃষ্টি নামে পৃথিবীর বুকে প্রবল বেগে। আবার 'দীপক' গাইলে জ্বলে ওঠে সর্বগ্রাসী আগুন। তানসেনের মৃত্যুর সংগে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে এই দুটি রাগ। এই দুটি রাগ গাইবার শেষ অধিকারী ছিলেন মুরাদ আলি খাঁ। সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বড় বড় জলসায়, নবাবের দরবারে কখনও বা রাজা মহারাজাদের কাছ থেকে মুরাদ আলি খাঁ সাহেবের ডাক আসতো গান শোনাবার জন্যে। তাঁর সংগে থাকতেন সব সময়েই তাঁর একমাত্র বাঙালী ছাত্র যদুনাথ রায়। এমনি ভাবে ওস্তাদের সংগে আসরের পর আসর পর্যটন করতে করতে যদুনাথ একদিন এসে পৌঁছলেন বাংলাদেশের ছোট্ট মুলুকের নবাব ওয়াজেদ আলির বহু বিখ্যাত দরবারে।

যে সুরের অনুসন্ধানে যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একদিন ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, সেই সুরই আবার তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিল মাতৃভূমির কোলে। কিন্তু তখন তিনি একজন রীতিমত আর্টিস্টে হয়েছিলেন রূপান্তরিত। ওস্তাদের সংগে তখন তিনি শুধু তানপুরাই বাজাচ্ছেন না, গানও গাইছেন রীতিমত ভাবে। তাঁর গান বহু গুণীজনের সমাদর পাচ্ছে। আর তারই ফলে যাবার একদিন তাঁকে দেশ ছেড়ে যেতে হল। ডাক এলো তাঁর মহুরভঞ্জ থেকে। কোলকাতার কোন এক জলসায় যদুনাথ রায়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যের রাজধানী বারিপদায়। ময়ূরভঞ্জ হচ্ছে উড়িষ্যায়। আর ময়ূরভঞ্জের রাজধানীর নাম হচ্ছে বারিপদা। এই বারিপদায় রাজ দরবারে তিনি সভা-গায়ক হ'য়ে সুরে সুরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন সবার মন। রাজা তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দান করেছিলেন প্রচুর নিষ্কর ভূসম্পত্তি। একদিনের সর্বহারা যদুনাথ অক্লান্ত সাধনা আর অর্থনীর মূল্য স্বরূপ শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু সম্পদ। যে সুরের ঐশ্বর্য ছিল তাঁর কণ্ঠে, সীমাহীন চেষ্টা, গুরুর শিক্ষা আর অসীম সাধনা দিয়ে তিনি সেই সুরকে পেয়েছিলেন একান্ত আপনার করে। আর সেই সুরই তাঁকে দিয়েছিল সম্পদ দেশ মান প্রতিপত্তি।

দেশ ছেড়ে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে চলে গেলেও কোলকাতার সংগে তাঁর সম্পর্ক কিন্তু একদম শেষ হয়ে যায় নি। মাঝে মাঝে কোলকাতায় এসে বড় বড় জলসায় তিনি গান গ্রহণ করতেন। এই পশ্চিম বাংলার সংগীত পরিবেশন করার সময় তাঁর আরও একটি গুরুর কথা জানতে পারা যায়। কোলকাতা শহর থেকে দূরে চব্বিশ পরগণার মজিলপুরের দত্ত বাড়ীতে তখন বড় বড় বাছা বাছা ধনাঢ্য সংগীত শিল্পীরা গান বাজনা করতেন। সেই দত্ত বাড়ীর একটি আসরে যদুনাথ রায় বীণা বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বীণা গুরুর শিক্ষা-গুরুর নাম আজও অজানা রয়ে গেছে।

ওস্তাদ মুরাদ আলি খাঁ ইমন, মালকোষ আর দীপক রাগে সিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র উপযুক্ত বাঙালী শিষ্য যদুনাথকেও বহু রাগ রাগিনীর সংগে, ঐ ইমন, মালকোষ আর দীপক রাগের তালিম করেছিলেন মন প্রাণ ভরে।

যদুনাথের কোন ছেলে ছিল না। তাই তিনি তাঁর ভাইপো আশুতোষ রায়কে কণ্ঠ সংগীত শিখিয়ে ছিলেন। আশুতোষও খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংগে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে সাধনা করেছিলেন। আশুতোষ কোলকাতাতেই বাস করতেন। মুরাদ আলি খাঁও তখন কোলকাতায় থাকতেন। আশুতোষ মুরাদ আলির কাছেও সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে কোলকাতা ছেড়ে তিনি চলে যেতেন ময়ূরভঞ্জের বারিপদায় যদুনাথের কাছে তালিম নেবার জন্যে। এমনিভাবে পরবর্তী কালে আশুতোষও একজন ধনাঢ্যবন্ত কণ্ঠশিল্পী রূপে স্বীকৃতি লাভ

করেছিলেন।

দীর্ঘ জীবনের অধিকারী যদুনাথ, অতীত ৩৭ আর বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে জয় করেছিলেন বহু সংগীত প্রেমিকের মন। তাঁর আচার ব্যবহার শিক্ষাদান আর সংগীত পরিবেশনের মধ্যে ছিল এমন একটা আন্তরিকতা, যেটা সহজেই সকলকে মুগ্ধ করতো। তাই তিনি ছিলেন সবার প্রিয় শিল্পী। তাই শতবর্ষের মতো শত পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়েছিল ঐ মরমী দরদী শিল্পীর যশের সুরভী দিকে দিগন্তে। তাই প্রবল জীবনের সর্বহারা মানুষটি শেষ জীবনে পেয়েছিলেন সবার ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর স্নেহ।

এই সুরের কারিগর মরমী দরদী মানুষটি সুরের হাট সবাইকে ছাড়িয়ে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রায় নব্বই বছর বয়সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বারিশালায় তাঁরই সাধনার জন্মদিনে।

পরলোকের পথে আত্মার বিড়ম্বনা

(১৮০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জীবন্ত দাহ করে পরকালের পথে রাজার বিদেহী আত্মার সহযাত্রী করা হোত।

পরিশেষে প্রাচীন আজটেকদের সভ্যতার উচ্চ মান সম্বন্ধে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে। তাদের শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শৈলীর যে সব বিস্ময়কর নিদর্শন মহাকালের বিলুপ্তির পরোয়ানাকে উপেক্ষা করে আজও সগৌরবে টিকে আছে সেগুলি সভ্যতার উচ্চ মান ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে তাদের বর্ষ গণনা যেরূপ নিখুঁত ছিল সমকালীন পৃথিবীতে কোথায়ও সেরূপ ছিল না।

বর্তমান ভারতে নিয়মিত প্রথায় বর্ষ গণনায় যেখানে পর ১৪০০ বছরে নববর্ষের দিনটি ২৩ দিন পেছিয়ে গেছে সেখানে আজটেকদের প্রাচীন বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী গণনায় ৩০০০ বছরে মাত্র একদিন হেরফের হোত। তবে তাদের বর্ষপঞ্জী গণনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। ২০ দিনে মাস ধরে ১৮ মাসে বর্ষ গণনা করা হোত। এভাবে বছর শেষে আরও ৫ দিন যোগ করে ৩৬৫ দিনে বছর নির্দিষ্ট হোত। বর্ষ গণনা আরো নিখুঁত করার তাগিদে প্রতি চার বছর অন্তর আরও একদিন যোগ করা হোত অনেকটা বর্তমান গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জী নির্দেশিত লিপইয়ারে ফেব্রুয়ারী মাসে বাড়তি একদিন সংযোজনের মতো। অনুরূপ বর্ষপঞ্জীর সঙ্গে সর্বাধুনিক বর্ষপঞ্জীর গরমিল মাত্র বছরে যেখানে থাকে ২ মিনিট ১ সেকেণ্ড, সেখানে ভারতীয় ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের রচিত পঞ্জীতে ভুলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ মিনিট ৯ সেকেণ্ড।

রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে

(১৮৮ পৃষ্ঠার পর)

হেন যাত্র। হিন্দী ভাষা যদি উদ্ভটই না হইবে তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ, অধ্যাপক স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় মহাপণ্ডিতগণ হিন্দী ভাষার মাধ্যমে দর্শনের দুরূহ বাক্যগুলি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন কেমন করিয়া? আর কেনই বা একখানা হিন্দী কবিতার বইকে বহুবার পূর্বে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ নোবেল পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত বলিয়া মত দিলেন? তারপর তুলসীদাসের রামায়ণ তো অনূদিত হইয়াছে দেশী ও বিদেশী বহু ভাষায়। তবুও কি বলিতে হইবে হিন্দী একটি অনুন্নত ভাষা? কুলি মজুর শ্রেণীর হিন্দী ভাষা শুনিয়া হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গেলে ভুলই হইবে। তৃতীয় বক্তব্য—হিন্দী রাষ্ট্র ভাষা হইলে অহিন্দীভাষী ছাত্রগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিফল হইবে। অহিন্দীভাষী ছাত্রগণ যদি বিদেশী ভাষা ইংরাজি শিক্ষা করিয়া খাস ইংরাজের দেশে বসিয়াই ইংরাজ ছাত্রদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে পারে-তবে উপযুক্ত হইলে তাহারা হিন্দীভাষী ছাত্রদিগকে প্রতিযোগিতায় হটাইতে পারিবে না কেন? এই উক্তির মধ্যে কোন যুক্তি নাই, আছে দুরভিসন্ধি মাত্র। সুতরাং হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলে "হিন্দী রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাও একটি লোকঠকান দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যা কথা। যদি প্রত্যেক প্রদেশেই নিম্নশ্রেণী হইতে আন্তরিকতার সহিত হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া হয় বিশেষ ব্যবস্থায়, তবে অচিরেই দেশের অধিকাংশ লোক হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিবে। তখন হিন্দীকে কোন প্রদেশ বিদেশের ভাষা বলিয়া মনে হইবে না, মনে হইবে ইহা সর্বভারতীয় ভাষা। সুতরাং "হিন্দী রাষ্ট্র" বলিয়া কুহুর তর আর থাকিবে না। আর ঐ ভাষার মাধ্যমেই চলিবে তাদের আদানপ্রদান, প্রদেশে প্রদেশে গড়িয়া উঠিবে এক জাতীয়তা-বোধ—এক জাতি এক প্রাণ।

Gram : PANELPIN

Phone : 41-2358

Fitwell Fasteners (India) Pvt. Ltd.

7. SWINHOE STREET

CALCUTTA-700 019

Manufacturers / Assemblers

OF

WRIST WATCHES

Manufacturers of :

PRECISION TUNED COMPONENTS FOR RADIO. T.V,
TELEPHONES. SEWING MACHINES, FANS. AND
VARIOUS OTHER PURPOSE
AND
SHEET METAL WORKS.

INDUSTRIAL SEWING MACHINE FOR FILLED BAG CLOSING

ESSENTIAL
FOR
BAGGING PLANT
TO STITCH
ANY KIND OF
BAGS.

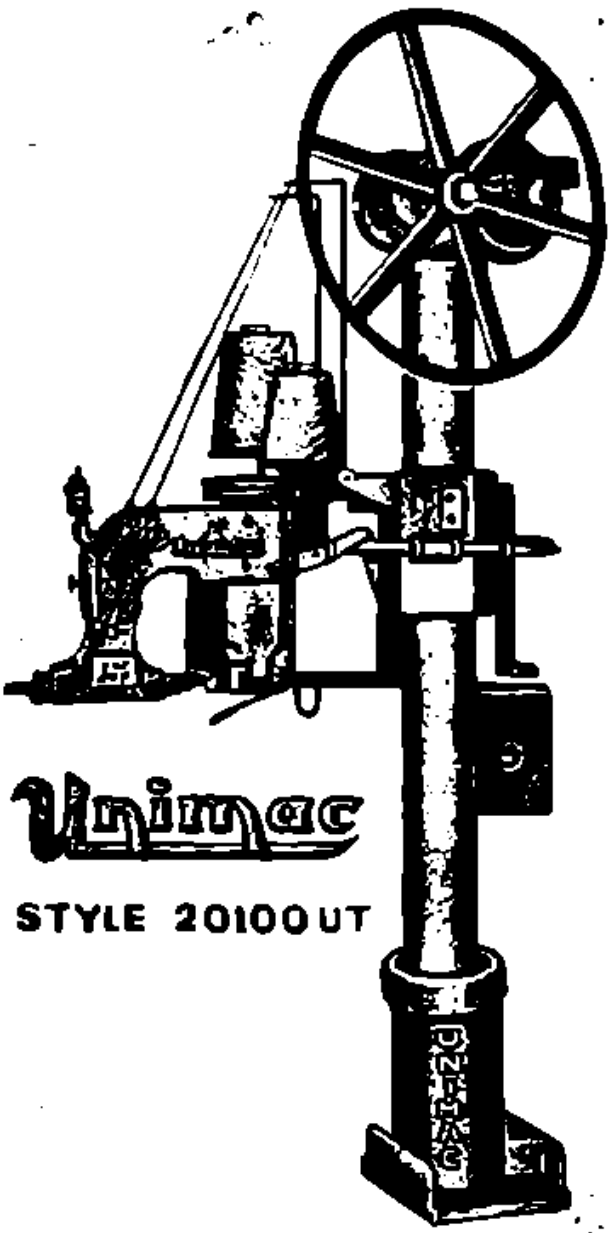

UNIQUE MACHINE CO.,
'COMMERCE HOUSE'
4TH. FLOOR. ROOM NO. 10A,
2, GANESH CHANDRA AVENUE.
CALCUTTA - 700 013.

Dial : 23-4302
22-4946

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ প্রেস, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অফিস বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯ (ফোন : ৭৭ ২৪৩০) হইতে প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্ট হাউস ৪১এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণে : পি. কে প্রিন্টার্স, ৯এ এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

উজ্জ্বল ভারত

নিখিল ভারতীয় ভাষা পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

মূল্য—৫০ টাকা

যুগ্ম-সম্পাদক—গৌরচন্দ্র সাহা

With Best Compliments of :

M/s. S. S. INDUSTRIES

ENGINEERS & MANUFACTURERS

Specialists in :

Timber Treatment Plant, Timber Seasoning Kiln Scientific Apparatus, Boiler & Pipe Line Erection & Vacuum Impregnation Plant.

City Office :

25, MARQUIS STREET,
CALCUTTA—16
PHONE : 21-2332

Regd. Office & Works :

8/1 GURUDAS DUTTA GARDEN LANE
CALCUTTA-4
PHONE : 35-1646

মাছের চাষ

মাছের ভালো ফলনের জন্যে অক্টোবর মাসে কি করতে হবে

১। পুকুর থেকে সব আগাছা তুলে নিন।

২। ডুবে যাওয়া পুকুরে চারাপোনা ছাড়ুন।

৩। বিঘা প্রতি ১০।১২ কেজি কলিচুন, এক সপ্তাহ পরে ১০০০ কেজি গোবর সার দিন। এর ৪।৫ দিন পরে ৪ - ৫ চারাপোনা ছাড়ুন।

৪। বড় মাছ তুলে চারাপোনা ছেড়ে নিবিড় মিশ্র চাষ শুরু করুন।

৫। নিয়মিত সার, সমপরিমাণে সরষের খৈল ও চালের কুঁড়ো মেশানো খাদ্য দিন। মাসে বিঘা প্রতি ১০।১২ কেজি কলিচুন ভিজিয়ে পুকুরে দেবেন ও মাসে একবার জাল টানবেন।

৬। এখনই বিঘা প্রতি পুকুরে ৪।৫ হাজার জিওল মাছের পোনা ছাড়ুন। পরিপূরক খাদ্য দেবেন প্রথম মাসে হাজার পোনায় ২০০ গ্রাম, পরের মাসগুলিতে ৪০০। ৬০০।১০০০।১৩০০।২০০০ গ্রাম।

মাছ চাষের বিশদ তথ্যের জন্য
স্থানীয় মৎস্য বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নং-১৩১৯-৫০ তাং ১৩।৯।৭৯

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৯'০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২'০০
৩।	শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫'০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩'০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২'০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫'০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২'০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২'০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪'০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪'০০

শ্রীপ্রতিভা রায় রচিত

১।	নারী প্রগতির জন্মকথা	৩'০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫'০০

রেণু মিত্র রচিত

১।	সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	২'০০
২।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৪'০০

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩।	রবীন্দ্র হৃদয়	৫'০০
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা	৬'০০

নরনারায়ণ আশ্রম

ফোন : ৭৭-২২৪০

গ্রাম : বাগুইআটি / পোঃ অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২'০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪'০০	সদা পাঠ্য গীতা	১'৫০	**শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.**	
বৃহৎ পকেট গীতা	৯'০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২'০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪'০০
সুলভ পকেট গীতা	৩'০০	কর্মবাদ	৩'০০	মানুষের মত মানুষ	১'০০
পত্রাবলী	৩'০০	ভারত আত্মার বাণী	৭'৫০	বিদ্যাসাগর	৩'০০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২'০০	Soul of India Speaks	7'00	**ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের**	
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.				শরীর ও শক্তি	৪'০০
মেয়েদের বাঙালী	৫'০০	ব্যক্তিগত রামমোহন	৪'০০	নীরোগ রেখে দীর্ঘ জীবন	৪'০০
ছেলেদের বাঙালী	৯'০০	আচার্য জগদীশচন্দ্র	৪'০০	সরল যোগ ব্যায়াম	৪'০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮'০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩'০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪'০০
বাংলার কবি	৬'০০	ব্যক্তিগত বিবেকানন্দ	৪'০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪'০০
বাংলার বিদুষী	৪'০০	রবীন্দ্রনাথ	৪'০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬'৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮'00

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী , ● ১৪কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

ওর কাছেই আমাদের জুতো তৈরির হাতেখড়ি

শুনে হয়তো অবাক হবেন, যে এ ছোট্ট শিশুর কাছেই বাটা অনেক কিছু শেখেছে, শিখেছে।

যেমন শিশুর জুতো তৈরি হবে শিশুর পা'কে অনুসরণ ক'রে। জুতো হবে নরম তুলতুলে, যাতে বাচ্চার কোমলতে ব্যথা না লাগে। সুন্দর 'ফিট' হবে যাতে ওরে শিশু পায় পুরোপুরি আরাম। সেই সঙ্গে মেয়ার রাখতে হবে তার বাড়ন্ত পায়ের কথা।

এছাড়াও আছে সুন্দর সুন্দর রঙ, সুন্দর সুন্দর নকসা। এ সব কথা চিন্তা করে তবেই আমরা ছোট্ট শিশুদের জন্য আমাদের মনোরম, বাহারী জুতো তৈরি করি।

আমরা এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, আমাদের ও বিশ্বের এবং সব শিশু বিশেষজ্ঞদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Bata

শুধু সেরা জুতোই নয়, আরো অনেক বেশী

With Best Compliments of :

GENERAL STORES & ENGINEERING CO.,

Mechanical Engineers, Govt. & Rly. Contractors.

Manufacturers of :

RAILWAY CARRIAGE & WAGON COMPONENTS.
STEAM, ELECTRIC & DIESEL LOCO SPARES.

Office :

10, Lalbazar Street, Mercantile Building (1st Floor)
Calcutta-700001. Phone : 23-2717

Factory :

BALTIKURI, KALITOLA, HOWRAH.

With Best compliments of :

Phone : 22-0991

KRISHNA ENGINEERING CO.

HARDWARE MERCHANTS

Specialist in : Rag Bolts Hightencile Stainless Steel. Brass Bolt Nuts, Gun Metal. Tapper Washers, Bright Bolts, Nuts, Pipe & Pipe Fittings. Plastic Sheet, Asbestos, Non-Ferrous Goods & General Order Suppliers.

Office : 71-A, Netaji Subhas Road,
(Room No. D. S 3)
Calcutta-700 001,

Factory : 3, Natabar paul Road,
Kadamtolla, Howrah.

With Best Compliments of :

Phone : 69-2071

SHIB BANERJEE & SONS

Manufacturers of :

Precission Jobs, Taper & Bevelled Washer, Machined Washer, & Machinery Parts.
RAILWAY & GOVERNMENT SUPPLIERS.

Works :-

166/5, Belilious Road, (Kadamtala)
Howrah-711101

Office :

44, Chatterjee Para Lane,
(Kadamtala) Howrah-711101

আঞ্চল ভারত

৩২ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
আষাঢ় '৮২

সূচীপত্র

বিজ্ঞান জড় ও অজড়ের সমন্বয় ।
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত । ২০৫
অস্ত্র নয়—প্রেমই শক্তি ।
সম্পাদকীয় । ২০৬
নবরূপে স্মরণে । গৌরচন্দ্র সাহা । ২০৭
এক আধটা পাহরা ।
দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । ২০৭
উপহার । দুর্গা গোস্বামী । ২০৭
শতবর্ষের স্মৃতি-সায়রে সরোজিনী
জনরঞ্জন কাব্যতীর্থ । ২০৮
নিমাই তার নাম । পরেশ সাহা । ২০৯
সেই সুরের মধুর স্মৃতি ।
স্বপন বুড়ো । ২২৪
মহাকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও
তুলসীদাস । নিখিলরঞ্জন রায় । ২১৮
পুরুষোত্তমানন্দের দিন-পঞ্জী । ২২২
রূপার কাপ । দীপেন রায় । ২২৯
বেকার মিস্ত্রি । সুনামেশ ঘোষ । ২৩১
তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ ।
অসীমা গাঙ্গুলী । ২৩৩
তফাৎ । অসীমা রায় । ২৩৩
মেনে রাখা ভাল । রতন হাঁস । ২৩৩
উদ্বাস্তু । অমু চালদার । ২৩৪

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

বিজ্ঞান জড় ও অজড়ের সমন্বয়

"বর্তমান যুগে বিজ্ঞান যে পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে বিশ্বের ছোট-বড় সকল ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র জীবনের মধ্যে জড় ও অজড়ের সমন্বয়ই প্রদর্শিত হইবে। প্রতি জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আধ্যাত্মিক যে কোনও ঘটনা ঘটে, তাহার কতকগুলির সহজ সরল ব্যাখ্যান জড়বাদের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই চলে না। পক্ষান্তরে জীবনে এমন সব ঘটনাও ঘটে, অজড়বাদের আশ্রয় না লইলে কিছুতেই যাহাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। একমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে (যাহা মার্কস্‌পন্থীরা চাহিতেছেন) যেমন সমাজ ধর্ম ও কৃষ্টির সহজ ব্যাখ্যান সম্ভব হয় না, তেমনি ধর্মের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়াও (যাহা ভারতের প্রাচীন পন্থীরা চাহিতেন) অর্থনীতির ব্যাখ্যা সহজ সরল হইবে না। যে কোনও একটি দৃষ্টি-কোণে জীবনের সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গেলে যুক্তির টানাহেঁচড়া করিতেই হইবে। জীবনের সঙ্গে যেমন প্রত্যেক দৃষ্টিকোণের সদা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তেমনি জীবনের মধ্য দিয়াই শুধু প্রতিটি দৃষ্টিকোণের সঙ্গে অপর দৃষ্টিকোণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে। সমগ্র জীবনের বাহিরে বাস্তব দৃষ্টিতে কোনও দৃষ্টিকোণই অপর দৃষ্টিকোণের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের সহজ সরল ব্যাখ্যান দিতে পারে না। জীবনের কোনও ঘটনাকে মুখ্য বা গৌণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যেও মুখ্যত্ব বা গৌণত্ব আসিয়া পড়িবে, যাহা জীবন্ত মানুষের পক্ষে মোটেই সত্য নয়, কল্যাণজনকও নয়।

'Each cell must live for itself as well as for the whole organism'—প্রতিটি জীবকোষ নিজের জন্য যেমন বাঁচে, ঠিক তেমনি সমগ্র জীবনের জন্যও বাঁচে···। ইহা দৈহিক জীবকোষের পক্ষে সত্য, মনস্তত্ত্বের মধ্যেও সত্য। কিন্তু প্রতি অংশেরও যে একটি নিজের দ্বারা নিজের জন্য (by it and for it) বাঁচিবার অধিকার আছে, সমগ্র (whole) যে অংশেরও উপায় (means), তাহা মার্কসীয় দর্শন স্বীকার করে নাই। মার্কসীয় দর্শনের মতে অংশ শুধু সমগ্রের জন্যই বাঁচিবে, নিজের দ্বারা নিজের জন্য বাঁচিবার কোন প্রয়োজন বা অধিকারই অংশের নাই। মার্কসবাদ যতই 'জীবন্ত' হইবার দাবী করুক, এইখানেই সে যান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছে।··· ভারতবর্ষের শ্রীকৃষ্ণই অংশ ও সমগ্রের এই বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বর্তমান যুগে শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার 'সিদ্ধান্ত-দর্শন' ও 'ভক্তিযোগ-দর্শন' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন।"

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়

অস্ত্র নয় —প্রেমই শক্তি

রেণু মিত্র

ঘটনাচক্রে তিব্বতকে আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। যাতায়াত বা পারস্পরিকতা না থাকলে কাছের মানুষও দূরের হয়। ইতিমধ্যে ১১ই জুলাই ১৯৭৯-র অমৃতবাজারে দুই সাংবাদিক সম্মেলনের, 'কুড়ি বৎসরের গণতান্ত্রিক সংস্কার ও দশ বছরের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সত্ত্বেও অতীশের নাম তিব্বতের মানুষ এখনও পুরোপুরি ভুলে যান নি। ...তিব্বতের লোকেরা অতীশকে খুব শ্রদ্ধা করেন। কারণ তিব্বতী সমাজে অতীশের অবদান আছে। ...এই বাঙালী পণ্ডিত বেশ ভালভাবেই তাঁর নিজের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। যেন একজন জ্ঞানী মানুষ হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয়।'

—এরই নাম সভ্যতা। চাল তরোয়াল বন্দুক কামান এ্যাটমবোমা ও হাইড্রোজেন বোমা দিয়ে এ জয় করা হয় নি। মিলে মিশে ভালবেসে দেশের চিত্ত জয় করা হয়েছিল। কতখানি ভাল তারা অতীশকে বেসেছিল, কতখানি তিনি তাদের সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন যে এত বিরুদ্ধতার মধ্যেও তাঁকে মনে রেখেছে। এটা চিত্ত জয়—পশু বশল নয়। অমরতার গৌরবে বীরে ওঠেন যারা, তাদের দেহ যখন আবার কবর থেকে তুলে ফেলা হয় কিম্বা ঐ রকম কিছু ঘটে তখন বোঝা গেল যাকে একদিন অত্যন্ত সম্মান করেছিল তাকে ভালবাসতে পারে নি। হাজার হাজার বৎসর আগে যত দূর দেশ থেকে একজন তাঁর চিন্তাধারা অপর দেশের মানুষের কাছে নিয়ে উপস্থিত করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন মানুষ অভিজ্ঞতা ও intuition-এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম চিন্তাধারার অধিকারী হয়ে থাকে। আমার যা ভাল লেগেছে অপরকে তা দেবার প্রবণতাও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা যখন শক্তির ভারে চাপিয়ে দেওয়া হয়—তখনই মানবাত্মার পক্ষে সেটা অপমান-জনক হয়। সেখানে গ্রহীতার বিচার বিবেচনার স্বাধীনতা থাকে না। চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা যদিও আজও দেশে-দেশে চলছে খুবই—তবু মানবাত্মা এ থেকে মুক্তি চায় সেও খুব সত্য কথা। একাদশ শতকের অতীশকে বিংশ শতাব্দীর নানান রকম চিন্তাধারার মধ্য দিয়েও স্মরণ রাখার চেতনে আছে স্বাধীনভাবে গ্রহণ। মানুষ তো শুধু জীব নয়, জীব হয়েও সে শিব—সে কথাটা কোনমতেই যেন আমরা না ভুলি। এজন্য তার সভ্যতার ভিত্তি হবে ভালবাসা —হৃদয়ের আদান প্রদান—সামগ্রিক প্রাণ ধর্ম। এটাই তো মানুষের অন্তরের চাওয়া—অথচ এমনই দুর্ভাগ্য যে, মানুষ তার এই অন্তরতম আকাঙ্ক্ষাকে নিজেরই চোখে আজও রূপ দিতে পারল না!

মত-স্বাধীনতা কিন্তু মত-সহিষ্ণুতাই নয়। মত-সহিষ্ণুতার মধ্যে অপর মতের প্রতি প্রাণ-খোলা স্বীকৃতি থাকে না—সংসারে অনেক কিছুই সইতে হয়—এ-ও সইলাম। এ মানসিকতার ফল স্থায়ী ও সংগঠনাত্মক নয়। বিশ্বে উদ্ভূত প্রত্যেক মতবাদ তার বিশেষ দেশকালপাত্রে রচিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন অনন্য। কিন্তু সে-ই একমাত্রও নয়, এবং এতেই তার সবটুকু সার্থকতাও নয়। অপর প্রত্যেকটি মতবাদও অনন্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সেই সব মতবাদের সঙ্গে হাত-ধরাধরিতেই প্রত্যেকের চরম সার্থকতা। তাই তোমাদের সব মতই আমারও মত এবং যতটা আমি নিজেকে ব্যাপকতর গভীরতর করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে সেই সব মতকে আস্বাদনে ও আচরণে আনতে পারব—ততটা বেশীই আমি সার্থক। তাই তোমার মত তোমার, আমার মত আমার—এতে শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণ আটকানো যাবে না। প্রত্যেক মতবাদেই সত্যের এক একটা দিক আত্মপ্রকাশ করেছে—তাই প্রত্যেককে যথা স্থান ও মান দিয়ে—স্বীকৃতি দিয়ে—প্রত্যেকের উপলব্ধি আস্বাদন ও আচরণের মধ্যে আনবার অপ্রমত্ত প্রয়াসই মানুষী সভ্যতার সার্থকতা।

অতীশকে ভালবেসে মনে রেখেছেন তিব্বতীরা দীর্ঘকাল ধরে, নূতন নূতন চিন্তাধারা বা সত্য বা ভালবাসা বা হৃদয়ের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিতে পারবেন, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করে নিজেদের মহত্তর জীবনের অধিকারী করবেন তাঁরা।

কবিতা

নজরুল স্মরণে

গৌরচন্দ্র সাহা

পরাধীন ভারতের শতাব্দীর নিরুদ্ধ বেদনা
বিস্ফারিত কলরোলে যে কবির দুর্বার আহ্বানে
বদনে বিশ্বের বাঁশী হাতে অগ্নিস্রাবী অগ্নিবীণা
রণক্লান্ত সে বিদ্রোহী মরদেহে আজি আর নেই।

আমরা ব্যথিত চিত্তে অশ্রুসিক্ত অনেক শ্রদ্ধায়
তাঁহারে স্মরণ করি। আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়
সে অগ্নিবীণার সুর দুঃখে কিম্বা জাতীয় দুর্যোগে
আমাদের চেতনায় অনন্ত অক্ষয় বাজবেই।

এক আধটা পায়রা

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁক ঘুরে চলে গেল
দুচারটে ছেলেমেয়ে
খুশীতে উচ্ছল।

এক ঝাঁক পায়রার চোখেতে আকাশ।

ভালবাসা ভালবাসা
কলেজের খাতার লেখা
অকারণ হাসি আর
নিরর্থক কথা।

এক আকাশ পায়রার ডানাগুলো নীল।

বাঁক ঘুরে চলে গেল
দুচারটে ছেলেমেয়ে
হয়তো আউটরাম কিম্বা ময়দান।
তারপরও কিছু আছে—
ট্রামের জানলা থেকে
হাত নাড়া
কাল আবার দেখা হবে
কথা দেওয়া।
এইবার ঘর বাঁধে খাঁচাটায়
দাঁড়ে গিয়ে বসা।

ট্রামলাইন বাঁক ঘুরে চলে গেল
তাতে আছে
দুএকটা ছেলে মেয়ে
অপুষ্ট, অনুজ্জ্বল।

এক আধটা পায়রার চোখেতে মেঘ।

উপহার

দুর্গা গোস্বামী

তোমাকে একটি টুকটুকে তাজা রক্তগোলাপ
উপহার দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে আহত হও তুমি—
কাঁটার ঘায়ে।
স্বচ্ছন্দে ওড়বার জন্য তোমাকে সীমাহীন উদার গগন
উপহার দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে হারিয়ে যাও তুমি—
আমার দৃষ্টির অগোচরে।
সাগরের সাদা ফেনার মাথায় মাথায় নেচে নেচে—
ভেসে বেড়াবার জন্য তোমাকে একটা সুনীল সমুদ্র—
উপহার দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে মণিকোর সন্ধানে তুমি—
ডুব দাও সাগরের অতল গভীরে।
পাগলা ঘোড়ার মত পাহাড়-থেকে-লাফিয়ে-পড়া একটা
উচ্ছল জীবন্ত জলপ্রপাত তোমাকে—
এনে দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে ঘাটতে-পড়া প্রপাতের মত তুমি—
প্রশান্ত নদী হয়ে বহু দূরে বয়ে চলে যাও।
কামনাময়ুর উষ্ণ আলিঙ্গনের মত—একটি
প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা—তোমাকে—
উপহার দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে পতঙ্গের মত তুমি—
ভস্ম হয়ে যাও।

... ...

আরও কত-কত-কিছুই ত' তোমাকে—
উপহার দেব ভেবেছিলাম ; কিন্তু দিই নি—
পাছে সবকিছু দিয়ে ফেললে—তুমি—
আমার মন থেকে নিঃশেষে মুক্ত হয়ে যাও।

শতবর্ষের স্মৃতি-সায়রে সরোজিনী

জয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় গণ-জীবনে আসে নব জাগৃতির জোয়ার। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বুকি মুখর হয়ে উঠে নব জীবনের সাম ঝঙ্কারে। পরাধীন ভারতের গণ-নারায়ণের তন্দ্রা হয় বিদূরিত। অর্ধশতাব্দীর জোড়িকের উদয়ে শতাব্দীর তমিস্রা হয় অপসৃত। অন্তরূপ থেকে পুরুষের পাশে অসূর্যম্পশ্যা নারীরা এসেও দাঁড়ায় সেদিনের সেই সূর্যালোকে। এ নারীদের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন তিনি অঘোর-নন্দিনী সরোজিনী নাইডু। অনুরণিত হয় তাঁর কণ্ঠে কবিগুরুর বাণী

শুধু সুখে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ ?
কেন না ছুটাব ভেঙে সন্ধানের রথ
দূঢ় বলা পণে ?

ঘোষণা করেন তিনি—"পুরুষের একক প্রচেষ্টায় পরাধীনতার নিগড় কিছুতেই ছিন্ন হতে পারে না। নরনারী পাশাপাশি না দাঁড়ালে জাতি ভ্রষ্টিষ্ঠ-বলিষ্ঠ হ'তে পারে না।" তাই ১৯০৫ সাল থেকে আমরা তাঁকে দেখি মুক্তি আন্দোলনে মুক্তস্নায়ুর মূর্তিতে। সায়ুরিরূপে দূঢ় হস্তে চেপে ধরেন স্বাধীনতা যুদ্ধের হৃৎ-যন্ত্র। তাঁর চিত্ত-বীণায় বুকি ঝঙ্কার তোলে বার্নার্ডশ'র বাণী—"You will never have a a quiet world till you knock this patriotism out of the human race." তাইতো ১৯০৬ সালে ভারতীয় মেয়েদের শিক্ষা-সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"স্বাধীনতা মেয়েদের জন্মগত অধিকার। ঘরের কোণে তাদের কূপমণ্ডুক করে রাখা জাতির সর্বনাশ। নারী-পুরুষের সহযোগিতা সংসারকে সুখ-সুন্দর স্বর্গে রূপান্তরিত করতে পারে।" বিধবাদের উপর সমাজের নির্যাতনেও তাঁর বহ্নিবাণী কণ্ঠ থেকে উদ্গীর্ণ হয়। তিনি যেন নারী-হৃদয়ের গভীর গহন অন্ধকারে দিব্য জ্যোতির দীপ-শিখা। তাদের প্রসুপ্ত চেতনাকে করেন উদ্দীপ্ত।

হিন্দু মুসলমানের বিভেদও তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"এক-জন রুষক তিনি হিন্দু হোন আর মুসলমান হোন একই ভাবে নিদাঘ তাপ ও বর্ষার বৃষ্টি ভোগ করেন। এঁদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? তিনি প্রয়াসী হন জাতির সম্মুখে নজরুলের কবিতা-কলিকে ফুটিয়ে তুলতে—

একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তাঁর নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।

১৯২৫ সালে সরোজিনী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁর গলার স্বর ছিল নাইটিঙ্গেল পাখীর মত সুরেলা। সাধারণ কথাবার্তা, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা সবই সকলের প্রতিমূলে সুধাবর্ষণ করত। তাঁর ভাষণ শ্রবণে অনেকের অচেতন চিত্তে চেতনার অরুণোদয় হ'ত। কখনো কখনো তাঁর ভাষণে পাওয়া যেত আবার অগ্নিগর্ভ সঙ্কেত। ১৯৪২ সালে ভারতছাড় আন্দোলনে তাঁকে নারীদের অগ্রদূত রূপে দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁর অগ্নিগর্ভ বাণীতে জন-মানসের সুপ্তি জড়তা দূরীকরণে প্রয়াসী হন। তাই এ বীরাঙ্গনার বক্তৃতায় আতঙ্কিত হয়ে বৃটিশ সরকার এ সিংহিনীকে বার বার লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন।

স্বাধীনতার পূজারিণী এ রমণীর সহানুভূতি ও দরদ ছিল পৃথিবীর প্রতিটি পরাধীন জাতির প্রতি। তাই আমেরিকার মৃত্তিকায় দাঁড়িয়ে পরাধীন নিগ্রোদের পক্ষে অগ্নিঝরা ভাষায় তিনি ভাষণ দেন। ব্রাউনিং-এর বাণী বুকি তাঁর হৃদয়-বীণায় দীপক রাগিনী তোলে

I was ever a fighter, so one fight more
The best and the last.

বস্তুতঃ মহীয়সী সরোজিনীর চরিত্রখানি ছিল ভবভূতির ভাষায়—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'। হায়দ্রাবাদে হঠাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তিনি সেখানে মহামারী নাইটিঙ্গেলের মত তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দিবারাত্র ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থায় ব্রতী হন। অভয়ার মূর্তিতে তিনি তাদের কান্নার অশ্রু মুছিয়ে দেন সান্ত্বনায় অভয় অকলে। তাদের হৃদয় দুয়ার থেকে সরিয়ে দেন বিষাদের আগল। নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য সরকার কর্তৃক তিনি 'কাইজার-ই-হিন্দ' পদকে সম্মানিত হন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে এ কাজতেজা সমর্পিতা মহিলা সে পদক ঘৃণাভরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাই তো সার্বজে

(শেষাংশ ২৩৭ পাতায়)

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লেখাপড়া নেই। কোন কাজ নেই। নিমাইয়ের আবার সেই দুরন্তপণা।

আবার সে দল গড়েছে। সঙ্গী-সাথীদের ডেকে নিয়েছে। বলেছে, 'চল রে যাই, আবার আমরা গঙ্গায় গিয়ে সাঁতার কাটি।'

সঙ্গীরা প্রথমে বিশ্বাস করে নি।

বলেছে, 'ইস্, তামাসার আর জায়গা পেলি নে নিমু, তামাসা করতে এলি আমাদের সঙ্গে!'

'না-রে, তামাসা নয়। সত্যি আমি গঙ্গায় যাবো। আবার আমি সাঁতার কাটবো। গঙ্গা আমায় টানছে।'

'সত্যি বলছিস্?'

'হ্যাঁ রে, সত্যি বলছি।'

'দিব্যি কেটে বল্।'

নিমাই বললে, 'সত্যি, সত্যি, সত্যি। তিন সত্যি করলাম। হলো তো? চল্, এবারে গঙ্গায় চল্।'

সঙ্গীদের তো মহা আনন্দ।

নিমাই ছিল না, তাই তাদের গঙ্গায় যাওয়া হয় নি। তাদের খেলা জমে নি। খেলা তারা ছেড়ে দিয়েছে। ঘরে গিয়ে বসেছে।

নিমাইয়ের ডাকে আবার তারা বাইরে এলো। দল বেঁধে গঙ্গায় চললো।

অনেকদিন পরে সবার মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

'এ্যাঁ···এ্যাঁ···এ্যাঁ··· দিলে তো, সারা গায়ে জল ছিটিয়ে দিলে তো! পুজোটা দিলে তো পণ্ড [illegible]

তর্কচঞ্চু মশাই গঙ্গায় এসেছিলেন। স্নান সেরে সূর্য পুজো করছিলেন। নিমাই দলবল নিয়ে গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে।

গঙ্গার জল তোলপাড় হলো। বৃষ্টির ছিঁটের মতো অজস্র ছিঁটে ছিটকে গেলো এ-দিক সে-দিকে।

সেই ছিঁটেই তর্কচঞ্চুমশাইয়ের গায়ে লেগেছে।

তর্কচঞ্চু চটে উঠলেন। বললেন, 'বাঁদরগুলো আবার কোত্থেকে জুটলে হে, আ? এ্যাদ্দিন এদিকে আসে নি, হাড় জুড়িয়েছিল। শান্তিতে ছিলুম। শান্তিতে পুজো-আর্চাটা সারতে পারতুম। এ যে দেখছি, আবার এসে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুললে!'

তর্কচঞ্চুর কথায় নিমাই ও তার দলবল খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলে। সে হাসি যেন ছুঁচের মতো গিয়ে বিঁধলো তর্কচঞ্চুর মনে।

তিনি একেবারে ক্ষেপে উঠলেন।

রাগে গর্‌গর্ করতে করতে বললেন: 'আবার হাসা হচ্ছে? আমার সঙ্গে ঠাট্টা? রসাতলে যাবি। নিপাত যাবি। ওলাউঠা হয়ে মরবি। নবদ্বীপের হাড় জুড়োবে।'

বালকেরা মুখ ভর্তি জল নিয়ে পিচকারীর মতো ছিটিয়ে দিলে তর্কচঞ্চুর দিকে।

তর্কচঞ্চু তেড়ে এলেন।

কিন্তু ধরবেন কাকে? তারা এক ডুবে অনেক দূরে যেয়ে উঠেছে।

তর্কচঞ্চুর সেখানে যাবার ক্ষমতা নেই।

অগত্যা শাপ-মন্যি।

তর্কচঞ্চু শাপ দিলেন : 'নিপাত যা, নিপাত যা। তিন দিনের জ্বরে ওলাওঠা হয়ে মারিয়ে যা।'

তর্কচঞ্চুর শাপের কথা শুনে বালকেরা আবার খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

তর্কচঞ্চু এবারে রণে ভঙ্গ দিলেন।

গঙ্গার জলে বার কয়েক মাথা ডুবিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়ালেন। পেছনে তখনও বালকদের সেই খিল্‌খিল্ হাসি।

শুধু একদিনই ত নয়।

রোজ এমনি হয়। রোজই নিমাই তার দলবল নিয়ে গঙ্গায় যায়। ক'াপায়। সাঁতার কাটে।

তাদের দস্যিপণায় অন্য স্নানার্থীরা বিরক্ত হয়।

তাদেরই কেউ ছুটে আসে শচীদেবীর কাছে।

বলে, 'বামুনদি' কৈ লো!'

'কে?'

'আমি, আমি পটলের মা।'

'পটলের মা, তা এ অসময়ে কি মনে করে দিদি'? শচীদেবী রান্নাঘরে ছিলেন। পটলের মা'র ডাকে বাইরে এলেন।

পটলের মা বললে, 'আর যে বাঁচি নে বামুনদি', নিমুকে এবারে সামলাও।'

'এ কথা বলছো যে? কি করেছে নিমু?' শচীদেবীর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

পটলের মা বললে, 'বলছি কি আর সাধে দিদি, নিমুর জ্বালায় দেখছি আমাদের গঙ্গাস্নান বন্ধ করতে হবে। ঘন্যোকন্যো সিঁকের তুলতে হবে। এই তো সেদিনকার ছেলে, মুখ থেকে এখনো দুধের গন্ধ যায়নি, তারই এতো বেয়াদবি!'

পটলের মা শচীদেবীর কাছে সব কথাই খুলে বললে। শুনে চুপ ক'রে রইলেন শচীদেবী। দুশ্চিন্তায় মাথাটা ওঁর যেন ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠলো।

পটলের মা বললে, 'আর তোমাকেও মন্যি দিই বাপু, ছেলেমানুষ কৈ লেখা-পড়া করবে, মানুষ হবার চেষ্টা করবে, তোমরা তার লেখাপড়া ছাড়ালে। কেন? না, লেখাপড়া করলে ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে। যেন রাজ্যের সব লোকই লেখা-পড়া করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়! ভগবৎ দেখে বাঁচি নে!'

শচীদেবী বললেন, 'যার বাথা সে-ই বোঝে দিদি, অন্যকে তা শোনানো যায়, কিন্তু বুঝানো যায় না।'

শচীদেবীর চোখ দু'টি জলে টলমল করছে।

পটলের মা বললে, 'তা তোমাদের বাথা তোমরা বোঝো গে, আমরা সেখানে নাক গলাতে যাবো কেন? আমরা শুধু বলতে আসি তোমার পুতের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠি বলে। তা ভালো মনে করো আসবো, ভালো মনে না করলে আসবো না।' বলে পটলের মা দপ দপ করে বিদ্রের উঠোন থেকে নেমে গেলো।

শচীদেবী বললেন, 'পটলের মা, শোন, রাগ ক'রে যেয়ো না।' পটলের মা সে কথার কোন উত্তর দিলে না।

নিমাই ঘরে ফিরলে শচীদেবীর সব রাগ গিয়ে পড়লো তার উপর।

'আয়, এ দিকে আয়, এ দিকে আয়। আজ তোকে মেরে আমার হাড় জুড়োই।' বলতে বলতে শচীদেবী ছুটে গেলেন নিমাইয়ের দিকে।

নিমাই কিন্তু নড়লে না। সরলে না।

বাড়ী ঢুকে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। শচীদেবী তার পিঠে ক' ঘা বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ্যাতো লোকের মরণ হচ্ছে, যম কি তোকে চোখে ভাখে না রে।'

কথা শেষ করতে যেয়ে বুকটা কেঁপে উঠলো শচীদেবীর। মাথাটা ঘুরে গেলো। দু' চোখে অন্ধকার।

ঘুরছে। ওঁর চোখে ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা সব ঘুরছে। সব যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেলো। নিমাই যেন দূরে, অনেক দূরে সরে গেছে ওঁর কাছ থেকে। কাছে ওঁর

কেউ নেই, কিছু নেই।

শচীদেবী 'নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন' বলে ডেকে উঠলেন। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। বসে পড়লেন।

দু'চোখ থেকে অবিরল জল গড়িয়ে পড়ছে।

কোন কোন দিন এমনও হয়।

ক্যান্তমাসীর শশা গাছে শশা ধরেছে। মাচা ছেয়ে গেছে। মাচা থেকে ঝুলে পড়েছে কচি তাজা শশাগুলি।

নিমাইয়ের চোখ পড়লো সে শশার দিকে।

দলবলকে বললে সে, 'শশা খাবি? বেশ কচি-তাজা শশা!'

দলবল থেকে একজন বললে, 'কোথায় পাবো?'

'আমি দেবো।'

'যা, মিথ্যে বলছিস্ কেন?'

নিমাই বললে, 'না-রে, মিথ্যে নয়। আমিই তোদের শশা খাওয়াবো। অনেক, অনেক শশা।'

'তবে, সে দিকি নি, দেখি কেমন মুরোদ তোর!'

'আমার সঙ্গে চল্।'

'কোথায়?'

'ক্যান্তমাসীর বাড়ীতে।'

'ওরে বাপ্‌রে, ক্যান্তমাসীর শশা খাবার আগেই যে তার লাঠি খেয়ে প্রাণ যাবে। তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি তোর কথা।'

ক্যান্তমাসীকে ভয় করবার কারণ আছে।

বয়েস হয়েছে ক্যান্তমাসীর। মাথার সবগুলি চুল দাদা হয়ে গেছে। দাঁতগুলি গেছে পড়ে।

কিন্তু তাহলে কি হবে! শশার দিকে সব সময়ই তার সজাগ দৃষ্টি।

হাতে যখন আর কাজ থাকেনা, তখন একখানি লাঠি হাতে শশা গাছের কাছেই সে বসে থাকে।

বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলে, 'আয়, কে শশা নিবি আয়। হাত গুলো করবো। পা ভেঙে দেবো।'

কেউ মজা দেখবার জন্যে বলে, 'ও মাসী, তোমার শশা নিল। ধরো, ধরো, ধরো!'

ক্যান্তমাসী লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়ায়। এ দিক সে দিক তাকায়। তারপর হেসে বলে, 'মস্‌করা করা হচ্ছে? আয় না, একবার শশায় হাত দিয়ে ছাখ্ না। লাঠির গুঁতোয় মাথা ভেঙে দেবো না!' বলতে বলতে মাসী আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসে পড়ে।

নিমাই ঠিক করলে, দিনে নয়, রাতে যাবে তারা ক্যান্তমাসীর বাড়ী।

রাতেও মাসীর ভালো ঘুম হয়না। বিছানায় বসে বিমোয়। একটু শব্দ হলেই চমকে ওঠে। উঠে বাইরে আসে। এ-দিক সে-দিক তাকায়। বিড়্‌বিড়্ ক'রে কতো কি যেন বলে। তারপর ঘরে ঢুকে একখানা গানে টান দেয়। গানে গানে রাত কেটে যায়।

সেদিন ছিল অন্ধকার রাত।

নিমাই সেদিন বাড়ী ফিরলে না। তার সঙ্গী-সাথীদের কেউই না। রাতের অন্ধকারে তারা চললো ক্যান্তমাসীর বাড়ী। শশা আনতে।

নিমাই কম্বলে গা মুড়েছে। সঙ্গী-সাথীদেরও সে তাই করতে বললে।

সঙ্গীদের একজনের কম্বলে আপত্তি। কম্বল সে গায়ে জড়াতে পারে না। কেমন যেন সুং সুং লাগে। গা চুলকোয়। শরীরটা কেমন যেন গরম হ'য়ে ওঠে।

সে-ই বললে, 'আবার কম্বল কেন ভাই?'

নিমাই বললে, 'দূর বোকা, কম্বল ছাড়া গেলে ক্যান্তমাসী আমাদের চিনে ফেলবে না! কম্বল জড়িয়ে আমরা গন্ধ সাজবো! ক্যান্তমাসী আমাদের চিনতে পারবেনা।'

ছেলেটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'কিন্তু কম্বলে যে আমার সুং সুং লাগে ভাই। ভারী বিশ্রী লাগে।'

'তা লাগুক। কতক্ষণ আর লাগবে? ক্যান্তমাসীর শশা খেলেই তা সেরে যাবে।' বলে নিমাই নিজেই ছেলেটির গায়ে একটি কম্বল চাপিয়ে দিলে।

রাত হয়েছে অনেক। অন্ধকার রাত।

পথ-ঘাট ভালো ক'রে দেখা যায় না। বড়ো বড়ো গাছগুলিকে বড়ো বড়ো পাহাড়ের মতো মনে হয়।

নিমাই তার দলবল নিয়ে ক্ষান্তমাসীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। ক্ষান্তমাসী ঘুমোয় নি। বিছানায় শুয়ে শুন্ শুন্ ক রে গান গাইছে।

উঠোনে পায়ের শব্দ শুনে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে রে?' নিমাই জানে, ক্ষান্তমাসী এবারে তার লাঠিখানি নিয়ে বাইরে বেরুবে। একটা বিপত্তি ঘটাবে।

তাই আর একটি বালকের কাঁধে চেপে সে মাসীর ঘরের শেকলটি বন্ধ করে দিলে।

ততক্ষণে লুঠ শুরু হয়েছে। বালকেরা টপাটপ শশা কোচড়ে রাখছে। আর মুখে একটা ধোঁৎ ধোঁৎ শব্দ করছে।

ক্ষান্তমাসী দরজা খুলতে যেয়েও খুলতে পারলে না। বাইরে থেকে শেকল আটকানো।

ভেতর থেকে টানাটানি করেও যখন শেকল খুললো না, তখন সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলে, 'কে কোথা আছো গো, এসো গো। ঘরে আমার ডাকাত পড়েছে গো।'

ক্ষান্তমাসীর চীৎকার শুনে লোকজন যখন তার বাড়ীতে এলো, নিমাই তার দলবল নিয়ে ততক্ষণে চম্পট দিয়েছে।

একজন ঘরের শেকল খুলে দিতেই ক্ষান্তমাসী বাইরে বেরুলো। দৌড়ে শশা গাছের কাছে গেলো। গিয়েই সে কান্নায় ভেঙে পড়লে, 'আমার সব্বোনাশ করেছে রে। আমার সব শশা নিয়ে গেছে রে। শশা গাছটিও ছিঁড়ে দিয়েছে রে।'

ক্ষান্তমাসীর এ কান্না সারা রাতেও আর থামেনি।

আর একদিনের ঘটনা।

শচীদেবী ঘরের কাজ করছিলেন।

একটি মেয়ে এসে খবর দিলে, 'পিসিগো পিসি, দেখে যাও তোমার নিমুর কাণ্ডখানা।'

বিস্মিত হলেন শচীদেবী। বললেন, 'কি গো? কি করেছে নিমু?'

'একবার এসোই না। নিজ চোখেই দেখবে নিমু কি করেছে। বাব্বাঃ, ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাপু, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখি নি।' বলে মেয়েটি শচী-দেবীকে সঙ্গে নিয়ে চললো।

বাড়ীর পাশেই একটি পড়ো জায়গা। রাজ্যের জঞ্জাল ফেলা হয় সেখানে। ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি, এঁটো-কাঁটা চার-পাশে তার ছিটানো।

নিমাই গিয়ে বসেছে সেখানে।

দেখে তো শচীদেবীর চক্ষু স্থির। এ যাদাল ছেলেকে তিনি কি ক'রে সামলাবেন? এ যে তাঁর হাড় কালো ক'রে ছাড়লে!

মুখে বললেন, 'এই বাঁদর, চলে আয়, ওখান থেকে চলে আয়।'

'না, না, আমি যাবো না। কোথাও আমি যাবো না। এখানেই থাকবো।'

'ওখানেই থাকবি? ঐ ছিঁটালে?

'ছিঁটাল হয়েছে তো কি হয়েছে? বেশ তো আছি আমি এখানে।'

'বেশ আছিস্? এই তোর বেশ থাকা? চারদিকে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। একটা দুর্গন্ধ উঠছে। তবুও বলছিস্ যে ভালো আছিস্? তোর কি কোনকালেই জ্ঞান-গম্যি হবে না?'

এবারে নিমাইয়ের আবেগ যেন উথ্‌লে উঠলো। বেশ জোরেই সে মার কথার উত্তর দিল।

বললো, 'মুখ্‌খু আবার জ্ঞান-গম্যি কি? তোমরা তো মুখ্‌খু ক'রে রেখেছো। পড়তে যাও না। ভালো-মন্দ আমি বুঝবো কি করে।'

'ওরে বাঁদর, তুই চলে আয়।'

'আগে বলো আমায় পড়তে যেবে? পড়তে দিলে আমি খুব ভালো হ'য়ে যাবো। তোমার সব কথা শুনবো। বলো আমায় পড়তে যেবে?'

নিমাইয়ের পড়া বন্ধ করিয়ে সুখী হন নি শচীদেবী। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চোখে তাঁর জল এসেছে। মনে মনে বলেছেন, 'নদীর ঢেউ দেখেই যে আমি নৌকো ডুবিয়ে দিলাম গো, নিমাইকে মুখ্খু ক'রে রাখলাম। আচ্ছা, পড়ে তো সবাই, তাই বলে সবাই কি সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়? বিশ্বরূপ ঘর ছেড়েছে বলে নিমাইও কি ছাড়বে? কে বললে সে কথা? হাতের পাঁচটি আঙুল কি সমান?'

শচীদেবী মনে মনে প্রশ্ন তুলেছেন, নিজেই তার উত্তর খুঁজেছেন, কিন্তু তবুও তিনি কোন নিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেন নি।

মনে তিনি জোর পাননি।

কিন্তু নিমাইয়ের কথায় আজ যেন তিনি জোর পেলেন। পড়া-শোনোয় যার এতো ঝোঁক, তাকে পড়তে না দেয়াটা অন্যায়। বাপ-মায়ের কর্তব্য পালনে অবহেলা।

নিমাইয়ের কথায় শচীদেবী তাই উত্তর দিলেন, 'দেবো রে দেবো, কালই তোকে আমি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসবো।'

নিমাই বললো, 'উঁহু, বিশ্বাস হয় না। তুমি ভুলিয়ে ভালিয়ে এখান থেকে আমায় তুলে নিতে চাও। এখান থেকে উঠলেই আবার তুমি কথা ঘুরিয়ে ফেলবে!'

'না রে না। কথা ঘুরাবো না।'

'তিন সত্যি করো।'

'সত্য, সত্য, সত্য। এই নে তিন সত্যি করলাম। হলো তো? এবারে উঠে আয় দিকি নি।'

নিমাই হাসতে হাসতে এবার উঠে এলো। শচীদেবী তাকে গঙ্গাস্নানে নিয়ে চললেন।

'একটা কথা রাখবে?'

রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে এসেছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। গৃহদেবতা রঘুনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে সবে শয্যা নিয়েছিলেন, শচীদেবী তখনই এ কথা বললেন, 'একটা কথা রাখবে?'

'বলো।'

'আমি বলি কি, আমাদের ভাগ্যে যা আছে, হবে। নিমাইকে তুমি আবার পড়তে দাও। চোখের সামনে দিন দিন ও এ ভাবে বকে যাচ্ছে, সে যে আমি সইতে পারছিনে গো!'

মিশ্রও কথাটা ভাবছিলেন ক'দিন ধরে।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়েছে। তাতে ব্যথা পেয়েছেন তাঁরা। সংসারটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তো বংশের গৌরব বাড়িয়ে গেছে বিশ্বরূপ। আজ দশজনে তার প্রশংসা করছে। কিন্তু নিমাই? নিমাই তো নে যে যাচ্ছে নীচে। অনেক নীচে। সেখান থেকেই একদিন হয়তো সে চোর-জোচ্চোরের দলে ভিড়বে। বংশের উঁচু মাথাটা সে নীচু ক'রে দেবে। তার চেয়ে সে পড়ুক, পড়ে মানুষ হোক। মানুষ হ'য়ে যদি সে সংসার ছেড়ে যায় তো, যাবে। তাতে ব্যথা পাবেন তাঁরা। তবুও তো অগৌরবের হাত থেকে বাঁচবেন।

শচীদেবীর কথায় মিশ্র তাই বললেন, 'বেশ তো, তাহ'লে কালই ওকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসি।'

'তাই যাও গো, লেখা-পড়া ক'রে ও মানুষ হোক। তারপর সে যদি আমাদের দিকে না চায় তো, না চাইবে। সংসার ছেড়ে যায় তো, যাবে। কপালে দুঃখ থাকলে কে তা খণ্ডাতে পারে বলো?'

একটু থেমে আবার বললেন, 'ওই না একটি গেলো, সে ব্যথা তো আমরা সয়ে আছি। ও-ও যদি তেমনি করে যায়, সে দুঃখও আমরা সইতে পারবো।' বলতে বলতে শচীদেবীর গলাটা ধরে এলো। তাঁর চোখ থেকে ক' ফোঁটা জল পড়লো গড়িয়ে।

জগন্নাথ মিশ্র পরদিন নিমাইকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন।

গঙ্গাদাসকে বললেন, 'ছেলেকে তোমার কাছেই রেখে গেলাম, রেখো পণ্ডিত, ও যেন মানুষ হতে পারে।'

গঙ্গাদাস বললেন, 'হবে, হবে। নিশ্চয়ই হ'বে। আরে বাঘের ছেলেই বাঘ হয়। পণ্ডিতের ছেলে পণ্ডিত হবে না? নিশ্চয়ই হবে। নিশ্চয়ই হবে।

মিশ্র ম্লান হেসে সেখান থেকে চলে এলেন। (ক্রমশঃ)

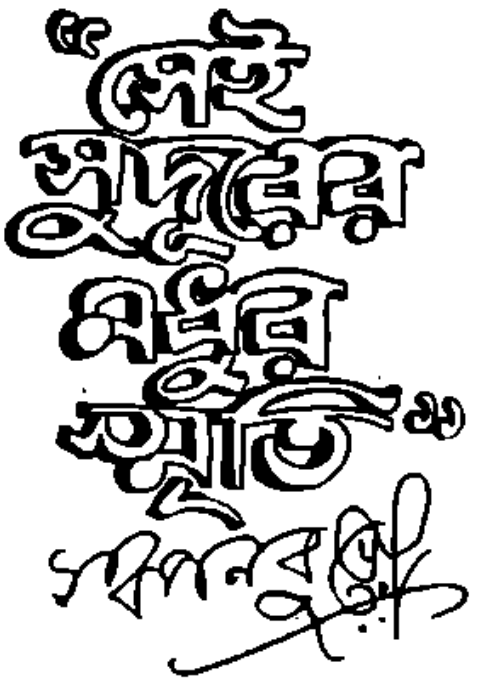

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ পাঁচ ॥

আমাদের সাহিত্যচর্চা একটু একটু করে জমে উঠছে। একটা খাতা করে নিয়েছি।

তাতে যখন-যা প্রাণ চায় লিখে রাখছি।

কখনো ছড়া কখনো কবিতা, আবার কখনো ছোট গল্প।

কিন্তু একটা ব্যাপারের অভাব আমরা কয়েকজন খুব অনুভব করছি যে, আমাদের কাছাকাছি কোনো খেলার মাঠ নেই। কাজেই ইস্কুল ছুটির পর আমরা প্রায় বেকার হয়ে যাই। তখন আমাদের কোনো কাজ থাকে না।

শুনেছি মাণিকতলা খাল পারে—মানে, খাল পেরিয়ে কোথায় নাকি স্কটিশের একটি নিজস্ব খেলার মাঠ আছে। কিন্তু অত দূরে হেঁটে হেঁটে ছেলেরা যেতে চায় না। তাছাড়া অভিভাবকেরাও ছেলেদের অত দূর ছেড়ে দিতে রাজি নয়। ওদিকটায় তখন একেবারে লোকের বসতি ছিল না। খালের ওপারে কিছু কিছু ঝোপ-জঙ্গল-খানা-খন্দও ছিল।

কত দূর সেই খেলার মাঠ—সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ধারণা ছিল না।

কখনো শুনতে পেতাম, স্কটিশ কলেজের ছেলেরা সেখানে ফুটবল খেলে।

তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে কি লাভ? আসল কথাটা ছিল—দূর।

অত দূরে খেলতে যেতে ইস্কুলের ছেলেরা বিশেষ উৎসাহিত হত না। আমাদের স্কটিশ বিদ্যালয় ছিল একেবারে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপরে। রাস্তা দিয়ে ট্রাম চলছে—গাড়ী-ঘোড়া চলছে, লোকজনের আনাগোনা। ভয়ের কিছুই ছিল না। ফেরিওয়ালার দল সুর করে তাদের সওদা নিয়ে সব সময় আনাগোনা করছে। পকেটে পয়সা থাকলে তার থেকেও পছন্দমত কিছু কেনাকাটা যেত।

আমাদের ইস্কুলের খুব কড়া আইন-কানুন ছিল। টিফিনের ঘণ্টায় কেউ রাস্তায় বেরিয়ে আসতে পারবে না। বড় রাস্তার দিকে সবুজ রঙের একটা বড় কাঠের ফটক ছিল। টিফিনের ঘণ্টায় সেটা বেমালুম বন্ধ থাকত। আর এক জাঁদরেল গোঁফওয়ালা দারোয়ান লাঠি হাতে সেই ফটক পাহারা দিত। আলেকজাণ্ডার সাহেবের কড়া হুকুম—টিফিনের ঘণ্টায় কেউ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে বেরুতে পারবে না। যে কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। সে দায়িত্ব নেবে কে?

অভিভাবকেরা ত' ছেলেদের ইস্কুলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত। সুতরাং ইস্কুলের দিক থেকেই যত কড়াকড়ি।

বড়লোকের ছেলেদের বাড়ী থেকে টিফিন আসত। বোতল ভর্তি দুধই বেশী। সঙ্গে দুটো চারটে করে সন্দেশ। আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখতাম—আর ইস্কুলের উঠোনে ছুটোছুটি করে খিদেটাকে আরো চাঙা করে তুলতাম। ইস্কুল ছুটির পর বাড়ীতে ফিরে যার হবিষ্যি পাকের সুন্দর আতপ চালের ভাত, নিরামিষ তরকারী, আর ঘায়ের গাতের দুধকলা মাখা ভাত যেন অমৃত বলে মনে হত।

খাওয়া দাওয়ার পর চাঙা হয়ে উঠে একেবারে ছাদে

চলে যেতাম।

মামা বাড়ীতে সেই সময় 'প্রবাসী' আর 'ভারতবর্ষ' কাগজ রাখতেন। সেইগুলো লুকিয়ে একেবারে সোজা ছাদে। আমাদের বড়দের গল্প আর উপন্যাস পড়া একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তুর দিকেই ছোটদের দৃষ্টি বেশী।

ঝাল আর টক আচারের দিকেই ছোটদের জিব লক্‌লক্ করে।

তেমনি নিষিদ্ধ বই পড়ায় যেমন আনন্দ আর উল্লাস তেমন আর কিছুতে নয়।

'প্রবাসী' কাগজটি আমাদের ছেলে বয়েসে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম। তাতে অনেক কিছু জানা যেত।

'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'পঞ্চশস্য', প্রভৃতি বিভাগগুলি পড়লে সাধারণ জ্ঞান খুব বেড়ে যেত।

তখন সে সব কিছু বুঝতে পারতাম না। পড়তে ভালো লাগতো তাই গো-গ্রাসে গিলতাম।

পরবর্তী জীবনে এই 'প্রবাসী' যে আমাদের কত উপকার করেছে, ভাষা শিখিয়েছে, জ্ঞান বাড়িয়েছে, বাইরের বিশ্বের দিকে দৃষ্টি আমাদের প্রসারিত করে দিয়েছে।

'ছেলেদের পাততাড়ি' বলে প্রবাসীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা বিভাগ ছিল। এই বিভাগের আকর্ষণ ছিল—সুন্দর সুন্দর ছিল মেয়া ছড়া, দেশ বিদেশের মজাদার সব কথা, ছোট ছোট গল্প। পড়ে খুব আনন্দ পেতাম। বড় হয়ে আমি যুগান্তর কাগজে 'ছোটদের পাতৃতাড়ি' পরিচালনা করতাম। তখন ছেলেবেলায় পড়া প্রবাসীর কথা খুব মনে পড়ত।

এই পাতৃতাড়ির ভেতর দিয়েই "সব পেয়েছির আসরের" প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এখন সারা দেশ জুড়ে এই সব পেয়েছির আসরের কত শাখা। তারা কত ভাবে সংগঠনের কাজে এগিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষাশিবির যাপন করছে, হাতের কাজ শিখছে ছেলেমেয়েরা।

আমার ছেলেবেলার কথা বলছিলাম।

আমি যে সময়ে স্কটিশ ইস্কুলে পড়তাম—সেই সময় আমার এক ক্লাশ ওপরে পড়ত—পরবর্তী জীবনের বিখ্যাত খেলোয়াড় বলাইদাস চাটার্জী।

তখনই সে স্পোর্টস্-এ দারুণ নাম করেছে। লং জাম্প, হাই জাম্পে একেবারে ওস্তাদ। খেলাধূলাতেও চৌকস। নানা রকম খেলায় এই বলাইদাস কাপ, শীল্ড জিতে আসত, আর আমরা চুটি আদায় করে নিতাম।

আমাদের ইস্কুল এ ব্যাপারে খুব উদার ছিল।

সাহিত্যেও যেমন প্রেরণা পেয়েছি—মিশনারী বালক কাগজ থেকে, তেমনি নিজেদের হাতে-লেখা কাগজ 'দিবাকর' আর 'অরুণ' আমাদের অন্তরে সাহিত্য-চর্চায় কম উৎসাহ যোগায় নি।

'সানডে স্কুলে' আমরা যেমন যীশুর জীবনী, আর নানা রকম রঙীন ছবিওয়ালা বাইবেল উপহার পেতাম, তেমনি আমাদের বিদ্যালয়ে সাহিত্যসভাও বসত। আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হত। সেখানে নিজেদের রচনা পাঠ করা হত। এই লেখার ব্যাপারেও ছোট বয়েসে প্রশংসা পেয়েছি।

আমাদের ওপরের ক্লাশে পড়ত যেমন খেলোয়াড় বি. ডি. চ্যাটার্জি—তেমনি আমাদের এক ক্লাশ নীচে পড়ত প্রবোধকুমার সান্যাল।

এই প্রবোধ পরবর্তী জীবনে নামকরা সাহিত্যিক হয়েছে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' লিখে এক সময় দারুণ নাম করেছে। ছেলেবয়েসেই দেখেছি সে বন-বাদাড়ে ঘুরতে খুব ভালোবাসত। অজানাকে জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। নারকেলডাঙার ওই অঞ্চলে ওর দিদিমার কাছে থাকত বলে শুনেছি!

সেই অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষায় যেতে থাকবার বয়েসে—আমি উপন্যাস-গল্প পড়ার কাজে একেবারে যেতে উঠলাম।

বাইরে বেরুবার ত' বিশেষ সুযোগ ছিল না! তাই ইস্কুল থেকে ফিরে—কি করি—কি করি ভেবে মনটা ছোক্ ছোক্ করতে থাকত!

সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াতাম কোথায় কোন বই লুকিয়ে আছে। সে বই খুঁজে বের করে একেবারে নিরালা ছাদে চলে যেতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের আলো থাকে—চোখ পিটপিট না করে—ততক্ষণ গো-গ্রাসে গিলতে হবে—সেই নিষিদ্ধ গল্প বা উপন্যাস। একদিন খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একটি চটি বই—

নাম—'অরক্ষণীয়া'। এটা আবার কি বই?

লেখকের নাম দেখলাম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বইখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রকাশিত আট আনা সংস্করণের একটি ছোট উপন্যাস।

এই রকম ছোট ছোট বই আট আনা দাম করে প্রকাশক প্রকাশ করছেন।

আজকের কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে ভাবা যায় না। হিসেব করলাম,—যাই হোক,—বিকেল বেলা ত' কাটবে।

আমার স্বামী নানা রকম বই পড়তে ভালোবাসতেন। ভাবলাম, তিনিই হয়ত কিনেছেন পড়বার জন্য। খোঁজ পড়বার আগেই বইটি শেষ করে ফেলা চাই।

তাই গোপনে বইটি নিয়ে নিঃশব্দে ছাদে চলে গেলাম।

ছোট ছোট টাইপে ছাপা—তখনকার দিনের ছাপা বই—

যাকে বলে একরকম হেলাফেলা করেই বইটি বের করা হয়েছে।

তবু পাতা উল্টে পড়তে বসলাম।

দুটো পাতা পড়বার পরই—সেই ছোট বইখানি যেন মনটাকে টেনে ধরল।

বিয়ে হয় না—এমন একটি অসুন্দর মেয়ের কাহিনী। মা আর মেয়ে পরের গলগ্রহ হয়ে কোনো রকমে দিন গুজরান করে।

কিন্তু লেখক কী ভাষায়—অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে লিখেছেন সেই গল্প।

আর সেই কিশোর মনটা যেন স্তব্ধ করে দিল। কোনো দিকে আর তাকাবার অবসর নেই।

এমন করে প্রাণের সকল আবেগ নিয়ে কোনো লেখক ত' কাহিনী রচনা করেন নি!

বই যখন শেষ হল—তখন দিনের আলো নিভে এসেছে—

আরো অবাক কাণ্ড!

গল্প পড়ে আমি কাঁদছি।

চেয়ে দেখলাম, সেই অসুন্দর মেয়ে জানবার দুঃখে—কোঁটা কোঁটা জল চোখ থেকে পড়ে ছোট্ট বইখানি ভিজিয়ে দিচ্ছে। কারো লেখা পড়ে কাঁদতে হয়—এমন অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে ছিল না।

সেই লেখকের ভাষার কী যাদু ছিল—তা সেই দিন সন্ধ্যায় কিছুই বুঝতে পারি নি! কিন্তু একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—সেকথা এই বৃদ্ধ বয়েসেও মনে করতে পারি।

আর এক লেখা পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম—

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করে।

"ম্যাগো, আমায় ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়েছি যে বেলা—
এখন শুধু তোমার কাছে বসে
করবো শুধু পড়া পড়া খেলা।"

অথবা—

—"খোকা মাকে শুধায় ডেকে—
এলাম আমি কোথা থেকে?
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে—
ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।"

এখন আবার এক নতুন সাথী জুটল—

যাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!!

এখন কেবল খুঁজে খুঁজে এই লেখকের লেখা বই পড়বার চেষ্টা করি।

কিন্তু সব সময় ত' আর শরৎচন্দ্রের বই সন্ধান করে বের করা যায় না। তাও আবার অতি গোপনে জোগাড়

করতে হবে।

ইস্কুলে অবশ্য ছেলেদের জন্য একটা গ্রন্থাগার আছে। কিন্তু ছোটদের পড়বার বইয়ের তালিকা আলাদা।

সপ্তাহে একদিন করে বই দেয়।

কিন্তু সেখানে ত' আর শরৎচন্দ্রের বই পড়তে দেবে না। চাইলেই ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। অথবা সরাসরি ক্লাশ-টিচারের কাছে নালিশ করবে।

কাজেই মন-মরা হয়ে ঘোরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার খাঁচিও বা সন্ধান পাওয়া যায়—শরৎচন্দ্র দূর অস্ত্……

কাজেই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়।

আজে-বাজে যে সব বই পাই—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ক্ষুধার্ত মানুষের মতো তাই দিয়েই উদর পূর্তি করি।

এই বিকেল বেলাটা কি ভাবে কাটাই—তাই হয়েছে আমাদের এক সমস্যা।

আমাদের একটা ছাত্রদল রোজ হেদোতে আসে বেড়াতে। শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গেই জুটে গেলাম।

বিকেল বেলা সেইখানে সবাই ছুটি। তারপর সবুজ ঘাসের ওপর দেহ এলিয়ে দিই। সামনে বড় বড় মাছগুলো মুড়ি আর মুরগার গুলি পেয়ে ভেসে ওঠে। দেখতে চমৎকার লাগে।

তখন এত সাঁতার কাটবার ধুম ছিল না।

মেয়েরাও কেউ সেই আমলে হেদোতে ঢুকত না। তখন ছেলেদেরই রাজত্ব।

আমাদের মধ্যে কোনো রাজনীতি ঢোকেনি। কখনো মুখে মুখে আবৃত্তি চলত…

কখনো চলত ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের কেরিকেচার… আবার কখনো স্বল্প জ্ঞানের সাহিত্য চর্চা…

আমাদের মধ্যে অনেকে ছবি আঁকতে পারত—

তা নিয়েও আলোচনা আর সমালোচনা চলত!

এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল—

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসছেন…

ব্রাহ্ম-সমাজে তিনি বক্তৃতা দেবেন।

শুনে ছেলে-মহলে সাড়া জেগে উঠল।

যারা রবীন্দ্রনাথের ছড়া, কবিতা পড়েছে—মুখস্থ করেছে—তাদের উৎসাহের অন্ত নেই।

আমরা শুধু জানতাম—রবীন্দ্রনাথ নামকরা কবি—বড়লোকের ছেলে—"শান্তিনিকেতন" নামে একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন—

সেখানে ছেলের দল খালি পায়ে সেখানে খুশী ঘুরে বেড়ায়, গান গায়—ছবি আঁকে!

আপন মনে খেলাধুলা করে।

গাছের তলায় ওদের ক্লাশ বসে!

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছে গল্প বলেন।

সেখানে ছেলেদের কোনো শাসন-বারণ নেই।

তারা দল বেঁধে নানা রকম অভিনয় করে—

দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে ভোরের বেলা সারা আশ্রম ঘুরে বেড়ায়—

তাদের বলা হয় বৈতালিক দল। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে এই রকম নানা কথা আমাদের কানে আসত।

সেই আমাদের মনের কবি, প্রাণের কবি, কল্পনার কবি কলকাতায় আসছেন। আর বক্তৃতা করবেন ব্রাহ্ম-সমাজে।

এ সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে? আমরা হেদোতে যেখানে বন্ধুর দল নিয়ে মিলিত হই—তার কাছেই কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপর ব্রাহ্ম-সমাজ। ব্রাহ্মরা সেখানে সমবেত হয়ে উপাসনা করেন, ভক্তিমূলক গান করেন—, আলোচনায় যোগ দেন। এইটুকুই আমাদের জানা আছে।

সবাই মিলে ঠিক করা গেল—সেদিন বিকেলবেলা হেদোতে মিলিত হয়ে ব্রাহ্ম-সমাজে যাওয়া হবে।

সেখানে রবীন্দ্রনাথকে দেখবো—তাঁর মুখের কথা শুনবো। আমরা কয়েকজন ইস্কুলের পর কথা সময়ে গিয়ে হেদোতে উপস্থিত হলাম।

(শেষাংশ ২৪০ পাতায়)

মহাকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

নিখিলরঞ্জন রায়

বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস অবিস্মরণীয় তিনটি নাম। এই নামত্রয়ের ত্রিবেণীধারায় যুগে যুগে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ-জীবন ও জন-মানস অভিসিঞ্চিত ও সঞ্জীবিত হয়েছে ও হয়ে আসছে। যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই মহাকবিত্রয়ের মূল্যায়ন প্রচেষ্টা অতি দুষ্কর। স্থনের পুঞ্জল সমুদ্রের গভীরতা মাপতে গিয়ে যেমন গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ফিরে এসে সমুদ্রের খবর দিতে পারে না, তেমনি মহাকাব্য-সমীক্ষকও বিশাল ও বিচিত্র ভাব-রস সমুদ্রের অতলে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—আর তার কোন হদিস মেলে না। বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শনের মতোই আমাদের ক্ষুদ্র আকিঞ্চন।

প্রাচীন ভারত-বিদ্যাবিদ্‌গণের (Indologists) মতে অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতে আর্যভাষায় রামায়ণকথা তাহার প্রথম রূপ পরিগ্রহ করেছিল। বাল্মীকি-রামায়ণ আর্ষ ভারতের আদি কাব্য। ২৪ হাজারেরও বেশী অনুষ্টুপ ছন্দে বিরচিত এই সুবিশাল মহাকাব্য। তীর্থ সলিলের মত পবিত্র রামায়ণী কথা যুগ যুগ ধরে সংসার-তাপদগ্ধ নরনারীর হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করে আসছে। এই অমর মহাকাব্য স্বর্গ ও মর্ত্যে যেন এক সেতু রচনা করেছে। বাল্মীকি দেবতাদের গুণকীর্তন করেন নাই। মানুষই কিরূপে দেবতার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই সংসারই কিভাবে সুখের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়, তাই তিনি দেখিয়েছেন। তাই রামায়ণী কথার মহিমা মানুষের চিত্তে চির অম্লান।

"যাবচ্চন্দ্র দিবা কর্তৌ ভূলোকে প্রচরিষ্যতঃ।
তাবদ্ রামায়ণী কথা ভূলোকে প্রচরিষ্যতি।"

চন্দ্র সূর্য যতদিন আলোক বর্ষণ করবে, রামায়ণী কথাও ততদিন ভূলোকে প্রচারিত হতে থাকবে। মহর্ষি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অতীত ও বর্তমান কালের কত কবি, কত কথাশিল্পী, নাটকার সংস্কৃত ও ভারতের নানা আঞ্চলিক ভাষাতে অমর কীর্তি স্থাপন করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি, ভর্তৃহরি, ভাস ও মুরারি, বাংলা সাহিত্যে রামচরিত-প্রণেতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, কৃত্তিবাস, উত্তর বঙ্গের কবি অদ্ভুতাচার্য, রাঢ়ের প্রসিদ্ধ কবি "রাঘ-রসায়ন"-প্রণেতা শ্রীরঘুনন্দন এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, মায় রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবেই আদিকবির আদর্শে অনুপ্রাণিত কিম্বা প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের শাশ্বত জাতীয় মহাকাব্য। এই মহাকাব্য দু'খানি কত ভাবেই যে আমাদের জাতীয় মানস ও কর্মসাধনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তার ইয়ত্তা নাই। এই মহাকাব্যদ্বয় আবার ইতিহাসও বটে—ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় এবং সামাজিক ইতিহাস। ভারতীয় জীবনের আদর্শ, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনীতি ও সমাজনীতি, রাজা ও প্রজার সম্পর্ক, গৃহধর্ম, যুদ্ধনীতি, তীর্থ মাহাত্ম্য, আপদ্ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের এক অভ্রান্ত ও অপরিহার্য এন্‌ সাইক্লোপেডিয়া। "রামায়ণী কথার" ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।" গৃহধর্মের আদর্শ কত উদার, কত মহৎ ও কত উন্নত হতে পারে রামায়ণ তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই আদর্শের সার্বজনীনত্ব অবিসম্বাদী। পারিবারিক জীবনের সুখ, শান্তি, এবং সামাজিক শৃঙ্খলা ও সংহতির পক্ষে এই আদর্শ সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষেই অপরিহার্য। মহাকবি বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণের উপাখ্যান মানবিক মর্যাদায় এমন এক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত যে, সারা বিশ্বের মানুষের কাছেই এ এক অনবদ্য ক্লাসিক রূপে আদৃত। রামায়ণের

ধার্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ আদর্শ ও নীতি চিরকাল মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে।

শুধু ভারতেই নয়, এককালে বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব বহু বিস্তৃত এশিয়া ভূখণ্ডে—যেখানেই প্রাচীন ভারতীয়েরা গিয়েছেন বা উপনিবেশ স্থাপন করেছেন সেখানেই—ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। বিশালতর ভারতবর্ষ, যথা ব্রহ্ম শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), কম্বোজ (কামপুচিয়া), চম্পা (Cochinchin), লাওস্, ভিয়েতনাম; দ্বীপময় ভারত ইন্দোনেশিয়া অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ; মধ্য এশিয়ার বহু অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়া হয়ে চীন ও মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্য পৌরাণিক উপাখ্যানও প্রচার লাভ করেছিল। সে সব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব এখন আর লক্ষণীয় না হলেও সেখানকার অধিবাসীদের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব আজও বহুলাংশে অক্ষুণ্ণ আছে।

উক্তরূপ বহুজনীন প্রভাবের কথা বিচার বিবেচনা করলে রামায়ণ, মহাভারত যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য তাতে সন্দেহ থাকে না। গ্রীক মহাকাব্য হোমারের ইলিয়াড, ওডিসি কিম্বা ইতালীয় কবি দাঁতে রচিত লাটিন মহাকাব্য "ডিভাইনা কমেডিয়া" আর ভার্জিল রচিত 'ইনিড',—এদের কোনটাই ব্যাপ্তি ও বিশ্বজনীন আবেদনের তুলাদণ্ডে রামায়ণ মহাভারতের সমতুল্য নয়। রামায়ণ-কথা আকাশের আলো বাতাসের মতই মানুষের চিত্তকে আলোকিত ও স্নিগ্ধ করে। নানা সামাজিক সংঘাত ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সঙ্কট সত্ত্বেও আজও রামায়ণের আদর্শ ভারতবাসীকে কল্যাণের পথ দেখায় এবং নানা বিচিত্র রস-পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মানুষের চরিত্রকে মহত্তর, উন্নততর ও সুন্দরতর করে তোলবার নির্দেশ দেয়।

বাল্মীকি-রামায়ণে আমরা তৎকালীন ভারতবর্ষের একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক চিত্র দেখতে পাই।

সে সময় ভারত ভূখণ্ডে তিনটি বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা বিদ্যমান ছিল। (১) মিথিলা ও অযোধ্যার সভ্যতাকে বলা যায় মৈথী বা অধ্যাত্ম সভ্যতা। সে সভ্যতায় বস্তু-সম্পদ ও বুদ্ধি বিদ্যার যথাযথ মূল্য স্বীকৃত হলেও মানুষের মূল লক্ষ্য ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ। যে সভ্যতা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী। (২) ভারতের অতি নিকট প্রতিবেশী লঙ্কার সভ্যতা ছিল বস্তুতান্ত্রিক অথবা আসুরিক সভ্যতা। বৈদিক যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড সেখানে পূর্ণ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত বটে, কিন্তু সে সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ছিল সম্ভোগ। বিত্ত সম্পদ ও ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের উপরেই ছিল সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। রাক্ষসগণ নানা বিদ্যা, জড় বিজ্ঞান ও রাজনীতির চর্চায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। রাক্ষসী সভ্যতা ছিল রজোগুণ প্রধান। (৩) ভারতের দক্ষিণ-মধ্য অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যার অঞ্চলে ছিল আর এক প্রকারের সভ্যতা। কিষ্কিন্ধ্যার সভ্যতা আর্য সভ্যতা হতে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সেখানকার সমাজ ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন রূপ। একে বলা হয় অনার্য সভ্যতা।

বাল্মীকি-রামায়ণের কবিত্ব ও প্রসাদ গুণও পরম উপভোগ্য। মহাকবি কালিদাস উপমায় অনন্য সাধারণ, কিন্তু কালিদাসের উপমার রসাস্বাদন অনেক স্থলেই ব্যাখ্যা ও অর্থবোধের উপর নির্ভরশীল। আদি কবির উপমা সরল, সহজ ও প্রসাদগুণ-ভূষিত। রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতা হরণে চলেছে—মহাকবি বলছেন ঘোর অন্ধকার যেন সূর্যচন্দ্রহীনা সন্ধ্যাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বহু সরল উপমা ও গভীর সত্যোপদেশে বাল্মীকি-রামায়ণ সুসমৃদ্ধ। মুমূর্ষু জটায়ু রাবণকে বলেছিলেন:

ন হি সম্ভোঽবিনীতস্য দুষ্কৃতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যপীতবত্তার্থ শস্ত্রানীব পরুষে॥

দুষ্কর্মের প্রতিফল তখন তখনই পাওয়া যায় না। শস্য পেকে উঠবার জন্য যেমন কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়, তেমনি দুষ্কর্মের পরিণামও কিছুটা সময় সাপেক্ষ, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী।

কবিত্ব-সম্পদেও বাল্মীকি-রামায়ণ সাহিত্যশিল্পের এক অনবদ্য সৃষ্টি। মহাকবির রচনা উপাখ্যানের অভিনবত্বে, ভাব-সম্পদের গভীরতায় এবং বর্ণনাকৌশলে সমুজ্জ্বল।

কিছিন্ধ্যাকাণ্ডে ঋতু পরিবর্তনে প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা কি অপরূপ! অংশ মাত্র এখানে উদ্ধৃত করি।

সুস্থৈক হংসং কুমুদৈরলঙ্কৃতং মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং তারাগণাকীর্ণমিবাম্বরীক্ষম্॥
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবৃদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
আপ্লুত্যবানামধিকাহ্নু সম্পদ্বীর্যরাজন্যনামিব দুর্বিতানাম্॥
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈর্বায়ুপ্রযানৈ মৃদুর্মারুতেন।
দৌতামলক্ষৌমপট প্রকাশৈঃ কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি॥
বন প্রচণ্ডা মধুপানমত্তাঃ প্রিয়াম্বিতাঃ ষট্চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
বনেষু মত্তাঃ পবনাস্থ যাত্রাং কুর্বন্তি পদ্মাসনলোলগৌরাঃ॥
জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং শ্লোকস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ শংসন্তি বর্ষব্যপনীত কালম্॥

রাম লক্ষ্মণকে বলছেন, দেখ ঐ মহাহ্রদ (পম্পা) কিরূপ শোভা ধারণ করেছে—তাতে অসংখ্য কুমুদ ফুটে রয়েছে এবং তারি ভিতর একটি হাঁস ঘুমিয়ে আছে। মনে হয় যেন মেঘমুক্ত তারাকীর্ণ নৈশ আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত চপল হংসরূপ মেখলায় পরিবেষ্টিত, প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপলে শোভিত জলাশয়গুলি যেন নানা ভূষণে সজ্জিতা বরাঙ্গনাগণের ন্যায় বিরাজ করছে। নদীতীরে নববিকশিত কাশকুল মৃদুমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হয়ে নির্মল পট্ট-বস্ত্রের মত শোভা পাচ্ছে। বন মধ্যে মধুপানে মত্ত, পদ্ম ও অশন পুষ্পের রেণুতে পীতবর্ণ ষোমাছিরা প্রিয়াসঙ্গবিলাসী হয়ে মত্তভাবে বায়ুর গতি অনুসরণ করছে। নির্মল জল, প্রস্ফুটিত ফুল দল, তীক্ষ্ণ শ্লোক-ধ্বনি, সুপক্ক শালিধান, মৃদুমন্দ বাতাস ও বিমল চন্দ্র ঘোষণা করছে যে, বর্ষাকাল অপনীত এবং শরৎ সমাগত।

বাঙালীর জীবন চর্যা, জনমানস ও জাতীয় জীবন-গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এক কালে উড়িষ্যা হতে কামরূপ এবং রাজমহল হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত ও প্রচারিত হত। বাঙালীর ঘরে ঘরে, চণ্ডীমণ্ডপে, মুদীখানায়, বারোয়ারি তলায়, গাঁয়ে, গঞ্জে ও শহরে সর্বত্রই ধনী দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধবনিতা ভক্তিগদগদচিত্তে রামায়ণ-পাঠ শুনত। রামায়ণ পাঠ ছিল আমাদের নিত্য জীবনের এক অতি প্রিয় লৌকিক অনুষ্ঠান। ১৩৯৮ খ্রীঃ অব্দে মহাকবি কৃত্তিবাস এই বঙ্গভূমের ফুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। স্বনামধন্য গৌড়েশ্বর হিন্দুকুলতিলক যদুজয়মর্দন দেবের আদেশেই কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দ রামায়ণ রচনার কাল বলে অনুমিত হয়। সে সময়টা ছিল হিন্দু সমাজের ঘোর বিপর্যয়ের সময়। নিষ্ঠুর তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় বলাৎকার ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে হিন্দু রমণীকুলের মধ্যে সাহস, সহিষ্ণুতা এবং সতীত্বের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কৃত্তিবাস সেই ঘোর সঙ্কটে জাতির ত্রাতা-কবি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আরও প্রায় দু'শো বছরের পরবর্তী হিন্দী কবি ভক্ত তুলসীদাসকেও অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। উভয়েই কলি-কলুষ নাশকরূপে আখ্যাত।

কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস কেউই বাল্মীকি রামায়ণের পুরাপুরি অনুসরণ করেন নি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রত্নাকর দস্যুর কাহিনী, তরণীসেন বধ, রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্রের অকাল দুর্গাপূজা ইত্যাদি উপাখ্যান বাল্মীকি রামায়ণে নাই।

বাল্মীকি-রামায়ণ এক সুবৃহৎ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ—২৪ হাজারেরও বেশী শ্লোক এর অন্তর্ভুক্ত। কয়জন বাঙালীর পক্ষে এই শ্লোক-সমুদ্রে অবগাহন করে মূল কাব্যের রস-মাধুর্য আস্বাদন করা সম্ভব? বাংলার কৃত্তিবাস ও হিন্দী-কবি তুলসীদাস সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে গিয়েছেন—প্রচলিত সহজ লোক-ভাষায় ওঁদের মহাকাব্য রচনা করে। যে কোন দেশে ও ভাষায় এ-হেন লোক-শিক্ষক দুর্লভ। এঁরা নিজ হৃদয়-দর্পণে সমাজের যে প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন তারই এক অপূর্ব আলেখ্য সৃষ্টি করে কবিরূপে অমর কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। কৃত্তিবাস প্রকৃত পক্ষেই কৃত্তিবাস; আর তুলসীদাস ভক্তিরসের প্লাবনে জন-মানসকে সঞ্জীবিত করে হয়েছেন ভক্ত কবি।

কবিদের কেউ কেউ দু'টি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে

থাকেন। এক শ্রেণীর কবি অভিনব ভাবধারার প্রবর্তক, জাতির জীবনে নূতন ইতিহাসের রচয়িতা ও ইতিহাসের নিয়ামক। বাল্মীকি মানব-মনের অন্তস্তলদর্শী সেই শ্রেণীর মহাকবি। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা জাতির অনাহত জীবন-বীণায় যে সুর ঝঙ্কৃত হয় তাকেই উচ্চ গ্রামে বেঁধে জনমনমুগ্ধকর সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। মহাকবি কৃত্তিবাস ও ভক্তকবি তুলসীদাসকে শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত করা যায়। ভগীরথের ন্যায় মানুষের মনোভূমিকে এঁরা কাব্য-গঙ্গার পূত সলিল ধারায় স্নিগ্ধ ও উর্বর করেছেন। চর্যাপদের কোন এক বিস্মৃতনামা কবি-কণ্ঠে একদিন যে বাণী উচ্চারিত হয়েছিল বঙ্গ-কবি কৃত্তিবাস যেন সে বাণীরই মূর্ত প্রতীক।

"মনরসময়ী গভীরা বঙ্কিম সুভগো উপজীবিতা করিতিঃ।
অবগাঢ়া চ পুণীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥"

মনরসময়ী বাঙ্গালা ভাষা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বারিধারার মতোই এই প্রান্তীয় ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের মনোভূমিকে লালন করেছে। বিশুদ্ধ পয়ার ছন্দে বিরচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সুকণ্ঠ গায়কের কলাকৌশলে অপূর্ব শ্রুতিমধুরে পরিণত হয়।

"ফল পুষ্প দেখিলেন গন্ধে আমোদিত।
মধুরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত॥
নানা পক্ষি কলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিনজন মনসুখে করেন ভ্রমণ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
সকৌতুকে নানা স্থল করে নিরীক্ষণ॥"

তুলসীদাসের "রামচরিত মানসে" আখ্যানবস্তু অপেক্ষা ভক্তি-নিবেদনই প্রাধান্য পেয়েছে। ভক্তি-মন্দাকিনীর পবিত্র-মধুর ধারা বইয়ে দিয়েছেন ভক্তশিরোমণি তুলসীদাস।

শাপগ্রস্তা পাষাণভূতা অহল্যা ভগবান রামচন্দ্রের পবিত্র পদরজঃস্পর্শে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত গভীর আত্মনিবেদনের আকুতি—

"বিনতী প্রভু মোরী মৈঁ মতিভোরী নাথ ন মাঁগউঁ বর আনা।
পদ কমল পরাগা রস অনুরাগা মম মন মধুপ করই পানা॥"

প্রভু, আমি আর কোন বর চাই না। আমি মন্দমতি, আমার এই মিনতি যে, তোমার চরণ পদ্মের পরাগের মধু আমার মন-ভ্রমর যেন অনুরাগের সহিত পান করে।

"জেহি পদ সুরসরিতা পরম পুনীতা প্রগট ভই সিব সীস ধরী।
সোই পদপঙ্কজ জেহি পূজত অজ মম সির ধরেউ কৃপাল হরী॥
এহি ভাঁতি সিধারী গৌতমনারী বার বার হরিচরণ পরী।
জো অতি মন ভাবা সো বর পাবা গই পতিলোক অনন্দ ভরী॥"

যে কৃপাময়, যে গঙ্গা শিবের মাথায় থাকেন—সে গঙ্গা যাঁর চরণ হতে উদ্ভূতা এবং যে চরণ ব্রহ্মা পূজা করেন, সেই তুমি আমার মাথায় হাত দিয়েছ। অহল্যা এই কথা বলে বার বার হরির (রামচন্দ্রের) চরণে পড়তে লাগলেন, এবং মুক্ত হয়ে যে ভুবনে তাঁর স্বামী সেই ভুবনে উত্তীর্ণ হয়ে স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন।

তাই, তুলসীদাস প্রার্থনা করছেন :—

"অস প্রভু দীনবন্ধু হরি কারণ-রহিত দয়াল।
তুলসীদাস সঠ তাহি ভজু ছাড়ি কপট জঞ্জাল॥"

এমন যে দীনের বন্ধু হরি, যিনি অকারণ দয়া করেন, ওরে মূর্খ তুলসীদাস, কপট জঞ্জাল ছেড়ে তাঁকেই ভজনা কর।

"কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ।" যিনি দেখেন, যিনি জানেন, যিনি প্রকাশ করেন তিনিই প্রকৃত কবি। এই ত্রিকালদর্শী সর্বানুভূঃ কবিত্রয়ের অমৃত বাণী চির সত্য, চির ভাস্বর।

শ্রীমৎ
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঠাকুর, আমার চতুর্দিকে এত বাধা লইয়া তোমাকে বুকে লইয়া কেমনে আগাইব ? রেণুর শরীর, বিনুর শরীর, প্রতিভার শরীর, সোপার শরীর এমনই যে ইহাদের রোগের ও ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তোমার পথে চলা যে কি শুরুতর ব্যাপার তাহা আমি আজ বুঝিতেছি। তুমি আছ, তাই আমি চলিব। সব কিছু এখানের রেণুর কাজ করার উপর নির্ভর। তুমি যাহা হয় করিও। তুমি প্রকাশিত হইবে না—ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। বর্তমান সমস্যার সমাধান তুমি ও তোমার দর্শন ছাড়া আর কেহ দিতে পারিবে না। রামপন্থীরা এমন একটা অস্বস্তিকর আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছে যে, ইহাদের হাত হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে তোমারই সর্বাপেক্ষা বেশী যোগ্যতা রহিয়াছে। ইহাদের দিন সন্নিকট। পাঞ্জাবে দ্বিতাধিক রাজ্য গঠিত হইতে চলিয়াছে। দুইটি আঞ্চলিক কমিটির হাতে যে যে অঞ্চলের ভাষা কৃষ্টি রক্ষার ভার থাকিবে। ইহাদের সিদ্ধান্ত বিধান সভা মানিয়া লইবে। যদি দুইয়ের মধ্যে বিরোধ হয়, রাষ্ট্রপাল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন। বুঝা যাইতেছে বাঙ্গালা-বিহারও এই ভাবে 'এক' হইবে। তোমার সমন্বয়ের আদর্শ এখানেও বলবৎ হইবে। ৯টায় বিষ্ণুপদ নারিকেলডাঙ্গা হইয়া আসে। ব্যাপার দেখে। ৪টায় চলিয়া যায়। ওখানে কিভাবে চলে সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুপদের সঙ্গে আলোচনা হয়।.....৫টার পর খুব মেঘ হয়। তাহার মধ্যে রেণু পি সাহাকে সোপাকে দেখাইবার জন্য লইয়া যায়। ১৫০০ টাকা ভিজিট দেয়। ..... ৪ঠা এপ্রিল

জীবনে খাওয়া-পরা চলা-ফেরার জন্য কাহাকেও বেগ দেই নাই। আমি ছিলাম অনপেক্ষ, অতি অল্পে সন্তুষ্ট। তাই এত পথ কোথায়ও মাথা না বিকাইয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছি, পা ফসকাইয়া যাই নাই। ভারী বোঝা নিয়া কি দীর্ঘ পথ চলা যায় ? আমার জীবন ছিল সহজ। তাই সকল খাওয়ায়, অতি সহজ খাওয়ায় যখন তখন যে-সে অবস্থায় চলিতে পারিয়াছি। কাঁথিতে গভীর রাত্রিতে পুলিশকে ফাঁকি দিবার জন্য খালি পায়ে চষা ক্ষেত অতিক্রম করিয়াছি। কি বিপ্লবের আগুন বুকে লইয়া সারা জীবন সব সুখ দুঃখ পদদলিত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। ঠাকুর, তোমাকে,তোমার দর্শনকে রোপায়িত করিব, তাই 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য' চলিয়াছি। পথের কাঁটায় রক্তাক্ত হইয়াছি, হৃদয়-ব্যথায় বিচলিত হই নাই। চলিবার আনন্দে মাতাল ছিলাম। আজ কি সেই আমার আনন্দের চলা স্তব্ধ হইবে ? এত বাধা ঠেলিয়া কি তোমাকে নিয়া আগাইয়া চলিতে পারিব ? তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক আমার সকল পদক্ষেপে। আমি তোমার, সর্বতোভাবে তোমার। রেণু এল সরকার প্রভৃতি ঘুরিয়া ৬টার পর আসে। ৫টায় উপেন ধর আসে। ৫॥ টায় ট্যাক্সীতে যাই। ৭টার পর আলোচনা আরম্ভ হয়, ৯টার পর শেষ হয়। সংসারের ওপারে ভগবানকে পাইতে হইলে এই সংসার গুছাইবার কোন প্রশ্নই উঠে না। আজ ভগবান যখন সংসারের বুকে অবতীর্ণ তখন তাঁহার মনস্তত্ত্বের ছাঁচে সকল সম্পর্ককে গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ইহাই বিশ্বের দিব্য রূপান্তর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন করিয়া যে ছন্দে সংসার করিয়াছেন, তেমন করিয়া তাঁহার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া আমাদিগকেও সংসার করিতে হইবে। ইহাই আলোচনা করিয়াছি। এত লোক চাকুরিয়া কালীবাড়ীতে কোন দিন হয় নাই। মহাকালীর কথা দিয়া আরম্ভ করি। উপেনের ওখানে···যাই। ধীরেন মজুমদার, ধীরেন ব্যানার্জী, নকুলেশ্বরবাবু, হরবিলাস বোষাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ১১টায় ধীরেন ডাক্তার আসে। ৫ টাকা আশ্রমের সেবার জন্য দিয়া যায়। সকালে সেবানন্দ আসিয়াছিল, তাহার কাছে শুনিলাম প্রণব নাকি নবদ্বীপ মঠে আশ্রয় নিয়াছে। বেশ তো। ৫ই এপ্রিল

সহস্র সহস্র বক্তৃতা দিয়াছি। মানুষ শুনিয়া মুগ্ধ

হইয়াছে, বক্তৃতাকালে কেহ সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু কেহ কি ছুটিয়া আসিল ইহা গ্রহণ করিবার জন্য? আমার ধর্মকে রাজনীতিকে জীবন দিয়া যোগাঞ্জিত করার নির্দেশের মধ্যে কেহ যোগ দিতে সাহস পায় না। জীবত্ব বজায় রাখিয়া শিবত্ব লাভ হইবে কেমন করিয়া? শিবত্বের আদর্শে জীবত্বকে কি করিয়া গড়িয়া তোলা যায় আমি তাহা বলি বলিয়া মানুষের প্রাণ সায় দেয়, কিন্তু বুদ্ধিতে তাহা নিতে পারে না। এই তো, প্রণব মহম্মদার নাকি নবদ্বীপে আশ্রয় নিয়াছে। কাহারও কথার কি কোনও মূল্য আছে? আমিই নিত্যগোপালের দর্শন বলি —ইহা প্রণব একদিন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়াছে। আর আজ যেহেতু আমি এখনই সন্ন্যাস দিলাম না, তাই সে অন্যত্র গেল? আমার কোন আপত্তি নাই। সন্ন্যাস—গেরুয়া পরা—কি এতই বড়? থাক, পথের ধারে বসিয়া আছি। যাহা পাই, যাহা না পাই—দুই-ই বরণ করিতে হইবে। ঠাকুর, তোমার জয় হউক। রেণু ব্যাঙ্ক প্রেস প্রিন্টিয়ার হইয়া ৩টায় ফেরে। ৬টার পর রেণু ও আমি মঠে যাই। একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসেন, তিনি মাঝে মাঝে আগে আসিতেন। 'আনন্দ' হইতে দুঃখময় সংসার কেমনে সৃষ্টি হইল তাহার আলোচনা করি। 'সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে'। দুঃখও আনন্দের আস্বাদন। মানুষ দুঃখও চায়। নইলে সংসার লইয়া এত মাতে কেন? 'বিবাহৃতে একত্র মিলন'। সৎ—পুরুষ, চিদানন্দ—প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষ সমন্বয়ই creative। 'আনন্দ' আসিলেই বহুর কথা, সৃষ্টির কথা আসিবে। শঙ্কর-বুদ্ধ সমন্বয় নিত্যগোপাল ছাড়া কেহ করেন নাই। একই পরম সত্যের বুদ্ধ দিয়াছেন এক দিক, শঙ্কর দিয়াছেন অপর দিক। শঙ্কর Father of static life, বুদ্ধ father of dynamism। শঙ্করে নারায়ণের মহিমা, বুদ্ধে নরের মহিমা। শঙ্কর একত্বের, বুদ্ধ বহুত্বের, রূপের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। এক বহুর সমন্বয় নিত্যগোপাল দিয়াছেন। শেষে প্রণবকুমার মল্লিকের সঙ্গে কথা হইল। তাঁহার ভাল লাগিয়াছে এই নূতনত্ব। সত্যেন শাস্ত্রী ২ বৃহস্পতিবার আলোচনা করিয়াছে। তাহার স্বার্থ আছে, সে জ্যোতিষী ব্যবসায় সুরু করিয়াছে। তাহার প্রচার হউক। আশুবাবু, নারায়ণবাবু ও আশা আসিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। ৬ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমার বিপ্লবী রূপের খবর কি বিশ্ব পাইবে না? মহানির্বাণ মঠে যে-রূপের সেবা চলিতেছে, তাহাই কি সবখানি? ভক্তগণ প্রণাম করে, প্রসাদও পায়, অথচ জীবন সেই static সেই statice, একটুও নড়চড় নাই; কোথায় নির্ভয়-বিশ্বাস, জাতি কুলশীলের বন্ধন ছিঁড়িয়া মুক্ত আকাশতলে বিশ্ব মানবের সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইবার দুর্জয় লালসা? যাহা হউক, আগে পাঠাদি কিছু হইত না, এখন তাহা হইতেছে। ইহাও ভাল। কিন্তু তুমি কোথায়? তোমার দর্শন কোথায় সেই পাঠের মধ্যে? ভাগবতের যে ব্যাখ্যা হয় তাহার মধ্যে কি জড়াজড় সমন্বয়-দর্শন ফুটিয়া উঠে? যাহা ফুটিয়া উঠে তাহাতে মায়ার 'মিথ্যাত্ব-'ই ফুটিয়া উঠে। ব্যবহার মিথ্যা, পরমার্থ সত্য—ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্মের প্রতিপাদ্য। বর্ণাশ্রমও সমাজ গড়িয়াছে, কিন্তু তাহা ব্যবহারিকভাবেই সত্য। উহা ছাড়িয়া একদিন কেবল হইতে হইবে—ইহাও তাহারা বলে। কিন্তু ভাগবত ধর্মে, তোমার দর্শনে ব্যবহারও পরমার্থের অপর দিক সমন্বয়তা ব্রহ্ম-আস্বাদনের ঘন রস—ইহা কি বর্ণাশ্রম বলে? ঠাকুর, তুমি আবার এস, তোমার দর্শন প্রচার কর। রেণু সুরেন রায়, সুহৃৎ মিত্র ও প্রিয়রঞ্জনবাবুর উজ্জ্বল-ভারতের চাঁদার টাকা লইয়া আসে। প্রিয়রঞ্জনবাবু বলেন, কেমন করিয়া এত খরচ চালাইবে উজ্জ্বল ভারত দিয়া? ৩টায় সন্তোষ ভট্টাচার্য আসে। ৪টার পর আমি রেণুসহ বাহির হইয়া প্রথমে হরিবাসী ও পরে মধুর বাসায় যাই। ৬টায় ফিরি। গত শুক্রবার মঠে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—শ্রীযুধবিন্দু ঘোষ—তিনি আমাদের আসার আগে আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি বলেন, শাস্ত্রের ভিতর এমন একটা ত্রুটি ছিল যাহার ফলে এ দেশ পরাধীন হইতে পারিয়াছে। সেটা কি? আরও জিজ্ঞাসা করেন, এতদিন সেল তবু নিত্যগোপাল প্রচারিত হন নাই কেন? মহানির্বাণ মঠের খবর কে জানিত? এখানে সাধুরা খায় দায় ঘুমায়। এই সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করি। রেণু ভারতীর আরণ্যক-নাগরিক সভ্যতা পড়িয়া শুনায়। ৮টায় পর যান। তাঁহাকে সভাপতির অভিভাষণ, মাঘ-ফাল্গুনের পত্রিকা ও 'সমন্বয়-মূর্তি নিত্যগোপাল' দেওয়া হয়। চৈত্রের উজ্জ্বল ভারত প্রেস আজও দিল না। অদ্ভুত এরা! ৭ই এপ্রিল

(চলবে)

দূরের আকাশ

অনিলরঞ্জন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কলেজ ষ্টিটের মোড়ে ছোট্ট একটি স্টেশনারী দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বৈশাখী চুলের ফিতের দাম করছিল। ওর ছোট্ট বোন বুলু বেরোবার মুখে বলে দিয়েছিল ওর জন্যে লাল রং-এর একটা ফিতে কিনে আনতে। বৈশাখীরা সাত বোন। কিছু দিন আগে ওর এক দিদি একজন মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে লাহোর চলে যায় স্বামীর সংগে। এই ঘটনায় অনেকটা এক ঘরে হয়েছিল ওরা। পরে ওদের বাড়ীর লোকেরা চোরের মত লুকিয়ে চুরিয়ে এখানে ওখানে যাতায়াত করত। লজ্জা থেকে এর মধ্যে বেরে যাওয়ার ভাবটাই বেশী। ওর বাবা এক মার্চেন্ট অফিসে মোটামুটি ভাল চাকরীই করেন। মাইনেটা বলার মতই। কিন্তু এই মাইনেটা দিয়ে সংসারের হাল তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। মেয়েদের বয়েস পেরিয়ে গেলেও জামাই আনার মতো অবস্থা তার নয়। একটা সাধারণ ছেলের হাতে মেয়েকে দিতে গেলে যা কিরিস্তি তিনি শুনে এসেছেন তা কার্যে রূপান্তরিত করতে গেলে অন্য ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যত আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে ভেবে কিছুটা এগিয়েছেন আবার পিছিয়ে এসেছেন। বাপের এই অসহায় অবস্থা দেখেই হউক অথবা যাকে কাছে পেয়েছে তাকে নিয়েই বুকে পড়া থাক ভেবেই হউক ঘটনাটা ঘটে গেছে। দিদি তো স্নোতের টানে রশি আলগা করে দিয়ে গা ভাসিয়ে দিলো কিন্তু সংসারের অন্তান্তদের কী হাল সে তো কিছু দিন ধরে দেখে আসছে সৈকত।

দেখে দুঃখ হলেও কিছু করার মতো অবস্থাতো সৈকতের নয়।

বেশ কিছু দিন সৈকতও ওকে এড়িয়ে চলতো। পাশাপাশি বাড়ীতে ওরা থাকলেও একজন আরেকজনকে এড়িয়ে চলতো। তবুও সময়ে অসময়ে বৈশাখীর কালো চোখের চাউনিটা ওর বুকে আঘাত হানত।

এখন অবস্থাটা অনেকটা থিতিয়ে গেছে। বৈশাখীদের বাড়ীর লোকেরাও অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

বৈশাখীর প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল ছেলেবেলা থেকেই সৈকতের। বৈশাখীও জানে সৈকতের ঐ দুর্বলতাটুকুর জন্যে কতটা কষ্ট পাচ্ছে ও। চাকরীর জন্য কত ঘোরাঘুরি করেছে এ ক'বছর সৈকত কিন্তু অবস্থার কোনও হেরফের হয় নি।

ওদের সম্পর্কটাও তাই এখন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে যেখান থেকে শুধু একজন আর একজনকে দেখে চমকে উঠে। এগিয়ে গিয়ে কাছে টেনে আনতে ভয় পায়। তবুও সম্পর্কটা আছে। হয়তো থাকবেও। যদিও কিছুদিন ধরে ওরা এড়িয়ে চলছে একজন আর এক জনকে।

এ সময় সৈকত অমন একটা দোকানের সামনে বৈশাখীকে আশা করে নি। অনেকটা আশ্চর্য হওয়ার গলায় সৈকত বললো তুমি!

ঐ ছোট্ট একটা ডাকেও বৈশাখীর ভেতরটা কেঁপে উঠল। কাছে এগিয়ে এলো সৈকত।

বৈশাখীর দৃষ্টিটা এত ক্ষণ ঘোরাফেরা করছিল দোকানে সাজানো জিনিষ গুলোতে।

রয়েছে রকমের জিনিষ। নখের পালিশ থেকে চুলের

কিনতে পর্যন্ত কত লোভনীয় জিনিসে ঠাসা দোকানটা। দোকানী দেখছিল বৈশাখীকে। আর বৈশাখী দেখছিল জিনিষগুলোকে। খুব একটা ভীড় ছিল না দোকানে। কাজেই কেনা বেচার ফাঁকে বাড়তি লাভটুকুর দিকেই বেশ দৃষ্টি দোকানীর।

ওতো আর জানে না কত জ্বালা ঐ বৈশাখীর বুকে। কত না পাওয়ার ব্যথা ছড়িয়ে আছে ওর ঐ সুডৌল দেহের এখানে ওখানে। রংটা খুব ফর্সা না হোলেও বয়েসের যৌবনটুকুও তো কম নয়। কতই বা বয়েস। কাজেই একটি যুবতী মেয়ের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে যতটুকু সম্ভব দৃষ্টি দিয়ে মনটিকে একটু সরস করে নিচ্ছিল দোকানী। মেয়েরা যতো অভাবের মধ্যেই থাকুক না কেন বাইরে থেকে তাদের আকর্ষণ কিন্তু বিন্দুমাত্রও কমে না। কারণ বাইরে থেকে নিজেদের লুকিয়ে রাখাই ওদের স্বভাব।

তাই কেউ বুঝতে পারবে না ঐ সাত বোনের এক বোন বৈশাখীর মনটা দোকানের চার দিকে ঘুরলেও তার ঐ গোপন জীবনের কথা।

বাইরে থেকে সেও যা বোঝা যায় থেকে বেরিয়ে আসা অন্য মেয়েগুলোও তাই। ওদের অবস্থার হেরফের থাকলেও সাজে, লাজে, চাউনিতে, কিংবা চলার ভঙ্গীটুকু ওদের সকলেরই এক।

দোকানীর কাছে বৈশাখীর আকর্ষণও তাই মোটেই কম নয়। দোকানী কি ভাবতে পারবে যে এই একটু আগেই কত আশা নিয়ে এসে বৈশাখী আবার শূন্য মনেই বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় বৈশাখীর। এই কলকাতা শহরে কত অফিস। অথচ কোনও একটা জায়গাতেও ওর যে কোনও রকমের একটা চাকরী হচ্ছে না। হয়ত হবেও না। তবু ওকে চাকরীর চেষ্টা করে যেতে হবে।

সৈকত বেকার। বেকার বৈশাখীও। কিন্তু মেয়ে বেকার মানে আরও সাংঘাতিক অবস্থা।

একটা মাসিক টিকেট আছে বৈশাখীর। রোজ যাতায়াত করছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। যেহেতু মাসিক কাজেই দিনে দু'বার তিনবার যাতায়াত করলেই বা বাধা দিচ্ছে কে। ওর তো ছুটি কেউ আছে। যাতায়াতের পথে কত অদ্ভুত ঘটনা ও দেখে আসছে এই টিকেটকে কেন্দ্র করে। কোনটা লেখা আবার কোনটা শোনা।

একদিন একটি ছেলে গেট পার হচ্ছিল, গেটকিপার বল্লে, খোকা টিকেট।

ছেলেটি উত্তর না দিয়ে বুক পকেটে হাত রাখলো। মানে পকেটে টিকেট। পার হলো এমনি ভাবে কত লোক। সকলেই বুকে হাত দিয়ে বুঝালো তাদের সকলেরই টিকেট আছে পকেটে। কিছুক্ষণ বাদে একটি লোক পার হচ্ছিল যার গায়ে জামা ছিল না। পরণে শুধু একটি লুঙ্গি। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে অম্লানবদনে বুক দেখিয়ে দিলো। ধপ করে তাকে ধরে ফেলল গেট-কিপার। চালাকি পেয়েছ? বলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

অর্থাৎ যা সকলকে করতে দেখেছে তাই করছিল ও। কিন্তু পার হওয়া আর তার হোল না। ওর কী অপরাধ বুঝতে পারলো না লোকটা। টানতে টানতে ওকে ধরে ধরে নিয়ে গেল গেটকীপার। ঘটনার বিবরণ শুনে সকলে তো অবাক।

এত দুঃখের মধ্যেও এই সমস্ত ঘটনা যখন শোনে বা দেখে বৈশাখী খুব কৌতুহলী হয়ে উঠে।

সকালের দিকে বেরোয় ও। ফেরে বারোটা একটা নাগাদ। আবার বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সন্ধ্যের দিকে আবার কোনও দিন একটু রাতও হয়ে যায়। এ অফিস, সে অফিস, এ বন্ধু ও সে বন্ধুর দাদার অফিসে ঘুরে ঘুরে হাজিরে দিয়ে যাচ্ছে ও। যদিও কোনও জায়গা থেকেই কোনও আশা পাচ্ছে না, তবু চেষ্টা তো করতে হবেই, এত বড় একটা শহরে ওর দাঁড়াবার স্থান হচ্ছে না ভেবে যাবে যাবে একটু অবাকও হয় ও। কিন্তু ও তো বোঝে না যে কলকাতা শহরটা যতই বড় হউক তারও তো একটা সহনশক্তির সীমা আছে। ভারতের যত লোক

তাদের সকলেরই যদি দৃষ্টি থাকে ক'লকাতার দিকে তা-হ'লে কতজনকেই বা সে আশ্রয় দেবে?

কাউকে কাউকে তো ফিরে আসতেই হবে। তাই ফিরে আসছে শূন্য হৃদয়ে ঐ বৈশাখীরা আর অনুরাধারা। যেথায় যায় শুধু ঠাঁই নাই-ঠাঁই নাই। ঐ একটানা একটা ব্যর্থতার শিকার হোয়ে দিনের দিনের পর দিন ওরা কাটল ধরা সংসারের সামনে এক জীবন্ত সমস্যার প্রতীক হোয়ে দিন পার করে দিচ্ছে।

পয়সার অভাব বলে তো শখ সাধও একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না। অনেক চিন্তাভাবনা করে তাই বৈশাখী ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল একটু রোদের অনুরোধটা রাখতে।

একটু আগেই ও এসেছিল একটা বিবাহ বন্ধনী অফিসে। সেখানে কাজ করে ওর দাদার এক বান্ধবী। সেই মেয়েটি ভারী মিশুকে ও একটু পরোপকারী, বেচেই বলেছিল ওকে বৈশাখী তুমি বিকেলের দিকে আমাদের অফিসে এসো। আমি তোমার কথা আমাদের মালিককে বলবো চাকরী হলে হয়েও যেতে পারে। কিন্তু হয়নি।

একটু দুঃখ পেলেও ওদের অফিস থেকে বেরিয়ে ওর পা-টা আটকে যায় ঐ দোকানের সামনে। আর তারই একটু পরেই রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পায় সৈকতকেও।

অনেকদিন বাদে আবার দু'জনের দেখা।

ওরা স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। তবুও যতটা খুশী হওয়া উচিত ছিল ততটা খুশী সৈকত হোতে পারে না। কারণ এ দুনিয়ায় সব কিছুই ভাল লাগে যদি পেটে দানাপানি থাকে। অনেক জায়গায় ঘুরেটুরে ফিরছিল ও, পেটের ভেতরে একটা দানব যেন হুল্ল করে চলেছে। পেটের ভেতরটা চো চো করছিল। এত দিন পরে দেখা হোলেও ওর মনের ভেতরে একটা অলসভাব যেন ছড়িয়ে আছে।

সৈকতের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বৈশাখী বলে, এসেছিলাম একটা অফিসে। দাদার এক বান্ধবী চাকরী করে এখানে একটা বিবাহ বান্ধবী অফিসে আমাকে দেখা করতে বলেছিল।

—কিছু আশা পেলে?

—তেমন কিছু না—

Phone : 35-6752
35-7530

Modern Engineering Works

Manufacturers of :

ALL KINDS OF FERROUS & NON FERROUS CASTINGS, MACHININGS, CABLEGLAND, ALL TYPE OF PERFORATED TRAYS & GENERAL ORDER SUPPLIERS.

34/J, SUREN SARKAR ROAD,
CALCUTTA-700010.

—চালিয়ে যাও—একদিন একটা না একটা ছুটলে ছুটেও যেতে পারে—

—ঠিক বলছ?

—ঠিক বলছি না তো ঠাট্টা করছি?

—এখন কারও কাছে কোন আশা পেলে টাটাই মনে হয়—

—অত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটলে চলবে কি করে? ধাক্কা লাগলেই তো চলার পথ আরও দ্রুত হয়।

—অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না।

তুমি কোথায়ও কিছু পেলে?

—আমি আর চাকরীর পিছনে ঘুরছি না।

—লটারী পেয়েছ না কি এরই মধ্যে?

—লটারী নয়। এবার থেকে ঠিক করেছি চাকরীর পেছনে ঘুরে সময় নষ্ট না করে ব্যবসা-ট্যাবসা করব।

কথা বলতে বলতে ওরা পূরবীর কাছে এসে গেল। বৈশাখী বললো, একটু চা খেলে হোত না?

আঁতকে ওঠে সৈকত। পকেটের অবস্থা মোটেই ভাল না। যা আছে তা দিয়ে কোনও মেয়েকে নিয়ে কেবিনে ঢোকা যায় না।

বুঝতে পারে বৈশাখী। এ সপ্তাহে টিউশিনির টাকাটা ও পেয়েছে। তার কিছু অংশ তখনও ওর মণিব্যাগে। বলে, বুঝেছি, তোমার ক্যাশ সর্ট। চল আমি নিজেই সে ভারটা নিচ্ছি।

এই বৈশাখীকে নিয়ে সৈকত কতবার কলকাতা এসেছে। ঘোরেছে, দেখেছে, ভেবেছে কত কী। তখন ভাঁচা বয়েসের কল্পনা ছিল। এখন ক'বছরের মধ্যেই যেন কত পাল্টে গেছে ওরা। আরও কত পালটাবে কে জানে!

ওরা একটা কেবিনে ঢুকল। অনেকদিন বাদে আবার দু'জনে একটু নিরিবিলিতে বসবে। বেয়ারা এসে স্ক্রিন টেনে দিয়ে গেলো। হাসি মুখে অর্ডারের জন্য দাঁড়ালো সে।

অর্ডার হোল। শুধু চা আর কেক। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাও স্ক্রিনটা সরিয়ে দিয়ে গেল। লোকের হাটে ওরাও কেমন যেন বে আব্রু হয়ে পড়ল।

অপমান বোধ করছিল ওরা দু'জনেই। চট করে উঠে পড়তেও পারে না। কোনও কথা না বলে চা খেয়ে ওরা উঠে পড়ে।

বৈশাখীর ইচ্ছে হচ্ছিল বেয়ারাটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মনের জ্বালটা মিটিয়ে নেয়।

তবু নিজেকে সামলে নেয়। ইচ্ছে অনুযায়ী কি আর সবকিছু এখন করা যাচ্ছে?

না—

সুতরাং অতটা বোকামী না দেখিয়ে ওরা সিধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। শিয়ালদার জনসমুদ্রে এবার ঝাঁপ দিলো ওরা।

কোনও বিদেশী ক'লকাতা এলে তাকে যদি প্রথমে ময়দান থেকে শিয়ালদায় ছেড়ে দেওয়া হয় তা'লে কী ভাববে সে?

অবাক হোয়ে ভাববে, এটা কি আধুনিক শহর, না —অন্য কিছু? যারা রোজ যাওয়া আসা করছে তাদের অভ্যস্ত চোখেও ধাঁধা লেগে যায়। ঘম আটকে আসে। লোকগুলো দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই। এই দৌড়ের শেষ কোথায় ওরা জানে না। শুধু দৌড়ঝাঁপ আর ব্যস্ততা। কারও দিকে কারও তাকাবার সময় নেই। শুধু সামনে, পেছনে, পাশে লোক আর লোক। অগণিত লোকের মিছিলে নিজেকে সামলে রাখাই দায়। সঙ্গের লোকের হদিস রাখবে কে? এতক্ষণ একসংগে এলেও ভীড়ে বৈশাখী হারিয়ে যায়। একটু পরে হাওড়াই সার্টে একটা টান পড়ে। দেখে, কোনও রকমে শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ওর পাশে বৈশাখী।

যুদ্ধে কিছুটা বিরতি। অর্থাৎ প্ল্যাটফর্মে এসে গেছে ওরা। এখানে ভীড় থাকলেও গেটের সামনে যেমন থাকে তেমন না।

বৈশাখী বলে, ভাবলাম তুমি বুঝি পেছনেই পড়ে আছো?

—মেয়ে বলে তোমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল বুঝি?

—সে এ দেশে নয়। মেয়েদের ভীড়ে পথ চলা কী রকম ঝিক্কি সে তোমরা বুঝবে না।

অনেকটা আশ্বস্ত হোয়ে আবার বৈশাখীর চোখে চোখ রাখে সৈকত……

ক্রমশ:

ওয়েসিস্

পিনাক

সামনে গাঢ়ে ইটো দলিল রাস্তাটা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে, হয়ত বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঐ অন্ধকারের নীচে। তবুও সবাই চলেছে, চলতে হবে অহিরকেও। হঠাৎ চমকে উঠল অহির, পর্ণা কখন হারিকেন হাতে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। কি চায় পর্ণা, সামান্য হারিকেনের আলোয় সমস্ত অন্ধকার গুলোকে দূর করতে? এবার আলোটা উঁচিয়ে ধরে পর্ণা বলে, "কাল আবার আসবি তো অহির?" চোখ-দুটো চিকচিকিয়ে ওঠে অহিরের 'কেন আসব না? রোজই তো আসি, আজও এলাম।' মাথা নীচু হয়ে এল পর্ণার, আপন মনেই বলে ও, 'কিন্তু একটা দিনের যে অনেক তফাৎ। একটা দিনের তফাৎ-এ কত উড়ন্ত পক্ষীরাজ পা ভেঙে গড়িয়ে পড়ে ধুলোয়। এমন সময় ঘরের ভিতরে রেডিওটা গাক গাক করে বেজে উঠল, আকাশবাণী কলকাতা, এখন স্থানীয় সংবাদ পড়ছি। আর শুনতে চায় না পর্ণা। গলাটা ঝেপে ওঠে ওর, 'ইস কে যে এত জোরে রেডিওটা ছেড়েছে?' দাওয়ার হারিকেনটা ধপধপ করে জ্বলছে তবুও সামনে অন্ধকার। পর্ণা আর্তনাদ করে উঠল, "অহির তুই চলে যা, তাড়াতাড়ি পা চালা।"

সত্যিই চলে গেল অহির পর্ণা। টের পায় না, ও শুধু টের পায় একটা অস্বস্তি যেন আস্তে আস্তে গ্রাস করছে। শুধু ওর মনেই নয় পাড়া প্রতিম, মা নীহারবেলা সবার মধ্যেই। হয়ত অহিরের মধ্যেও। ওদের সবাইকে বহুদিন ছটফট করতে দেখেছে পর্ণা। সেই অস্বস্তিটার রূপ হয়ত একটা আরশোলার মত, দুটো শুঁড়ও হয়ত আছে তার। সুযোগ পেলেই ওটা বিড়বিড় করে উঠতে থাকে উপরের দিকে ঠিক মঙ্গলের কাছাকাছি। তাই আজকাল অহিরকে দেখে অকারণেই চমকে ওঠে প্রতিম, চমকে ওঠেন নীহারবেলা, আর পর্ণার জিভটা কেমন জড় হয়ে আসে।

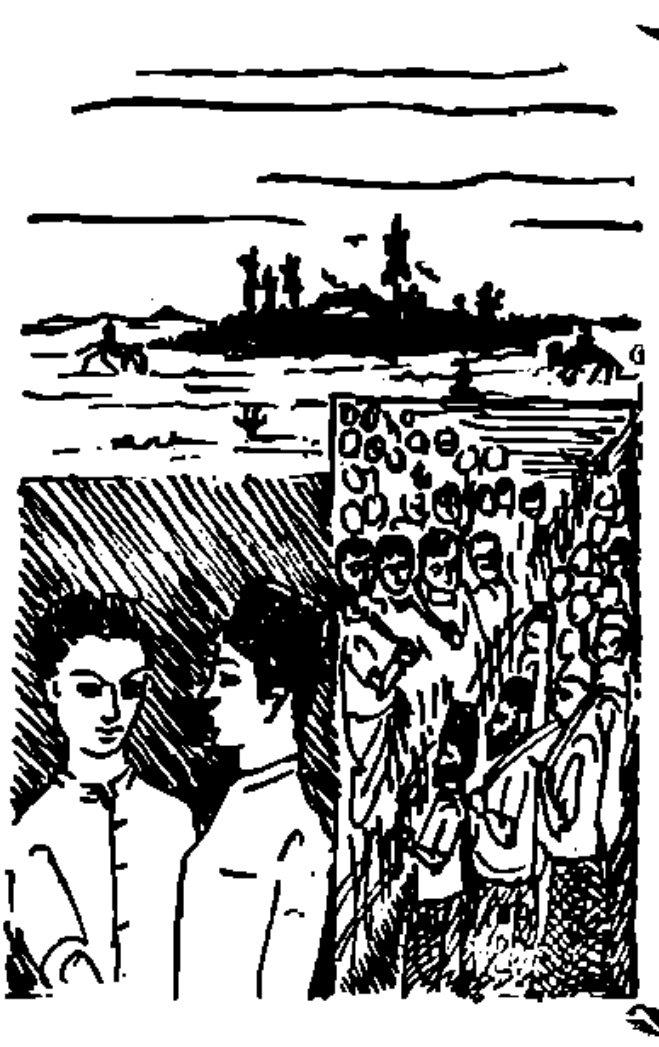

আজকাল করিমটা বড্ড ব্যস্ত থাকে। বাসির উপর দা ঘষার ঘস ঘস শব্দ ভেসে আসে ওর ঘর থেকে। খবরের কাগজ পড়তে জানে না করিম, তবুও কাশিম মোড়লের রেডিওতে কান পেতে থাকে ও। ইদানিং রেডিওতে নাকি কেবলই নদীয়ার কথা বলছে। করিমের সঙ্গে এসে যোগ দেয় আরও অনেকেই। কাশিমের ছেলে রহিম বুড়ি ভরে কাঁচামাল নিয়ে যায় কলকাতায়। আর পরিবর্তে আসার পথে সঞ্চয় করে নিয়ে আসে একরাশ বিচিত্র রকমের খবর। রহিমের পরিবেশনের ভঙ্গীটিও নিপুণ। এই তো কিছু দিন আগে ও ওর ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা মেলায় গিয়েছিল। কত বাসি পটকা পুড়ছিল ওখানে। তবে ওখানে ও একটা নতুন জিনিস দেখে

এসেছে। সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল রহিম। একটা লোক জলন্ত মশালে একমুখ কেরোসিন নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে জলন্ত মশালের আগুনটা চারগুণ হয়ে লাফিয়ে উঠছিল। ওস্তাদ বটে লোকটা। ভারী ভালো লেগেছিল রহিমের, ভারী মজার খেলা। কত জনকে ও ডেকে ডেকে বলেছে ওর নতুন অভিজ্ঞতার কথা। এদ্দিন পর সত্যিই সুযোগ মিলল রহিমের। আজ ওর ও আছে এক মুখ কেরোসিন, খেলছে ঠিক ওস্তাদ লোকটার মতই। করিমের সঙ্গে ওর রক্তের সম্পর্ক, এ ছাড়া করিমকে চেনে ও হাড়ে হাড়েই। একবার বুড়ো বাপের উপর রাগ করে দিয়েছিল নাঙ্গলা বলদটার গলায় বেশ কয়েকটা কোপ বসিয়ে। হাম্বা হাম্বা করতে করতে গরুটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বুড়ো মা ঠেকাতে এসেছিল, তাকেও মেরে মাথা কাটিয়ে দিয়েছিল করিম। আর এ-পাশে যা শানাচ্ছে নেপা বাগ্‌দির ছেলে ফড়িং। ও কিছু দিন আগে মাত্র ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে। ওর গরু হারান মল্লিকের জমির ধান খেয়েছিল এই নিয়ে হারান মল্লিকের সাথে প্রথমে ওর হাতাহাতি তারপর কোপাকুপি। ফড়িং-এরও কিন্তু এখন আর রেডিওতে তৃপ্তি হয় না। চায়ের দোকানে বসে বিভিন্ন রকম খবর শোনে ও; শুনতে শুনতে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারে না ফড়িং, তখনই ও বাড়ী গিয়ে খসখস করে বালির উপর ধা, বল্লমগুলো ঘষতে থাকে। জহির সেদিন ওদের বাড়ীর সামনের ডোবাটায় নেমে গামছা ছেঁকে মাছ ধরছিল, সঙ্গে ছিল পাশের বাড়ীর আজাদ। আওয়াজ, শিঙিতে ভরে গিয়েছিল মেটে কলসীটা। হাঁড়ির ভিতর আস্ত মাছগুলো এমন লাফালাফি ধাপাধাপি করছিল মনে হচ্ছিল ওরা যেন এক-যোগে এবার মাটির হাঁড়িটা ভেঙেই ফেলবে। ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে জহিরের বুক ঠেলে। তারপর ও আপন মনেই বলে, "বেশী বাড়াবাড়ি, মরবে ওরা, নির্ঘাত মরবে।" করিমের উঠোনের উপর দিয়ে যাচ্ছিল জহির, হাতে সেই মেটে কলসীটা তার ভিতরে মাছগুলো তখনও লাফাচ্ছে, আর করিমের ঘর থেকে খসখস শব্দটাও ভেসে আসছিল। হঠাৎ কেন যেন জহিরের গলার কাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল।

জহির হয়ত আর আসবে না। জহির মানে সেই জহির, যাকে ভাইফোঁটার দিন দাদা প্রতিমের সাথে অনেক যত্ন করে খাওয়ায় পর্ণা, ফোঁটা করে মাথায় পরায়। দাদা প্রতিমেরই একাধারে স্কুল ও কলেজের বন্ধু জহির, আর মা মরা ছেলেটার মধ্যে নীহারদেবী যেন আরেকটা প্রতিমকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই পর্ণার জন্মদিনে প্রতিমের সঙ্গে জহিরও বোনকে এনে দেয় কিছু না কিছু উপহার। সেই জহিরের কথাই ভাবছে পর্ণা। কি করবে পর্ণা, আজ যে সবাই অসহায়। আজ ওরা জেগে উঠেছে যাদের আস্তানা ঐ গভীর অন্ধকারে, যাদের পিপাসা মেটে তাজা খুনে। ওরা যেন চারপাশের সমস্ত আলোটুকু শুষে নিচ্ছে। সেই অন্ধকারে আদিম হিংসায় ঝলসে ওঠে ধারালো ইস্পাতের টুকরোগুলো। যেগুলো সুযোগ পেলেই ছুটে আসতে পারে যে কোন কার দিকেই। ঠিক সে সময় শুকনো হাতদুটো দিয়ে নীহারদেবী মেয়েকে টেনে আনেন বুকের কাছে। "পর্ণা, ঐ শুনতে পাচ্ছিস, ওরা পাহারা দিচ্ছে কেমন চেঁচাচ্ছে ওরা। হয়ত কোন বিপদ হয়েছে, হয়ত দুস্কৃতকারীরা"……হঠাৎ প্রতিমও ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে পাশের খাটে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় ও। পর্ণা তখন নিজের বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডের ঠক্‌ঠক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কোথায় যেন পড়েছিল পর্ণা ড্রাগনের নিঃশ্বাসে আগুন জ্বলে, আজ যেন সেই অসংখ্য ড্রাগনের নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এমন কি আকাশটাও। যে আকাশটার দিকে এক বুক আশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগত পর্ণার। ব্যর্থ হবে জেনেও আকাশের তারা গুণত ও।

সেদিন সকালে ক্যালেণ্ডারে চোখ রেখে চমকে উঠল পর্ণা, তাহলে এক এক করে জীবন থেকে খসে গেল কুড়িটা বছর। শেষ পর্যন্ত এক বুক আশা নিয়ে নিজের গায়ের

তাজা বেগুন দুটোকে ছিঁড়ে আনল পর্ণা। আসলে তেমন কিছু নয়, বেগুনগুলো কেমন করে ছোট থেকে একটু একটু করে বড় হয়ে উঠছে তা দেখতে নেশা লেগে যেত পর্ণার চোখে, তবুও পেয়ারটা পর্ণার দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রতিম বলে, "পড়ে ছাখ নদীয়ার কথা কি লিখেছে, চাপড়ার অবস্থা এখন আরও সাংঘাতিক।" "আরও সাংঘাতিক?" পর্ণার ঠোঁটদুটো নড়ে ওঠে, কিন্তু আজ যে ১২ই শ্রাবণ।" প্রতিম উঠে যেতে যেতে বলে, "তেমন কিছু আয়োজন করিস না পর্ণা, জহির আজ হয়ত আসবে না।" পর্ণার বিশ্বাস হয় না, তাই ও ব্যালকনিতে, তাজা বেগুন দুটোকে বটী দিয়ে দুভাগ করে কেটে। কিন্তু একি? একটা নাদুস-নুদুস্ মাংসল পোকা মন্থর গতিতে বেরিয়ে আসছে তাজা বেগুনটা থেকে। বটীটা উল্টে দিয়ে ঘরে চলে এল পর্ণা, ওর জলীয় চোখদুটো চিকচিক করে উঠল। পর্ণা ওর মন নিংড়ানো একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সূর্যের দিকে। "কেন এমন হয়?"

আজকাল প্রায়ই পর্ণার মনে হয় পায়ের তলার মাটিগুলো যেন কেটে চৌচির হয়ে গেছে, তার ওপরেই আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটে চলেছে সবাই। এইতো পাশের বাড়ীর শিবু কিছুক্ষণ আগেই হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিয়ে গেল ঐশনের গায়ে ডোবার জলে একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে, ওটা একজন মধ্যবয়স্ক মুসলমানের। দেহটার জায়গায় জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। আশ্চর্য তার কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল আরেকটা ঘটনা, বুড়ো পঞ্চানন মুদির মেয়ে-ছেলেটার প্রাণহীন দেহ নুয়ে পড়ে আছে পাটক্ষেতের ভিতর। ওর সারাগায়ে রক্তের ছাপ, সবাই যেন ভয়ার্ত চোখে দেখছে চাপড়ার কলুষের সমুদ্রতরঙ্গের মত গর্জন তুলে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। পায়ের নীচে কাটলের ভিতর থেকে এবার হাজার হাজার ঘুঘুর কাতরানিরা কণা তুলে জেগে উঠছে।

সারারাত জেগে পাহারা দিয়ে প্রতিম আজ ক্লান্ত। তাই প্রতিম বসে বসেই ঝিমুচ্ছিল। নীহারদেবী এখনও ঠাকুর ঘরে। সবার মঙ্গলার্থে সেখানে ওঁর কেটে যায় আরও বেশ কিছুটা সময়। আর ঝিমঘরে বসেছিল পর্ণা। এইতো সন্ধ্যের খবর বাসের মধ্যে ধরা পড়েছে তের জন দুষ্কৃতকারী, যাদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল আগ্নেয় অস্ত্র। শুনেই নীহারদেবী ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা আটকালেন। হঠাৎ অন্ধকারে এক ঝলক বিদ্যুতিকার গন্ধ নিয়ে দোর-গোড়ায় যে এসে দাঁড়াল, তাকে দেখে চমকে উঠল পর্ণা। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল প্রতিমের, "জহির তুই?" কিন্তু কেমন করে এলি? আমি তো সেদিন তোর খবর নিতে ভেবেছিলাম তোদের বাড়ী যাব, কিন্তু অনেক সাহস করে শেষ পর্যন্ত ফিরে এলাম। এছাড়া ধরাও পড়ে গিয়েছিলাম মাঝখানে, তপনদের হাতে।" "না গিয়ে ভালই করেছিস, আমিও আজ এসেছি অনেক কষ্টে, অন্ধকারে গা ঢেকে।" অতল সমুদ্রের নীচ থেকে যেন কথা বলে উঠল জহির। বিশেষ প্রয়োজনেই আজ বের হয়েছিল জহির, কিন্তু ফিরতে রাত হয়ে গেল। ও আজ কিন্তু নিশ্চিত, বাকীবাকী ছয় মাইল অন্ধকার পথের কোথাও না কোথাও ওর মৃত্যু ওৎ পেতে বসে প্রহর গুণছে, কেননা আজকে ওকে যেতে হবে সপ্তরথীর মাঝ। সেদিন জহির আসতে চেয়েছিল পর্ণার জন্মদিনে, কিন্তু ওর কাকার ছেলে আখলু শুনতে পেয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ ছুটিয়ে এনে ঘেরাও করেছে ওকে। তাই একটা রাতের জন্য আজ আশ্রয়প্রার্থী জহির। এর আগেও জহির অনেক কটা রাত কাটিয়েছে এ বাড়ীতে। প্রবল বন্যার সময় সবাই যখন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করছিল, তখন ও ওর বুড়ো বাপ আর বিধবা দিদিকে নিয়ে উঠেছিল এইখানেই, আজও জহির নিরাপত্তার খোঁজেই ছুটে এসেছে সেই একই ঘরে, তবু তার মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট ব্যবধান। আজ প্রতিমের হৃৎপিণ্ডটা অছেড়ে পড়ছে বুকের কাছে আর জহিরের দুচোখে আকুতি মেশানো।

পাশাপাশি শুয়ে আছে জহির আর প্রতিম, তখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। এভাবে পাশাপাশি শুয়ে কেটেছে ওদের আরও অনেক রাত। তবুও নতুন রক্তে রাঙিয়ে দুচোখে ভয়ে সে দৃশ্য দেখছেন নীহারদেবী আর

(শেষাংশ ২৪০ পাতায়)

রূপার কাপ

—দীপেন রায়

১৯৩৬ সাল।

ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের আনন্দ উৎসব-মুখর আমেরিকার মাউন্ট ওয়াশিংটন।

স্বামী যোগানন্দ প্রতি বছর শিষ্যদের এ সময় উপহার দেন। এ বছরও ব্যতিক্রম হল না।

পুরানো প্রিয় শিষ্য ই, ই, ডিকেনসনের হাতে স্বামী যোগানন্দ একটি রূপার কাপ দিলেন। এই কাপটি ভারত থেকে আনা হয়েছে। কাপটি স্বামীজীর হাত থেকে শ্রদ্ধা-ভাবে গ্রহণ করেই ডিকেনসন আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলার উপক্রম করলেন। গুরুদেবকে ধন্যবাদ দেবার মত শব্দও তাঁর মুখে যোগাল না। কিন্তু তাঁর অন্তরে এক অপরূপ ভাবের সঞ্চার হল।

স্বামী যোগানন্দ ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। খানিকক্ষণ পর নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে ডিকেনসন স্বামীজীকে বললেন, গুরুদেব আজ সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর ধরে আমি এই রূপার কাপটির জন্য প্রতীক্ষা করে আছি। আজ আমার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আপনি পূর্ণ করলেন।

স্বামীজী মধুর হেসে বললেন, তাই তুমি মোড়কটি খুলে কাপটি বার করে সানন্দে চেঁচিয়ে ওঠেছিলে, 'রূপার কাপ', 'রূপার কাপ' বলে।

ডিকেনসন্ খুশী হয়ে বললেন, ঠিক তাই গুরুদেব।

স্বামিজী জিগগেস করলেন, রহস্যটা কি ?

ডিকেনসন্ বিনীতভাবে রহস্যটা উদ্ঘাটন করলেন। বললেন, আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। নেব্রাস্কার শহরে বাবা মার সঙ্গে থাকি। একদিন খেলাচ্ছলে আমার দাদা আমাকে একটা ডোবার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেন। আমি ঠাঁই না পেয়ে ডুবে যাচ্ছিলাম। একবার ডুবছি, একবার ভাসছি। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ অদূরে একটা উজ্জ্বল আলোর আবির্ভাব হল। এই আলোর মধ্যে দেখলাম, একটি প্রশান্ত স্থির ধীর সাদা বস্ত্র মূর্তি। আমার দুরবস্থা দেখে আমার দাদার এক বন্ধু উইলো গাছের একটি ডাল নুইয়ে আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন। আমি তক্ষুণি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ডালটিকে আঁকড়ে ধরলাম। তক্ষুণি তাঁরা দুজনে আমাকে টেনে পাড়ে নিয়ে এলেন। পাড়ে এসেও সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে ভুলতে পারি নি। সেই রামধনু আলো, সেই দিব্য পুরুষ আমার অন্তরের অন্তস্তল দখল করে রইল।

স্বামী যোগানন্দ প্রশ্ন করলেন, আর কখনও সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখেছ ?

উত্তরে ডিকেনসন্ বললেন, হ্যাঁ, স্বামীজি, আর একবার দেখেছি। তখন আমি সতের বছর বয়সে যুবক। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মার সঙ্গে শিকাগো বেড়াতে গিয়েছি। তখন সেখানে ধর্মীয় অধিবেশন চলছে। পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখলাম এগিয়ে আসতে। তাঁকে দেখে আমি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম। মাকে উদ্দেশ করে আমি বললাম, মা, এই সেই মহাপুরুষ যিনি আমার জলে ডুবে যাওয়ার সময় দর্শন দিয়েছিলেন, আলো দেখিয়েছিলেন, সাহায্য করেছিলেন দাদার বন্ধুর সঙ্গে।

লক্ষ্য করলাম সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ একটা বড় বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মা আমাকে নিয়ে সেই প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলেন। সেখানে প্রবেশ করেই দেখলাম, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ মঞ্চে বসে আছেন। তিনি মঞ্চে জলদগ্রাহী বক্তৃতা করলেন।

বক্তৃতা শেষে আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে মধুর হেসে বললেন, 'আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু পরে আসবেন এবং তিনি তোমাকে একটি রূপার কাপ উপহার দেবেন।' সেই থেকে আমি গুরু-প্রীতির থেকে রূপার কাপ গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আজ তেতাল্লিশ বছর পর আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। শুধু তাই নয়, আজ ক্রীস্ট মাস বৃক্ষের নিকটে আপনি যখন এই উপহারটি আমাকে দিলেন তখন আমি আবার সেই জ্যোতির্ময় আলো দেখতে পেলাম।

রহস্যটি জেনে নিয়ে স্বামী যোগানন্দ ডিকেনসনকে প্রশ্ন করলেন; সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে চিনতে পেরেছ ?

উত্তরে ডিকেনসন বললেন, হ্যাঁ, গুরুদেব। তিনিই সেই পরমব্রহ্মের মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ, জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য।

বেকার মিছিল

কুমারেশ ঘোষ

আমাদের দাবী মানতে হবে।
চাকরি চাই, চাকরি চাই।
নইলে বেকার ভাতা চাই।
ওভারটাইম চলবে না, চলবে না।
ছাঁটাই করা চলবে না।
বন্ধ কারখানা খুলতে হবে।
চাকরি চাই, চাকরি চাই।
নইলে বেকার ভাতা চাই!

বিরাট মিছিল। রাস্তা ভর্তি। সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে এত বেকার যুবক-যুবতী।

প্ল্যাকার্ডে প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেছে। নানা রঙে লেখা নানা কথা লেখা। সেগুলো সগর্বে সদর্পে বজ্রমুষ্টিতে মাথার উপরে উঁচু করে ধরে আছে চাকরির সরব দাবীদারেরা। আর তাদের হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডগুলো যেন নীরব আঞ্চলিক ভাষায় বলছে: চাকরি চাই, চাকরি চাই। নইলে বেকার ভাতা চাই।

মিছিলের পুরোভাগে লাল সালুর ফেস্টুনের দুদিকটা লাঠির ডগায় ধরে আছে দুজন বেকার যুবক। তাতে লেখা: পশ্চিমবঙ্গ বেকার সম্মেলন।

লাল ফেস্টুনটাও যেন চোখ রাঙিয়ে বলছে চাকরি চাই, চাকরি চাই। নইলে বেকার ভাতা চাই।

উঃ! দেখবার মত মিছিল।

কাতারে কাতারে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবক-যুবতীরা। দেশের আশা, ভরসা, ভবিষ্যৎ।

দুপুরের রোদে তারা ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত, অবসন্ন প্রায়। এদের উপর প্রকৃতিও যেন বিরূপ।

রাস্তাটা পার হবার দরকার ছিল।

পারলাম না মিছিলের জন্য। তাই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছিলই দেখছিলাম।

দেখছিলাম আর ভাবছিলাম: সত্যিই আমরা বাঙালীরা কোথায়? এই সব বাঙালী বেকার তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যৎ কি? চাকরি না পেলে এরা খাবে কি? সরকারের তো উচিত এদের জন্য ভাবা।

সরকারকে যথারীতি মনে মনে গালাগালি দিতে লাগলাম!

—গরম চা—য়। পিছিয়ে যাবু। গরম চা—য়!

—মিঠা পানি! ঠাণ্ডা মিঠা পানি! ভাব লেবে—ভাব!

—গোলি মিঠাই। লেমু-ওয়ালা। মু-মে দিলিয়ে পানিকা কাম করেগা! সরবৎ! ঠাণ্ডা সরবৎ!

—মিঠা পান! মশলা-পান!

আশ্চর্য, অবাঙালী ফেরিওলো সুযোগ বুঝে মিছিলের আশেপাশে বিবিধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। চলছে রীতিমত কেনাকাটা!

ভাবছিলাম, ঐ খোট্টাগুলো কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

GOUTAM ENGINEERING CONCERN

ENGINEERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

ICHAPUR ROAD. JHAWTALA
(Cannal Side)
L. P. No. 217/27
P. O. Santragachi. HOWRAH. 711104

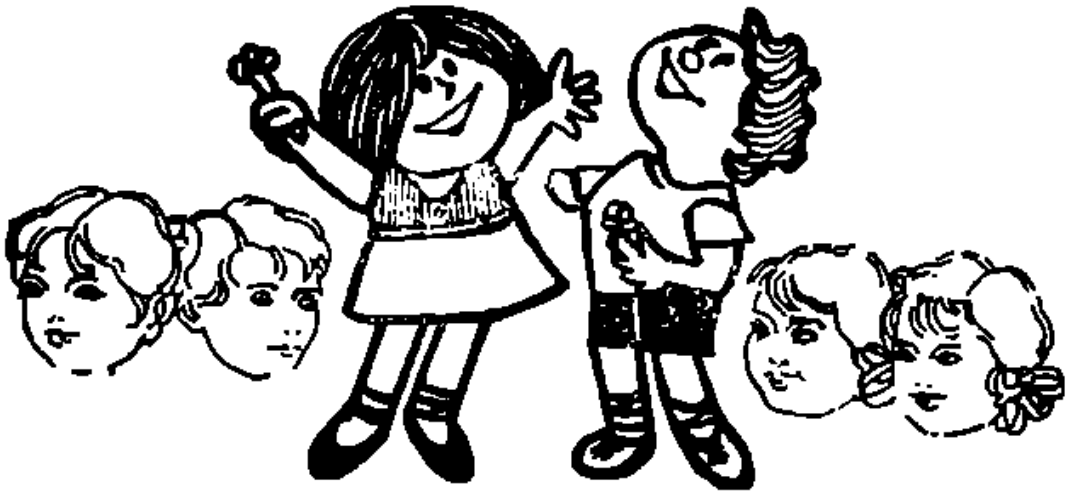

তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ

অসীমা গাঙ্গুলী

জ্বালাও আলো, আমার আলো
জ্ঞানের আলোর প্রদীপখানি,
অজ্ঞানতার অন্ধকারকে
ঘুচিয়ে ফেলো, ঘুচাও গ্লানি।
মানুষ মারা ক্ষেপণাস্ত্র—
পুড়িয়ে জ্বালো হোমানল,
শুদ্ধ করো জগৎটাকে
ছড়িয়ে প্রেমের শান্তি জল।
ভেদাভেদের পাচিলটাকে
ভেঙেই কর ধূলিসাৎ
তোমরা তরুণ নবীন কিশোর
তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ।

তফাৎ

মানসী রায় (বয়স দশ বৎসর)

ছোট মেয়ে কিনতে চায় একটি ছোট রাখী
টাকার কথা ভেবে মায়ের জলে ভাসে আঁখি।
বড়লোকের মেয়েগুলো সোনার রাখী পরে
গরীব মেয়ে কেঁদে মরে ছেঁড়া রাখীর তরে।

জেনে রাখা ভাল

রতন রায়

•পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার কোথায় জানো? ওয়াশিংটন শহরে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। এই গ্রন্থাগারটির নাম 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেস'। বই সংখ্যা চার কোটির উপরে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামে এক একটি গ্রন্থ বিভাগ আছে। গ্রন্থাদি রাখার শেলফের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বই প্রকাশিত হলেই এরা তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। গ্রন্থাগারটি ১৭০ বছরের পুরানো।

••আমের ইংরাজী 'ম্যাংগো' কেন তা জানো? আমের ল্যাটিন নাম 'ম্যাংগোরিকা ইনডিকা'। ইনডিকা শব্দটি ইনডিয়া থেকে উদ্ভূত। তাই আমের ইংরাজী ম্যাংগো।

•••ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ সালে। এর আগে ১৮৯৮ সালের ২২শে জানুয়ারী এত সময়ব্যাপী পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দেখা গিয়েছিল। এই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ৪৬মিঃ শুরু হবে, শেষ হবে বেলা ৫টা ১ মিনিটে।

উদ্বাস্তু

অজু ছালদার

একটা বড় শহর। সেই শহরের বুকে খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়ে থাকে প্রান্ত ক্লান্ত মানুষগুলো। আকাশের গভীর কালো রংটা সরে গিয়ে লোবাণী রোদ্দুর যখন উঁকি মেরে ঠিক তখনই সেই শহরের কাকটা ডেকে ডেকে মানুষগুলোর ঘুম ভাঙায়। কলের ট্যাপে জলের মিলনে ভোঁ ভোঁ শব্দ ওঠার আগেই বাড়ির কলতলা পরিষ্কার করতে শুরু করে কাকটা।

অথচ মানুষগুলো জেগে উঠেই খাবার জন্য তাড়াহুড়া লাগিয়ে দেয়। নোংরা, ভ্যাপসা গন্ধ-ওঠা বাসী আবর্জনা বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন দিনের নতুন আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়। কাকটার কথা কিন্তু মনে ছায়াপাতও করে না। পরিশ্রমী প্রচার-বিমুখ কাকটা ওই আবর্জনা থেকে বেছে বেছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তুলে নেয়। তারপর ঘর বাঁধে বাড়ির পশ্চাৎ ঘেষেই জীর্ণ নারকেল গাছে। ছানাপোনা নিয়ে বিরাট সংসার কাকের। কাজের ফাঁকে কাকটা লক্ষ্য করে একটু দূরে খালি মাঠটায় কারখানা হচ্ছে। চারিদিকে সবুজ গাছপালা এক এক করে কেটে দৈত্যাকারের চিমনী বসছে। কোন রকমে বেঁচে গেল ফলহীন নারকেল গাছটা। বাঁচলেও শান্তি নেই। কারখানার কালো ধোঁয়ায় ছানাপোনাদের জীবন অতিষ্ঠ।

আতঙ্কে কাকটার ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। কত আশা নিয়ে ঘর বেঁধেছে। সেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে না হলে সে ছানাপোনারা বাঁচবে না।

দুঃখী কাকটা নতুন বাড়ি খুঁজতে লাগে। মনের মতন বাড়ি আর পায় না। শহরের কোথাও তেমন গাছপালা নেই। যা ছিল তা কেটে ফেলে নতুন নতুন স্কাইস্ক্র্যাপার হচ্ছে। আগের মতো আজকাল আর স্কাইস্ক্র্যাপারের মাথায় বসতি করার জায়গা নেই। চারিদিকে শুধু এ্যান্টেনা আর এ্যান্টেনা। ওগুলো আবার চড়ুই পাখীদের দখলে। তাছাড়া ছানাপোনা নিয়ে ওখানে ঠিক বাসও করা যায় না। তবুও প্রায় উদ্বাস্তু কাকটা হয়ে না। নতুন উদ্যম নিয়ে বাড়ি খুঁজতে লাগে।

আজকাল কাকটা দিংসুটে স্বার্থপর মানুষগুলোর ভাষা বুঝে গেছে। হতুমে মানুষগুলো নিজেরাই শহরটাকে পরিষ্কার করে তিলোত্তমা করছে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেও কাকটার শান্তি নেই। এখন আর ওর তেমন কদর নেই।

একদিন কাকটা বাড়ি খুঁজতে গিয়ে সমগোত্রীয় বন্ধুদের কাছে জানতে পারলো মানুষগুলো হাজার হাজার কমিটির মতো একটা পক্ষী সংরক্ষণ কমিটিও তৈরী করেছে। কত আশা নিয়ে কাকটা উড়ে উড়ে সেই বাড়িটার ছাদে গিয়ে বসলো। কিন্তু না, তার সমগোত্রীয় কেউ নেই। মানুষগুলোই নাকি কমিটির পদগুলো দখল করে আছে। হতোদ্যম কাকটা বসে একটু জিরোতে না জিরোতেই স্বয়ং সভাপতি মহাশয় তেড়ে এলেন তাকে তাড়িয়ে দিতে। —"এ্যাই যা"। কাকটা উড়ে যেতে যেতে শুনতে পেল সভাপতি মহাশয় পাশের সঙ্গীকে বলছেন— "কি ঝুটি ব্যাপার, জানলার পর্দাটা নষ্ট করে দিলো।"

ক্লান্ত অবসন্ন কাকটা নীড়ে ফেরে। কিন্তু নাঃ, নীড় কোথায়! নারকেল গাছটার চিহ্ন কোথাও নেই। ছানা-পোনারাও অদৃশ্য। বাড়ির মালিকেরা এ্যান্টেনা লাগাবার অসুবিধায় গাছটা কেটে ফেলেছে। দুঃখে কাকটা ভেঙেও পড়ে। করুণ সুরে ডেকে যায়। পাড়ার বখাটে ছেলে-গুলো ওকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করে। কাকটা অনেক কষ্টে এখানে ওখানে উড়ে উড়ে মৃত ছানাপোনার সন্ধান পায়।

আজ আর কাকটার বাঁধন নেই। মুক্ত বিহঙ্গ মুক্তই হয়ে যায়। তবু যেন কোথায় একটা নীরব অভিমান থেকে যায়। তাই নিঃসঙ্গ, দুঃখী, উদ্বাস্তু কাকটা আর এক শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় বোধহয় নতুন জীবনের জন্য। কোন দিকেই ওর আর লক্ষ্য নেই, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলা। ওর পিছনে হাজার হাজার নিঃসঙ্গ, দুঃখী, উদ্বাস্তু কাক পাখির মিছিল।

অথচ এই শহরের উদাসীন, ব্যস্তবাগীশ মানুষগুলোর কারখানার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চোখে তার সামান্য প্রতিফলনও হয় না। ——

মনে পড়ে বারে বারে সেই অ-খ্যাত প্রাণকে

সুনীতি সান্যাল

চারদিকে জল আর জল। পূর্ব বাংলার বর্ষায় এ চিত্র মানুষের খানিকটা গা-সওয়া অবস্থা। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি—সে বারের বন্যা যেন তার তাণ্ডবের সীমানা বেশ বাড়িয়েই চলেছে। বন্যা হলে বেশীর ভাগ গ্রামগুলোই প্লাবিত হয় কিন্তু এবার শহরের মানুষও বন্যার কোপের হাত থেকে রেহাই পেল না। শহরের বড় বড় রাস্তায় নৌকো চলেছে, বাড়ী বাড়ী কলাগাছের ভেলাই হয়েছে চলাচলের সাথী। উঠোন দিয়ে এ ঘর ও ঘর করতে কাঠের তক্তার পাঁকো। ডুবুডুবু অর্ধ-পাড়াগাঁয়ের বন্য-মুয়োর শহরের কোনো উঁচু জায়গা পেলেই সেখানে আস্তানা নিচ্ছে। সর্পকুল প্রাণ বাঁচাতে যত্রতত্র ঢুকে গেছে। ঘরে ঘরে ধনী-দরিদ্র সবাই যেন জীবন চালাবার সামান্যতম প্রয়োজনটুকু জোগাড় করতে অস্থির। দূর অতীতের পূর্ব-বাংলার সেই চিত্র এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। আর একটি চিত্র যা এখনও আমার প্রাণকে নাড়া দেয় তাই আজ এখানে বিবৃত করছি।

গভীর রাত, গভীর অন্ধকার আর চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে যাবে যাবে গ্রামের উপান্ত থেকে শেয়ালের হুক্কাহুয়া শব্দ আর শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। পাড়ার এক মহিলা চটাং ঘুম থেকে চমকে বিছানায় বসে কান খাড়া করলেন। সত্যিই তো! মনে হচ্ছে যেন বেশ দূর থেকে নারী কণ্ঠের কান্নাস্বর ভেসে আসছে। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন—ঘরের দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন—শব্দ আরও স্পষ্ট করে শুনতে পেলেন। সত্যিই নারী কণ্ঠের কান্না? অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। না জানি কী সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে তারই মতো আর কোন নারী। ছেলে বিছানায় ঘুমিয়ে আছে, ডাকলেন তাকে—ওরে ঈগলটির ওঠ—মেয়ে-মানুষের গলার কান্নার শব্দ পাচ্ছি—তুই ভেলা নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে চলে যা, মেয়েটার নিশ্চয়ই কেউ নেই, না হলে এত রাতে বাঁচাও, বাঁচাও বলে কেউ চীৎকার করে, ওরে, তুই ঈগলটির যা। ছেলের অন্যান্য আত্মীয়-আত্মীয়ারা তো অবাক। এ কেমন মা! এত রাতে বিশেষ করে যেখানে প্রবল শুয়োরের উৎপাতে সবাই দিনের বেলাতেই ত্রস্ত সেখানে মা হয়ে ছেলেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে? কিন্তু উপায় কী! মহিলার মায়ের প্রাণ যে তখন তার ঘরের গণ্ডী পার হয়ে সেই ক্রন্দনরতা নারীর জন্য ব্যাকুল।

টর্চের আলো সম্বল করে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছেলে রওনা হল ভেলা নিয়ে। ছেলের মা বসে রইলেন ঘরের

বারান্দায়। পরিবারের আর সবাইও উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে রইলেন আর ঐ ছেলের মায়ের দুঃসাহসের আলোচনায় সময় কাটাতে লাগলেন। শব্দ লক্ষ্য করে করে বেশ কিছুক্ষণ চলার শেষে ছেলে ঠিক জায়গায় পৌঁছল। কিন্তু একি! এ যে ও পাড়ার কি বিন্দু। ছেলেটাকে ঠিক করে দাঁড় দিয়ে নেমে ছুটে গেল বিন্দুর কাছে। আরে ও বিন্দু দি এমন করে কাঁদছ কেন? কী হয়েছে তোমার? উন্মাদিনী বিন্দু যেন প্রাণ পেল ছেলেটাকে দেখে। ওরে দেখে যা আমার এক মাত্র ধন বুঝি আর বেঁচে নেই রে! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আগে দেখে নিল সে ছেলেটির নিঃশ্বাস পড়ছে কিন্তু সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। টাইফয়েড হয়েছে, হঠাৎ জ্বর এত নেমে গেছে ঘরে অন্য দুঃখিনী মায়ের একমাত্র পুত্র মৃত্যুর প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য মুহূর্ত দেরী না করে ছুটল জেলা নিয়ে কাছের ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তারবাবু অত রাতে ঐ জলময় স্থানে ঘরের বাইরে কখনও হন নি কিন্তু ঐ ছেলেটির এতখানি সাহস আর প্রাণের পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রাণও বিচলিত হয়ে উঠল। তিনি ওষুধের বাক্স নিয়ে তার সাথে রওনা হলেন। পৌঁছলেন বিন্দুর বাড়ী, তার যথা চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দেহের তাপ আশা সঞ্চার করল। এখন পথ্য চাই ত। কিন্তু বিন্দুর পক্ষে ঠিক ঐ মুহূর্তে রোগীর পথ্য তৈরী করবার অবস্থা নয়। ছেলেটি ডাক্তার বাবুকে তার জেলায় করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ছুটল নিজের বাড়ীর দিকে। মা বসে আছেন বারান্দায় ছেলের বিপদ-সঙ্কুল পথের বাধা যেন মাতৃ-শক্তিতেই মুক্ত করবার ধ্যানে। ছেলেকে নিরাপদ অবস্থায় পেয়ে মায়ের প্রথম জিজ্ঞাসা—কার কি হয়েছে রে? ছেলে বলে উঠল—শীগ্‌গীর বালি আল দিয়ে দাও—বিন্দুদির ছেলে মরমর হয়েছিল জ্বর একেবারে নেমে গিয়ে। ডাক্তার ডেকে ইনজেকসন, ওষুধ দেওয়াতে শরীর গরম হয়েছে, এখন পথ্য চাই। মা আর দ্বিরুক্তি না করে বন্ধুর অসুখ বিসুখের সম্ভাবনায় ঘরে রাখা বালি আল দিয়ে সঙ্গে মিছরি দিয়ে আবার পাঠালেন ছেলেকে। বিন্দু তার ছেলেকে পথ্য খাইয়ে দিল। ছেলে চোখ মেলে তাকাল—দেখল তার পাশে দাঁড়িয়ে ঐ পাড়ার একজন দাদা। চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে। সেই মুহূর্তে মায়ের বুক থেকে বেরিয়ে এল আসন্ন পুত্র শোকের তপ্ত নিঃশ্বাস। মুখ দিয়ে ভাষা বেরুলনা বিন্দুর। বাল বিধবা বিন্দুর একমাত্র সম্বল ঐ পুত্রের জীবন রক্ষার দুটি প্রাণের মানুষকে তার মনে হল এ কি বিস্ময়! তাই ছেলের শিয়রে বসে মনে মনে শুধু বলল—হে পরমেশ্বর, আমায় ভাষা দাও—ঘরে ঘরে জানাব এই প্রাণের খবর।

পথ চাওয়া মা-ও ফিরে পেলেন তার ছেলেকে। দুই পাড়ার দুটি মা নিশ্চিন্ত হলেন। এ পাড়ার মাও বিছানায় বসে মনে মনে বললেন—হে পরমেশ্বর, বিন্দুর ছেলের প্রাণরক্ষায় আমার ছেলের সেবা তুমি সার্থক করেছ, তাকে নিরাপদে ঘরে এনেছ। অসহায়া নারীর বিপদে আমার পুত্রের এই সেবা যেন তার জীবনে অব্যাহত থাকে তেমন করে তুমি তার জীবনকে চালিত করো।

দ্বীপান্তরে মহিলার জীবনের আর একটি ঘটনা—রেলের কোয়াটার পাশাপাশি বাড়ী। সংসারের সব কাজ শেষ করে প্রৌঢ়া রমণী বসেছেন তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক গৃহদেবতার পূজায়। থেকে থেকে পাশের বাড়ীর ভেতর থেকে চাপা গলায় চিঁ চিঁ শব্দে কে যেন কাঁদছে। পূজার মন্ত্র উচ্চারণের ফাঁকে ঐ শব্দ মহিলার কানে আসছে। চমকে উঠছেন—আবার পূজার মন্ত্র উচ্চারণে মন দিচ্ছেন। নাঃ—আবার সেই শব্দ। পাশের মুসলমান বাড়ীতে দীর্ঘদিন পর বেশী বয়সে গর্ভবতী হয়েছেন মুসলমান বধূ। তারই কি কিছু হল? পূজা বন্ধ করে আসনে বসেই ভাবছেন বসে। কিন্তু থেকে থেকে আবার সেই শব্দ। পড়ে রইল পূজার ফুল, পড়ে রইল দেবতাকে নিবেদন করবার নৈবেদ্য। আসন ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লেন—ঢুকলেন তাদের বাড়ীতে। যা ভেবেছেন সত্যিই তাই। বধূটির প্রসব বেদনা উপস্থিত। ছোট একখানা জানালাবিহীন বদ্ধ ঘরে বধূটি শুয়ে আছে আর থেকে থেকে গোঙানি শব্দ করে যাচ্ছে। সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের লোকগুলো অন্তঃমহিলার

উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল—প্রসব-বেদনা উপস্থিত হলে লোক-জানাজানি নাকি খুব খারাপ, তাই বধূটির আত্মীয়া বাইরের লোককে টেনে এনেছে বলে বধূটির উপরেই তাদের রাগ হতে লাগল। মহিলা ঘরে ঢুকলেন—দেখলেন আনাড়ী দাই প্রসূতির কোমরে দড়ি বেঁধে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সন্তান যাতে নিচের দিকে নামতে পারে তাই তাদের এই ব্যবস্থা। মহিলার বাক্যিব্যের কাছে তাদের এগোবার সাহস হল না—তিনি বললেন—"আমার সামনে এমনি করে ওকে আমি কখনই মরতে দেব না।" দড়ি খুলে ফেললেন, মোটামুটি ধাত্রীবিদ্যা জানে যা বুঝলেন তাতে সহজে প্রসব হবার কোন লক্ষণ তিনি দেখলেন না। চিকিৎসকের সাহায্য নিতেই হবে এবং সে ব্যবস্থাও তিনি নিজেই করবেন। বাড়ীর লোক পুরুষ চিকিৎসকের নাম শুনে আঁৎকে উঠলেন। বউ মরে গেলেও কোন পুরুষকে তারা ঘরে ঢুকতে দেবেন না। অবশেষে রাজী করালেন পাশের আরেক বাড়ীর বৃদ্ধ ভদ্রলোক বই দেখে দেখে মোটামুটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে থাকেন তাঁকে এনে উঠানে বসিয়ে রেখে অবস্থা বলে বলে ওষুধের ব্যবস্থা করবেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রথমে তাদের বাড়ী যেতে আপত্তি জানালেন কেননা ঐ মুসলমান পরিবারটি তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হবেন বলে। কিন্তু মহিলা তো নাছোড়বান্দা। পরিবারের লোকেদের সংস্কারের বলি হবে ঐ আসন্ন প্রসবা নারী? তার প্রাণ যাবে ঐ মহিলার সামনেই? তিনি তা কিছুতেই হতে দেবেন না। এর জন্য যে কড় ওঠে তা উঠুক—আগে প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা হোক। বৃদ্ধ চিকিৎসককে ডেকে আনলেন। তিনি উঠোনে বসে রইলেন ওষুধের বাক্স নিয়ে। ভেতর থেকে মহিলা যখনকার যা অবস্থা বলে বলে ওষুধ দিতে লাগলেন। অবশেষে রাত প্রায় ১০টা নাগাদ বধূটি নির্বিঘ্নেই পুত্র সন্তান প্রসব করল। বধূটিকে সুস্থ করে তার ঘর থেকে যখন তিনি বের হলেন—তখন বেশ রাত। সারাদিন খাওয়া হয়নি কেননা নিত্যপূজা সমাপন না করে তিনি কোন আহার গ্রহণ করতেন না।

আরাধ্য পুত্র সন্তানকে বুকের কাছে পেয়ে বধূটি মহিলার হাত ধরে চোখের জলে শুধু জানাল "আপনিই আমার মা"—মহিলা হেসে উত্তর দিলেন "তোমার মা হতে পেরেছি বলেই তো আনন্দ নিয়ে ঘরে যাচ্ছি।"

পূর্ব-বাংলার কত স্মৃতি আজ তলিয়ে গেছে কিন্তু প্রসূতি-সেবায় জ্যোতির্ময়ী ঐ নারীর কথা মনে হলে কেমন বিহ্বল হয়ে উঠি। ইচ্ছা জাগে তেমন সমাজকে দেখতে যেখানে নারীর এই প্রাণ জাগ্রত। কোনো বুদ্ধি দিয়ে নয়, কোন বাহবার আশায় নয়, শুধু সবার জন্য প্রাণ জেগে উঠুক প্রতি প্রাণে।

শতবর্ষের স্মৃতি-সায়রে সরোজিনী

(২০৮ পাতার পর)

কবির কথায় বলি—

মহাবীর্যবতী তুমি বীরভোগ্যা
তোমার সৌন্দর্যের রহস্য রেখেছে তার দুর্গে
দুর্গম্য পরুষতায়।
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে।

দেশ থেকে দেশপ্রীতি আজ উবে গেছে। 'স্বার্থে স্বার্থে নিয়ত সংঘাত' বাধছে। নারকে নারকে সর্বদা সারক হানাহানি। তিলোত্তমাকে পাবার জন্য যেন সুন্দ উপসুন্দে অধুনা সংগ্রাম। ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রহীন। মদনদের মোহ মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করেছে। দেশমাতার তুমি উদ্গাত্রিকা তুমি। মনের মুকুরে তোমার মূর্তি তাই বার বার ভেসে উঠছে! শতবর্ষের স্মৃতির সায়রে শতদল মেলে বিকশিত হয়ে যেন দেখা দিচ্ছ সরোজিনী। তোমার চরণ-সরোজে দীন কবির অঞ্জলি এ কবিতা-কলি গ্রহণ কর—

আজ তোমার পদ্মমধু স্বার্থান্ধের নেত্রে নেত্রে ক'রে
দিক্ খুলে আঁখি;
দেশমাতার হোক সব প্রকৃত পূজারী,—তব রেণু
সর্ব অঙ্গে মাখি।

আউল সম্প্রদায়ের ভাবের গীত

তৃপ্তি ব্রহ্ম

প্রতিবৎসর কল্যাণী (ঘোষ পাড়াতে) দোলের সময় হয় কর্তাভজাধর্মসম্প্রদায়ের মেলা। মেলা হয় ঐ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদের নামে। তার মেলাটি বিখ্যাত আউলচাঁদের সুযোগ্য উত্তরসাধিকা সতীমার নামে। এঁর ছেলে দুলালচাঁদও ছিলেন বড় সাধক।

ইনি সতীমার সন্তান ও ভাবের সাধক সিদ্ধপুরুষ বলে লোকপূজিত হয়ে আছেন। এঁর রচিত পদ লালশশীর পদ বলে খ্যাত।

কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়ের ভাবের ব্যাপার, দেহতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও কর্তাভজন সম্বন্ধে ইনি বহু পদ রচনা করেছেন। আউল ধর্মসম্প্রদায়ের এই ভাবের গীত ও পদ-কর্তা লালশশী অমরত্ব প্রাপ্ত। কারণ, পদকর্তা দীনহীনভাবে প্রকৃত ভক্তস্বরূপ অন্তরঢালা দরদ দিয়ে যে সমস্ত পদ রেখে গেছেন, একাধারে তার সাহিত্য-মূল্য, সমাজ-মূল্য, ধর্ম ও দর্শন আজকের দিনে এবং ভবিষ্যতেও প্রযোজ্য। নামে ভাবের গীত হলেও ওর বাস্তবধর্মীতা অনস্বীকার্য। ধর্মের ঘরে সাধনার সাক্ষ্যবস্তু যদি হয় পরমকে জানা, তাহলে পরম আমাদের থেকে কাছে বা দূরে এমন কোনও কথা নয়। আসলে তা আছে দেহমধ্যে, তাকে অনুসন্ধান করে জেনে নিতে হয়। তাই সাধনার পথে প্রথম ও প্রধান কথা অহং আমিত্ব ত্যাগ করা। এই আমিত্বের আড়াল ঘুচে গেলে, অহংমেঘ কেটে গেলে উদিত সূর্যস্বরূপ সহজানন্দকে জানা যায়। সেই সহজ সামান্যে আছে, বিশেষে পাওয়া যাবে না। এখানে সামান্য অর্থ দীনহীন ফকিরী ভাব আর বিশেষ অর্থ প্রাচুর্য ও বিলাসিতা। শেষেরটি ত্যাগ করে আগেরটি ধরাই বিশেষ সাধনার পথে। তাই গানের ভাষায় পদকর্তা বলেন—

যারা নেকড়া পরে আখড়া করে কামাল বেশে
সহজে তার হিয়ার মাঝে বিরাজে সেই সহজ বসে
এই যে ব্রহ্মপদ পদার্থ তত্ত্ব না করে
নির্বচ্য অনির্বচ অর্থ তায় ঘরে
লালশশী বলে যে আবেশে উড়ছে খুশীর নিশানা।

অথচ দীনহীনভাবে লোকের কাছে ভিক্ষা করার বিড়ম্বনা ব্যবহারিক জগতে বিষয়, আর ভাবের মানুষের ভাষা লোকের জানারও কথা নয়। তাই বলেন—

যদি ভিক্ষা মেগে খেতে যাই এই ভবের বাজারে
বাসনা হাতে করে পথে পথে ভোর কপনি পরে
আমি যে লোকের সাক্ষাতে জানাইলে জিগির
তখনই সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোন দেশী ফকীর।

লোকের বিস্ময়ের বস্তু এমনতরো ফকিরী ভাব। কারণ, তাতে গান, বাজনা কিছুই নেই; থাকবে কি ভিক্ষা মেলে। ভিক্ষারও একটা আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক নিয়ম আছে, তাই প্রশ্নবানের সামনে পড়তে হয় তাকে—

বলে "তাকতা তাগুড় লাগ্ ঝুপাঝুড়" না বাজান না গান
অমনি কি আমার কাছে খামকা ভিক্ষা চান।

তখন লালশশী বলে ভেবে দেখি সোধায় না তাই কিছুতে।

লালশশীর কোন কিছুতেই সোধায় না। অভাবের সংসার গরীব গিন্নী কর্তার মুরোদ নেই, হতচ্ছাড়া মিনসে। তাই গিন্নীকেই সব সামলাতে হয়—ঘর দুয়ার, ক্ষিতি, রোজগার, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ সবই। গরীব বিধাতা; গরীব কর্তা তাই গিন্নী বা সাধকের দশ দশা—

বলবকি আর আধা সবার দশার কথা
কাঙালের পলটনকে যে বানালে সে তো গরীব বিধাতা
শুনলে পাছে মনে হয় ব্যথা।
দশার কথা মনে করিলে, ও ভাই নয়নের জলে
ভেসে-কুটে করতে করতে অমনি ধরে যাথা।

ভানা কুটোই সার; ঘরে ঘরে করে থাকেও সবাই, অথচ মজার কথা গড়নদারকে কেউ চেনে না—

তোমরা গড়নদারকে জান না এ বড় বিষয়
আওএর আর যোয়েদ ছত হিয়েদ চাহারম
সবেধাত্র বিবি এই চারজন
চারবর্ণে হচ্ছে দেখ ত্রিকুল সৃজন্

যদি ফিরে তাকিয়ে না দেখিবে, দেখবে গিয়ে কোথা?

এই বিধাতার তোপাজেল যোগান সবারে
বিষয় বুঝে দিচ্ছে যারে যারে
যে যত লইতে পারে।

—যার যতটা নেওয়ার ক্ষমতা আছে তাকে তাই সরবরাহ করে যাচ্ছেন। গানের ভাষায়—

দেখ খোল খোরাক-পোষাক আদি যার যত আশা
খুব যে ঘটায় অট্টালিকায় সকলের বাসা
মণি মুক্ত প্রবালে খচিত
কোন সুখে কেহ ত তাই থাকে বঞ্চিত
তাই আচারে ব্যবহারে দেখ কোন বিধি কেমন দাতা?

—আমাদের আউল গড়নদার দীনহীন; নিজেই সামান্য ন্যাকড়া দিয়ে লজ্জা ঢাকেন—অথচ—

দেখ আমাদিগের গড়নদার ছোড়ের ন্যাকড়া কাশি
চাইলে পরে তা করেন আমদানি
তাই দেখ তার নিশানি
এই খুদের সরা জলের ভাঁড় নিকড়ে যত
চাইতে না চাইতে রে ভাই পাই অবিরত।

আউলে প্রভু বিশমণি কাঁথা ঘাড়ে করে এসেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। সম্বল বলতে ছেঁড়া কাঁথা, জলের ভাঁড় ও খুদের সরাই। চাইলে তার থেকে দান করেন আর সে দান পেয়ে লোকের অভাব মিটে যায়। কিন্তু এর আছে কি; এর শয্যা তো খেজুরের পাতা—

কুঁড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারে না
আর শশীলালে হেসে বলে—শয্যা খেজুরের পাতা।

—খেজুরের পাতা কণ্টক শয্যার প্রতীক; কুঁড়ে ঘর মানবদেহ।

—এ হেন লোকের বাহ্যিক বেশ সদাই ভোর। কারণ ইনি দীনকর্তা দীনের সন্ধান পেয়েছেন অর্থাৎ সহজমানুষকে জেনেছেন। এ হেন পদকর্তা লালশশীর দীনভাব-এর তুলনা কোথায়?

সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি

(২১৭ পাতার পর)

কিন্তু আমাদের মধ্যে বাকি কয়েকজন আসতে বড় দেরী করে ফেলল।

তখন সবাই মিলে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে ছুট্ লাগালাম।

কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

আমরা যখন ব্রাহ্ম সমাজের সামনে হাজির হলাম—তখন ওখানে একেবারে লোকারণ্য।

অনেক গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়।

এগিয়ে যাই সাধ্যি কি ?

ব্রাহ্ম-সমাজের সিঁড়ির ওপরও বহু লোক দাঁড়িয়ে। দূর থেকে বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

আমরা ঋষি-কবির পেছন দিকটা শুধু দেখলাম। দীর্ঘ দেহ—কোঁকড়ানো চুলের রাশি—

বি-রঙের একটি আলখাল্লা পরিধানে—চারিদিকে বহু মানুষ তাঁকে ঘিরে ধরে আছে— এইমাত্র বোধ হয় তিনি গাড়ী থেকে নেমেছেন।

কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নেবার কোনো উপায় ছিল না।

আমরা সবাই নির্বাক !

প্রথম বার আমাদের কবি-দর্শন এই পর্যন্ত ! [চলবে]

ওয়েসিস্

(২৩০ পাতার পর)

পর্ণা। হাতে মোমের আগুনটা দপদপ করে জ্বলছে, এখনই জাগিয়ে দিতে হবে ওদের। বাইরে কোথায় যেন ভীষণ চেঁচামিচি হচ্ছে। শুনছেন নীহারদেবী শুনছে পর্ণাও। তবুও এই মুহূর্তে পর্ণার মনে যেন এক অদ্ভুত বিশ্বাস জন্ম নিল, ঐ চেঁচামিচি ওদের উঠোন ডিঙিয়ে ভিতরেই এসে পৌঁছাতে পারবে না এই ছোট্ট ঘরটায়, যেখানে পিঠে পিঠে লাগিয়ে শুয়ে আছে জহির আর প্রতিম। চারপাশের সবাই যেন আজ পিপাসার্ত। এক বীভৎস তৃষ্ণায় ওরা মাথা খুঁড়ছে। ওরা মাথা খুঁড়বেই, অথচ জহির আর প্রতিমের দেহের স্পর্শে এখানে যেন কোন অলক্ষ্যেই জন্ম নিয়েছে ছোট্ট একটা ওয়েসিস্। তাই ওরা নিশ্চিন্ত, তাই ওরা ঘুমাচ্ছে।

পর্ণা এবার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, দেখেছো মা ওরা কেমন ঘুমাচ্ছে। থাক, তুমি আর ডেকো না ওদের, ওরা আর একটু ঘুমোক।

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৫৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed a/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

CALOREX INDIA PRIVATE LIMITED

Manufacturers of Industrial Boilers

★
★ ★

"GAGANTARA" (2nd. Floor)

13 CAMAC STREET

CALCUTTA - 700 017

Phone : 43-3351, 43-4112, 43-3751

Central Regd. No. R. N. 2571/57

Messrs. Kalpana Engineering Private Ltd.

(Assisted unit of Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd.)

Manufacturer of Air/Vacuum Brake System, Spare Parts for Locomotives and EMU Coaches of Indian Railways. Also manufacturer of Air/Hydraulic Brake System Used in Vehicles for Defence, Govt. of India.

15 NOV 1979

OFFICE : 8, Madan St. (1st. floor), Suite No. 7, Calcutta-700072.

TELEPHONE : 23-5080

GRAM : RAILBRAKE Howrah

FACTORY : J-46, Industrial Estate, Baltikuri, Howrah-5.

ইন্ডিয়ান কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ প্রেস, গ্রাম : বাগবাজার, পো: অফিস বক্স, কলিকাতা-৩ ফোন : ৩৯-২৪৮১ হইতে প্রকাশিত এবং বিশ্বী প্রিন্ট হাউস ২৩৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণে : সি, কে, প্রিন্টার্স, ৯৯ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯।

উদ্ভিদ জগৎ

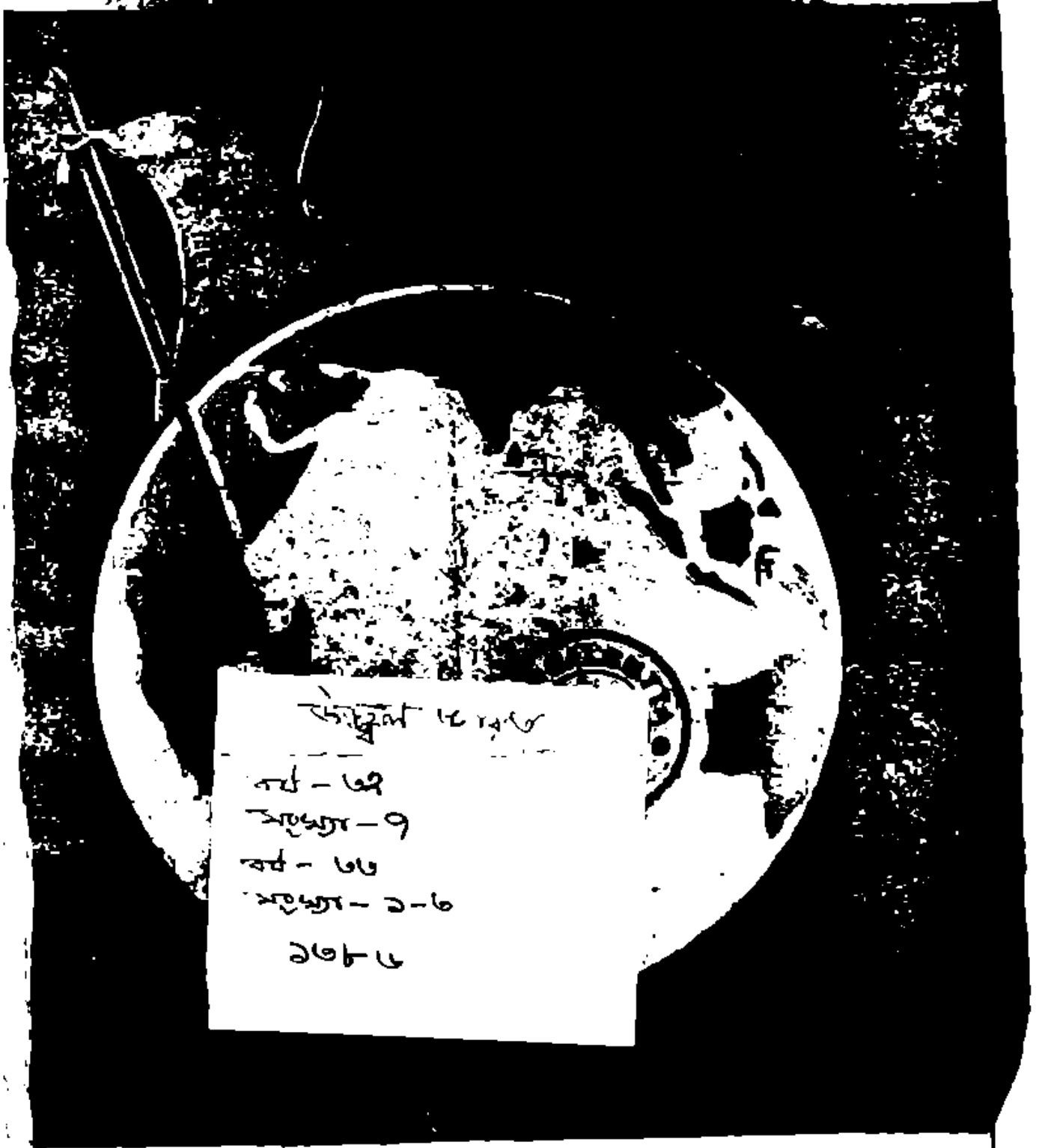

বর্ষ – ৩৫
সংখ্যা – ৭
বর্ষ – ৩৬
সংখ্যা – ১-৬
১৭৮৬

নবম শ্রেণী পর্যন্ত

মূল্য – ১৫ টাকা

GRAM : SAHABON

Phone : 33-2721 (Office)
57-3705
35-0863 (Residence)
67-4437 (Godown)

M/s. Pearson Containers Co.

SALES & ADMINISTRATIVE OFFICE :
13, Baidyanath Mullick Lane,
CALCUTTA-700070

Regd. Office :
Sahabagan, P.O. Tangra,
CALCUTTA-700059

Manufacturer of Quality Drums & Kegs.

● PURCHASE PEARSON PRODUCT ●

'মনে করো, জুতো হাঁটছে পা রয়েছে স্থির.....

Bata understands shoes

সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি। কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে দিতে পারিনা। সেজন্যই আপনার মনোমত, রুচিমাফিক, হালফ্যাশানের জুতোর জন্য সর্বদা কাটায় আসুন।

Bata

উজ্জ্বল ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

স্বল্প — সঞ্চয়

(১ অক্টোবর ১৯৭৯ থেকে নতুন জমার উপর সুদের হার বেড়েছে)

আমানতের নাম	বার্ষিক সুদের হার (পুরাতন)	বার্ষিক সুদের হার (নূতন)	অন্যান্য সুবিধা
১। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (ক) একক/যুগ্ম, পেনশন, সঞ্চয়িকা, , অবসর বৃত্তি, প্রাচুয়িটি ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	৫·৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	অন্যূন ২০০ টাকা জমার পাশ বইতে বছরে দু'টি ড্র'র প্রতিটিতে ১১০০০টির বেশী পুরস্কার। ১ম পুরস্কার একলক্ষ টাকা।
(খ) পাবলিক অ্যাকাউন্টস	৪½% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	
২। পোষ্ট অফিস টাইম-ডিপজিট ১, ২, ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী	যথাক্রমে ৭%, ৭·৫%, ৮% ও ১০%	যথাক্রমে ৮%, ৮·৫%, ৯% ও ১০·৫%	জমা ৫০ টাকার গুণিতকে যত খুশী। সুদ প্রতিবছর প্রদেয়।
৩। ৭ বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট ২য় পর্যায়	৬% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	৬·৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	প্রতি ১০০ টাকার মেয়াদান্তে ১৫৫ টাকা ৫০ পয়সা প্রদেয়।
৫ম পর্যায়	১০·২৫% চক্রবৃদ্ধি	১০·৭৫% চক্রবৃদ্ধি	প্রতি ১০০ টাকার মেয়াদান্তে ২০৪ টাকা ৫০ পয়সা প্রদেয়। যত খুশী রাখা যাবে।
৪। ৫ বছরের জাতীয় উন্নয়ন বণ্ড	১০% চক্রবৃদ্ধি	১০·৫% চক্রবৃদ্ধি	প্রতি ১০০ টাকার মেয়াদান্তে ১৬৭ টাকা প্রদেয়। যত খুশী রাখা যাবে।
৫। ৫ বছরের রেকারিং ডিপজিট	৯·২৫% চক্রবৃদ্ধি	১০·৫% চক্রবৃদ্ধি	মাসিক জমা ৫ টাকার গুণিতকে যত খুশী। ১০ টাকার পাশ বইতে মেয়াদান্তে ৭৭৮ টাকা ১০ পয়সা প্রদেয়। ৫, ১০, ১৫ ও ২০ টাকার পাশ বই জীবন বীমার সুবিধাযুক্ত।
৬। ১০ বছরের কিউম্যুলেটিভ টাইম-ডিপজিট	৬·২৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	৬·৭৫% চক্রবৃদ্ধি (করমুক্ত)	মাসিক জমা ৫ টাকার গুণিতকে। ১০ টাকার পাশ বইতে মেয়াদান্তে ১৯৯৩ টাকা ২০ পয়সা প্রদেয়। জমা টাকা আয়কর রেহাইযোগ্য।

বিঃ দ্রঃ—করযোগ্য আমানতগুলিতেও বার্ষিক ৩০০০ টাকা পর্যন্ত প্রাপ্য সুদ নিয়মানুযায়ী আয়করমুক্ত।

আরও জানতে হলে যোগাযোগ করুন :

স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা ১ ; আঞ্চলিক অধিকর্তা, জাতীয় সঞ্চয়, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা-৭২, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক ; বি. ডি. ও. অফিস ; নিকটতম পোষ্ট অফিস ; অনুমোদিত এজেন্ট। মহিলা এজেন্ট অথবা আপনার অফিসের পে-রোল গ্রুপ নেতা।

স্বল্প-সঞ্চয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

২৪ পরগণা জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

(—১৭৭৮(২৪) তাং—২৬/১১/৭৯

M/s. S. K. Steel Industries

16B, MADAN CHATTERJEE LANE,

CALCUTTA-700007

Manufacturers of all kinds of Stainless steel utensils

and Kitchen Wares.

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সহজ পাঠ্য গীতা	১·২০	**শ্রীনীলিমা ঘোষ** এম. এ. বি. টি.	
বৃহৎ পকেট গীতা	৯·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
সুলভ পকেট গীতা	৩·০০	কর্মবাণী	৩·০০	মানুষের মত মানুষ	১·০০
পদ্যগীতা	৩·০০	ভারত আত্মার বাণী	১·২০	বিজ্ঞানের	৩·০০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২·০০	Soul of India Speaks	7·00	**ব্যায়ামবীর শ্রীশীরদ সরকারের**	
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.				শরীর ও শক্তি	৪·০০
				নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৯·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের	৯·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪·০০
বাংলার ঋষি	৬·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী , ● ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

When you buy a bicycle as a lifelong investment, Consider these plus features...

Sturdiness :
High tensil steele tubings, dip brazed for foolproof weld-strength to suit all road conditions and beat strenuous usage.

Attractive Appearance:
Painting of shot blasted parts done on an ultramodern sophisticated Ransburg Electrostatic Plant lends closer bond and adhesiveness to the Paint surface

Sparkling Glitter :
Automatic Glydo Electroplating Plant makes Rims, Handle Bars and Chainwheels corrosion resistant.

Light Running :
Friction-parts fabricated from special case hardened steel to make them stress- and-strain resistant.

Smoother Acceleration :
Precision parts like Chain, Freewheel, Hubs engineered by expert technicians on most sophisticated machines

HERO 79
Has Them All !

NO WONDER, ALL THESE FEATURES MAKE 'HERO' THE LARGEST SELLING BICYCLE IN INDIA !

Perfectly Aligned :
Latest testing equipment ensures smoother mobility with compact geometrical setting of Frame, Fork and Handle Bar.

Easy on legs :
Superbly designed and crafted pedals, with lock-nut system, for durability and to suit any pedalling style,

Super Craftsmanship :
Rims fabricated from special steel strips to suit all roads and load condition. Bright spokes zinc plated for rust-resistance.

Sleek '79 Look :
Attractive paper transfers, uniquely shaped Fork-crown, elegant Handle Grips and dazzling Reflectors for safer cycling at night.

Economically Priced :
To suit all pockets and testes.

HERO CYCLES PRIVATE LIMITED, LUDHIANA

উজ্জ্বল ভারত ৩২ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
শ্রাবণ '৮৬

সূচীপত্র

আজ চাই একটা দার্শনিক বিপ্লব—পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ২৪৫
সংখ্যার রাজনীতি | সম্পাদকীয় | ২৪৬
সরকারী উদ্যোগে নকলের কারবার | শরদিন্দু সাহা | ২৪৭
বাইশে শ্রাবণে | গৌরচন্দ্র সাহা | ২৪৯
আতঙ্ক | তারা ভট্টাচার্য | ২৪৯
সকলেই সম্রাট এখন গোপাল ভৌমিক | ২৪৯
নিজেকে নিয়ে | অমিত কাঞ্জিলাল | ২৪৯
বর্ষা শুরু হল | অমর বসু | ২৪৯
ট্রাফিক জ্যাম | রেনা চৌধুরী | ২৫০
সেই সুরের মধুর স্মৃতি | স্বপন বুড়ো | ২৫৩
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ২৫৭
বাংলার শিশু সাহিত্যের ধারাবাহিকতা সুধা ঘোষ | ২৬১
দূরের আকাশ | অখিল রঞ্জন রায় | ২৬৮
পূজোর ফুল | কুমারেশ ঘোষ | ২৭০
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ২৭১
ভট্টাচার্যির টিকি | বাণী নাগ/২৭৩
মেনে রাখা ভাল/রতন রায়/২৭৩
পাহাড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত/অনিরুদ্ধ মিত্র/২৭৩
পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা ব্যাহত/ডঃ আভা সেঠ | ২৭৫
দাদু/আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় | ২৭৭

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

আজ চাই একটা দার্শনিক বিপ্লব

একটা দার্শনিক বিপ্লব ছাড়া ভারতবর্ষের বুকে কোন প্রগতিশীল অভিনব ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতি প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। কেননা ভারতীয় দর্শন মনুষ্যের ভাব ও ভাষার উপর গঠিত সমাজ-ব্যবস্থা static। ... বর্তমান সময়ে সমস্ত সমস্যা সেখানে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সেটা হইতেছে পরস্পর বিরোধী কালচারের সংঘাত। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ জড়বাদকে হজম করিয়া ফুস্থ হইতে পারিতেছে না, জড়বাদী পাশ্চাত্য জড়বাদের ব্যর্থতা বুঝিয়াও পরবর্তী পদক্ষেপ কোথায় তাহার খোঁজ পাইতেছে না। ভারতের পক্ষে আজ বড় দুর্দিন। আজ সে অজড়বাদীও নহে, জড়বাদীও নহে। অথচ আজ তাহাকে বাঁচিতে হইলে জড়বাদকে হজম করিয়া অজড়বাদী হইতে হইবে, জড়বাদকে অস্বীকার করিয়া নহে। ঈশ্বর, নর-নারী বা সমাজে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে কম্যুনিজমের যে সর্বশেষ দর্শন তাহা প্রচলিত ভারতীয় চিন্তা-ধারার মূলতঃ বিরুদ্ধ। উৎকট জড়বাদের এই ধারা ভারতীয় সভ্যতার উপর বারবার আঘাত হানিতেছে। দর্শনের অভাব দর্শন দিয়াই মিটে হয়। কম্যুনিজমকে তো এমনি সরাইতে পারা যাইবে না, একমাত্র তাহার অনুনিহিত সত্যকে যদি নিজেদের মধ্যে পরিপাক করিয়া লইতে পারা যায়, তবেই শুধু তাহার দুর্বলতা ও অসৌন্দর্য হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা পাইতে পারে। ...জড়-অজড়, চৈতন্য-অচৈতন্য, matter-spirit, Hegel-Marx, শঙ্কর-চার্বাক বা শঙ্কর-বুদ্ধের অর্থাৎ পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়কারী নিতাগোপালের এই সমন্বয় বার্তার আজ বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।...

একটা দার্শনিক বিপ্লব ছাড়া কোন আন্দোলনই আর অগ্রসর হইতে পারিবে না...। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন আজিকার নহে। ভগবান বুদ্ধ প্রথম মানুষের মহিমা স্থাপন করিতে আসিয়া ইহার বিরুদ্ধে লড়িয়া ছিলেন। তাহার পর হইতে কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায় ও সর্বশেষ মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস পর্যন্ত এই অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছেন, আজও করিতেছেন। কিন্তু কতটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন? সহরের ঘটনা ইহার বিচার নয়—দার্শনিক ভাবে, সামাজিক ভাবে উচ্চ বর্ণ নিম্ন বর্ণের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।...প্রচলিত বর্ণাশ্রমের গুণ-কৌলীণ্য ও কর্মকৌলীণ্যই এই অস্পৃশ্যতার মূলে। গুণে ও কর্মে সমতা না আনিতে পারিলে সমাজের ব্যবহারে সমতা আনা যাইবে না। গুণ-কৌলীণ্য ও তাহার ফল স্বরূপ কর্ম-কৌলীণ্যের উপরেই বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাকে দার্শনিক ভাবেই প্রস্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীনিতাগোপালের এই গুণ ও তথা কর্মের সমতার দর্শন আজ হইতে প্রায় ৫০ বৎসর আগে লিখিত হইয়া আছে। তাঁহার জাতিদর্পণগ্রন্থ ১৩১১ সনে গ্রন্থাকারে ছিল যখন অস্পৃশ্যতা-বিরোধ আন্দোলন আরম্ভই হয় নাই।...

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়

সংখ্যার রাজনীতি

বর্তমান কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার দান সংখ্যার রাজনীতি। এটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার মত এরও বৈজ্ঞানিক গুণ অনেক, তবু এ আজ সমাজ রাষ্ট্রের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কুৎসিৎ রূপ বহুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছিল, সর্বশেষে সেদিন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারে যা দেখা গেল তার লজ্জা ভারতের চিরদিনের কলঙ্ক হয়ে রইল। সংখ্যার প্রতিটি একক যদি সৎ হত, চরিত্রবান হত, যদি বিনা যোগ্যতায় তথাকথিত ক্ষমতালাভে উচ্চাভিলাষী না হত, সর্বোপরি যদি দেশাত্মবোধ বলে তাদের কোন বস্তু থাকত তাহলে প্রতিটি গণককে, প্রতিটি সংখ্যাকে যে মূল্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে স্বর্গরাজ্য বানানো যেত। মানুষ অধিকতর কল্যাণলাভের আশায় যা উদ্ভাবন করল, তার বীভৎস রূপ দেখে আজ তাকে আঁৎকে উঠতে হচ্ছে। গ্রামের অশিক্ষিত ভোটদাতার হাতে যখন গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষিত হয় না, তখন শিক্ষাবিস্তারের কথা আমরা বলি, কিন্তু কেরালা রাজ্যে রাজ্যে আজ যা হচ্ছে তা তো শিক্ষার অভাবের ফল নয়, অত্যন্ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তা প্রধানত চরিত্রের অভাবের ফল, দেশাত্মবোধের অভাবের ফল। চারিত্রিক সত্যনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠা যাদের নাই-ই, দেশের প্রতি ভালবাসা থাকলেও দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদের চরিত্রকে আমাদের পক্ষে বশে রাখা সম্ভব হত। আজ দেশদ্রোহী এই চরিত্রহীনতার দিনে, নেতৃত্ব যখন সর্বথা ওই সেই সময়ে আমাদের—সর্ব সাধারণের—করার কিছু নাই এই সিদ্ধান্তে ঐ সর্বনাশের পথেই গা ভাসিয়ে আমরা চলব, না উঠে দাঁড়িয়ে সমাজ রাষ্ট্রের সুস্থতার পথ আমরাই খুঁজতে প্রয়াস পাব?

আজকের বাঁচবার একমাত্র পথ সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রবান হওয়া যে সত্য-বোধ জড়বাদকে ভয় করে বনে গিয়ে ধ্যানে বসবে না, যে চরিত্র তার দীপ্তিদ্বারা জড়বাদকে পরিপাক করে, অকামযাত্রা কামকে জয় করে সমাজ সংসারকে নূতন করে গড়ে তুলবে। একান্ত জড়বাদের অন্য নাম সুবিধাবাদ, একান্ত অজড়বাদের অন্য নাম ক্লীবত্ব, পলায়ন-পরায়নতা। হাজার হাজার বছরের অধ্যাত্মবাদ যদি ভারতবর্ষকে বলবানই করত তাহলে আজ ক্ষমতা অর্থ ও যশের লোভে সে এত দীনতার পরিচয় দিত না। তাই বলি তথাকথিত অধ্যাত্মবাদ সত্যিকারের শক্তি ও পবিত্রতা দিতে পারে নি। আর সুবিধাবাদ তো কখনই কোন সামগ্রিক কল্যাণ আনতে পারে না।

জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধ আমাদের রক্তে নূতন কথা। বহু মহাপ্রাণের সাধনা দ্বারা স্বাধীনতার আগে যেটুকু সৃষ্টি হয়েছিল, ক্ষমতা হাতে পেয়ে তা লোপ পেয়ে গেছে। আজকের আমরা কি জাতীয় পদার্থ তার কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্ভব নয়। পৃথিবীটা পরস্পরের অনেক কাছে এসে পড়েছে বলে নানাবিধ চিন্তার ফল আমরা পেতে পারছি—কিন্তু এই বিবিধ চিন্তার সাথে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবোধের কোন সমীকরণ সম্ভব হয় নি বলে আমাদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই—পরের বুলি মুখস্থ করেও কল্যাণ আনতে পারছি না, নিজেদের যা ছিল বাস্তবে তার প্রয়োগের কৌশলও আয়ত্ত করিনি। আমরা পরস্পর-বিপরীত জীবন-চেতনা বা ভাবধারার সমন্বয় করতে পারতাম যদি ভারতের আত্মা সমগ্র মানুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সমগ্রভাবে গ্রহণ করতে পারতাম। তাঁর জীবনের বৈপ্লবিক সত্তা বিস্মৃত হয়ে আমরা তাঁকে ছয় পটের ঠাকুরই করে রেখেছি, নয় দুর্বোধ্য বোধে পরিত্যাগ করেছি। তাঁর সামগ্রিক জীবনের বিপ্লবের গোপন-বার্তা প্রকাশ করতেই শ্রীশ্রীনিতাগোপাল জড়-অজড়, আত্মা-অনাত্মা, প্রভৃতি সমস্ত বিপরীত বিরুদ্ধের সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা হয়েই রাজনীতি-বিশারদ—তাই কখনও ক্ষমতা অর্থ যশ বা ব্যক্তি-স্বার্থদ্বারা তিনি আচ্ছন্ন হননি, সামগ্রিক কল্যাণ বুদ্ধিও কখনও তাঁ হতে তিরোহিত হয় নি। আমরা আগে সৎ হব, চরিত্রবান হব, তারপর আমরা রাজনীতি করব, তা না হলে যা হবার তাই হচ্ছে। এতদিন মানুষের উপরে যে অত্যাচার অবিচার শোষণ চলেছিল, আজ গণতন্ত্রের হাতে তার যে মুক্তাহা হতে পারল না তার কারণ সংখ্যাই শক্তি নয়, সংখ্যাই একমাত্র সমাধান নয়। জড়বাদ-উদ্ভূত চিন্তাগুলির সঙ্গে অজড়বাদের সত্যতা আদর্শনিষ্ঠা ও সামগ্রিক কল্যাণ বুদ্ধির সমন্বয় ব্যতীত শুধু সংখ্যার যোগবিয়োগে মানুষের শান্তি সুখ কল্যাণ সম্ভব বা নিরাপদ নয়।

সরকারী উদ্যোগে নকলের কারবার

শরদিন্দু সাহা

আসলের তকমা এঁটে নকলের ব্যবসা সব দেশেই আইনের শাসনে নিয়ন্ত্রিত। আমেরিকায় নকল বা ভেজাল পণ্যের পসারী অপরাধীকে দশ বছর কারাবাস আর ২০ হাজার ডলার বা সেড় লক্ষ টাকার ওপর জরিমানার মোকাবিলা করতে হয়। তবুও কোথাও নকল পণ্যের কারবার চলে না এমন নয়। কেন না যে পণ্যের চাহিদার অনুপাতে যোগান কম তারই নকলের কারবার থেকে মুনাফা শিকারীরা ফায়দা লুটে থাকে। এমন কি অনুরূপ কারণে সরকারী উদ্যোগেও কিছু দেশ নকলের ফলাও বেসাতি করে থাকে। তারই একটা নজির এখানে দাখিল করা হোলো।

ক্যাভিয়ার রাশিয়ার একটি বনেদী খাদ্য। দেশের বাইরেও এর খুব নাম ডাক। প্রাচীন কাল থেকেই এটি সে দেশের রাজকীয় ভোজের আসরে আভিজাত্যের মর্যাদায় চিহ্নিত হয়ে এসেছে। আজও সেখানে এর কদর কিছু মাত্র কমে নি। বিশেষ করে রাশিয়ার সব চেয়ে উগ্র সুরা ভডকার সঙ্গে এটির পরিবেশন মণি কাঞ্চন সংযোগ বলে বিবেচিত হয়। ক্যাভিয়ার এর নাম শুনলে মার্কিনী বা ইয়োরোপের ধনী ভোজন বিলাসীদের জিভে জল গড়াতে শুরু করে।

বর্তমানে দেশে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের তাগিদে রাশিয়াকে শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলি হতে উন্নত মানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য চাই প্রচুর বিদেশী মুদ্রা। স্বদেশে তৈরী পণ্যের বিনিময়ে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে পুঁজিবাদী পশ্চিমী দেশগুলিতে ক্যাভিয়ারের চাহিদা দারুণ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে এর দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি কেজি ১০০০, এক হাজার টাকায়। এর ফলে রাশিয়ার পক্ষে ক্যাভিয়ার রপ্তানী করে দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের মৌকা মিলেছে। তবে বিদেশে বিপুল চাহিদার অনুপাতে রাশিয়ায় এটি উৎপাদনের সুযোগ সীমিত থাকায় এর ফলাও রপ্তানি এতদিন সম্ভব ছিল না।

ক্যাভিয়ার তৈরীর মূল উপাদান স্টার্জন নামীয় সামুদ্রিক মাছের ডিম। এই মাছ এক একটা ওজনে ১২/১৩ মণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরা বসন্তের শেষে কাস্পীয়ান সাগরের খাদিজা। দুনিয়ার আর কোথাও এদের দেখা মিলবে না। গভীর জলের মাছ মানুষের হাতে যেমন সহজে ধরা দেয় না তেমনি বিনা জন্য শাসনেই এদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পাচ্ছে। কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল জুড়ে অবাধ শিল্প বিস্তারের ফলে ঐ অঞ্চলের জল দূষিত হয়ে পড়ায় এই বিরাটকায় মাছগুলি রাশিয়ার জেলেদের আওতার বাইরে অপেক্ষাকৃত কলুষ মুক্ত ক্যাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে ইরাণের উপকূলের দিকে দলে দলে হিজরত সুরু করেছে। এই সুযোগে ইরাণেও ক্যাভিয়ার তৈরীর নতুন নতুন কারখানা গজিয়েছে। এর ফলশ্রুতি রাশিয়ার ক্যাভিয়ার তৈরীর মূল উপকরণে ঘাটতি পড়ে।

কয়েক বছর আগেও রাশিয়ায় ১০০০ টনের মতো ক্যাভিয়ার উৎপন্ন হোত। এর প্রায় সবটাই বিদেশে পাচার করা হোত। এর ফলে দেশের রাজকোষে ১০০ কোটি টাকার মতো দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা জমা পড়তো। প্রয়োজনের তুলনায় এটা খুব বেশী নয়। অথচ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পথে প্রচুর সম্ভাবনাময় এই পণ্যটির উৎপাদন বৃদ্ধি হলে রাশিয়ার পক্ষে বিদেশ থেকে প্রচুর খাদ্য আর যন্ত্রাদি আমদানী করা কিছুটা সহজ হবে। তাছাড়া স্থানীয় ভোজন বিলাসীদের কথাও সরকারকে ভাবতে হয়। সাধ থাকলেও এর বাজার দর তাদের সাধ্যের সীমার মধ্যে না থাকায় তারা এটা খেতে পায় না। দেশের সবচেয়ে অভিজাত খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তারা দুঃখ। জন-মনের সঞ্চিত বিক্ষোভ পাছে বিস্ফোরণ ঘটায় এই ভাবনায় সরকারের টনক নড়ে। ক্যাভিয়ার তৈরীর বিকল্প উপাদান আবিষ্কারের তাগিদে ডাক পড়ে বিজ্ঞানীদের।

দশ বছরের ওপর গভীর গবেষণার পর রুশ বিজ্ঞানীরা অবশেষে যে নকল ক্যাভিয়ার পয়দা করেন তার মূল উপকরণ

স্টার্জন মাছের ডিম নয়। এর বাজার দরও আসল ক্যাভিয়ারের চেয়ে শতকরা ৮০ ভাগ কম। এই নকল ক্যাভিয়ার এমন নিখুঁত ভাবে তৈরী যে সাদা চোখে আসলের সঙ্গে এর প্রভেদ ধোটেই ধরা পড়ে না। কেন না নকল হলেও রূপে, বর্ণে আর গন্ধে বিশেষ তারতম্য নেই। তা ছাড়া আসল ক্যাভিয়ার তৈরীর সরকারী কারখানায় নকল বস্তুটিও পয়দা হওয়ায় এর সম্বন্ধে কারও পক্ষে বিরূপ ধারণা করাও সহজ নয়। এটি তৈরীর মূল উপাদান গরুর দুগ্ধজাত ছানা। নকল পদার্থকে রূপে গন্ধে ও বর্ণে হুবহু আসলের পর্যায়ে উন্নীত করার পথে কেরূপ অভিনব প্রক্রিয়ায় এটি তৈরী করা হয় সেটা কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

প্রথমে দুধের ছানাকে জিলেটিনের সঙ্গে মিশিয়ে যে সাদা ঘণ্ড তৈরী হয় সেটা বেশ করে শুকিয়ে নিয়ে সেমাই যন্ত্রে গুঁড়া করা হয়। পরে সেই গুঁড়োকে রসের সাহায্যে সাগু দানার আকারে কল থেকে নিষ্কাষিত করে নেয়া হয়। দানাগুলি দেখতে মাছের ডিম এর মতোই। তবে রং সাদা। এতে মাছের ডিমের মতো ঝাঁসটে গন্ধ সঞ্চারিত করার উদ্দেশে স্টার্জন মাছের ডিম এর গায়ে যে চট্ চটে রসের প্রলেপ থাকে তাই দিয়ে ঐ দানাগুলিকে লেপ্টে শুকিয়ে নেয়া হয়। এর পর বাকী থাকে আসল ও নকলের বর্ণ বৈষম্য বিলোপ করা। আসল ক্যাভিয়ারের রং গাঢ় কফির মতো কালচে। এই বর্ণ বৈষম্য দূর করতে সাদা ছানার দানাগুলিকে চা এর পাতা থেকে তৈরী ট্যানিন ও লবণ জলে জারিত করে এতে আসল ক্যাভিয়ারের রং ধরানো হয়। এভাবে তৈরী নকল ক্যাভিয়ার রূপে, বর্ণে, গন্ধে হুবহু আসলের মতোই দাঁড়ায়।

এখানে উল্লেখ্য আসল ও নকল পণ্যের গুণগত মান নিরবচ্ছিন্ন সমপর্যায়ের না হওয়ায় এদের কদর ও মূল্যে পার্থক্য থাকে। আসলের চেয়ে নকলের মান নীচু হওয়ায় এর বাজার দামও কম হয়ে থাকে। তবে রাশিয়ার নকল ক্যাভিয়ার বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে এর বাজার মূল্য আসলের চেয়ে কম হলেও পুষ্টি-মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। কেন না উভয়েরই মূল উপাদান যেমন মাছের ডিম বা দুধের ছানায় প্রচুর প্রোটিন থাকায় পুষ্টিগত গুণের মান এদের সম পর্যায়ভুক্ত। তবে সংগ্রহের সুযোগে তারতম্য থাকায় এদের উৎপাদন ব্যয়েও ফারাক থেকে যায়। ফলে এর বাজার মূল্যও কম হয়। তবু স্বীকার করতেই হয় নকল বস্তুটি নিখুঁত হোক না কেন আসলের তুলনা এঁটে তাকে বাজারে চালানো ঠিক ঘি এর চাপরাস আঁটা বনস্পতির মতোই বিভ্রান্তিকর। তা হলেও এটা মানতে হয় নিখুঁত নকল ক্যাভিয়ার রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের একটা সার্থক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এর ফলে রাশিয়ার পক্ষে যেমন স্বদেশে ভোজন বিলাসীদের সস্তায় এই বনেদী খাদ্যটি সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে তেমনি আসল ও নকল ক্যাভিয়ারের কলাও রপ্তানীর মাধ্যমে পশ্চিমী ধনী দেশগুলি থেকে প্রচুর দুর্লভ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের পথে অবাধ সুযোগ মিলেছে। তা ছাড়া যে মাছের ডিম দিয়ে ক্যাভিয়ার তৈরী হয় সেই মাছগুলি ক্যাস্পিয়ান সাগরে রাশিয়ার অকূল ছেড়ে ইরাণের দিকে হিজরত করায় রাশিয়ার ক্যাভিয়ার ব্যবসায়ে যে সঙ্কট দেখা দেয় নকল ক্যাভিয়ার আবিষ্কারের ফলে সেই সঙ্কট কেটে যায়।

Phone : 23-7023

Grams : "DIWANZADA" CALCUTTA

D. D. CHOPRA & CO. PTE. LTD.

Timber & Plywood Experts

24, Jawaharlal Nehru Road,

Calcutta-13

কবিতা

বাইশে শ্রাবণে

সৌর চন্দ্র সাহা

শ্রাবণে রোদন বুঝি সবই।
আকাশেতে সূর্য্য নেই—
পৃথিবীও হারায়েছে রবি।

আতঙ্ক

তারা ভট্টাচার্য্য

সব শব্দ শেষ—গাছ কাটা হয়ে গেল।
আমরাই বাড়ীর মাথা ছাড়িয়ে যাবে সে—
অথবা চালাবে মূল ভিতের গভীরে—
এই আশঙ্কায়।
অথচ জানি আকস্মিক ভূকম্পনে ধ্বসে যায় বাড়ী
জীবন হারায় বৃক্ষ আলোর অভাবে।
'পদ্মপত্রে জলবৎ আমাদের প্রাণ,—একথাও বহু শোনা।
তবুও কী এক ভয় জীবনের আনাচে-কানাচে—
ছায়া ফেলে যায়।
সে ভয়ে হিংস্র হই—স্বার্থ লোভ ঘিরে ধরে মন;
মহাক্রোধে ধ্বসে পড়ি গাছের জীবন।

সকলেই সম্রাট এখন

গোপাল ভৌমিক

সম্ভোগের হরিত নেশায়
সকলেই সম্রাট এখন
উষ্ণ বুকের উপত্যকায়
লক্ষ্যভেদ শেষ করে কৃতার্থ অর্জুন
সর্বনাশী ক্ষুধা তবু দেহের কোষে কোষে—
জেগে রয়, কামনার ক্ষুধার্ত আগুন।

নিজেকে নিয়ে

অমিত কাশ্যপ

নিজেকে এখন গাছের মত মাটীর সঙ্গে বাঁধতে শেখ
চনমনে চোখ চাওয়ায় ভেসে ডাল পাতার মত
অঙ্গে থেকে মনের সঙ্গে বাঁধতে শেখ,
মৌমাছি ঝাঁক আসছে ফিরে গন্ধে গন্ধে মেতে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিকড়-বাকড় মাটির কোল ঘেঁসে
বাঁধতে শেখ নিজেই এবার নিজের চারদিকে।

এমন একটা বয়স যখন পৃথিবীর ছিলো
চাঁদ তারার মাঝে রোদ পোড়ে শুধু ভাবতো
কি মিষ্টি সুখ বুঝে তোমায় বাঁধলো আমায় বাঁধলো;
চিরটা কাল যদি জ্যোৎস্না রূপ কেরি করতো
দালানবাড়ি খাঁকোর পাড় কলমিলতার ডালে
বাঁধতে তবে বলতো না কেউ নিজে চারিদিকে।

বর্ষা শুরু হল

অমর বসু

অসময়ে বর্ষা শুরু হল
ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে
ভাসিয়ে দিল সমতলের জমি
একটা যাত্রী বোঝাই নৌকা ডুবে গেল
অশ্রুর কান্নার রেশ নিয়ে
যেন সেই মুহূর্তে আমার যৌবন
হয়ে গেল ছড়ানো ছাঁদের পালক
অঙ্কুরিত পদ্মবীজ ঝুরে পড়ল বিষের ছোঁয়ায়।
আজকাল আমার স্বপ্নরা হয়ে যায়
শ্বেত কণিকার দল।
পাণ্ডুর মুখে চেয়ে থাকি দূর বর্ণালীর রংয়ে
চেরা আপেলের বুকের রক্তটুকুও হাতে নিতে
শুকিয়ে যায় চোখের নিমিষে
যন্ত্রণায় নীল শিরা ফুলে ওঠে কপালের পাশে
আমি আছি একভাগ ঘুমে
সে আছে অন্য পূর্বাচলে
দুটি মনের আদান-প্রদান হবে ওঠে জীবন তারী
ঘনবারাতের শঙ্কিত মেঘের মত।

ট্রাফিক জ্যাম

হেনা চৌধুরী

মনীষা গেট স্যালুটিশ নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাবা মা, ভাইরা এবং বহু বান্ধবীর দল এসেছে এয়ার পোর্টে ওকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। সকলেরই চাহনিতে স্নেহ। ছোঁয়া ছুঁয়ে আর প্রার্থনায় শুভেচ্ছা প্রীতি ও ভালবাসা। মনীষা ছলছল চোখে হোটের কোণে মান হোসমার হাসি নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। আর কথার ফাঁকে ফাঁকেই অন্যমনস্ক মনটা ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বারবার অবাধ্য চোখ দুটো বলে যাচ্ছে লাউঞ্জের গেটের দিকে।

অথচ তার বিদায়টা এদের সকলের চেয়ে দেবাশীষের কাছে যেন জরুরী ছিল না। কিন্তু প্লেন ছাড়তে আর মাত্র আধঘণ্টা বাকী অথচ অথচ ওতো এখনও এলোনা, ওর মনের কথা বুঝতে পেরে অন্তরঙ্গ বান্ধবী সুস্মিতা বলল মিতেই চুপ উতলা হচ্ছিস মনীষা, দেখিস দেবাশীষ ঠিক সময়মতো এসে পৌঁছে যাবে। মনীষা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে বলেছে, বয়েই গেছে আমার ওর জন্য ভাবতে। কিন্তু কথাটা শেষ হবার আগেই মুক্তা বিন্দুর মতন বড় বড় ফোঁটায় মনীষার চোখের জল সুস্মিতার জড়িয়ে থাকা হাতের ওপর পড়লো। সুস্মিতা একান্ত সহমর্মিতে হাতটা চড়িয়ে নিয়ে বোধহয় দেবাশীষকে ফোন করবার জন্যই রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল। মনীষা সকলের থেকে একটু একলা হয়ে লাউঞ্জের এক কোণায় একটা সোফায় বসে ভাবতে লাগলো গতকাল সন্ধ্যাবেলার কথা। ওয়ালড্রোপের একটা নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে ওরা বসেছিল মুখোমুখি। দুজনেরই মনে হচ্ছেছিল চাপ চাপ বরফের মত কথা আছে বলবার। কিন্তু আসন্ন বিচ্ছেদ-কাতর মনে সান্নিধ্যের উষ্ণতায়ও মনে পড়ে নি। বন্ধ হোটেলের আলো আধারের পরিবেশে ভাষাহীন নীরবতা দিয়ে পরিবেশটাই কেমন যেন বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছিল। একপাশে পড়ে থাকা দেবাশীষের উপহার একগুচ্ছ তাজা লাল টকটকে গোলাপকে

ক্যাকাসে দেখাচ্ছিল ঠিক মনীষার মুখের মতন। বেয়ারা মেনুকার্ড দিলে অভ্যাসবশে দেবাশীষ বলেছিল এই সিক্রেট কর। মনীষা আলতো ভাবে আঙুল দিয়ে কার্ডটা দেবাশীষের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল আজ তুমি সিক্রেট কর। আমার কি-চ-চু ভাল লাগছেনা।

তারপর আবার চুপচাপ।

দেবাশীষ—এই কথা বলছনা কেন?

মনীষা ন্যাপকিনটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে বললো, কি বলবো বল?

তারপর হাতের চেটোয় মুখটা রেখে অন্যমনস্কভাবে বললো এই স্যুটটা পরলে তোমাকে দারুণ দেখায়। দেবাশীষ যেন শুনতেই পায়নি কিংবা এই প্রশস্তিতে খুশী না হয়ে খানিকটা আপন মনেই বললো, ভাবছি পাঁচ বছরে কতদিন।

মনীষা ওর হাতটা হাতের মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে বললো, প্লীজ, ওকথা থাক।

যাবার আগে আমায় এমন করে দুর্বল করে দিওনা দেবাশীষ। তুমি না আমার inspiration !

দেবাশীষ জবাব দিল excuse me। যে যার তার চেয়ে আশাপদ চেয়ে যে অপেক্ষা করে তার কষ্টটা বেশী কিনা। এরই মধ্যে বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। মনীষা তাড়াতাড়ি দেবাশীষের হাত ছেড়ে দিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বসে।

আজ দেবাশীষই পরিবেশনের ভার নেয়।

ছুরি কাঁটার টুংটাং আওয়াজ কয়েক লোকেও উঠেই বন্ধ হয়ে যায়।

দুজনে ন্যাপকিনে মুখ মোছে।

বেয়ারা মশলামৌরীতে বিল নিয়ে আসে।

দেবাশীষ তা মিটিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পেছনের পকেটে হাত ঢোকায়। তার আগেই একনজরে পরখ করে নিয়ে মনীষা বিলটা দিয়ে দেয়।

দেবাশীষ অভিমান মিশ্রিত অভিযোগের সুরে বলে তুমি দিলে কেন ?

ধরা গলায় মনীষা জবাব দেয় অনেকদিন দেব না বলে। একটা পাঁচ টাকার নোট ডিসের ওপরে রেখে দেবাশীষের গোলাপ গুচ্ছটাকে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে যায়। দেবাশীষ ওর পিছু পিছু আসে। মনীষা গাড়ীতে এসে বসে। দেবাশীষকে পথ অবরোধ করে দাঁড়ায় ওদের সাংবাদিক বন্ধু সুব্রত।

বলে, কেমন আছিস।

দেবাশীষ ওকে এড়াবার জন্যই সংক্ষেপে জবাব দেয়, ভাল।

কিন্তু সুব্রতর সংগিনী অপেক্ষা করে নেই। তাই ওর তাড়াও নেই। তাই ও আলাপকে দীর্ঘায়িত করতে চায়। বলে, বেশ আছিস তুই। দিনের বেলা চুটিয়ে ব্যবসা করছিস, আর সন্ধ্যে বেলায় প্রেম।

আর আমাদের সাংবাদিকদের দ্যাখ। চব্বিশঘণ্টার কাজ বিকেল বেলা।

ব্যক্তিস্বাধীনতা নেই। যখন যে সরকার তার স্তুতি করা। উঁ অসহ্য ! লোকে বলে সাংবাদিকরা অধিকাংশই মাতাল কিন্তু বস্তুতো মদ খায় কেন তা মেনে নিতে হলে মানুষকে কি মাতাল না হয়ে উপায় আছে।

গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে মনীষা বলে এই তোমাদের হোল।

সুব্রত লজ্জিত হয়ে বলে I am sorry। চলি রে ! বলেই ও পা টানতে টানতে এগিয়ে যায়। দেবাশীষ এসে গাড়ীতে বসে। মনীষা প্রশ্ন করে সুব্রত আমার সংগে যে বড় কথা বলল না ?

মেজাজটা একেবারে out ছিল।

দেবাশীষ গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়।

আবার দুজনে চুপচাপ।

ও সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে দেশলাই এর জন্য পকেটে হাত ঢোকায়।

তার আগেই পুট করে লাইটার জ্বালার শব্দে চমকে পাশ ফিরে তাকায়।

লাইটারের চকিত আলোয় একটুখানি স্বরূপ মুহূর্ত বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়।

কোথায় যাবে ?

চলো গঙ্গার ধারটা একবার ঘুরে আসি।

শীতকালের রাত ন'টায় গঙ্গার ধার প্রায় জনমানব শূন্য। নভেম্বরের শেষ। তাই বেশ শীত শীত করছিল।...

মনীষা আরও নিবিড় হয়ে বসে। আজ এই মুহূর্তে মনে হয় শুধু এমনি করে সে আর দেবাশীষ পাশাপাশি বসে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

গাড়ীটা এনে লেকরোডের মনীষাদের ছাইরঙা দোতলা বাড়ীর এক কোণায় দাঁড় করে।

দেবাশীষ গেটটা খুলবার জন্য হাত বাড়ায়। ওর হাতের ওপর মনীষার উত্তপ্ত চোখের জল গড়িয়ে পড়ে।

মনীষা অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ীর গ্লাস তুলে দিতে দিতে বলে আর রাত কেরো না। গরম জামা নেই। ঠাণ্ডা লাগবে।

দেবাশীষ স্টার্ট দেয়। মনীষা বলে, কাল আসছ তো ঠিক সময়ে ?

দেবাশীষ জবাব দেয়, কেন সন্দেহ আছে নাকি? হাত নেড়ে দেবাশীষ শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেয়।

গাড়ীর পেছনের লাল আলোটা শেষ বিন্দু কণায় মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মনীষা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই রাস্তায়ই একা একা দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাঁদে। তারপর চোখ মুছে বাড়ী যায়।

মনীষা ভাবে আর···আর আধ ঘন্টাও নেই।

কিন্তু কোথায় ও?

এরই মধ্যে হৈ হৈ করতে করতে ঢুকলো ঘানস।

ফুলের গোছাটা ওর হাতে দিয়ে বললো, দেবী আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ কর।

এলেন মিঃ ও মিসেস ত্রিপাঠী। দেবাশীষের বিজনেস পার্টনার। হাসী ফুলের বোকেটা হাতে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশ্ন করে দেবাশীষ কোথায়?

মনীষা সে কথার জবাব না দিয়ে বলে তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি বাবা মার সংগে দেখাটা করে আসি।

ওকে আসতে দেখে ৮ বছরের ভাই টিনু জরি আর রাংতা দিয়ে মোড়ানো একটা প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে বলে, দিদিভাই, টিফিনের পয়সা জমিয়ে কিনেছি। গ্লেনে বসে খাস।

টিনু বসেছিল বাবামায়ের মাঝখানে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

বসে নে দিদিভাই, বোস। আজও তো তোরই কত। বাবা মা দুজনেরই মুখগুলো ভারী থমথমে। চোখের কোণায় জল চিকচিক করছে।

বাবা বললেন, মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। মুখ উজ্জল করে ফিরে আসা চাই।

মা বললেন, তাই বলে সারাক্ষণ বই-এ মুখ গুঁজে থেকে শরীর স্বাস্থ্য খারাপ করবি না।

আর সপ্তাহে অন্ততঃ একটা করে চিঠি লিখবি।

এদিকে মাইকে ঘোষিকার কণ্ঠ শোনা যায়। প্যাসেঞ্জারস্ আর রিকোয়েষ্টেড - কথা শেষ হবার আগেই মনীষা উঠে দাঁড়ায়।

বাবা মার পায়ের ধুলো নেয়।

ওরা আশীর্বাদ করেন।

মনীষা কান্না ভেজা গলায় বলে তোমরা সাবধানে থেকো। ও ধীর পায়ে চেকপোষ্টের দিকে এগিয়ে যায়। বন্ধুবান্ধবীর দল ঘিরে দাঁড়ায়।

কে একজন দামী ক্যামেরা উঁচিয়ে ধরে - মনীষা ঘাড় নেড়ে বাধা দেয়।

তারপর ডুবন্ত মানুষের শেষ আশ্রয়ের মতন ঘাড় উঁচু করে দরজার দিকে তাকায়। কান্নায় গলা বুজে আসে। চেকিংএর কাজেলা মিটিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে। বন্ধুবান্ধবীর দল দোতলার বারান্দা থেকে রুমাল উড়ায়। মনীষাও রুমাল নাড়ে।

কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে যায়।

কে ও? দেবাশীষ না?

ওই তো ওর চিরচরিত ভংগীতে হাত নাড়ছে।

হাওয়া ওর মাথার চুলটা নিয়ে খেলা করছে, পরিকাটা নেকটাইটা এলোমেলো করে দিচ্ছে।

বায়নাকুলারের ভেতর দিয়ে মনীষা স্পষ্ট দেখতে পায়। হাত থেকে বায়নাকুলারটা পড়ে যায়···ততক্ষণ প্লেনটা মাটি ছাড়িয়ে রাণওয়েতে গতি নিয়েছে।

এবার সবাই দেবাশীষের দিকে ফিরে তাকায়।

দেবাশীষ জানে ওরা কি বলবে—ধরা গলায় বলে, কি কোরব বল। আজ প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ আসছেন বলে পড়েছিলাম প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যামে। এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে কিছুতেই পথ করতে পারলাম না।

সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[ছয়]

কলকাতায় সেই সময় যে সব পালা-পার্বণ চলতি ছিল, তার কিছু কিছু কৈশোরের কৌতূহল নিয়ে দেখেছি।

সেই সময় আমরা বিডনস্ট্রীটের ছাতুবাবুর বাজারের কাছে কাশী ঘোষ লেনে থাকতাম।

প্রতি বছর ছাতুবাবুর বাজারের ভেতর চড়কের মেলা বেশ জমে উঠত। চড়কের মেলায় বিরাট একটা কাঠের চক্র বসানো হত। বন্‌বন্ করে ঘুরতো। তা ছাড়া একটি মানুষ পিঠ ফুঁড়ে ঝুলে সেই চক্রে কেবলি ঘুরতো। আমরা ছেলের দল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। গা শির্-শির্ করত। কী করে পিঠ ফুঁড়ে বন্‌বন্ করে চক্রাকারে এতক্ষণ ধরে ঘূর্ণায়মান থাকত বুঝতে পারতাম না।

আকারণ নিজের দেহকে কষ্ট দিচ্ছে এটা দেখবারও একটা দারুণ আকর্ষণ ছিল। এই দৃশ্য দেখবার জন্য প্রচণ্ড জন সমাগম হত। সবাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো। আমরা ভাবতাম, নিজের পিঠকে ফুঁড়ে এমন ভাবে বন্‌বন্ করে ঘুরলে কী পুণ্যি হবে?

কিশোর মনের এই কৌতূহলের কোনো উত্তর পাওয়া যেত না।

চড়কের মেলায় সওদা করবার জন্যে নগদ একটি সিকি পেয়েছিলাম। তখনকার দিনে এই সিকির দাম অনেক-খানি। পকেটে সিকিটা পুরে খুশির সঙ্গে চড়কের মেলায় গিয়ে হাজির হলাম।

একটা ছবি কিনবো, টক্‌টক্ লজেন্স কিনবো, আর বিস্কুট কিনবো—এই আমার মনের বাসনা। মেলার ভেতর ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখে যখন আমার সওদা করবার ইচ্ছে হল,—পকেটে হাত দিয়ে দেখি আমার এত সাধের সিকিটা কখন ফাঁকি দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

কলকাতার শহরে যে পকেট মার আছে, আর সে বিন্দুমাত্র ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে পকেটের পয়সা তুলে নিতে ওস্তাদ—সে কথা সেই দিনই টের পেলাম।

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবরটি জানাতে তারা বাঙাল বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করে দিল।

আমার বাঙাল আখ্যা সেই সিকিটা অপহরণ করে পকেটমারের যে কি লাভ হল বুঝতে পারলাম না। মাঝখান থেকে চড়কের মেলায় আমার সওদা করা হল না।

পরেশনাথের মিছিল সেই সময় খুব ধুমধাম-জমকের সঙ্গে বের হত। কত টগবগে ঘোড়া সুন্দর পোষাকে সজ্জিত, দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। রূপোর আদালোটা নিয়ে রঙবেরঙে পোষাক পরে লোক দুধারে সার দিয়ে এগিয়ে আসত। মাঝে মাঝে সেই সাজানো টগবগে ঘোড়া—নানা রঙের পোষাকে সেজে মাথায় পাগড়ী দিয়ে জৈন ধর্মের বিরাট বিরাট ধ্বজা নিয়ে পুরুষগুলি রাস্তা তছনছ করে এগিয়ে যেত। দুইধারের ফুটপাথ একেবারে লোকে লোকারণ্য। সবাই দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু সাজানো রথ যাবে বলে ছেলেদের সামনে ট্রামের তার কেটে ফেলা হত। আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

পুজোর ঠিক পরেই পরেশনাথের এই বিরাট মিছিল বের হত। চলে যেতো পরেশনাথের মন্দিরের দিকে। ফেরিওয়ালারা ঘুরে ঘুরে নানা রকম খাবার বিক্রি করত। তাই কিনে মুখে পুরবার জন্যে ছোটদের উৎসাহের অন্ত থাকত না।

অনেক পর্দানশীন মেয়েরা ভাড়াগাড়ী ভাড়া করে রাস্তার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত—এই পরেশনাথের মিছিল দেখবার জন্যে।

এখনো হয়ত পরেশনাথের বের হয় মিছিল। কিন্তু আগেকার দিনের মতো সে জৌলুষ আর নেই।

তখনকার দিনের জেলে পাড়ার সঙের কথাও মনে পড়ে। বহুবাজার অঞ্চলের জেলেরা সারা বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু অর্থ জমিয়ে এই জেলে পাড়ার সং বের করত।

সারা বছর ধরে এই কলকাতার বুকে কোথায় কি কেচ্ছা হয়েছে, রাজনৈতিক নেতারা কোথায় কি গলদের সৃষ্টি করেছেন, কোন্ ধনী ব্যক্তি এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিড়ালের বিয়ে দিয়েছেন—ছড়া আর সঙের ভেতর দিয়ে সেই সব কেচ্ছা কেলেঙ্কারী সাজিয়ে গুছিয়ে রাস্তায় বের করা হত।

শোনা যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু এই সব হাসির মজলিসের ছড়া লিখে দিতেন।

এই জেলেপাড়ার সং দেখবার জন্য কলকাতার পথে পথে দারুণ ভীড় জমত। আর ভীড় জমলেই ফিরিওয়ালাদের পোয়া বারো। কত রকম মজাদার খাবার, তেলেভাজা আর কুলপী বরফের দল চীৎকার করে আসর সরগরম করে তুলতো।

মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নানের যোগ পড়ত। তখন দলে দলে মানুষ শেষ রাত্তিরে উঠে গঙ্গার ঘাটের দিকে বেরিয়ে পড়ত। সঙ্কীর্তনের দল খোল বাজিয়ে সারা পাড়াকে সচকিত করে উচ্চস্বরে কীর্তন গাইতে গাইতে গঙ্গার ঘাটের দিকে রওনা হত।

এই উপলক্ষে ভলান্টিয়ার দল তৈরী করা হত। গঙ্গার ঘাটে যাতে কোন দুর্ঘটনা না হয় এই ভলান্টিয়ার দল সেই কাজে নিযুক্ত থাকত। তখন ত আর মাইক ছিল না, তাই চোঙার মধ্যে মুখ রেখে চীৎকার করে ভলান্টিয়াররা সাবধান বাণী উচ্চারণ করত। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে কত বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আর কত বৌ-ঝি হারিয়ে যেতো পুলিশ আর ভলান্টিয়ার দল তাদের খুঁজে খুঁজে বের করত।

এই সময় অনেক দুর্ঘটনাও ঘটত।

গঙ্গায় বান আসায় অনেক অসতর্ক মানুষ সেই বানের জলে ভেসে যেতো।

তখন ত' আকাশ-বাণী কলকাতা ছিল না—তাই সব খবর সকল সময় শোনা যেত না। নানা রকম গুজবও ছড়িয়ে পড়ত চারধারে। খবরের কাগজে আর কটা খবর ছাপা হত?

তখনকার দিনের কলকাতায়—ছট্ পুজো একটা মস্ত বড় পার্বণ ছিল দেখেছি। অবশ্য এই ছট্‌পুজো অবাঙালী মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমা মহিলা আর মাড়োয়ারী মহিলাদের মধ্যে ছট্ পুজো খুব চলতি ছিল। এই সব মহিলা খুব সাজগোজ করে ঘোমটা দিয়ে গান গাইতে গাইতে মিছিল করে গঙ্গার দিকে চলে যেতেন। গানের ভাষা আমরা বুঝতে পারতাম না বটে তবে পশ্চিমা এই মহিলাদের শোভাযাত্রা দেখতে খুব ভালো লাগতো।

আমাদের পল্লী অঞ্চলে পৌষ পার্বণ একটা উল্লেখযোগ্য পার্বণ আর উৎসব। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের কাছে এই পৌষ পার্বণ যেন দখিন হাওয়ার আনন্দ বার্তা বয়ে নিয়ে আসত। তখন দেশে দুধের এত অভাব হয়নি। তাই ঠাকুমা-দিদিমার দল খুব সকালে বাস্ত পুজো সমাধা করেই পিঠে-পায়েস তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করতেন।

প্রথম প্রথম কলকাতাতে এসেও দেখেছি—বাঙালী প্রতিবেশীদের মধ্যে পৌষ-পার্বণ পালনের প্রথা প্রচলিত আছে।

কত রকম পিঠে যে বাড়ীর গিন্নিরা তৈরী করতে পারতেন তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

পৌষ সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে উঠে ওই দারুণ শীতে বাড়ীর গিন্নিরা গঙ্গা স্নান করে শুদ্ধ চিত্তে, শুদ্ধ বসন পরিধান করে অগ্নিদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে উনুন জ্বালাতেন।

তারপর বাড়ীর বড় বড় মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলত পিঠে তৈরীর অনলস অভিযান।

বিচিত্র নামের সব অপূর্ব পিঠে মুহূর্ত মধ্যে রূপ লাভ করত—! কত অনবদ্য তাদের নাম: আসকে পিঠে, চিতৈ পিঠে, চন্দ্রপুলি, মোহন বাঁশী, ক্ষীরের পুলি, চন্দ্র-

কাট, চিড়ে ভিজে, ক্ষীর কদম, রসের সাগর, পুলি পিঠে, অনেক খাবো, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু .....

সব নাম কি চাই মনে আছে?

তবে সেকালের ঠাকুমা-দিদিমারা এইসব পুলি-পিঠের নাম উল্লেখ করে ছড়া কাটতেন। শুনতে বেশ লাগত।

তখনকার দিনে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে বেশ ভাব-ভালোবাসা ছিল। পালা-পার্বণে সুখে-দুঃখে অপরের আনন্দ-বেদনার ব্যাপারে সবাই এগিয়ে আসত।

প্রতিবেশীরা নিজেদের তৈরী পিঠে পায়েস আশে-পাশের বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের দিয়ে পাঠিয়ে দিত। আবার পাড়া-পড়শীরাও তেমনি তাদের আয়োজিত উপা-দান আদরের সঙ্গে উপঢৌকন দিত।

এই ছিল সেকালের বাঙালী পাড়ার মধুর প্রথা। তখনো কলকাতায় বাঙালী সংসারে এত অভাব অনটন চড়িয়ে পড়েনি। কাজেই "আসুন জন, বসুন জনের" কোন অভাব ছিল না। কলার পাতা পেতে বসে গেলেই হল। এই পৌষ-পার্বণ বাঙালীর জীবনে চালি ছোটাতো, আর বাঙালীর সংসারে একটি প্রাচুর্য্যের ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসত।

সরস্বতী পুজোকে—সরাসরি পুজো না বলে আমি তাকে পার্বণই বলব। ছোটদের উৎসব বলে অভিহিত করা চলে।

কারণ এই সরস্বতী পুজো কিম্বা বাণী বন্দনা দেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতাতে দেখেছি প্রায় প্রতি বাড়িতেই ছেলেমেয়েরা সমবেত হয়ে তাদের প্রিয় সরস্বতী পুজো সমাপন করত।

অনেক আগে থেকেই ছেলেমেয়েরা দল শিউলী ফুলের বোঁটা সংগ্রহ করে তাই ভিজিয়ে নিজেদের কাপড়, সাড়ি জামা বাসন্তী রঙে ছুপিয়ে নিত।

খুব ভোরে উঠে আশে-পাশের ফুলের বাগান লুট করে ফুল সংগ্রহ ছিল এই সরস্বতী বন্দনার একটি বিশেষ অঙ্গ। এই ফুল দিয়েই মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়া হত।

ছেলের দল পুজো-প্রাঙ্গন নানা রকম রঙীন কাগজ দেবদারু পাতা দিয়ে সাজাতো।

নানা অঞ্চলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে যাত্রা হত। ছেলের দলও নানা বাড়ীর উঠোনে মঞ্চ সাজিয়ে নিজেরা অভিনয়ে মেতে উঠত।

ছেলেমেয়েরা মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য উপোস করে থাকত। আর একটা প্রথা সেই কালে প্রচলিত ছিল—সরস্বতী পুজোর আগে কেউ ফুল খেতো না। তাহলে নাকি বিদ্যে হবে না। আসল কথা পুজোর আগে ফুল কাঁচা থাকতো, খেলেই ছোটদের অসুখ করত। তাই এই সাবধান বাণী।

সারাদিন ধরে অঞ্জলি প্রদান, ভোগ রান্না, মঞ্চ সাজানো, এই সব চলত। মিশনারী বিদ্যালয়গুলি ও সিটি কলেজে কোনো পুজো হত না। বেথুনেও নয়। ওরা আশে-পাশের কোনো বাড়ীতে এই পুজোর আয়োজন করত। আর সেই খানেই অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ পেতো। একবার শোনা গেল, মা সরস্বতীর গলায় মালা দুলছে। তাই দেখতে ভক্ত জনের কী ভীড়।

সেই আমলেও দেখেছি কোনো কোনো অঞ্চলে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হত, আর তার নাম দেয়া হত—"সরস্বতী সম্মেলন।"

কোন খ্যাতিমান সাহিত্যিককে সেখানে ধরে নিয়ে আসা হত। তাঁরা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করতেন। স্বরচিত কবিতাও পাঠ করতেন।

সেই সময় কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার বেশ প্রচলনও ছিল। বহু বড় লোকের বৈঠক খানায় গানের জলসা বসত। সারা রাত ধরে তবলার চাটি শোনা যেত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত চর্চাও সরস্বতী পুজোর একটি বিশেষ উপকরণ ছিল।

দেবী সরস্বতীকে যখন পুজো দেবে পরের দিন বিসর্জন দেয়া হত—সে দৃশ্যও দেখবার মতো ছিল। অনেক বিদ্যালয় কিম্বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা করে মাকে গঙ্গার দিকে নিয়ে যেতো। বিডন্‌স্ট্রীট, হেদোর ধার সেই সময়ে একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো। অনেকে আবার সরস্বতী মূর্তি বিসর্জন দিতেন না। এক বছর বাড়ীতে সংরক্ষণ করতেন। বিদ্যার দেবীকে নাকি ভাসান দেয়া অপরাধ।

এইভাবে বিশ্বকর্মা দেবীকে এক বছর ধরে বন্দীদশায় থাকতে হত—ততদিন না এক বছর পরে আবার নতুন দেবীর আবাহন হয়! তখন পুরাতন দেবী বন্দী দশা থেকে মুক্তিলাভ করবেন। এই ছিল প্রচলিত আইন!

বিশ্বকর্মা পুজোও সেই পুরাতন কলকাতায় সম্পন্ন হত। তবে তার প্রসারতা ছিল না।

সেই প্রাচীন কালে বিশ্বকর্মার মূর্তিরও পরিকল্পনা করা হয়নি। তখনকার দিনে এত কারখানা তৈরী হয়নি। কাজেই শ্রমিক শ্রেণীর এত আধিক্য ছিল না। পত্রপাতি নিয়েই পুজোর আয়োজন করা হত।

সেকালে আজকের দিনের মতো বিশ্বকর্মা পুজোর এত ধুমধাম ছিল না। ছোট ছোট কারখানায় পুজোর আয়োজন করা হত।

বিশ্বকর্মা পুজোর সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানোর যে কী সম্পর্ক সেটা আমার আজও জানা নেই।

কিন্তু সেই অতীত কলকাতাতেও প্রচুর ঘুড়ি ওড়ানোর আয়োজন দেখেছি।

বড় লোকের ছেলেরা ছাদে ছাদে মো-সাহেবদের নিয়ে যে হল্লোড়ের সৃষ্টি করত—তা আজও যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। অনেক আগে থেকেই শিশি-বোতলের কাঁচের গুড়ো সেই সঙ্গে আরো সব মশলাপাতি মিশিয়ে সুতোতে মাঞ্জা দেয়া হত। সেই সুতোয় মাঞ্জা দেবারই বা কী ঘটা! পাড়ায় পাড়ায় এইভাবে কলরব শোনা যেত! বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি—ছাদে ছাদে যে "ভো-কাট্টা" চীৎকার উঠত তাতে পাড়ার কাক-চিল অবধি পালিয়ে যাবার পথ পেতো না।

এমনি ছিল সেকালের বড় লোকের ছেলেদের হুল্লোড় আর উল্লাস!

সেকালে বড় লোকের বখাটে ছেলেদের পায়রা ওড়ানোও একটি ব্যসন ছিল।

বড় মানুষের ছেলেদের ত' আর খেয়ে দেয়ে কোনো কাজ ছিল না, তাই হাজার হাজার পায়রা পুষতো আর তাদের আকাশে উড়িয়ে দিয়ে মজা দেখতো। এই ব্যাপারে মোসাহেবও অনেক জুটে যেতো। তারা ছাদে ছাদে এমন শিস্ দিত যে, বাড়ীর বৌঝিরা পথ চলতে ভয় পেতো।

আবার শোনা যেত, কোন ধনী ব্যক্তি বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করেছে! কোন্ কায়েন বাবু তার জল পাত্রের আবদারে লাখ টাকা ব্যয় করে কার্ত্তিক পুজো করেছে!

কোন্ বখাটে ধনী পুত্র ঘুড়ির সঙ্গে শত শত দশটাকার নোট বেঁধে দিয়ে ভো-কাট্টা খেলায় মেতেছে।

এই ছিল সেকালের 'কায়েন' কল্‌কাতা !!!

(চলবে)

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা	১২·০০
৩।	শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২·০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৬·০০

প্রতিভা রায় রচিত

১।	নারীপ্রগতির রূপকথা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

রেণু মিত্র রচিত

১।	সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	২·০০
২।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩।	রবীন্দ্র জীবন	৫·০০
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৫৭-২৫৪০

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ এগারো ॥

গঙ্গাদাস বিখ্যাত বৈয়াকরণ। অর্থাৎ ব্যাকরণে পণ্ডিত। দেশজোড়া তাঁর সুখ্যাতি। দূর দেশ থেকেও পড়ুয়া আসে তাঁর পাঠশালায়। নানা বয়সের পড়ুয়া। তারা ব্যাকরণ অধিগত ক'রে গুরুর কাছ থেকে বিদায় নেয়। কারো কারো বেশ নাম-যশও হয়।

নিমাই পড়তে গেলো সেই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায়। এবারে আবার সে নতুন মানুষ। তার দুষ্টুমি নেই। আর সে ধৃষ্টপণা নেই। বিদ্যাভ্যাসে আবার সে তার মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছে।

বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ এখনও মাঝে মাঝে আসে। বলে, 'আমাদের তুই ছেড়ে দিলি নিমু?

'বা-রে! ছাড়লাম কৈ? এই না তোর সঙ্গে কথা বলছি।'

'শুধু তো কথাই বলছিস্। কিন্তু কথা বলাই কি আর সব হলো রে? তুই গঙ্গার ঘাটে খেলতে আসিসনে।

নিমাই বলে, 'সময় কৈ রে? যাবো কি করে? দেখছিস নে আমি আবার পড়ছি। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ছি। পাঠশালায় পড়লে কি আর সময় থাকে রে? সময় থাকে না।'

একটু থেমে আবার বলে, 'আগে লেখা-পড়াটা শেষ করি ভাই, তারপর তোদের সঙ্গে আবার খেলবো'।

'পড়ে শুনে যে তুই পণ্ডিত হবি নিমাই। পণ্ডিতরা তো খেলে না। রাত-দিন শুধু অং বং চং করে।

বন্ধুর কথায় নিমাই হাসে। হেসে বলে, দোৎ, পণ্ডিতরা খেলে না কে বললে তোকে? পণ্ডিতরা বুঝি মানুষ নয়? পণ্ডিতেরাও খেলে। তবে তারা পড়ার শেষে খেলে। আগে আমার পড়া শেষ হোক, তখন আমিও আবার খেলতে যাবো। গঙ্গায় গিয়ে লাফ-ঝাঁপ করবো।'

নিমাইয়ের কথা বন্ধুটির মনে ধরে না। সে দেখছে, নিমাই আবার তাদের কাছ থেকে সরে গেছে। সে শুধু খেলা ছাড়েনি, তাদের কথাও বুঝি সে মন থেকে মুছে ফেলেছে। হয়তো কাছে গেলে সে আর তাদের চিনতে পারবে না। নাম বললে সে শুধু বিস্ময়ে তাদের মুখের দিকে হা করে চেয়ে থাকবে।

কিন্তু তারা তো নিমাইকে ভুলতে চায় না। ভুলতে পারে না। জল ছাড়া মাছ যেমন, নিমাই ছাড়া তাদেরও যে ঠিক তেমনি অবস্থা। নিমাইয়ের কথায় তাই সে মুখ ভার করে চলে যায়। পড়তে গিয়ে নিমাই তাদের ভুলে গেছে, এ কথাটা যে সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। গভীর ব্যথায় চোখে তার জল আসে। চোখে জল নিয়েই সে বাড়ি ফেরে।

পুঁথির বেড়া নিমাইকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করেছে, এ বেদনা কি সহজে ভোলা যায়?

অদ্ভুত মেধা নিমাইয়ের।

সে যা শোনে তা-ই মনে থাকে, যা পড়ে তা-ই যেন মনে গেঁথে যায়। বয়সে কম হলে কি হয়, ব্যাকরণের জটিল সূত্রগুলিও সে এরই মধ্যে আয়ত্ত করেছে।

এগুলি আয়ত্ত করা কি সহজ কথা?

না, এতোদিন পরে মনের মতো ছাত্র পেয়েছেন গঙ্গাদাস। পেয়েছেন তাঁর পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী।

দেবেন, দেবেন, তাঁর যা কিছু আছে, সব কিছুই দিয়ে

যাবেন নিমাইকে। নিমাইয়ের আধারেই ধরে রেখে যাবেন তাঁর দীর্ঘকালের সাধনা। তাঁর অর্জিত বিদ্যা।

গঙ্গাদাসের মন তাই আনন্দে উদ্বেল।

জগন্নাথ মিশ্রকে ডেকে বলেন, 'পণ্ডিত, আমি খুঁজে পেয়েছি পণ্ডিত।

জগন্নাথ কিছুই বুঝতে পারেন না। হা ক'রে শুধু গঙ্গাদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গঙ্গাদাস বলেন, 'হ্যাঁ আমি পেয়েছি পণ্ডিত, যাকে সব কিছু উজার করে দেয়া যায়, তাকে আমি খুঁজে পেয়েছি।'

একটু থেমে আবার বলেন, 'হ্যাঁ আমি দিয়ে যাবো, সব কিছু দিয়ে যাবো। আমার যা আছে তার সবই। সব কিছুই।' বলতে বলতে আবেগে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গলাটা যেন ধরে আসে।

জগন্নাথ মিশ্র বলেন, 'তোমার কথা তো আমি বুঝতে পারছিনে পণ্ডিত! কাকে কি দিয়ে যাবে?'

গঙ্গাদাস বলেন, তোমার নিমাইকেই। তোমার নিমাইকেই আমি আমার সব বিদ্যা দিয়ে যাবো। সে-ই, শুধু সে-ই সে বিদ্যার যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

একটু থেমে, একটু দম নিয়ে আবার বলেন গঙ্গাদাস, 'বহু ভাগ্যে নিমায়ের মতো সুপুত্র পেয়েছো পণ্ডিত, তুমি ধন্য, তোমার জনম সার্থক।'

গঙ্গাদাসের কথায় খুশি হন জগন্নাথ মিশ্র।

পুত্রের সুখ্যাতিতে কোন্ পিতার বুক আনন্দে ভরে না ওঠে! বাড়ি ফিরে শচীদেবীকে সে আনন্দের ভাগ দেন। গঙ্গাদাসের কথা শোনান।

শুনে শচীদেবী বলেন, 'হবে না? বাবার কথা কি মিথ্যে হতে পারে? বাবা বলেছিলেন না নিমাই মস্ত বড়ো হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে? তুমিই তো ওকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে মূর্খ বানাতে বসেছিলে!'

জগন্নাথ মিশ্র বলেন, 'ওরে, বুঝলে গো, ভয়ে, ভয়েই আমি ওকে পড়াশোনো থেকে সরিয়ে এনেছিলাম। একটা গেছে, লেখাপড়া শিখে নিমাইও যদি আবার সেই পথে যায়? তাহ'লে এ-পুরুষ ধরে যে আমি হাপিত্যেশ উঠবো। হাপিয়ে মরবো। নইলে কী আগুন ওর ভেতর লুকিয়ে আছে, সেটা কি আমি বুঝিনি বলতে চাও?' বলতে বলতে মিশ্রের গলাটা যেন ধরে এলো। চোখ দু'টি উঠলো ছল ছল করে। শচীদেবী বুঝলেন তা। বুঝে আর কথা বাড়ালেন না। নিজের কাজে চলে গেলেন।

এই আলোর পেছনে আঁধার আছে, হাসির পেছনে অশ্রুজল—মিশ্রের বুঝি এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না।

নিমাইকে নিয়ে সেদিন তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। এঁকেছিলেন একটি সুখী পরিবারের ছবি। সে পরিবারে সুপুত্র আছে, আছে কল্যাণী পুত্রবধূ। আর পুত্রবধূর কোল আলো করে এসেছে একটি নতুন অতিথি—মিশ্র পরিবারের ভবিষ্যৎ।

সে অতিথিকে বুকে তুলে নিয়েছেন মিশ্র। আদর করেছেন। সে আদরে শিশুর কচি মুখখানা হাসিতে ভরে গেছে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগেছে মিশ্রের মনেও। শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে তিনিও হাসছেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়া এলো। সে ছবি দুলে উঠলো। দুলে দুলে একেবারে ছিঁড়েই গেলো। ছিঁড়ে কুটি কুটি হলো।

মিশ্র ঘরে পড়লেন।

বয়েস প্রায় ষাট। কিছুকাল ধরে শরীরটা ভালো চলছিল না। সে ভাঙা শরীরেই জ্বর এলো। প্রবল জ্বর।

মিশ্র শয্যা নিলেন।

বৈদ্য এলেন। ওষুধ দিলেন।

কিন্তু জ্বর কমলো না। অবস্থা ফিরলো না। বরং দিনে দিনে খারাপ হয়েই চললো।

মিশ্র বুঝলেন, তাঁর ডাক এসেছে। চোখের আলো নিভে আসছে। এবারে তাঁকে যেতে হবে। এ পৃথিবীর মায়া-মমতার ডোর ছিঁড়তে হবে। তাঁর কাছে এসেছে অমৃতলোকের আমন্ত্রণ।

কিন্তু বড়ো মায়া হলো মিশ্রের। এ মায়ার ডোরে টান পড়তেই প্রাণটা যেন তাঁর কেঁদে উঠলো।

মায়া হলো নিমাইয়ের জন্যে। নিমাইকে দেখবার যে কেউ নেই। আহা, নিমাইকে যদি তিনি মানুষ করে যেতে পারতেন!

নিমাইয়ের কথা মনে হতেই মিশ্রের দু'চোখ ভরে জল এলো। বুকটা উঠলো হাঁপিয়ে।

নিমাইকে কাছে ডাকলেন।

গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'নিমু, আমি যে চললুম রে। দেখে শুনে চলিস্ বাবা। এ সংসার বড়ো কঠিন ঠাঁই, দেখে শুনে না চললে, প্রতি পদে ঠোক্কর খেতে হয়।'

চোখের জল মুছতে মুছতে আবার বললেন, 'নিমুরে, তোর জন্যে যে কিছুই আমি রেখে যেতে পারলুম না। সারা জীবন সরস্বতীর ভজনা করেছি, লক্ষ্মী তাই আমার প্রতি বিরূপা। আমার শূন্য হাঁড়ি কোনকালেই তাই ভরলো না। তা না ভরুক, সরস্বতীর স্তুতি করে মন তো আমার ভরেছে। সেই মন নিয়েই তোকে আমি আশীর্বাদ ক'রে গেলুম বাবা, তুই বড়ো হবি। মানুষের মতো মানুষ হবি। মিশ্র বংশের মর্যাদা বাড়াবি।' বলতে বলতে মিশ্র হঠাৎ থেমে গেলেন।

এগারো বছরের ছেলে নিমাই। সবই কিন্তু বুঝলে। বুঝলে যে, পিতা তাঁর এমন দেশে রওনা হয়েছেন, যেখান থেকে কোন কালেই মানুষ আর ফিরে আসে না। সেখানে গিয়ে মানুষ নক্ষত্র হয়। নক্ষত্র হয়ে আকাশে জ্বলে। জ্বলে জ্বলে পৃথিবীর মনের মানুষদের দেখে।

তার পিতাও নক্ষত্র হবেন। সেখানে গিয়েও তিনি তাদের দেখবেন। কিন্তু কোন কালেই তো সে আর বাবাকে কাছে পাবে না। ঘরে ফিরে তো আর তাঁকে বাবা বলে ডাকতে পারবে না। বাবার অভাবে সংসার তাদের শূন্য হবে। শূন্য সংসারে হাহাকার উঠবে।

গভীর ব্যথায় নিমাইয়ের বুকটা হাঁপিয়ে উঠলো।

চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জলের ধারা।

অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলে, 'বাবা!'

জগন্নাথ মিশ্র আর যেন কথা বলতে পারলেন না। শুধু একবার হাতটা উঠাবার চেষ্টা করেই আবার তা নামিয়ে নিলেন।

পরদিন অবস্থা আরও খারাপ হলো।

বন্ধু এলেন। বাড়ী ঘরে বিরস মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'রঘুনাথ, রঘুনাথ। এ কি করলে তুমি! তুমি আমার এ কি করলে।' বলে শচীদেবী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

নিমাই এক কোণে বসে শায়কাহত পাখির মতো ছট্ ফট্ করছে। চোখে অঝোর জলের ধারা। বুকে অসীম যন্ত্রণা। তার বুককে পিষ্ট করেই যেন জগন্নাথের বল জগন্নাথ মিশ্রকে অমৃত লোকে নিয়ে গেলো।

নিমাইয়ের মুখমণ্ডলে তাই যন্ত্রণার ছাপ আছে, কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। পিতার মৃত্যুতে সব কথা যেন তার ফুরিয়ে গেছে।

নিমাই যেন পাথরের মতো নিশ্চল।

॥ বারো ॥

জগন্নাথের মৃত্যুতে সংসারে অভাব দেখা দিল।

মিশ্র এমন কিছু বিষয় সম্পদ রেখে যান নি, শচীদেবী যা দিয়ে নিমাইকে মানুষ করতে পারেন।

চোখে তাই তিনি অন্ধকার দেখলেন।

নিমাই বুঝলে মায়ের অবস্থাটা। জানলে সংসারের অভাবের কথা। দেখলে তাকে খাইয়ে অনেক দিনই মায়ের খাওয়া হয় নি।

মায়ের দুঃখে নিমাইয়ের প্রাণ কেঁদে উঠলো।

মাকে তাই একদিন সে বললে, মাগো, রাতদিন তুমি অমন করে থাকো কেন? অতো চিন্তা করো কেন মা? বাবার কথা কি তোমার মনে নেই? বাবা বলতেন না, যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই তাদের আহার যোগাবেন। ঈশ্বর

তো আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আমরা খেতে পাবো না কেন?

ছেলের কথায় মায়ের চোখ থেকে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। নিমাই বলে, 'মাগো, তুমি কেঁদো না। তোমার চোখে জল দেখলে আমি যে স্থির থাকতে পারিনে মা! বলো, আর তুমি কাঁদবে না? বলো, আমার কথা দাও তুমি।' বলতে বলতে নিমাই মায়ের হাত দু'টি বাড়িয়ে ধরে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শচীদেবী বলেন, 'না-রে, আমি কাঁদবো কেন? কাঁদছি কোথায়? চোখে বুঝি একটা কুটো পড়েছিল, তাই চোখে জল এসেছে। নইলে আমি কাঁদতে যাবো কেন? তোর মতো ধন যার ঘরে, সে কাঁদবে কেনো রে?' বলে শচীদেবী নিমাইয়ের কাছ থেকে চোখের জল লুকোতে চান।

নিমাই সবই বোঝে। তবুও মুখে কিছু বলে না। মা'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে তার নিজের কাজে বেরিয়ে যায়।

বাবার জন্যে নিমাইয়েরও মাঝে মাঝে মন খা খা করে। এ-কথা সে-কথা মনে পড়ে চোখেও জল আসে।

'বাবা', 'বাবা', নিমাই আর প্রাণ ভরে 'বাবা' ডাকটি ডাকতে পারছে না। 'বাবা' ডাকটি চিরদিনের মতো তার মুখ থেকে ঘুচে গেলো।

ভাবতে গিয়ে নিমাইয়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে উড়ে যায়।

নিমাই নিজেই আবার নিজেকে বোঝায়, বাবা কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে? পৃথিবীতে তো কতো মানুষ এসেছে, কিন্তু কেউ কি চিরকালের জন্যে বেঁচে থাকতে পেরেছে? মানুষ সংসারে আসে কাজের জন্যে, কাজ ফুরোলেই আবার একদিন তাকে পাট গুটোতে হয়। সংসার থেকে বিদায় নিতে হয়। তার বাবারও কাজ ফুরিয়েছে। তিনিও তাই বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জন্যে সে দুঃখ করবে কেন?

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে নিমাইয়ের। নিমাই একদিন কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাকে বুঝিয়েছিলেন, 'নিমু, মানুষের দেহ যায়, কিন্তু আত্মা অমর। আত্মার মৃত্যু নেই, জীবাত্মা যে শিবাত্মারই অংশ। তোমার বাবা জীব দেহ ছেড়ে শিবাত্মায় গিয়ে মিলেছেন। তার জন্যে তুমি কাঁদবে কেন।

না, কাঁদবে না, বাবার জন্যে নিমাই আর চোখের জল ফেলবে না। এবারে সে কাজে নামবে। সংসারের অভাব দূর করবে মায়ের চোখের জল মুছাবে।

একটা দৃঢ় সংকল্পে নিমাইয়ের টানা টানা দুটো চোখ যেন জ্বলে ওঠে।

নিমাই কাজ করবে?

কিন্তু কি কাজ করবে সে? কাজ করতে গিয়ে তো আর লেখাপড়া ছাড়তে পারবে না! তাকে লেখাপড়া করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।

কাজেই লেখা পড়ার কাজই বরলে নিমাই।

ছাত্র পড়িয়ে, পুঁথি লিখে সে উপার্জন সুরু করলে। এর সঙ্গে আছে যজমানির টাকা। আছে গুরু মুরুব্বির সাহায্য।

সব মিলিয়ে শচীদেবীর ছোট্ট সংসার কোন মতে গড়িয়ে চললো। যা টাকা চাইলে কোন কোন দিন মায়ের হাতে কিছু সোনা তুলে দিত নিমাই।

সোনা দেখে আতঙ্কে উঠতেন শচীদেবী। ভাবতেন, নিমাইয়ের কি সেই ছেলেবেলার অভ্যেস ফিরে এসেছে? সেই যে প্রতিবেশীদের ঘর থেকে এটা-সেটা নিয়ে আসা? নইলে সে সোনা পাবে কোথায়?

মুখে বলতেন, 'সোনা পেলি কোথায় রে?'

নিমাই হেসে, রহস্য করে বলতো, 'কেন, কৃষ্ণ

[শেষাংশ ২৮০ পাতায়]

বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারাবাহিকতা

সুধা ঘোষ

শিশু-সাহিত্যের সূত্রপাত ঠিক কবে থেকে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় না। তবে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শিশু-সাহিত্যের প্রথম বই "ইতিহাস মালা" প্রকাশিত হয়। শিশু-সাহিত্য বলতে অনেকে পাঁচ থেকে সাত বছরের পড়ুয়াদের সাহিত্যকে শিশু-সাহিত্য বলেন, আবার কারো মতে ষোল বছর পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য বইকেই শিশু-সাহিত্য বলে। তাই যদি হয় তবে দেখা যায় শিশু-সাহিত্যের ইতিহাস দেড়শ বছরেরও পুরানো। ভারতের সংস্কৃতির মত এই শিশু-সাহিত্যও ইউরোপ, আরব মিশর প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

শিশু-সাহিত্য রচনা সহজ নয় বরং বড়দের সাহিত্যের চেয়ে কঠিন। বাংলার শিশু-সাহিত্য বাংলার বিরাট জাতীয় সাহিত্যেরই একটা অংশ। তখনকার শিশু-সাহিত্য শুধু আনন্দ দেবার জন্যই তৈরীহ তো না, সবই শিক্ষামূলক: শুধু সেগুলো যাতে ছোট ছেলেমেয়েরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে তারজন্য সরল করা হতো। এক সময় সাহিত্য মুখে মুখেও সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার রূপকথা, ছেলে ভুলানো গান, ঘুমপাড়ানী ছড়া অতি প্রাচীন। যেমন-

"ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এলো দেশে"……

বোঝা যায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার পটভূমিতেই এই সব গান রচনা হয়েছিল। এগুলো বাংলার লোক সাহিত্যের অন্তর্গত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশে যে শিশু-সাহিত্য রচনা হয়েছে তা ইংরাজী শিক্ষার ফল। ইউরোপীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে বাংলার জাতীয় জীবনে ও সংস্কৃতিতে নতুনত্ব দেখা যায়। এই সময় শিশু, কিশোর, প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যও অনেক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেই সঙ্গে শিশু-সাহিত্যও মুকুলিত হয়ে ওঠে।

"ইতিহাস মালার" পর কুল বুক সোসাইটি কয়েকটি বই প্রকাশ করে। ওদের প্রথম বই "উপদেশ"। রচনা করেছিলেন ক্যাপ্টেন টুয়ার্ড। সোসাইটির বইগুলির মধ্যে দেবনাথ মিত্রের নীতি-কথা বহুল প্রচারিত। এই বই এর গল্প ইংরাজী ও আরবী ভাষাতেও অনুবাদ হয়। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের যুগ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটীর বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ছিল।

বিদ্যাসাগরের যুগে শিশু-পাঠ্য কবিতা রচিত হতে থাকে। ছন্দ-বৈচিত্র্য বা নীতি-শিক্ষার প্রচেষ্টা তাতে বিশেষ দেখা যায় না। যেমন তিন কড়ি মুখোপাধ্যায়ের "লঘু পাঠ" পদ্য গ্রন্থে "সন্ধ্যাকাল" কবিতাটি—

ধরাতল সুশীতল রবি অস্ত যায়
শীতল বাতাস বহু শরীর জুড়ায়।
সন্ধ্যা হলো পাখী সব উড়িয়া চলিছে
কলরবে নিজ নিজ কুলায় পশিছে।……

……

যে পাঠ শুনিলে সব বিদ্যালয়ে গিয়ে
অভ্যাস কর গে তাই স্মরণ করিয়ে।……

কবিতাটি অনেকটা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "পাখী সব করে রব" আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে" সেই রকম।

বিদ্যাসাগর যুগে যে কয়জন খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক ছিলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। বিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থ 'টেলিমোকাস' এর বাংলা অনুবাদ উনিই করে-ছিলেন। শিশু-সাহিত্যে বাংলা ভাষার উন্নতির মূলে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষা নিজের দেশেই অনাদৃত ছিল। তখন মিশনারীরা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের হিন্দুধর্ম বিরোধী শিক্ষা দিতেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা" স্থাপন করেন। এই পাঠশালায় বেদান্ত, প্রতিবাদ্য হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রকাশ করেন। তাঁর প্রথম শিশু সাহিত্য। বাংলা শিশু-

সাহিত্যের তিনি যুগস্রষ্টা। বিদ্যাসাগরের "কথামালা" "বোধোদয়," "আখ্যান-মঞ্জরী," শিশু-সাহিত্য। বর্ণপরিচয় শিশু-সাহিত্য না হলেও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সহজ পথ দেখিয়েছে। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে অবশ্য অনেক গল্প আছে আর সেগুলি শিশুরা নিজে পাঠ করে সহজেই অর্থ বুঝতে পারে। এর ভাষা শিশু-সাহিত্যের ভাষা ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিশু-সাহিত্যে। কবিতা রচনা হয়নি। মদন মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথম মৌলিক কবিতা লেখেন। তাঁর লেখা "শিশুশিক্ষা"র প্রথম ভাগে—"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল ……।

বিদ্যাসাগরের যুগেই বাংলা ভাষায় অনুবাদক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। "রবিনসন ক্রুসো"র ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুবাদ করেন জন রবিনসন। প্রকাশিত হয় ১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় গ্রন্থ "সেক্সপীয়ার কৃত গল্প" অনুবাদক ভক্টর বেয়ার। এখন বহু বাঙ্গালী লেখক এর বাংলা অনুবাদ করেছেন। এগুলি শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অনুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন—বিটন সাহেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রোট সাহেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত।

বিদ্যাসাগরের "আখ্যান মঞ্জরী" শিশু-সাহিত্যের শেষ অবদান। গ্রন্থখানি অনুবাদ নয়, ইংরাজী বইএর অবলম্বনে। প্রকাশকাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। বিদ্যাসাগর-যুগে শিশুসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অক্ষয় কুমার দত্তের "চারুপাঠ"। রচনার বিষয়বস্তু ইংরাজী বই থেকে সংগ্রহ। চারুপাঠে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছিল। "স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন" প্রবন্ধটী শিশুদের উপযোগী না হলেও তিনি মনে করতেন শিশুদের বাস্তব চিন্তাধারার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রবন্ধটীর মধ্যে শ্রেণী-চেতনার আভাসও পাওয়া যায়। সেকালে শিশুসাহিত্যে এ একটা নতুন দিক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁর "শিশুশিক্ষা"র তৃতীয় ভাগে ঠিক এই ধরণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের „জ্ঞান-প্রদীপ" প্রকাশিত হয়। প্রথম ভাগটী একটু সংস্কৃত ঘেঁসা ছিল কিন্তু দ্বিতীয় ভাগটী মনে হয় বিদ্যাসাগরের রচনার প্রভাবে কিছুটা সহজ।

শিশু-সাহিত্যে তারাশঙ্কর তর্করত্নের "কাদম্বরী" মূল সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। ডেনমার্কের অ্যানদ্রু অ্যাণ্ডারসনের রূপকথার গল্পগুলো বাংলায় অনুবাদ করেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। তিনি "মারমেড" "নাইটিংগল" "সোয়াইন প্রিন্স" এগুলোর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। এর রচনাকাল ১৮৫১ থেকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত শিশু-সাহিত্য অনুবাদে সমৃদ্ধ ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রিয়মাধব বসু নামে এক বিদেশের "জ্ঞানরত্নমালা" নামে একখানি বই প্রকাশ করেন, বই-খানিতে সমাজের বিবিধ দোষ যেমন কৌলীণ্য প্রথা, সুরা পান, বাল বিধবা বিড়ম্বনময় জীবনের বর্ণনা লেখা আছে। সেকালে এটা শিশু-সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত না হলেও এর প্রথম প্রবন্ধটী কিন্তু "বাল্যকাল"।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হরিনাথ মজুমদারের "বিজয়-বসন্ত" প্রকাশিত হয়। রূপক ইতিহাস। তখনকার সময় এ রকম মৌলিক রচনা বড় একটা দেখা যায় নি। বইটী থেকে বোঝা যায় হরিনাথ বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। আবার অভিভাবকদের নির্বাচিত পাত্রে অল্প বয়সে বিবাহ দানেরও বিপক্ষে। স্বয়ংবর বিবাহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। তখনকার সময় এ ধরণের উদার মতবাদ প্রকাশে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় প্রকাশ পায়।

১৮৬১ খৃঃ তারকচন্দ্রগুপ্ত "প্রাণীবিদ্যা" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

১৮৬৭-৭৫ খৃঃ হরিশচন্দ্রমিত্রের "কবিতা কৌমুদী" প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কথামালার প্রণালীতে শিশুদের জন্য কবিতা

রচনা করেছিলেন। এগুলি ঈশপ ফেবিলসের আদর্শে।

একটী কবিতা —"মেষ ও চাতক"

উড়িল আকাশে মেষ গরজি ভৈরব
ভায়ু পলাই ত্রাসে
তা দেখি তড়িৎ হাসে
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে
তাহে তরু মড়মড়ে।
...যা চাহ লভ তা সদা নিজ পরিশ্রমে
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের বর্ণনাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়। —"রাত পোহাল ফর্সা হলো ফুটল কত ফুল।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চুঁচড়া থেকে গোপালচন্দ্র দত্তের "কবিতা মঞ্জরী", ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা থেকে হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জ্ঞানমঞ্জরী" কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা-গ্রন্থ "শিশু-কবিতা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের একটী কবিতা—'কলম'

খাকড়ি, বাখড়ি, সর, হাঁসের পালকে
কলম তোরেরি করে যত ছেলে লেখে।
লোহার কলমে আমি তোমাদের তরে
এ 'শিশু-কবিতা' বই লিখি ঘরে ঘরে॥
তা বলে তোমরা ভাই কোরোনা এখনি
ছেলেবেলা ভাল নয় লোহার লেখনী॥

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রজনীকান্ত গুপ্ত "আর্য্যকীর্ত্তি" রচনা করেন। বইখানি শিশু-সাহিত্য হলেও সংস্কৃতের ভারী পাণ্ডীত্যে এত ভারী যে শিশু-সাহিত্যে অচল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শিশুসাহিত্যে প্রথম মুসলমান সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক "পদ্যশিক্ষা" নামে একটী গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের প্রথম কবিতা "প্রাতঃ"

রজনী হইল ভোর দেখ শিশুগণ
চারিদিকে নাহি আর আঁধার তেমন।
বাসা থেকে পাখীগণ বাহির হইয়া
বিমুগুণ গান করে পাখায় বসিয়া॥

... ...

ঘন ঘিরা মেঘমালা শিথিলে এখন
পরেতে আনন্দে কাল করিবে যাপন।

"সোমপ্রকাশ" সম্পাদক বিদ্যাভূষণ ১৮৭৬ হতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি শিশু ও কিশোরদের জন্য বই প্রকাশ করেন। বইগুলির নাম—নীতি সার, রোমরাজ্য ইতিহাস, উপদেশ মালা, গ্রীস দেশের ইতিহাস ইত্যাদি।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবীর "যমু গল্প" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের একটি কবিতা "দ্বিপ্রহর"

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক
শ্রান্তি ভরে অনিমিখ
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা।
রবির অনল কর
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা।

বিদ্যাসাগর-যুগের বেশীটাই গদ্য ও অনুবাদ শিশু-সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। বিদ্যাসাগরোত্তর যুগে (১৮৯১ খৃঃ) শিশু সাহিত্যে কবিতা ও গল্প সাহিত্যের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের আরম্ভ যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত "হাসি ও খেলা" গ্রন্থখানি থেকে। প্রকাশ কাল ১৮৯১ খৃঃ। রবীন্দ্রনাথ বইখানি পড়ে বলেছিলেন...'বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই। তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই। তাহাতে যে পরিমাণ উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণ উপকার হয় না.....।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শিশুদের "বালক" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'তো। এই পত্রিকার অধিকাংশ লেখক ঠাকুর পরিবারের। রবীন্দ্রনাথের "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "রাজর্ষি", "হেঁয়ালী" এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায় সাথী

প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু ছোট বয়সে "সাথী"তে কবিতা লেখেন। "সাথীতে" উপেন্দ্রকিশোরের "বেচারাম ও কেনারাম" নাটক প্রকাশ হয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "আশ্চর্য্য হত্যাকাণ্ড" নামে রোমাঞ্চ কাহিনীও এই পত্রিকায় ছাপা হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "মুকুল" প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য্য যোগেশচন্দ্র, গিরীন্দ্রমোহিনী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর সরস লেখায় পত্রিকাটি ভরিয়ে তুলতেন। সুকুমার রায় তাঁর আট বছর বয়সে "মুকুলে" একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নাম "নদী"

হে পর্বত যত নদী কল্পিনিরীক্ষণ
তোমাতেই করে তারা জন্ম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে
কল্ কল্ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে॥

শিবনাথ শাস্ত্রী মুকুলের সম্পাদক ছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গুরুপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদনায় "শৈশব সখা" ও উইলিয়াম কেরীর সম্পাদনায় "মেহময়ী" প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে রাজেশ্বর গুপ্তর সম্পাদনায় শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা "অঞ্জলি" প্রকাশিত হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠ দাসের সম্পাদনায় "সখী" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলার লোক-সাহিত্যের কিছুটা অংশ উপকথা, রূপ কথা, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প ইত্যাদি নামে সংগৃহীত হয়ে শিশু-সাহিত্যে লিখিত হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'হাসি ও খেলা' প্রথম উপকথা রচনা করেন। উপকথাটি—

'.....ফুলগুলি দেখিয়া মালির বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু যেই হাত বাড়াইয়াছে অমনি পারুল ফুলটি চাঁপা ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল—সাত ভাই চম্পা জাগরে।

চাঁপা উত্তর করিল—কেন বোন পারুল ডাকরে?

যোগীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করেন।

উপেন্দ্রকিশোরের "ব্রহ্মত্রাণী" উপকথা শ্রেণীর গল্প। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "শিশুরঞ্জন রামায়ণ" প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই রামায়ণখানির প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"শিশুরঞ্জন রামায়ণ দেখিয়া প্রীত হইলাম। ...এখনকার শিশুরা রুশিয়ার পিটার বা স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ইতিহাস বেশ জানে কিন্তু দশরথ বা জনক রাজার নাম শুনিলে আকাশ হইতে পড়ে.....।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের "ছেলেদের রামায়ণ," অবনীন্দ্রনাথের "শকুন্তলা" শিশুদের কাছে আজও লোভনীয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষীরের পুতুল" মৌলিক রচনা, শিশুসাহিত্যে নতুন সৃষ্টি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদানন্দিনীর "সাত ভাই চম্পা" ও "টাকডুমাডুম্" উপকথা রচিত। "সাতভাই চম্পা" ও "বাপিত ও মেয়াল" এর নাটকও রচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর ও জ্ঞানদাদেবী ছোটদের আনন্দের জন্য নাটক রচনা করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতাটির কয়েকটি লাইন—

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ীর গলি দিয়ে
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই (১৮৯৭ খৃঃ) যোগীন্দ্র নাথ সরকার "হাসিখুশী" রচনা করে শিশু সাহিত্যে কবিতার মধ্য দিয়ে বর্ণ পরিচয়ের উপায় গ্রহণ করেন। অ—অজগর আসছে তেড়ে। আ—আমটি আমি খাব পেড়ে। পড়না শিক্ষার জন্য "রামায়ণের দশটি ছেলে" ছড়া রচনা করেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের "রামাছবি"র গল্প, পদ্য, ছবি সবই শিশুদের উপযোগী। ঐ গ্রন্থের একটি কবিতা "বনের পাখী"

বনের পাখী ডাকাডাকি
করছ কেন তুমি?
সোনার খাঁচায় এস তুমি রাখব সযতনে।.....

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথের "খেলার সাথী" প্রকাশ

হয়। বাংলার ছড়া সংগ্রহ করে তিনি তার সংকলন প্রকাশ করেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"…… বাংলাতে এইরূপ গ্রন্থের সম্পূর্ণ অভাব ছিল"। সংকলনের "খুকুমণির ছড়া" কবিতায়—

আটুল বাটুল জামলা সাঁটুল
জামলা গেলো হাটে
জামলাদের মেয়ে দুটো পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না
ছোলা ভাজা দেব
আবার যদি কাঁদ তবে
তুলে আছাড় দেবো।

খোকামণিদের কান্না থামাবার জন্য অন্য উপায়। সেখানে রাঙ্গা বৌয়ের চাহিদা। এর থেকে তখনকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটা চিত্র পাওয়া যায়। ছড়াটা রচনা মোগল আমলের শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে রচিত তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে "মুকুল" পত্রিকায় "কালা হাবে কি ধলা হাবে" "পেটুক দাদু" প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খৃঃ "হাসিরাশি" বইখানিতে "মজার দেশ" "কাজের ছেলে" (দাদখানি চাল, ঘণ্ডরীর ডাল, চিনিপাতা দই) "টমাস সাহেবের মাছ ধরা" ইত্যাদি ছড়াগুলো শিশুদের কণ্ঠস্থ। যোগীন্দ্রনাথের উদ্ভট ছড়া শিশুসাহিত্যে একটা কীর্তি। তবে কেউ কেউ বলেন সুকুমার রায় উদ্ভট ছড়ার প্রবর্তক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় "উষা" প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ "প্রকৃতি" নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বিভূতিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "বালাসখা" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অনুকূল চন্দ্র শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ঢাকায় সচিত্র মাসিক পত্রিকা "তোষিণী" প্রকাশ হয়। কবি কালিদাস রায় শিশুদের জন্য অনেক কবিতা ও ব্রাতকের গল্প এই পত্রিকায় লিখেছেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শিশুপাঠ্য "সোপান" প্রকাশ হয়। এর লেখক ছিলেন—অনুরূপা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অনিলকুমার হালদার ইত্যাদি। সোপানের বিষয়বস্তু ছিল ভ্রমণ কাহিনী, ছোট বড় গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অনুবাদ কবিতা ধাঁধা ইত্যাদি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পুত্র শোকতাপে সচিত্র মাসিক পত্রিকা "শিশু" প্রকাশিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র এই পত্রিকায় লিখতেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর "সন্দেশ" প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু "সন্দেশে" লিখে থাকতেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার শহরের বেন কিনস্ স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে "অঞ্জলি" প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় "মৌচাক" পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাংলার শিশু সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হেমেন্দ্রকুমার রায় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী রচনা সুরু করেন। শিশু-সাহিত্যে সুনির্মল বসুও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তাঁর লেখা "হেম বাতাস"

হুঁই, চামেলী এবার ফোটো ফোটো—
কাঁপছে বুঝি অপরাজিতার ঠোঁটও।

উনিশ শতকে বাংলার শিশু-সাহিত্যে কবিতা ও ছড়ার যে সৈন্য ছিল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তা প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে। এই সময়টায় কয়েকজন শক্তিমান নূতনমান কবির আবির্ভাব হয়। যেমন, কাজী নজরুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন, গোলাম মোস্তাফা ইত্যাদি। নজরুলের "কাঠ বিড়ালী, কাঠ বিড়ালী পেয়ারা তুমি খাও?" "দেখবে আমি জগতটাকে" শিশুদের অতি প্রিয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়ে "আমার দেশ" নাম নিয়ে একখানি বই প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার মিত্রের সম্পাদনায়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শিশু-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা "শিশু সাথী" প্রকাশিত হয়। "শিশু সাথী"তে রমেশ দাসের "সাগরিকা", নীহাররঞ্জন গুপ্তের "শঙ্কর", অখিল নিয়োগীর (স্বপনবুড়ো) "বেপরোয়া," যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুটকুটের দপ্তর," খগেন্দ্রনাথ মিত্রের "আফ্রিকার জঙ্গলে", "ভোম্বল সর্দ্দার ও বাগ্দী ডাকাত" শিশুদের মুগ্ধ করে। ভোম্বল সর্দ্দার গল্পটি রুশ ও

হিন্দী ভাষায় অনুবাদ হয়। শিশু সাথীতে নারায়ণ গাঙ্গুলী, সুবিনয় রায়, কালিদাস রায়, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, আশাপূর্ণাদেবী এঁরাও লিখতেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নিশিকান্ত সেনের সম্পাদনায় শিশু-পাঠ্য পত্রিকা "খোকাখুকু" প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেই শিশু-পাঠ্য "দুলবেণু" প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ববাংলার ঢাকাতে "রাজভোগ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায় "পাতভাড়ি" ও প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও গিরিজাকুমার বসুর সম্পাদনায় "দাদুঘর" প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই নৃপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সম্পাদনায় "বেণু" মাসিক পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেই ভবানীপুর অকল থেকে "রামধনু" প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কাজীর বিচার", "বীরবলের গল্প," হেমানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "ইউরোপ যাত্রার দুঃখ" নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সতীকান্ত গুহর সম্পাদনায় "চিত্রা" প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় "মাস-পয়লা" প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই ললিতমোহন ঘোষের সম্পাদনায় "গল্প গাথা" প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গিরিন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় "অঙ্কুর" ও সুধা সেনের সম্পাদনায় "কিশোরী" প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র নাথ সেনের সম্পাদনায় "ধ্রুব" প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুহ ও শ্রীমতি নলিনী চক্রবর্তীর সম্পাদনায় "কিশোর", শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের সম্পাদনায় "কৈশোরিকা", যোগীন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় "কৈশোরক", সুহৃদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "ছেলেখেলা", প্রভাতকিরণ বসুর সম্পাদনায় "জলছবি" ও সাময়িক পত্রিকার জগতে অন্যতম বিশেষ পত্রিকা "হাসপাতাল" প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জনাব মহম্মদ নাসির উদ্দীনের "শিশু-রাজ্য" প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর থেকে নীহাররঞ্জন সিংহ ও অনিলকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'কচিকথা' ও বাণীদেবী ও শ্রীমতী মিনতি ঘোষের সম্পাদনায় "ছেলেখেলা" প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদারের সম্পাদনায় "রূপকথা" প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে "কিশোর বাংলা" প্রকাশিত হয়। কিশোর বাংলা নামে একটি সংঘও ছিল, এর সদস্য কিশোর বয়স্ক। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমধুসূদন দেব সম্পাদিত "শুকতারা" প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া থেকে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "পল্লবী" প্রকাশিত হয়।

আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ শিশু সাহিত্যে সমাজবাদ, সাম্যবাদ ও শ্রেণীচেতনার আভাস দিয়ে শিশু সাহিত্যকে নতুন ভাবে গঠন করতে চেষ্টা আরম্ভ করলেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন সরকার "ছোটদের অর্থনীতি" ও "ছোটদের রাজনীতি", শ্রীগিরিশ চক্রবর্তী "মানুষ কি করে বড় হলো", "মানব ইতিহাসের ধারা", "অমর ভারত গড়ল যারা" প্রভৃতি বহু রচনা করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও শিশু সাহিত্য সমৃদ্ধ করতে চেয়ে ছিলেন। তাঁর ছোটদের "সন্ধীপন পাঠশালা", "আমি যখন কিশোর ছিলাম" নতুন কথায় প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বালক বালিকাদের মনে শ্রেণীচেতনার অনুভূতি জাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রমথ বসু "আগামী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। "আগামী"র একটি ছড়া—

"এদিনের ছড়া"—প্রমথ বসু
তাই, তাই, তাই, মামা বাড়ী যাই
মামা বাড়ী গিয়ে দেখি, দুধ ভাত তো নাই।
রেশন থেকে চাল এনেছে, ধান কাঁকেড়ে ভরা
কাঁকড় মেশা ভাত খেয়ে প্রাণটি হলো সারা।
তিন দিনেতে চাল ফুরোলো, চাপল না তো রান্না
মামামামীর বাচ্চা খোকা সুরু করে কান্না।
আগামীতে বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা "ছড়া"
রাঙ্গামশাই, রাঙ্গামশাই করছ তুমি কি ?
এই দেখ না আমি যেমন মন্ত্রী পুষেছি।
মন্ত্রী মশাই তা বিনা তিন নাচতে শিখেছেন
গোজাদিলের রাঙ্গা গড়ে নাম্বটি কিনেছেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের "ঘিটেকড়া" প্রকাশ হয়। তার একটি কবিতা—

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই,
ভেজাল দারা পেটটা
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস কিসবে বাকো চেটা।.....

আরেকটি কবিতা—

"পুরোনো ধাঁধা
বলতে পার বড়ো মানুষ মটর কেন চড়বে ?
গরীব কেন সেই মটরের তলায় চাপা পড়বে ?

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী পত্রিকায় শিশু বিভাগ নামে "ছেলেদের পাত্‌তাড়ি" প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার ঠিক ঐরূপ "আনন্দমেলা" নামে শিশু বিভাগ তৈরী হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গাদাস পত্রিকায় অখিল নিয়োগী "ছোটদের পাত্‌তাড়ি" বিভাগ পরিচালনার ভার নেন। স্বপন বুড়ো অর্থাৎ শ্রী অখিল নিয়োগী ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামে আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি "সব পেয়েছি" আসরের প্রতিষ্ঠাতা।

বাংলা শিশু-সাহিত্যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভেই হাস্য রসিকতার সূচনা করেন সুকুমার রায় ও শিবরাম চক্রবর্তী। শিশু-সাহিত্যে উপেন্দ্র কিশোরের "রামায়ণ", "মহাভারত", "টুনটুনির গল্প" খুব সহজ ভাষায় লেখা। সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল" আর "ক, খ, ব, র, ল" গল্প শিশু-সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে রেখেছে। দক্ষিণারঞ্জনের আসল বই "ছেলেদের আনন্দ মেলা" "দাদামশায়ের থলে" "ঠাকুরমার ঝুলি" শিশুদের অতিপ্রিয়। দীনেন্দ্র রায়ের "ছেলেদের মজার গল্পের বই," "দানোর দান" "চীনের ড্রাগন," হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের "রবিনসন ক্রুসো" সেকালে যথেষ্ট আদর পেয়েছে। হেমেন্দ্র কুমার রায়ের "যখের ধন," "মেঘদূতের মর্তে আগমন" রোমাঞ্চ গল্প। শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "শিশুভারতী" নামে পুস্তক প্রকাশ করেন। আমাদের দেশে যাদের গল্প লিখে যাঁরা ছোটদের মন জয় করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর লেখা "চায়ের ধোঁয়া" "এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে", "হাত ও রহস্য" ইত্যাদি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় একদা আকাশ বাণীর গল্প-দাদুর আসরের পরিচালক "দাদামণি" হিসেবে বাংলার ছেলেমেয়েদের মন জয় করেছেন। আকাশ বাণীর শিশু-মহলের পরিচালনা করেন ইন্দিরাদি। তাঁর লেখা ছোটদের বই "খুকুল খুকুল" "বাদশা বেগম"।

চিত্র জগতেও বর্তমানে শিশুদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের জন্য ছবি তোলার ক্ষেত্রে সরকারী অনুদানের সুযোগ আছে। চিত্র জগতের খ্যাতনামা পরিচালক সত্যজিত রায় (বর্তমান "সন্দেশ" এর সম্পাদক) এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহশীল। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা "গুপী গাইন বাঘা বাইন" সত্যজিত রায়ের পরিচালনায় পর্দার বুকে দেখতে পেয়ে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেছে। বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী"র ছোট্ট নায়ক অপু ও তার দিদি দুর্গার চরিত্র পর্দার বুকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছেন সত্যজিত রায়। তাঁর "অয় বাবা ফেলুনাথ," "সোনার কেল্লা" শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়।

শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দ দানের জন্য বর্তমানে অনেক পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে এবং অনেক সঙ্ঘও গঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে আজ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও আগ্রহশীল। শিশুদের মনস্তত্ত্ব, তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক কিছু করণীয়, তাদের শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য আজ অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। ইদানীংকালে অণু-পরমাণু, মহাশূন্য অভিযান, রকেট, চন্দ্রলোক, আণবিক বোমা ইত্যাদির ওপর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা হতে দেখা যায়।

———

ভ্রম সংশোধন

আষাঢ় সংখ্যায় শিশুজগতের ২৩৩ পৃষ্ঠায় জেনে রাখা ভাল নিবন্ধের শেষাংশে দুইবার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ আছে। ঐগুলি সূর্যগ্রহণ হবে।

আষাঢ় সংখ্যার সূচীপত্রে তক্ষং নামক ছড়াটির লেখিকার নাম ভুলক্রমে অসীমা রায় ছাপা হয়েছে। ওটা হবে বানসী রায়। অনবধানতা বশতঃ এই ছাপার ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। স. উ. ভা.

দূরের আকাশ

অনিলকৃষ্ণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ট্রেন থেকে নামলো সৈকত ও বৈশাখী। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ওদের একটু ঝিমুনি ভাব এসেছিল। কখনও বা বৈশাখী তার নরম শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিল বেসামেলি বসা সৈকতের দিকে।

কী আশ্চর্য!

একটুও কেপে উঠেনি সৈকত, কিংবা আরও একটু ধকিস্থ হওয়া চেষ্টা করেনি মোটেই। আস্তে আস্তে ওদের স্টেশনটা এলো আর আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে নিজেদের সিট ছেড়ে উঠে পড়লো ওরা।

আর একটু এগিয়ে গেলেই ওরা পৌঁছে যাবে যে যার বাড়ীতে। কিন্তু লোকাল ট্রেনের অচেনা লোক ভরতি কম্পার্টমেন্ট থেকে কী এমন আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে ওদের বাড়ীতে যা থেকে বাড়ী যাওয়ার মুহূর্তটা একটু আলাদা মনে হোতে পারে?

এখানেই একটা খটকা। যেমন শৈলজ্যাঠা। মানে যিনি জীবনের সত্তরটি বছর পেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ একটা অনাত্মীয়ের জগতে এসে পৌঁছেছেন। জীবনের গোলমালে কোনও একটা স্টেশনের বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে না সৈকতও। বাড়ী থেকে যখন তখন বেরিয়ে পড়ে আবার ফিরে আসে যখন তখন! ফিরে আসে বোধ হয় নৈবিক কারণেই।

এইটুকু জীবনে অনেক কিছু দেখেছে ও। শৈল-জ্যাঠারা থাকে কিরাবে, রেলের কলাপে ছোট্ট একটি বাসাও পেয়েছিল শৈলজ্যাঠার মেয়ে। বড় মেয়ে কল্যাণী।

নামেও যেমন কাজেও তেমনি। এর ওর কাছে বই-পত্র চেয়ে টেয়ে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করল। টিউশনি করে পয়সা যোগাড় করে টাইপ শিখল। বাড়ীতে মাকে কাজে সাহায্য করলেও পড়াশুনায় এতটুকু ফাঁকি ছিল না। বরঞ্চ বাড়তি সময় পড়ে সংসারের কাজের সময়টুকু পুষিয়ে ফেলতো। ফলও ফলল।

বি, এ, পাশ করলো নিজের চেষ্টাতেই। সংসার থেকে একটি পয়সাও নেয়নি। বরঞ্চ সংসারের জন্যে নিজের সামান্য আয় থেকে এটা ওটা কিনতো। চাকরীও পেয়ে গেলো রেলে। সংসারের হাল ধরলো। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে শৈলজ্যাঠা বললেন, সাবাস মা, আমি যা পারিনি তুই তাই করলি। বেশ ভাল হওয়ার পর চাকরী বাকরীর কম চেষ্টাতো করলাম না, জুটলো কৈ? তাই সামান্য একটা চায়ের দোকান ভরসা করে আর কতদিন তোদের সামাল দেব?

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কল্যাণী বলেছিল, আমরা থাকতে তোমার চিন্তা কী? এবার আমিই চালিয়ে নিতে পারবো। তুমি যেমন আগে ছিলে তেমনি থাকবে। ভগবানের দয়ায় আমি যখন চাকরী পেয়েছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত মনে আবার আগের জীবনে ফিরে যেতে পারো।

ঠিক বলছিস্—

ঠিক নয়তো কি?

নিশ্চিন্তে ভগবানের চিন্তায় যে বিরাট বাধা সেই বাধাটা সম্বন্ধে চিন্তা আসতেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো শৈল-জ্যাঠার। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো তোর মা খুব খুশী ত? কল্যাণী বলে খুশী। মা তো আনন্দে যেই যেই করে নাচছে, বলছে তোর বাপ যা পারেনি তুই মেয়ে হয়ে তাই করছিস্। মাকে আমি চাকাই জামদানী কিনে

দিয়েছি এ মাসের মাইনে পেয়ে। আগামী মাসে তোমার জন্যে শান্তিপুরী ধুতি কিনবো।

"না রে ধুতি নয় তুই আমাকে একটা পাম্প বালিশ কিনে দিবি। শিশু-শিক্ষাদের যা চাল ওদের বাড়ীতে দেখা মিললেও বিছানা পত্র মেলে না। মিললেও ওতে শোয়া যায় না। জানিস্ তো ওদের অবস্থা। টেনেও কাজ দেবে। বেশ আরামে ঘুমানো যাবে। আজকাল দেখি সকলেই ঐ পাম্প-বালিশ ব্যবহার করে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ঐরকম একটা বালিশ কেনার।—ঠিক আছে, আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আসছে মাসেই কিনে আনবো।

—কিন্তু তোর মা রাগ করবে না তো?

—কেন রাগ করবে?

—বলবে হয়তো মিছামিছি ওতগুলো পয়সা মাছে খরচ কেন? তোর মাকে চিনিস তো। রাগ করেই আছে সারাক্ষণ।

—তুমি কিছু ভেবো না। মাকে আমি ম্যানেজ করবো।

তাহলে এবার আবার ঘুরে আসি কাউতলা থেকে। ওখানে যাওয়ার জন্যে যন্ত্র তাড়া দিচ্ছে এক শিশু। বড় ভক্ত রে। আর শিশু যদি শিশুর মতো হয় তাহলে ওদের নিয়েই শুরু তরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাবছি—

—মায়ের কথা তো? মাকে তুমি ভয় পেয়ো না। এখন আর মা তোমার পেছনে লেগে থাকবে না সারাক্ষণ—

—তাহলে বলছিস্?

নিশ্চিন্তে তুমি ঘুরে আসতে পারো—

মেয়ের কাছ থেকে আশ্বাস পেলেও ঠাকরুণের মুখটা ভেসে উঠে শৈলজ্যাঠার মনের কোনে। সময়ে অসময়ে ঐ মুখটা মনের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করে। যদি আবার ঝাপিয়ে পড়ে ওর উপরে?

কীভাবে সামাল দেবে? ঘুষ দিতে হয় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে—জানে শৈলজ্যাঠা। স্ত্রীও কী ঘুষ চান? ঘুষ ছাড়া আর কী? অতি সহজে যা হাতের মুঠোয় আসে তাই তো ঘুষ। বেকারত্বের ক্ষেত্রেই ঐ প্রাপ্তি যোগ, স্ত্রীরাও স্বামীদের কাছ থেকে ঘুষ না পেলে মুখ ভার করবে না কেন?

শুধু স্বামী বেচারাই যত অন্যায় করে, অবিচার করে, বোকামী করে, কিংবা বেহিসেবীর মত কাজ করে, আর তার জন্যে যত আক্রোশ দেনাদারী তাতো স্বামীদেরই দিয়ে আসতে হচ্ছে চিরকাল।

ঠাকরুণই বা ছেড়ে কথা কইবেন কেন? স্ত্রীর চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা যাদের হয়না তাদের বিয়ে করা উচিত না। সাফ্ কথা ঠাকরুণের।

প্রথম দিকে বুঝাতে চাইতো স্ত্রীকে শৈলজ্যাঠা। কিন্তু মেয়েদের বোঝানো অত সহজ না।

শেষ পর্যন্ত হাল ধরলো সংসারের কল্যাণী আর শৈলজ্যাঠার আগেকার ইচ্ছেগুলো নূতন করে চাড়া দিয়ে উঠলো। অর্থাৎ ভগবানের নাম করা, শিশু ও শিক্ষাদের নিয়ে সৎ আলোচনায় মেতে উঠলো শৈলজ্যাঠা। কিন্তু আচমকা একটা ধাক্কা এলো।

এতদিন শৈলজ্যাঠা ভাবতেই পারেনি কল্যাণী মেয়ে। যখন হুঁশ হোল তখন দেখলো জল অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে, কল্যাণী ভাল বেসেছে জগৎ নামে একটি যুবককে। অভাবের সংসারে যে প্রেম আসতে পারে এটা ভাবেনি শৈলজ্যাঠা। কিন্তু যখন সত্যি সত্যিই কল্যাণীদের জীবনেও ঐ প্রেম এলো তখন তো আর তাকে অস্বীকার করা যায় না। মেয়েকে তুলে দিলো তার হাতে। কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই বুঝতে পারলো মেয়েকে তুলে দিয়েছে জামাই এর হাতে, না তুলে দিয়েছে একটা ডাকাতের হাতে যে মেয়ের সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিতে চাইছে আবর্জনার জঞ্জালে। জগৎ ওর পরিবারের একজন নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে গোপন সূত্রে বাঁধা। কল্যাণী টের পেয়ে বেঁকে বসলো। স্বামী তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল সে নিজের পথ দেখে নিতে পারে। অর্থাৎ ডিভোর্স। অবশ্য শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট হোল। কিন্তু সোনার প্রতিমা এতদিনে জীর্ণ হোয়ে বাপের বুকে শেল স্বরূপ হোয়ে দাঁড়াল। আবার দোকানের ঝাঁপ খুললো শৈলজ্যাঠা। চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিতে চোখে

২৭০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পূজোর ফুল

কুমারেশ ঘোষ

[কথায় আছে এক-এক দেবতা এক-এক ফুলে সন্তুষ্ট হন। তবে আজকাল এক দেবতাই নানান ফুলে সন্তুষ্ট হন। তারই দুটি নমুনা—]

(কর্মচারী ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক)

—ভাই, দিন না কাজটা করে! অনেক দিন ধরে পড়ে আছে।

—তা আমি কী করবো!

—আপনি ইচ্ছে করলে পারেন।

—আর একদিন আসবেন দেখবো।

—আমি যে অনেক দূর থেকে আসি। অনেক সময়, অনেক পয়সা লাগে!

—তা সে পয়সা কি আমাকে দিতে হবে? যান, যান, জ্বালাবেন না এখন। কাজ করতে দিন।—ওরে ভজা, এক কাপ চা নিয়ে আয়। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

—তাহলে আজ হবে না কাজটা?

—বললাম তো, না, না, না।

—দেখুন, কিছু খরচা করতেও রাজী আছি। আপনার যা খরচ

—একটা বড় পার্টি ছাড়তে পারবেন?

—তা বাধ্য হয়ে দিতেই হবে।

—আচ্ছা, যান ঘুরে আসুন ঘণ্টা খানেক পরে। আর ঐ যে কী বললেন, ওটা দিয়ে যান।

—এই নিন। অশেষ ধন্যবাদ।

[খানিক পরে—

ঐ কর্মচারী ও একটি যুবক]

—কী মশায়, আমার কাজটা এখনও হলো না?

—সময় পাচ্ছি না। একটু দেরী হবে।

—দেরি দেরি শুনতে চাইনে। আজই যা করবার। করুন।

—আজই?

—হ্যাঁ, আজই। আপনার কাজটা তো বেশ চলছে! হ্যাঁ, তা তো চলছে।

—ওটা তা হলে আর চলবে না। পা দুটোও নয়। স্রেফ একটা বোম,—ব্যাস!

কেন ভাই রাগ করছেন? বসুন, এখুনি দিচ্ছি করে। —এই যে ভজা, চা এনেছিস। এই বাবুকে দে। নিন, ততক্ষন চা-টা খান।

দূরের আকাশ

(২৬৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ল এলে যেতো শৈলজ্যাঠার। তবু সংগ্রাম তাকে করে যেতে হোবে। করেছিলোও।

ছেলে চাকরী পাওয়ায় আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ন। এতদিনে ঠাকরুণ শৈলজ্যাঠার কাছ থেকে অনেক রে চলে গেছে। ছেলের সংসারে মা-ই কর্ত্রী। আর ংসারের কোনও ব্যাপারে ডাক পড়েনা শৈলজ্যাঠার। নের দুঃখে মাঝে মাঝে সে বেড়িয়ে পড়ে কোনও বন্ধুর াড়ীতে কিংবা শিষ্য শিষ্যাদের বাড়ীতে। ছ মাস ন মাস লে গেলেও ঠাকরুণের কাছ থেকে ডাক আসেনা বাড়ীতে ফিরে আসার।

শৈলজ্যাঠাও সেবার সৈকতকে বলেছিল, চুনি চুনি জানিস ভাই ঠাকরুণের কাছ থেকে ডাক না এলে আমিও ডোরর কিরছিনা।

অনেকদিন শৈলজ্যাঠার সঙ্গে দেখা হয় না। সে এবার এসেছিল সৈকতের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। সেখানেই আলাপ। হঠাৎ সৈকতের জানতে খুব ইচ্ছে করছিল শৈলজ্যাঠার কী ডাক এসেছে ঠাকরুণের কাছ থেকে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমৎ
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান যুগের সমস্যাসমূহের সমাধান-মূর্তি হইয়া আসিলেন, অথচ তাঁহাকে এতদিনেও কেহ জানিল না, অথচ মানুষ সমস্যা-পীড়িত। ইহার কারণ কি কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন। নিত্যগোপাল লিখিয়াছেন: প জমজম, ব টিম্‌টিম, নি চুপ। অর্থাৎ পরমহংসদেব জোর চলিয়াছেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ টিম্‌টিম্ করিতেছে, নি অর্থাৎ নিত্যগোপাল চুপ করিয়া আছেন। কেন চুপ করিয়া আছেন? He is watching the tide: একটা নীতি আছে—'Let the disease run its own course'। সহজভাবে প্রচারিত ও প্রকাশিত হইতে সমাজের ভাঙ্গা-গড়ার যতটা 'কাল' লাগে, ততটা লাগিবেই। তাঁহাকে নিয়া 'কেত্রি' করিতে অর্থাৎ ঢাপা প্রোপাগাণ্ডা করিতে মানা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দর্শনটী লিখিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পালাইয়া গিয়াছেন, বিপদে ফেলিয়া গিয়াছেন আমাকে। তাঁহার দর্শন আমার ঘাড়ে চাপিয়াছে, আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। যতদূর পারিয়াছি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য তাঁহার দর্শন অবলম্বনে লিখিয়াছি। তাঁহার প্রচার এই পথে কিছু বাড়িয়াছে নিশ্চয়ই। যে দর্শনে অতীতের 'pre existing knowledge or ever cherishad prejudices'-এর হাত হইতে মুক্ত হওয়া চাই তাহা কি এত সহজে মানুষের মনস্থ নিতে পারে? তাঁহার জীবন ও দর্শন কোন imperative mood-এ কথা না-কহিবার। তাঁহার প্রকাশ অনিবার্য সত্য, ইহা আমি বুঝিয়া গেলাম। নীলু ১০টায় আসে। রেণু সকালে মন্মথ দাস বাবুর বাসায় যায়,...। আজ পাঠে বিশেষভাবে আলোচিত হয়—অগ্রে ভগবানে, পরে পূজায় অনুরাগ সম্বন্ধে। জীব যদি তাহার জীবত্ব রাখিয়া সাধনার জন্য অগ্রসর হয়, তবে হয় তাহাকে কর্মী, নয় জ্ঞানী, নয় ভক্ত হইতে হইবে। অথচ তিনই তাহার জীবনের প্রকাশ। এই জন্য তাহাকে ভক্তিযোগে ভগবানে তন্ময় হইয়া সমগ্র হইয়া পরে শ্রীভগবানকে কর্ম জ্ঞান ভক্তি পথে আস্বাদন করিতে করিতে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অনন্তকাল অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষকে একাধারে কর্মী জ্ঞানী ভক্ত হইতে হইবে। পীযূষবিন্দু ঘোষ আলোচনার সময় ছিলেন। সন্তোষ ছিল। সকাল ৮টার পর কিতীশবাবু আসেন। তাহার কাছে সত্যেনের মহানির্বাণ মঠে নিত্যগোপাল সম্বন্ধে আলোচনার বিষয় অবগত হই।... ৮ই এপ্রিল।

শ্রীনিত্যগোপালের মতে অগ্রে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তি বা প্রেমে যুক্ত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই পূজাসক্তি, ধ্যানাসক্তি, স্মরণাসক্তি হয়। স্মরণের সাধনা করিতে করিতে ভক্তি হয় না। ভগবানে অনুরাগই পূজাসক্তির 'কারণ'। ভগবানে অনুরাগ 'কারণ', পূজাধ্যান তাহারই 'কার্য'; 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ'। উদ্দেশ্য হইতেছে—সমগ্র হইতে ওতপ্রোত হওয়া। জীব আত্মসমর্পণ যোগে শিব হয়, সমগ্র হয়। সমগ্রত্ব হইতে ওতপ্রোত না হইলে জীবনের কোনও বিশেষ প্রকাশ-কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি হইতে ওতপ্রোত হইতে হয় যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা অনিবার্য। জীবকে পিছনে সরিয়া আসিয়া সমগ্র হইতে হইবে। তখন তাহার পক্ষে যে কোনও পথে আত্মা-আস্বাদন সহজ হয়। সন্তান পেটে আসিলেই স্তনে দুগ্ধ আসার পথ সহজ নয়। জোর করিয়া দুধ বাহির করা যায় না। অনন্ত ভগবান হৃদয়স্থ হইলেই বিদ্যা তপ প্রাণনিরোধ প্রভৃতি সহজ হয়। আগে শিব, তৎপরে শরণাগত জীব, তাহার পর আত্ম-আস্বাদন। ইহাই নিত্যগোপালের 'ইষ্টের সহিত বিলাসই ভজন' বাক্যের অর্থ। ইষ্টের সহিত যোগীর বিলাসই ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম। এই বিলাস সব পথেই স্ফুরিত হয়। স্বামীকে ভালবাসিলে স্বামীর স্বামিত্ব-পুত্রত্ব পিতৃত্ব-ভ্রাতৃত্ব সবই আস্বাদন করিতে হয়। নচেৎ একাঙ্গ স্বামিত্ব-আস্বাদন পৌত্তলিকতা। অদ্ভুত নিত্যগোপাল, অদ্ভুত তাঁহার দর্শন। সকাল ৯টায় গুরুভ্রাতা আশুতোষ ঘোষ আসেন, মঠের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অন্তকার আলোচনা জরুরতাপূর্ণ ছিল। ঠাকুরের অনেক কথা বলেন। তিনটি কাজ তাঁহারা করিবেন—কলকাতার বাহিরের মঠগুলির

মহানির্বাণ মঠের সঙ্গে ইহার affiliation, কিম্বা affi, প্রশিক্ষদের নাম তলব, এবং ঠাকুরের গ্রন্থগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা। আমার উপর ইহাদের একটা দৃষ্টি ও আকর্ষণ আছে। ঠাকুরের জীবন-অবলম্বনে যে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লিখিয়াছি, তাহা ঠাকুরেরই আশীর্বাদ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কোন দিন প্রণাম করি নাই, আজ করিলাম। তিনি বয়সে জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা। আমাকে ইহারা 'স্বীকার' করেন। ঠাকুরের কিছু সেবা করিতে পারি ইহা বিশ্বাস করেন। আমার সঙ্গে মঠ সম্বন্ধে আলোচনা করা অর্থ-দ্যোতক। কেন্দু এস সরকার, ই আই রেলওয়ে প্রভৃতি স্থানে যায়।—৯ই এপ্রিল।

ঠাকুর, বিশ্বাস করি যতদিন আমার মস্তক তোমার পায়ে ঠেকানো থাকিবে, ততদিন আমি অজেয়। তোমার মূল্যে আমার মূল্য। আমি কি ছিলাম তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছি? তোমার স্পর্শে আমি আমূল ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি সরিয়া দাঁড়াইলে আমার গণাকড়ি মূল্যও নাই। 'তুমি আগামী কালের নূতন দর্শন আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছ, তাই আমি পাইয়াছি। তুমি সরিয়া লইলে আমার কি থাকিবে? আমি যেই শূন্য সেই শূন্য। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ যুক্ত, ততক্ষণই আমি বলার কথা বলিতে পারিব। নচেৎ আবার বোবা হইয়া যাইব। তোমার কথা আছে তাহা বলিবার শক্তি তুমি দিয়াছ, তাই বলিতেছি। তোমার দর্শন তোমার ইচ্ছা-মতই যাহাকে দিবে, সে বলিবে। গুটাইয়া লইলে কিছুই দিতে পারিব না। আমি যেন কখনও তোমা হইতে তিল-মাত্র বিচ্যুত না হই। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। আমার যোগক্ষেম বহন রাখ। তোমার কথা বলিবার সাধ মিটিল না। সময় তো শেষ হইয়া আসিল। আরও কি তোমার দর্শন ও জীবন কীর্তন মানুষের জীবনে ছড়াইয়া পড়িবে? ছড়াইয়া পড়িবার মত অবস্থা আমার কথায় হউক। তোমার জয় হউক। আশুবাবুর কাশ আমার এখানে আর একটা গভীর অর্থ আছে। ইহা ঠাকুরের আশীর্বাদ প্রেরণা, ঠাকুরের স্বীকৃতি। কেন্দু ভোরে বাগুইআটি যায় ফেরে ৩টার পর। ফেরার পথে বিভেনবাবুর ওখানে খায়। ভোরা লেপাবোর জন্য একটি মেয়েলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে ৪ টাকায়। এ যাবৎ ১৩৭০ টাকা দেওয়া ও খরচ হইয়াছে। কাঠ বাবদ ৩০ টাকা দেনা আছে। ৩টার পর সন্তোষ পাত্রী আসে। চৈত্র সংখ্যা উজ্জ্বল ভারত আজও আসিল না। ...ইহাদের না আছে কর্ম ও শৃঙ্খলার প্রতি কোনও দরদ, না আছে অন্যের মান মর্যাদার প্রতি এতটুকুও দৃষ্টি। এমন করিয়া সংসারের বিষয়ীদের সঙ্গে কেমন করিয়া চলিব? জীবনে আমি যখন যাহার কাজের দায়িত্ব লইয়াছি তাহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছি। আর ইহারা?.....১০ইএপ্রিল।

পুরুষোত্তম-দর্শন জীবনকে স্পর্শ করিবার পর প্রতি কর্মকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করিতে চাহিয়াছি, সে কাজ নিজেরই হউক বা পরেরই হউক। মানুষের সঙ্গে প্রাণ ঢালিয়া তাহাদের সুখদুঃখকে নিজের মনে করিয়া মিশিয়াছি। ফাঁক রাখিয়া মিলি নাই কর্মক্ষেত্রে, ভালবাসার ক্ষেত্রে কাহাকেও ফাঁকি দেই নাই। যাহার সম্বন্ধে যাহা করণীয়, তাহা করিতে প্রাণপণ করিয়াছি। সকল সম্পর্কের ভাগবত মর্যাদা দিতে চাহিয়াছি। শিক্ষক-জীবনে দরিদ্র হইলেও ঘরের চাউল আপন জনদের মধ্যে যাহার ঘরে চাউল ছিল না দিয়াছি, টাকা দিয়াছি। যাহার যাহা বিপদ তাহা কাঁধে নিতে চাহিয়াছি। বিপদে কাহাকেও একলা ফেলিয়া দূরে যাই নাই। কংগ্রেসের কাজ করিয়াছি সকল দেহ প্রাণ দিয়া। এক পা পথে। এক পা রথে—এই রূপ দো-মিল হইয়া জীবনে চলি নাই। নিজের স্ত্রীর অলঙ্কার দিয়া তবে অন্যের অলঙ্কার নিয়াছি কংগ্রেসী আন্দোলনে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের স্কুল ছাড়াইবার পর অপরকে ডাকিয়াছি। দুঃখ বরণই ছিল আনন্দ। দুঃখই আমার সারা জীবনে পথের পাথেয় যোগাইয়াছে। আজও দুঃখ আমার সঙ্গী।

(চলবে)

শিশু জগৎ

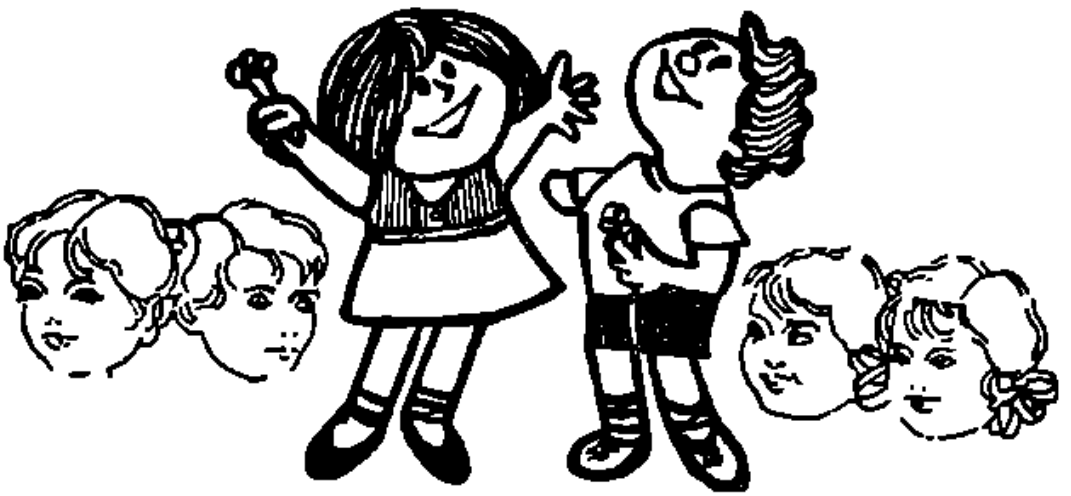

ভট্‌চায্যির টিকি (ছড়া)

বাণী নাগ

চাল, কলা, বেল আমের সঙ্গে
আস্ত একটি টাকা—
দিলেও দেখবে খুঁৎখুঁতুনিটি
যায় না তাহার ঢাকা!
যোগ ক'রলেই তাহার সঙ্গে
চক্‌চকে এক সিকি
আশীর্ব্বাদের ঘটায় তুলবে
ভট্‌চায্যির টিকি!

জেনে রাখা ভাল

রতন রায়

সাপ বিষয়ে তোমাদের কয়েকটা ভুল ধারণা আছে। যেমন—সাপ ইচ্ছে করেই মানুষকে কামড়ায়। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সাপ মানুষকে বেশ ভয় করে এবং যথা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। সাপের মণি ব্যাপারটা স্রেফ ধাপ্পা। বেদের কারসাজি। ইলিশের চোখ আঠা দিয়ে মাথায় বসিয়ে মণি বলে চালিয়ে দেয়।

একজন ভদ্রলোক কত ভাষায় দিব্যি পণ্ডিত হতে পারেন?

চৌত্রিশ ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম হরিনাথ দে। তিনি একজন বাঙালী। পৃথিবী-বিখ্যাত এই বাঙালী ভাষাবিদের জন্ম ভবেরবাড়ী গ্রামে।

দক্ষিণ ভারতের মেয়ে পদুমলা দেবীর নাম তোমরা জানো। মুখে মুখে অনেক শক্ত অঙ্ক করে উনি পৃথিবীকে অবাক করে দিয়েছেন।

অনেকেই কুকুর পোষেন। শ্রীমতী ওলগা ডান নামে সিডনীর এক ভদ্রমহিলার এখন ৩৬০টি কুকুর নিয়ে সংসার। শ্রীমতী ডান বিধবা, নিঃসঙ্গ এবং কুকুর-প্রেমী। নয় বছর আগে তিনি নয়টি কুকুর নিয়ে এই সারমেয়-সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

পাহাড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

অনিরুদ্ধ মিত্র (১২ বৎসর)

আমরা সমতলবাসী, পাহাড়ের অভিজ্ঞতা আমাদের কম। আমি তো উঁচু পাহাড় এতদিন দেখিই নি। এবার কুমায়ুন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পাহাড় সম্বন্ধে আমার ধারণা বেশ স্পষ্ট হল। আর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পাহাড়ে কি অদ্ভুত দেখায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সৌভাগ্য হল। আমাদের এখান থেকেও অবশ্য বর্ষাকালের ও শরৎকালের মেঘ মাঝে মাঝে খুবই সুন্দর দেখায়, কিন্তু পাহাড়েরটা অন্য রকম।

বিকেলে আলমোড়ার হোটেলে পৌঁছে দেখি পেছন

দিকে অনেকদূর অবধি জায়গাটা উপত্যকার মত ঢালু হয়ে নেমে গেছে এবং তার মাঝে বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, ক্ষেত, বাগান ইত্যাদি রয়েছে। তারপর আবার জমিটা উঁচু হয়ে একসারি পাহাড়, তার পেছনে পর পর সারি সারি পাহাড়। তার পেছনে অনেক দূরে বরফে ঢাকা কয়েকটি চূড়া—তুলনায় ওটার নাম নীলকণ্ঠ যার উপরে বদরিনাথের মন্দির। ভোরবেলায় উঠে দেখি উপত্যকার বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন এক বিরাট সমুদ্র ছেয়ে আছে সব জায়গায়। তার মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আবার ঢেউয়ের মত দেখাচ্ছে—পুরোটা জায়গা কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা। তার পেছনে নীলকণ্ঠ পাহাড়টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আর রোদ পড়ে চিক্ চিক্ করছে। ক্রমশঃ বেলা বাড়তে থাকলে কুয়াশাগুলি মেঘ হয়ে ওপরে উঠে গেলে উপত্যকা ও সামনের পাহাড় পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু বরফ-ঢাকা পাহাড়গুলোকে মেঘ ঢেকে গেল। পাহাড় উপত্যকার এক একটার এক একরকম রঙ —কোনটা গাঢ় সবুজ, কোনটা নীল, কোনটা ধূসর, কোনটার মধ্যে হলুদভাব বেশী।

আমরা একদিন বরফে ঢাকা পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখতে যাই। একটা উঁচু জায়গা থেকে হিমালয়ের অনেকগুলো চূড়া দেখা যায়। চারদিকে তখনো অন্ধকার রয়েছে কিন্তু দেখা গেল উঁচু চূড়াগুলির একটার মাথায় একটি লাল বিন্দু। খানিকক্ষণ পরে আরো কয়টার মাথায় অমনি লাল বিন্দু হলো। ধীরে ধীরে সেগুলি বাড়তে শুরু করল। অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেখানে কিন্তু তখনও পরিষ্কার আলো হয় নি। ওগুলোর কোথায় খাদ, কোথায় গহ্বর রয়েছে বেশ পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগলো। কোনটা সবচেয়ে উঁচু, কোনটা কাছে সব বোঝা গেল এই আলো দেখে। ত্রিশূলের তিনটি চূড়া আলাদা ভাবে পরিষ্কার দেখা গেল, ওটাকে একটা মস্ত বড় দুর্গের মত দেখাচ্ছিল। এরপর নন্দাদেবীতে আলো পড়লো। নন্দাকোট বলে পাহাড়টির মাথাটা সমান, তাতে আলো পড়লো যেন একটি লাল রেখা, ওটাকে দেখাচ্ছিল মিশরের পিরামিডের মত। ক্রমে লাল রঙগুলি হলুদ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং পরে সাদা হয়ে চকচক করতে থাকলো। এই অভিজ্ঞতা আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে। হিমালয় কত উঁচু এই থেকেই বোঝা যায়—আমাদের এখানে আলো পড়বার বহু আগেই চূড়ায় সূর্যের রশ্মি পৌঁছে যায়।

সূর্যাস্তের সময় সাধারণতঃ চূড়াগুলি মেঘে ঢাকা থাকে তাই সেটা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল, যদিও সেই সঙ্গে খুব ভয়ের কারণও ছিল। আমরা ফিরছিলাম রাণীক্ষেত থেকে বাসে। শহর ছাড়াবার একটু পরে উঠল প্রচণ্ড ঝড়, চারপাশের জঙ্গলের পাইন গাছগুলি হাওয়ায় ভীষণভাবে দুলতে আরম্ভ করল এবং মাঝে মাঝে গাছ ভেঙে পড়তে থাকলো। বাসের ওপর কখন যে একটা গাছ ভেঙে পড়বে এবং আমরা তার তলায় চেপ্টে যাব সেই ভয় করতে থাকলো। সেই সময় বাস থেমে গেল, সামনে রাস্তায় একটা গাছ পড়েছে। হাওয়া এবং বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা বেড়ে গেল চতুর্গুণ। যদিও তখনও বেলা রয়েছে, মেঘের দরুণ মনে হল সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ওখানকার লোকেরা কিন্তু এতে অভ্যস্ত। বাস ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার ও আরো কয়েকজন মিলে ছুটাছুটি করে কোথা থেকে কুড়ুল, দা ও করাত যোগাড় করে গাছ কাটতে শুরু করে দিল এই বৃষ্টির মধ্যেই। কিন্তু একটা কাটলে কি হবে? একটু পরে পরেই গাছ পড়েছে, জঙ্গলের মধ্যেও সমানে গাছ ভাঙা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ভাগ্য খুব ভাল যে কিছু হয় নি। খানিক পরে বৃষ্টি থেমে গেল, হঠাৎ দেখা গেল যে উত্তর আকাশ থেকে মেঘ উঠে যাচ্ছে এবং আমরা কিছু ভাববার আগেই দেখি সারা উত্তর আকাশ জুড়ে রয়েছে সাদা চকচকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা চূড়া। সূর্য তখন প্রায় অস্ত যাচ্ছে—চূড়াগুলি একটু ক্ষণের মধ্যেই সোনালী হয়ে গেল এবং তারপরেই মনে হল কে যেন চূড়াগুলির উপরে লালরঙের আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে নীচ দিকগুলি অন্ধকার হতে শুরু করল কিন্তু চূড়ার আগাগুলি বহুক্ষণ ধরে লাল হয়ে ছিল। বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে আকাশ এত পরিষ্কার হয়েছিল বলেই দৃশ্যটি এত সুন্দর ভাবে দেখা গেল। বাসটা যখন বাঁক ঘুরছিল তখন পাহাড়গুলো

(শেষাংশ ২৭৯ পাতায়)

নারী জগৎ

পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা ব্যাহত

ডঃ আভাশেঠ এম্. এ., বি. এল্., পি. এইচ. ডি. (লণ্ডন)

ইংলণ্ডের গির্জাগুলির সাইনড বা উচ্চতম সমিতি স্ত্রীলোকদের খ্রীষ্ট-যাজকত্বে অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে গত বৎসর ভোট দিয়েছিলেন। এ বৎসরও ৭ই জুলাই ইংলণ্ডের এ্যাংলিকান চার্চের অন্যান্য শাখাগুলি পুরোহিতের কর্তব্য করতে মেয়েদের অনুমতি দেবার প্রস্তাব নামঞ্জুর করে দিয়েছে। ৮ই জুলাই-এর স্টেটসম্যান বলছে, "The General Synod of the church of England yesterday rejected a new move to permit women to carry out priestly duties." আমরা আশ্চর্যান্বিত হই যে, গণতন্ত্র, গণমর্যাদা ও মানবিক অধিকারের পতাকা উড্ডীন করে চলা বিষয়ে যে ইংলণ্ড সর্ব পুরাতন এবং শ্রেষ্ঠ বলে সুনাম অর্জন করেছে, সেই ইংলণ্ডে নারীজাতিকে এই অধিকার হতে বঞ্চিত করবার সিদ্ধান্ত আজও করল খ্রীষ্টান পুরোহিতেরা!

পশ্চিমী জগতে বা খ্রীষ্টীয় কৃষ্টির মধ্যে তাদের ধর্ম হতে এমন কতক সীমারেখা এসে পড়েছে, তার বাইরে যারা চলাফেরা করেন তাদের প্রতি ধর্মগুরুরাও হয়তো অপ্রত্যক্ষ-ভাবে ঔৎসুক্য দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তা প্রকাশ করতে বা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। আমি ভারতে, ইংলণ্ডে বা অন্যান্য দেশে যে সব রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট বা অন্য গির্জায় গিয়েছি—যেমন মাদ্রাই ও প্যারিসের সুবিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক গির্জা, লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবি বা সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল—তখন খুব লক্ষের মধ্যে পড়েছে যে কোনও মেয়েকে পুরোহিতের কাজ করতে বা Dias-এ আসতে বা কোনও কোণায় দাঁড়িয়েও কোনওউপদেশ দিতে বা পাঠ শোনাতে দেখিনি।

বলাই বাহুল্য যে পশ্চিম জগতে কোনও কোনও স্থানে বা সময়ে শুনতে হয়েছে যে ভারতে মেয়েরা slave : স্ত্রীরা স্বামীদের আজ্ঞাবহ। আমি তখন অনেক স্থানেই বলেছি যে আমার ধারণা পশ্চিমজগতে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা বা অবাধ বিচরণ প্রকাশ পেয়েছে প্রধানতঃ যৌনজীবনে। ও সব দেশে আমি সিনেমা দেখতে যেতাম না, কিন্তু পাঁচ গুণ খরচ করেও তাদের বাল্লে বা দেশ-বিদেশ হতে আগত জীবন্ত মানুষদের গান, নাচ বা থিয়েটার দেখতে যেতে পশ্চাৎপদ হতাম না। তখন লক্ষ্য করেছি যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় নাচ বা ব্যালেতে স্টেজে স্ত্রীলোক আর্টিষ্ট-এর সংখ্যা যদি বিশ হয়, পুরুষ আর্টিষ্ট-এর সংখ্যা হয় দুই বা তিনমাত্র; পুরুষেরা কেবল একটু সহায়তা করবার মত অংশ নেয়। কিন্তু চৈনিক, রুশীয়, এমেন-দেশের নাচে মেয়ে ও পুরুষ শিল্পী সমান সংখ্যক হয় দেখেছি। প্রশ্ন করি যে, আর্ট তো পুরুষ ও নারী উভয়কেই আকর্ষণ করবে,

পুরুষ শিল্পী এত কম হওয়া তো স্বাভাবিক নয়। এ আলোচনার শেষ হবে তখন যখন আমি বলতে বাধ্য হই যে অর্থের নামে বাবসা চলেছে; অর্থ এখনও অধিকাংশস্থলে পুরুষের পকেটে আসে বলে ব্যবসার কারণে মেয়েদের স্টেজে দেখার দরকার বেশি।

গির্জাগুলি তাদের ধর্মাসনে সীমাবদ্ধ থাকে বলেই বোধহয় তাদের পুরোহিত মতবাদ চালিয়ে যেতে পারছে। নয়তো যে সব দেশে মেয়েরা বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় নানাদিকে খুব প্রশংসনীয়ভাবে অগ্রসর হয়েছে, সেই সব দেশের মেয়েরা ধর্মজগতে নিজেদের মানবিক অধিকার আদায় করছে না কেন—এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। ঘোড়ার শোপের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য কখন কোন ঘোড়ার হয় নি বা হবে না কেন এ প্রশ্নের উত্তরে পশ্চিম দেশীয় খৃষ্টান পাদ্রীরা বলেন যে "ইহা ভগবানের আইন-বিরুদ্ধ"। প্রশ্ন করি সে রকম আইন ভগবান কিভাবে ও কোথায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যাদের কথা হয় যে তিনি জানিয়েছেন, "Men will speak and women will hear."

পুরুষেরা বলবে, মেয়েরা শুনবে—এই অতি মামুলী কথা পৃথিবীর প্রত্যেক অংশেই সভ্যতার প্রথম স্তরে শোনা গেছে। একে ভগবানের উক্তি বলে প্রচার করবার দরকার কি? সভ্যতার সুরুতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবে যখন সাধারণ শ্রমে কোনও দিকে সাফল্য আসা যেত না, যখন শারীরিক শক্তিদ্বারা কর্ম-সমাধা করতে হত এবং অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্বলতার দরুণ ও সন্তানদের ঘিরে সময় কাটাতে হত বলে স্ত্রীলোকদের অন্যত্র মনোযোগ দেবার সুযোগ পরিমিত ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের প্রাধান্য সুরু হয়। এই অবস্থাই স্ত্রীলোককে পুরুষের নানারকম প্রয়োজনের সাধন হিসাবে দেখবার অভ্যাস করিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর অনেক অংশেই। খৃষ্ট ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও অ-বিশ্বাস প্রচার করে, এই ধর্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানুষের মনের বিকাশের সঙ্গে ধর্ম বিশ্বাসকে বিকশিত হতে দেয় না। দুই হাজার বৎসর আগে মানুষকে যা বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল, এখনও এবং সকল মানুষকেই তাই বিশ্বাস করতে বলা হচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসের শিক্ষা বদলান উচিত। নয়তো অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সেই বিশ্বাসকে মনে ধরে রাখতে পারে না। আবার সকল মানুষের ধারণা করবার শক্তি সমান হয় না বলে ধর্ম বিশ্বাসের অগ্রগতিকে অনেক মানুষ গ্রহণ করতেই পারবে না। এই সব কারণে ধর্ম-পালন করতে গিয়ে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, অ-বিশ্বাস ও ভেদ মনের অবনতি দেখা যায়।

ভগবানের নামে স্ত্রীলোককে কথা বলবার অধিকার হতে বঞ্চিত করাতে চার্চের হাতে এসেছে প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং চার্চের এই শিক্ষা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে স্ত্রীপুরুষের প্রতি এই গভীর অসম দৃষ্টি; এই দুঃখকর দৃষ্টিকোণ ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে তাদের সমাজে। দশ বার বৎসর আগেও পূর্ব জগতের মহিলাকে ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করতে দেখে পাশ্চাত্য জগতের এমন কি আমেরিকার মহিলাদের বলতে শুনেছি যে ইহাতে নাকি পুরুষেরা আহত হবে। আশ্চর্য বোধ করি যে উচ্চতম শিখরে যে মহিলা উঠেছেন তিনি তো একজন পুরুষের কাছে তাঁর নারীত্ব নিয়ে উপস্থিত হবেন কিম্বা হয়তো একজন পুরুষও যাতে তাঁর নারীত্ব হেতু আহত না হন সে বিষয়ে তিনি যত্নবান হতে পারেন। কিন্তু পুরুষসমাজের প্রত্যেকের নিকট কি তাঁকে তাঁর নারীত্ব হেতু নীচু হয়ে থাকতে হবে? নারীর এই অস্বাভাবিক নীচু অবস্থা প্রাচ্য সমাজে পাওয়া যায় না! নারীরা কেবল শুনবে, কোনও পুরুষকে বা কোনও পুরুষ-মিশ্রিত সম্মেলনে কিছু বলবার অধিকার বা সম্মান দিতে কোনও নারীকেই পুরুষ সমাজ এবং নারীরাও প্রস্তুত নয়। নারীদের কী দাসত্ব! যাহোক ইংলণ্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মারগারেট থ্যাচার ইংলণ্ডে এবং পাশ্চাত্যজগতে নারীকে মানবিক অধিকার বা দেওয়ার এই জবাট-বাঁধা সংস্কার কাটিয়ে দিচ্ছেন অনেক নরনারীর অন্তঃস্থল হতে। পশ্চিম সমাজ হতে এই অসম-দৃষ্টি দূর করার দাবীকে যখন আর উপেক্ষা করা যাবে না, যখন 'পুরুষেরা বলবে, মেয়েরা শুনবে' এই কথাকে ভগবানের উক্তি বলে বাচালতা হতে পশ্চিম সমাজকে শোনান হবে না, কেবল তখনই আশা করা যাবে চার্চের সিদ্ধান্তের কিছু বদল হওয়ার।

আমাদের অনেকেরই অভ্যাস সর্ব বিষয়ে সীমাংসার জন্য

(শেষাংশ ২৭৯ পাতায়)

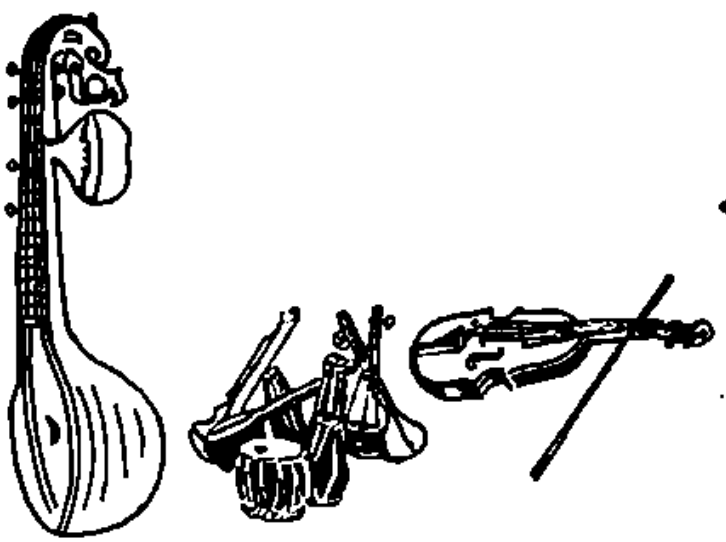

সঙ্গীত জগৎ

দাদূ

(১৪৪৪-১৬০৩)

আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়

এই উনিশশো উনআশী খ্রীষ্টাব্দ থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে প্রায় চারশো পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে মানুষটি জন্মেছিলেন আমেদাবাদে (জৌনপুর ?) তিনি কেমন করে গানের সুরের ভেতর দিয়ে, ভগবানের কৃপা লাভ করে, সারা ভারতের ভক্তি-মার্গের মানুষের চিত্ত জয় করে ছিলেন। তাঁর জন্মের ইতিহাসে তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁর লেখাপড়া, তাঁর ব্যবসা, তাঁর জ্ঞান লাভ, তাঁর সৎসঙ্গ লাভ, তাঁর সংগুরু প্রাপ্তি, তাঁর আচার ব্যবহার সংসার জীবন এমনকি তাঁর ধর্মপ্রচার পর্যন্ত যা কিছু ঘটনা ঘটেছিল, সব কিছুই যেমন অলৌকিক তেমনি অবিশ্বাস্য। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে, সাধনা দিয়ে, গীতি কবিতার ছন্দে ছন্দে বর্ণে বর্ণে সুরে সুরে প্রকাশ করে মানুষের অন্তরের গভীরে এমন একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

ভগবানকে পাবার জন্য, তাঁর কৃপালাভের জন্য বহু ধর্মের বহু পথ খোলা আছে কোটি কোটি মানুষের কাছে। কিন্তু তাঁর মত তাঁর সোপান তৈরী হয়েছিল সুরের অমূল্য মণি মুক্তা দিয়ে, তাইসে পথ চিরউজ্জ্বল চিরদীপ্ত চিরসুন্দর। তাঁর সুরের পথের পথিক জন আজও তাঁরই গীতিসুধারস পান করে আনন্দে হয়ে যায় অভিভূত। ভুলে যায় তারা মনের বেদনা সংসারের কষ্ট, দুঃখ তাদের ছুটে চলে যায় বিশ্ব-স্রষ্টার চরণপ্রান্তে।

গানের ভিতর দিয়ে
যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তাঁরে চিনি আমি,
তখন তাঁরে জানি ॥

বিংশ শতাব্দীর কবিগুরুর গীতিকাব্যের এই বাণীর সত্য রূপকে তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে নিজের জীবন-বেদ দিয়ে প্রমাণ করে গিয়েছিলেন সেই অনুপমীয় মহামানবের নাম দাদূ।

সত্য পথের পথিক হয়ে, সরল নিরভিমানে সহজ হয়ে সমস্ত দেহ মন সম্পূর্ণ করে যে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তার ডাকেই সাড়া দেন। সেই ডাকের কাছে যেমন জাতি-বিচার থাকে না, থাকে না কোন ভেদাভেদ। সারা জীবন দিয়ে ভক্ত দাদূ এই কথার সত্যতাকে প্রমাণ করে গেছেন।

সনাতন পথের বাঁধা ধরা নিয়ম নিষ্ঠা, অথবা জ্ঞানমার্গের অসংখ্য কঠিন ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে পথের সৃষ্টি, সেই পথকে সযত্নে এড়িয়ে দাদূ ভক্তের জীবন-শতদলকে ফুটিয়ে ছিলেন। প্রেম ভক্তির রসে রঞ্জিত, প্রাণের আকুল

আবেগের মধুর অশ্রু মেশানো অজস্র স্রোতের অনুরণন সুর-তরঙ্গের ঝঙ্কার গানে।

আমেদাবাদে (জৌনপুর ?) এক গরীব ধুনকরের পুত্র হয়ে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে, বৃহস্পতিবার দাদূ জন্মেছিলেন। তাঁর বাবার নাম ছিল লুলেমান। তাঁর শিক্ষা দীক্ষার কোন বালাই ছিল না, কোন সুযোগও তাঁর ছিল না। লেখাপড়া শেখাটা ছিল তাঁদের সংসারের কাছে সম্পূর্ণ কল্পনার বাইরে। তাই তিনি একটু বড় হতেই শিখেছিলেন চামড়ার কাজ।

অশিক্ষিত চর্মকার এই মানুষটির মধ্যে, বাল্যকালে তো নয়ই, এমনকি কৈশোর ও যৌবনেও এমন কোন অসাধারণত্ব দেখা যায় নি, যার ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে তিনি হবেন ভক্তি মার্গের একজন মহাসাধক। দুঃখ আর দৈন্যতায় ভরা অতি সাধারণ গরীব গৃহস্থের জীবন যাপন তিনি করতেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম হাওয়া। তাঁর দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে হয়েছিল। তাদের নিয়ে কোন রকমে সারা দিন রাত পরিশ্রম করে দাদূ দিনাতিপাত করেছিলেন।

এই সময় একদিন গ্রীষ্মকালের বিকেল বেলায়, হঠাৎ বড় জলের মধ্যে ভক্ত কবীরের পুত্র কামাল ঘটনা চক্রে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দাদূর ঢাড়া কুটিরে। দাদূর সরলতা, তাঁর মধুর ব্যবহার, আর অতিথি সেবার অকৃত্রিম চেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে ভক্ত কামাল আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে। সেই আশীর্বাদেই তাঁর জীবন-পথের নতুন দরজা খুলে দিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে তিনি গানে গানে বলেছিলেন।

"সৈব মাঁহি গুরুদেও মিলা
পারা হম্ পরদাদ,
মস্তক মেরা কর ধরা
কহ্যা হম্ অগাধ।"

চোখের সামনে থেকে অন্ধকার সরে গিয়ে যেমনি আলো জ্বালো, দাদূ আর দেরী করলেন না, বেরিয়ে পড়লেন সেই নতুন আলোর নতুন পথে। কাশী, বিহার, রাজপুতনার ভক্ত জনপদ নারায়না সাম্ভর ও অম্বরে গুজরাটের কাথিয়াবাড় আহিপ্রায়, টোক অঞ্চল এবং বাংলাদেশেও তিনি এসেছিলেন। তাছাড়াও দাদূ বুরহানউদ্দিন নামে একজনকে গুরু বলে স্বীকার করে গেছেন। অম্বরের রাজা ভগবন্ত দাসের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ হয়েছিল তাই তিনি বিরক্ত হয়ে অম্বর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর দাদূর সঙ্গে দীর্ঘদিন শাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন। বাংলাদেশ পর্যটন করার সময় বাঙালী নাথপন্থী যোগীদের সান্নিধ্যে ও শিক্ষা থেকে তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। এইরকম নানা কাহিনী দাদূকে নিয়ে ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে বহু ভক্ত জনের মুখে মুখে। তাছাড়া আরোও অনেক অলৌকিক গল্পও গড়ে উঠেছে দাদূকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে তাঁর ভজন গান। ভক্তিমার্গের এই ভজন গানের মধ্যেই তিনি অমর হয়ে আছেন। এখনও তাই দাদূর ভজন ধ্বনিত হয় হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠবীণার তারে তারে। দাদূ তাঁর ভজন গানে গানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভক্তি ও প্রেমের পরিপূর্ণ রস। তিনি বলেছেন,

নাউঁ নিধিও ধরি ভৈ
ভগতি নিধিও ভরি সোই।
সেবা নিধিও সঁধই ভৈ
সদা সজীবন হোই।
হিরদৈ রাম রহৈ জা জন কৈ।
তা কৌ ঊনা কোন কহৈ
সঠ সিধি নও নিধি তাকৈ আগৈ
সন্মুখ ঠাঢ়ী সাদ রহৈ।

নামের মধ্যেই করতে হবে হরির ভজন গান; ভক্তির জন্য গাইতে হবে ভজন, সেবার জন্যও করতে হবে ভজন নাম গান, কেননা সঞ্জীবনী রসরূপে সর্বত্র তিনিই বিরাজমান। যার মনের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র অধিষ্ঠান করেন, কে তাকে ছোট বলবে? অষ্টসিদ্ধি নবনিধি সবকিছুই ভক্তের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আজ্ঞাবহের মতো। মন্দির মসজিদের গণ্ডী, হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ দাদূর সাধন-উজ্জ্বল দৃষ্টির সামনে হয়ে গিয়েছিল বিলুপ্ত। তাই একের পর এক ভক্ত সাধকদল গিয়ে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দাদূর বড় ছেলে গরীব দাস উত্তরকালে এক সুবিখ্যাত ধর্মমিশ্র সাধক রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

ছোট ছেলে মসকীন দাস ও নবীবাঈ আর মাতাবাঈ নামে দুটি মেয়েও আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল।

দাদুর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে প্রধান ছিল মোট বাহান্ন জন। তাঁদের মধ্যে বুদ্ধব জী, জাইসা, মাধোদাস, প্রয়াগ দাস, শঙ্কর দাস, জন গোপাল, বনওয়ারী দাস, জগজীবন, সুন্দর দাস (ছোট) প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জন্য যে, সমসাময়িক কালে এরা প্রত্যেকেই দাদু-পন্থীদের ভাষায়, এক একটি 'থাম্বা' মানে স্তম্ভের মত প্রবর্তকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

অনেক বাধা, অনেক অবহেলা, অনেক অবিশ্বাসের সমুদ্র মন্থন করে প্রেমের, সত্যের ও ভক্তিরসের পথ ধরে দুনিয়া ছেড়ে দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে যাবার সময় দাদুর ঘনিয়ে এলো, তখন তাঁর অনেক শিষ্য ছাড়াও, হাজির হয়েছিলেন তাঁর সামনে একদল উচ্চকোটি সাধু। তাঁদের দেখে তিনি গেয়ে উঠেছিলেন

দাদু কয় সির ঘোটে ভাগ
সাঁবুকা দর্শন কিয়া।
কহা করৈ জম কাল
রাম রসাইন ভরি পিয়া॥

এই সময় আমি সাধুদের দেখা পেলাম, আমার কি পরম সৌভাগ্য। আমি রাম-রসায়ন পান করলাম, এখন কাল মৃত্যু আমার কি করবে। এই বলে রাজপুতনার ছোট জনপদ গ্রামে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে তিনি চলে গেলেন বিশ্ব-পিতার কাছে, চির সুন্দর অমর লোকে। বিদায় কালে তাঁর বয়স হয়েছিল উনষাট বছর।

পাহাড়ের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

(২১৪ পাতার পর)

মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে রাত হয়ে আসছিল, আমরা গন্তব্যস্থলে কখন পৌছব বা অন্ধকারে খাদে গিয়ে পড়ব সে সম্বন্ধে মনটা বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিল। তবু দৃশ্যটি মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি এনে দিয়েছিল।

পাহাড়ে এই প্রথম সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা আমার মনে যে আনন্দ দিয়েছে তা আমি কোনদিন ভুলব না।

পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা ব্যাহত

(২১৬ পাতার পর)

পশ্চিমের দিকে তাকান। বলাবাহুল্য এই সাংস্কৃতিক দাসত্ব উদ্ভূত হয়েছে আমাদের দু'শ বৎসরের রাজনৈতিক দাসত্ব হতে। মানব-সভ্যতায় পশ্চিম জগতের অবদানকে কমিয়ে বলা হচ্ছেনা, কিন্তু সভ্যতার ধারা কেবল তারাই দেখিয়েছে বা দেখাচ্ছে তা মনে করা ভুল। পশ্চিম জগতে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য স্ত্রীলোক ইঞ্জিনিয়ার আমরা কবে পেয়েছি? কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ইহা পাই সাধারণ রীতিতেই। পশ্চিমে কি স্ত্রীলোক সৈনিক বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা বিদেশ-মন্ত্রী পাই? ভিয়েতনামে তো অনেক পেয়েছি—যে পদ্ধতির পরিণাম স্বরূপ বেরিয়েছেন খাতনামা মাদাম বীন।

মানব-সভ্যতাতে চীনদেশের অবদান সর্বাগ্রে বললে অত্যুক্তি হবে না, সে অবদান খুব গভীর এবং এখনও পশ্চিমের সভ্যতাকে ক্ষেত্র বিশেষে চ্যালেঞ্জ দেয়। পশ্চিমে প্রেসিডেন্ট কার্টার মানবিক অধিকার প্রবর্তনে আগ্রহী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ পশ্চিমের অর্ধেক মনুষ্যকে—অর্থাৎ নারীকে—মানবিক অধিকার দিতে অস্বীকার করল আজ তাদের চার্চ ইংলণ্ডের মত প্রথম পর্যায়ের নেতৃত্বে। এদিকে চীনে বা দক্ষিণ পূর্ব এসিয়াতে নারীরা অনেক প্রকারের মানবিক অধিকার ভোগ করছে অনেক কাল হতে। তাদের দেশে পরদা তো নেই, ভ্রূণের মূল্যে নারীদের মূল্য দেওয়ার রীতিও রয়েছে। বিবাহিত স্ত্রীলোকদের পিতার নাম পরিত্যাগ করে স্বামীর নাম নেওয়ার রীতি চীনদেশে নেই; এসিয়ার যে সব স্থানে পশ্চিমী পদ্ধতির ছায়া পড়ে নি সেখানেও নেই। মাও-সা-তুং এর পত্নীকে মিসেস তুং বলা হয় না, চিয়াং চিং তাঁর নামেই বিখ্যাত। চৌ এন লাই এর পত্নী মিসেস লাই নামে পরিচিত নন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী হুয়া কুঁয়া ফেঙ্গের নামের কোনও অংশই তাঁর স্ত্রী চান জী তুনের মধ্যে নেই। ভারতেও পশ্চিমী পদ্ধতি চালু করার পূর্বে এবং এখনও যে সব গ্রামে বা সহরে পাশ্চাত্য রীতিনীতি প্রবেশ করেনি সে সব স্থানে স্ত্রীলোকেরা নামের পর দেবী লাগিয়ে থাকে, পশ্চিমী পদ্ধতিতে স্বামীর surname যোগ করে না। অতিআধুনিক আমেরিকাতে অনেক মেয়ে স্বামীদের নাম নিতে অস্বীকার করছে; তারা আরও বলছে যে একজন পুরুষ মিস্টার বলে পরিচিত হওয়ায় সে বিবাহিত বা অবিবাহিত তা প্রকাশ পায় না; কিন্তু মেয়েদের মিস্ বা মিসেস্ ডাকা হয় বলে তাদের বৈবাহিক অবস্থা ঘোষিত হয় সর্বত্র; আমেরিকার নূতন বিপ্লবীমেয়েরা তাই শুধু M.S. লিখবে স্থির করছে। যাহোক, এই সমস্ত দৃষ্টি বা কৃষ্টি এসিয়ার পক্ষে অতি পুরাতন কিন্তু পাশ্চাত্যজগতে ইহা বর্তমানে জাগছে মাত্র।

(২৮০ পাতার পর)

হছেন ? ককাই তো আমায় সব দেন। তাঁর দিয়েছেন
ন, আমায় দেবেন না তার ?'
শচীদেবী পুত্রের রহস্য বুঝতেন।
ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হতো। আতংকে বুক কাপতো
।'
প্রতিবেশীদের কাউকে আড়ালে ডেকে বলতেন
াই, নিমাই তো তোমার কোন ক্ষতি করেনি বৌ ?'
দেবীর এই অহেতুক প্রশ্নে বিস্মিত হতো প্রতি-
ণী।
বলতো, 'কি যে বলো বামুন দি', নিমাই আমার ক্ষতি
ত যাবে কেন ? ছোট বেলায় না বলে শশাটা-
টা নিত, ও সব ছেলেই নেয়। কিন্তু এখন তো
নেয় না। আমার বাড়িও যায় না। সে আমার
করবে কি করে ?'
দেবী আশ্বস্ত হন।
কন্তু তবুও তাঁর ভয় কাটে না। তিনি এ-কে ডাকেন
ডাকেন। এ-কথা সে-কথার ফেতর ঐ ক্ষতির
ও জিগ্যেস করেন।
নে সবাই আশ্চর্য হয়।
ামুন মা বলে কি ? নিমাই যাবে অন্যের ক্ষতি
? বলি সারা নবদ্বীপে অমন ছেলে আর একটিও
নাকি ? অমন সোনার টুকরো ছেলে ? অন্যের
যার প্রাণ কাঁদে, চোখে জল করে, সে যাবে কিনা
ক্ষতি করতে।'
নে শচীদেবীর আনন্দ হয়। পুত্রের গৌরবে তাঁর
রেওঠে।
লেন, 'না, অমনিই বলছিলুম, আর কালকার ছেলে
, বলা তো যায় না আবার কোথা দিয়ে কি করে

তুমি নিশ্চিন্তে থাকো বামুন মা, নিমাই সে ধাঁচের
নয়। বয়েস তো আমার একেবারে কম হলো
অনেক ছেলেই তো দেখলুম চোখে। কিন্তু
নিমাইয়ের জাত একেবারে আলাদা। ও ছেলের
কারো ক্ষতি করা সম্ভব নয়।
ীদেবী এবার নিশ্চিন্তে সোনা বিক্রী করে সংসার
টাকা সংগ্রহ করেন।

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত দ্বাদশ পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৪৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed *a/c* Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে হওয়া প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

With Best Compliments FROM

lectrometal (*India*) Pvt. Ltd.,

East Anglia House (7th. Floor),
3C CAMAC STREET, CALCUTTA-16

Gram : ELECSIDE

Telephone : 21-3127
24-2148
24-4337
24-4338

WORKS
Garia, 24 Parganas : Phone : 72-4295

Cable : KAMLAVALVES (Howrah) Phones : { Office : 66-276 Resi. : 61-064

KAMALA VALVES MANUFACTURIN CONCERN

31/2. "Y" ROAD, BELGACHIA.
HOWRAH-711 108, WEST BENGAL

The Leading Manufacturers of :

C.I., C.S., G.M., & S.S. & BRASS - VALVES & COCKS & PIPE SPECIALS I CONFORMING TO VARIOUS RELEVANT I.S. SPECIFICATIONS AN STANDARDS - "CONVEYS ITS' GREETINGS OF THE SEASON TO ALL."

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : রাজাইআটি, পো: অশ্বিনী নগর, কলিকাতা-৫৯ (ফোন : ৫১ হইতে প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্ট হাউস ২১নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণে : পি. কে. প্রিন্টার্স, ১৯নং এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

উজ্জ্বল ভারত

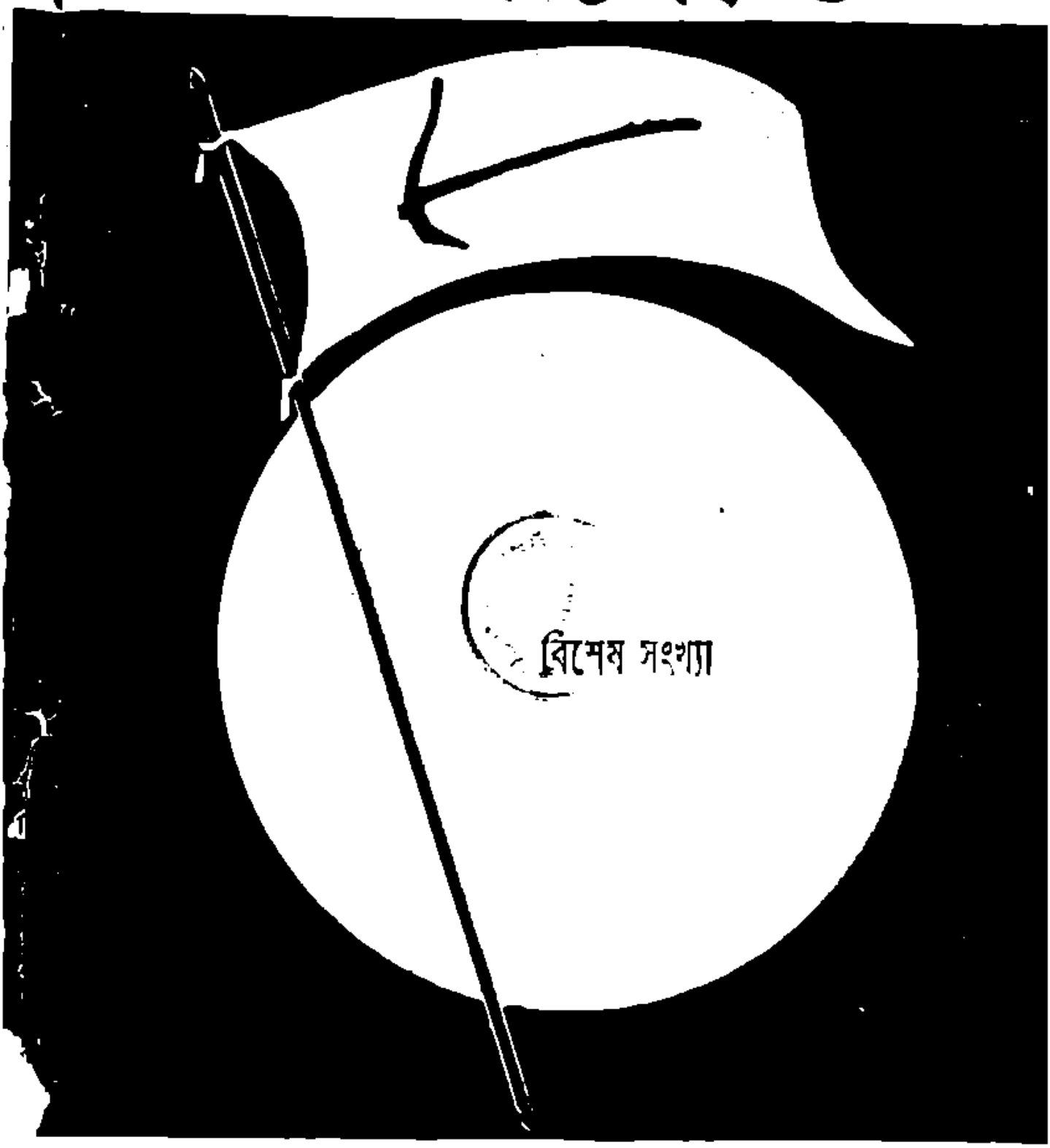

বিপ্লবী দার্শনিক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

Office : 8, KHAIRU PLACE
1ST. FLOOR
C A L C U T T A—700 072
PHONE : Office - 26-6928 P. P.

BAGREE TOOLS

Manufacturers of :

Automobile Components

(Ambassador Parts)

Factory :
GANI KA MATH
NILGANJ ROAD
AGARPARA
24-PARGANAS

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সবত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সংযমী আচরণে উদ্দীপিত করা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোন মানুষকে বিব্রত করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

নং ১২৮৭--১৮ তাং ১৩/৯/৭৯

With Best Compliments of :

Phone : 77-2481

M/s. APEE ENGINEERS

A Small Scale Unit Regd.

MANUFACTURERS & CONTRACTORS

OF :

RAILWAY SPARE PARTS & COMPONENTS ETC.

8, Sourin Roy Road,
Behala, CALCUTTA-700034

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সদা পাঠ্য গীতা	১·৭০	**শ্রীনীলিমা ঘোষ** এম. এ. বি. টি.	
বৃহৎ পকেট গীতা	২·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০	ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
সুলভ পকেট গীতা	১·০০	কর্মযোগী	৩·০০	মানুষের মত মানুষ	১·০০
পদ্যগীতা	৩·০০	ভারত আত্মার বাণী	৭·৫০	বিশ্বাসঘাতক	৩·০০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২·০০	Soul of India Speaks	7·00	**ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের**	
সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.				শরীর ও শক্তি	৬·০০
ব্যায়ামে বাঙালী	৫·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৪·৫০	সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪·০০
বাংলার কবি	৬·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০	ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী , ● ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

উৎসব ভারত

৩২ বর্ষ
৮ম-৯ম সংখ্যা
ভাদ্র-আশ্বিন '৮৬

সূচীপত্র

নমো নমঃ | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ২৮৩
পুজোর কথা | সম্পাদকীয় | ২৮৪
বিশ্ব শিশুবর্ষের ভাবনা | গৌর চন্দ্র সাহা | ২৮৫
ক্যারিবিয়ান কোরা | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ২৮৯
চেরাপুঞ্জি | মন্মথ রায় | ২৯৬
মানুষের মন | মীরা দেবী | ৩০৫
বন্দেমাতরম্ ও বঙ্কিমচন্দ্র | স্বপনবুড়ো | ৩৫৫
টাইম | হিমাংশু সেন | ৩৬৯

ধারাবাহিক রচনাগুলি এই বিশেষ সংখ্যায় দেওয়া হয় নি। আগামী সংখ্যা থেকে আবার সেগুলি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
বিশেষ-সংখ্যা
মূল্য : তিন টাকা মাত্র
বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

নমো নমঃ

দেবগণ হিমাচলে গেলেন এবং সেখানে দেবী বিষ্ণুমায়ার স্তব করিলেন। "যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা···যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ···যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা ··যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেন··· ক্ষুধারূপেন ···তৃষ্ণারূপেন ··জাতিরূপেন সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।" যিনি দেবী বিষ্ণুমায়া, তিনিই গীতা-ভাগবতে 'যোগমায়া'; গীতায় ইনি 'আত্মমায়া' শব্দেও শব্দিতা। হিন্দুদর্শনে মায়া মহামায়া ও যোগমায়া একার্থবাচক নহে। ঐ তিনটি শব্দ ঘনত্বের তিন পর্যায়ের দ্যোতনাই করে। ব্রহ্মের শক্তি মায়া, পরমাত্মার শক্তি মহামায়া এবং ভগবানের শক্তি হইতেছেন যোগমায়া। ভগবান যোগমায়ার উপাশ্রয়েই রাসলীলা করিয়াছিলেন, মায়া বা মহামায়ার আশ্রয়ে রাস সম্ভব নয়। মায়ার স্তরে এই সৃষ্টির ব্যবহারিক মূল্য ছাড়া অন্য কোন মূল্যই থাকে না, ব্রহ্মজ্ঞানে তাই জগৎ মিথ্যা। মায়া হইতেছেন ভগবান পুরুষোত্তমের যান্ত্রিকী (mechanical) প্রকৃতি; আর যোগমায়া হইতেছেন ভগবান পুরুষোত্তমের জীবনভূতা পরাপ্রকৃতি (organic nature)। মায়ার স্তরে পুরুষোত্তমই 'ব্রহ্ম' পদবাচ্য; যোগমায়ার স্তরেই মাত্র তিনি ভগবান পুরুষোত্তম। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী পর্যায়ে রহিয়াছেন পুরুষোত্তমের মহামায়া আশিঙ্গিত পরমাত্মরূপ। ইহাই বিভূতির ক্ষেত্র, ঐশ্বর্যের ক্ষেত্র। মায়ার স্তরে 'বুদ্ধি'-র কোনও পারমার্থিক মূল্য নাই; কাজেই ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু প্রতি সাধকের পক্ষে নিদ্রা-ক্ষুধা-ছায়া-শক্তি-তৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রান্তি পর্যন্ত সকলই হেয় অতএব নিরোধযোগ্য; অথচ চণ্ডীর দেবতারা তো প্রাণ খুলিয়া ঐ সব বৃত্তিকে দেবী জ্ঞানে স্তব করিয়াছেন, উহাদের সর্বাত্মক রূপের সামনে পাঁচ পাঁচটী বার মস্তক অবনত করিয়াছেন। তিনি যেমন 'চেতনা' ইতি অভিধীয়তে, তেমনি তিনি সর্বভূতের বুদ্ধিও বটেন, সর্বভূতের নিদ্রাও বটেন, সর্বভূতের ক্ষুধা-তৃষ্ণাও বটেন, সর্বভূতের সর্ব বৃত্তিও বটেন। সর্বভূতের ভ্রান্তিরূপে আবার তিনিই সংস্থিতা। তাঁহাকে শুধু 'চেতনা' বলিয়া অভিহিত করিলেই চলিবে না, তিনি যে অচেতনও। তাই তিনি সর্বভূতের নিদ্রা। একাধারে তিনি চেতনা ও অচেতনা, তিনি একাধারে বুদ্ধি ও ভ্রান্তি। তিনি একাধারে অতি সৌম্যা ও রুদ্রা বলিয়াই তিনি 'জগৎপ্রতিষ্ঠা'। ... কিন্তু একান্ত ব্রহ্মজ্ঞান তো অগতি; সেখানে জগৎ কোথায়? একমাত্র যোগমায়ার স্তরে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই স্থিতিগতির সম প্রতিষ্ঠা, জগৎ-প্রতিষ্ঠা। এই যোগমায়ার উপাসনা তখনই সম্ভব হয় সাফল্যমণ্ডিত হয় যখন মানুষ তাহার জীবনের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় ও তুরীয়াতীত স্তর দ্বারা নমস্কার করে --

Sri Sri Thakur Anukulchandra Satsang Ashram Collection

সম্পাদকীয়

পূজোর কথা

বছর ঘুরে পূজো আসে। লোডশেডিং-এর দিনেও আলোক-সজ্জার বাহার, সারারাত ঘুরে বেড়িয়ে পূজো-দেখা, জামা-কাপড়ের জৌলস, হৈচৈ এবং আরও কিছু—এই হয়ে গেল আজকের দিনের মানুষের কাছে পূজো। রেডিয়োতে এই খবরই ফলাও করে প্রচারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এ রকম পূজোয় জাতির জীবনে কি সার্থকতা এনে দিচ্ছে? এই পূজোর আসা-যাওয়া দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য লাভবান হয়, জাতির পক্ষে সেটা প্রয়োজন, কিন্তু জাতি আর কি লাভ করে? শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠার তো বালাই-ই নেই। আর মন্ত্রের অর্থ না জানলে এবং সেই অর্থ দিয়ে জীবনকে পুনর্গঠন না করলে শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বা স্মৃতিকে কতটুকু কি ফল দেবে? আচার অনুষ্ঠানের অর্থ জীবনে না আনতে পারলে সে আচার অনুষ্ঠান জাতির পক্ষে তো কল্যাণপ্রদ নয়।

মায়ের পূজায় মাতৃ-চরিত্র লাভের কথা ছিল। তিন দিনের পূজায় মায়ের কি চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে? জীবনের বিভিন্ন অসুরকে বধ করে জীবনকে, সমাজকে নতুন করে সৃষ্টি করার কৌশল আয়ত্ত করাই এই মাতৃ-পূজায় শেখবার কথা ছিল। ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রকে মাঝে মাঝেই নূতন করে সৃষ্টি করতে হয়। এই নূতন সৃষ্টির পথে অতীতের সু কু সংস্কার প্রচণ্ড বাধা। ভালই হোক মন্দই হোক অতীতের পেছো খুব শক্ত। পূজার প্রথম দিনে সু ও কু সংস্কাররূপ মধুকৈটভ নামের দুই অসুরকে বধ করতে হবে। যে অতীত নূতন সৃষ্টির পথে বাধা দেয় তার নাম মধুকৈটভ। দ্বিতীয় দিনে বিচ্ছিন্নতার অসুর মহিষাসুরকে বধ করে সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ গড়তে হবে যাতে সকলের স্থান—বিশেষ কোন শ্রেণীর নয়। সে সমাজে বিশ্বের যে যেখানে আছে সকলে এসে মিলবে, সেখানে ধনী দরিদ্র নেই, উচ্চ নীচ নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই। বিচ্ছিন্নতার অসুরকে বধ করতে ব্যক্তি-শক্তিতে কুলোবে না—কোন এক দেবতা মহিষাসুরকে বধ করতে পারে নি। সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি যে মাতৃ-শক্তি বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেই ব্যক্তির অতীত, সেই সঙ্ঘবদ্ধ মাতৃশক্তি দিয়েই এই বিচ্ছিন্নতার অসুরকে বধ করতে হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে অনন্ত কাল হাতাহাতির সম্পর্ককে গোড়ায় স্থাপন করে কোন মানুষের সমাজ তৈরী সম্ভব নয়। তৃতীয় দিনে ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রতীক শুম্ভনিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বধ করতে হবে ভোগাকাঙ্ক্ষার উপরে উঠে, সেবা ও ভজনার বুদ্ধি ও মন নিয়ে সংসারের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে ব্যবহার চালাতে হবে—ভোগ করার বুদ্ধি নিয়ে নয়। যে-কোন শক্তি কেন্দ্রীভূত হলেই তার মধ্যে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়—বিশ্বের এই ভোগাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে। এই ভোগাকাঙ্ক্ষাই সমস্ত সৃষ্টিকে ব্যর্থ করে দেয়—একে রূপান্তরিত করতে হবে ভজনা ও সেবাবুদ্ধিতে। পরিষাণ বড় কথা নয়—অনেক থাকলেই ভোগাকাঙ্ক্ষা আসে, অল্পেতে আসে না এটা একেবারেই ভুল। ভোগাকাঙ্ক্ষা অন্তরের মানসিকতায়। সেইটা বদলে সেবার মন জাগ্রত করতে হবে—তাই দিয়ে বধ হবে শুম্ভনিশুম্ভ অসুরদ্বয়।

জীবনের পথে বিভিন্নভাবে বাধাদানকারী সমাজ-রাষ্ট্রের অসুরদের বধ করার কৌশল কি মনোজ্ঞ করেই না সেদিনের জীবন-সাধক উপস্থিত করে গিয়ে ছিলেন! আর সে কৌশল জীবনের এমন এক স্তরের খোঁজ দেয় যার যেমন গভীরতা তেমনি বিস্তার। ব্যক্তিকে সার্থক করেও ব্যক্তি-অতীত এই যে বিরাট গভীর চেতনা সেই মাতৃ-শক্তি আমাদের বোধগম্য হোক, আমাদের মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত হোক—বিশ্বে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। বিভিন্ন অসুর বধ করে ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রে শোষণ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার এতখানি কথাই আমাদের পূজোতে আছে।

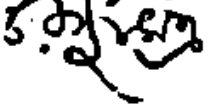

বিশ্ব শিশুবর্ষের ভাবনা

গৌর চন্দ্র সাহা

ইংরাজী ১৯৭৯ সালটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে "আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশ যাতে শিশুদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে নতুন করে অবহিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই আহ্বান। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। এরাই একদিন ফসল ফলাবে, দেশ শাসন ক'রবে, রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে দেশের সম্মান রক্ষা ক'রবে। এরা বড় হবে, ধীরে ধীরে শক্তি সামর্থ্য অর্জন ক'রবে। আমরা বুড়ো হব, ধীরে ধীরে শক্তি সামর্থ্য হারাব। তারপর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষমতার হাত বদল হবে—অবশেষে অস্তিত্বেরই বদল হবে। ওরা থাকবে—আমরা থাকবো না। এই নিয়ম অনাদি কাল থেকে চ'লে আসছে। কিন্তু ওদের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকবো। অমরত্ব অভিলাষী মানুষ তাই সন্তানকে ভালবাসে। সামগ্রিকভাবে মনুষ্য জাতি শিশুদের প্রতি স্নেহপ্রবণ। আমাদের শাস্ত্রে আছে "স্নেহ নিম্নগামী"। কোন্ আদিকালের ঋষিমুখের সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে এ যুগের কবি সুকান্তের ভাষায়—

"এসেছে নূতন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান :
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চ'লে যেতে হবে আমাদের।
চ'লে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

এ অঙ্গীকার আমরা হয়তো মাঝে মাঝে ভুলে যাই। ভুলে যাই আমাদের ভবিষ্যতের কথা। বর্তমান-সর্বস্ব এক হৃদয়হীন অস্তিত্ব নিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তাই বুঝি রাষ্ট্রপুঞ্জের মত বিশ্বহিতকারী সংস্থাকে ঘোষণা ক'রতে হয় এক আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের। সেই বর্ষে নতুন করে আবার সেই অঙ্গীকারকে আরও সততার সঙ্গে, আরও সোচ্চার ক'রে আমরা যেন ঘোষণা ক'রতে পারি এবং তার সার্থক রূপায়ন করতে পারি।

কিন্তু বর্তমান সভ্যতার হৃদয়হীন প্রভাবে আজকের মানুষ বড় বেশী ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর আত্মসর্বস্ব হ'য়ে পড়েছে। তাই সামগ্রিকভাবে আমরা পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনেও ব্যর্থ হয়েছি। এমনি একটা সামগ্রিক অবক্ষয়ের দিনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ নতুন ক'রে ভাবছেন সমগ্র মানব জাতির ভবিষ্যতের কথা। আর সেই ভাবনার ফলশ্রুতি স্বরূপ ঘোষিত হ'য়েছে ১৯৭৯ সাল আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসেবে। হয়তো আরও আগেই এ আহ্বান এলে ভাল হ'ত। কেননা মনুষ্যজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বিষয়ে যা কিছু পরিকল্পনাই নেওয়া থাক না কেন শিশু থেকেই তার আরম্ভ হওয়া উচিত।

এক সুন্দর সুন্দর কল্যাণ ধর্মী সমাজ গ'ড়ে তুলতে চ'লে সে ভাবনার অঙ্কুর আজকের শিশুদের মধ্যেই উপ্ত করতে হবে। কারণ কচি মনেই তার প্রভাব বেশী ক'রে পড়বে। ডাঁটো মনগুলি যে অনেক আগেই কপটতায় কলুষিত হ'য়ে গেছে। তারা এখন বিশ্বাসের অযোগ্য। এক হাতে তারা শান্তির অলিভ পত্র দোলায়, অন্য হাতে শানায় বিষাক্ত ছুরিকা। তাদের দিয়ে এ পৃথিবী সুন্দর ক'রে গড়া যাবে নি। বরং তার অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে বিপন্ন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তারা এ পৃথিবীকে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। দিয়েছে অনেক মৃত্যু, শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা। আজকের যারা বড়ো তারা বড়ো হয়েছে পরিপক্ক হয়েছে এক সর্বাত্মক অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে। তাদের চিন্তার পাকে পাকে রয়েছে হিংসা, আত্মপরায়ণতা তথা সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতা বোধ। সেখানে প্রেম, সহানুভূতি, কল্যাণবোধ ভালো করে দানা বাঁধতে পারে নি। তাই নতুন করে যা কিছু করতে হবে তা একেবারে শুরু থেকে। আমাদের অস্তিত্বের প্রারম্ভ থেকে। শিশুরা তাই।

কিন্তু এ বড়ো সহজ কাজ নয়। এই বিরাট কর্মকাণ্ড কোন্ বিন্দু থেকে শুরু করা হবে সেটাও ভাবনার কথা। শিশুদের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে গেলেই যে কয়টি সূত্র সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তা হ'ল শিশুর পিতা মাতা,

পরিবেশ এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক পরিস্থিতি। এর কোনওটাকেই বাদ দিয়ে শিশুর কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। এ দেশে এর মধ্যে যেটা সব চাইতে প্রকট তা হ'ল দারিদ্র্য ও অশিক্ষা। শিশুকে এ পৃথিবীতে নিয়ে আসার পরিণতি ও প্রকরণ সম্বন্ধে অধিক সংখ্যক পিতামাতার ভাবনা ও জ্ঞানের সামগ্রিক অভাব এ ব্যাপারে একটা পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। একটি শিশুকে পৃথিবীতে আনবার আগেই যে প্রসূতির স্বাস্থ্যের একটা মান রক্ষা করা প্রয়োজন এবং তার প্রসব ও প্রাথমিক পরিচর্যার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এ বিষয়ে পরিবার ও রাষ্ট্রের যৌথ দায়িত্ব থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য এই যে এদেশের রাষ্ট্রনেতাগণ এ বিষয়ে উপযুক্ত সমীক্ষার সাহায্যে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের চেয়ে শিশুসুলভ কলহে নিমগ্ন থাকার জন্য এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষটিকে বিশেষ করে বেছে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জ তার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে এই শিশুবর্ষে মানবাধিকার সনদের যে সব ধারাগুলি শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেগুলি সম্বন্ধে এক নিবিড় কার্যক্রম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশু কতকগুলি বিশেষ অধিকারের অধিকারী। সেগুলি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নরূপ :

(১) শিশুদের শারীরিক মানসিক নৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির জন্য আইন এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে এইসব ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রত্যেক শিশুরই জাতি এবং নাম গ্রহণ করবার অধিকার থাকবে।

(৩) প্রত্যেক শিশু এবং তার জননীর সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত হবে। যাতে প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তার জন্য শিশু এবং তার মায়ের উপর বিশেষ নজর রাখা হবে।

(৪) যে সব শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোন অসুবিধা থাকবে, তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) যেসব শিশু কোন পরিবারভুক্ত নয় অথবা দুর্গত পরিবারের সন্তান সেইসব শিশুর সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) প্রত্যেক শিশুকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৭) ত্রাণ এবং রক্ষা-ব্যবস্থা যেখানে করা হবে, সেখানে শিশুদের অগ্রাধিকার থাকবে।

(৮) অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাহানিকর কোন কাজ করতে দেওয়া হবে না। যাতে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি না হয় এমন কোন কাজ করা থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে। ইত্যাদি···

আমাদের এই বিরাট দেশে শিশুসংক্রান্ত সমস্যা একান্ত ভাবেই বিরাট এবং বহুবিধ। ষাট কোটি লোকের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে প্রতি সেকেণ্ডে এক একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু পরিবেশ এবং পরিস্থিতি এদের জন্য এতই প্রতিকূল যে জন্মের প্রথম বছরের মধ্যেই প্রতি হাজারে অন্তত ১১২টি শিশুর মৃত্যু হয়। শুধু অপুষ্টির ফলেই প্রতি বছর শিশু মৃত্যুর পরিমাণ এদেশে প্রায় ১২ লক্ষ। শুধু কি অপুষ্টি? বিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষের মস্তিষ্ক গঠনের ব্যাপারে শৈশবের কয়েকটি বছরে প্রোটিন গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় প্রোটিনের অভাব ঘটলে মেধা ও ধীশক্তি উপযুক্তভাবে গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু কোথায় প্রোটিন? দেশের বৃহৎ অংশই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। সেখানে ঘরে ঘরে চলছে অর্ধাহার না হয় নৈতিক বৈধব্যদশা—একান্তভাবে নিরামিষ। প্রোটিন কোথায়? সমগ্র জাতিই বুঝি মেধাহীন এক ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে!

বহু সন্তানের জন্ম এদেশের এক মৌলিক সমস্যা। অসংখ্য শিশুমৃত্যুর কারণকে অতিক্রম করেও এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আমাদের পরিকল্পনাকারীদের সমস্ত সাধ্যসীমা লঙ্ঘন করে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে চলেছে। শিশু সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ এখানেই হওয়া উচিত।

শিশু-সমস্যাকে প্রধানতঃ দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা

চলে। প্রথমতঃ পুষ্টি বা স্বাস্থ্য সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সমস্যা। এই প্রথম স্তরের সমস্যাটি ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে স্বভাবতঃ ভাবে প্রকট। বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন। প্রতি জনপদে নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ, স্বল্প ব্যয়ে সহজলভ্য শস্য, সব্জী প্রভৃতি থেকে উপযুক্ত পুষ্টির খাদ্য নির্বাচন ও ব্যবহার সম্বন্ধে অশিক্ষিত বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণকে অবহিত করে তোলা, প্রসূতির জন্য এই খাদ্যের যথোপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন করা, প্রসূতি-কল্যাণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রতিটি প্রসূতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তাকে সুপ্রসবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, প্রতিটি প্রসূতির জন্য সুপ্রসবের সব ব্যবস্থা করা প্রভৃতি শিশুকল্যাণের পক্ষে প্রাথমিক প্রয়োজন। বৃহৎ জনসমষ্টির আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ন চললেই তা পুরোপুরি সার্থকতা অর্জন করতে সমর্থ হবে।

এদেশে শিশুমৃত্যু হারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একে সহনীয় স্তরে নামিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক কর্মসূচী অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে শিশুমৃত্যুকে রোধ করে শুধু কতকগুলো ভগ্ন স্বাস্থ্য দুর্বল দেহ এবং অপরিণত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট নিছক টিকে থাকা মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি করলেই শিশুকল্যাণ তথা মানব কল্যাণের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। গোড়া থেকেই তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শুধু বললেই তো হবে না। স্বাস্থ্য প্রকল্পের বাইরেও আরও কিছু সামাজিক ও মানবিক সমস্যা এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এ সমস্ত রূপায়নের মূল ধারক বাহক হল প্রতিটি পরিবারের কর্তা। কিন্তু তার পক্ষে শুধু শুভেচ্ছার বিকাশই যথেষ্ট নয়—আর্থিক সঙ্গতিও প্রয়োজন। তাই প্রথমেই যেটা প্রয়োজন হবে সেটা প্রতিটি পরিবারের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত মৌল সর্বনিম্ন আয় নিশ্চিতকরণের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ। তার পরেই আসে বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা (বিশেষ করে নারী নিরক্ষরতা) দূরীকরণের বাস্তব সম্মত সময়বদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ। এর সঙ্গে ব্যাপক ভাবে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করলেই মোটামুটি ভাবে শিশুস্বাস্থ্য রক্ষার পটভূমিকা প্রস্তুত হয়ে যায়। এর পরে আসে কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা। এ বিষয়ে শিশুদের দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়। প্রাকবিদ্যালয় শিশু ও বিদ্যালয়গামী শিশু। এ দুয়ের মধ্যে পুষ্টির ব্যাপারে প্রাক বিদ্যালয় শিশুদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন এবং সেটাই হয়তো সব চেয়ে কঠিন। এ ব্যাপারে প্রথম প্রয়োজন প্রতিটি পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের এক জাতীয় প্রকল্প। তার পর শিশুর প্রয়োজনীয় দুগ্ধ সরবরাহের প্রকল্প। অবশ্য এর মধ্যে মাতৃস্তন্য দানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রতিটি প্রসূতিকে অবহিত করাও প্রয়োজন। তৃতীয়, শিশুর উপযোগী সুলভ এবং সুলভ খাদ্যের ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। স্থানীয় শস্য ও সব্জী ফল প্রভৃতি থেকে শিশুর উপযোগী খাদ্য প্রস্তুতের ব্যাপক শিক্ষা ও সেই সব সামগ্রী স্বল্প মূল্যে যাতে পাওয়া যায় সে জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণও প্রয়োজন। এর পশ্চাদপটে অবশ্যই ব্যাপক কৃষি গবেষণা ও ফসলের পরিকল্পনা থাকা চাই। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

অবশ্য শুধু সরকারের উপর নির্ভর করলেই চলবে না। এ ব্যাপারে বেসরকারী প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে। সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় জনসাধারণের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসতে পারে। এই বিশাল দেশে এ ছাড়া এই বিরাট কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করা সম্ভবও হয়তো নয়। এদের কর্মোদ্যমের কয়েকটি সম্ভাব্য দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে সম্প্রতিকালে জাতীয় চেতনায় চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটেছে। একজাতীয় ভ্রান্ত আন্ত-জাতিকতাবাদ আমাদের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ

মনকে একান্ত ভাবে বিভ্রান্ত করে চলেছে। জাতীয় চরিত্রেরও হয়েছে চরম অধঃপতন। অথচ দীর্ঘ পরাধীনতার শেষে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই প্রাচীন জাতির সম্মুখে নব জাগরণের প্রচুর সম্ভাবনা এসেছিল। তাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হয় নি। আমরা আরও দেখতে পাই যে দেশের ভাগ্য তথাকথিত শিক্ষিত ভারতীয়েরা ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞানেরও অধিকারী নন। এমন কি বিদেশে গিয়ে এ বিষয়ে বিদেশীদের ঔৎসুক্যভরা প্রশ্নের কোনও সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেন না। ফলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা খুব স্পষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল হতে আমরা সাহায্য করতে ব্যর্থ হই। এতে আমাদের মর্যাদা হানি হয়। এই অধঃপতনের গতি রুদ্ধ করে জাতীয় জীবনে নব জাগরণের সূচনা করতে হলে এক বিরাট কার্যক্রম আরম্ভ করতে হবে আজকের শিশুদের নিয়ে, কেননা শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত। দলীয় রাজনীতির সংস্রবমুক্ত সত্যিকারের মানব দরদী ও দেশপ্রেমিকদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারাই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে চরিত্রগঠনের ও কল্যাণধর্মী কর্মের অনুপ্রেরণার জন্য যথেষ্ট উপকরণ রয়েছে। কিন্তু সেগুলি সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপিত করার কোনও সুসংবদ্ধ চেষ্টা এ যাবৎ বিশেষ একটা হয় নি। এ বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলি গ্রহণের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১) বিদ্যালয়ের বিভিন্ন মানের উপযোগী এক সুসংবদ্ধ সাঙ্কেতিক পাঠক্রমের সংকলন। প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ, মনীষীদের বাণী, শাস্ত্রগ্রন্থের সুনির্বাচিত অংশের সহজবোধ্য অনুলেখন প্রভৃতি সম্বলিত এই পাঠক্রম আমাদের সুকুমারমতি বালক বালিকাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। এতে করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে প্রত্যেক ছাত্র ভারতীয় আদর্শ ও জীবনবোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট ও যথাসম্ভব পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ ও বিশ্বের প্রতি স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। শিশুদের রুচির এই সর্বাত্মক বিকাশের কার্যক্রমের মধ্যে আরও থাকবে তাদের পরিচ্ছন্নতার বোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নীকরণ, সহনশীলতা, স্বজাতিপ্রেম তথা বিশ্বনাগরিকতা বোধের বিকাশ প্রভৃতি মৌলিক হৃদয় বৃত্তি জাগরণের প্রচেষ্টা।

(২) ভারতীয় শিশুদের সুস্থ মানসিকতা গঠনে সহায়ক বহু তাত্ত্বিক সহজবোধ্য পুস্তক ও মাসিকপত্রের প্রকাশনা। শিশু সাহিত্য সেবী, চিন্তাবিদ্, সমাজ সংগঠক, শিক্ষাবিদ শিল্পী প্রভৃতির মধ্য থেকে যাঁদের কর্মোদ্যম সন্দেহাতীত ভাবে গঠনাত্মক, কল্যাণধর্মী এবং শিশু চরিত্র গঠনের পক্ষে সহায়ক তাদের নিয়ে কর্মীগোষ্ঠি গড়ে নিয়ে এ সম্বন্ধে কাজে নামা যায়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্যে কোন্ বয়সে কোন্ মাধ্যমে এবং কি পরিমাণে এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান শিশুমনে প্রবেশ করানো সম্ভব ও সমীচীন সেইভাবে বিচার করে এবং উপযুক্ত ভাবে উপস্থাপিত করে মনোজ্ঞ সচিত্র কাহিনী ছবি, ছড়া, গল্প প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে এক সুপরিকল্পিত শিশুগঠনের কাজ এই পত্রিকার মাধ্যমে করা হবে। পুস্তকগুলিও হবে সরল সহজবোধ্য ভাষায় সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সচিত্র বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের অংশবিশেষের উপযুক্ত উপস্থাপন। সরকারের আনুকূল্যে এই পত্রিকা ও পুস্তকগুলি হবে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যের এবং দরিদ্র জনগণের মধ্যে সেগুলি বিনা মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে।

উপরোক্ত কার্যক্রম সফল করতে বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি বা ট্রাষ্ট গঠন করে এক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে এই এক শিশুবর্ষে শিশু সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব হবে এটা একান্তই দুরাশা। কিন্তু এই শিশুবর্ষে যদি শিশুদের প্রতি করণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমাদের একটা সচেতনতা আসে তবেই আগামী বছর গুলিতে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে। ১৯৭৯ কে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ রূপে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার সার্থকতা সেখানেই।

কবিতা

॥ ক্যারিবিয়ান কাব্য ॥

অনুবাদক : নচিকেতা ভরদ্বাজ

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণপূর্বতম প্রদেশ ফ্লোরিডা। এবং ফ্লোরিডার দক্ষিণপূর্বে, অতলান্ত মহাসাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর এবং মেক্সিকান উপসাগরের সঙ্গমস্থলে কাছাকাছি দ্বীপময় কয়েকটি ছোট ছোট দেশের সমষ্টি। সাধারণভাবে এদের বলা হয় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা দেশমালা। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এদেরই একটি দেশ বা খেলাধূলার আসরে, বিশেষ করে ক্রিকেটের জন্য পৃথিবী-খ্যাত হয়ে আছে। হাইতি, জ্যামাইকা, বার্বাডস, পুয়ের্তো-রিকো, পোর্ট অব স্পেন, মার্তিনিক, ফরাসী গিনি, ডোমিনিকা প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট দেশ আছে এখানে। শুধু খেলাধূলায় নয়, সাহিত্য-সৃষ্টিতেও এইসব দেশ কৃতিত্বের অধিকারী। বিশেষ করে এদের কাব্যে যে অদম্য স্বাজাত্যাভিমান, নিসর্গ-প্রীতি এবং আত্মানুসন্ধান ও শ্বেতকায় প্রভুদের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যে তীব্র ধিক্কার প্রতিবাদের আগ্নেয় কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—অকপট উচ্চারণে এবং আন্তরিকতার ঐশ্বর্যে তা ভাবানুরণনের পরও সহজেই পাঠকচিত্ত স্পর্শ করে। অধিবাসীরা অধিকাংশই মূলতঃ নিগ্রো। দেশী ভাষার সঙ্গে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাও এখানে বিশেষ প্রচলিত। এবং এইসব ভাষায়ই এঁরা সাহিত্য রচনা করে থাকেন। আফ্রিকার এবং আমেরিকার নিগ্রো সাহিত্যের মত এঁদের সাহিত্যও নবজাগরণের উদাত্ত গানে মুখর। নিগ্রো জীবনের সুখ দুঃখ, স্বপ্ন সাধ, আশা আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল আলেখ্য (ম্যাগনা কার্টা) রচনা করে চলেছেন এঁরা। এবং নিগ্রো সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের অবদানও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বরং বলা চলে এই ক্যারিবিয়ান সাহিত্য ছাড়া পৃথিবীর নিগ্রো সাহিত্য অপূর্ণ। এই ক্যারিবিয়ান কাব্য-সাহিত্য থেকে কিছু কিছু গীতি কবিতা এখানে উজ্জ্বল ভারতের পাঠকদের জন্য অনুবাদের মাধ্যমে পরিবেষণ করা হচ্ছে।]

জ্যামাইকার কবি **এডল্‌ফ্‌ রবার্টস**
[ADOLPHE ROBERTS]-এর কবিতা

জ্যামাইকা ॥

সে এক কৃষাণী মাত্র। তবু যেন দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণী
ঐশ্বর্যে আলোকে রূপে অসামান্যা। জীবন রচনা।
জ্যামাইকা তার নাম—স্থিরতম প্রতিষ্ঠায় উচ্চশীর্ষ
সমস্ত শত্রুর আক্রমণে।
মুখ তার অরণ্যানি প্রস্ফুটিত অর্কিডের বর্ণসমারোহে
অপরূপ হয়ে আছে, আরক্ত হিবিসকাস যেন স্থির
বহ্নিশিখাগুলি
ছড়িয়ে রয়েছে তার পথে পথে আলো জেলে দিতে :
স্বপ্নে ও সঙ্গীতে এক অনন্যা পৃথিবী।
প্রান্তরে উদ্যানে তার কমলা ও কফির মুকুলে
অজস্র ফুটে আছে নক্ষত্র-খচিত রূপকথার আকাশ
রহস্য-নিবিড় নম্র রূপায়ত অঙ্গনে প্রাঙ্গণে।
সে সেই ভূমিতে আজো দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর
পিতৃপিতামহ
যে মাটির অন্তরালে নির্জনে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে রয়েছে
যে ঘুম কখনো কোনোদিন ভাঙবে না ;
আরণ্য সৌন্দর্যে দৃপ্ত সজল সম্পন্ন তনুর প্রতিমা
উদাত্ত পূর্ণতার পরিপ্লাবি অপোহত আনন্দে মহান
সম্রাজ্ঞী গৌরবে মুক্ত কী মহিমময়ী !

———

হাইতির কবি **এমিল রোমার**
[EMILE ROUMER]-এর কবিতা

তুলনা ॥

আমার এ হৃদয়ের নয় পীত পূর্ণতা, পরিপক্ক ট্যাঞ্জারিনের
মতন পীবর দুটি নয় স্তন পরিপূর্ণ—তোমাকে আমার
কী যে ভালো লাগে—কী যে সুস্বাদ নিবিড়
নরম কাঁকড়ার মাংস সহযোগে বেগুনের চচ্চড়ির মত,
কাল মসলার সঙ্গে তুমি যেন মিশে তাজা সুস্বাদ কলিজা,
মটরশুটির ঘুগ্‌নি, সয়াবিনের পুডিং কিংবা ঘুমের ওষধি
মিশ্রিত চায়ের মত তোমার সান্নিধ্য, এই তুমি।
তুমি যেন বিদেশ থেকে উৎকৃষ্ট চালানী মাংস আর
শুষ্ক-ভবন এই সমর্পিত আমার হৃদয়।
চাটনির সঙ্গে যেন বিরিয়ানীর সুগন্ধ নিবিড়,
অথবা সুস্বাদ তাজা চানাচুর
মসলায় মুগ্ধ মনোহর,
অথবা টুকটুকে তাজা বাচা মাছ—অপরূপ
রসনা-রোচন ॥

মার্টিনিকের কবি **গিলবার্ট গ্র্যাসিয়ান্ত**
[GILBERT GRATIANT] এর কবিতা

নিগ্রোর আত্মকথা ॥

অজস্র বৃক্ষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে এ পৃথিবী,
আকাশ প্রচ্ছন্ন এক ব্যাপ্ত ঝড়ে—ঝড়ের সঙ্কেতে,
উষ্ণ মাটিতে স্যাখো জলধারা উপচে উঠছে ধীরে
যেখানে ঘুমিয়ে থাকে অবোলা পশুরা,
এবং নিগ্রো জানে
দীর্ঘ তার পরিচিত পরিচিত আত্মীয়তা ছুঁয়ে
অন্ধকার অতিক্রান্তাগুলি—
বোঝে সে জলের ভাষা, তারাদের সঙ্গে তাদের
সমস্ত সংলাপের মৃদু উচ্চারণ,
ঘাতাসের অভীপ্সা ও অগ্নির আবেশ।
মানুষের নামে ধন্যবাদ,
তোমার যা দিয়েছ মানুষেরে, তার জন্য,
দুহাতে অঞ্জলি ভরা তোমাদের
এবং আনত তোমরা নতজানু
ক্রীতদাস অথবা সৈনিক,
বিশ্বের পাদপীঠে উৎসর্গিত তোমরা রেখেছ
তোমার শ্রমের ফল, উৎসাহের দীপ্ত ফলশ্রুতি
এবং নিহিত শক্তি ছন্দোময় তোমাদের উদাত্ত
প্রাণের নির্যাস।

নিকোলস গুথেন
[NICOLAS GUITHEN]-এর কবিতা

অভিজ্ঞান ॥

তোমার মাথার চেয়ে তোমার উদর অনেক বেশি জানে
এবং তোমার উন্নত নিবিড় ঘন দৃপ্ত উরুদ্বয়ের মতই
বলিষ্ঠ দৃঢ় কালো লাবণ্যে রূপময়
ঐশ্বর্যদীপ্ত তোমার ঐ উদাত্ত অনাবৃত দেহ-প্রতিমা।

তোমার তনুতে তনুতে যেন আরণ্যক অন্ধকার;
উদাম অরণ্যই তোমার ঐ রূপের—
রহস্যময় নগ্ন রূপের যথার্থ প্রতীক,
গলায় দোলানো ঐ লাল পলার মালায়
তোমাকে দেখে আদিম অরণ্যের কথাই মনে পড়ে—
বাঁকানো চ্যাচা সোনার ঐ লাল মজবুত কলিতে
আর মোটা মাদুলিতে:
এবং ঐ হিংস্র কালো কুমীর
সে যেন তোমার চোখের জানোয়ীতে সাঁতার কাটছে!
এবং সব মিলিয়ে তোমার ঐ স্বাস্থ্য স্বচ্ছল
শক্ত বলিষ্ঠ নিবিড় নগ্ন শরীর
সে যেন ফেলে আসা—ছেড়ে আসা আমাদের
উদাম আরণ্যক পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

জামাইকার কবি মারকাস্ গার্ভে
[MARCUS GARVEY] এর কবিতা

আনন্দ প্রতিমা ॥

সৌন্দর্যের কালো রাণী, তুমিই দিয়েছ বিশ্বে
এই সব বিচিত্র বর্ণের

অপরূপ আনন্দময়তা : সমস্ত নারীর মধ্যে তুমিই একক
যশস্বিনী,—তুমি সম্রাজ্ঞী সুন্দরীতমা শ্রেষ্ঠ পরমা।
সকল রত্নের মধ্যে উজ্জ্বল উজ্জ্বলতমা,
শিরশোভা রত্নের মতন

প্রদীপ্ত ভাস্বর তুমি, আফ্রিকার আনন্দময়ী মহাদেবী
নিসর্গের শুদ্ধ প্রতিমা।

তোমার পবিত্রতম কৌমার্যের প্রেমের মন্দিরে
কালো মানুষেরা আসো নিত্য তারা ধ্যানমগ্ন
তোমার পূজায়।

কারণ তোমার চোখে সেই দীপ্ত পুণ্যরাশি
আলোকিত দিবা সমুদয়,

সর্বাঙ্গে তোমার সেই স্থিরতম পবিত্র সত্যের প্রত্যয়।
আর কাউকে কোথাও আমরা দেখিনি তো এরকম
চীনাংশুকে অথবা কোনো মহার্ঘ্য বসনে ভূষণে

অলংকৃত, পৃথিবীর ইতিহাসে—ধাবমান এ প্রাণের প্রবাহে
প্রাচীন যুগের সেই ঈশ্বরী তেনাস থেকে
পুরাণের পূরবী হেলেন :

কোথাও দেখিনি আমি জীবনের এত শুদ্ধ প্রতিরূপ,
আফ্রিকা, তুমিই আমার সেই অনিন্দ্য ঈশ্বরী
স্বয়ম্বরী পূর্ণ-প্রতিমা

প্রতি কালো অঙ্গে যেন উন্মীলিত আলোর অমৃত ॥

মার্টিনিকার কবি লাইওনেল এ্যাটুলি
[LIONEL ATTULY] এর কবিতা

এবং সে কথা বলল ॥

এবং সে কথা বলল, কথা বলল এবং কথা বলল ॥
বাইরে তখন বরফ পড়ছিল এবং ভীষণ ঠাণ্ডা।
সত্যি এটা দুঃখের যে তারা তোমাকে
এটুকুও দিতে পারে না

সামান্য মাথা বাঁচাবার মত আশ্রয়টুকু পর্যন্ত,
তাদের সভ্যতার অন্য সব কিছুর কথা ছেড়েই দিলাম।
উদ্ধত কাঁচুলির এবং দুর্লভ অন্তর্বাসের সঙ্গে
মোজা বাঁধার ফিতা আর উজ্জ্বল কোমরবন্ধ,
আর কেতাদুরস্ত ফিটফাট আর বোধহীন আত্মতৃপ্তি
আর নিপুণ অজ্ঞানতা
আর অসহায় মৈত্রীর মিথ্যাচার
আর কিছু চটকদার অচেনা শব্দাবলী
আর আনুষঙ্গিক একালের আরো কিছু।
আর তার পরিবর্তে ওরা নিয়ে গেছে তোমাদের
কোমল নমনীয় ধাতব সংবদ্ধ শরীরগুলি,
তোমাদের নৈঃশব্দের আত্মাভিমানী মর্যাদা,
আর সৃষ্টির উপহার হিসাবে
তোমাদের পবিত্র জরায়ু—সমগ্র মানবতার
শ্রেষ্ঠতম ভবিষ্যৎ।
আমি আবার ফিরে পেয়েছি আমার অস্থির অহংকার
আমার প্রতিষ্ঠা তোমার কাঁধের উজ্জ্বল-বিজয়ী প্রতিভায়
তোমার পূর্ণ পবিত্র ঐ উদ্ধত স্তনের অন্তরালে :
সত্যি যে মুখবন্ধ—একটি পুরুষের মাথার
ভার বহনে সম্পন্ন সক্ষম,
একটি মানুষের হৃদয়ের শান্তির পিপাসা
যে মিটিয়ে দিতে পারে—দেয়,
যে পূর্ণ করে দিতে পারে—দেয়—মানুষের
অন্তহীন আনন্দের ক্ষুধাকে
সামান্যতম বিশ্বাসভঙ্গ না করে
সমান্তরাল ছলনার অভিনয় না করে ॥

ডোমিনিকার কবি সলোমে উরেনা ডি হেনরীকুইস্
[SOLOME URENA DE HENRIQUEZ]
এর কবিতা

মুগ্ধতার স্বপ্নভূমি

মুগ্ধতার স্বপ্নভূমি
প্রেমের উদ্যান
প্রথম স্বর্গের সুখ
সৌন্দর্য, আনন্দ অম্লান
এখনো নিসর্গে যার রূপ ধরে আছে।
মনোরম মাঠে মাঠে যার
সহস্র 'অতির' স্বর্গ নন্দিত বিশ্বাসে
জীবনে জীবনে ছিল শান্তির উচ্চারণ।
ভারতীয় পরিবার
বিসকিয়ার বহতা বংশধারা
উর্বরা ভূমিতে তার
সুখী ও সহজ অধিকার
নিরীহ নিরপরাধ তারা
সুখী ছিল স্বপ্নের গভীরে
প্রাণের প্রবাহ তারা চেয়ে দেখত
মুগ্ধ চোখ তুলে।
আত্মার ভিতরে কোনো দুঃখ নেই
ফুল ফোটা নদীটির তীরে
যাথা উঁচু পথ চলা, নেয় নাই তুলে
ঘাড়ের উপরে কোনো কঠিন জোয়াল।
অরণ্যেরা অজস্র বিলাতো
পক্ক ফল সুস্বাদু রসাল,
পাহাড়েরা ফুলের জলসায়
ভরে দিত দূর দিগন্তর।
এবং নদীরা তাদের স্বচ্ছ জল
উদার আতিথ্য ভরা এবং উর্বর
সমুদ্রের গভীর অতল
দিত মাছ হাজার হাজার
অফুরন্ত ধনী সে ভাণ্ডার॥

হাইতির কবি ফিলিপ্পে থোবি মার্সেলিন
[PHILIPPE THOBY MARCELLIN] এর
কবিতা

বিদ্রোহের গান

চিরন্তন একটা ঘৃণার শপথ উচ্চারণ করে
কেতাদুরস্ত ইউরোপীয় ঘিঘি সভ্যতার উদ্দেশ্যে
এখন থেকে আমি তোমার গানই শুধু গাইতে চাই,
বিদ্রোহ, গুলিগোলা আর ধ্বংসের তাণ্ডবের গান
এবং কালো মজবুত কাঁধে কোকোমাচাকের শব্দ,
ল্যাম্বির ডাক, ভূতুর রহস্যময় ইন্দ্রিয়পরতা
এই সব নিয়েই নেশার ঘোরে পাগলের মত
গান গাই আমি তোমার
তিনগুণ রহস্যগভীর এবং উজ্জ্বল স্মৃতিময়তায়
শিল্পিত তোমার সমস্ত ক্লাসিকাল রূপসৌন্দর্যের
ঘোপদুরস্ত ঐশ্বর্য আড়ম্বর ছেটে ফেলে
উলঙ্গ আদিম অকৃত্রিম সুখর বর্বরতায়
আমি মাথা উঁচু দাঁড়াতে চাই
যথার্থই ক্রীতদাসের দুরন্ত বংশধরের মতন :
নতুন এক নবজন্মের সূর্য-সিক্ত উদাত্ত কণ্ঠস্বরে
আমি গান গাইতে চাই
আমি গান গাইতে চাই তোমার পচা গলা বিকৃত
বীভৎস ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার॥

কিউবার কবি **জোস্ রড্রিগ্স্ মেন্ডেস্**
[JOSÉ RODRIGUEZ MENDEZ] এর কবিতা

পাশবিক

দালালের উদ্যত নির্মম চাবুক
ভয়ের দারুণ দণ্ড উচিয়ে—পিছনে পাশে
আমাদের শায়েস্তা করেছে :
যাতে আমরা বলগা-বদ্ধ ঘোড়াদের দীন বশ্যতায়
অভ্যস্ত বাঁধা সড়কের
প্রচলিত পথ ধরে চলি—
অসহায় ষাঁড়েদের মত :
আমরাও মরে গেছি—মূল্যবদ্ধ ক্রীত জানোয়ার
দাসব্যবসায়ীদের সুতীব্র অঙ্কুশে বিতাড়িত
আহত রক্তাক্ত আমরা রজ্জুবদ্ধ স্কন্ধ মৃতপ্রাণ,
এবং বীভৎস ক্ষতে আক্রান্ত আমাদের
অসহায় কানে কানে
সকরুণ সান্ত্বনা দিতে
বলতে অভ্যস্ত ওরা—স্বর্গ আর ঈশ্বরের কথা।

আজো আমরা রয়ে গেছি সেই একই ঘৃণ্য ক্রীতদাস।
কারণ এখনো আমরা স্বেদে আর অশ্রুতে স্নাবিত
শৃঙ্খলিত বদ্ধ হাত ঊর্ধ্বে তুলে কাঁদি
এক টুকরো রুটির জন্য
আর কোনোমতে মাথা গোঁজবার ঠাঁই
আর সামান্য ঘিন মজুরির কয়েকটি করুণ পয়সার
ভিক্ষালাভের দীন প্রত্যাশায়।

হাইতির কবি **জ্যাক্স্ রোমাঁ**
[JACQUES ROUMAIN] এর কবিতা

গিনির অভিমুখে মন্থর পথ ॥

এই তো সে পথ ধীরে চলে গেছে গিনির ভিতরে
মৃত্যু তোমাকে সেই পথ থেকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে
অন্য দিকে : এই তো বীথিকা গড়া শাখা প্রশাখায়
বৃক্ষরাজি, অরণ্যানি, চাওয়ার নিবিড় শব্দ শোনো
দীর্ঘ তার উচ্ছ্বসিত অনন্ত চুলের ত্রিধামার গভীরে।

এই তো সে পথ ধীরে চলে গেছে গিনির ভিতরে
যেখানে তোমার পিতৃপিতামহ এখনো অপেক্ষা করে আছে
সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে : পথে যেতে যেতে তারা কথা
বলেন শোনো পরস্পর, অপেক্ষা করছেন,
এই তো সময় যখন উচ্ছ্বসিত নদীরা মর্মরিত
ঘাড়ের মাথার মত নদীরা ছড়িয়ে।

এই তো সে পথ ধীরে চলে গেছে গিনির ভিতরে
কালো দেশের কালো মানুষেরা হয়তো বা তোমাকে তেমন
জানাতে পারবে না তারা উজ্জ্বল স্বাগত :
পাখীর চিৎকারে বিদ্ধ ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশের নীচে
চারিদিকে ইতস্তত: নীল নীল নদীর দৃষ্টির
মাঝ খানে—: যেখানে বৃক্ষরাজি তাদের অরণ্য নীল
আঁখি-পল্ল তুলে
আলোকে আড়াল করে অবিরল চেয়ে আছে,
নির্জন সেখানে
নিবিড় জলের ধারে নিরিবিলি শান্ত এক গ্রাম
অপেক্ষা করে আছে আমারই জন্য যেন মৃদু প্রতীক্ষায়
পিতৃপিতামহদের পর্ণ কুটির আর অলৌকিক
একখানি শক্ত পাথর
তাদের পরম পূজ্য : যেখানে ঘুমাবে তুমি সব শান্ত হলে।
শেষতম উপাধান অন্তিম বিশ্রামে ॥

হাইতির কবি **জ্যাকস্ রোমাঁ**।
[JAOQUES ROUMAIN] এর কবিতা

মুক্তি

যীশু মুক্ত করে দিয়েছিলেন পাপী মানুষদের
এবং রোমে তৈরী করেছিলেন তাঁর চার্চ,
এবং তার করুণার কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছিল মরুভূতে
সমাজের উচ্চমঞ্চে চার্চ
এবং চার্চের মাথার উপরে সমাজ
একে অন্যকে বহন করে নিয়ে চলে,—
একে অন্যের পরিপূরক

প্রতিষ্ঠা করেছে এই সভ্যতায়—যেখানে
প্রাচীন জ্ঞানের কাছে সমর্পিত শান্ত মানুষেরা
মৃত নয় পুরানো দেবতাদের খুশী করতে
প্রত্যেক দশ বছর পরে বলিদান দেয়
করেক লক্ষ অসহায় প্রাণ।

তিনি আফ্রিকাকে ভুলে গিয়েছিলেন।
কিন্তু লক্ষ্য করা গেল একটা জাতি (মানুষেরই সগোত্র)
ঈশ্বরকে এখনো ফিরিয়ে দেয়নি
তাদের বশ্যতা মেনে নেবার কর,
তাদের কালো রক্তের উপঢৌকন,—
ওরা যে তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তার দেয়
খাজনার কথা।
তাই যীশু তার দুটি করুণার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন
কোকড়ানো চুলের মাথাগুলির উপর···
এবং নিগ্রোরা বেঁচে গেল
তবে নিশ্চয়ই—তা ইহলোকে নয়।

হাইতির কবি **জ্যাকস্ রোমাঁ**।
[JACQUES ROUMAIN] এর কবিতা

সুসমাচার নিগ্রোদের জন্য ॥

ভাইরা, বন্ধুরা শোনো,
আমরা আর কেনোদিন প্রার্থনা করব না।
নষ্ট উদ্বেলিত ছড়িয়ে পড়া বন্ধ জলার উপরে
কড়ো পাখীর দুরন্ত চিৎকারের মত
চেয়ে স্থাখো আমাদের বিদ্রোহ জেগে উঠছে
কী এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়।
না, আমরা আর গাইব না হতাশার
অসহায় বিষণ্ণতায় ক্লান্ত
অন্য কোনো অলৌকিকের অর্থহীন স্তোত্রগাথা।

অন্য এক দুর্জয় গীতক সঙ্গীত স্থাখো
উদ্বেলিত বেরিয়ে আসছে আমাদের কণ্ঠ থেকে।
উর্ধ্বে উত্তোলিত করে ধরব আমাদের রক্ত পতাকা
আমাদের বীর শহীদদের উষ্ণ রক্তে যা রঞ্জিত,
এবং এই রক্তাক্ত প্রতীকের নীচে সমবেত আমরা
একসঙ্গে এগিয়ে চলব আগামীর দিকে
নতুন উদ্যমে আবেগে অহংকারে।
এই রক্ত পতাকাই সামনে তুলে ধরে
এগিয়ে চলব আমরা নতুন আশায়
পর্বতবৃত এই বীভৎস জগত পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে,
চারিদিকে এই দুঃসহ ঘৃণার কারাগার
লাথি মেরে ভেঙে ছিন্ন ভিন্ন করে
পার হয়ে এই প্রত্যহের প্রচলিত বিদীর্ণ সড়ক।

বৃটিশ ডোমিনিকার কবি **ড্যানিয়েল থ্যালী**
[DANIEL THALY] এর কবিতা

স্মৃতির গভীরে ॥

তুমি কি শুনতে পাও না সুদূরাগত অশ্রুময়ী একটি গানের
অবিরাম স্বরলিপি—অবিরল কান্নার মতন
যে বাথা গুমরে উঠছে—ক্রান্তিহর রাত্রির গভীরে
দীর্ঘ বিলম্বিত আহা ? হয়তো তা হতে পারে
পাহাড়ে পাহাড়ে
আছড়ে পড়া সমুদ্রের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
প্রতিটি তরঙ্গ-রেশ মিলিয়ে যাবার আগে
মুমূর্ষুর নিঃশ্বাসের মত।

যে লোকটি গাইছে দূরে বহু দূরে হেমন্তের শস্যক্ষেতের
শিয়রে বসে—দগ্ধ ভস্মীভূত তার প্রিয় কুটীরের
নির্জন নিরালায়, বৃদ্ধ এক কড়োলিস,—সে তার
দেশের জন্য
অবিরাম ক্রন্দনে আকুল
অসহ্য আবেগে আহা রাত্রির পরিপ্লাবী নীরব জ্যোৎস্নায়।
হয়তো সে তখন একটি দীর্ঘ করুণ নিগ্রো দুঃখ
কিশোর বালক
সামান্য এক টুকরো লাল শালুতে আবৃত কটীদেশ,
শ্বেত প্রভুদের কোনো ক্রীতদাস,—জাহাজের যাত্রী হয়ে
একদিন অতলান্ত পেরিয়ে এসেছিল
এ ভূখণ্ডে। তারপর থেকে তার বুকের ভিতরে
অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি বেজেছে আকুল
কী এক অসহ্য অন্ধ ব্যাকুলতা গ্রাস করেছে তাকে
অবিরাম : কিন্তু কিছুই কেউ পারেনি সান্ত্বনা
দিতে তাকে :

তার সেই আদি মাতৃভূমি সেই সুদূরের প্রিয়তমা
আফ্রিকাকে নিঃশেষে হারিয়ে
কোথায় কোথায় সেই নীল নদ নদীগুলি বুকে তার
জলহস্তী সুখে খেলা করে !

———

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩।	শ্রীনিতাগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২·০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

৺প্রতিভা রায় রচিত

১।	নারীপ্রগতির রূপকথা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

রেণু মিত্র রচিত

১।	সমন্বয় মূর্তি শ্রীনিতাগোপাল	২·০০
২।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩।	রবীন্দ্র হৃদয়	৫·০০
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম : যাওইআটি / পো: অশ্বিনীনগর
কলিকাতা-৫১ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৫৭-২৫৪০

একাঙ্কিকা

॥ গৃহরাজ্য ॥

মন্মথ রায়

[অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ মহানন্দ মিত্রের বাসভবনে বসিবার ঘরের মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল। টেবিলের দুইপার্শ্বে কিছু চেয়ার। মহানন্দ একটি সোফার সংবাদপত্র পড়িতেছেন। ভৃত্য ভূতনাথ করজোড়ে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভূতনাথ ॥ চিঠি পেলাম বৌয়ের অবস্থা এখন তখন। কিছু টাকা নিয়ে দেশে ছুটতে হচ্ছে আমাকে এখুনি। ছুটি চাই, সেই সঙ্গে কিছু টাকাও চাই কর্তা।

মহানন্দ ॥ কর্তা? কর্তা আবার কে?

ভূতনাথ ॥ ও, হ্যাঁ, স্যার। আমাকে দয়া করুন স্যার।

মহানন্দ ॥ সে সব দিন আর নেই ভূতনাথ। জান তো এ বাড়ীর বিধি ব্যবস্থা এখন সংবিধানে শাসিত। এজন্য প্রথমে তোমাকে দরখাস্ত করতে হবে হোমসেক্রেটারির কাছে। তিনি তোমার দরখাস্ত পাঠাবেন এস্টাব্লিশমেণ্ট সেক্‌শনে। তারা দেখবে তোমার ছুটি পাওনা আছে কিনা। ক্যাজুয়েল লিভ, আরনডলিভ এসব এ্যাকাউণ্ট দেখা হবে। তারপর, তুমি যখন কিছু টাকাও চাইছ, তখন কেসটা কিন্নাদকেও দেখাতে হবে।

ভূতনাথ ॥ কিন্তু অত শত দেখতে গেলে, স্যার আমি আমার মরা মরা বউকে নিয়ে দেখতে পাব না।

মহানন্দ ॥ বউকেই যদি দেখতে না পাও, তবে ছুটি নিয়ে লাভ?

ভূতনাথ ॥ এখন তো তাই দেখতে পাচ্ছি স্যার। দেখি আমাদের ইউনিয়নের সংগে পরামর্শ করে দেখি।

মহানন্দ ॥ ও বাবা, তোদেরও আবার ইউনিয়ন হয়েছে নাকি?

ভূতনাথ ॥ তা একটা হয়েছে স্যার।

মহানন্দ ॥ কিন্তু, সেটা আমরা এখনও রেকোয়াইজ করিনি।

ভূতনাথ ॥ করেন নি, কিন্তু করতে হবে স্যার।

মহানন্দ ॥ সে দেখবো। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট দরখাস্ত দিক।

ভূতনাথ ॥ আজ্ঞে আমি তার প্রেসিডেণ্ট।

মহানন্দ ॥ ওরে বাবা, তাই নাকি? আচ্ছা তোর সঙ্গে আমি প্রাইভেট, কথাবার্তা কইবো, এখন। ওই যে, আমার এক বন্ধু দেখা করতে আসছেন—পরাক্রম সান্যাল। এসেই চা চাইবে। দু'নম্বর চা আনবি।

ভূতনাথ ॥ দু'নম্বর মানে চা আর বিস্কুট।

মহানন্দ ॥ না চা আর মুড়ি। কিন্নাদ নতুন সার্কুলারে দু'নম্বর চায়ে বিস্কুট কেটে মুড়ি করেছে। আর এক নম্বর চায়ে সিঙ্গারা আর রাজভোগের জায়গায় শুধু ক্যাজুনাটস্ করেছে।

[পরাক্রম সান্যালের প্রবেশ]

মহানন্দ ॥ আরে এস এস, পরাক্রম এস। তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভালো আছ তো?

পরাক্রম ॥ তা আছি। কিন্তু গলাটা শুকিয়ে গেছে। একটু চা।

মহানন্দ ॥ (ভূতনাথকে) হ্যাঁ হ্যাঁ চা। (দুইটি অঙ্গুলি ভূতনাথকে দেখাইলেন) বুঝেছিস?

ভূতনাথ ॥ হ্যাঁ স্যার।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

মহানন্দ ॥ তারপর পরাক্রম, এখন কী আন্দোলন চালাচ্ছো ?

পরাক্রম ॥ আইন অমান্য আন্দোলনের কথাই ভাবছি।

মহানন্দ ॥ সে কি হে ? আইন অমান্য আন্দোলন !

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ দাদা, আইন অমান্য আন্দোলন।

মহানন্দ ॥ কোন আইন ?

পরাক্রম ॥ সব আইন।

মহানন্দ ॥ সে কি হে ? আইন না থাকলে সমাজ চলবে কি করে ?

পরাক্রম ॥ ভেবে দেখ ভাই, আইন থাকলেই বুঝতে হবে সমাজের স্টাণ্ডার্ডটা নীচু, সে সমাজে অনেক গলদ। যে সমাজে আইন নেই, বুঝতে হবে, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ, মানে, পারফেক্ট।

মহানন্দ ॥ তা আমাদের সমাজ কি পারফেক্ট ?

পরাক্রম ॥ এখন নয় বটে, কিন্তু সব আইন উঠে গেলে ধীরে ধীরে আপনা আপনি সমাজ পারফেকসনে এসে যাবে। কিন্তু আইন চালু থাকলে, সমাজের সে বিশুদ্ধ অবস্থা কোন দিনই আসবে না। এই যে চা এসে গেছে !

[দুই নম্বর চা লইয়া ভূতনাথের প্রবেশ]

পরাক্রম ॥ কিন্তু, মুড়ি কেন ?

ভূতনাথ ॥ আজ্ঞে বিস্কুট বাড়ন্ত।

[ভূতনাথের প্রস্থান]

মহানন্দ ॥ (হাসিয়া) মানে, ডেফিসিট বাজেট চলছে আর কি ! কিন্তু আইন সব তুলে দিলে, সমাজ পারফেকসনে, আসবে, একথা তুমি কি করে বল।

পরাক্রম ॥ একসপেরিমেন্ট করে তাই দেখা গেছে। বিলেতে অনেক জায়গায় হকাররা পথের ধারে খবরের কাগজ রেখে চলে যায়। দিনের শেষে এসে দেখে, সব কাগজ বিক্রি হয়ে গেছে। আর তার দামও রেখে গেছে ক্রেতারা। ফাঁকি দেয় নি কেউ। তবেই দেখ ভাই—

মহানন্দ ॥ তুমি হাসালে।

পরাক্রম ॥ আজ হাসছো, হাসো, কিন্তু, একদিন দেখবে এ আন্দোলন চলছে আর জিতেও গেছে। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে তিনিই এ আন্দোলনটাকে চরম রূপ দিয়ে যেতেন। তিনি নেই কাজেই আইন অমান্য আন্দোলনটাকে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে এখন আমাদের। রাত দিন এখন আমি এই সবই ভাবছি।

মহানন্দ ॥ তা ভাবো। আমাদের পার্লামেন্টের জরুরী অধিবেশনের সময় হয়ে এল। তুমি এবার এস।

পরাক্রম ॥ পার্লামেন্ট ? ও তোমার হোম পার্লামেন্ট ? তোমার সেই পাগলামিটা এখনো আছে নাকি ?

মহানন্দ ॥ পাগলামি বলছ কি হে ? যখন চাকরিতে ছিলাম তখন আমার সংসারটা ছিলো অরাজক। সাবজজের চাকরি। বাইরের লোকের বিষয় সম্পত্তির মামলা নিষ্পত্তি করতে হ'তো আমাকে। রাতদিন আদালতের নথির মধ্যে ডুবে থাকতে হ'তো। নিজের ঘরের দিকে তাকাবার অবকাশ ছিলো না। গিন্নি আর ছেলেমেয়েরা খুশি মতো খরচপত্র করতেন। মাসের দশ দিন যেতে না যেতেই কতরকমের অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতো ! তখন একেবারে হাবুডুবু খেতে হ'তো।

পরাক্রম ॥ ঘরে-ঘরেই এ অবস্থা।

মহানন্দ ॥ কিন্তু পেন্সন নেবার পর আমি এটা চেক করেছি। চেক না করে উপায়ই বা কী বলো। আয় তো অর্ধেক হয়ে গেছে।

পরাক্রম ॥ বটেই তো। তবু তো তোমার পেন্সন আছে। আমার তো কোনো ফিক্সড ইনকামই নেই। ম্যানেজ করা যে কী কষ্ট সে আর কি বলব।

মহানন্দ ॥ তা তো বটেই। কিন্তু ভাই, কী করে মানেজ করছো?

পরাক্রম ॥ ইজম্ দিয়ে।

মহানন্দ ॥ ইজম্?

পরাক্রম ॥ হাঁ। ইজম্।

মহানন্দ ॥ কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

পরাক্রম ॥ তুমি আমার পরম বন্ধু বলেই সিক্রেটটা তোমাকে বলছি। কিন্তু দেখো, কথাটা চাউর করে দিয়ো না যেন।

মহানন্দ ॥ আরে না, না। তুমি বলো।

পরাক্রম ॥ তাহলে শোনো। মাসের প্রথম সপ্তাহে হাতে কিছু টাকা আসে। মানে পাওনা-টাওনাগুলো কিছু পাই।

মহানন্দ ॥ তা তো পাবেই। মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেলেই তো লোকে দেনা শোধ করে।

পরাক্রম ॥ হাঁ। আর তাতেই তখন আমার হাতে কিছু টাকা আসে। আর তাই মন মেজাজটাও বেশ ভালো থাকে। মাসের ওই প্রথম সপ্তাহটাতেই আমি ক্যাপিটালিজম্ ফলো করি। ট্যাক্সিতে চাপি—কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য যে, কোন বন্ধুবান্ধবের চোখে পড়ি না। তা থাকগে, তখন দু'চার পয়সা দানধ্যানও করি, ছেলে-মেয়েদের সিনেমা থিয়েটার দেখার পয়সাও মঞ্জুর করি; খোসমেজাজে নিজে বাজার করি; ভালো খাই দাই। মানে, মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি ক্যাপিটালিস্ট এবং দস্তুর মতো খানদানী মানুষ।

মহানন্দ ॥ আর দ্বিতীয় সপ্তাহে?

পরাক্রম ॥ তখন টাকা পয়সার টান পড়ে, অবস্থাটাও নরম হয়ে আসে।

মহানন্দ ॥ তখন সোস্যালিজম্?

পরাক্রম ॥ এই তো ঠিক ধরেছো, দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি সোস্যালিস্ট। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ মানি না। পাওনাদার টাকা চাইতে এলে বলি আরে দাঁড়ান মশাই, আপনার না হয় দু-পয়সা আছে, আমার না হয় নেই। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেতে নতুন সমাজে আমাদের সুযোগ সুবিধে পেতে দিন। মনে রাখবেন, এটা সাম্যের যুগ। আমার নেই, আর আপনার আছে বলেই যে আপনি আমাকে চোখ রাঙাবেন, তা আর চলবে না।

মহানন্দ ॥ এমনি করে কলা দেখিয়ে যাও। বাঃ! এ-বেশ।

পরাক্রম ॥ হাঁ।

মহানন্দ ॥ আর তৃতীয় সপ্তাহে?

পরাক্রম ॥ কমিউনিজম্। তখন আমি দস্তুর মতো কমিউনিস্ট। ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে তখন জেহাদ ঘোষণা করি। বলি: মশাই, আমরা হচ্ছি মেহনতি মানুষ, শ্রমিক। আমাদের শোষণ করে, বঞ্চনা করে আপনারা আপনাদের টাকা করেছেন। আপনাদের দাবির পেছনে না আছে নৈতিক ভিত্তি, না আছে কোনো ন্যায়সংগত যুক্তি।—পাবেন না।

মহানন্দ ॥ পাবেন না?

পরাক্রম ॥ না, পাবেন না।

মহানন্দ ॥ কিন্তু ভাই, আমার কাছ থেকে সেই যে একশ' টাকা নিয়েছিলে—

পরাক্রম ॥ বললাম তো এ সপ্তাহে পাবে না।

মহানন্দ ॥ কিন্তু আমার যে বড়ো ঠেকা। সেই জন্যেই তো তোমায় ডেকেছি। না ভাই, আর যাকে না বলো, আমাকে এমন করে ফাঁকি দিয়ো না। না হয় পরের সপ্তাহেই তোমার বাড়ি যাবো, কেমন?

পরাক্রম ॥ যেয়ো না ভাই, যেয়ো না। মাসের শেষ সপ্তাহটা, সে বড় ভয়ঙ্কর।

মহানন্দ ॥ ভয়ঙ্কর কিসের? তোমার তো সব ইজম্ শেষ হয়ে গেছে, ক্যাপিটালিজম্, সোস্যালিজম্, কমিউনিজম্।

এর পরে আর কোন ইজম্ আছে নাকি ?

পরাক্রম ॥ হ্যাঁ, আছে—নুডইজম্।

মহানন্দ ॥ এঁ্যা ? কী ইজম্ ?

পরাক্রম ॥ নুডইজম্—নগ্নতাবাদ।

মহানন্দ ॥ সে কী হে ? একেবারে উলঙ্গতান্ত্রিক ?

পরাক্রম ॥ ভয় নেই। আমার চাকর আগে থেকেই তোমাকে সাবধান করে দেবে : ও ঘরে যাবেন না, কর্তা সন্ন্যাসী হয়েছেন নাগা সন্ন্যাসী।

মহানন্দ ॥ ওরে বাবা! না, না, আমি তাহলে ও মাসের প্রথম সপ্তাহেই এবার চেষ্টা করে দেখবো। মানে, ধনতান্ত্রিক সপ্তাহে।

পরাক্রম ॥ দেখো, দেখবে, কবিগুরুর 'আকবর বাদশার সাথে হরিপদ কেরাণির' কোনো ভেদ নেই। তারপর তোমার বরাত। আচ্ছা আমি তাহলে এখন উঠি।

মহানন্দ ॥ [ঘড়ি দেখিয়া] হ্যাঁ, তোমাকে এখন উঠতেই হবে। আমাদের পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময় হয়ে গেছে। মন্ত্রী আর সদস্যরা এলেন বলে।

পরাক্রম ॥ মন্ত্রী ? —ও, হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমার সেই গৃহরাজ্য। তা প্রাইমমিনিস্টারটি কে ? তুমি না মিসেস ?

মহানন্দ ॥ প্রাইমমিনিস্টার আমি মহানন্দ মিত্র। আর কাত্যায়নী দেবী হলেন হোমমিনিস্টার—তোমরা যাকে বলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অন্যান্য পোর্টফোলিওগুলোরও বেশীর ভাগ উনিই নিয়েছেন। তবে ফিনান্সের পোর্টফোলিও আমি জোর করে আমার হাতে রেখেছি।

পরাক্রম ॥ আর ছেলেমেয়েরা ?

মহানন্দ ॥ ওরা সব অভিনেত্রী মেথার—এম্.. পি।

পরাক্রম ॥ তা ওরাই তো দলে ভারী। ভোটে তোমাকে হারিয়ে দেয় না ? 'নো কনফিডেন্স' আনে না ?

মহানন্দ ॥ শোনো, শোনো : একটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাতে হলে মাথায় বুদ্ধি চাই।

পরাক্রম ॥ সে তো নিশ্চয়।

মহানন্দ ॥ গৃহরাজ্য গণতন্ত্রে শাসিত হবে শুনে সকলেই মহাখুশি। আমি তখন করলাম কি, একটা constitution—মানে, তোমরা যাকে সংবিধান বলো - লিখে ফেললাম। এমন সব কঠিন কঠিন কথা দিলাম তাতে যে, অর্ধেক কথার মানেই কেউ বুঝলো না। বুঝবে কী করে বলো। লেখাপড়া করে কেউ ? সিনেমা থিয়েটার পোশাক আশাক আচ্ছা নিয়েই আছে সবাই।

পরাক্রম ॥ তারপর কী হলো ?

মহানন্দ ॥ সংবিধানের সব কথার মানে না বুঝেই সবাই সই দিয়ে দিল। আর তাতেই আমি টিকে আছি।

পরাক্রম ॥ কিন্তু ভোট তো ওদের সবারই রয়েছে।

মহানন্দ ॥ কিন্তু ভেটো রয়েছে আমার হাতে। ভোটে ওরা অবাঞ্ছিত কিছু পাশ করিয়ে নেবে বুঝলেই আমি 'ভেটো' মেরে সেটা নাকচ করে দিই।

পরাক্রম ॥ বাঃ এ তো বেশ।

মহানন্দ ॥ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালানো সোজা কথা নয়। বুদ্ধি চাই।

পরাক্রম ॥ একদিন তোমাদের অধিবেশন দেখতে হবে। দেখতে পাবো তো ? তোমার বুদ্ধির খেল ?

মহানন্দ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমাকে ডিপ্লিটার্স গ্যালারীতে বসিয়ে দেবো ; কিন্তু খবরদার! আমাদের প্রসিডিংস দেখে তুমি হাসতে পারবে না, উত্তেজিত হতে পারবে না, হাততালি দিতে পারবে না। আর কোন স্লোগান তো নয়ই।

পরাক্রম ॥ বেশ, তাই হবে। আচ্ছা তবে আসি।

মহানন্দ ॥ এসো ভাই, এসো। আর শোনো, পরের মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমি যাচ্ছি তোমার কাছে। হ্যাঁ তোমাদের আইন অমান্য

আন্দোলন চালু হবার আগে।

[কথা শেষ হইবার পূর্বেই পরাক্রম সান্যাল চলিয়া গেলেন]

মহানন্দ ॥ নাঃ! কথাটা কানেই তুললে না। একে ওকে ফাঁকি দিয়ে, ধার কর্জ করে বেশ আছে। মুক্ত পুরুষ। আমার মতো রাজা শাসনের তাবেদা নেই। আইন টাইনের হাঙ্গামাই নেই।

[চিৎকার করিয়া] ভূতো! ভূতো! ভূতনাথ!

মহানন্দ। লোকসভার অধিবেশনের সময় হয়ে গেছে। সব ব্যবস্থা করো। মার্জেন্টের পোষাক পরো। আমি আসছি।

[মহানন্দ অন্দরে গেলেন। ভূতনাথ ব্যস্তভাবে টেবিলের উপর হইতে কাপ প্লেট লইয়া গেল। সংগে সংগে আবার ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের উপর একটি সুন্দর টেবিল ক্লথ পাতিয়া দিল, টেবিলের শিয়োদেশে একটি মর্যাদাব্যঞ্জক ভালো চেয়ার আনিয়া রাখিল। তড়িৎ গতিতে সাজসজ্জা সারিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। একটু পরেই আবার সে ফিরিয়া আসিল। এখন তাহার অঙ্গ বেশ। সার্জেন্ট। সার্জেন্ট-এট-আর্মস এর কায়দায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিতে লাগিল।]

ভূতনাথ ॥ আনন্দভবন গৃহরাজ্যের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমহানন্দ মিত্র। আনন্দভবন গৃহরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী কাত্যায়নী মিত্র। আনন্দভবন গৃহরাজ্যের লোকসভার সদস্যগণ শ্রীঅরুণ মিত্র, শ্রীবরুণ মিত্র, শ্রীতরুণ মিত্র এবং শ্রীমতী কেকা মিত্র।

[নামোচ্চারণের সংগে সংগে একে একে সকলে টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। কাহারো কাহারো মুখে উত্তেজনার চিহ্ন।]

মহানন্দ ॥ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের আনন্দভবন গৃহরাজ্যের এই লোকসভার জরুরী অধিবেশনটি শুরু করার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে ॥ সাধু। সাধু।

তরুণ ॥ যা বলবে সংক্ষেপে বল বাবা!

মহানন্দ। অর্ডার! অর্ডার! লোকসভার অধিবেশন কালে আমি কারো বাবা নই। এই কাত্যায়নী দেবী আমার স্ত্রী নন। আর অরুণ, বরুণ, তরুণ এবং কেকা আমার পুত্র-কন্যা নও।

সকলে ॥ সাধু। সাধু।

মহানন্দ ॥ আমাদের আনন্দভবন গৃহরাজ্যের যে 'কনষ্টিটিউশন'—মানে সংবিধান—আমরা সর্বসম্মতিক্রমে স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেছি, যা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য আমরা 'ওথ'—মানে, শপথ নিয়েছি, সেই সংবিধানে ঘোষিত হয়েছে আমাদের সরকার লোকায়ত্ত সরকার। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেই আমাদের গৃহরাজ্য পরিচালিত করার সংকল্প নিয়েছি আমরা। হ্যাঁ, সংবিধানেও এ সংকল্প লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সকলে ॥ সাধু। সাধু। [হাততালি]

মহানন্দ। মাননীয় সদস্যগণ, আজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে একটি বেসরকারি বিল। বিলটি এনেছেন আমাদের এই লোকসভার কনিষ্ঠতম সদস্য শ্রীতরুণ কুমার মিত্র বিলটির নামকরণ করা হয়েছে 'পুত্রকন্যাণ বিল'। এর প্রস্তাবিত বিধানগুলি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল।

তরুণ ॥ না, না, মোটেই না। এইরূপ জঘন্য উক্তির আমি তীব্র প্রতিবাদ করি।

বরুণ ॥ বিলের সব ধারাগুলি যদিও আমি এবং আমার সমাজতন্ত্রীগণ অনুমোদন করি না, তবু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একদেশ-দর্শিতার নিন্দা করি।

অরুণ ॥ স্বতন্ত্র দলের পক্ষ থেকে আমি বলছি, বিলটির যথাযথ আলোচনা যেন প্রধানমন্ত্রী বন্ধ করার অপচেষ্টা না করেন।

কেকা ॥ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর এ ক্ষমতা অবশ্যই আছে যে বিলটি সংবিধান বিরোধী হলে তিনি এর আলোচনা অবশ্যই বন্ধ করতে পারেন।

সকলে ॥ শেম্ শেম্!

মহানন্দ ॥ অর্ডার! অর্ডার! শ্রীমতী কেকা মিত্র শান্ত হোন। মাননীয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমি এই বিলটি আমাদের মন্ত্রী সভার এক বিশেষ অধিবেশনে গভীর ভাবে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে বিলটি সংবিধান বিরোধী নয়। এবং তজ্জন্য আলোচনা-যোগ্য।

কতিপয় সদস্য ॥ [টেবিল চাপড়াইয়া] সাধু! সাধু!

কেকা ॥ টেবিলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কাত্যায়নী ॥ শ্রীমতী কেকা মিত্র একটি জলন্ত সত্যের প্রতি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবেচনা করে দেখো, তার নাম কি, এ হোল গিয়ে সভা। সভা সভ্যভাবেই পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

তরুণ ॥ অন্ এ পয়েন্ট অব অর্ডার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই উক্তির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। ওঁর এই কটূক্তির নির্গলিতার্থ হচ্ছে, আমরা অসভ্য।

কেকা ॥ চিয়ার চিয়ার। শুনুন শুনুন!

মহানন্দ ॥ কাতু, কাতু, তোমার এই উক্তি প্রত্যাহার করো কাতু। [সদস্যদের তুমুল গর্জন]

তরুণ ॥ হোয়াট ইজ কাতু?

বরুণ ॥ উইথড্র, উইথড্র।

মহানন্দ ॥ কাতু মানে মাননীয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাত্যায়নী দেবী। আমি আমার উক্তি প্রত্যাহার করে মূল বক্তব্য বিষয়ে আসছি। শ্রীতরুণ মিত্র এই হাউস—মানে, গৃহের সামনে যে-বিলটি এনেছেন তা সংবিধান বিরোধী না হলেও এবং আলোচনা-যোগ্য হলেও কার্যত নৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় সদস্যগণ! একথা অতীব সত্য যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রচিত এই সংবিধান অনুযায়ী আমাদের এই গৃহরাজ্য পরিচালনার সর্ববিধ ক্ষমতা এবং দায়িত্ব, মাননীয় সদস্যগণ, আপনাদের হাতেই ন্যস্ত রয়েছে। এ আশা আমি অবশ্যই করবো যে, আপনারা তার অপব্যবহার করবেন না। সর্বদা মনে রাখবেন আমাদের এবারকার বাজেট সারপ্লাস বাজেট নয়, ডেফিসিট বাজেট।

কাত্যায়নী ॥ নিশ্চয়। তারপর বিবেচনা করে দেখো, তার নাম কি, এ হোল গিয়ে আকালের বছর। চালের দামটা ভালো করে বিবেচনা করে দেখো।

তরুণ ॥ চালের দামের সঙ্গে আমার প্রস্তাবিত বিলের কোন সম্বন্ধ নেই। এসব অবান্তর কথার তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। আমার বিলের বিষয়বস্তু হচ্ছে সমগ্র দেশের নির্যাতিত, নিষ্পীড়িত, লাঞ্ছিত পুত্র-সমাজের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি পূরণের দাবি। দেশের প্রত্যেকটি গৃহরাজ্যকে আজ এই দাবিপূরণ করতেই হবে। নতুবা বিদ্রোহের ঘনঘোর ঘটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

মহানন্দ ॥ উত্তেজিত হয়ো না বৎস, উত্তেজিত হয়ো না।

বরুণ ॥ হোয়াট ইজ বৎস?

কতিপয় সদস্য ॥ প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।

মহানন্দ ॥ প্রত্যাহার করছি।

[সকলের হাততালি]

মহানন্দ ॥ শ্রীতরুণ মিত্র তাঁর বিলটি এইবার হাউসের সামনে মুভ করুন মানে তুলুন।

তরুণ ॥ যেহেতু সবল পিতৃসমাজ থেকার অথবা বিস্তাধী পুত্রদের চরম অসহায়তার সুযোগ লইয়া পুত্রদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রগতিকে

শেকল এবং পীড়ন করেন, সেই হেতু এই পুত্র-সমাজ সংঘ-বদ্ধ হইয়া প্রতিটি গৃহরাজ্যের পিতৃ-সমাজের নিকট এই ন্যূনতম দাবি পেশ করিতেছে :

(ক) ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন পুত্রকে তথাকথিত শিক্ষালয়রূপ কারাগারে নিক্ষেপ করা চলিবে না।

(খ) বিশ্বের প্রগতির সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিয়মিত সিনেমা দেখার ব্যবস্থাকল্পে আলাদা কিছু অর্থের ব্যবস্থা রাখিতে প্রত্যেক গৃহকর্তা বাধ্য থাকিবেন।

(গ) পুত্রদের গৃহে প্রত্যাগমনের সময় সম্পর্কে কোনো বাধ্যবাধকতা রাখা চলিবে না—কারণ গৃহের সংকীর্ণ পরিবেশে পুত্রদের বিশ্বজনীন সংস্কৃতি শিক্ষার সুব্যবস্থা হইতে পারে না।

কাত্যায়নী ॥ এই বড়ো বড়ো কথাগুলো কোত্থেকে শিখলি রে তরুণ?

তরুণ ॥ আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই জঘন্য উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর উক্তি প্রত্যাহার না করলে আমি লোকসভা ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হবো।

কতিপয় সদস্য ॥ প্রত্যাহার করুন, প্রত্যাহার করুন।

মহানন্দ ॥ কথাটা তুমি প্রত্যাহার করো কাতু।

বরুণ ॥ এগেন 'কাতু'?

কাত্যায়নী ॥ আমি প্রত্যাহার করছি। আপনি বলুন।

তরুণ ॥ আমার বিলটির সর্বশেষ ধারা (ঘ) পুত্রদের পোশাক নির্বাচন, কেশ কর্তন এবং সামগ্রিক প্রসাধন সম্পর্কে পুত্রদের রুচিই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। —সমগ্র বিলটি 'পুত্রকল্যাণ বিল' এই নামে এই গৃহরাজ্যে গৃহীত হউক—আমি প্রস্তাব করিতেছি।

বরুণ ॥ সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষ হইতে আমি এই বিল সমর্থন করিতেছি।

অরুণ ॥ বর্তমান সমাজে বিলটির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। স্বতন্ত্র দলের পক্ষ হইতে আমি আমার সমর্থন জানাইতেছি।

কেকা ॥ বিলটি যেভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে নারী-সমাজের পক্ষ হইতে আমি ইহা অনুমোদন করিতে পারি না। তবে হ্যাঁ, প্রস্তাবক যদি কন্যাসমাজকেও এই বিলের আওতায় আনিয়া বিলটি পুত্রকন্যাকল্যাণ বিলরূপে সংশোধন করিয়া লন তাহা হইলে আমার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিতে আমি সক্ষম।

তরুণ ॥ মাননীয় সদস্যগণ, দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমি ইহাতে অক্ষম। আমরা ইহা অত্যন্ত পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, নারী-সমাজ কোনোরূপ কঠোর সাধনা না করিয়াই অপরের নৌকায় উঠিয়া ওপারের বন্দরে গিয়া লাভবান হইতে চায়।

কেকা ॥ আমি এই জঘন্য নির্লজ্জ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি।

তরুণ ॥ চিৎকারে সত্যের কণ্ঠ রোধ হয় না।

কেকা ॥ ভালো হচ্ছে না খোকা।

তরুণ ॥ মুখ সামলে কথা বলবি ছুটকি।

বরুণ ॥ হোয়াট ইজ 'খোকা'?

অরুণ ॥ হোয়াট ইজ 'ছুটকি'?

কাত্যায়নী ॥ এসব হচ্ছে কি? বিবেচনা করো—তার নাম কি—এ হলো গিয়ে সভা। মেছোবাজার নয়।

তরুণ ॥ কি বলছো মা? এটা মেছোবাজার?

বরুণ ॥ হোয়াট ইজ 'মা'? এখানে মা-টা নেই।

মহানন্দ ॥ অর্ডার। অর্ডার।

কেকা ॥ তোমরা যাকে অপমান করেছো!

তরুণ ॥ সরকার পক্ষের দালাল।

অরুণ ও বরুণ ॥ শেম্! শেম্!

তরুণ ॥ যাকে জানা আছে। মা তো নয়, ডাইনী।

বরুণ ॥ তা নয়তো কি? বাবাকে সব সময় কু-বুদ্ধি দিচ্ছে।

তরুণ ॥ আর তাতেই তো ওই বুড়োটা—

অরুণ ॥ থোকা, মুখ সামলে কথা বলবি। ওই বুড়োটা আছে বলেই এখনো টিকে আছিস।

তরুণ ॥ জানি, জানি, ও স্বতন্ত্রদলকেও জানি। যত সব অপরুনিষ্ট।

বরুণ ॥ তা নয়তো কি! যত সব সরকারের দালাল।

অরুণ ॥ কী? আমাকে দালাল বলছিস?

কাত্যায়নী ॥ এ কী? ওরা যে আস্তিন গোটাচ্ছে। মার-কোঁচা মারছে। বিবেচনা করো—তার নাম কি—এ হোলো গিয়ে—

কেকা ॥ অরাজকতা। কোথায় রইলো মা, তোমার 'ল এণ্ড অর্ডার'?

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] ওগো বিবেচনা করো—তার নাম কি—সভার সার্জেন্ট গেলো কোথায়?

ভূতনাথ ॥ আমার অর্ধাঙ্গ মরমর। আমি সরে পড়ছি।

[পলায়ন]

তরুণ ॥ ভেবেছো কি? তোমরা সব ভেবেছো কি?

অরুণ ॥ আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তরুণ ॥ [চিৎকার করিয়া] পুরুলংঘের ভাইরা, আশে পাশে যদি থেকে থাকো তাহলে শীগগির চলে এসো।

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] ওগো দেখছো কী? এ যে গৃহযুদ্ধ—তার নাম কি—এ হল গিয়ে সিভিল ওয়ার।

কেকা ॥ তাহলে কি হবে মা?

কাত্যায়নী ॥ [মহানন্দকে] দাঁড়িয়ে দেখছো কি? মিলিটারী ডাকো।

মহানন্দ ॥ হাঁ [চিৎকার করিয়া] মিলিটারী! মিলিটারী। কেউ নেই। গেলো কোথায় সব? মিলিটারী!

কেকা ॥ স্ট্রাইক করেছে বাবা ॥

মহানন্দ ॥ স্ট্রাইক করেছে, মিলিটারী স্ট্রাইক করেছে? কাণ্ড দেখছো কি? এদিকে ঘোরতর সিভিল ওয়ার। আর ওদিকে coup-d' etat ফু-ত-তাত হতে চলেছে। পালাও পালাও শিগগির

কাত্যায়নী ॥ কিন্তু ওরা যে যুদ্ধ করছে।

মহানন্দ ॥ ব্যাক ডোর দিয়ে পালাও—সোজা খাবার ঘরে। খাবার ঘণ্টা বাজাও—এখনি সব ঠাণ্ডা হবে।

[তাহাই হইল ॥ যবনিকা]

With Best Compliments from :

Phone : 45-3991 (4 lines)

STEEL PRODUCTS LTD.

Regd Office : 96, Garden Reach Road,

Calcutta-700023

Manufacturers of :

Hamilton Poles

Gram : BAGSEW

Phone : 43-1155
77-5679

VIJAYA SEWINGS PRIVATE LTD.

17-D, EVEREST BUILDING

46C, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA-700 071

MAKERS OF :

VIJ-101 PORTABLE BAG CLOSING MACHINE

সম্পূর্ণ উপন্যাস

॥ মানুষের মন ॥

মীরা দেবী

আজও কোন চিঠি এলনা।

চিঠি রোজই ডাকে ফেলে অতনু কিন্তু জবাব তার বড় আসেনা। একেবারে আসে না যে তা নয়, আসে মাঝে মাঝে।

আর সেই চিঠির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকী মুচকী হাসে। সেই হাসিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। যে হাসির মানেটা সময় সময় অতনু নিজেই ধরতে পারে না। এ তার এক নেশা খবরের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে দরখাস্ত লেখা আর উত্তরের জন্যে উদগ্র প্রত্যাশা।

এ এক অদ্ভুত খেলা। যদি আদৌ উত্তর না আসে জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল এমন একটা ভাব নিয়ে গুম হয়ে থাকে আর যদি ইন্টারভিউ এর চিঠি আসে তাহলে ঐ ভাবে মুচকী মুচকী হাসে আর সেই হাসিটা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিমিয়ে আসে, বিবর্ণ হয়ে আসে। তারপর একসময় চিঠিটা পুরানো চিঠির ফাইলের মধ্যে ভরে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, যেন সমস্ত উদ্বেগ আশঙ্কা আশা আর আকাঙ্খার সমাপ্তি ঘটায়। এই ভাবে চলে আসছে আজ পাঁচ বছর। পঁচিশ বছর বয়স থেকে চিঠি লেখা সুরু করেছিল আজ ওর বয়স তিরিশ বছর। সব ব্যাপারেই এত যুক্তিবাদী যে মানুষটা এই একটা ব্যাপারে এমন অদ্ভুত যুক্তিহীন। সে নিজেই জানে যে এটা তার একটা কমপ্লেকস কিন্তু এই কমপ্লেকস থেকে মুক্তি পেতে চায়না হয়তো এটাই তার একমাত্র বিলাস কিম্বা একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু এই বিলাস বড় যন্ত্রনাদায়ক বড় নির্মম। নিজের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিজেকে নিয়ে এই নির্মম খেলা অনবরতই খেলে চলেছে অতনু কিন্তু কেন যে এ খেলা খেলে সে নিজেও জানেনা। বুঝতে পারেনা, হয়তো বুঝতে পারেন তার মা। বোঝেন বলেই ছেলের এই পাগলামীটা প্রাণপনে লুকিয়ে রাখতে চান আর সকলের কাছ থেকে।

অতনু কখনও তার অদৃষ্টের কথা, তার ভবিষ্যতের জন্য হতাশার কথা প্রকাশ করতনা। সে যেন শেষ পরিণতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। শেষটা তার জানা তাই সহিষ্ণুতাও অটল। সেই বেদনাদায়ক শেষ পরিণতির গাম্ভীর্য্য তার গোটা চরিত্রকে তীক্ষ্ণ ধার আর বলিষ্ঠতায় আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তবু তার বুকে ছিল বিষণ্ণতা নিজের তৈরী খেলায় স্বেচ্ছাকৃত পরাজয়ের গ্লানি, যা কথায় বলে বোঝান যায় না। হৃদয়ের গভীর

কোন কক্ষে তার অভিঘাত সঞ্চিত হত দিনের পর দিন এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে। সেই বিষণ্ণতার ভার নিজের বুকে তুলে নিয়েছেন অতনুর মা। অতনু হয়তো সে কথা বোঝে তাই মাকে সে আরও গভীর ভাবে ভালবাসে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধ'রে নিজের এই জড় অস্তিত্বের আশ্রয় খোঁজে।

ঘৃণা সে নিজেকে করেনা। নিজের কাছে নিজে সে নির্ভার, বেদনাহীন, যেন কদিনের জন্য জীবনের সমস্ত কর্তব্য, সমস্ত বন্ধন থেকে ছুটি পেয়ে কদিনের জন্যেই বেড়াতে এসেছে বাইরে। সেখানে কাজ নেই, বাধ্য বাধকতা নেই শুধুই অবসর যাপন। তারপর একদিন ফিরে যেতে হবে। সে দিনের তারিখটাও যেন তার জানা। নোটঘাট সবই বুঝি বাঁধা। পরম নিশ্চিন্ত উদ্বেগহীন। অতনু আবকের বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত পরাজিত জনতার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে সেতো এদের দলের নয়। এই ভাবনাটা তার একার। সে যে নিজেকে এদের দলভুক্ত মনে করেনা এটাতে তার একাকীত্বই প্রমাণ করে। এই একাকীত্ব তাকে যেন একটা আশ্চর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে রেখেছে। এইখানেই তার প্রচ্ছন্ন গর্ব অথচ সেই গর্বের প্রতি তার অসীম অনীহা।

মাকে মাকে তার খুব ইচ্ছে করে গল্প লেখার শুধু গল্প নয়, উপন্যাস লিখবে। উপন্যাসের একান্ত পরিধি না পেলে তার চরিত্রদের যথাযথ বিহারে বাধা আসবে। কোন বাধাকেই যে সে প্রশ্রয় দিতে চায়না। ছোটগল্পের সীমিত বলয়ের মধ্যে তার চরিত্রেরা হাঁফিয়ে উঠবে। সমস্ত বক্তব্য অস্ফুট থেকে যাবে। সে যা বলতে চায় তা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হোক। লিখতে বসলেই অজস্র চরিত্র এসে ভীড় করে, নানা ব্যাঞ্জনায়। আনন্দ, শোক, জন্মমৃত্যুর এক বর্ণাঢ্য মিছিল, সেই মিছিলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, তাদের কথা শুনতে শুনতে, অতনু জানতে পারে এরা সকলেই তার নিজেরই ভিন্ন ভিন্ন সত্তা, একে অন্যের সঙ্গে অনবরতই দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আপোষ যে নেই তা নয় অতনুর ভাল লাগে এই ভিন্ন ধর্মী সত্তাদের সম্পর্কের জটগুলো এক এক করে ছাড়িয়ে ফেলতে। লেখা আর এগোয় না, এদের ভাবনার মধ্যে অবগাহন করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে অতনু। তাঁর সেই অসমাপ্ত গল্পগুলো পড়তে পড়তে যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখতে পায় আর সম্ভাবনা আছে এই বিশ্বাসেই নতুন এক হতাশা তাকে নিস্পৃহ করে। ও জানে এটা ওর এক অদ্ভুত দুর্বল মানসিকতা। এর বিরুদ্ধে ওর নিরুচ্ছার অভিযোগ দিনেদিনে ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তখন ঈশ্বরের মত এক উদাসীন অনুভূতি ওর ভাসমান আত্মাকে পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। ও নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে এ কমপ্লেকস কি তার একার? না, সে কোন কাজ করেনা জীবিকার সন্ধানে উন্মাদের মত তাকে ছুটে বেড়াতে হয় না তাই নিজের এই কমপ্লেকসটাকে সে এত স্পষ্ট করে চিনতে পারছে? মায়ের মুখখানা মনে পড়লো। সে মুখ কি বিষণ্ণ? কিম্বা নির্বিকার। তাকে নিয়ে মায়ের স্বাচ্ছন্দ্য কি ভারগ্রস্ত? বাবার সম্বন্ধে জানার পর যেদিন সে সঙ্কল্প করেছিল যে চাকরি করবে সে দিন মাকে বলেছিল,

—মা তুমি কিছু ভেবনা। মাসা আছে। আমি আছি। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়তো হবে কিন্তু দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবাকে ও কখনও দেখেনি এবং এ সংসারে বাবার অনুপস্থিতি কোনদিনও মায়ের দুর্ভাবনার কোন কারণ হয়ে উঠেছে কিনা তা সে জানে না। নিছক সৌজন্য বোধেই ও হয়তো মাকে ও কথাটা বলেছিল। মা ওর ভয়ানক গম্ভীর, ভীষন শান্ত আর অসম্ভব ধৈর্যশীলা। মাঝে মাঝে মা ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে ওঠেন। একটা কঠিন শীতলতা তখন মা আর অতনুর মাঝখানে প্রকাণ্ড ব্যবধান গড়ে তোলে, সেই সময় কিসের একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ওকে মায়ের হৃদয়ের কাছটিতে কিছুতেই যেতে দেয়না। আর তখন একটা অসহ্য যন্ত্রনায় কষ্ট পায়।

অতনুর ঘরের জানলাগুলো মা এসে রোজ সকালে নিজের হাতে খুলে দেন। ওর খুব ভাল লাগে ভোরের

সূর্য ওকে প্রত্যহ নতুন জীবন দান করে ও মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে ওর বিছানাটার যেখানে রোদ্দুর এসে পড়ে ঠিক সেই খানটায়। আর টেবিলের ফুলদানীতে রাখা ফুলগুলোর দিকে, ও কিন্তু ফুল দেখেনা। দেখে ফুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া রোদ্দুর।

মা রোজ সকালে এক গোছা করে টাটকা ফুল নিয়ে ওর ঘরে ঢোকেন। ও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মা নিঃশব্দে পুরনো ফুলগুলো তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে যান।

প্রতিদিন সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এক একদিন ওর মনের আজ যদি মা শুধু হাতে ওর ঘরে আসেন তাহলে খুব ভাল হয়। কেন যে ভাল হয় তা ও বিশ্লেষণ করতে পারছেনা। ভাল লাগবে, হয়তো একটু নতুনত্ব হবে বলে। কিন্তু কোনদিনও মার ভুল হয় না। আগে কিন্তু মা এতটা নিয়ম মেনে চলতেন না। বেশ কিছু এলোমেলো অগোছাল ছিলেন। রমা মাঝে মাঝে বলতো —"তোমার মা কিন্তু একটু অন্যমনস্ক। আসলে একটু খেয়ালী।" কথাটার মধ্যে যেন একটা অভিযোগ লুকিয়ে থাকতো। ভাল লাগতনা অতনুর। রমা মাকে বুঝতে ভুল করছে, এই ভেবে সে ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করতো। এখন কিন্তু মাকে একটুও এলোমেলো বা অন্যমনস্ক বলা চলে না। মায়ের এই অদ্ভুতটাতো রমা দেখতে পেল না। ঘুরে ফিরে বারে বারে তার রমার কথাই মনে পড়ে। পড়ুক না কি ক্ষতি তাতে। প্রথম দিকের রাগ বা অভিমানটাকে এখন আর প্রশ্রয় দেয় না। তাই রমার কথা যতক্ষণ ভাবতে ভাল লাগে ততক্ষণ ভাবে।

যেদিন চাকরীর খবর পেল অতনু বাড়ি এসে সেইদিনই দরখাস্ত খানা লিখে ফেললো। একটা বিলিতি ফার্মে সেলস রিপ্রেসেনটেটিভ। এ কাজ ও ভালবাসে। দশটা পাঁচটা অফিসের বদ্ধঘরে আবদ্ধ থাকার চেয়ে এ কাজ অনেক ভাল।

ঘুরে বেড়াতেই ও ভালবাসে। কত মানুষের সংস্পর্শে আসা যায়। কত অভিজ্ঞতা কত বৈচিত্র্য। সবাই বলে এ কাজে ওকে খুব ভাল মানাবে। চাকরীতে ও মনোনীত হল। প্রথম দিন বেশ খুশী খুশী মন নিয়েই বেরিয়ে এল অফিস থেকে। ওখান থেকে বেরিয়েই রমার কাছে গেল। রমার মা খুব খুশী হলেন। রমার হাত দিয়ে চা আর গরম কচুরী পাঠিয়ে দিলেন। অতনু ভেবে বলেছিল মা: একেবারে শরৎ চন্দ্রের নায়িকা যে। রমা সেই শীতের সন্ধ্যায় কানটা খুলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেদিন বেশিক্ষণ ছিলনা অতনু, কারণ মা বাড়িতে অপেক্ষা করে আছেন। রাগ করে রমা বলেছিল যা মা, কেবল মা।

পয়লা জানুয়ারী। বাড়ীতে একটা আনন্দের বাতাস বইছে। এ বাড়িতে রমার প্রায় নিত্য আসা যাওয়া। ব্যাপারটা আর লুকোছাপা নেই। অতনুর চাকরী না হলেও বাধা ছিলনা কারণ অতনুকে অসহায় করে রেখে যান নি ওর বাবা। তবু অতনু চেয়েছিল আগে চাকরীটা হোক। পয়লা থেকে জীবনের পার্টনারটি বদলে যাচ্ছে। তাই ওরা ঠিক করেছিল একটা দিন ওরা সম্পূর্ণ নিজেদের জন্য ব্যয় করবে। দুর্ঘটনাটা ঘটল সেইদিনই।

গাড়ীটা পাঁড় করিয়ে ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল একটা গাছের তলায় নদীর ধার ঘেঁসে। হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যায় অতনু। পাটা গিয়ে পড়ে একটা পাথরের ওপর আর যে ডালটা ধরে ও নিজেকে বাঁচাতে গিয়েছিল সেই ডালটা ভেঙ্গে গিয়ে ছিটকে এসে ওর পায়ের মাংসে বিঁধে যায়। কোনরকমে তাকে গাড়ীতে বসিয়ে রমা নিজেই গাড়ী চালিয়ে সোজা নিয়ে গেল হাঁসপাতালে। অতনুই ওকে শিখিয়েছিল গাড়ী চালাতে। হাঁসপাতালে যখন পৌঁছাল তখন অতনু সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

শেষ পর্যন্ত সেই পাটা উরু থেকে কেটে বাদ দিতে হল আর মেরুদণ্ডে যে আঘাতটা লেগেছিল সেটা তার সোজা হয়ে দাঁড়াবার অধিকারটুকু সম্পূর্ণ ভাবে হরণ করল। বাড়ি এসে হুইল চেয়ার থেকে নেমে সোজা বিছানায় আশ্রয় নিতে হল অতনুকে।

প্রথম প্রথম রমার আসার কোন সময় অসময় ছিলনা।

প্রায় সারাক্ষণই তাকে দেখা যেত অতনুর বাড়ির কাছাকাছি। ক্রমে ক্রমে তার আসা যাওয়ার মধ্যে একটা ধরা বাঁধা নিয়ম দেখা গেল। অতনু এখন ঘড়ি দেখেই বুঝতে পারতো রমার আসার সময় হল আগে সেটা বুঝতে পারতো ঘড়ি না দেখেই।

কিন্তু রমাকে থেমে থাকলে তো চলবে না। অতনুর অনুরোধেই বি. টি. টা পাশ করল স্কুলেও চাকরী নিল। তারপর একদিন রমা দু'চোখ ভরা জলে অনুমতি চাইতে এল অতনুর কাছে বাইরের একটা স্কুলে কাজ করার। বাড়ির লোকরা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাই সে চায় তিন কতকের জন্যে তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে।

একদিন সে বিশ্বাস করেছিল অতনু নিশ্চয়ই সোজা হয়ে দাঁড়াবে একদিন না একদিন। সেদিন ঐ কাঠের পা-টাকে নিজের বশে আনতে পারবে।

রমা স্কুলে চাকরী নিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ দুবছর। সে আর আসেনি। আজও মাঝে মাঝে তার চিঠি আসে। প্রথম দিকের চিঠিগুলোর আয়তন এখনকার তুলনায় অনেক বড় ছিল। তারপরের চিঠিতে একটা করে প্রশ্ন থাকতো "তুমি কেমন আছ?" আর থাকতো সান্ত্বনার একটি সংবাদ "কিছু ভেবনা আমি ভাল আছি, তুমি ভাল থাকতে চেষ্টা কোর।" শেষ চিঠিটা যেটা একদিন আগে এসেছে তাতে প্রশ্ন চিহ্নটা নেই। তার বদলে আছে, "আশাকরি তুমি ভাল আছ আমি ভালই আছি।" এই চিঠিটা অতনু লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিল মায়ের কাছ থেকে। তার মা যখন পূজোর ঘরে থাকেন তখন বার বার চিঠিটা পড়ে। বুঝে নেয় থাকে সেই মুচকী মুচকী হাসিটা যার মানে ও নিজেই জানে না। হয়তো কোনদিনই জানতে পারবে না কিম্বা কখনও জানতে চাইবে না।

পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মা যখন জানতে চাইবেন কার চিঠি এল তখন কি উত্তর দেবে তাই ভাবছিল অতনু। সত্যি কথাটা মাকে বলা যাবে না। এ কথাটা মনে হ'তে প্রথমে তার খুব রাগ হচ্ছিল যার উপর। তারপর সমস্ত মেয়েদের ওপর, সবশেষে রাগটা গিয়ে পড়ল গোটা বাঙালী সমাজের ওপর, যারা মেয়েদের শুধু মেয়ে করেই রেখেছে অথচ এই ভারতবর্ষেই অর্দ্ধনারীশ্বরের পরিকল্পনা, তবে ব্যতিক্রম আছে বৈকী। তার প্রমাণ রমার মা। রমার মাকে এতদিন অতনু বুঝতে পারেনি এখন বুঝেছে। আজ জীবনের সমস্ত উজ্জ্বলতা থেকে সরে এসে তার যেন দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়েছে। কোন মাকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার মত সময় যেদিন তার ছিল না সেদিন কখনও তাঁকে ভাল লাগত, কখনও সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হত আবার কখনও মনে হত বড় কাজের মানুষ। আজ কিন্তু বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারে অতনু, ঐ ভদ্রমহিলা একজন সম্পূর্ণ মানুষ কিন্তু সমাজ তাঁকে পুরোপুরি একটা গোটা মানুষ হয়ে ওঠার অধিকার দেয়নি উপরন্তু বাধা দিয়েছে সবাই, এমনকি রমাও। রমার সঙ্গে রমার মায়ের মিল নেই কোথাও একমাত্র মিল আছে চেহারায়। ভেতরে এত অমিল অথচ বাইরে এত মিলের ছড়াছড়ি। হাসিটা ঠিক এক। কপালটা, গড়ন-পিটোন এমনকি হাত নাড়ার ভঙ্গি পর্যন্ত।

অতনু সাহস করে কোনদিন জানতে চায়নি ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে। আর তার নিজের পক্ষেও তাকে বোঝার ক্ষমতাও ছিল না অবকাশও ছিল না। তার সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিল সুনীল। সুনীলের তো চিরদিনই সব বিষয়ে জানার অসীম কৌতূহল।

এতদিন পরেও সুনীলের কথা মনে পড়ে কি রকম একটা অসহায় আস্ফালন তৈরী হল অতনুর মনের মধ্যে। অতনু এবারে ডুবে গেল সুনীলের চিন্তায়।

সুনীল অতনুর চেয়ে রমাদের বাড়ির সঙ্গে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ছিল। সুনীল অতনুর চেয়ে সামান্য বড়ই হবে কিন্তু তার আচরণের মধ্যে সেটা ধরা পড়ত না। বরং

মনে হ'ত সে যেন তাদের চেয়ে অনেক বড়। রমার মায়ের সঙ্গেই কথা বলার যেন উপযুক্ত। রমার বাবাকে কাছে পেলে সুনীল হয়তো সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো। যার ফলে রমার অন্তরঙ্গতা তৈরী হল অতনুর সঙ্গে। ফলে একটা অব্যক্ত দূরত্ব ক্রমে ক্রমে ঘন হয়ে উঠতে লাগল রমা আর সুনীলের মধ্যে। সুতরাং অতনুকে যেন রমার সম্বন্ধে বড় বেশী দায়ীত্বশীল হয়ে পড়তে হ'ল। অতনু আর রমার এই নতুন ঘনিষ্টতায় সুনীলের মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হল সে সম্বন্ধে অতনুর খুবই কৌতূহল হ'ল অথচ সুনীল এমন কোন সুযোগ দিল না যাতে অতনু এ বিষয়ে কিছু জানতে পারে।

রমা চুল বাঁধছিল নিজের ঘরে বসে। আজকের বিকেলটায় তার আর কাউকেই ভাল লাগছিল না। ভাল না লাগার কোন কার্যকারণও ছিল না। এমনিই ভাল লাগছিল না। আজকাল ওর নিজের এই মুডটার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়েছে তাই এই অবস্থাটা হলে আগের মত আর বিব্রত বোধ করে না। একটু আগেই মনে পড়ল অতনু আজ ওর চিঠিটা পেয়েছে। কি হতে পারে তার মন? ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। অতনু সম্বন্ধে তো আজকাল ও কেমন উদাসীন, নির্বিকার হয়ে পড়েছে তবু কেন যে আজ আবার এতদিন পরে অতনুর ভাবনা ওকে এতটা সময় ব্যস্ত করে রাখল কি করে তাই ভাবছে। হয়তো চিঠিটা পোষ্ট করার ফলেই।

পিছনে ফেলে আসা সমস্ত ভাবনা থেকে রেহাই পেতে চায় রমা। এখানকার ঘরখানা ও সম্পূর্ণ অন্যভাবে সাজিয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে ঘর সাজাতে ও ভালবাসত আর যেভাবে ঘর সাজানোয় ও অভ্যস্ত ছিল এখন সম্পূর্ণ তার বদল করেছে। হয়তো ও নিজেকেও সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে চায়। যে জীবনটা ও ফেলে এসেছে সে জীবনে এমন কোন নাটকীয়তা কখনও ঘটেনি যাতে ওর উচ্ছলতায় কোথাও বাধা পড়তে পারে। ওর বাবা মায়ের ও ছিল একমাত্র সন্তান, বাবা মায়ের সমস্ত ইচ্ছেগুলো একা ওকে বহন করতে হত আর সবচেয়ে বিপদ হ'ল বাবা আর মায়ের ইচ্ছেগুলোর মধ্যে এতটুকু মিল নেই। দুদিকের সেই অমিলের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য টেনে আনার অসম্ভব চেষ্টায় পাক খেয়ে দিনগুলো রমার কেমনভাবে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা নিজেই বুঝতে পারেনি। ও যেন সমুদ্র মন্থনের "অমৃত কুম্ভ", নাগ পাশের প্রবল ঘর্ষণে সমুদ্র মথিত করে ওর আবর্তাব। কার ভাগে পড়বে ও। দেবতার লীলায় নিস্পত্তি আছে কিন্তু দেবতার সৃষ্ট মানুষের লীলায় অত সহজে নিস্পত্তি ঘটে না সেটা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে রমা।

ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে রমার কাজ ছিল পবিত্র হয়ে ঠাকুর ঘরে ধূপ দেখানো। দুমিনিটে ধূপ দেখানো সারা হলে একতরফের বকুনি আবার খাবার টেবিলে উপস্থিত হ'তে দেরী হ'লে যে ডিমের পোচ ঠাণ্ডা হয়ে যায় ঠাণ্ডা পোচ খেলে শরীরে কোন উপকার নেই এই কারণে আর এক তরফের বকুনি। এরপর আসে এক তরফ থেকে রান্না ঘরে গিয়ে একটু কাজকর্ম শেখার দাবী। আর এক তরফ থেকে তানপুরাটা নিয়ে গলাসাধার দাবী। রমার দিন শুরু হয় এইভাবে আর শেষ হয় অসীম ক্লান্তিতে, কিন্তু তবুও ও খুশী হয় এই ভেবে যে ও দুজনকেই খুশী করতে পারছে। এই খুশীটুকুকেই সম্বল করেই এতবড় দুরূহ পথটা অতিক্রম করতে করতে ও আজ বাইশ বছরে পৌছল।

সুনীল যখন এ সংসারে ঘনিষ্ট হয়েছে তখন রমার বয়স বড়জোর পনের কি ষোল। সুনীলকে অর্থাৎ সুনীল কাকুকে ও বিশ্বাস করতো ভালবাসতো আর ভয় পেত যেমন তেমনি নির্ভর করত তার উপর অনেক বেশী কিন্তু ভাললাগতো ওর অতনুকে। এখানেও সেই মজার ব্যাপার। এখানেও সেই টাগ্ অব্ ওয়ার। সুনীলের বিশ্বাস, রুচি, অভ্যাসে আর অতনুর বিশ্বাস, রুচি ও অভ্যাসে আকাশ পাতাল তফাৎ। তাই তাঁতীর মাকুর মত দুদিক ছোড়া দিতে দিতে রমা একদিন ভুলেই গেল কোথায় তাকে থামতে হবে, কোথা থেকে বা নতুন করে চলতে

শুরু করবে। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একদিন এই নাগ-পাশ থেকে মুক্তি পেল। যেটা কোনদিন ও ওর চরিত্রে সম্ভব ছিল না সেইটেই শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল। ও জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে সুদূর বিহারে ওর এক বান্ধবীর কাছে। সেখানকার স্কুলে মাষ্টারি নিয়েছে। এ পক্ষ ও পক্ষ দুপক্ষই ওকে ফিরিয়ে নিতে বাস্ত কিন্তু ও আর ফিরবে না। দূরে সরে এসে ও বুঝতে পারছে নিজের কি সর্ব-নাশটাই ও করেছে এতদিন ধরে।

চুল বাঁধা আর শেষ হল না, অনেকক্ষণ বাদে পুরানো ভাবনায় তলিয়ে গেল। কখন হীরা এসে ওর খাটে শুয়ে পড়েছে ও লক্ষ্যই করেনি। হীরা নিজের খাটে ডাঁই করে কাপড় রেখেছে ট্রাঙ্কটা ঝেড়ে পরিষ্কার করবে বলে। শাড়ীগুলো তুলতে তুলতে নীল চিঠির তাড়া খুলে পড়তে বসেছিল হীরা। একটির পর একটি পড়ে চলেছে। তের খানা শেষ হতে সেই চিঠির তাড়া হাতে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে রমার খাটে। তার দিকে নজর পড়তে সচকিত ফিরল রমার। চিঠি সম্বন্ধে ঠিক অতখানি আগ্রহ বা মমতা কেন ওর জীবনে তো এল না? মমতা ওর কোন বিষয়েই নেই। কিন্তু কেন নেই? সুনীল সম্বন্ধে কোন-দিন ওর মমতা আসেনি। অতনু সম্বন্ধেও না, জীবনে এমন কোন ঘটনা বা এমন কোন চিন্তা ওর মনকে বেশিক্ষণ জুড়ে রাখেনি। মা বলতেন "রমা মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে একটু একা বস। নিজের সঙ্গে একটু পরিচয় কর। নিজেকে চেন আর এই চেনার ইচ্ছেটা আসে চিন্তার মমতা থেকে।" মার এই কথাগুলি ওর ভাল লাগত কিন্তু মনে হতো ওটা যেন মার অনেক পড়াশুনার একটা বিজ্ঞাপন। তবুনি কথাটা কেমন জোলো হয়ে যেতো। ভেতরে ভেতরে হাসি পেতো। মাকে খুশী করার জন্যে বাহ্যিক একটা সায় দিত মাথা নেড়ে। আজ কিন্তু মার সেই কথাগুলোই বেশী করে মনে পড়ছে। একদিন কলেজ থেকে ওর বন্ধু রূপা ওকে জোর করে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। রোজই যেতে বলতো কিন্তু ও যেতে চাইত না, ওর মনে হত ওর এই নিতান্ত সাদা-সিধে শাড়ী ব্লাউজ রূপার ঝকঝকে মস্ত গাড়ীখানায়, রূপার পাশে মানাবে না। কেমন যেন কুঁকড়ে যেতো ও নিজের মধ্যেই।

সেদিন ওর পরনে ছিল পাশের ফ্ল্যাটের নতুন বৌর একখানা দামী শাড়ী। বৌটি জোর করে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। আর দুষ্টুমী ভরে আদর করে বলেছিল 'কান কাঁদে সোনা আর সোনা কাঁদে কান'।

তার মানে?

তার মানে এই শাড়ী তোমাকেই মানায় ভাই। সামনের ঝকঝকে নতুন ড্রেসিং টেবিলে আয়নায় ওর ছায়াটা উজ্জ্বল হয়ে পড়েছিল সেদিকে ইশারা করে বৌটি ওর দুটি আকর্ষণ করল। লজ্জায় এক ঝলক রক্ত চলকে উঠলো রমার মুখে, কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠলো। নিজেকে দেখতে পেল যেন নতুন করে, নিজেকে দেখার পুলক আবেশে কেমন একটা মোহাবেশ ওকে বড় করে তুললো। বুকের মধ্যে একটা স্পন্দন।

সেই স্পন্দিত রমা একরাশ লজ্জা আর ভালবাসা নিয়ে সোজা বাসষ্টপে কলেজের উদ্দেশ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। মনটা সারাদিনই যেন সুরে বাজছিল। হঠাৎ খুশীর হাওয়ায় প্রকৃতির সব কিছুকে স্বীকৃতি দিতে ওর ভাল লাগছিল, তাই রূপার আহ্বানকে ও সাদরে গ্রহণ করল, আজ ওর মনে হল বেমানান তো লাগবেই না বরং ওকে পাশে নিতে রূপার হয়তো বেশ গর্বই বোধ হবে।

গাড়ীখানা মস্ত বড়। ভেতরে কালো কাতারে গদী মোড়া। হাতখানা রূপার পিঠের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল হঠাৎ নজর পড়ল' নিজের সুডৌল আর গোলাপের পাপড়ির মত কমলা হাতখানা দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে আবার সেই স্পন্দন ও অনুভব করল। রূপার প্রতি একটু করুণা হ'ল। রূপা বেশী কথা বলে না সেদিন রমাই কথা বলছিল বেশী খুব স্বাভাবিক আর সময়োচিত আলোচনার অবতারণাই সে করেছিল।

রূপা বললো—

—আজ পিসির ক্লাস তুই এটেণ্ড করলি না কেন ?

—য়্যায় বোরিং

ছোট্ট করে জবাব দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল রমা।

—আমার কিন্তু মোটেই বোরিং লাগে না।

—তবে তুমি যচ্ছে।

—ধ্যেৎ আর লোক পেলি না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার রূপা আরম্ভ করে—বেশ তো, কোন ক্লাশ তোর কাছে ইন্টারেস্টিং ? —ও বাবা তাহলে তো এখন কলেজের রুটিনে ডুব দিতে হয়। ছাড় তো ওসব কথা।

রমা নিজের হাতের দিকে চোখ ফেরায়। রূপা রমার হাত স্পর্শ করে ইশারা করল। সেই ইশারা অনুসরণ করে রমা দেখে ড্রাইভারের আয়নায়—একজোড়া আকাশ নীল গভীর চোখ তারই প্রতি নিবিষ্ট।

মাথাটা সরিয়ে নেয় রমা। বিরক্তিতে মুখখানা একটু সংকুচিত হল আর রূপার চোখে চাপা হাসি। রূপার সেই হাসিটা ওর ভাল লাগেনি। কেমন যেন একটা অমর্যাদার আভাষ ও অনুভব করল। বেশ ছিল এতক্ষণ এবারে একটা অস্বস্তি শুরু হল। সারাদিনের ধুলোতে যেন একটা বেসুর বেজে উঠলো। গাড়ীর হর্ণ তীব্রভাবে বেজে উঠলো। নেপালী দারোয়ান ছুটে এসে প্রকাণ্ড গেটটা দুপাশে সরিয়ে দিল। ওদের গাড়ীটা ভেতরে ঢুকলো। ওর মনে হল যেন বিরাট একটা হাঁয়ের মধ্যে ওদের পুরে দেওয়া হচ্ছে। দুধারে সবুজ লনের পাশে পাশে নানা রকম ফুলের গাছ। গাড়ীটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। একটা গাড়ীবারান্দার তলায় এসে দাঁড়াল। এতক্ষণের সমস্ত আনন্দ উৎসাহ ওর বিস্বাদ হয়ে গেল। কেমন যেন ভয় আর সংকোচ ওর অস্তিত্বটাকে বিব্রত করে তুললো।

মার্বল পাথরে বাঁধান সিঁড়ি। দুধারে ফুলের টব। সোটিকো নিখুঁত করে সাজান। এতক্ষণ ড্রাইভার বলে যাকে ভেবেছিল সে নেমে গট গট করে এগিয়ে গেল ওদের দিকে না তাকিয়েই। রূপা ব্যস্ত হয়ে ডাকল এই দাদা, পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিস যে ? তাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই রমার দিকে হাত বাড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিল।

আমার বন্ধু রমা চ্যাটার্জি। ইনি আমার দাদা রঞ্জত সেন।

পরস্পর যথারীতি নমস্কার বিনিময় হল, রমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো

—আগে বলবি তো ?

রঞ্জতই উত্তর দিল

—আগে না বলায় ক্ষতি কিছু হয়েছে কি ? আগে জানলে আমার মত আনাড়ি ড্রাইভারের গাড়ীতে উঠতেন না নিশ্চয়ই। কথাটা হঠাৎ কেমন কাঁটার মত বিঁধল রমার কানে।

—না না আনাড়ি ভাববো কেন ? গাড়ীতে চড়া যে আপনাদের অভ্যাস আর সেটা হয়তো জন্মগত অধিকারেই। কাজেই গাড়ী চালানোর আনাড়ি ভাববো কেন ?

কথাটা এভাবে কি বলেছিল রঞ্জত ? রমার কথার সুরটা যে খুব সরল ছিল না সেটা ওরা দুভাই বোনেই বুঝতে পারল। প্রথম পরিচয়টা তিক্ত করার ইচ্ছা হয়তো কারোরই ছিল না তাই তিনজনেই সহজভাবে হাসির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো। রূপাই কথার মোড় ঘোরাল।

—মা কোথায় রে দাদা ?

—বেরোবার সময় দেখে গিয়েছিলাম মার শরীরটা তেমন ভাল নেই নিজের ঘরেই আছেন হয়তো। কেমন যেন একটা আর্তস্বরে রমা বলে উঠলো

—তাহলে আজ আমি চলি বুঝলি !

রূপা এসে ওর হাত চেপে ধরল।

—দূর পাগল চলে যাবি কেন ? তুই এলি' মার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবি ?

ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠছিল। পর পর তিনখানা ঘরের দোর পার হয়ে ওরা গিয়ে পৌছাল যে ঘরখানায় সে খানা

রূপার ঘর। ছিমছাম স্বল্প আসবাব পত্রে ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজান। রমা প্রথমেই বললে,

—বাঃ ঘরটা তো বেশ সাজিয়েছিস।

—আমি নারে, মা সাজিয়েছেন।

রমার মনে হল মা হয়তো খুব সিনেমা দেখেন। রমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে রূপা বললো,

—কি রে কি ভাবছিস? আচ্ছা তুই বস মাকে খবর দিই।

একটু পরেই রূপা ফিরে এল।

—ঐ যে বাথরুম, মুখ হাত পাগুলো ধুয়ে আয়। সারা-দিন ক্লাসের পর যা অবস্থা হয়।

—না না আমি বেশ আছি। তুই বরঞ্চ ফ্রেস হয়ে নে রূপা আর বাকাব্যয় করল না। সোজা চলে গেল বাথরুমে। ফিরে এসে ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসল। ড্রেসিং টেবিল দেখে সকালের কথা মনে পড়ে গেল। প্রকাণ্ড একটা সাজান হলঘর পেরিয়ে রূপা ওকে নিয়ে গেল দোতলায়। লম্বা বারান্দা। বারান্দার ধারে কত রকমের অকিড, কত ক্যাকটাস। সাজাবার নানা উপকরণ। সব কিছুর সংমিশ্রণ। কোনটায় বিদেশী ছাপ, কোনটায় শান্তি-নিকেতনী, কোনটা বা টেরাকোটা চং-এর। উড়িষ্যার ছাপও আছে। নানা রকম টুকিটাকি ঘর সাজাবার উপাদানে বড় মনোরম করে সাজান। দেওয়ালে, দেওয়ালে মডার্ণ পেন্টিংস। হলঘর থেকে দালান অবধি যতখানি দেখছে রমা তার কোথাও কিছু ক্লাসিকসের ছাপ নেই। সাধারণতঃ শোনা যায় বড়লোকের বাড়ীতে পুরানো আমলের জিনিস কিছু কিছু রাখা নাকি আভিজাত্যের একটা বড় প্রমাণ কিন্তু এখানে সে সব কিছুই নেই। দেশী বিদেশীর সমন্বয় আছে বটে দেশী জিনিষের একাল সেকালের বিজ্ঞাপনটা নেই।

রমার আর একটুও ভাল লাগছিল না যদিও কৌতূহল রমার প্রচণ্ড। নিজের মুখটা দেখে নিল। ওর মুখের নীচেই রূপার মুখ। সদ্য সাবানে ধোয়া। তখনও প্রসাধনের প্রলেপ পড়েনি। নিজের মুখটা ভালই লাগল। সকালের দুঃখের রেশটা রমার মনে আবার গুনগুনিয়ে উঠলো কিন্তু কেন তেমন করে কাঁকন বাজল না। মুখটা একটু ম্লান হয়ে গেছে। ইচ্ছে করছিল আলতো করে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নিতে কিন্তু পারল না। হয়তো পারত যদি ছবিদির মত একটা ছোট্ট তোবড়ানো পাউডারের কৌটা সযত্নে রাখা অনেক দিনের পুরানো রেণুকা পাউডারের অবশিষ্ট আর তাতে দীর্ঘ ব্যবহারে মলিন পাউডার পাফটা এখন পেতে পারতো কিম্বা পাশের বাড়ির নতুন বৌ-এর নতুন পাউডারটা যেখানে আনন্দ আছে, সখ আছে, লোভ আছে, লোকসানও আছে কিন্তু রূপাদের মত সমাজে লাভ লোকসান যা আছে তার প্রকাশ বড় সংযত। সে লোকসানের খবর সাধারণ লোকে পায় না। লাভের খবর যদিও একটু বেশী নজরে পড়ে তাই খুব স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ সেখানকার সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর। সেখানকার সবকিছুর মধ্যে একটা প্রত্যাশার আভাস পায়। এই সংস্কারের মধ্যে দিয়ে রমা বেড়ে উঠেছে কাজেই রূপাকে ও ভালবাসে যতখানি ঠিক ততখানিই দূরত্ব ওদের দুজনের মধ্যে। সকালবেলা বৌদির আগ্রহে সে সাড়তে আপত্তি করেনি কিন্তু এখন বন্ধুর আগ্রহকে সে উপেক্ষা করল ওর মনে হল কোথায় বুঝি একটু দয়া মিশে আছে।

—দিদিমণি আপনাদের চা দেওয়া হয়েছে সুবেশা আয়া এসে খবর দিল। সে যে পরিচারিকা মাত্র তা বোঝা গেল দিদিমণি সম্বোধনে। রূপা জিজ্ঞাসা করল—

—মা কোথায়?

—ওখানেই আছেন।

—দাদা?

—দাদাবাবুও আসছেন।

—বাপী আসেন নি?

—না তিনি এখনও বাড়ী আসেন নি।

—চল যাচ্ছি।

ফিকে নীল রংএর পাতলা একখানা তাঁতের শাড়ীতে রূপাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। সারা ঘরখানা ধূপী প্রসাধনের সুগন্ধে ভরপুর হয়ে উঠেছে। রূপার পাশে নিজেকে খুবই অগোছাল মনে হচ্ছিল রমার। আর তাই

তার মনের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য বোধের কাঠিন্য ক্রমে অহংকারের রূপ নিচ্ছিল।

চায়ের টেবিলে এসে কেমন একটা অস্বস্তি। যেন দিনেদুপুরে সাজান ঘর, কি জানি যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় সৌজন্যের ব্যাপারে। চায়ের টেবিলের সরঞ্জাম আর প্রাচুর্য, তার উপর পরিবেশনের সৌন্দর্য্য তাকে মুগ্ধ করছিল তেমনি ভীতও করছিল। খাওয়াটাকে যে এত সুন্দর, এত রুচিপূর্ণ, এত আকর্ষণীয় করে তোলা যায় এটা এই প্রথম বুঝলো রমা।

রূপা প্রথমেই মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। একটুখানি দ্বিধাগ্রস্থ হল রমা, হাতদুলে নমস্কার করবে না পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে এই ভেবে। কিন্তু রূপার মায়ের স্নিগ্ধ হাসিতে সে দ্বিধা তার নিমেষেই দূর হল। হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিতেই দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন তাকে। এই আন্তরিক স্পর্শে মনটা যেন অনেকখানি ভরে গেল। সংকোচ কেটে গেল।

—কি নাম তোমার মা?

—রমা।

—বাঃ ভারী মিষ্টি নাম, তোমরা দুজন বুঝি একই সঙ্গে পড়?

—হ্যাঁ মাসীমা।

—একই সাবজেক্ট?

—না আমার বাংলা অনার্স।

—কতদূরে বাড়ী তোমাদের? এ কথার জবাব রূপাই দিল।

—বেশী দূরে নয় মা। তবু একদিনও আমাদের বাড়ি আসেনি, কতদিন বলছি ওকে।

রূপার মা হেসে বললেন রূপাকে

—তুমি গিয়েছিলে কি একদিনও। তুমি গিয়ে নিয়ে আসবে তো?

রূপার দিকে তাকিয়ে রমা হাসল।

—কেমন এবার হল তো? তুই না গেলে আমি কিছুতেই আসব না। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রূপার দাদা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললো

—কেন আমরা কি অপরাধ করলাম। আলাপ যখন হয়েছে মাঝে মাঝে আমাদের জন্যেও অন্ততঃ আসতে হবে আপনাকে। রমা এ কথার জবাব দিল না। এ ধরনের সপ্রতিভ আলাপে রমা অভ্যস্ত নয় তবু তার মনে হল রূপার দাদাকে সে বলে আপনিও চলুন একদিন আর আপনাকেও যেতে হবে মাসীমা—কিন্তু বলতে যে পারল না কারণ দুটো বাড়ির ছবি পাশাপাশি ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। ও মনে মনে তখনি সংকল্প করল এই পরিচয়ের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হবে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা হয় না, কোন এক অদৃশ্য হাত সব কিছুর ওলোট পালট করে দেয়। পথ চলতে গেলে উদ্দেশ্য নিয়ে বেরুলে সোজা পথই যে সব্‌ সময় পাওয়া যায় তাতো নয়, গন্তব্যে পৌছতে হলে কতবার যে মোড় ঘুরতে হয় তার ঠিক নেই। কারো বা অনেক বেশী বড় রাস্তা থেকে একেবারে গলির গলি তস্য গলি কারো বা বড় রাস্তা থেকে আর একটা বড় রাস্তায়। রমার জীবনে পড়েছিল অজস্র মোড় ঘোরা, অফুরন্ত পথের অজস্র অভিজ্ঞতা, আজ বান্ধবীকে লক্ষ্য করতে করতে নিজের পুরণো দিনগুলি মনে পড়ল। কোথায় বা রূপা, কোথায় বা অতনু, কোথায় বা আর সকলে। প্রতিটি মানুষ ভিন্ন তবু কোথায় যেন একটা অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। একজনকে দেখলে আর একজনের কথা মনে পড়ে। কেন এমন হয়?

রূপার মাকে দেখার আগে নিজের মাকে ছাড়া আর কারো মাকে এমন মন দিয়ে দেখেনি। নিজের মায়ের সঙ্গে রূপার মায়ের সেদিন কোন মিল খুঁজে পায়নি রমা আজ কিন্তু পায়। তার নিজের মা, অতনুর মা, রূপার মা এরা তিনজন তো সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ তবু কোথা যেন একটা মিল রয়েছে।

রূপাদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে রমা সেদিন খুব অন্যমনস্ক ছিল। ওদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে নিজেকে কেমন যেন অপমানিত মনে হচ্ছিল।

মা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, গম্ভীর মুখে ওকে ফিরতে

দেখে তাঁর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল

—কি হয়েছে রমা? আজ এত দেরী কেন?

—রূপাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, রূপা কিছুতেই ছাড়ল না, জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

—"ও!" ছোট্ট একটু জবাব কিন্তু ওজন তার অনেক বেশী। সুনীল আগে থেকেই এসে বসেছিল। সেই প্রশ্ন করল।

রূপা কে?

মা জবাব দিলেন

—তার সঙ্গে রমার আকাশ পাতাল তফাৎ।

—কেন? প্রশ্ন করে সুনীল।

—শুনেছি তারা খুব বড়লোক।

—ওঃ তফাৎটা তাহলে টাকায়? সুনীল একটু ব্যঙ্গের সঙ্গে বলে। উত্তরে মা বলেন

—সেটা কি খুব বেশি রকম তফাৎ নয় সুনীল?

—নাঃ, আমি তা বিশ্বাস করি না।

আলোচনাটা এখন মা আর সুনীলকাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বুঝতে পারল রমা—এবং এর পরিণতিটা হয়তো খুব সুখকর হবে না। তাই সে আস্তে আস্তে উঠে যেতে চাইছিল কিন্তু সুনীল তা হতে দিল না।

—তোর কি মনে হয় রমা?

—সত্যিই ওদের জাত একেবারে আলাদা সুনীলকা।

—কিসে বুঝলি?

—প্রতিদিন ওদের যে কত অপচয়।

—কি রকম?

—কি প্রকাণ্ড বাড়ি ওদের। কত ঘর যে অযথা পড়ে রয়েছে নামমাত্র ব্যবহারের নামে তার ঠিক নেই। এই ক্রাইসিসের যুগে ভাড়া দিলে নিজেদেরও আয় বাড়ে আর কিছু লোক মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়ে বেঁচে যায়।

—কি করে বুঝলি, ঘর গুলোর ব্যবহার নাম মাত্র রয়কারে?

—তা নয়তো কি? ড্রইংরুম, ডাইনিংরুম, অতিথিদের জন্য আলাদা ঘর, বাড়ির লোকদের প্রত্যেকের নিজস্ব ঘর লাগোয়া বাথরুম আর দালান ড্রইংরুম, তাছাড়া বাড়িতে লাইব্রেরি, অফিস, একটা ঘরে বস্তা রুম—শুধু বাস্তু রাখা হয়। একটা ঘরে বাড়তি বিছানা। এছাড়া কাজের লোকেদের ঘর, ড্রাইভারের ঘর—ও বলে শেষ করা যায় না। খাওয়ার প্রাচুর্য্য দেখলে সেই সময়টা ভুলে যেতে হয় যে আমাদের দেশে কোন ভিখিরি আছে, যারা দিনান্তে একমুঠোও খেতে পায়না। ওরা খাওয়ার পর পাতে যা পড়ে থাকে তাতে হয়তো দুটো গোটা পরিবারের খাওয়ার সংস্থান হয়ে যায়। পরণের কাপড়, পোষাক আসাকের খরচটা কি ইচ্ছে করলে আর একটু কমান যায় না?

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে রমা হাঁফিয়ে পড়ল। মুখ চোখ গরম হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ নিরুদ্ধ অমর্য্যাদাবোধের প্রতিক্রিয়ার পর যেন একটু শান্ত হল। এই আলোচনার বোধহয় দরকার ছিল। সুনীল কিন্তু তেমনি নির্বিকার। মৃদু হেসে আর স্বভাবজাত সংযত ভংগীতে বললো—

—তোর পরণের শাড়িটার কত দাম রে রমা?

—কত আর, ছত্রিশ টাকা!

—এর কমে শাড়ি পাওয়া যায় না?

—যাবে না কেন? তবে ভদ্র সমাজে পরা যায় না।

—ভদ্র সমাজে বলতে?

রমা একটু হকচকিয়ে গেল। একটু থতমত খেয়ে বলে, এই আমাদের মত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর কি।

—মাষ্টার মশাইর স্ত্রী এই রকম শাড়ি পরেন?

—না, তা অবশ্য পরেন না।

—তারা ভদ্রলোক তো:

—মাষ্টার মশাইর যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে স্ত্রীকে নিশ্চয়ই এই রকম শাড়িই কিনে দিতেন।

ব্যা সেইটেই আমার কথা। রূপাদের ক্ষমতা আছে তোদের চেয়ে আরামে থাকার তাই তারা জীবনকে না না স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চায়। যেমন তোদের ক্ষমতা আছে মাইভিদের চেয়ে আরামে থাকার। তোদের গরম কালে মাথার ওপর ফ্যান আছে, শীতে গায়ে দেবার

লেশ আছে, কিন্তু ম্যাট্রিমণাইদের তা নেই।

—ঠিক তাই! দাদা, তোর বাবাও, তাঁর ক্ষমতায় যতটা পারেন ততটাই করেন। আর আর বাড়াতে পারেন নি, রূপার বাবা হয়তো আজও আর বাড়িয়ে চলেছেন।

এতক্ষণে রমার মা মুখ খুললেন।

—তা বলে একটা সীমা তো থাকবে?

—না, বৌদি! এ ব্যাপারে সীমা থাকেনা, কারণ সীমা রেখার নির্দিষ্ট কোন সীমানা নেই। সামর্থ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনটাও বেড়ে যায়। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন আমরা নিজেরা যখন গাড়ি চড়ে যাই তখন আর কারও গায়ে কাদার ছিটে লাগল কিনা দেখিনা, কিন্তু আমরা যখন রাস্তায় পায়ে হেঁটে চলছি তখন অন্যের গাড়ির চাকার কাদা আমাদের ভয়ানক ক্রোধের উদ্রেক করে। আপনি একটু ভেবে দেখবেন আমার কথাটা।

রমার মনে হল সুনীলকাকু হয়তো ঠিকই বলেছেন। রূপার বাড়ির ঐশ্বর্য্য, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য সবই ওর কাছে বিলাস আর প্রাচুর্য্যের বিজ্ঞাপন বলে মনে হয়েছিল। রূপার দামী রত্নতের নিখুঁত আর দামী পোষাক, মায়ের ওর, রূপার উচ্ছলতা সবই তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই কি তাদের ব্যবহারে কোন প্রচ্ছন্ন প্রচার ছিল? সেদিন যখন রত্নত ওকে গাড়ি করে পৌছে দিতে চেয়েছিল ওর মনে হয়েছে রত্নত হয়তো ওকে দয়া দেখাচ্ছে। তাই বেচারার আন্তরিক অনুরোধের জবাবে ওর আচরণের রূঢ়তা রত্নতকে কেমন করুণ করে তুলেছিল। তার কারণটা রত্নতের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কারণ রত্নত হচ্ছে সেই জাতের মানুষ, যাদের পরিচিত মহলের মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। ওর পরিবেশ একই ছাঁচে গড়া সেখানে কেউ ভদ্রতা করলে অহেতুক দয়া মনে করে আঘাত দেয়না। স্বাচ্ছন্দ্যকে অন্যের প্রতি অবিচার বলে ধরে নেয় না। বা প্রয়োজনকে বিলাস বলে অপমান করে না। তাই রমার প্রত্যাখ্যানটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু পেরেছিলেন রত্নতের মা এবং চিন্তিত হয়েছিলেন। রমার এ আচরণ সমাজের কাছে অপরিচিত। অপরিচয়ের একটা রহস্য আছে তাই তার প্রতি আকর্ষণ মানুষের অনেক বেশী। রমাও হয়তো এ পরিবারে সেই দিনই ইস্তফা দিত যদি না আর সুনীলকাকুর আলোচনায় যোগ না দিত।

সুনীল যেন আগাগোড়াই ওদের বিলাসটাকে প্রয়োজন বলে সমর্থন করে গেল। সুনীলের যুক্তির কাছে ওরও যেন মতের পরিবর্তন হল। এতদিন যেন কোথায় একটু ভুল ঘটেছিল। দৃষ্টি শক্তিটাকে একটি মাত্র জেবে আবদ্ধ রাখলে এই রকমই ঠিকে ভুল হয়। মনের বাতাস ওমোট হয়ে ওঠে, তাতে অকারণ মানসিক বৈরের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে ওঠে। এমনি করেই সুনীল ওর অনেক ভুল ভেঙে দিয়েছে কিন্তু একেবারে ভেঙে দিতে পেরেছে কি?

সেদিন অতনুর সঙ্গে সুনীলকাকু আর মায়ের আলোচনার বিষয় বস্তু নিয়ে কথা হচ্ছিল। অতনু কিন্তু সুনীলের যুক্তিকে মোটেই সমর্থন করেনি এক কথায় বুর্জোয়া মনোবৃত্তি বলে নস্যাৎ করেছিল। রমা দুঃখও পেল কিন্তু একটা স্বস্তিও পেল। যুক্তির দিক দিয়ে না হোক বিশ্বাসের দিক দিয়ে। মন ভারী হল, এতে সে সুখীই হল। মন খুলে ওর ধারণাটাকে মেলে ধরল, যা পারেনি সুনীলের সামনে কারণ সেখানে বিশ্বাসের চেয়েও যুক্তিটা বড় ছিল। যারা ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসে তারা সেই সব খেলার টিকিট কাটবে তাদের জন্যেই, যারা ক্রীড়া-রসিক। শুধুমাত্র সঙ্গ কামনার বশবর্তী হয়ে ভিন্নধর্মী মানুষকে ডালে ঝোলে অম্বলে সব তাতেই মিশ খাওয়াতে গেলে ভুল ঘটবেই। সেই ভুল ঘটল সুনীল সম্বন্ধে রমার। তাই সুনীলের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের সঙ্গে একটা সুপ্ত বিরোধ ক্রমশই বেড়ে চলতে লাগল আর সেই বিরোধে ইন্ধন যোগাল অতনু। অতনু আর রমার বিশ্বাসে আর অভ্যাসে মিল ছিল। ঠিক সেই কারণেই সুনীলের সঙ্গে রমার দূরত্বটা গড়ে উঠেছিল। রমার সঙ্গে সুনীলের এই বিরোধে সুনীল দুঃখ পেত যদিও সে দুঃখের কোন প্রকাশ ছিলনা। রমা তাই জানতেও পারেনি কিন্তু জানতে পেরেছিলেন রমার মা। তাঁর কাছে সুনীল মন

খুলে সবই বলতো। সুনীলের অন্তরের একটি প্রচ্ছন্ন অংশে উদয় সূর্যের মত রক্তিমাভায় বিকশিত হয়ে আছে রমার জন্যে সেটা তিনি অনুভব করতেন কিন্তু সেই স্পর্শকাতর লালিমাটুকুর ব্যর্থতা সম্বন্ধে তাঁর মন যেন স্থির নিশ্চয় ছিল কারণ তিনি জানতেন তাঁর মেয়ের মন কোথায় বাঁধা পড়ে আছে।

সুনীল বড় একা, তার পাণ্ডিত্য তাকে উঁচু বেদীতে বসিয়ে তার আর সবার সঙ্গে পার্থক্য ঘটিয়েছে। তার রুচির শুচিবাই তাকে দার্শনিকের দলে সরিয়ে দিয়েছে। তার সংস্পর্শে এলে মানুষ একই সঙ্গে হতাশ হ'ত আবার উৎসাহিতও হ'ত। হতাশ হত নিজেদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে—আর উৎসাহিত হত সুনীলের সাহচর্যে সেই অজ্ঞানতা দূর হবে এই আশায়। সুনীলের সহজ আর স্পষ্ট বিশ্লেষণধর্মী আলাপে লোকে তাকে শ্রদ্ধাও করতো যেমন, ভয়ও পেত তেমনি। সেই শ্রদ্ধাকে অনেকে ভালবাসা বলে ভুল করেছে। সময় বিশেষে জানাতে পেরেছে যে সেটা ভালবাসা নয় ভয় লাগা। সে জানতো সে কারো কাছের মানুষ নয়, এর জন্য একটা হাহাকার তার বুকের মধ্যে সর্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে যদিও প্রাণপণে সেই কাতরতাকে সে লুকিয়ে রেখেছে। রমার প্রতি সুনীলের স্নেহের স্বরূপটা রমা কোনদিনও ধরতে পারেনি—সে জানতো স্নেহটা তার প্রাপ্য আর এই স্নেহের কোন ভাগীদারকে সে সহ্য করতে পারত না।

সুনীলকাকুর মতের সঙ্গে তার মিল হয় না অথচ সুনীলকাকু তাকে ভালবাসেন এর একটি মাত্রই কারণ সে ধরে নিয়েছিল সেটা হল, তার মায়ের সঙ্গে তার মতের মিল। মা আর সুনীলকাকু এক জাতের। বাবা ছিলেন সাদামাটা মানুষ। ধর্মভীরু, সৎলোক। সংস্কারের অজস্র বাঁধনে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। মা ছিলেন্ সম্পূর্ণ বিপরীত। মায়ের জীবনে বাবার প্রভাব বিশেষ কার্যকরী হয়নি। তবে মা শান্তি-প্রিয় তাই বাবাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি, তাছাড়া বিপরীত ধর্মী হলেও, তাঁদের মধ্যে একটা বন্ধন ছিল যেটার স্বরূপ দুজনের একজনেরও জানা ছিল না। যদি কোন বন্ধনই সেখানে না থাকতো তাহলে হয়তো রমার জীবনে এই অসঙ্গতিটুকু ঘনিয়ে উঠতো না।

পরের দিন রমার একেবারেই ক্লাশ করতে ইচ্ছে ছিল না বললে ভুল হবে। কিছু করেই কলেজে যায় নি। রূপার মুখোমুখি হতে আজ ওর মন চাইছিল না অথচ ওর সম্বন্ধে ওদের বাড়ির মতামতটাও জানবার কৌতূহল খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ওদের সম্বন্ধে যে তিক্ততা নিয়ে ও বাড়ি ফিরেছিল সন্ধ্যার আলোচনার পর সে তিক্ততাটা আর অতটা তীব্র ছিল না। ওদের বাড়িটা ভেসে উঠছিল চোখের ওপর। রঞ্জনকে কেমন যেন অন্যরকম মনে হচ্ছিল ওর। ও ধরণের ছেলেকে আগে কখনও দেখেনি। ওর মেলামেশার জগৎটা ছিল খুবই ছোট। মেলামেশার বাধা বাড়ির দিক থেকে ছিল না, ছিল ওর নিজের দিক থেকেই।

ওখান থেকে ফিরে এসে সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছিল রূপার মায়ের কথা। ওখানে যেন ওঁকে মানাচ্ছিল না। ঠাকুর ঘরের সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে সাধাসিধে বাড়িতেই যেন ওঁকে বেশী মানায়। উজ্জ্বল দেখায়। গাছে ফুটে থাকা অনাঘ্রাত ফুলের মত একটা পবিত্রতা যেন ওঁর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। ঐ বৈভবে যেন ওঁর রুচি নেই। সংসারে কিছুর প্রতিই ওর যেন বিতৃষ্ণাও নেই, অনুরাগও নেই। বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ, কথাটাতেই যেন ওকে আপন করে নিয়েছেন।

কদিন পরে রূপার সঙ্গে দেখা হল রমার। রূপাই এগিয়ে এসে বলল, কারে! বেশ মেয়ে তো? সেদিনের পর থেকে আর দেখাই নেই। ভাল লাগেনি বুঝি আমাদের বাড়ি?

—ঠিক তার উল্টো। ভাল এত লেগেছে যে তোকে দেখলেই তোদের সঙ্গ পাবার জন্যে মনটা ছটফট করবে তাই ইচ্ছে করেই সরে ছিলাম।

—তাই নাকি?

রূপার মুখের হাসিটা যেন ম্লান মনে।

—তা বেশ তো, ছটকটানি যদি চলেই থাকে তাকে থামাতে তো ক্ষতি নেই ?

—না, না, বেশি ঘনিষ্ঠতার ফল ভাল নয়।

—থামা তোর তত্ত্বকথা। বল কেমন লাগল আমাদের বাড়ি ?

বাড়ি খুব সুন্দর। ডিজাইন খুব আধুনিক, মেজেগুলো আরো সুন্দর তবে পা পিছলে যাবার ভয়টা খুব বেশি। বাড়ির ডেকরেশান অপূর্ব। ও বাড়িকে প্রাসাদ বলা চলে।

হাসতে থাকে রমা।

—আঃ কি বাজে বকছিস ? আমি কি তাই জানতে চাইছি ?

—তবে ?

—আমাদের বাড়ির পরিবেশ—না থাক দরকার নেই বাবা, আবার এখুনি কি বকতে সুরু করবি কে জানে। শুধু বল আমার মাকে কেমন লাগল ?

—সত্যি বলব ? তোর মা বলে মনেই হয় না।

—তার মানে ?

—অমন শান্ত মায়ের এমন ছন্নছাড়া মেয়ে কি করে হল বলতো ?

দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। রূপা জিগ্যাসা করল

—ড্রাইভার সাহেবকে কেমন লাগল ?

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে রমা জবাব দিল,

—তোর দাদাকে ? বেশতো ভালই লাগল।

—উঁহু ! তেমন করে ঝাঁকন বাজল না।

—কতটুকু দেখলাম বল যে মানুষটা সম্বন্ধ সমালোচনা করবো।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে দেখা যেত রূপাদের কালো প্রকাণ্ড গাড়িটা এসে কলেজ গেটে দাঁড়াতে। রমাকে আর রূপাকে নিতে এসেছেন স্বয়ং রঞ্জত সেন। রূপা প্রায়ই অনুরোধ করতো ওদের গাড়িতে যাবার জন্যে। রমা কিন্তু এড়িয়ে যেত রূপা হাত ধরে টানাটানিও করত। শেষ পর্যন্ত রমাকে না নিয়েই ফিরে যেতে হত। এই ব্যাপারটা নিয়ে একটা চাপা গুঞ্জন কলেজ বিল্ডিংএর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াত। রূপা গ্রাহ্য করেনি কিন্তু রমা করেছে। তাই রমা শেষ পর্যন্ত সাড়া দিল।

সেদিন ড্রাইভার এসেছিল। রমার মনের সমস্ত ভার সুনীলের কথায় কেটে গিয়েছিল। সে তার যথারীতি সাদা-সিধে পোষাকেই রূপার বাড়ি যেতে একটুও দ্বিধা করেনি। কোরিডোরে দেখা হল রঞ্জতের সঙ্গে। রঞ্জতকে সেদিন ভারি ভাল লাগছিল। ঢিলে চালা পায়জামা। আর শাল পাঞ্জাবী। এ পোষাকে যে ওকে কোনদিনও দেখা যাবে রমা কখনও আশা করেনি। ওর দৃষ্টিতে তাই কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা প্রশংসা ফুটে উঠলো। সেটুকু রঞ্জতের বুঝতে দেরি হয়নি। রঞ্জতের মন যদি বিশ্লেষণ-ধর্মী হত তাহলে হয়তো এইটে নিয়ে অনেক কিছু ভাবতে পারত। যে ছেলে শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত সুরুচিপূর্ণ মেয়েদের কাছ থেকে অনেক তারিফ পেয়েছে, সে আজ এই অতি সাদাসিধে নিতান্ত ঘরোয়া মেয়ের সপ্রশংস দৃষ্টিটুকুকে মূল্য দিল কেন ? এটা হয়তো প্রশ্ন সাপেক্ষ।

—আসুন, এতদিনে আমার কথা মনে হল ? আজ রমা অনেক সহজ তাই অনায়াসে বলতে পারল।

—আসতে কি বলেছিলেন একদিনও ?

—তাই বুঝি ?

—মাসীমার কাছে এসেছি।

—তাহলে আমাদের প্রবেশ নিষেধ।

—না, তা নয়, প্রবেশের অনুমতি দিতে পারি কিন্তু একটা শর্তে।

—শর্ত ?

—হাঁা, গান শোনাতে হবে।

—গান ? আমি ?

—হাঁা, আপনি। আগে বলুন শোনাবেন কিনা ! না হলে ! কৈ রূপা কোথায় ? চল্লাম তবে।

—কি মুস্কিল দাঁড়ান্ দাঁড়ান্। শোনাব না বলেছি কি ?

রূপা ততক্ষণে তার নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে

ওদের কথা শুনে হাসছে। রূপার ঘরে গিয়ে রমা নিজেই বললো

—তোর তোয়ালেটা কোথায় ?

রূপার বড় ভাল লাগল এই সহজ ব্যাপার। খুশী হয়ে বললো

—বাথরুমে আলমে ! গোসলখানায়ে সব কুছ তয়ার হ্যায়।

—ঠিক হ্যায়।

বলে রমা অনায়াসে চলে গেল ঘরের লাগোয়া বাথরুমে। আলতো করে পাউডারের প্রলেপে, সামান্য প্রসাধনে তাকে এত সুন্দর লাগছিল, রূপা মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখছিল।

ওরা দুজনে যখন চায়ের আসরে এল, তখন সেখানে আর সব্যুই এসে গেছে। আজকে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছিল বাগানের লনে।

চোখে ভারী সেলের চশমা। সুপুরুষ গৌরবর্ণ ভদ্রলোক, বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও একটা অনড় তারুণ্য যেন ঘিরে রেখেছে ভদ্রলোককে। ইনিই রূপার বাবা। পরিবারের সকলেই যে এত সুন্দর হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রূপা কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি নিস্তব্ধ করে দিল রমাকে। রমা না পারল মাথা নুইয়ে প্রণাম করতে না পারল হাত তুলে নমস্কার করতে। তিনিও সে সবের সুযোগই দিলেন না। হাসি মুখে বললেন,

—আই সি, বেশ ! বেশ ! তুমিই রমা ? কদিন ধরেই গুরুর মুখে তোমার নাম শুনছি। তোমার মাসীমার কাছেও। বলে সস্নেহে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ওঁর দিকে। রমার মনে হল সে চাউনি যেন অর্থপূর্ণ।

তারপর রূপার দিকে চেয়ে বললেন,

- তোমার রুচির প্রশংসা করি। বলেই উঠে দাঁড়ালেন।

—আজ তো আমার আর বসবার সময় নেই তোমরা বোস—আমাকে এখুনি একবার বেরুতে হবে। আসবে নাকি তুমি ? স্ত্রীর দিকে তাকালেন। রূপার মা সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন। রমার দিকে চেয়ে বললেন,

—আবার এস, কেমন ?

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন

—খুকু ! তুমি রমাকে একটা ছুটির দিনে সকালেই এখানে নিয়ে এস, সকলমে খাওয়া দাওয়া করা যাবে, রাজী তো ? রমা উঠে গিয়ে পায়ের ধুলা নিল তারপর রমা, রূপা, রজত তিনজনে মিলে চায়ের শেষ পর্বটা সহজে গুজবে আর গানে ভরিয়ে তুললো। বিকেল গড়িয়ে এসেছে। এবারে রমাকে ফিরতে হবে। রজত রূপাকে বললে,

—চল্, রমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তিনজনে উঠে গাড়ির কাছে গেল। রমা উঠে বসেছে। রজত গিয়ে বসেছে স্টিয়ারিং-এ। হঠাৎ রূপা বলে বসলো

—দাদা, তুই যা ওকে পৌঁছে দিয়ে আয়। জীবন ভুল হয়ে গেছে। মায়ের আজ সারাদিন উপোষ গেছে, আজ মাহবুদের হাতে মা খাবেন না। আমি মায়ের খাবারটা করে রাখি।

রমা বিস্মিত হল, খুশী হল, সংকুচিত হল। রূপা তাহলে সংসারের কাজ করতেও জানে। ভাল লাগল। যত তাদের সংস্পর্শে আসছে তত ওদের সম্বন্ধে ধারণা ওর পালটে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত আর ধনীদের মধ্যে এই যে পাঁচিল এর বেশির ভাগ যায় মশলাই ভুলে ওরা। অর্থ সবাইকেই অমানুষ করে তোলেনা। সুনীলের কথা মনে পড়ল। সুনীল বলেছিল

"হাত তুলে দেবার যত ক্ষমতা থাকলে তবে তো মানুষ দিতে শিখবে ? আর্থিক সম্পদ মানুষের মানসিক সম্পদও কিছুটা বাড়ায় বৈকি।" অতনু একথায় টেবল চাপড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কথাটা অবশ্য বেশিদূর এগোয় নি। আজ আবার মনে পড়ল। এঁরাও নীল, ষষ্ঠী, এদের পালন করেন, এঁদের মেয়েরাও-রান্না ঘরের তাপ সহ্য করতে পারে। নিজের হাতে কাজ শিখে খুশী হতে শিখেছে।

রজত গাড়িতে স্টার্ট দিল। রমা মনে মনে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। এত রাতে একা রজতের গাড়িতে ..... কি জানি বাড়িতে এ ব্যাপারটা কি ভাবে নেবেন সবাই! বাবাকে ভয় নেই, মা ম্যানেজ করবেন কিন্তু মা নিজে যদি এটাকে ভাল মনে না নেন? তারপর সুনীল কাকা? যাঁর ভাল না লাগলে ইঞ্জন যোগাবেন। সব মিলিয়ে মনটা ওর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেললো। কিছুদূর গিয়ে রজত বললো

—একা মুখ বুজে বসে আছেন, আপত্তি যদি না থাকে সামনে চলে আসুন না। বলতে বলতেই ব্রেক কষে গাড়ি থামাল। রমার তখন ভাববার অবসর নেই, তাছাড়া ব্যাপারটা সৌজন্য বিরুদ্ধ, রজতকে যেন কেবল ড্রাইভার বানিয়েই দেওয়া হচ্ছে: তবু নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়েই সামনে এসে বসল।

—কি হ'ল আপনার? হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন?

—কৈ না তো!

—না বললেই হ'ল: একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

—বলুন।

—হঠাৎ হঠাৎ আপনার এমন মুড চেনজড হয়। তখন মনে হয় বুঝি কিছু অপরাধ করে ফেললাম।

—না, না, এ নিয়ে এত ভাবছেন কেন?

—কেন তা জানি না।

হয়তে এ জিনিষটার সঙ্গে পরিচিত নয় বলে সহজ ভাবেই কথাটা বলেছিল, তাই কোথায় গিয়ে যে আঘাত করল রমাকে তা সে জানতেই পারল না। রমা অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল। রজত আবার বলল,

—কৈ, বললেন না?

—উত্তর শুনবেন?

—আগ্রহ হচ্ছে খুব অবশ্য আপনি যদি এটা অন্যায় আগ্রহ বলে মনে করেন তা হ'লে না হয় থাক।

—দেখুন আপনারা যেমন আমাদের মুডগুলোর সঙ্গে পরিচিত নন হয়তো আমরাও আপনাদের মুডগুলোর সঙ্গে পরিচিত নই। তাই এমন হয়। তা ছাড়া.....

—একটা কথা।

থামিয়ে দেয় রমাকে। তারপর বলে

—প্রথমেই বলি, আপনি বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন? আপনার মুডের সঙ্গে আমি পরিচিত নই কিন্তু সেটাতে বহুবচন জুড়ে গৌরব বাড়াবেন না কিন্তু।

—রজতবাবু! আমি নিজেই যে এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে মনে হয়

—কি মনে হয়?

—মনে হয় এখানে আসার পর থেকে এই সমাজটা সম্বন্ধে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।

—খারাপের দিকে তো?

—না, বরং ঠিক উল্টো। কোথায় যেন ভুল হয়েছিল।

—এত শিগগির মতের পরিবর্তন হওয়াটাই ঠিক নয় রমা দেবী। আরো কিছুদিন দেখুন। আমাদের আরও বিচার করুন। আমাদের পুরো সমাজটার সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর প্রকাশ করবেন আপনার অভিমত।

—আপনি কি দুঃখ হলেন? আমি কিন্তু আঘাত দেবার জন্যে কিছু বলিনি।

—না, না, মোটেই তা নয়, বরং মুক্তি পেলাম আপনার সহজ সরল অভিব্যক্তিতে সত্যই আমাদের সমাজে যেটার অভাব। জানেন রমা দেবী, আমার মাঝে মাঝে কি রকম হাঁফ ধরে। সাজান হাসি! সাজান কথা, সাজান আচার, আচরণ যেটাকে বলা হয় কালচার্ড এ্যাটিচ্যুড—আমি সহ্য করতে পারি না। এ্যাটিচ্যুড যখন তৈরী করা হয় তখন তার মধ্যে সত্যি কোথায়? জীবনের সর্বত্রই বাঁধা ধরা এই নিয়ম। নিয়মের জেলখানার বন্দী প্রাণটা খোলা আলোয় তলায় বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করে। আমার বিশ্বাস রমা দেবী এ শুধু আমার একার অবস্থা নয়। এমন ভাবনা হয়তো আরো অনেকের, তবু উপায় নেই। চোরের হাওয়া যদি গায়ে লাগতে ইচ্ছে করে উপায় নেই, গায়ে ব্লেসিং গাউন

চাপিয়ে ভদ্রতাটা বজায় রাখতে হবে। চায়ের টেবলে এসে সবদিকে শুভ ইচ্ছা জানাতে হবে, যদি ইচ্ছে না করে তবুও।

—নিয়মে যদি এত আপত্তি, জোর করে নিয়ম ভাঙেন না কেন?

—তা হয় না।

—কেন হয় না রজতবাবু?

—কারণ আমরা সামাজিক জীব!

—কিন্তু সমাজ তো আমাদেরই ইচ্ছে দিয়ে তৈরি।

—রমা, তুমি ছেলে মানুষ। অপ্রস্তুত হয় রজত। হঠাৎ তার বুক চিরে তুমি বেরিয়ে যাওয়ায়। এর আগে অনেকবার রমার সঙ্গে দেখা হয়েছে পিকনিকে, কৃপার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে, জন্মদিনের পার্টিতে কিন্তু কখনও রজত রমাকে তুমি বলেনি। সীমারেখার বাইরে এতটুকুও এগিয়ে আসেনি। আজ তার তুমি সম্বোধনে বিস্মিত হল রমা। আর আশ্চর্য এক উপলব্ধি ওর সমস্ত মনের মধ্যে মৃদু সৌরভের মত ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একেই কি বলে রোমাঞ্চ? পুলক? 'গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘোর' —লাইনটা বারে বারে রমার মনে পড়ছিল। এর পরেও যখনি সে সেদিনের কথাগুলো নিয়ে ভাবনার জাল বুনেছিল আপন খুশীতে, ওর ইচ্ছে করেছিল চিৎকার করে বলে ওঠে তুমি বলায় কোন দোষ হয়নি। এতদিন না বলাতেই বরঞ্চ দোষ হচ্ছিল কিন্তু বলতে পারল না কিছু। ঘন পল্লবে ঢাকা চোখ দুটো লজ্জায়, নম্রতায় স্নিগ্ধতায় যেন নুঁয়ে এসেছিল। সেই আনত চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে রজতের পৃথিবীর রং বদল হল। এমন একটি মুহূর্তের জন্যে ওর মন যেন এতদিন তৃষিত হয়ে ছিল। অতি ধীরে শান্ত সুরে সে প্রশ্ন করল

—তুমি রাগ করনি তো? কৈ উত্তর দিলেনা? দেবে না উত্তর?

রমা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল যে সে রাগ করেনি। প্রসঙ্গান্তর হবার প্রশ্রয় পেল রজত। বলে—

—তবে চোখ তুলে চাও আমার দিকে। রমার দীর্ঘ পক্ষ চোখ দুটি বার কয়েক কেঁপে উঠলো। বারে বারে রজতের আকুল অনুরোধে চোখ তুলে চেয়ে দেখলো। অতল দীঘির মত গভীর আর উত্তাল সমুদ্রের মত স্বচ্ছ নীল চোখ দুটির দিকে। সে চোখের অধিকারী রজত সেন। দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল অপলক দৃষ্টিতে। সেদিন সেই চেয়ে থাকার মধ্যে যত কথা তাদের বলা হয়েছিল তেমন বুঝি আর কোনদিনও হবেও না কারণ সেই লগ্ন জীবনে একবারই আসে। গাড়িটা এতক্ষণ পার্ক করা ছিল রাস্তার ধারে। ওরা বসে ছিল বশোর রোডের কোল ঘেঁষে নির্জন একটা ম্যাঠের গাছের তলায়। যখন ওরা ওখানে পৌঁছেছিল তখন সূর্যের রং ছিল লাল তারপর কখন সে রং ফিকে হয়ে গেছে। চারদিকে ফুট ফুটে চাঁদের আলো। হঠাৎ মনে হল রজতের, এত রাতে এই নির্জন জায়গায় এ ভাবে বসে থাকাটা ঠিক হবে না। জায়গাটায় বদনাম আছে। বিপদ এলে সে একা। হঠাৎ যেন নতুন এক দায়িত্ব বোধ তার মধ্যে জেগে উঠলো। বেশ জোরের সঙ্গে বললো—

—চলো ওঠা যাক্।

—চলুন।

—এত চুপ হয়ে গেলে কেন?

—কৈ না তো?

—আজ বেড়াতে এসে কি ভাল লাগেনি?

—আপনার?

—এর উত্তর কি তুমি জান না?

—জানি।

অনেকক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে। গাড়িতে উঠেছে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। দুজনেই চুপচাপ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রজত প্রশ্ন করল

—অমন চুপ করে কেন?

—ভাবছিলাম।

—কি?

—ভাবছি আপনার চোখ অমন স্বচ্ছ নীল কেন ; ঠিক যেন—বিদেশীর চোখ।

—ঠিকই তো।

—মানে ?

—মানে আমি তো এখনও তোমার কাছে বিদেশী। নয় কি ?

হেসে ওঠে রজত, রমাও যোগ দেয় সে হাসিতে কিন্তু লজ্জার জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। লোকালয়ের আলো আর কোলাহলের মধ্যে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। রজত তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল রমার দিকে। রমা আলতো করে ছুঁয়েছিল সেই হাত। সেই দুটি হাতের স্পর্শের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছিল অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক সম্ভাবনা। সে দিন ওরা কোন কথা বলেনি। কিন্তু সেদিনই বোধ হয় দুজনে দুজনের বুকের ভাষা স্পষ্ট করে জানাতে ও জানতে পেরেছিল।

রমার বাড়ির সীমানায় এসে গাড়িতে ব্রেক কষল রজত। রমা অন্য দিনের মত আজ আর নমস্কার জানায় নি। বন্ধুবাদ দেয় নি। হাসিমুখে বিদায় সম্ভাষণ জানায়নি। কাঁপা কাঁপা চোখের তারায় আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিল।

অতনু জেনেছিল রমা ও বাড়ির প্রতি আগ্রহশীল কিন্তু কতখানি তা সে জানতো না। প্রায় দিনই তার ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে রমা বিকেলটা কাটায় অন্যত্র অথচ পরিষ্কার করে রমা কিছু বলে না। আগে বলতো, কিন্তু ইদানিং রূপার কথা উঠলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতো অতনু। ভাল লাগত না রমার অতনুর এই ছেলে মানুষী কিন্তু তাকে আঘাত দিতেও পারত না। ও ছিল তার বন্ধু। বন্ধু অর্থে যা বোঝায় ঠিক তাই কিন্তু সেই বন্ধুত্বের দাবিতে সে যখন অতিভাবকত্ব ফলাত সেটাই অসহ্য হত রমার পক্ষে। রমা প্রথমে তাকে বোঝাতে চাইত—একদিন বলেও ছিল

—দূর থেকে দেখলে দেখার অনেক ভুল থেকে যায়, ওদের সম্বন্ধে তুমি সেই ভুলটাই করছ।

অতনু বলেছিল,

—ঠিক তার উল্টোটাও তো হতে পারে ? কাছে থেকে অনেক সময় মায়া তৈরি হয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। ভালবাসার দাবিতে ভুলত্রুটি গুলোকে মানুষ উপেক্ষা করে, তখন আবেগের সৃষ্টিতে বিচারে গরমিল ঘটায়।

—তাহলে তো কারো সঙ্গেই মেলামেশা করা চলেনা।

—কেন চলবেনা ? সমানে সমানে করাই ভাল।

—তাহলে তো সব আগে তোমাকেই বাদ দিতে হয় অতনু।

—কেন ?

—কারণ তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক ধনী।

—বাজে কথা রাখ।

—দেখ অতনু, এ সব কথা থাক। মোট কথা সৌদ্ধাবী আমি পছন্দ করি না। ধনী হলেই খারাপ হবে এমন বিশ্বাস নিয়ে ঠকতে আমি রাজী নই। মানুষকে আমি ভালবাসি। মানুষকে আমি জানতে চাই। মানুষকে আমি বুঝতে চাই। দূর থেকে নাক উঁচু করে তাদের বাঁধা ধরা ছকে ফেলে দিয়ে বাহবা নিতে চাই না।

—তুমি কিন্তু উত্তেজিত হয়েছ রমা। আমি বলতে চেয়েছিলাম ধনীর জাত আর আমাদের জাত এক নয়।

এরপর এ সম্বন্ধে অতনু আর কোন কথাই বলে নি। ক্রমে ক্রমে ওদের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে উঠতে লাগল। আর সেটা রমার মায়ের বুঝতে দেরি হল না। আশ্চর্য ঐ ভদ্র মহিলা—সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও যেন কিছুর মধ্যে নেই। ওকে বাদ দেওয়াও যায়না অথচ যেন জোর করে ধরে রাখাও চলে না। সকলের সামান্যতম আবদার অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য উনি এত আন্তরিক হয়ে ওঠেন যেটা অনেক সময় লোকে বুঝতে পারে না সেটা সত্যি না লোক-দেখানো।

ওঁর বাড়িতে কাজ করে যে মেয়েটি তার মা এসে নিজের দুঃখের কথা ওঁকে জানিয়ে ছিল, ছেলের একটা চাকরীর জন্যে ওঁর হাতে পায়ে ধরে ছিল। উনিও সেই ছেলের চাকরীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরী যোগাড় করে দেন অথচ এক টাকা বেশি মাইনের

পরিবর্তে সেই মানুষটাই তার মেয়েকে কাজ ছাড়িয়ে নিয়ে যায় আবার কিছুদিন বাদে সেখানকার কাজ চলে গেলে ওর কাছে রাখতে চায় মেয়েকে। উনি খুবই রেগে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু কান্নাকাটিতে আবার ক্ষমা করতেও দেরি হয় নি। এ তো শুধু একদিনের ঘটনা। এমন যে কত ঘটনা প্রতিদিন ঘটে চলেছে তার শেষ নেই। রমা বলতো, এটা মার দুর্বলতা। রমার বাবা বলতেন ধন-প্রিয়তার দোষ, সাদা কথায় নাম কেনার। কেউ কেউ বলতো লোক দেখানো। এত বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁর, কিন্তু তাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। সুনীল বলতো

—বৌদি! আপনার এটা একটা মহৎ গুণ কিন্তু লোকে তা বোঝে না। আপনি অন্যের চোখে ছোট হয়ে যান। আপনার নিজের প্রতিও তো কর্তব্য আছে। নিজেকে অন্যের চোখে ছোট করার অধিকার তো আপনার নেই।

রমার মা হেসে বলতেন

—সুনীল, এক কাজ করতো ভাই, সবাইকে খুশী করার মত মন্ত্র আমাকে শেখাও, যাতে করে নিজেকে খুশী করার জ্বালাই আর থাকে না।

—আমার কথার কি এই উত্তর হল বৌদি?

—বয়েস হয়েছে তো ভাই, ও সব বিধি নিষেধ আর মানতে ইচ্ছে করে না যে। আমাদের পোড়া দেশের বেশির ভাগ মানুষই যে এই রকম ধরা মানের, ওদের ওপর রাগ করা কি চলে?

রমা জানে তার মায়ের মতবাদ। মায়ের যুক্তি সকলের সঙ্গে মেলে না। মায়ের কথা বুঝতে হলে মন দিয়ে যুক্তি দিয়ে বুঝে নিতে হয়। কিন্তু বাবাকে বোঝা অনেক সহজ। বাবার মতবাদ সহজ, সরল। আর পাঁচজনের সঙ্গে মেলে। ভগবানকে বাবা বিশ্বাস করেন। ভক্তি করেন। সেখানে কোনো যুক্তি নেই, কোন তর্ক নেই, সবাই যা করে বাবাও তাই করেন। তাই বাবাকে অনুসরণ করতে কখনও রমার অসুবিধে হয় নি। বাবা যখন একমনে বসে পূজো করতেন তখন ভাল লাগতো। সেই মনটা ওকে মুগ্ধ করতো। ক্রমে ক্রমে ওর মনের মধ্যেও বিশ্বাস আর ভক্তির চিত্ত গভীর হয়ে তৈরি হল। ভগবানে ওর বিশ্বাস, ঠাকুর দেবতায় ওর ভক্তি এ নিয়ে বন্ধু বান্ধবের কাছে ওর কোন সংকোচ ছিল না। নানা সংস্কারে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল। তাতে তার তৃপ্তি ছিল, স্বস্তি ছিল। কেউ যদি তার সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলতো সে তর্ক করত না, আর নিজের বিশ্বাসকে অকপটে স্বীকার করতে তার কোন দ্বিধা ছিল না। তার মাও এ বিষয়ে কখনও কোন বাধা দেন নি। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে আগ্রহী নন বলে মেয়ে বাধা পায় তা জেনেও তিনি তাঁর নিজের মতকে অস্বীকার করেন নি কোনদিনও। ভগবানে তাঁর বিশ্বাস আছে কিনা বোঝা যেত না। পূজা পার্বণে কখনও তাঁকে উৎসাহী দেখা যায় নি অথচ পূজা পার্বণের অনুষ্ঠানে কোন অনীহা প্রকাশও করতেন না। পারিবারিক কর্তব্যবোধে নিষ্ঠার সঙ্গে সে সব অনুষ্ঠান পালন করেছেন। মন্দিরে তীর্থে যেতেন ভক্তের মন নিয়ে কি পর্যটকের মন নিয়ে তাও ঠিক বোঝা যেত না। এই-খানেই তাঁর সংসারের সঙ্গে তাঁর বড় অমিল। রমার মনে হত এই জন্যেই হয়তো তার বাবা মার মধ্যে এতটা দূরত্ব। বাইরে থেকে কেউ এই দূরত্বটা ধরতে পারত না কিন্তু রমা ধরতে পারতো। মা যেন স্বতন্ত্র। তাই আত্মীয় মহলে মায়ের প্রতি অনেকেরই অন্তর্নিহিত একটা বিরাগ তৈরি হয়ে উঠেছিল। অথচ বিপদের দিনে প্রয়োজনের সময় সেই মাকে তাদের দরকার হত সবচেয়ে বেশি। সংসার সম্বন্ধে মা যথেষ্ট বুদ্ধিহীন অথচ নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে সামাজিকতায় মা অত্যন্ত উদাসীন। মার সমাজ যেন তাদের নিয়েই যারা তাঁর রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। এ নিয়ে কত বিরুদ্ধ সমালোচনা তার কানে এসেছে। রমা মাকেই দোষ দিত কারণ মা স্বাভাবিক মা তার সঙ্গে একমত। তাই শুধু অন্তরের কাছেই ও মন খুলতে পারতো অবশ্য সুনীলও অনেক ব্যাপারে রমার সঙ্গে একমত ছিল। সুনীল রমাকে সত্যিই বড় স্নেহ করতো। যে ভাবে রমা তৈরি হয়ে উঠবে সে আশা করেছিল তা হল না।

ক্রমশই যেন রমা সম্বন্ধে তার হতাশা দেখা দিতে শুরু করল। আর এর জন্য রমার মাকেই সে দায়ী করতো। রমার মা প্রতিবাদ করেন নি। অসীম ধৈর্যে সংযত রাখেন নিজেকে। জীবনের শুরু থেকে যে অখিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গড়ে উঠেছে তার ফল ভোগ করতে হয় রমাকেই সবচেয়ে বেশি। সুনীলকে রমার বাবা ভালবাসেন কিনা রমা জানত না তবে এই সংসারের সঙ্গে সুনীলের ঘনিষ্ঠতা রমার বাবার মাধ্যমেই গড়ে উঠেছিল। রমণী বাবুর সঙ্গে মতের মিল হত না কিন্তু মায়ের সঙ্গে হত। এর ফলে একটা অস্পষ্ট যুক্তিহীন বিক্ষোভ মা আর সুনীলকাকুর বিরুদ্ধে তৈরি হয়ে উঠেছিল রমার মনে। রমণীবাবু এমন একটা যুগের বিশ্বাসের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে-ছিলেন যেটা এখন আর চলে না। ঠিক এই কারণেই অতনু তাঁকে একেবারেই পছন্দ করত না, তিনিও অতনুকে পছন্দ করতেন না। অতনুর একরোখা বেপরোয়া চরিত্রের মধ্যে রমণীবাবু নিজের বিশ্বাসকে মেলাতে পারতেন না। রমণীবাবুকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল সুনীলের। ভদ্রলোকের দিলখোলা হাসি আকৃষ্ট করেছিল আর ছিল তাঁর অসাধারণ আড্ডার মেজাজ। খোশ গল্পে দারুণ পটু। কিন্তু মুস্কিল হত যখন তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতেন। কমলাদেবী অর্থাৎ রমার মাকে ঘিরে সুনীলের কৌতূহল শ্রদ্ধা আর ভাললাগা তাকে ক্রমে ক্রমে এ বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে তুললো। সুনীল কমলা দেবীর চেয়ে অনেক ছোট। সুনীলের মা আর তিনি প্রায় সমবয়সী। সুনীল রমণীবাবুকে দাদা বলতো বলেই তাকে বৌদি বলে ডাকতো। বৌদি যেন সব কিছুর ব্যতিক্রম। কিন্তু সুনীলের মা বারব্রত পূজা-পার্বণ নিয়ে বাংলাদেশের নিতান্ত গৃহমুখী নানা সংস্কারে আচ্ছন্ন এক মা। স্বামীর মতেই তাঁর মত। তা ভালো হোক আর মন্দ হোক। সেই সংসারে সরল বিশ্বাস নিয়ে তিনি মানুষ হয়েছেন যেখানে মেয়েরা বিশ্বাস করে মেয়ে জন্ম যখন হয়েছে তখন বিয়ে হবেই আর স্বামী যেমনই হোক সেই-ই একমাত্র গুরু। কাজেই সেই মায়েরই বয়সী কমলা বৌদিকে বুঝতে গিয়ে সে আরও কিছু বুঝলো জানলো, যার সৌরভ তার মনকে লোকোত্তর এক আনন্দলোকে পৌঁছে দিল। রমাকে পেল। রমাকে তার মনে হত এ কোন স্বর্গীয় ফুল। অমলিন পবিত্র, শুভ্র, কোমল, তাজা ফুলের প্রতীক। রমার প্রতি তার অবুঝ স্নেহ আর বৌদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা তাকে অন্য এক জগতের সন্ধান দিল। বৌদির উদার স্বচ্ছ সংস্কারের স্নেহ-ছায়ায় সুনীল সমৃদ্ধ হল। দিন রাত তার মন পড়ে থাকতো ঐ বাড়িটিতে যেখানে রমা আছে। আছেন রমার মা। দিনে দিনে রমা তার মনে আশ্চর্য এক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করল যে স্বপ্নলোক শুধুই অনুভবের।

কোন এক সময় সুনীল আবিষ্কার করল যে এই সংসারটির দায় দায়িত্ব তার ওপরেই এসে পড়েছে আর এ দায়িত্ব গ্রহণে সে খুব সুখী। কিসে রমার ভাল হবে, কি ভাবে গড়ে তুললে সে আরও সুন্দর হবে, আরও সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে তারই সাধনায় মগ্ন হল। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখী এসে দেখলো এই স্বপ্নলোকের চাবিটা তার হাতে নেই। রমণীবাবু সেখানে প্রকাণ্ড এক বাধা। বাবার প্রশ্রয় আর সুনীলকাকুর শাসন রমার পক্ষে সুখকর হল না।

সুনীল কি তখন ভাল করে চেনেছে নিজের মনের চেহারা? স্নেহের আড়ালে ধীরে ধীরে যে পদ্ম কোরক-টির অস্তিত্ব সঞ্চারিত হচ্ছিল সুনীল তাকে স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি। রমা ভালবাসত সুনীলকাকুকে কিন্তু সে ভালবাসায় শাসন ছিল না। ছিল দাবি, ছিল আব্দার আর আব্দারের প্রশ্রয়। কমলা ভাবতেন কি জানি কি হবে এর পরিণাম। একটা বিস্ফোরণ না ঘটে যায়। হলও তাই। ভালবাসার দায়ে যে বাধা নিষেধ আবর্তের সৃষ্টি করল সুনীল, সেই আবর্তে হাঁফিয়ে উঠলো রমা। শাসনের মাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেল, মন তার একটা অজানা বিরূপতার ভারে ভারগ্রস্ত হল। মা আর সুনীল কাকুর দৃষ্টিতে সে দেখতে পেত বিচারকের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। বাড়ি আর ভাললাগত না। বাবাকে সে পেত/ কাছে

সেখানেও তার মনের মত আবহাওয়ার অভাব ছিল। তখন ওর একমাত্র আশ্রয় হল অতনু। মন খুলে অকপটে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে রমা অতনুর কাছে। অতনুও নির্দ্বিধভাবে সমালোচনা করেছে সকলের—মা, বাবা সুনীলকাকুর। রমার চোখে তখন নেমে গেছে সকলেই। বাবা, মা, সুনীল সবাই।

একদিন সুনীল দেখে রমা এমন একটা দলের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে যে দলটাকে সুনীল চেনে এবং অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে রমাকে দেখে ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। রাগে ফেটে পড়ে বৌদির কাছে। কোন সাহসে রমা ঐ রকম দলে গিয়ে ভিড়তে পারে? মা হয়ে বৌদিই বা কি করে রমাকে প্রশ্রয় দেন এ ব্যাপারে? যদিও রমার মা ব্যাপারটা জানতেই পারেন নি। এই জানতে না পারাটাকে সুনীল মনে করে দায়িত্বহীনতা। তাদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে রমা ফিরে এল অত্যন্ত বিব্রত মন নিয়ে। দাদা বলে যাদের শ্রদ্ধা করেছে তাদের স্বরূপ দেখে ও বিস্ময়ে, লজ্জায় ঘৃণায় অভিভূত হয়েছে।

ইন্টার কলেজের নাটক প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়ে এসেছিলেন অনুরাধা রায়। সেই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান পায় রমা। রমাকে অনুরাধার খুবই ভাল লেগেছিল। রমার সঙ্গে আলাদা ভাবে সে আলাপ করল। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল। সুনীল অনুরাধা ও তার স্বামী অপরেশকে চিনতো। ও সাবধান করে দিয়েছিল রমাকে ওদের সম্পর্কে কিন্তু কি দুর্নিবার আকর্ষণে রমা শেষ পর্যন্ত লুকিয়েই দেখা করতো ওদের সঙ্গে। অবশ্য যাকে বলে। মা বারণ করেছিলেন তবে খুব জোর করা কমলার অভ্যাসের মধ্যে ছিল না। উনি জানতেন জোর করলেই লুকোচুরি আসবে। বোঝাতে চেষ্টা করতেন কিন্তু বাবা মার বিপরীতধর্মী আচরণের মধ্যে মানুষ হয়ে রমার ভেতরে একটা জেদ তৈরি হয়েছিল। সে জেদ ঠেকে শেখার। বাবাকে না যাকে, কাকে সে সমর্থন করবে? এই ঘোটানার মধ্যে পড়েই এই স্বভাব তার খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছিল।

এই অনুরাধাদের দলটা ছিল রক্ষণশীল। সুনীল অনেক কিছুই জেনেছিল। তাই সেদিন বারণ সত্ত্বেও রমাকে ওদের সঙ্গে দেখে খুবই ক্ষিপ্ত হয়েছিল সুনীল। প্রথমেই এসে বৌদিকে প্রশ্ন করে

—রমা কোথায়?

—কলেজে, কেন?

—ফেরার সময় তো হয়ে গেছে।

—না, সে এখন ফিরবে না।

—তার মানে?

—বলে গেছে একটু বেড়াতে যাবে। আসতে দেরি হবে।

—কোথায় যাবে বলে গেছে?

—দেখ সুনীল! মেয়ে বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে. এখন অত কড়াকড়ি কি করা চলে?

সুনীলের রাগটা গিয়ে পড়ল রমার মায়ের ওপর। রমার চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সে মনে মনে তাঁকেই দায়ী করে বসল। মুখে একটা চাপা বিদ্রূপের হাসি টেনে বলল

—খুব নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন যেন মনে হচ্ছে বৌদি!

—না সুনীল! নিশ্চিন্ত নই কিন্তু কিছু করারও তো নেই ভাই।

—নেই কেন?

—কি করবো? যে মেয়ে বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে, আর পাঁচটা জায়গায় মিশছে তাকে কি সব সময় আর বন্ধ করে রাখা যায়?

—তাই বলে যেখানে সেখানে ছেড়ে দিতে হবে?

—যেখানে সেখানে বলবো কেমন করে?

—মেয়ে আপনার, তার ভালমন্দ আপনি বুঝবেন। আমার কি? তবে আপনি বড় দুর্বল বৌদি। দুর্বলতায় তারই ক্ষতি করছেন।

—দেখ সুনীল! এ বড় কঠিন প্রশ্ন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। একটা কথা কি জান? যে পরামর্শটা ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেটাকে ও জুলুম বলে যদি মনে করে তখনি বিদ্রোহ আসবে। এই নিষেধটা যদি ওর

কোন বন্ধুর কাছ থেকে আসে তাহলে সৎ-পরামর্শ বলে মনে করবে, আর যদি ভালবাসার মানুষের কাছ থেকে আসে তখন নির্দ্বিধায় মেনে নেবে ভালবাসার দাবি বলে।

—ওর ভালবাসার মানুষ থাকলে তো বাঁচা যেত। আমাদের দায়িত্ব অনেক খানি কমে যেত। আছে কি তেমন কেউ?

—মাঝে মাঝে মনে হয়···

আগ্রহ ফুটে ওঠে সুনীলের মুখে চোখে

—কি মনে হয় বৌদি?

—মনে হয় ও হয়তো কিছুটা মুক্তি পায় অতনুর কাছে।

মুখটা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায় সুনীলের, যে শুভ্র স্নিগ্ধ অনুভূতিটা সে সযত্নে গোপনে রেখেছিল নিজের মনের মধ্যে সেটা যেন আজ হঠাৎ কারো তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু তবু নিজেকে প্রকাশ করে ছোট করতে পারল না সুনীল। অসম্ভব স্পর্শ-কাতর সে। আত্মসম্মানে আঘাত অন্য যে কোনও আঘাতের চেয়ে গভীর তার কাছে। তার পৌরুষ আহত হল, তার পবিত্র ভালবাসা অপমানিত হল। এটা সামলে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার নিজের মনের এই পরিচয়টা এই আঘাত পাবার পর টের পেল সুনীল। সুনীল অবুঝ নয় যদিও ভালবাসা তার অবুঝ। নিজের মনকে অন্য খাতে বইয়ে নিতে সে পারবে। সুনীলের সেদিনের মনের চেহারা কমলার কাছে গোপন রইল না। সন্তানোপম এই উদাস ছেলেটির প্রতি মমতায় তাঁর মনভরে উঠেছিল। রমা এই ভালবাসার সন্ধান পেল না। এর জন্য তাঁরই অন্তর হাহাকার করে উঠলো। রমা যদি সুনীলকে বুঝতো, যদি তাকে ভালবাসতে পারতো তাহলে কমলা অত্যন্ত সুখী হতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুনীলের সংস্পর্শে এসে রমা দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো আর তার ভালবাসার মাধুর্যে সুন্দর হতো কিন্তু তা হলনা, তা হবেও না কারণ তা হবার নয়। সুনীলকে রমা তার মনের যে বারগায় বসিয়েছে সেখানে ভালবাসার চেহারা অন্যরকম। সেখানে শ্রদ্ধা আছে ঘৃণা আছে ভাললাগা আছে বিতৃষ্ণা আছে, ভয় আছে বিরক্তি আছে। সুনীলকে রমা ভালবাসে তার স্নেহশীলতা আর আন্তরিক দায়িত্ব বোধের জন্যে, কিছুটা বা অভ্যাসের বশে। এর জন্য সে বেশ গর্বিত। সুনীল কাকু যে তার কোন ক্ষতি সইতে পারবেনা এ নিয়ে তার যথেষ্ট অহংকার। কিন্তু সেই দায়িত্ব বোধের পরিপ্রেক্ষিতে যখন নিষেধের আর সমালোচনার অবকাশ ঘটতো তখন তার মন খুবই বিদ্রোহ করতো।—কে উনি যে এত শাসন করবেন? সেই সঙ্গে মায়ের ওপর বিরক্ত হত, মা সুনীল কাকুকে সমর্থন করতেন বলে। মনে হত মা নিজে কিছু ভেবে দেখেন না, সুনীল-কাকুর প্রভাবে যার ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন। এ সংসারের প্রতি সুনীলের কর্তব্য বোধের জন্য ও মনে মনে কৃতজ্ঞ কিন্তু মাঝে মাঝে ওর মনে হত এই মানুষটি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মা আর সুনীলকাকু বাবাকে যেন একঘরে করেছে; বাবা মার মধ্যে দিনে দিনে এই বিচ্ছেদটা কঠিন হয়ে উঠছে আর সেটার জন্য বুঝি অনেক খানি দায়ী সুনীলকাকুই। অবশ্য এটা ওর অনুমান তবু গোটা মানুষটাকে ও অস্বীকার করতে পারত না। তাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে এ মানুষটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। দূরে সরানও যায় না, কাছে টানাও যায় না।

আত্মজার মনের এই দ্বন্দ্ব আর অতি প্রিয় স্নেহের মানুষটির মনের ছবি কমলার কাছে স্পষ্ট কিন্তু তিনি নিরুপায়। একদিন সুনীলকে, বলেছিলেন,

—দেখ, রমা যদি তোমাকে ভালবাসত তাহলে আমি খুবই শান্তি পেতাম; কিন্তু আমি জানি সে তোমার উপযুক্ত নয় অন্তত এখন পর্যন্ত তুমি যেখানে পৌঁছে গেছ সে সেখানে পৌঁছতে পারেনি। পারা সম্ভবও নয় কারণ তার বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও তো থেমে থাকছ না; তুমি তো ক্রমশই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছ। তুমি আরও বড় হও; তোমার যোগ্য সঙ্গিনী অবশ্যই খুঁজে পাবে। কথাটা বড় ভাল লেগেছিল সুনীলের। সেই মুহূর্তে ঐ কথাগুলো একটা স্নিগ্ধ প্রলেপের কাজ করেছিল ওর মনে। সত্যিই রমা বড় ছেলেমানুষ। তাকে শুধু স্নেহ করা যায়। নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর মমতা করা

যায়। এই সব ভাবতে ভাবতে ও আবিষ্কার করল যে রমাকে ও মেহই করে শুধু। এতদিন সেই স্নেহের রূপটাকে ঠিক ধরতে পারছিল না। মন ওর এর পর অনেকখানি সহজ হল। হাল্কা হল। ও শান্তি পেল।

এতদিন কমলা ছিলেন নিরপেক্ষ তাই দৃষ্টি ছিল সুস্থ বিচার ছিল নির্ভুল; সেই কারণেই রমা, অতনু, সুনীল কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না। কিন্তু স্নেহের দাবি বড় প্রবল। ঐ যে একরোখা প্রচুর সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ছেলেটি ভালবাসার প্রথম কুঁড়িটিকে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে তার বেদনা তাঁর বুকে বড় বেশি করে বেজে ছিল। তিনি চেয়েছিলেন সে তার আশ্চর্য ক্ষমতাগুলো বিকশিত করুক। তাই তাকে তার বিশেষ ক্ষমতাগুলো সম্বন্ধে বারে বারে সচেতন করে দিতে চাইতেন নানা ভাবে। সংসার কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটাকে অন্যরকম রং এ আপন ইচ্ছেতে ছাপিয়ে নিল। গুঞ্জন উঠলো। প্রশ্ন জাগল রমার মনে। সেই প্রশ্নগুলোকে দেখতে পান নি কমলা। সে গুলোর সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাঁর ছিলনা। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যর্থতা এই খানেই ঘটল। সবচেয়ে ক্ষতি হল তাঁর নিজের।

অতনু তার বাবাকে দেখেনি কোনদিনও। শুধু বাবা কেন: কোন আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ সে পায় নি কোনদিন। প্রকাণ্ড একটা বাড়ি, সব ঘরগুলো তালাবন্ধ। মাঝে মাঝে মা সেগুলো লোকদিয়ে পরিষ্কার করান। মা নিজে থাকেন যে ঘরে সে ঘরে অতি সাধারণ এক খানি টেবিল একটি খাট একটি আলমারী। সেই ঘরেরই একপাশে ঠাকুর ঘর সেখানে মায়ের বেশির ভাগ সময় কাটে। এই ঘরের পাশেই অতনুর ঘর। এই তিনটি ঘরের মাঝখান দিয়ে দরজা আছে। অতনু যতদিন ছোট ছিল দরজা খোলা থাকতো। বি.এ পাশ করে সে দিন কতকের জন্যে দার্জিলিং বেড়াতে যায়, ফিরে এসে দেখে মাঝখানের দরজা বন্ধ। সে দরজা খোলা হয় না আর। ফিরে এসে প্রথম দিন খুলতে গিয়ে দেখে মায়ের দিক থেকেই বন্ধ। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল

—দরজা বন্ধ কেন?

—ওটা এবার থেকে বন্ধই থাকবে।

—কেন মা?

—তোর সম্পূর্ণ নিজস্ব একখানা ঘর হল। তুই তো এখন বড় হয়েছিস!

এই বুঝি মায়ের সঙ্গে তার প্রথম বিচ্ছেদ। সেই ছোট বেলার মত করে মাকে আর কোনদিনও পাওয়া যাবে না। বড় হওয়ার প্রথম লাভ নিজস্ব অধিকার আর প্রথম মাশুল হাহাকার: এ দুয়ের অদ্ভুত এক নতুন স্বাদ অতনুর অভিজ্ঞতাকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিল। জ্ঞান হওয়া অবধি সে মাকেই দেখেছে, মাকেই জেনেছে কিন্তু সে মা কত দূরের। সে মাকে সে কোনদিনও কাছে পায়নি। কোন আদরের আতিশয্য তার জীবনে ঘটে নি।

কিভাবে এ সংসারটার খরচ চলে ও কি করে এতবড় বাড়িটাকে বজায় রাখা হয়েছে এ সব বিষয় কোনদিনও কোন প্রশ্ন ওর মনে আসে নি। ডিসেব পত্র মাই রাখেন। সরকার মশাইএর সঙ্গে এ ব্যাপারে যাবতীয় কথাবার্তা মা-ই বলেন। বাড়ির ট্যাক্স, ইলেকট্রিক বিল ইত্যাদি মাই দেখাশোনা করেন। ও শুধু দেখছে ও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত খরচের টাকাটার পরিমাণ বেড়েছে। ওদের সংসারে বিলাসিতা নেই কিন্তু কোন অভাবও নেই; যা খুশী করার অধিকার যেমন ওর নেই সম্ভবত ইচ্ছা পূরণেও ওর কোন বাধা নেই। তবে বড় একা ও। মা কখন যে বিছানা ছেড়ে ওঠেন ও টের পায় না। একটি মুহূর্তের জন্যে ওর অপেক্ষা করে থাকাটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সেটা মায়ের নিজের হাতে ওর ঘরে টাটকা ফুলের গোছা রেখে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে যাওয়া আর পূজোর প্রসাদী ফুল এনে ওর মাথার আলতো করে ছুঁইয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া। ওর এক এক সময় ইচ্ছে করে মায়ের আঁচলটা টেনে ধরে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আদর খায়। কিন্তু কিছুতেই পারে না। কিসের যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ভোরের

বেলা যা যেদিন ওর ঘুমের মধ্যে ফুল রেখে চলে যান সেদিনটা ওর ভয়ানক বিশ্রী লাগে, মেজাজটা বিগড়ে যায় কিন্তু মাকে তো কোনদিনই জানাতে পারে না। মায়ের অধিকাংশ সময় কেটে যায় পুজোর ঘরে। আশ্চর্য মানুষ। কোথাও কখনও বার হন না ; কোনো সঙ্গী নেই, আত্মীয় নেই, সামাজিকতা নেই ; শুধু সংসারের তদারকি আর ঠাকুরঘর। মাঝে মাঝে মায়ের নামে চিঠি আসতো খামে, সেদিনটায় মায়ের প্রাত্যহিক ধরাবাঁধা নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটত।

অতনু বড় হয়ে রমাকে ভালবেসে নিজেকে ভালবাসল আর নিজের পৃথিবীটার পরিধি যেন অনেক বড় হয়ে গেল। সেখানে ও একমাত্র মানুষ আর সবাই যেন ওরই আশ্রিত। ওর মাও যেন সেই আশ্রিতদেরই একজন। ও ভাবে এই নির্জন গম্ভীর দমবন্ধকরা আবহাওয়ার কোন্ শক্তিতে মা নিঃশ্বাস নিয়ে আজও প্রসন্ন রয়েছেন। তাঁর শ্বেতশুভ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে উজ্জ্বল এক প্রশান্তি তাঁকে ঘিরে রেখেছে। কি সে প্রশান্তির উৎস ? এতদিন এসব প্রশ্ন তার মনে আসেনি কিন্তু এখন নিজেকে জানার প্রয়োজনে আর ভালবাসার যাদুস্পর্শে ও জানতে চায়, ওর মাকে ছুঁতে চায়, মার বেদনার্ত, নিভৃত কক্ষটিতে অংশগ্রহণ করতে চায়। কত-দিন ভেবেছে অতনু, মাকে জিজ্ঞেস করবে বাবার কথা কিন্তু পারে না। বাবা তার মৃত তা সে জানে, জেনেছে তার মাকে দেখে। সধবার কোন্ চিহ্ন তাঁর দেহে নেই সেইটাই বাবার মৃত্যুর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু কেমন ছিলেন তিনি ? কিভাবে মারা গেলেন ? তাঁকে তিনি দেখেছেন কিনা এ প্রশ্নগুলো তাকে বিব্রত করে কিন্তু সে কিছুতেই সহজ ভাবে মাকে বলতে পারে না। কিসের যে বাধা তাও তো বুঝতে পারে না। হয়তো এ প্রশ্ন তার আগে মনে আসত না কিন্তু রমাকে ভালবেসে সে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। বাবার একখানাও ছবি নেই। বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে। সে কি তার বাবার মতন দেখতে হয়েছে ? অজস্র প্রশ্নের ভীড়ে মন তার ভারাক্রান্ত ; তাই আর পাঁচটা মানুষের মত সহজ হতে পারে না সে। মানুষের ভীড় তার ভাল লাগে না। উৎসবকে সে সযতনে এড়িয়ে চলে। মানুষের সামনে সে সংকুচিত হয়ে পড়ে। লোকে ভাবে সে লাজুক আর এই ভাবনাটাতেই সে অপমানিত হয়। ওর মনে হয় যে ওর বুঝি আর সকলের মত সব কিছুতে অধিকার নেই। কিন্তু কেন নেই ? নেই বলে অধিকার ওকে অর্জন করে নিতে হবে। তাই নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মে এই দুটি ছেলেমেয়ে রমা আর অতনু প্রথম যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো তখন অতনুর মনে হত রমাকে না হলে তার চলবে না। রমার এতটুকু ভাগও সে কাউকে দিতে পারবে না। তার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত দাবি প্রচণ্ড স্রোতের মত দুকূল হারিয়ে রমাকে ঘিরে প্রবাহিত হল। সেই স্রোতের প্রচণ্ডতায় রমা বিপর্যস্ত হল। অতনুর সর্বগ্রাসী দাবিই রমাকে অতনুর কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিতে শুরু করল ; কিন্তু এত দিনের অভ্যাস, এতদিনের মমতা, এতদিনের পরিচয়ের বন্ধনও তো কম নয়। সে বাঁধন জোর করে খুলে ফেলার ইচ্ছে সত্যি রমার ছিল না। অতনুর জীবনে যেটা ছিল দাবি রমার জীবনে সেটা ছিল বিবেচনা। ওরা ভুল করেছিল দুজনেই। অল্প বয়সের ভুল। ভালবাসার আসল রূপ ওদের জানা ছিল না। তাই ভালবাসার সুর ওদের শোনা ছিল না। বাড়িটা যখন রমার কাছে ক্রমে ক্রমে বিস্বাদ হয়ে আসছিল তখনি রূপাদের সংস্পর্শে এল।

সকলকে বিস্মিত করে বিরাট কাল গাড়িখানা এসে দাঁড়াল রমাদের বাড়ির সামনে। গলির মধ্যে গাড়িটাকে হয়তো একটু কষ্ট করেই ঢোকাতে হয়েছিল।

উদ্ভাসিত আহ্বানে সচকিত রমা। সকালবেলা রোদের আলো মাখা গায়ে মেখে সদ্যস্নাতা রূপা এসে দাঁড়িয়েছে। কপালে একটা কিকে রংএর টিপ, পরেছে কিকে সোনালী সাড়ী। রূপাকে সত্যিই মনে হচ্ছে অপরূপা।

—মাসীমা? মাসীমা কোথায় রমা?

রমার বিস্ময় তখনও কাটেনি। তার সেই বিস্ময়কে নস্যাৎ করে দিয়ে রূপা আবার বলে

—মাসীমা কৈ?

রমা রূপাকে ঘরে এনে বসায়। বলে,

—কি ব্যাপার বলতো?

—সে কথাটা মাসীমাকেই বলব।

মনে মনে প্রমাদ গুণলো রমা। মা তো এখন একটা চিরকুট কাপড় পরে রান্নাঘরে ব্যস্ত। নিজেদের সংসারের এই বিশ্রী ছবিটাকে রূপার সামনে তুলে ধরতে মন চাইছে না। মনে মনে বিরক্ত হয় রূপার ওপর। কোন রকম জানান না দিয়ে এ ভাবে ও এল কেন? অথচ ওরা তো নিজেরা যথেষ্ট এটিকেট দুরস্ত। এ কি তাদের সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা: এদের মত সাধারণ মানুষের সময়ের কোন দাম থাকতে পারে না। এইটেই কি রূপার বিশ্বাস? কিন্তু এখন তো আর অত ভাবার সময় নেই। হাসি মুখেই আবাহন জানাতে হবে বন্ধুকে! তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা কাপড় মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে,

—মা তাড়াতাড়ি কাপড়খানা বদলে নাও, রূপা এসেছে তোমার কাছে।

—কেন কাপড় বদলাবার কি আছে? আজ না হয় জানতে পারছি তাই কাপড় পাল্টালাম, এরপর কোন-দিন যদি সোজা ও এ ঘরে চলে আসে? দরকার কি এসব আড়াল আবডালের? মা সেই বেশেই অত্যন্ত সহজভাবে বাইরের ঘরে এলেন। রূপা দাঁড়িয়েই ছিল। দেওয়ালে যামিনী রায়ের ছবিটা মন দিয়ে দেখছিল, রমার মাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল। স্মিত হাসিতে ঘরখানার অপ্রস্তুত অবস্থা এক নিমেষে সহজ হয়ে গেল।

—মাসীমা আমি রমাকে নিতে এসেছি। ওখানে ও খাবে আজ। মা আমাকে পাঠালেন আপনার অনুমতি নিতে।

—ওমা, অনুমতির কি আছে? মা যেতে বলেছেন নিশ্চয়ই যাবে। কিছু ব্যাপার আছে নাকি?

—না না, তেমন কিছু না, এমনই। সেদিন তো মা ওর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেন নি তাই।

—বেশ তো তুমিও তাহলে একদিন আমার কাছে ডাল ভাত খেয়ে যাবে তো মা?

—নিশ্চয়ই, কিরে রমা তোর হিংসে হচ্ছে?

—তা হচ্ছে বৈকি! কিন্তু আজ তো আমি যেতে পাচ্ছি না রে।

—কেন? ওসব শুনবো না।

—না, শোন্ মানে।

রমার মা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, কেন কি এমন কাজ তোমার? মাসীমা নিতে পাঠিয়েছেন, না যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

কিন্তু রমার মন প্রথম থেকেই এত তিক্ত হয়ে ছিল যে আমন্ত্রণের মধ্যে একটা অপমানের আভাস যেন পেল; সহজভাবে এই নিমন্ত্রণকে ও নিতে পারছে না। হট করে যেতে বললেই কি যেতে হবে? আগে থেকে কিছু বলা নেই যখন। কিন্তু যেতেই হল। এরপর আর না গেলে মায়ের মুখ থাকে না। গিয়ে অবশ্য খুব খারাপ লাগে নি। রূপার বাবা বাড়ি ছিলেন না। রূপার মা নিজের হাতে রান্না করেছিলেন। রূপা রমাকে একেবারে রান্নাঘরেই নিয়ে গেল। এও এক রান্নাঘর আর ওর মায়েরও এক রান্নাঘর। এতো রান্নাঘর নয়। রমা কখনও এ রকম রান্নাঘর দেখেনি। কোথায় উনুন, কোথায় আর সব সরঞ্জাম?

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন

—এস মা, আমি তো ভাবলাম আগে থেকে বলা নেই হয়তো তোমার মা পাঠাবেন না। আমার ওপর রাগ করবেন।

রূপা বলে উঠলো—

—জানো মা, উনি তো আসতেই চাইছিলেন না,

মাসীমাই জোর করে পাঠালেন।

রমা বলে উঠলো

—না মাসীমা, কৃপা মিথ্যে কথা বলছে।

নানা রকম গল্প আনন্দের মধ্যে দিয়ে সময়টা ভালই কেটে গেল। রমার মন অনেকখানি হাল্কা হল। বোধ হয় এর প্রয়োজন ছিল। মাসীমাকে আজ অনেকখানি কাছে থেকে দেখতে পেল রমা। কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে নিজের মায়ের সঙ্গে কিন্তু একটা চাপা বিষণ্ণতা যেন তাকে ঘিরে রেখেছে। কেন? কেন এ বিষণ্ণতা?

খাবার টেবিলে রজত এসে বসল। কোথাও কোন আড়ষ্টতা নেই। রমা এদের সঙ্গে যত পরিচিত হচ্ছে ততই বুঝতে পারছে যে এতদিন ও এদের সম্বন্ধে কিরকম একপেশে দৃষ্টিভংগি নিয়ে কাটিয়েছে। এতদিন মনে হত এই দুটো জাতের মধ্যে বুঝি বিরাট পার্থক্য রয়েছে কিন্তু সেটা যে কতবড় ভুল এখন তা বুঝতে পারছে। এদের অর্থ আছে এবং এই অর্থকে সুপ্রযুক্ত করার মত যথেষ্ট রুচিজ্ঞান আছে শুধু এইটুকুই যা তফাৎ। যাদের অর্থের প্রাচুর্য্য নেই তারাই বরঞ্চ এদের বুর্জোয়া বলে অনেক দূরে সরিয়ে রাখে। এরা যদি কোন ক্ষতিকর কাজ করে তাহলে তার ব্যাখ্যা হয় যে এটা একটা রাজনৈতিক চাল। এদের বুঝি অধিকার নেই নিরবধ্যবিত্ত মানুষের মাঝে নেমে আসার। এরা যদি কোনদিনও কোন প্রতিভার পরিচয় দেয় তার ব্যাখ্যা হয়, এরা অর্থের বিনিময়ে প্রতিভা কিনেছে।

রজতের গান শোনার পর থেকেই রমার মনের ভাবনায় এক আশ্চর্য ধরণের বিবর্তন সুরু হয়েছে। খাবার টেবিলে আজ রমা প্রথমটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়েছিল কারণ সকালের বিরক্তিটা ওর তখনও কাটেনি; কিন্তু কৃপার মায়ের আর রজতের সহজ ব্যবহার, কৃপার সারল্য ওকে অনেকখানি সহজ করে তুললো। এক সময় ওর মনে হল বেশ ভালই লাগছে। মনের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তৈরি হয়েছে। সকালের মনগড়া অভিযোগগুলো এখন একেবারেই মিথ্যে বলেই মনে হল আর সেই সঙ্গে মনে হল এই ধরণের পূর্বকল্পিত ধারণার বশে আমরা নিজেদের বঞ্চিত এবং ছোট করে ফেলি! খাওয়া শেষ হলে কৃপার মা নিজের ঘরে চলে গেলেন। রজত অনুরোধ জানাল—

—যদি আপত্তি না থাকে আসুন না আমার ঘরে। কৃপা রমাকে নিয়ে আয়।

নিজের নামটা অতনু ছাড়া শুনতে বেশ ভালই লাগল। কৃপা সঙ্গে সঙ্গে রমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে একটু হাসল। রমা লজ্জা পেল কিন্তু এত সহজ ভাবে রজত কথাটা বলা যে বিস্মিত হবার অবকাশ রইল না। অনেকক্ষণ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। ওদের সেই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে রমার মনে হল, বাবা তাঁর কাজ নিয়েই আছেন, মা নিজের মধ্যেই ডুবে আছেন, রমা আর কৃপা এরা দুজনেই শুধু দুজনের ভালমন্দ, দুঃখবেদনার অংশীদার হয়ে গেছে, ভালবাসার প্রভায় ভাইবোনের মধুর সম্পর্কটাকে দিনে দিনে মধুরতর করে তুলছে। ওদের কাছে এসে আরও বড় ভাল লাগল। নিজের ভাই নেই, ভাইয়ের স্নেহ কি ও তা জানে না। পড়ন্ত রোদের আলোয় ওদের দুই ভাইবোনের মিলিত গানের মাধুর্যে অভূতপূর্ব সুখের আবেশে রমার স্নায়ুগুলো যেন শিথিল হয়ে আসছিল। সকালের তিক্ততা সন্ধ্যার তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। রমা ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরল। রমার মন যত ভরে উঠছে অন্য দুটি মনে ততই বিক্ষোভ জমে উঠছে। রমার কিন্তু এখন সেদিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। অতনু ভাবে কোথায় যেন একটা অসংগতি ঘটতে চলছে। ওর কাছ থেকে কি রমা দূরে সরে যাচ্ছে? কিন্তু কোন স্পষ্ট ইংগিতও সে পায়নি এ ব্যাপারে। রমা চায় অতনুর আলাপ হোক কৃপা আর রজতের সঙ্গে। কিন্তু অতনু কিছুতেই রাজী নয়। রমা দূরে সরে যাচ্ছে এই রকম একটা ধারণা সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে খচ খচ করত। এই চিন্তাটা নেশার মত ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একটা অনুদার অভিমানের দুঃসহ কোমল বেদনা যেন রমাকে ওর আরো কাছে টেনে

জানতো। নিজেকে কেমন দুঃখী দুঃখী মনে হত। এটা কি ওর ঈর্ষা? না অকথ্য যুক্তিহীন আক্রোশ? কি ক্ষতি হয় যদি রঞ্জনের সঙ্গে রূপার সঙ্গে আলাপ করা যায়? রঞ্জনকে সে তো নিজের বাড়িতেই ডাকতে পারে? কিন্তু না সে তা কিছুতেই পারবে না কারণ নিজের বাড়ি ওর কাছে একটা প্রকাণ্ড রহস্য। যাকে ও চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না স্পষ্ট করে, যাকে ও ভালবাসে, অসম্ভব ভালবাসে। ওর মনে হয় ওর মা দুঃখী, বড় দুঃখী, বড় একা। সব থেকেও কিছু নেই। আত্মীয় পরিজন নেই বন্ধু নেই, সন্তান? তাও তো সে একাই। মেয়ে নেই, মেয়ে কি জিনিষ মা তা জানে না। প্রকাণ্ড একটা বাড়ি। অঢাবদ্ধত বৈভব আর একটি সন্তান—এই নিয়ে যার সংসার। ছেলের সঙ্গে দারুণ একটা দূরত্ব। যেন মেপে মেপে সম্পর্ক বজায় রাখা, মনটা মাঝে মাঝে দারুণ বিদ্রোহ করে। রমার মায়ের মত তার মা কেন সহজ নন। রমার মায়ের কাছে অসংকোচে এগিয়ে যাওয়া যায়। বন্ধুর মত তাঁর কাছে মন খোলা যায়। কিন্তু নিজের মা তার এত পর কেন? তবু যাকে সে অসম্ভব ভালবাসে আর এও জানে যে সে ছাড়া তার মায়ের আর কিছু নেই। মাকে কখনও দুঃখ করতে দেখেনি তবু বোঝে মা বড় দুঃখী। মা তো কখনও উত্তেজিত হন না, কাঁদেন না? মা কি বাবার কথা ভাবেন? অতদূর ভাবতেই পারেনা তার মায়ের জীবনে তার বাবা নামে কেউ কখনও ছিল।

রমার মা দিন কতকের জন্য বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন, বোনের খুব অসুখের খবর পেয়ে। সুনীলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। বাড়িতে বাবা আর রমা। বাবার বেশির ভাগ সময়টাই কাটতো বাইরে। কাজেই রমার বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধই হল প্রায়। কলেজের পারসেন্টেজ বজায় রাখবার জন্যে এক একদিন তাই লাগিয়েই বেরিয়ে পড়তে হত।

হঠাৎ একদিন দপ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। না, লোডশেডিং নয়, শুধু ওদেরই বাড়ির আলো নিভেছে। বাবার কাছে জানতে চেয়ে সদুত্তর পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালে মিস্ত্রীর কাছে জানতে পারল লাইন কেটে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাবা স্বীকার করলেন সময় মত ইলেকট্রিক বিলের টাকা মেটানো হয়নি। গরীব হলেও তারা আলো আর পাখায় অভ্যস্ত ছিল আর বায়ুতাপও বহন করতে পারতো। এটা স্রেফ বাবার গাফিলতি। কতদিনে যে ঝঞ্ঝাট মিটবে। দিনের আলো থাকতে থাকতে সমস্ত কাজকর্ম করে নিতে হত। গোটাকতক মোমবাতি আর একটা ছোটখাট লণ্ঠন যোগাড় করে রাখল। সন্ধ্যায় ট্রানজিসটারটা নিয়ে বারান্দার কোণের জানলার ধারটিতে বসে থাকতো, সেখান থেকে আকাশের একটু ফিকে আলো এসে ওর বসবার জায়গাটুকুতে পড়তো। সঙ্গে বই থাকতো কিন্তু কাঁপা কাঁপা বাতির আলোয় পড়তে পারত না। মনের মত প্রোগ্রাম না থাকলে রেডিও বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকতে হত। অন্ধকারের একটা নেশা আছে। ক্রমে ক্রমে নিজের অজান্তেই সেই নেশায় কেমন জড়িয়ে পড়ল রমা। অন্ধকারে মনকে বুঝি মেলে ধরা অনেক সহজ, নিজের সঙ্গে মোকাবিলায় তাই বাধা পড়ে না। ওই অন্ধকারের মধ্যে আর গরমের মধ্যে থাকতে থাকতে ও কেমন একাত্ম বোধ করল বস্তিবাসীদের সঙ্গে। বস্তির দিকে ওর মন আকৃষ্ট হল। একদিন বাবাকে বাড়িতে রেখে সন্ধ্যার পর ও গেল বস্তির পথ ধরে। লণ্ঠন আর কুপির টিমটিমে আলো আলিয়ে যারা তাদের এক বিষণ্ণের সংসারটাকে সামলাচ্ছে তারাই যেন ওর কাছের মানুষ। বাড়ি ফিরে মনটা কেমন একটা সুস্থ আবেগে ভরে উঠলো। সন্ধ্যা আসার দুর্ভাবনায় যে মন একদিন বিরক্ত হয়ে উঠতো সেই মনই কবে থেকে যে দিনান্তে সন্ধ্যার আগমনের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল তা নিজেই বুঝতে পারেনি। জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে মেলে ধরতো ওর সহজ দৃষ্টিটাকে। অন্ধকারের মধ্যে দূরের আলোগুলো কল্পনায় রঙীন হয়ে উঠতো; ও তখন ভাবতে চেষ্টা করত ওর সামনে যেন ছড়িয়ে রয়েছে কোন প্রাচীন সবুজ দ্বিপতা। ও যেন বেলি চামেলি যুঁইয়ের গন্ধ পাচ্ছে। যেন দেখতে পাচ্ছে ঠাকুরঘরের প্রদীপের আলোয় ঠাকুমা

কাঁথা সেলাই করছে তার নাতির জন্য। যেন শুনতে পেত ঠাকুমার কাঁপা কাঁপা গলায় রূপকথার গল্প। সে এক আশ্চর্য নেশা। দিনের বেলায় কোলকাতার বাসষ্ট্যাণ্ডের কর্মব্যস্ত শব্দে ঘুমিয়ে থাকতো যে আবেগ, সন্ধ্যার পর যেন অলৌকিক এক আচ্ছন্নতায় তা জেগে উঠে ওকে তীব্র সুখী করতো। এক এক দিন রমার খুব ইচ্ছে করতো অতনুকে জানাতে সেই অন্ধকারের উপলব্ধির কথা। একদিন সন্ধ্যায় অতনু এল, ওর খুব ভাল লাগল; হঠাৎ বলে বসল

—আমরা এই অন্ধকার থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রেখেছি। ঠিক ঐ রজতদের মত।

—তার মানে?

—ওদের কোনদিনই লাইন কাটা যাবে না।

—যদি লাগাই কেন করে?

—ওদের কাজের লোকেরা তখনি জানান জানিয়ে দেবে।

—তা দেবে।

—জান রমা, ওরা হল বড়লোক।

—কিন্তু ওরা তো অনেক জানাশোনা করে। অনেককে সাধ্যসাধনা করে, সোস্যাল ওয়েল ফেয়ারে অনেক খরচ করে।

—তা করে ঠিকই কিন্তু ওরা নিজেদের কেমন আলাদা করে রেখেছে।

—তা তো হবেই।

—কেন হবে?

—ওদের অর্থ আছে তাই।

—না, অর্থ কারো একার হতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে ওরা যাদের পরিশ্রমে আরাম আয়েস ভোগ করছে তাদের নিজেদের থেকে আলাদা করে রাখবে কেন?

—কেন, ওরা তো ওদের কর্মীদের বাড়ি দিয়েছে সেই সঙ্গে অনেক সুবিধেও।

—তা দিয়েছে; কিন্তু ঠিক নিজেদের বাড়ির মত বাড়ি আর সুবিধে দিয়েছে কি?

—না, তা কি করে হবে?

—কেন হবে না? ওরা অর্থ দিচ্ছে তারা সামর্থ্য দিচ্ছে; তবে কেন একই শ্রেণীভুক্ত ওরা হতে পারে না? রমা চুপ করে রয়। এ কথাটা সে এতদিন ভেবে দেখেনি। দেখেছে ধনী লোকেদের দান, বদান্যতা। তারা হাসপাতাল তৈরি করেছে, স্কুল তৈরি করেছে নিজেদের জন্যে সিংহভাগ বজায় রেখে, পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভাগে তো হয় নি। ওর মনে পড়ল অতনুর ঘর আর রজতের ঘর। রজতের ঘরের প্রয়োজনীয় যা কিছু বিলাসের পর্যায় পড়ে আর অতনুর মাত্র প্রয়োজনটুকু। একদিন ওর ঘরের পুরোণ আমলের বড় দামী আলমারীটা বিক্রি করে সেই টাকায় আরও দুটো আলমারী কিনে ও ওদের সরকারবাবু আর পুরোণ আমলের কাজের লোক ব্রজদাকে দিয়ে দিয়েছিল, বলেছিল একজনের জায়গায় তিনজনের প্রয়োজন মিটছে। এটাই কি ভাল হল না? সেদিন ব্যাপারটাকে রমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল পয়সার গরম। করুণা করার স্পর্ধা। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে বসে বসে ও উপলব্ধি করতে পারল অতনুর মনোভাব। চোখ ধাঁধান ঘর তোপানোর মত উপকরণেই অভাবের সত্যটা এমন করে ধরা পড়ল। তাই আবার যেদিন ঘরে আলো জ্বললো, ফ্যান ঘুরলো, সেদিন ওর শান্তি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু অন্ধকারের জন্যে একটু বেদনার্তও হয়েছিল ওর মন।

দীর্ঘদিন পরে যেদিন রমাদের ঘরে আবার আলো এল সেদিন রমা ওপরের ফ্ল্যাটে নতুন বৌটির কাছে গেল। বৌটি বার বার করে ওকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আগে। একখানি ঘরের সংসার। মেয়েটি নতুন এসে সংসার পেতেছে। রমা গিয়ে বসার একটু পরেই মেয়েটির স্বামী অরূপ অফিস থেকে ফিরল। রমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল সবেমাত্র অফিস থেকে এল, একখানি ঘর। রমা নেমে আসতে চাইছিল কিন্তু স্বামীস্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়ান গেল না। রীণা যতটা সম্ভব খুশী খুশী মুখ করে ওকে আপ্যায়িত করার চেষ্টা করল। হঠাৎ বড় আলোটা জেলে দিয়ে অরূপ বলে উঠলো

—দেখুন তো রমাদি! এই বুককেসটা কেমন হয়েছে?

রীণার দিকে তাকিয়ে রমা বললো,

—নতুন কিনলেন বুঝি ?

কিন্তু সে মুখে কোন আনন্দ বা আগ্রহ দেখল না রমা। অরূপ বলে,

—বইগুলোর এবার গতি হবে কি বল রীণা ? জানেন রমাদি আপনার বান্ধবীটির কত দিনের ইচ্ছে পূর্ণ হল এতদিনে। অবশ্য আংশিকভাবে।

রমা বললো,

—কেন আপনার ইচ্ছেও কি পূর্ণ হল না ?

—ঠিক তার উল্টো। বরং বলতে পারেন আমার একটি ইচ্ছের মৃত্যু হল। রীণা পাথরের মত বসেছিল, জানলার ধার ঘেঁষে। অরূপ বলে চলেছে

—আমার কি ইচ্ছে ছিল জানেন ? আমার ঘরে বিলাসিতার কোন চিহ্ন থাকবে না। বইগুলোর ঝুলো ঝেড়ে কি ঘরের একপাশে জড়ো করে রাখা যায় না ? খাট না হলেও কি শোওয়া যায় না ? আলমারী না হলেও কি কাপড় রাখা যায় না ? আগেকার দিনে তো বাক্সয় কাপড় রাখা হত। রমা একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললে

—হ্যাঁ, তার আগে প্যাটরা কি কাঁশিতে কাপড় থাকতো। তারও আগে হাঁড়ির মধ্যে। কিন্তু মনে কোরবেন না অরূপ বাবু, সেদিন কিন্তু রীণার কাপড়টায় ইস্ত্রি ছিলনা বলে আমার সামনেই আপনি ওকে গাইয়া, আন-স্মার্ট এই সব বলেছিলেন। আপনার সেদিনের মতামতের সঙ্গে আজকের কথাগুলো কিন্তু মানাচ্ছে না।

—সেটা পরিচ্ছন্নতা, রুচির কথা।

—কিন্তু রুচি বজায় রাখতে গেলে কতকগুলো প্রয়োজনের কথা এসে পড়ে নাকি ? বার বার কাপড় ইস্ত্রি করে পরাটা সুবিধে না ইস্ত্রি যাতে নষ্ট না হয় সেই ভাবে রাখার ব্যবস্থা করা সুবিধে বলুন ?

—দেখুন ওসব খাট, পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবল আমাদের মানায় না। ও সবের জন্য যথেষ্ট অর্থের দরকার।

—আপনি অর্থ চান না অরূপ বাবু ?

—নিশ্চয়ই চাই।

—কেন চান ?

—বাঃ, অর্থ কে না চায়।

—তার মানে আপনিও খাট, পালঙ্ক, ড্রেসিং টেবল চান। শুনেছি রীণার বাবাকে আপনি বারণ করেছিলেন এ সব দিতে। কেন বলুন তো ?

—আমি এই যৌতুক নেওয়া ব্যাপারটাকে ঘৃণা করি। তাছাড়া আমার মনে হয় এসব ঘরে রাখা মানে বিলাসিতা।

—তাহলে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপার্জন করাটাও বিলাসিতা।

—কেন ?

—কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত আয় হলেই মানুষের প্রয়োজনের পরিধিটাও বেড়ে যায় না কি ?

—আসলে ও সব আমার পোষায় না। আমার ঘরে এইসব আসবাব পত্র থাকলে আমার মনে হবে আমি বুঝি দলছাড়া হয়ে গেছি। রীণা আমার আদর্শের দায়-ভাগ নিতে পারল না। আমার ইচ্ছের মর্য্যাদা দিল না। কিছু না থাকার মধ্যে দিয়েই খুশী হয়ে ওঠার আর্ট ওর জানা নেই। আমি ভেবেছিলাম এই সব ব্যাপারে ও আমাকে সাহায্য করবে। আমার ইচ্ছে ওর ইচ্ছে একখাতে বইবে, তা হল না।

—অরূপ বাবু ! আপনার ইচ্ছের স্বরূপটা আপনি জানেন না তাই অনায়াসে রীণার ইচ্ছেগুলোকে অপমান করেছেন। আমি চলি। যদি ইচ্ছে হয় আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখবেন। রমার যেন সমবেদনা হয়ে আসছিল। সে বোঝে অরূপের ক্ষোভের কারণ আর রীণার দুঃখও, বোঝে ; তাই একটা বিস্ফোরণের আগেই ও ওদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। আসলে ওদের অভ্যাসের মিল হয়নি ; তাই ওদের ভালবাসার মাঝখানে তিল তিল করে ঘৃণা আর লোভ জমা হয়ে হয়ে একটা পাহাড় গড়ে তুলেছিল। যদি যাযাবরী জীবন বেছে নেওয়া যায় তাহলে অরূপের কথার তাৎপর্য বোঝা যায় ; কিন্তু ভালবেসে বিয়ে করে ঘর সংসার করতে গেলে মানুষ তার সামর্থ্য অনুযায়ী

ঘরটুকুকে গুছিয়ে রাখতে চায়। বিশেষ করে মেয়েরা। সারাদিনের পর বাড়ি এসে ঘর অগোছালো দেখলে ছেলেরাই বেশি বিরক্ত হয়। নিতান্ত প্রয়োজনের সামান্যতম আয়োজনটুকু নিয়ে জীবনযাত্রাটাকে সুচারু ভাবে চালাতে পারার মধ্যেও একটা আর্ট আছে। বিবাহিতদের এটা বোধ হয় বোঝা উচিত। বড়লোকের বাড়ির প্রয়োজন আর গরিব বাড়ির প্রয়োজনের পার্থক্যটা রমা এখন বেশ বুঝতে পারে রূপাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর থেকে।

আজ ওখান থেকে চলে আসার পর অতনুর কথা মনে পড়লো। আশ্চর্য্য! এতক্ষণ ও অতনু আর রীণার কাছে যে কথাগুলো বলে এল তার প্রায় সবটাই তো অতনুর কথা। হঠাৎ ও আবিষ্কার করল ওর নিজের দারিদ্র্যের জন্য বেশ একটা গর্ব রয়েছে মনে। কোথায় যেন রঙতরা ধরে যাচ্ছে ওর কাছে। মনে হচ্ছে রঙতরা যেন সাজানো গোছান পুতুল, সুখ আর সৌজন্যের বাজারে শো কেসে সাজান রয়েছে অতি যত্নে, একটু অসাবধান হলেই জীবন যাত্রায় ধরাদরীর প্রশ্ন এসে পড়বে। নিজেকে বেশ সুখী আর বুদ্ধিমতী মনে হচ্ছে এখন, সেই সঙ্গে একটা অলিখিত কৃতজ্ঞতা বোধ অতনুর কাছে।

অতনু এখন বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে, বুঝতে আর কষ্ট হয় না। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না অতনুর মাকে। অতনু নিজেই তো তাঁকে গ্রহাগারে বসিয়ে রেখে নীরবে পূজো করে চলেছে।

মা বাড়ি ফেরেন নি। সুনীলের কাছে রমা ইয়েটসের একটা কবিতা পড়তে বসল। সুনীল যখন যে বিষয় নিয়ে পড়ায় বা কথা বলে তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে যায়। ওটা ওর স্বভাব। সেদিন পড়াতে পড়াতে সাহিত্যের তাৎপর্য, কবিতার মূল্যায়ন, আর তার সঙ্গে মানুষের যে গভীর সম্পর্ক তারই ব্যাখ্যায় ডুবে গেল। রমা সুনীলের পাণ্ডিত্যে, সহজ সুন্দর করে বোঝানর পদ্ধতিতে শ্রদ্ধায়, প্রশংসায় আবার নতুন করে যেন মুগ্ধ হল। জীবনের গভীরে যে সুপ্ত তারগুলো আছে সেখানে যেন মৃদু সুরের ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছে রমা। বাইরের ঝিমঝিম শান্ত বর্ষার সঙ্গে ঘরের ভেতরের শান্ত অথচ প্রাণের তাপে উষ্ণ আবহাওয়াটা আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল। এই যে পরিমণ্ডল তৈরী হয়ে উঠেছে এর যেন নাম দেওয়া যায় না। একটা সম্পূর্ণ বাস্তব অথচ আশ্চর্য্য রোমান্টিক এই অবস্থাটার যেন শেষ না হয়। যেন হঠাৎ কোন রূঢ় সত্য একে ভেঙ্গে না দেয়।

রমা যেন হঠাৎই বুঝতে পারল যে সে বড় হয়ে গেছে, অনেক বড়। আজ সে বুঝতে পারল কেন মায়ের সঙ্গে সুনীলের এত মিল। মায়ের সঙ্গে সুনীলের আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি করে কেটে যায় আজ সেটা স্পষ্ট হল। এতদিন ধরে দুজনের বিরুদ্ধে অতনুর বক্রোক্তি আর নিজের মনের অস্পষ্ট একটা সন্দেহ এতদিনে লজ্জা পেয়ে সরে গেল। রমা বুঝতে পারল মা বাবার কাছে যোগ্য মর্য্যাদা পেলেন না, তাই মা যেন বাবার সম্বন্ধে কর্তব্য পরায়ণ, অথচ ব্যক্তিগত সম্পর্কে উদাসীন। আসলে বাবা মায়ের থেকে অনেক সাধারণ, তাই হয়তো মাকে হিংসে করেন, মনে মনে ভয়ও করেন। তাঁর সম্বন্ধে লালিত এবং অভ্যাসগত সংস্কার দিয়ে তিনি মাকে বিচার করেন। তাঁর মতে মেয়েমানুষ, সে মেয়েমানুষই। এই ভেবে এতদিন ধরে নিজেকে ঠকিয়েই এলেন। সুনীল মাকে মাঝে বিচারকের ভূমিকায় নিজেকে আরোপ করে ফেলতো। রমার কাছে তখন ওর মা বাবার সপক্ষে, বিপক্ষে অনেক কথাই বলতো। সপক্ষে কথাগুলো শুনতে ভাল লাগত রমার। কিন্তু বিপক্ষের কথা উঠলেই কেমন যেন অস্বস্তি সুরু হত ওর। একদিন বলেই ফেলেছিল,

—সুনীলকাকু, ও সব কথা থাক।

সুনীল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে

—কেন?

—কি দরকার আমার বাবা মায়ের সম্পর্কের কথা জানার?

—কিন্তু কেন জানবে না? তোমার পায়ের তলার

মাটি কেমন তা যদি না জান তবে কেমন করে তার ওপর দাঁড়াবে তুমি?

—যদি খারাপ মাটি হয় তাহলে না হয় সরেই যাব। আর যদি শক্ত মাটি হয় তাহলে তো তোমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে থাকবো।

—তোমার জানতে ইচ্ছে করে না রমা কি কি উপাদানে তুমি তৈরি? তোমার মা বাবার প্রভাব তোমার ওপর কোথায় কতখানি কাজ করছে? আত্ম বিশ্লেষণ না করে মানুষ কখনও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

- তার জন্য মা বাবাকে বিচার করতে হবে?

—এটা তুই যদা যুক্তির কথা বলছিস রমা? মা বাবাও তো মানুষ! আমাদের সঙ্গে একই আলো বাতাসের অংশ গ্রহণ করছেন নাকি? তবে কেন তাঁদের বেলায় বিচার থাকবে না? রমার মনে পড়ল সেদিনই বাবা সুনীলকে বলছিলেন—আজকাল ছেলেমেয়েরা মা বাবার অতীতটাকে টেনে বার করতে চায়। সব যেন এক একটি বিচারক। আমরা যা করেছি তা খুঁড়ে খুঁড়ে বার না করে যা বলছি তাই কর দিকি তাতেই তোদের মঙ্গল।

এর উত্তরে সুনীল খুব শান্ত ভাবেই বলেছিল

—এখন সময় বদলেছে, রুপ পাল্টাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের বিচারক। মানুষের মন যত স্বাধীন হচ্ছে তার দায় দায়িত্ব ততই বাড়ছে। যা খুশী তাই করার দিন আর নেই। রমণীবাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন

—কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি মানুষ এখন যা খুশী তাই করছে।

- না দাদা, আপনি যা বলছেন তা একেবারেই উল্টো।

—তার মানে?

—আপনাদের আমলেই বরং যা খুশী তাই হত। এই দেখুন না, আপনি কি বৌদির মত মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন? তিনি কি আপনার মনের মত?

—আমি তখন বিয়েই করতে চাইনি। বাবা জোর করে বিয়ে দিলেন। আমারও বাবার অবাধ্য হবার সাহস ছিল না। হেসে ওঠে সুনীল।

—তাহলে দেখুন আপনার ওপর আপনার বাবা জোর করে ছিলেন।

—কিন্তু আমি তো বাবার অবাধ্য হই নি।

—হ্যাঁ বাবার অবাধ্য হন নি। বিয়েটা করেছিলেন কিন্তু আপনার বাবা কি চেয়েছিলেন আপনার বিবাহিত জীবন অশান্তিকর হোক?

—কিন্তু তার জন্যে কি আমি একাই দায়ী?

—খানিকটা। কারণ তাঁকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন, নিজের ইচ্ছে আর অভ্যাসগুলো তার ওপর চাপিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছে কি তাঁর অভ্যাসের কথা কি একবারও ভেবেছিলেন? তাহলেই দেখুন আপনার বাবা তাঁর যা খুশী তাই করেছিলেন, আপনিও যা খুশী তাই করছেন।

—কিন্তু সেই যা খুশীর পেছনে যুক্তি ছিল, বাবা ভেবেছিলেন ছেলে বড় হয়েছে তার জীবনে এখন স্ত্রীর প্রয়োজন। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, সংসারে এ সবের কি প্রয়োজন নেই? আমিও ভেবেছিলাম আমাদের বাড়ির বৌ আমাদের বাড়ির অভ্যাসেই তৈরি হয়ে উঠুক।

—তাহলে দেখুন আপনার বাবার যুক্তিটাও একতরফা আর আপনারটাও। এখনকার মানুষরা কিন্তু বেশিরভাগই জোর করে নিজের ইচ্ছে অপরের ঘাড়ে চাপাতে চায় না। আসলে আপনার রুচিকে, আপনার ইচ্ছেকে, আপনার বাবা যদি একটু পাত্তা দিতেন, অর্থাৎ যদি জানতে চাইতেন আপনার মতামত, তাহলে আপনার জীবনটা কি অন্যরকম হত না? আপনাদের তো একটুও বনিবনা হয় না।

—থাক্ থাক্ সুনীল। আমরা না হয় বাপের কথায় বিয়ে করেছি, এখনকার এই নিজেরা দেখে শুনে বুঝে পড়ে যে বিয়ে হচ্ছে তার পরিণামটা কি? পুজোর চাঁদা না দিলে যাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। ভাড়াটেকে বাড়ী ছাড়তে বলে পাড়ার ছেলেরা বাড়িওয়ালাকে ছুরি মারবে,

পরীক্ষার টুকতে না দিলে মাষ্টার পাষের হয়ে যাবে এগুলো বাধ্যতার চিহ্ন ?

—তা আপনি যাই বলুন দাদা এখনকার ছেলেরা আর ধর্মের কি নীতি কথার নেশায় বুঁদ হয়ে নেই। এরা অনেক বোঝে, অনেক ভাবে, চোখের দৃষ্টি এদের ঝাপসা নয়। আপনারা যা পাপ করেছেন এরা তার প্রায়শ্চিত্ত করছে।

—তাই বলে মানবিকতা বলে কোন কথাই থাকবে না—আর পাপ ! পাপ কাকে বলছ ?

তর্ক এইভাবেই চলেছিল সেদিন আবার স্বাভাবিক নিয়মে থেমেও গিয়েছিল।

অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন রজতের সঙ্গে দেখা হল রমার। রজত গাড়িটায় ব্রেক কষে জিগ্যেস করল,

—কি ব্যাপার, এই বাদলায় কোথায় বেরিয়েছেন ?

—কলেজে।

—এই বৃষ্টিতেও ?

উত্তরে রমা একটু হাসল।

—উঠে আসুন পৌঁছে দি।

রমা দ্বিরুক্তি করে না, উঠে পড়ে গাড়িতে। রজত সাগ্রহে প্রশ্ন করে

—কলেজের পারসেনটেজ সম্বন্ধে খুব পারটিকুলার বুঝি আপনি ?

—না, না, যতটা ভাবছেন ততটা নয়। আসলে কি জানেন, কি করবো বাড়িতে বসে ?

মনে মনে ভাবে রমা, রজত তো জানে না বাড়ির দুখানা স্যাঁত সেঁতে ঘরের থেকে যতটা দূরে থাকতে পারা যায়, তাই রমা ইচ্ছে না থাকলেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ কলেজ যাবার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। এমনি যদি কোথাও ঘোরা যেত, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এসবের হিসেব না কষেই তাহলে হয়ত ভাল লাগত। বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। দুজনেই চুপচাপ। কিন্তু কথা বলা দরকার। কথা না বললে নিঃশব্দে যে কথা বলা হবে তার সুর-মূর্ছনা অনেক খানি দায়িত্ব গড়ে তুলবে, এই মুহূর্তে তা ভাল লাগলেও পরে সেই ভাললাগাটাই হয়তো ভার হয়ে উঠবে। হঠাৎ তাই কথা সুরু করে।

—আপনি গ্লাস কামাই করতেন ?

—নিশ্চয়ই ! হা হা করে হেসে উঠে রজত।

—কত কামাই যে করেছি। এক এক দিন এক এক রকম অভিযান। কোথায় যে গেল সেই সব বন্ধুরা।

—তাদের দেখতে ইচ্ছে করে ?

—করে না ? ছেলে বেলার বন্ধুদের কখনও কি ভোলা যায় ? জানতে ইচ্ছে করে কিভাবে তাদের জীবন চলছে ? কি করছে তারা ? কত জনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

—আপনার স্বপ্ন ?

—স্বপ্ন দেখাই সুরু করতে পারিনি তবে স্বপ্নের আবেশ মনের চারিপাশে আজও ছায়া ফেলে।

অকারণেই কান দুটো গরম হয়ে ওঠে রমার।

—জানেন ?

রজত হঠাৎ বলে,

—বাবা আমাকে কিছুতেই বিদেশে পাঠাবেন না। আশ্চর্য লাগে আমার। বাবার তো টাকার অভাব নেই। তাঁর বাবসা দেখতে বলেন কিন্তু তাতেও তো যোলআনা বাড়ান দরকার। আমার খুব ইচ্ছা করে নতুন কিছু করার, নতুন কিছু শেখার, কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেশে কৈ বল তো।

—কেন এ দেশে কি নতুন কিছু শেখার নেই ?

—আমার ইচ্ছে করে ও দেশ থেকে নতুন কিছু শিখে আসতে যেটা এদেশে হচ্ছে না। কিন্তু বাবা রাজী নন। তা ছাড়া গান, গান আমার স্বপ্ন।

—তা গান শিখবার জন্যে ওদেশে কেন ?

—না, না, বিদেশী সুর। জান বিদেশী সুর আমাকে পাগল করে দেয়। আমার ইচ্ছে করে ওদেশে গিয়ে ওখানকার কোন সুরকারের কাছ থেকে সাধনা করি।

—মেসো মশাই বোধ হয় আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।

—সেইটেই তো আশ্চর্য। অথচ বাবা নিজে খুব ভেরাইং।

—দেখুন মেসো মশাই হয়তো কিছুটা হোমসিক—শুনেছি তো উনি যখন বিদেশে গিয়েছিলেন তখন মাসীমাকে সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিলেন।

রজতের সেই অবাঙালী চেহারার দিকে তাকিয়ে রমার কেবলি মনে হত সত্যিই রজতকে এদেশে মানায় না। নীল চোখ, লাল চুল, গৌরবর্ণ। গাড়িটা ঠনঠনিয়ার কাছে আটকে গেল, জল, শুধু জল, দুজনে চাইল দুজনের দিকে। রজত হেসে প্রশ্ন করে

—এর পরেও কি এগোতে বল?

—ফিরুন।

—কিন্তু কোথায়?

—যেখানে খুশী।

রজত গাড়ীর মুখ ঘোরায়। গাড়ি ছুটলো। রমা জানতে চাইল কোথায় চলেছি।

সময়ের সংকেত ঘড়ির কাঁটায়। চলুক ওরা দুজনে যেখানে খুশী। এই যে ঠিকানাহীন ছোটা এ অভিজ্ঞতা ওর কাছে নতুন। এখন বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নেই, ন্যায় অন্যায়ের বোধ নেই, বর্তমান, ভবিষ্যতের বিচার নেই। গাড়ী ছুটছে হুহু করে।

অতদূর কথা মনে পড়ল রমার। গাড়িটা যখন লোকালয় ছেড়ে মাঠের পথ ধরেছে বৃষ্টি জোরে এল। কাঁচটা অনবরত অটোমেটিক ক্লিকে পরিষ্কার হয়ে উঠছে আবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। জলের ছাটে এদিকে তাকিয়ে রমার মনে হল ওর মনের অবস্থা এখন যেন ঠিক ঐ রকমই।

নির্জন পথ বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ। নিজের অজান্তেই গান গাইতে সুরু করেছে রজত। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে। হঠাৎ কখন রমাও যে গলা মিলিয়েছে তা তার নিজেরই খেয়াল নেই। খেয়াল হতেও থেমে যায়নি সে। আজকের এই সকালটা যে হিসেবী হতেই ভাল লাগছে। গান যখন আপনিই এসেছে গলায় বাধা দিয়ে লাভ কি? গাড়িকে এখন চলতেই হবে কারণ নামার জায়গা নেই। একটা গাছ তলায় গাড়ি থামল। রমার অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরাল রজত। গাছের তলায় তেমন জল ছিল না। বৃষ্টিও প্রায় ধরে এসেছে। তারপর এই প্রথম ঘড়ি দেখলো। বেলা একটা। রমা খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছে। ওর খুব লজ্জা করতে লাগল। রজতের হয়তো খাওয়া হয়নি। এখন পুরোপুরি বাস্তবে ফিরে এসেছে ওরা। রজত বলল

—দাঁড়াও। একটা মজা দেখ। এস আমার সঙ্গে।

টিনের শেড দেওয়া একটা চায়ের দোকান। এই বাদলার খদ্দেরের আর আশা নেই দেখে দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করার উদ্যোগ করছে। ওরা দুজনে গিয়ে হাজির। অন্য কেউ হলে দোকানী হয়তো হাঁকিয়ে দিত। সে একবার গাড়ি খানার দিকে একবার ওদের দিকে চেয়ে বিনীত বিস্মিত মুখে তাকাল। রজত বললো

—চা আছে? একটু চটপট দিন তো। আর কি আছে? এই তুমি কি খাবে বল।

রমা তো অবাক।

—আরে বল না। লজ্জার কি আছে? বল বল চট পট বল। বেলা হল অনেক। তেলে ভাজা চলবে? দোকানী একটু থতমত খেয়ে বললো

—আজ্ঞে, তেলেভাজা তো সব ফুরিয়ে গেছে। কেক আছে মেব?

—না, না ঐ মোয়া দিন। চিঁড়ের মোয়া।

মোয়া আর ভাঁড়ে চা নিয়ে ওরা বসল। রমা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল

—এ অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়েছিল? রজত একটু হাসল। দোকানীর দাম মিটিয়ে দিয়ে গাড়িতে এসে স্টার্ট দিল। ওরই মধ্যে কয়েকটা বাচ্চা এসে গাড়ির চারিপাশে ঘড়ো হয়েছিল। এবার খেলার পালা। রাস্তায় কাদা, জায়গায় জায়গায় গর্ত। বাতাস বইছে এলোমেলো। মেঘগুলো যেন ছুটে পালাচ্ছে। নিতান্ত মামুলী

গল্পের মধ্যে ওরা ফিরে এল। ওকে গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে রজত চলে গেল। রমা একটা নতুন গানের রেশ নিয়ে ফিরে এল।

অতনুর মনটা আজ কদিন ধরে কেমন যেন ভার ভার। কারণটা সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছিল না। আগের সন্ধ্যাতেও রমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। রমা বেশ খুশীই ছিল। বেশ একটু সেজেও ছিল। অনেকদিন পর রমাকে বেশ সহজ বলেই মনে হচ্ছিল। বিকেলে রমা অতনুর কাছে গেল। বেশ উৎসাহ নিয়েই বললো

—জানো, আজ ভারি মজা হয়েছে।

—কি রকম?

—বেরিয়েছি আর ঝমঝমে বৃষ্টি—উঃ!

—বাঃ, রোমান্টিক!

—শোন রোমান্সের এখন তো সুরুই হয় নি। হঠাৎ সেই প্রকাণ্ড কালো গাড়ি।

—হুঁ, চলে নীল সাড়ি নিমাড়ি নিমাড়ি পরাণ সহিত মোর?

—হ্যাঁ ছাই, শোনই না আগে।

—কি শুনবো?

—ঝপ করে গাড়িটা এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে গেল, সাদর আহ্বান—বৃষ্টিতে না ভিজে চলে আসুন গাড়িতে।

বদান্যাহল্য রজতের তরফ থেকে তুমি এখনও সর্বনামকে প্রচলিত হয়নি।

—তারপর?

—তারপর একটু দোনামনা, অবশেষে গাড়িতে প্রবেশ।

—বাঃ, বেশ ডায়লগ্ সিচুয়েশান তৈরি, লিখে ফেল না। প্রযোজক নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে।

কথাটা বলতে বলতে একটু গম্ভীর হয়ে যায় অতনু।

—দেখ রমা, ভদ্রলোককে আমার খারাপ লাগে না। গাড়ি আছে, পয়সাও আছে। কাজেই মানুষের উপকার করবেন না কেন? অবশ্য মনটাও থাকা চাই ও সেটা তাঁর আছেও। অনেকের সব আছে মনটা থাকে না। তবে কি জান রমা! বড়লোকের দানে আমার বিশ্বাস নেই।

—কি রকম?

—এই ধরো বাসস্ট্যাণ্ডে শেড করে দেওয়া, হাসপাতালে বেড, স্কুলে প্রাইজ এগুলো তো নিজের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন। এরা প্রকৃত গরীবের দুঃখ কতটা বোঝে? এরা কি কোনদিনও কোন বস্তি এলাকায় যায়? খোঁজ নেয় তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের?

অতনুর মা চল্লিশ খানা ঘরের একটা বস্তি করে দিয়েছেন, ভাড়া প্রতি ঘরের জন্যে মাত্র আট টাকা। অতনু জিগ্যেস করেছিল "এই একশো নিরানব্বই টাকা নিয়ে তোমার কি হয়?" মা বলেছিলেন, "ওদের কৃপা করার কোন অধিকার নেই। মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে অপমান করবো কেন? তারা আসুক তাদেরও ঘরের প্রয়োজন, আমারও টাকার প্রয়োজন'।

—মা কিন্তু এ নিয়ে কখনও ঢাক করে বলে বেড়ান না।

অতনুর মা আজকাল বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে অতনুকে জানাতে চান। ওঁর ধারণা হয়েছে যে উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। সেই জন্যেই বস্তির কথা এতদিনে উনি ছেলেকে জানিয়েছেন। এ কথা জানার পর মাকে ওর আরও ভাল লাগে। মায়ের মহত্ত্ব ওর মনকেও অনেক খানি বড় করে তোলে। এই সব ভাবতে ভাবতে ওর খুব ইচ্ছে করছিল এখুনি মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু আদর খেয়ে আসে। কিন্তু তা হবার নয়। ও হয়তো গিয়ে দেখবে মা একখানা খাতায় মন নিবিষ্ট করে বসে আছেন কিম্বা একখানা ভারী বইতে মনোনিবেশ। ও জানে মা ওকে ভালবাসেন। সে ভালবাসা সীমাহীন; মায়ের কাছে সমস্ত পৃথিবী একদিকে, আর ও আর এক দিকে; কিন্তু তবুও মা ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অতনুর সঙ্গে একদিন নিতান্ত নাটকীয় ভাবেই রজতের

আলাপ হল। আলাপের মধ্যে রসালাপ ছিলনা। রজতের গাড়ি থেকে রমা নেমেছে ঠিক তখনই অতনু এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনেই। অতনু অবশ্য দেখতে পায় নি ওদের, রমাই ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। অতনু খুব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল রজতের দিকে, তারপর চুপ করে বলে বসল

—কি আশ্চর্য! আমাদের বাটিতে আপনাকে যেন মানাচ্ছে না। রমার মনে হল অতনু যেন ইচ্ছে করেই কটাক্ষ করল ওর গাড়ি বাড়িকে ইংগিত করে। রজত কিন্তু সেরকম কিছু ভাবেনি। খুব সহজ ভাবেই বললো

—হ্যাঁ, এ কথাটা আমাকে অনেকেই বলে। দুর্ভাগ্য আমার।

অতনু মুখ চোখে চেয়ে বলল

—আপনাকে এই পাঞ্জাবী আর পায়জামা অপূর্ব মানিয়েছে।

অপ্রস্তুত হল রজত। রমাও। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রজত বললো

—আসুন একদিন আমাদের বাড়ি। রমার দিকে চেয়ে বললো

—চলে আসুন একদিন অতনু বাবুকে নিয়ে আমাদের ওখানে।

অতনু হাসিমুখে বললো,

—আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ রইল। রমার বুক থেকে পাথরের ভারি বোঝাটা নেমে গেল। তবু মনে হচ্ছিল আলাপ না হলেই বুঝি ভাল ছিল। তাছাড়া অতনুর মুখে আমাদের কথাটার ওপর একটু জোর বেশি ছিল বলে মনে হল। রজতের গাড়িখানা ফিরে গেল। রমা অতনুর দিকে ফিরে দেখে অতনু একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হঠাৎ রমাকে প্রশ্ন করে

—তুমি ঠিক জান ওর নাম রজত সেন?

—নিশ্চয়ই! তাতে সন্দেহ কি?

—আমার কিন্তু মনে হয় ও চেহারা বাঙালীর হতেই পারে না। নিশ্চয়ই ওর মা বাবার কেউ একজন বিদেশী।

রমা হেসে ওঠে

—ধ্যাঃ, তা হতেই পারে না আমি ওর মা বাবা দুজনকেই দেখেছি। তাছাড়া রূপার সঙ্গে ওর মুখের যথেষ্ট মিল। তবে রূপা ওর থেকে অনেক ময়লা। আসলে মা বাবা দুজনেই তো খুব ফরসা, সাধারণ বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশি, বিশেষ করে ওর বাবা। তবুও অতনু জোরের সঙ্গেই বলে

—তুমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখ। নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

রমার কিন্তু এরকম সন্দেহ হত না, হয়তো ওদের বাড়ির পরিবেশে রজতকে একটুও বেমানান লাগে না তাই। দুধের ঘরেই তো রজের বাসা। সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে দেখলে হয়তো অতনুর মত ওরও মনে এই রকম একটা সন্দেহ হতে পারতো কিন্তু রমা তো অন্য দিকটাও দেখেছে। রূপা, রূপার মা, বাবা এদের সঙ্গে রজতের ব্যবহার তাতে কোথাও রহস্যের নাম গন্ধও নেই। কিন্তু অতনু কেন এ ব্যাপার নিয়ে এত ভাবছে। তবে কি পুরুষের চিরাচরিত ঈর্ষা? আর কোন খুঁত তো পাওয়া গেল না তাই জন্মের খুঁত? কিন্তু অতনুর মনের এই অনুদারতা কেন? ওকি ওর ভালবাসাকে বিশ্বাস করে না? বা নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই? তাই কি হীনমন্যতা? রমা সত্যিই বুঝতে পারত না অতনুকে কারণ রজতের সম্বন্ধে এই সন্দেহ বা উপেক্ষার ভাবটুকুকে সে কিছুতেই মেলাতে পারত না তার চরিত্রের সঙ্গে। অতনুর মধ্যে সত্যিই কোন নীচতা সে কখনও দেখেনি। সে রাগী, জেদী কিন্তু নীচ নয়। মাঝে মাঝে অতনুর সন্দেহটা ওকেও পেয়ে বসে; সত্যিই কি কোন রহস্য আছে রজতের জন্মের মধ্যে? এই প্রশ্নটাকে বুকের মধ্যে সংগোপনে বহন করতে হত। রমার সে যে কি যন্ত্রণা।

রূপার মায়ের সমস্ত আরাম আয়াসের মধ্যে কোথায়

যেন একটা উদাস প্রত্যাখ্যান মনে হত। এই মানুষটি যেন নির্বিবাদে সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে অনায়াসে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন।

হঠাৎ একদিন কিছু না জানিয়েই রমা রূপাদের বাড়ি গিয়ে পড়ে। বাড়ির কাছ বরাবর হতেই ও দেখতে পায় ওদের গাড়িটা গ্যারেজের বাইরে। নিজেকে ও বড় গাছ গাছের আড়ালে ঢেকে রাখল। গাড়িতে রজত আর রূপা। মনে মনে খুশীই হল রমা। মাসীমাকে একটু একলা পাওয়া যাবে। আজ মাসীমাকে ওর দরকার। ইদানিং অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল রমা ওদের বাড়িতে। খবর না দিয়েই ও যে কোন ঘরে চলে যেতে পারত। মাসীমা খাটের ওপর বসে ছিলেন। অনেকগুলো চিঠির তাড়া নিয়ে। সামনেই একটা চন্দন কাঠের বাক্স। ওর মনে হল এ সময় ওর উপস্থিতিটা হয়তো ওঁর কাছে প্রীতিকর হল না। রমা কিন্তু মনে মনে তখন নাছোড়বান্দা। এ সুযোগটা সে কিছুতেই হারাবে না। মাসীমার মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া সে দেখতে পেল, ভাবল হয়তো তিনি মনে মনে বিরক্তই হলেন, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়েই খুবই আগ্রহের সঙ্গে কাছে ডাকলেন। সেদিনটা ছিল মন উদাস করা এলো মেলো বাতাসের মেঘলা সকাল। মা একবার বারণ করেছিলেন কলেজে যেতে কিন্তু রমার মন ছুটেছিল, না, কলেজে নয়। প্রায় জোর করেই বেরিয়েছে বাড়ি থেকে। এ বাতাস মানুষের মনকে বে-পরোয়া করে তোলে। ছেলেবুড়ো কারোরই ছাড়ান নেই এর হাত থেকে। এই দিনে প্রবীণরা করেন স্মৃতি চারণা আর নবীনরা উদ্বেল হয়ে ওঠে যে কোন ধরণের আবেগে। এমন কি শিশুরাও ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় বাইরের মুক্ত বাতাসে। রূপাদের বাগানের শুকনো পাতা-গুলোও যেন আশ্চর্য্য নৃত্যে মেতে উঠেছে। সমস্ত চঞ্চলতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরে পড়ল। বৃষ্টির গায়ে ধাক্কা দিতে বাতাস আরও জোরে ছুটতে লাগল। এবারে যে শেষ শুরু হল তার তান, লয় অন্যরকম। এই অন্য রকম আবহাওয়া এক প্রবীণ আর এক নবীন নারীকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুললো, মনের গহনের তারগুলোর যেন একই সঙ্গে সুর বাঁধা হয়ে গেল।

রূপার মায়ের দীর্ঘ পক্ষ চোখ দুটিতে বিষন্নতার ছায়া ঘন হয়ে উঠলো। তিনি রমাকে প্রশ্ন করলেন

—তুমি কি রজতকে ভালবাস?

এ প্রশ্নের জন্য রমা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। রমার কাছ থেকে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বলেন,

—তোমাকে কয়েকটা কথা বলব। এ সংসারে সে কথা আর কেউ জানে না একমাত্র তোমার মেসোমশাই ছাড়া, এমন কি রূপা বা রজতও জানে না। অস্বস্তি শুরু হল রমার। সে নিজেই প্রশ্ন করবে বলে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল কিন্তু তার বদলে একি: কী বলতে চান মাসীমা?

—রজত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জাগে না তোমার মনে? ধক করে ওঠে রমার বুকের মধ্যে।

—কি প্রশ্ন মাসীমা?

—ধরো তার চেহারা নিয়ে?

—হ্যাঁ হয়।

—কি মনে হয়?

—মনে হয় কেমন যেন অবাঙ্গালী চেহারা কিন্তু রূপার সঙ্গেও তো মিল আছে।

—আমার সঙ্গে পাও কি?

—না।

—ওদের বাবার সঙ্গে ওদের দুজনেরই মিল আছে আমার সঙ্গে শুধু আমার মেয়ের

—বেশীর ভাগ তাই হয় মাসীমা, আমি তো আমার মায়ের মতই দেখতে।

—না রমা। আসল ব্যাপারটা তুমি জান না। কিন্তু তোমাকে জানানো দরকার, না হলে আমি চিরদিন অপরাধী হয়ে থাকবো। রজত আমার ছেলে নয়। ওর মা বাঙ্গালীও নয়। রমার মনে পড়ে গেল অতনুর কথা। অতনু কি তাহলে জানতো এ কথা। অতনুর মা, অতনুর

বাড়ির পরিবেশ সেও তো আর পাঁচটা বাঙালী বাড়ির মত নয়। তবে কি গভীর কোন রহস্য জড়িয়ে আছে এই দুই পরিবারের মধ্যে? রূপার মা বলেন

—মমা, তোমাকে আমি আজ সব কথাই খুলে বলবো। ওকে আমি লণ্ডন শহর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওর মা খাঁটি বৃটিশ। ওর মা যদি মারা যেত দুঃখ ছিল না কিন্তু সে ওকে ফেলে পালাল কারণ ওর বাবা একজন ভারতীয়। ভারতীয়ের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হতে পারল কিন্তু তার সন্তানকে সে স্বীকার করে নিতে পারল না। এমনিই ঘৃণা ভারতীয়ের ওপর। আর সবচেয়ে লজ্জা আর বিড়ম্বনার কথা—তোমার মেসোমশাই ওর বাবা।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না রূপার মা। তারপর বলেন

—তুমি হয়তো ভাবছ মা, তোমার রূপার বাবা কেন এমন ঘটতে দিলেন? তাঁর কোন দোষ নেই। তিনিও কম দুঃখ পান নি। আমি যদি সেদিন রজতকে বুকে তুলে না নিতাম তাহলে তিনি আজ কোন্ স্তরে চলে যেতেন জানি না। সে কিন্তু এক প্রকাণ্ড উপাখ্যান। তোমার সময় আছে? ধৈর্য? তাহলে আমাকে বলতে দাও মা। বুকের মধ্যে এই কথাগুলি চেপে রেখে আমি আর পারছিলা।

—কিন্তু মাসীমা! আপনি তো যা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা হয়ে গেছে।

—না, মা, আমি যা বলতে চেয়েছি তা কিছুই বলা হয় নি। তুমি তার আভাসও হয় তো পাচ্ছনা। আমার বুকের যে কি তার নিয়ে আমার দিন রাত্রি কাটছে তা তুমি জান না। যখন তোমার মেসোমশাই সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছেন, তার বাবা তাকে বিলেত পাঠান বড় আশা করে, ছেলে আরও বড় হয়ে ফিরবে। যাবার আগে ছেলের পায়ে বেড়ি পরাতে চেয়ে ছিলেন। গরিবের ঘরের মেয়ে আমি। নিজের মতামত জানাবার মত বয়েস বা শিক্ষা কোনটাই ছিলনা। তবু পনের বছরের মেয়ের চোখে সুন্দর, সুপুরুষ স্বামী তার স্বপ্নে ভরে আছে। ফুলশয্যার আবেশ কাটতে না কাটতেই চলে যেতে হল তাঁকে সুদূর লণ্ডনে। সেখানে যে বাড়িতে পেইং গেস্ট হয়ে ছিলেন সেই বাড়ির মেয়ের এক বান্ধবীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো তার পরিচয়। যুক্তিহীন দুর্বল আবেগে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনলেন। একে বয়েস ছিল কম তার ওপর দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। মেয়েটি যখন তাঁকে জানালো এই দুর্ঘটনার কথা তখন বাধ্য হয়েই তাঁকেও জানাতে হল যে তিনি বিবাহিত। মেয়েটি নিজেকে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে তাঁর সন্তানের জননী হল কিন্তু দিন কয়েক পরেই ছেলেকে ফেলে রেখে উধাও হল। এর পর এই সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব তাকে একাই নিতে হল। খবরটা কানা ঘুসো কানে এল। তখন আমার শ্বশুর মশাই ব্যাপারটা সত্যি কিনা জানবার জন্যে লণ্ডনে যাবার উদ্যোগ করলেন। আমিও যাবার জন্য কেঁদে পড়লাম কারণ এ ব্যাপারটাকে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে এর মধ্যে দুষ্টলোকের ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। এ হতেই পারে না। উনি ও কাজ করতেই পারেন না।

নিতান্ত অল্পবয়স্ক শিক্ষিত প্রায় নাবালিকা এক মেয়ে রওনা হল বিদেশের উদ্দেশ্যে। স্বামীর অসুখ সম্ভবত এই রকম একটা কারণ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে।

তিন মাসের শিশুকে নিয়ে অসহায় মানুষটি অনু-শোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে প্রায় পাগলের মত। কোন আশ্রমে দিতে পারেন নি কারণ একে বিদেশী, তায় প্রমাণের দায় আছে। অনেক টাকার বিনিময়ে একটি মেয়েকে কিছুক্ষণের জন্য সাহায্য করবার জন্য পেয়েছিলেন। সে এসে দুই বারে ঘণ্টা চারেক থেকে দেখাশুনো করতো।

আমার দিকে মুখ তুলতে পারলেন না। তাঁর সেই বিষণ্ণ লজ্জিত মর্মাহত অবস্থা দেখে অভিমান ভুলে ঐ মেষশিশুর মত সুন্দর বাচ্চাটিকে বুকে তুলে নিলাম। এই হল আমার রজতের আসল পরিচয়। রজতের মা রজতের বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় না জেনেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল;

তাকে তো দোষ দেওয়া যায় না। তারও তো সমাজ আছে, এক বিবাহিত ভারতীয়কে সে কি করে মেনে নেবে তার ওপর যখন এত লুকোচুরি।

—মাসীমা।

—না রমা, আজ শুধু আমারই বলার দিন। তুমি কিছু বলবে হয় তো, সে পরে বোলো। রমা, তুমিও হয় তো ভালবেসেছ রজতকে সব কিছু না জেনেই।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে মূক দুই অসমবয়সী নারীর অভিব্যক্তি মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। রমা ভাবছিল রজত আর তাকে নিয়ে—এ ধরণের ভাবনার আলো কোন অবকাশ আছে কিনা সেটা তার নিজেরই নিশ্চিত করে জানা নেই। অতনুকে ভালবেসে সে বিভোর হতে পারছে কি? আবার তাকে ভাল না বেসেও তো উপায় নেই। রমা অনেক ভেবে স্থির করল মাসীমাকে অতনুর কথা জানাতেই হবে। না হলে উনি হয়তো মনে মনে আরও অনেক কিছু কল্পনা করে একটা মিথ্যের ওপর ইমারৎ গড়বেন।

রজত এদেশের ছেলে নয়। এই কথাটাই রমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। রূপা তার সহোদরা নয়। একথা রূপা জানে না, রজতও না। যেদিন ওরা জানবে কি হবে সেদিন? কষ্ট পেল রমা, খুব কষ্ট পেল। রজত সেনের আসল পরিচয় জেনে সংস্কার তার মনকে আচ্ছন্ন করেনি এইটেই তখন বিশ্বাস করেছিল কিন্তু কি ভাবে মনের অগোচরে এই বস্তুটি পাকে পাকে জড়িয়ে যাচ্ছিল তা আগে বুঝতে পারেনি রমা। আশ্চর্য মানুষের মন। রজত অন্য জাতের এটা ভেবে দুঃখ পাচ্ছে রমার মত মেয়ে কিন্তু রজতের রুচি, রজতের সংস্কার, অভ্যাস? সে তো এদেশের মাটির গন্ধ মেখে মেখে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমি জানি অতনুকে আমি চরম দুঃখ দিতে পারব না। রজতকে দুঃখ দিয়ে নিজে দুঃখ বরণ করবো। আর মাসীমা? মাসীমা হয়তো নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রজত সম্বন্ধে। না ভুল হয়ে গেছে, এ লোভ আমার সংবরণ করা উচিত ছিল। আরও অনেক আগে অতনুর কথা ওদের জানানো উচিত ছিল। নিজের ওপর নিজের বিরক্তি রমাকে অসহায় করে তুললো। রমা ভাবছে মাসীমার কথা—জীবনের শুরুতেই যাঁর রামধনুর সব রং হারিয়ে গেল। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা রইল না। রইল করুণা। এই করুণার ভার বহন করতে করতে আজ তিনি মধ্যবয়স প্রায় অতিক্রম করতে চলেছেন। যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন তারই সঙ্গে সম্পর্ক হল ভিন্নতর। অথচ বাইরের চোখে তাঁরা স্বামী স্ত্রী, সুখী পরিবার। অত্যন্ত সহজ অর্থেই স্বামী স্ত্রী না হলে রূপার অস্তিত্ব সম্ভব হত না। এরপর থেকে রূপার বাবা স্বাচ্ছন্দ্য আর সামাজিক মর্যাদা দিয়ে রূপার মায়ের জীবনের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করে চলেছেন। আর রূপার মা কর্তব্যের বোঝা কাঁধে নিয়ে নিজেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে সেই বোঝার আধার করে তুললেন। এ বাড়িটি ঘিরে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আছে, স্বস্তি আছে কিন্তু নেই প্রাণ প্রাচুর্য। এখানে সব কিছু ঘটে যায় নির্বিবাদে। অসন্তোষ নেই। অশান্তি নেই। অভিযোগ নেই, নেই কোন অনুবিধে। আছে সময়বদ্ধ করা এক গভীর প্রশান্তি। রূপা রজত এই আবহাওয়ার মানুষ তবু ওদের ভাল লেগেছে রমার। ওরা স্বতন্ত্র, ওরা যেন এই ক্ষুধা-বিব্রত বৃহৎ জনারণ্যের অংশীদার নয়। ওরা ভিন্ন দ্বীপবাসী। তাই ওরা বড় সরল বড় সহজ।

রূপার বাবা বাড়িতেই ওদের খেলাধুলোর এত সুযোগ দিয়েছেন আর নিজে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত সঙ্গ, তাই ওদের বাইরের সংগীর বড় একটা প্রয়োজন হয়নি! ওরা নিজেদের মধ্যেই ডুব দিয়ে আছে। আজকের বিপর্যস্ত পৃথিবী ওদের চিনতে পারেনা। ওদের প্রকাণ্ড সুন্দর প্রাসাদটির দিকে তাকিয়ে অন্যেরা ওদেরও কালোবাজারীদের ছকে ফেলে দেয়। অকারণ অভিশাপের বিষাক্ত নিঃশ্বাস ওদের বিরুদ্ধে কত কঠিন মন্তব্য ওদের গণ্ডির বাইরের বাতাসকে উত্তপ্ত করে তোলে, ওরা কিন্তু সে খবর পায় না।

রূপার বাইরের জগৎ বলতে কলেজটুকু। সেখানেও নিকট বন্ধু বলতে রমা। রজত খেলতে ভালবাসে আর

ভালবাসে গান। যদিও দুটো বিপরীত টানাপোড়েনে বোনা। যেদিন ও জানতে পারবে সেদিন কেমন ভাবে গ্রহণ করবে নিজেকে? এই প্রশ্নটা বারে বারে বিব্রত করে রমাকে।

সুনীলের নজরে পড়েছে রমার গতিবিধির পরিবর্তন টুকু। রমার মনের মধ্যে যে কতকগুলো চিন্তার জট জড়াতে সুরু করেছে তাও সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। সুনীলের মনের লেন্সটাতে সব ছায়া সব রেখা অতি স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়ে। তাই তার দুঃখও যত, আনন্দও তত। কিন্তু সুনীল কেন প্রতিদিন এতটা করে সময় বার করে রমাদের বাড়ির জন্য? রমার বাবার সঙ্গে গল্প করে সে তো কিছুই পায়না তবু অনেক খানি সময় ব্যয় করে তাঁর কাছেই। কি জানি হয়তো কিছু পায়। মানুষকে বিশ্লেষণ করে বিচার করাই অভ্যাস সুনীলের। সে জানে স্কুলে ঘরে লাশকাটা টেবিলের মানুষ আর জ্যান্ত মানুষ এক নয়। জমাট বাঁধা হিম শীতল অস্থি, মজ্জা, মাংস চিরে চিরে যা জানা যায়, উষ্ণ রক্তের কণিকায় আঘাত দিয়ে তা জানা যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয় সুনীলকেই। সুনীল আসলে নিজের মনকেই নিজে চিনে নেবার চেষ্টা করত নানা দিক থেকে, নানা ভঙ্গীর মাধ্যমে। আর সে চেনা অন্যকে বিশ্লেষণ করে করে।

রমার প্রতি তার একটা ভাললাগা ক্রমে ক্রমে আকর্ষণের রূপ নিচ্ছিল। রমাকে সে বাড়িতে বড় একটা পেত না ইদানিং তাই এই বোধটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল। আগে যখনি গেছে রমাকে পেয়েছে অনেক কাছে পড়ানোর সুযোগে। ভাল লাগত এই সহজ সরল ফুলের মত পবিত্র মেয়েটির সান্নিধ্য। মাঝে মাঝে ওর খুব ইচ্ছে করত রমাকে আদর করতে কিন্তু ওর সম্ভ্রম বোধ সেটা হতে দিত না। যে ভাবে আদর করতে ইচ্ছে করত সে ভাবে আদর করার বয়স রমার আর ছিল না। তাছাড়া ওর হয়তো একটা নিরুদ্ধ বাসনা ছিল রমা বড় হয়ে উঠুক, ওর উপযুক্ত হোক; আদর করে ওর সেই বড় হয়ে উঠার মর্যাদাটুকুকে ছোট করে দিতে রাজী ছিল না। কিন্তু এই দীর্ঘ ধৈর্যের অবকাশে রমার মায়ের সঙ্গে সুনীলের সম্পর্কটা একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বের রূপ নিল। রমার মায়ের মনে এর প্রতিফলন খুব গভীর ভাবেই দাগ কাটল। স্বামীর কাছে তিনি মর্যাদা পান নি, সম্মান পান নি, সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যটুকুও না। এক কথায় স্বামী স্বামী হতে পেরেন নি। তিনি নিজেও যদি স্বামীর স্বরূপ সম্বন্ধে এত না ভাবতেন তাহলে বাংলা দেশের আর পাঁচটা স্ত্রীর মত দিন কেটে যেত কিন্তু মুস্কিল হল এই খানেই। রমণীবাবু যে হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন সে হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না কমলা। বিরোধ এই খানেই। রমণীবাবুরা জেনে এসেছেন স্ত্রী সব আগে মেয়ে মানুষ তারপর সেবিকা। মেয়েমানুষের স্বাতন্ত্র্য, কোন বিবেচনা শক্তি বা যুক্তি থাকতে পারে না। তাদের বিবেচনার গণ্ডি সংসারের কতগুলো বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যেই। তাছাড়া আর যে কোন ব্যাপারেই স্বামীর নির্দেশই একমাত্র অবলম্বন। সংসারের সেবা করাই তাদের ধর্ম সুতরাং সন্তানদের সামনে বা কাজের লোকদের সামনে কিম্বা অপরিচিতদের সামনে স্ত্রীর কোন স্বাতন্ত্র্য বোধ বা মর্যাদা বোধ যে থাকতে পারে এটা তাঁদের বিশ্বাসের বাইরে। স্ত্রীকে তাঁরা স্নেহ করেন এবং ব্যবহার করেন। স্ত্রীকেও তাইতেই সুখী থাকতে হয়। এইটেই তাঁরা শিখে এসেছেন এ যাবৎ। কমলা এলেন এ সংসারে অন্যরকম বিশ্বাস ও অভ্যাস নিয়ে। তিনি জানতেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সব আগে বন্ধুত্বের ও অনুরাগের সম্পর্ক। সম্পর্কের বোনেদ কর্তব্য দিয়ে নয়, ভালবাসা আর দায়িত্ব বোধ দিয়ে গড়া। সেই ভালবাসাই তৈরী করে কর্তব্য, সেবা আর মমতা। এসব কথা বলাবাহুল্য করে দেন রমণীবাবু। যেদিন থেকে তিনি কমলার জীবনে জেলার সাহেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সেদিন থেকে স্বামী স্ত্রীর মাঝখানে লোহার বেড়া তৈরি হয়ে গেল। রমণীবাবুর ক্ষোভ জমে উঠলো পর্বত প্রমাণ আর কমলার অভিযোগ পুঞ্জীভূত হল। ফলে বিক্ষোভ আর অশান্তির মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠলো রমা দু' পক্ষের ভালমন্দের বিচার করতে করতে।

এই আবহাওয়ার মধ্যে সুনীল যেন মস্ত সহায়। মায়ের একাকীত্ব বাবার অভিমান একমাত্র সুনীলকাকাই যেন সামলে নিতে পারে। তাই বাড়িতে কোন বিপর্যয় দেখা দিলেই সে ছুটে যেত সুনীলের কাছে। এইভাবে এ বাড়ির সমস্ত ভালমন্দের সঙ্গে সুনীল আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতেন কমলা। কমলা কখনও কারো উপর জোর করে নিজের ইচ্ছে চাপাতেন না। হয় তো সেইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। স্বামীকেও যেমন জোর করে কখনও নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু জানান নি, মেয়েকেও তেমনি জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে চালান নি। তিনি ভালমন্দের দিক দেখিয়ে দিতেন কিন্তু জোর করতেন না কোনদিনও কোন ব্যাপারে। মেয়ে বড় হচ্ছে, তার বিচার বুদ্ধি বেড়ে উঠুক, সে ভাববার সুযোগ পাক, বিচার করার যোগ্যতা তৈরি হোক। তাই যখনি কিছু বারণ করার দরকার হয়েছে তার সঙ্গে মুখোমুখী বসে আলোচনা করেছেন। এমনি ভাবেই তার বড় হয়ে ওঠাকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। সুনীলের কিন্তু এ ব্যাপারে ভিন্ন মত। শাসনের ব্যাপারে সে কঠোর একনায়কত্বে বিশ্বাসী। কমলাকে সে ভাবত দুর্বল। মায়ের দুর্বলতা। রমার কোন কাজে ত্রুটি দেখলে সে বলতো "তুমি ছেলে মানুষ, তোমার বোঝার বয়স হয়নি। আমাদের কথা তোমাকে শুনতেই হবে"। সুনীলের সেই মূঢ় শাসনের প্রতিবাদে রমা অনেক সময় রেগে যেত; তখন সে আশ্রয় নিত তার বাবার কাছে যেখানে ছিল শুধুই অকাতরে প্রশ্রয়। সুনীল বৌদিকে যতখানি শ্রদ্ধা করত তত-খানিই বিক্ষোভ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তার মনে হত বৌদির প্রশ্রয়তেই রমা এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এতটা উদাসীন সংসারের প্রতি। সুনীলের মনের অত্যন্ত গভীরে রমার প্রতি যে আকর্ষণ জমেছিল রমা তা বুঝত না। রমার দিক থেকে সুনীলের প্রতি ভয়, ভালবাসা শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু ভাললাগার চমক ছিল না। তাই সুনীলের চাওয়াটুকুকে সে বুঝতে পারত না। তার বুঝতে না পারার অক্ষমতার জন্য সে দায়ী করতো কমলাকে। এই সূক্ষ্ম অনুভবটুকুর পথ ধরে কমলা বৌদির সঙ্গে সুনীলের সম্পর্কে একটা মস্ত ফাটল তৈরি হয়ে উঠলো, যার খবর সুনীলও জানত না কমলাও জানতেন না। অনেক পরে একদিন খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল এই ফাটলটা কিন্তু সেদিন আর উপায় ছিলনা এই ফাঁকটাকে আবার ভরাট করে নেবার।

অতনু সেদিন কোথাও বেরোয় নি। ওর কি রকম মনে হচ্ছিল যে রমা আসবে। যদিও রমা ও সময় বড় একটা আসে না। এ বাড়িতে রমা আসতে চায় না। এই প্রকাণ্ড বাড়ি সর্বদাই যেন শূন্যতায় উদাস হয়ে আছে। অতনুর মাকে কখনও সখনও দেখতে পায়। একা একা অতনুর ঘরে বসে থাকতেও কেমন সঙ্কোচ লাগে। মাসীমা যদি কিছু মনে করেন? এই মাসীমাকেও ঠিক বুঝতে পারে না। রূপার মাকে বুঝতে পারে, তিনি যেন অনেক সহজ কিন্তু অতনুর মায়ের চারিদিকে কি যে রহস্যের বাঁধা। ওঁকে দেখলে ওর অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যায়। ও তখন খুব ছোট, পুরী গিয়েছিল। একদিন ভোরবেলায় খুব কুয়াশা হয়েছিল। বাবার হাত ধরে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিল। আকাশের একটা দিকে আবছা লাল আলোর আভায় ভরে গিয়েছিল কিন্তু হাল্কা হাল্কা মেঘ এসে মাঝে মাঝে সেই আলোটাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছিল। অতনুর মাও যেন ঠিক সেই আবছা আলোর মত। বোঝা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাঁর স্পর্শ পাওয়াও যায় না। অথচ কি যেন এক আকর্ষণ। অতনুদের ঐ প্রকাণ্ড বাড়িটা এক রহস্য। দম বন্ধ হয়ে আসে রমার। কিন্তু একথা সে মুখ ফুটে বলতে পারে না অতনুকে। হঠাৎ একদিন মা এলেন অতনুর ঘরে। মায়ের মুখে যেন অন্য কোন আলো। অতনু মাকে অনুভব করতে পারে না। মা বললেন,

—খোকা, তোর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

অতনু মুখ তুলে চাইল। ইজি চেয়ারে যেমনটাকে এলিয়ে দিয়ে বসেছিল। উঠে বসল, মা বসলেন খাটে।

—হ্যাঁরে, তোর নিজের কথা কিছু জানতে ইচ্ছে করে না?

—নিজের কথা?

—হ্যাঁ নিজের কথা, মানে তুই কে? কি তোর পরিচয়? তোর বা—

—এসব প্রশ্ন তো তুমি আমাকে কোনদিনও ভাবতে শেখাও নি মা।

—এ সব কি শেখাতে হয় রে?

—কি হবে জেনে? বেশ তো চলছে।

অতনু হাসে। সে হাসিতে শুধুই শূন্যতা।

—না, চলছে না, আজ চললেও যখন বয়স হ'বে তখন এ সব প্রশ্নই মনকে উত্তাক্ত করবে।

– বেশ, তবে তুমি বল।

—তোর বাবার সম্বন্ধেও তো কিছু জানতে চাস না।

অতনু অসহায়ের মত চায় মায়ের দিকে।

—বাবার নাম জানি। তাঁর ফটো চিনি।

—আর কিছু?

—না।

—তোর ঠাকুরদা ছিলেন খুব বড় জমিদার, এ বাড়ি তাঁরই তৈরি।

—এটা যে জমিদারের বাড়ি তা মনে হয়। বন্ধুরাও বলে। ঠাট্টা করে জমিদার নন্দন।

—তোর বাবা ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান। তোর ঠাকুমা অনেক আগেই মারা যান। আমি তাঁকে দেখিনি। তোর ঠাকুরদাকে অবশ্য দেখেছি তবে দূর থেকে।

অতনু তাকায় মায়ের দিকে।

—তোর বাবার জমিদারী রক্তের উত্তাপের সঙ্গে আর একটা উত্তাপও ছিল তার নাম স্বদেশীয়ানা। যাকে বলা যায় সন্ত্রাসবাদী বা এ্যানারকিষ্ট। আমার বাবার অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। আমরা থাকতাম সহর তলীতে। একদিন পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেন তোর বাবা অজানা অচেনা। ক্রমে ক্রমে আমার বিশ্বাস ও মতের সঙ্গে মিল হল তাঁর। সেই সূত্রে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। তোর বাবাকে আমাদের বাড়িতেই লুকিয়ে রাখা হল। তাঁর ঘরে আমিও দীক্ষা নিলাম। আসলে তখন বয়স ছিল সেই রকম যখন আবেগের জোয়ারেই ঢেউ ওঠে বেশি।

—তারপর!

—তোর ঠাকুরদা এ বিয়েতে মত দিলেন না কারণ তোর ঠাকুরদারা ছিলেন নৈকষ্য কুলীন আর আমরা ছিলাম ভঙ্গ। তখনকার দিনে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা এ সব মানতেন বেশ কঠোর ভাবেই। কিন্তু বিয়ে আমাদের হল গোপনে। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। আমি রইলাম বাপের বাড়ি, সিঁদুর রইল চুলের ভেতর গোপনে। এভাবে ছমাস কেটে গেল। তোর বাবা ধরা পড়লেন আমাদের বাড়ি থেকেই। পরে শুনেছি আন্দামানে তাঁকে যাবৎ জীবন কারাদণ্ডে পাঠান হয়েছে। বাবা আমাকে নিয়ে এলেন তোর ঠাকুরদার কাছে কিন্তু তিনি আমাকে স্বীকার করলেন না। বাবা মা আমাকে নিয়ে তখন চলে গেলেন বিহারের এক অখ্যাত পল্লীতে। তার সাত মাস পরেই তুই এলি আমার কোলে। দু বছরের তোকে নিয়ে ফিরে এলাম কোলকাতায় বাপের বাড়িতে। নানা জনের নানা গল্পে উত্তাক্ত আমি ক্রমে ক্রমে যেন নিজেকে বন্দী করে ফেললাম নিজের মধ্যে। তখন আমার একমাত্র অবলম্বন তুই। হঠাৎ এল একটা উইলের খসড়া তোর ঠাকুরদা সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন তোকে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারীকে। তোর নামকরণ করেছেন। তাঁর ডায়েরিতে জানা গেল আমাদের সব খবরই তিনি রাখতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিশাল দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। আমার মন বিদ্রোহ করেছিল। এ বংশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার নেই। এখানে আমাকে তো আবাহন করে নেওয়া হয় নি। এখানকার সুখ দুঃখের ভাগ তো আমার পাওয়া হল না। তবে এখানকার সম্পত্তির দায়িত্ব আমি কেন নেব? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোর বাবার কথা ভেবে সব দায়িত্ব আমি মাথায় তুলে

নিলাম। কিন্তু খোকা, তোর জিনিস তোর জন্যই রক্ষা করে এসেছি এতদিন। এর পাই পয়সাও আমি নেইনি, আমার ভরণ পোষণের জন্য আমার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার বাবা। তাই থেকেই আমার চলে। কিন্তু তুই যে বড় লোকের নাতি, তোকে তো সেই ভাবেই মানুষ করতে হবে। অতি আগ্রহী হিতৈষীদের নানান প্রশ্নের আড়ালে তোকে মানুষ করে তুলতে হয়েছে। তোর টাকা আজ নানা ব্যবসায় খাটছে। জমিদারী উঠে গেল। তাই তোর বিষয় আশয় অন্যভাবে রক্ষা করে আসছি। মুকুন্দবাবু সব জানেন। তিনিই তোর একমাত্র হিতৈষী। ভদ্র লোক আমাকে তাঁর নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন। বস্তির টাকাটা আমার নিজের আর একটা ছোটখাট সাবানের কারখানা সেটাও আমার বাবার দেওয়া। তোর সম্পত্তি প্রচুর। পড়াশুনো তো অনেক হল। যদি বাইরে যেতে চাস ঘুরে আয়। ব্যবস্থা করি। আমি আর কদিন? হঠাৎ যদি মরেই যাই, তার আগে এসব তোকে বুঝে নিতে হবে। তোর দায়িত্ব তুই নে, এবার আমাকে ছুটি দে। পাড়ার লোকের কাছে একদিন আমরা অত্যন্ত হীন সমালোচনার পাত্র ছিলাম, সে সব প্রশ্ন আজ থেমে গেছে; শুধু আমাদের ঘিরে কিছু রহস্য এদের মনে বাসা বেঁধে আছে। তার জন্য আর ভয় করি না। যদি কোনদিন তিনি ফিরে আসেন তাঁকে চিনে নিতে চেষ্টা করিস। আমি বড় ক্লান্ত রে। মায়ের শেষ কথাটায় চমকে ওঠে অতনু। মা এমনভাবে তো কখনো বলেন না। ওর ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, মা, মাগো, আমি তোমায় মরতে দেব না কিন্তু বলতে পারে না। স্থাণুর মত বসে থাকে জানালার দিকে চেয়ে। হঠাৎ হুঁস হতে দেখে মা কখন উঠে গেছেন ঘর থেকে। এতদিনে স্পষ্ট হয় ওর কাছে কেন ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কোন আত্মীয় স্বজনের। কোন দিনও কোন নিকট আত্মীয়ের বাড়ি ওরা যায় নি বা কেউ কোনদিন আসেনি ওদের বাড়ি। ওদের বাড়িতে বিজয়াদশমীতে করবীর কিছুই ছিল না। মা ওকে সমস্ত প্রশ্ন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ওর মনে কোনই অবৈধতা নেই অথচ কি ভয়ানক কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ও পৃথিবীতে এসেছে। কেমন যেন কুঁকড়ে গেল ওর মনের ভেতরটা। এই মুহূর্তে মনে হল রমা যেন আর কোনদিনও না আসে। রমাকেও এখন দিনের আলোয় সত্যি দেখতে চায় না। কোন এক বিষণ্ণ অবসরে আলো আঁধারি ছায়া ছায়া নির্জনতায় ও বলবে রমাকে সব কথা। তারপর ছেড়ে দেবে নিজের ইচ্ছেকে রমার ইচ্ছের হাতে।

রমার কাছে রজতের সব কথা শুনেছে অতনু, ওই মুহূর্তে ওর বড় আপনজন বলে মনে হল তাকে। তবু রজত ওর চেয়ে ভাগ্যবান; সে মাথা তুলে থাকবে কারণ তার নিজের পরিচয়কে সে তুলে ধরতে পারবে জগতের সামনে নির্দ্বিধায় কিন্তু ও কি করবে? যদি কেউ বিশ্বাস না করে ওর জন্মদাতার বৈধ পিতৃত্বকে। না না, ও কোনদিনও আলোর সামনে দাঁড়াতে পারে না। অভিশপ্ত মায়ের এক হতভাগ্য সন্তান হয়ে ওকে লুকিয়ে থাকতে হবে সমাজের অন্ধকার কোণে। সম্পত্তি ও চায় না। অসহ্য অভিমান আর বিতৃষ্ণায় নীল হয়ে উঠলো ওর ক্ষুব্ধ সত্তা। সেই দিন থেকে শুরু হল ওর চাকরী খোঁজা। এ সম্পত্তি ও দান করে দেবে কোন ভাল কাজে। যেখানে ওর মাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি সেখানে ও থাকতে পারে না। চাকরী পেলে রমাকে আর মাকে নিয়ে চলে যাবে অনেক দূরে। যেখানে এই সব প্রশ্ন নেই।

রূপার মা কেন অনেকটা হালকা হলেন রমার সঙ্গে কথা বলে। মনে মনে একটা আশাও তৈরি হল। রমা তো সব জেনেছে। জেনেও তার অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হয় নি। এই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বোঝার যে যন্ত্রণা সেটা সইবার ক্ষমতা তাঁর নেই। রজত যদি কোনদিনও জানতে পারে সব কথা সেদিন রমা যদি ওর পাশে থাকে তাহলে এতবড় আঘাতটাকে সে সইতে পারবে। এই সব ভেবে রমাকে তিনি আরও বেশি করে আঁকড়ে

ধরতে চান। আর এটাও বুঝেছেন যে রজত রমাকে পছন্দ করে। রমা যদি আসতে দেরি করে রূপাকে রজত জিজ্ঞাসা করে আর রমা তাই নিয়ে ওর দাদাকে স্পষ্টা স্পষ্টি ঠাট্টা করে সেটা উনি আড়াল থেকে জেনে ফেলেছেন। আর বেশ উপভোগও করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় রজতের গাড়ি রূপাদের কলেজের পাশে। রূপা কি আজ একলা আসবে, না রমাকে নিয়ে আসবে এমনি এক আশা নিরাশার টানা-পোড়েনে রজতের দিনগুলো গানের সুরের মতই ভেসে চলেছিল। এমনি একটা মুহূর্তে রজতের সঙ্গে দেখা হল রমার। রজত চেয়েছিল নিজেকে রমার কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে আর রমার মনের ছবিটা স্পষ্ট করে দেখতে। ইতিমধ্যে ওরা দুজনেই ভূমিতে পৌঁচেছে। রজত ছেলে এসে দাঁড়াল রমার পাশে। রজত প্রশ্ন করে,

—কোথায় চলেছ ?

—তুমি ?—রমা তার সপ্রশ্ন চোখদুটো তুলে ধরে।

—এমনিই যাচ্ছিলাম।

—গাড়ি কোথায় ?

—নিইনি, হাঁটতে ভাল লাগছে।

—কাজে যাচ্ছ ?

—না তেমন কিছু নয়।

—চল না একটু বেড়িয়ে আসি।

—কোথায় যাবে ?

—চল পরেশ নাথের মন্দিরে যাই।

—বেশ চল।

ও ধারগাটায় ভীড় থাকেই কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন মানুষ হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যেও নিজেকে আর মনের মানুষটিকে একান্ত করে নিজের করে পায়। ঠিক তেমনি মন নিয়ে রজত রমার পাশে এসে বসল নরম ঘাসের ওপর। আরও অনেক জোড়া চোখ যে ওদের দেখছে তা ওরা তখন ভাবতেই চায় নি। রজত সেদিন বলেছিল

—রমা! আজও তোমাকে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না, তুমি কি বুঝতে দেবে না ? আমি যদি আশাকরি আমরা দুজনেই সমস্ত অপরিচয়ের সীমানা ছাড়িয়েছি তাহলে কি অন্যায় হবে ? যদি আমি এরপর বিশ্বাস করতে চাই যে তোমার ঠিকানা আর আমার ঠিকানা একটাই, তাহলে কি তুমি বিরক্ত হবে ?

রমার সমস্ত শরীর মনে এক অনাস্বাদিত অনুভবের জোয়ার। তার বুকের ভেতরের ধমনিগুটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল, কানদুটো আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সারা শরীরে মনে এই যে বঙ্কার এ তো সে আগে কোনদিনও অনুভব করেনি! অতনুকে সে ভালবেসেছে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের নিয়মে। অতনু ছিল তার খেলার সঙ্গী। আর এই যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এর স্বাদ সে এর আগে পায় নি।

কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল

—বাড়ি চল রজত।

রজত কোন উত্তর দাবি করে নি, শুধু উঠে দাঁড়াবার আগে ওর নরম হাতটা দুহাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শের উষ্ণতা নিয়ে ভরা মনে বাড়ি ফিরেছিল সেদিন রমা। বাড়িতে এসে দেখে সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। মা আর সুনীলকাকু ঘরঘরে আবহাওয়ার মধ্যে কথার জাল বুনে চলেছেন। বাবা মাঝে মাঝে আসছেন, মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছেন। সুনীলকাকু জিজ্ঞাসা করলেন,

—কোথায় গিয়েছিলে ?

নির্ভীক উত্তর রমার

—বেরিয়ে ছিলাম।

সুনীলের মুখখানাতে রক্ত ঝলকে উঠলো। এতবড় অপমান এর আগে তাকে কেউ করে নি। হাতের বইখানা ছুঁড়ে ফেলে বললো, চল্লাম বৌদি।

কেউ কিছু বলার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

কমলা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন

—ও ভাবে উত্তর কেউ দেয় ? বেরিয়ে ছিলি সে তো জানা কথাই।

একটু কাঁকের সঙ্গেই রমা বললো

—ওরই বা অত দেরী কেন? বয়েস আমারও যথেষ্ট হয়েছে মা।

কমলা খেয়ে গেলেন। অপমানিত হতে তিনি চান না। তাছাড়া রমার কথাটার মধ্যেও যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। রাগটা সুনীলের ওপরেই গিয়ে পড়ল। সুনীলেরও একটু শিক্ষা হওয়ার দরকার ছিল। কমলা একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন

—অভ্রজ তোকে বার চারেক খুঁজতে এসেছিল। কাল বাড়িতে থাকিস ও আসবে। রমা একবার ভাবল এখনই ছুটে যায় অভ্রজর কাছে, কি হল? কেন ডেকেছে? কিন্তু কেমন একটা আলস্য তাকে পেয়ে বসল। সারাটা দিন মেঘলা বাতাস। মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। রমার মনটা ঘুরে ফিরে সকালের পথে ঘাটে উদাসী হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। ভারি স্নিগ্ধ আর নরম লাগছিল সকাল বেলাটা। রজতকে আজকে দেখাচ্ছিল ভারি সুন্দর। আজকাল বেশির ভাগই সময় রজত ধুতি পাঞ্জাবী পরে। একদিন ধুতি পাঞ্জাবীতে রজতকে প্রশংসা করেছিল রমা। তাই কি এখন প্রায়ই ধুতি পাঞ্জাবী পরছে? রূপার নজরেও পড়েছে ব্যাপারটা। সে এ নিয়ে মৃদু ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। একটা সুর যেন নতুন করে তৈরি হয়ে উঠছে। বিস্তারের পর্ব ছেড়ে অন্তারীতে ঘোরা ফেরা করছে। কিন্তু কি করবে রমা? এ সুর বন্ধ করতেই হবে। এ গান সোমে পৌঁছবে না কোনদিনও। এই মানুষটা যেদিন জানবে যে এদেশের মাটি তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে ভাবতে পারবে না, এ দেশের বাতাস তার অঙ্গে অঙ্গে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করছে তাতে তার অধিকার আংশিক মাত্র, এ দেশের মানুষের সে একান্ত আত্মীয় হতে পারে না, সেদিন কি অপরিসীম ঘৃণায় নিজেকে সরিয়ে নেবে রজত? ক্ষমা করবে কি রজত সেই মানুষটিকে যিনি এ সবের জন্য দায়ী? কিন্তু এ সব কেন যে ভাবছে রমা! নিজের মনকে সে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে; সেখানে কোথাও কি কোন প্রশ্ন উঠেছে রজত সম্বন্ধে? থাক না তার শরীরে বিদেশী রক্ত। কী এসে যায় তাতে? সে তো এই বাংলার জল বাতাসে মানুষ হয়ে উঠেছে; তার মনের তারে সেই সুরই বাজছে যে সুরে রমারা ভাবতে শিখেছে। না, কোন প্রশ্ন নেই কিন্তু যদি কোনদিন রজত জানতে পারে তার বাবার এই হঠকারিতার কথা সে দিন? সে দিন কি সে পারবে এ দেশের মানুষকে নির্বিধায় সহ্য করতে? তার চেয়ে অনেক ভাল রজত জানুক সব। সুস্থ ভাবে জানুক। রমার প্রয়োজন সময়ের। সবার কাছ থেকে—অভ্রজর কাছ থেকে, রজতের কাছ থেকে, সুনীলের কাছ থেকে আর নিজের কাছ থেকেও।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখে মা শুয়ে আছেন চোখ বুঁজে। এ সময় তো মা শুয়ে থাকেন না। ও কাছে যেতেই মা পাশ ফিরে শুলেন।

—মা, শুয়ে আছ যে?

—শরীরটা ভাল লাগছে না।

মায়ের গলার সুরটা ভারী। রমার বুঝতে বাকী রইল না যে শরীরের সঙ্গে মনটাও ভাল নেই। মা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি যে বালিশে জলের ফোঁটাটা তখনও একেবারে শুকিয়ে যায় নি।

—তুমি কখন থেকে শুয়ে আছ মা?

—তা আজ সারাদিনই বলতে গেলে। পেটের ব্যথাটা আবার বেড়েছে।

রমা মায়ের কাছে বসে পড়ে। কপালে হাত রাখে। গা বেশ গরম।

—তুমি সারাদিন একলা আছ মা?

—তা আর কে থাকবে?

—সুনীল কাকু আসেন নি?

—না, সে তো সেদিনের পর থেকে আর আসে না। আর তোর বাবা তো সকালে কোন রকমে দুটি ভাত মুখে ফেলেই বেরিয়ে যান, ফেরেন সেই রাত এগারটায়; কোথায় যে থাকেন কে জানে?

—সুনীলকাকু কি আমার ওপরেই রাগ করে আর আসেন না?

—কি জানি? আসলে নিজেকে নিয়েই নিজে বিব্রত। এই সংসারটার সঙ্গে ও যে কেন এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পারি না। কি যে ও চায়।

—কেন, এতে না বোঝার কি আছে? আসলে উনি আমাদের সকলকেই খুব ভালবাসেন। বিশেষ করে তোমাকে।

রমা অপাঙ্গে একবার মায়ের দিকে তাকাল। রমার মা কোন জবাব দিলেন না। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে থাকলেন। রমা জামাকাপড় ছেড়ে হিটারে চায়ের জল বসাল। মাকে জিজ্ঞাসা করল চা খাবেন কিনা। পাউরুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মায়ের কাছে এসে জানতে চাইল মা সারাদিনে কি খেয়েছেন। হঠাৎ রমার মনে হল মায়ের সম্বন্ধে তার অনেকখানি দায়িত্ব। মায়ের অসুখ প্রায়ই হয় কিন্তু তা নিয়ে ওকে কোনদিনও মাথা ঘামাতে হয় নি কারণ ও ব্যাপারে বাবা আর সুনীলকাকুর দায়।

মায়ের জ্বর দিন দিন বেড়েই চলেছে। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল, কলেজ যাওয়া বন্ধ। এ কয়দিনে ও বেশ বুঝতে পেরেছে. মা কত একা। বাবা এ ব্যাপারে কোন দায়িত্বই নিতে চান না, যা কিছু বলে রমা তিনি তা সযত্নে এড়িয়ে যান। সব কিছু রমাকে একাই করতে হচ্ছে। বাবা বাজার থেকে বেশির ভাগ দিনই তৈরী খাবার নিয়ে আসেন আর মাকে মাকে মাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ কেমন বুঝছো'? রমাকে বলেন, রান্নার দরকার নেই, দোকান থেকে খাবার নিয়ে আসব। রাতের খাবারটুকু আর দিনের বাজার করে দিলেই বাবার যেন সব কর্তব্য শেষ। দিনের রান্না, রোগীর পথ্য, ডাক্তারের কাছে যাওয়া, রোগীর সেবা এ সবেতে যেন ওঁর করণীয় কিছু নেই, সব তাকেই করতে হবে। এর আগে বাড়িতে কারো অসুখ হলে সুনীলকাকুই সব দায়িত্ব সামলেছেন। মাকে যতবার জিজ্ঞেস করেছে সুনীল কাকুকে খবর দেবে কিনা মা ততবারই বলেছেন—

—না, না, ওকে মুক্তি দে। ও যখন মন ঠিক করতে পেরেছে তখন ওকে আর বিরক্ত করিস না। বেচারা বড় জড়িয়ে পড়েছিল আমাদের সংসারে।

রমা বুঝতে পারে না এটা মায়ের অভিমান না উপলব্ধি।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। মায়ের অবস্থা ভালর দিকে তো যাচ্ছেই না উপরন্তু আরও যেন নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মাকে না জানিয়েই রমা একদিন গেল সদয়ে সুনীলের বাড়ি। এর আগেও কয়েকবার গিয়েছে রমা কিন্তু ভাল লাগে নি। সমস্ত বাড়িটা যেন মৃত। ফরবখানার স্তব্ধতা আর শূন্যতার কথা মনে পড়ে যায়। পুরণো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ি। কতদিন পলস্তরা পড়ে নি। চুন বালি খসে খসে লাল ইঁটের গাঁথনি বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় থাম দেওয়া চক্ মেলান দালান। সিঁড়ি দিয়ে উঠে অনেকখানি বারান্দা পেরিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে সুনীলের ঘর, প্রকাণ্ড একটা হলঘরের মত; পুরণো আমলের দেরাজ, প্রকাণ্ড কালমারি পালঙ্ক, সব কিছুর মধ্যেই সাবেকী আমলের বনেদী-আনা। কেমন যেন ভয় ভয় করে। সব কিছু যেন বড় গম্ভীর। অসম্ভব প্রকাণ্ড একটা সেক্রেটারিয়েট টেবলের সামনে বসে সুনীলকাকু। মাথাটা চেয়ারের পিঠে হেলানো। এমন সময় এ ভাবে অবসন্ন হয়ে বসে থাকার কথা তো নয়। রমার ঘরে ঢোকা সুনীল জানতেই পারল না। খুব আস্তে সে ডাকল,

—সুনীলকাকু।

চমকে তাকাল সুনীল। বিস্ময় আর আনন্দে সে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—রমা? কি ব্যাপার? তুই হঠাৎ?

—মার খুব অসুখ।

—বৌদির অসুখ? কি হয়েছে?

—ডাক্তারে ধরতে পারছে না।

—কতদিন?

—তা একমাসের ওপর। —হ্যাঁ, একমাসের ওপর হয়ে গেল আপনি আমাদের বাড়ি যান নি।

হেসে ফেলে সুনীল।

—তোমরাও তো একমাসের ওপর হয়ে গেল আমার খবর নাও নি? অসুখটা তো আমারও হতে পারতো।

লজ্জা পেল রমা।

—কে আছে বৌদির কাছে?

—বাবাকে বলে এসেছি একটু বসতে কিন্তু বাবাকে তো জানেন?

উত্তরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সুনীল তার মাকে বলে গেল যে সে বেরুচ্ছে। আসতে দেরি হতে পারে। যেন না ভাবেন। রমা জানে সুনীলের মা ছাড়া আর কেউ নেই। তার মাকে সে কোনদিনও দেখেনি। অতবড় বাড়ির মধ্যে কোথায় যে তার মা থাকেন তার হদিস পাওয়া যায় না। সুনীল একটা ট্যাক্সি ডেকে নিল। ট্যাক্সিতে চুপচাপ বসেই ছিল। কি রকম অস্বস্তি হচ্ছিল রমার। আর কেবলি ভাবছিল কি ভীষণ একা এই মানুষটি। এই মুহূর্তে সুনীলের জন্যে তার মনটা অসম্ভব অভিভূত হয়ে পড়ল। নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হল। দু একটা প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর বিশেষ কোন কথা হল না। রমা নামল গাড়ি থেকে। ড্রাইভারের টাকা মিটিয়ে দিয়ে সুনীল রমার মায়ের ঘরে গেল। রমাকে ডেকে বলে গেল

—এক কাপ চা কর।

কমলাকে না জানিয়েই রমা সুনীলের বাড়ি গিয়েছিল। সুনীল যখন এসে দাঁড়িয়েছে কমলা তখন চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। সুনীল খুব আস্তেই ডেকেছে

—বৌদি! অসুখ বাধিয়ে বসেছেন?

কমলা অসম্ভব চমকে উঠেছেন।

অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারেন নি।

—একটা খবর দেন নি কেন?

কমলা কিছু বলেন না। ম্লান একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো ক্লান্ত মুখে। রমা নিশ্চিন্ত হল আর নিশ্চিন্ত হলেন রমার বাবা। তিনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রমার মনে হল এতদিন মা আর সুনীলকাকুর সম্পর্কের স্বরূপটাকে সে বুঝতে পারেনি। তাই পদে পদে হোঁচট খেয়েছে। আজ মনটা বড় নির্ভার হল। বড় ভাল লাগল। এদের দুজনের মাঝখানের সম্প্রতি বন্ধুত্বের এই সুদৃঢ় সেতুটি বিশ্লেষণ করতে গেলে হয়তো আরও অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু কি দরকার এই দুটি মানুষকে নিয়ে মন গড়া বিচারের? বৌদির সঙ্গে তাঁর আইনগত কি সমাজ-গত কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু আত্মিক এই সম্পর্কের দাম কি কম? রমা এর বেশি আর কিছু ভাবতে চায় না। ভাবতে গিয়ে ভুল সে করেছিল।

কমলা সুস্থ হয়ে উঠতে আর প্রায় একমাস সময় কেটে গেল। অতনু এসেছে মাঝে মাঝে কিন্তু একান্তে রমাকে কিছু বলার সুযোগ সে পায়নি। রমাও কোনদিনও তাকে জিজ্ঞাসা করেনি কেন সে রমার খোঁজ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই দু মাসের মধ্যে একদিনও রূপা কি রজত তো এল না! দু মাস বাদে কলেজে গেল রমা। সেখানে শুনলো রূপা অনেকদিন ধরেই নাকি কলেজে আসছে না। শেষের দুটো পিরিয়ড অফ্ ছিল রমার। সোজা চলে গেল রূপাদের বাড়ি।

দারোয়ান নিঃশব্দে গেট খুলে দিল। তার কাছেই জানল দিদিমণি উপরে আছেন। মানদা এসে জানাল ওপরে যেতে মায়ের ঘরে। সবাই যেন ফিস ফিস্ করে কথা বলছে। যেন কি এক রহস্য চারদিকে। রজতের ঘরের দরজা বন্ধ। রূপার ঘরে পর্দা ঝুলছে। তিন তলায় মায়ের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে এল। পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে নক্ করবে কিনা ভাবল। মানদা আগেই গিয়ে খবর দিয়েছে। ভেতর থেকে রূপা ডাকল

—আয় রমা।

রূপার মা শুয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখেই চমকে উঠলো রমা। অলমলে দিঁথিটা আজ যেন উষর রুক্ষ মাঠের বুকে চেরা সরল রেখার মত উদাস। অতি ধীরে বল্লেন

—এস রমা।

রমা কোন কথা বলতে পারল না, দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। কতক্ষণ যে কেটে গেল এভাবে!

—তুই কার কাছে শুনলি ?

—কারো কাছে না। কিছু জানতামও না। এখানে এসে দেখছি।

—কবে হল এমন ?

—আজ একুশ দিন। বাগানে বসে চা খাচ্ছিলেন হঠাৎ স্ট্রোক হল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।

—রমা খুব অপরাধীর মত বললো তুমাস হল মায়ের অসুখ তাই কারো কোন খবর নিতে পারি নি। আজ কলেজে গিয়ে শুনলাম তুইও অনেকদিন যাস নি। লাষ্ট পিরিয়ড অফ্ ছিল তাই খবর নিতে এলাম কিন্তু এসে যে এ রকম দেখবো ভাবতেই পারি নি। মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—দাদা এল।

উঠে গেল রূপা।

খালি গা, একটা সাদা উড়ানী গায়ে অবিন্যস্ত, সোনালী কয়লা পা দুখানি আবরণহীন। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল রমা। রমাকে দেখে কোন কথা বলতে পারে নি রজত। অনেক পরে বললো,

—কবে শুনলেন ?

রমা বুঝতে পারলো, প্রচ্ছন্ন এক অভিযোগ ঐ কথা দুটির মধ্যে। রমা অত্যন্ত সংকোচের সংগে বললো

—এই তো এখানে এসে জানতে পারলাম। এদের এই শোকের মধ্যে নিজেকে কেমন যেন বেমানান মনে হচ্ছিল রমার। সে আর সহ্য করতে পারছিল না এই অবস্থাটা। অথচ উঠে আসতেও পারছে না। রূপাই বললে—

—মাসীমা এখন কেমন আছেন ?

—এখনও উঠতে পারছেন না তবে ভয় কেটে গেছে। আচ্ছা, আমি আজ চলি রে, শিগ্‌গিরই আবার আসব। মাসীমা, যাই। রজত সঙ্গে সঙ্গে বললো

—বাড়ি যাচ্ছেন তো ?

—হ্যাঁ।

—চলুন, আমি ও দিকেই যাচ্ছি। আপনাকে পৌঁছে দেব।

রূপার মা বল্লেন

—সেই ভাল, যা তাড়াতাড়ি এখন।

রজত ভেতরেই বসেছিল। অনেকক্ষণ ওরা কেউই কোন কথা বলে নি।

রজতই সুরু করল

—কি অবস্থা দেখ। হঠাৎ এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে ভাবতেই পারি নি। মানুষ জন্মটাকে ভাবতে পারে। দিন ক্ষণ নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুটাকে ? ভাবতেই পারে না। অথচ দেখ জন্ম অনিশ্চিত কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। এতবড় সত্যটাকে আমরা বেমালুম ভুলে বসে থাকি। এই শোকটাকে ভুলবার জন্যেই বোধহয় আমাদের শাস্ত্রকারেরা খুঁটি নাটি এত বিধান দিয়েছেন। তাই না ? রমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। কি জানি যদি হিন্দু শাস্ত্র সত্য হয় তাহলে রূপার পূর্বপুরুষরা রজতের হাতের তর্পণ গ্রহণ করবেন কি ? রজত আপন মনে বলে চলেছে,

—জান রমা, এই যে কদিন এত নিয়ম আচারের মধ্যে দিয়ে চলেছি তাতে নিজেকে খুব পবিত্র মনে হচ্ছে। এ বিষয় চিন্তা করবার অনেক কিছু আছে। আগে এমন করে ভাবিনি তো, তাই মনে হত এ সব বুঝি একেবারেই বাজে কিন্তু এখন দেখছি এ কত বড় সত্যি। দুনিয়ার কিছুই জানি না। এ দিকে বাবা কতবড় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। আচ্ছা রমা, বাবা এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারতেন, তাই না ? সব চেয়ে মজা কি জান ? আমার বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে গেছেন। অবশ্য বাবা চাইতেন না যে আমি কখনও বাইরে যাই। শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন কিন্তু লণ্ডনে নয়। কোন মতেই নয়। আমেরিকায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ভাবছি শেষ পর্যন্ত হয়তো কোথাও যাওয়া হবে না।

—কেন ?

—মাকে আর রূপাকে কার কাছে রেখে যাব বল ?

—তা অবশ্য।

—রূপাটার যদি বিয়ে হয়ে যেত তাহলেও বা কথা ছিল। ওর স্বামীই ওদের দেখাশুনো করতো অন্তত কিছুদিন আমি না ফেরা পর্যন্ত। কিন্তু লণ্ডনে আমাকে একবার যেতেই হবে।

—না না, নাই বা গেলে লণ্ডনে।

—কেন বলতো? লণ্ডনের ওপর তোমাদের অত রাগ কেন? কিন্তু লণ্ডনই আমাকে টানে সবচেয়ে বেশি।

—তাই বুঝি?

—জান, ইংলিশ ফিল্ম দেখতে দেখতে আমার মনে হয় আমি যেন ওখানেই চলে গেছি। আর লণ্ডনেই যত আপত্তি। রমার বাড়ি এসে গেছে। রমা নেমে আসে। রজত বললে,

—মাসীমাকে বোলো আজ আর নামব না। কাল বিকেলের দিকে হয়তো আসতে পারি। তখন যেন চিনতে ভুল কোরো না। এ গুলোকে আর দেখতে পাবে না বলে মাথার চুলে হাত বুলোয়। গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

অতনু একদিন এসে রমার হাতে নিজের ডায়েরীটা দিয়ে গেল। বললে—

—আমার অনুরোধ এটা পড়বে।

—পরের ডায়েরী?

রমা হেসে বলে।

—'পর'? হুঁ, মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হবে না। পর নিজেই তো অনুমতি দিচ্ছে। পর কথাটার ওপর একটু জোর দিল অতনু। খোঁচাটা রমার মনে লজ্জার চেয়ে রাগেরই সৃষ্টি করল বেশি। অতনুর এই জোরটাকে সে ভয় পাচ্ছে। অতনু যেন তাকে জোর করে দখল করে নিচ্ছে। আনন্দের বদলে একটা চাপা অস্বস্তি যেন তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনের ওপর চেপে বসেছে। অতনুকে তো ও ভালবাসে তবে কেন এমন হয় মনের মধ্যে? অতনু তার জীবনে অনিবার্য তবে কেন অতনুই সবখানি হয়ে উঠছে না?

কমলাকে নিয়ে সুনীল গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ফিরতে দেরি হবে। কোনও কাজও ছিল না রমার। অতনুর ডায়রীটা নিয়ে পড়তে শুরু করল। ক্রমশ: ডায়রীটা যেন তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। মায়ের কাছ থেকে শোনা সব কথাই অতনু তার ডায়রীতে লিখেছে। সে চেষ্টা করছে চাকরীর জন্য। যে সংসার তার মাকে সম্মান দিতে চায় নি সে সংসারের এক কপর্দকও সে ভোগ করবে না, মায়ের নামে সে হাসপাতাল করে দেবে। সে চাকরী পেলেই রমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। রমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো, রজতের শুকনো মুখটা মনে পড়ল। মনের মধ্যে ভিড় করে এল মায়ের মুখ, বাবার মুখ, সুনীলকাকুর মুখ, আর রজতের মায়ের কথাগুলো। ওর কেমন ভয় করতে লাগল। অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর পাচ্ছে না। নিজেকে চিনতেও পাচ্ছে না যেন। একি অসহায় দুর্বলতা। অনেক কাঁদল সেদিন রমা। ওর মনে হল ওর জীবনে বোধহয় এই কান্নাই একমাত্র সম্বল। কিন্তু কেন? কেন ও নিজেকে এমনভাবে বাধা হতে দেবে? অনেক পরে মনটা একটু হাল্কা হলে মুখে চোখে জল দিয়ে হাল্কা প্রসাধনে নিজেকে সতেজ করে তুললো। মনে মনে স্থির করল এখন এসব নিয়ে কিছু ভাববে না।।

যথারীতি কলেজ যাচ্ছে রমা। একা একা ভাল লাগে না। রূপা এখনও কলেজ যায় নি। মাঝে মাঝে মনে হয় রূপাদের বাড়ি যাবে কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না। কিসের একটা বাধা ওকে যেন বিব্রত করে। ওদের বাড়ির খবর অনেকদিন পায় নি। দেখতে দেখতে প্রায় একমাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রূপার চিঠি এল। মাত্র দুটি কথা, "বিশেষ দরকার, দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি আয়।"

রমা প্রায় হন্তদন্ত হয়েই হাজির হল। রমার মা ওকে দেখে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন। রূপা ওকে নিয়ে নিজের ঘরে গেল। ঘরে গিয়ে রূপা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মেসোমশাইর মৃত্যুতেও তাকে এমনভাবে কাঁদতে দেখে নি। অনেকক্ষণ কাঁদল রূপা, শেষে বললো

—জানিস দাদা এখানে নেই।

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠলো রমার

—কোথায়?

—লণ্ডন।

—সে কি? কেন?

—সে তার মাকে খুঁজতে গিয়েছে।

রমা তো সবই শুনেছে আগে, তাই বিস্মিত হল না কিন্তু পাষাণ হয়ে গেল। রূপা বললো—

—হঠাৎ সেদিন বাবার কাগজপত্র খুলে দেখবার জন্য ড্রয়ারটা খুলেই বাবার ডায়রীটা পেল। অনেক দিনের ডায়রী। কেউ জানতো না ওখানে বাবার ডায়রী থাকে। সেই ডায়রীর মধ্যেই ছিল সাদার মায়ের ছবি। রূপা আবার কেঁদে ফেললো।

—আমরা, মানে দাদা আর আমি কিছুই জানতাম না রে।

রূপার মা কখন যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রমার পেছনে তা ওরা জানতেই পারে নি। চমক ভাঙল তাঁর কথায়।

—সেদিন আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কি কান্নাই কাঁদল। মুখে শুধু এক কথা, মা, আমাকে অনুমতি দাও একবার তাঁকে খুঁজে দেখি। রূপা বলে উঠলো, বাবা কেন যে ওগুলো সামনেই রেখেছিলেন।

রূপার মা ক্লান্ত স্বরে বললেন

—অতবড় সহরে কোথায় তাকে খুঁজে পাবে, তাছাড়া এত বছর পার হয়ে গেছে চেহারাতেই বা মিল পাবে কি করে?

রূপা বললো

—দাদা তোর নামে একটা চিঠি রেখে গেছে। আবার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো রমার। রূপা বাবার ঘর থেকে চিঠিটা এনে রমাকে দিল। খুলতে পারল না রমা। যন্ত্রচালিতের মত ব্যাগে ভরে রাখল সে চিঠি। রূপা হয়তো চেয়েছিল চিঠিটা দেখতে। ফিরে এল রমা। পথ ঘাট তার কাছে যেন লুপ্ত মনে হল। দুঃখ করার মত মনের জোরটুকু হারিয়ে ফেললো রমা। একটা অসাড় অনুভূতিতে দেহমন বিকল হল। বাড়ি যেতেই পারল না।

With Best Compliments from

Phone : 47-5983
22-6441

Avantika Trading Corporation

12, Rowland Road.
Calcutta-20

সোজা চলে গেল পরেশনাথের মস্তিষ্কে। অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধা নিয়ে চিঠিটা খুললো। মাত্র একটি লাইন লেখা আছে।

"রমা: পার তো অপেক্ষা কোরো, ফিরে আমি আসবই।"

অনেক চেষ্টা করে অতনু শেষ পর্যন্ত একটা ইন্টারভিউর চিঠি পেল। ছুটে গেল রমার কাছে। রমা বাড়ি ছিল না। ইন্টারভিউ বন্ধ হয় নি। আবার গেল রমার বাড়ি, এবারেও দেখা পেল না।

কমলা স্বভাবতই একটু গম্ভীর ছিলেন। এখন যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। এবারে অসুখের পর থেকে তিনিও যেন কেমন সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। সুনীলের অনেকখানি সময় রমাদের বাড়ীতেই কাটে কিন্তু আগের সে উচ্ছলতা নেই। এই পরিবারের তিনটি মানুষ যেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপবাসী। তার মাঝে সুনীল, সেও যেন নিজের জন্য একটি ভিন্ন দ্বীপ গড়ে নিয়েছে। এদের থেকে দূরে সরে গিয়ে সে যে থাকতে পারবে না তার প্রমাণ সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে। অথচ এদের মধ্যে থেকে তার জীবনের সহজ আনন্দটুকু যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। বিশ্লেষণ, অনবরত বিশ্লেষণ। এরই মধ্যে সুনীল যেন পুরোপুরি নিমজ্জিত, এর থেকে তার উদ্ধার নেই। রমার বেশির ভাগ সময়টা কাটে লাইব্রেরীতে। কিন্তু সে কি সত্যিই পড়াশুনা করছে? রমার বাবা খুব ব্যস্ত হয়েছেন ওর বিয়ের জন্যে। ওরা ধরেই নিয়েছেন অতনুর সঙ্গে রমার বিয়ে হবে। অতনু তো পাত্র হিসাবে কাম্য। কিন্তু রমার অভিপ্রায় যেন বোঝা যাচ্ছে না।

রমা রজতের চিঠি নিয়ে সেদিন বাড়ি এসে কারো সঙ্গে কোন কথা বলে নি। রজতের যাওয়াটা ঠিক হল কিনা তাও সে বুঝতে পারছে না কিন্তু রজতকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অতনুকেও না। কিন্তু অপেক্ষা তাকে করতেই হবে। কিসের অপেক্ষা তা জানে না। রমা শুধু অপেক্ষা করেই থাকবে।

অতনু যেদিন এল তাদের বাড়ি চাকরীর খবর নিয়ে সেদিন রমা খুশী হতেই চেয়েছিল। অতনুর আন্তরিকতাকে সে অসম্মান করতে পারে নি, তাই সেদিন অতনু যা বলেছে তাই করেছে।

কত পুরণো কথাগুলো মনের মধ্যে জোয়ারের স্রোতের মত ভেসে আসছে। সব যেন কেমন ওলোট পালট হয়ে গেল। অতনু হয়তো ভাবছে রমা তার শারীরিক পঙ্গুতার জন্যেই চলে গেল। সকলেই হয়তো তাই ভাবে। রমা সেদিন নিজেকে ভুলে অতনুর খুশীতেই খুশী থাকতে চেয়েছিল। অন্তত: সেই কটা দিন সে অতনুকে ভাবতে দিয়েছিল যে অতনুকেই সে চায়। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর আর কি করার থাকতে পারে?

রমা নিতা এসেছে। সেবা করেছে, উৎসাহ দিয়েছে। অতনুকে তার ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করেছে। সাহস দিয়েছে। তারপর ঘড়ির কাঁটার মত দিনগুলো চলতে শুরু করল। রমা চাকরী নিয়ে চলে এল এই বিদেশে। আজ হঠাৎ অনেক দিনের পর লুকনো স্মৃতিগুলো জোয়ারের স্রোতের মত ভেসে এল।

রমা শুয়েছিল ওর খাটের ওপর চিঠির তাড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে। কতদিন পার হয়ে গেছে রমার জীবন থেকে। চুল বাঁধা হয় নি। হাতে চিরুণী ধরাই ছিল। অতনুকে দুলাইনের যে চিঠিটা সে লিখেছে, আজই যেটা ডাকে ফেলেছে একটু আগে, সেই চিঠিটার কথাই ভাবছিল।

চিঠিটা দেওয়া ঠিক হল কিনা তা সে জানে না তবে চিঠিটা যে সত্যি এবং বড় রূঢ় সত্যি তাই বিশ্বাস করে একটা নৈর্ব্যক্তিক মুক্তির স্বাদে তার মন বিষণ্ণ হল। মুক্তির স্বাদে বিষণ্ণতার উপলব্ধি সে এই প্রথম অনুভব করল। আজ রমার রাতের রং ফিকে হয়ে এসেছে, এতে আর সকালেও নতুন সূর্যের রং ধরবে না। যে জীবনটা এক

দিন রঙে রসে উজ্জল ছিল কেন্দ্রগত কোন প্রত্যয়ের শক্তিতে, সে কি কোনদিনও সেই উজ্জলতাকে সংহত করে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিল? আজ জীবনের টুকরো-গুলোকে ছুড়ে ছুড়ে দেখতে পাচ্ছে অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা পরিমণ্ডলে নিজেকে সাজিয়ে সাজিয়ে অপব্যয় করেছে। সেই অপব্যয়ের অবধারিত নিয়মে হয়তো আজ পাচ্ছে তুচ্ছ আর বিস্বাদ জীবনের অন্তিম অভিজ্ঞতা। জীবনটা আজ তাই শুধু জীবন নয়, একটা অনড় বোঝা। রমা তার ডায়রীতে লিখেছিল "যে প্রশ্নগুলো বারে বারে উঁকি দিচ্ছে কোথায় তার উত্তর? উত্তর দেবার বা নেবার আকুল আগ্রহ আমার ছিল কি? জীবনের পর্বে পর্বে প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি খুঁজে দেখবার সৎ চেষ্টা কোনদিনও করতাম, তাহলে আজকের এই শেষ পর্বটাতে পৌঁছে খুশী হয়ে বলতে পারতাম না কি মানুষের জীবন নিটোল, এর শুরু আছে, শেষ আছে, আর শুরু থেকে শেষের প্রস্তুতিতে অভিজ্ঞতার আনন্দ আছে। তাহলে আজকের এই অনিবার্য একাকীত্ব নিয়ে আমার এত অভিযোগ জমে উঠতো কি? জীবনকে ভালবাসা যেমন সত্য তেমনি সত্য এই চলমান জীবনের পৌনঃপুনিক আবর্তন। এই আবর্তনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, আগুনের ফুলকির মত ছিটকে ছিটকে পড়ছে। যখন যে ফুলিঙ্গের আওতায় এসে পড়ছে তখন সে সেইভাবেই জ্বলে উঠছে। এই চরম সত্যটাকে অতিক্রম করে জীবন-প্রবাহের নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কখনও কি সম্ভব?"

[শেষ]

With Best Complements from

Phone : Office & Works : 69-3236
Residence : 67-5951

SUPREME INDUSTRIES

ELECTRICAL, MECHANICAL
ENGINEERS
&
GENERAL ORDER SUPPLIERS

Specialist in :—

TURBINE PUMPS,
ALL SORTS OF SPARE PARTS,
EXCAVATION & MINING
EQUIPMENTS.

Office & Factory :—

84/3, SRI KRISHNA BHAGAT LANE
(Belilious Road)
HOWRAH-1

বন্দেমাতরম ও বঙ্কিমচন্দ্র

[ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী উৎসব সর্বত্র পালিত হচ্ছে। সেই সময়কার একটি ঘটনা।]

বিখ্যাত দেশনেতা জগবন্ধু ভাইগিরির সাক্ষাৎলিপে সাড়ে তেইশটি সভায় সভাপতিত্ব সম্পন্ন করে ক্লান্ত মনে, ঘর্মাক্ত কলেবরে গৃহে প্রত্যাগমন করে আহত সৈনিকের মতো নিজের কক্ষে ভীষ্মের শরশয্যার মতো আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আবার উঠে বৈশাখীর কবলমুক্ত হবার ক্ষমতা তাঁর নেই। ভৃত্যকে শুয়ে শুয়েই আদেশ করলেন :]

জগবন্ধু ॥ ওরে কেনেরাম —[কোনো উত্তর নেই !]

জগবন্ধু ॥ [বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করে] ওরে ব্যাটা কেনেরাম—

কেনেরাম ॥ হুজুর—

জগবন্ধু ॥ সাড়া দিচ্ছিস নে কেন ?

কেনেরাম ॥ আমি ত দরজার বাইরেই ছিলাম হুজুর—

জগবন্ধু ॥ ভালো করে গা-পা টিপে দে। উঃ ! দারুণ ব্যথা !

কেনেরাম ॥ আজ্ঞেবাবু টিপে দিচ্ছি—

[কেনেরাম গা-পা টিপতে লাগল, জগবন্ধু একটু আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।]

[হঠাৎ একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বরে নেতা-জগবন্ধুর নিদ্রা টুটে গেল।]

কণ্ঠস্বর ॥ পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

জগবন্ধু [বিস্মিত হয়ে] কে ? কে একথা বললে ?

কণ্ঠস্বর ॥ আমি গো আমি। আমার গলা শুনে তুমি আমায় চিনতে পারবে না। এইমাত্র তুমি "বন্দেমাতরম্" সম্পর্কে মেঠো বক্তৃতা দিয়ে এলে না ? হাততালিও অনেক পেলে।

জগবন্ধু ॥ কে আপনি ? আমার এই নির্জন কক্ষে আপনি কি করে ঢুকলেন ? বাইরে দারোয়ান ছিল না ?

কণ্ঠস্বর ॥ দারোয়ান আমার পথ আটকাতে পারে না। আমার যাতায়াত সর্বত্র। আমার প্রশ্ন, পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?

জগবন্ধু ॥ এইবার আপনাকে চিনেছি। আপনি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—

কণ্ঠস্বর ॥ তবু ভালো, শেষ পর্যন্ত আমায় চিনতে পারলে। শোনো, তোমাকে গোপনে কয়েকটি কথা বলব বলে এই অন্ধকার রাত্রে এসেছি—

জগবন্ধু ॥ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, আমার নিদ্রা টুটে গেছে! এইবার সত্যি আপনাকে চিনেছি—

কণ্ঠস্বর ॥ যদি চিনেই থাকো, তাহলে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও—

জগবন্ধু ॥ আদেশ করুন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—

কণ্ঠস্বর ॥ তোমরা "বন্দেমাতরম্" নিয়ে আবার হঠাৎ মাতামাতি শুরু করলে কেন? লোকে ত ধীরে ধীরে গানটিকে ভুলেই যাচ্ছিল।

জগবন্ধু ॥ কেন? আপনি কি জানেন না যে 'বন্দেমাতরম্' রচিত হবার পর একশ বছর পূর্ণ হল? আজ আমরা সেই অমর মন্ত্রের স্মরণোৎসব করে এলাম।

কণ্ঠস্বর ॥ অনেক দিনের কথা ত'! তাই সব সময় স্মরণে থাকে না!

জগবন্ধু ॥ আমরা কিন্তু স্মরণে রেখেছি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র! আমরা আপনার অকৃতজ্ঞ সন্তান নই। স্বাধীনতার যে বাণী আপনি আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন—

কণ্ঠস্বর ॥ বটে! বটে! তোমরা সব মনে রেখেছ?

জগবন্ধু ॥ নিশ্চয়। আমরা ঋষি-মন্ত্র ভুলিনি। একশত ছেলেমেয়ে সমবেতভাবে আপনার এই মন্ত্র বন্দেমাতরম্ উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে পথে পথে পরিভ্রমণ করে ফিরেছে। কাগজে কাগজে সেই বিবরণ প্রচার করা হয়েছে। সেই শোভাযাত্রার ফটো তোলা হয়েছে। আরো নামকরা কাগজে সেই সব ছবি ছাপানো হবে—

কণ্ঠস্বর ॥ বটে! বটে! এত কাণ্ড করেছ তোমরা?

জগবন্ধু ॥ [উল্লসিত হয়ে] শুধু কি তাই? গ্রামে-গঞ্জে, শহরতলীতে যাতে 'বন্দেমাতরম্' উৎসব সম্পন্ন হতে পারে, আমরা সেজন্য সর্বত্র কমিটি গঠন করেছি। তারাও নিজ নিজ অঞ্চলে মিছিল বের করবে—

কণ্ঠস্বর ॥ ফিরিস্তি ত' শুনলাম। মাঝখানে প্রসঙ্গ করে একটি প্রশ্ন শুধু করি—

With Best Complements of

PHONE : Facty. : 57-4239
Resi. : 56-1773

C. R. ROY & CO.

SAW MILL OWNER,
REGD. CONTRACTOR
OF
D. G. S. & D. & RAILWAYS

101, JESSORE ROAD, DUM DUM
Calcutta-700074

জগবন্ধু। প্রশ্ন করুন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—

কণ্ঠস্বর। এই যে তোমরা চক্কা নিনাদ করে 'বন্দেমাতরম্' গেয়ে এলে, আমার লেখা পুরো গানটা গেয়েছিলে ত?

জগবন্ধু। মার্জনা করবেন ঋষি, আজকের এই বর্তমান অবস্থায় পুরো গানটা গাইবার উপায় নেই! জাতীয়-সঙ্গীত রূপে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

কণ্ঠস্বর। জাতীয়-সঙ্গীত হলে বুঝি তার অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়?

জগবন্ধু। মানে—গানটা একটু দীর্ঘ ছিল কিনা! তাছাড়া—

কণ্ঠস্বর। তাছাড়া?

জগবন্ধু। তাছাড়া, আপনাকে আর কি বলব ঋষি কবি, গানখানির ভেতর অনেক ঠাকুর দেবতার কথা আছে ত? আমাদের ভারতবর্ষ আবার 'সেকুলার' ষ্টেট। মানে বুঝতেই পারছেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক আবার আপত্তি উত্থাপন করতে পারে!

কণ্ঠস্বর। তাই গানটির অঙ্গচ্ছেদ করতেই হবে? খাসা যুক্তি। [একটু নীরব থেকে] আচ্ছা, তোমরা যে আমার মূর্ত্তি নির্মাণ করেছ—

জগবন্ধু। আপনার সে মূর্ত্তি কি পছন্দ হয়নি ঋষিবর?

কণ্ঠস্বর। পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। আমি বলতে চাই, এই মূর্ত্তির একখানি হাত যদি কেউ ভেঙে দেয়, আর একটি চোখ কেউ তুলে ফেলে,—

জগবন্ধু॥ একথা আমরা ভাবতেও পারি না বঙ্কিমচন্দ্র—তাহলে ওই সুন্দর মূর্ত্তির সত্যি অঙ্গহানি করা হবে—

কণ্ঠস্বর। আমার বন্দেমাতরমেরও তো তোমরা অঙ্গহানি করেছ। তবে আর তাকে নিয়ে এই উৎসবের প্রহসন কেন?

জগবন্ধু। ঋষিবর, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। জাতীয়-সঙ্গীত আকারে ক্ষুদ্র না হলে সব সম্প্রদায়ের লোক সমবেত ভাবে তা গাইতে পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে বন্দেমাতরমের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিই পাবে।

কণ্ঠস্বর। তার প্রমাণ ত' আমি স্বর্গ থেকে ভারতভূমিতে এসেই বুঝতে পারছি। সঙ্গীতের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে, বিকৃত কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছে, অর্থ না বুঝে তার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, শব্দগুলিকে সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করা হচ্ছে না! জানো ত শব্দই ব্রহ্ম! ফলে আমার 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত হয়েছে এক বিদ্রূপের বস্তু!

জগবন্ধু। আপনি যদি আদেশ করেন, তবে এ ব্যাপারে জনমত সংগঠন করতে পারি। দেশে যত রাজনৈতিক দল আছে—তাদের সবার কাছে আবেদন প্রচার করতে পারি। বিধান সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি—

কণ্ঠস্বর॥ থাক্-থাক্—তোমাদের কেরামতি ত' বেশ বোঝা গেছে! আমাদের দেশে একটা চলতি প্রবাদ আছে—'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।" এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। অধিক সন্ন্যাসী মিলে বন্দেমাতরমের সপিণ্ডিকরণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অথচ এমন একদিন গেছে যেদিন এই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজার হাজার ভারতবাসী স্বাধীনতার যজ্ঞে জীবন-পণ করেছে, ফাঁসি কাষ্ঠে আত্মদান করেছে, চিরকালের জন্য দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হয়েছে। একদা শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্র কণ্ঠে ধারণ করে 'বন্দেমাতরম্' পত্র প্রকাশ করেছিলেন। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ একে নতুন সুরে সঙ্গীতিত করেছিলেন। বিপিন পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় এর মর্যাদা রক্ষার জন্য কারাগার বরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ বন্দেমাতরমের অঙ্গহানি করেন নি। সরলাদেবী এই 'বন্দেমাতরম্'

মন্ত্র উচ্চারণ করে "বীরাষ্টমী উৎসব" শুরু করে-ছিলেন।

জগবন্ধু॥ সে কথা সত্য ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। বন্দেমাতরমের অমর্যাদার জন্য আমরা সত্যি লজ্জিত।

কণ্ঠস্বর॥ আমার মাতৃভূমিতে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমাদের সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনে আবার সেই সুজলা সুফলা বাংলা দেশে ফিরে এসেছি। কিন্তু এসে কি দেখছি?

জগবন্ধু॥ কি দেখছেন বঙ্কিমচন্দ্র?

কণ্ঠস্বর॥ দেখছি, বাঙালীর মুখে আর সে হাসি নেই। বাঙালীর জীবনে আর বারো মাসে তের পার্বণ নেই! বাঙালীর গ্রামে আর গোয়ালভরা গাই নেই। পুকুরভরা মাছ নেই! মরাই ভরা সোনার ধান নেই। বাঙালীর পুষ্ট হাতে আর পথ চলবার লাঠি নেই। বাঙালী জীবন ধারণের জন্য শুধু ধুঁকছে! বাঙালী নিজের জাতীয় পোষাক ধুতি চাদর বর্জন করে প্যান্ট-সার্ট পরিধান করেছে। লাঠি ছেড়ে দিয়ে তারা 'পাইপগান' চালাতে শুরু করেছে। মেয়েরা শালীনতা বিসর্জন দিয়ে পেট কাটা জামা পরতে আরম্ভ করেছে। অন্ধসজ্জায় বিদেশীর অনুকরণ করছে। নৃত্যে, গানে কোথাও সুরুচির পরিচয় নেই। "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরিণী" জননী আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ঐশ্বর্যের দেবী কমলা আর বিদ্যার দেবী বাণীকে তোমরা অনাদরে হারিয়ে ফেলেছ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আর বিদ্যাদান করা হয় না! সেখানেও রাজনীতি চলেছে! কোন্ আদর্শ নিয়ে বন্দেমাতরম্ তোমরা গাইবে শুনি? গানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে কি করে? সেই তাজা প্রাণ আজ দেশে কোথায়? [একটু নীরব থেকে] শুনতে পেলাম তোমরা রবির নামে রবীন্দ্র পুরস্কারের আয়োজন করেছ। আর যত অযোগ্য ব্যক্তি তাই লাভ করে রবির নামের অমর্যাদা করছে! কী লজ্জার কথা! কিন্তু দোহাই তোমাদের! 'বঙ্কিম পুরস্কার' নামে কোনো পুরস্কারের প্রহসন তোমরা ঘোরো না। তা হলে মরেও স্বর্গরাজ্যে বসে আমি শান্তি পাবো না। জানো তো—সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আমি স্বর্গরাজ্যে বসে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে অবস্থান করতে চাই—

জগবন্ধু॥ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, অপরাধ গ্রহণ করবেন না। আপনি অভিযোগ করেছেন, বাঙালী আর বারো মাসে তের পার্বণ করে না! কিন্তু আপনাকে সবিনয়ে জানাই, আমরা সাড়ম্বরে দশভুজার পূজা করি, ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মীকে আবাহন করি, দেবী সরস্বতীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করি। সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজো করে ব্যবসায়ীরা। আমরা-বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন করি, বইয়ের মেলা বসাই। সারা রাত জেগে গান শুনি।

কণ্ঠস্বর॥ খুব বড় তালিকা ত পেশ করলে! কিন্তু বৎস, জিজ্ঞেস করি ডেকুলের বিচিত্র দুর্গা প্রতিমা, আখের ছিবড়ে দিয়ে তৈরী সরস্বতী প্রতিমাকে পূজো করলে কি মনে ভক্তি জাগে? আসল কথা হচ্ছে—ভক্তি—ভড়ং নয়!! সেই প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তি বাঙালী জীবন থেকে দূরে সরে গেছে। তাই বাঙালীর উন্নতি এখন সুদূর পরাহত! এই বৃদ্ধের কথাগুলো একটু ভেবে দেখো!

[এরপর কণ্ঠস্বর শুরু হল। নেতা জগবন্ধু আচমকা জেগে উঠলেন।]

॥ ছোট গল্প ॥

টাইম

হিমাংশুকুমার সেন

সোনার মাটি গ্রাম গঞ্জের হাটতলার কাছে বহুকাল ধরে তালপাতার কুঁড়ে ঘর বানায় মিতাইয়া। ওরা আসে বিহারের রাঁচি হাজারিবাগের পাহাড়ী এলাকা থেকে। বংশ পরম্পরায় ওরা এমনি ভাবেই আসে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গায়ে গতরে খাটতে। বছরে আট ন মাস এখানে থেকে যায়। সোনার মাটিতে ওরা গাছ কাটে মাটি কাটে মাটি ফেলে। আর কেউ কেউ বাঁকে করে ভাঙা লোহা বয়ে এনে মহাজনের কাছে জমা দেয়।

এদের মধ্যে একজন দশরথ সাউ। সামনের তিনটে দাঁত বড়। গোঁফ সে কামায়। লজ্জায়। মাথা মাথে মাথে ছাড়া করে। দুঃখে। তবে গোঁফ কেশ মুক্ত হলেও মাথায় কয়েকটা থেকে যায়। টিকি রাখা প্রথা। দশরথ তাই রাখে।

দশরথ আতে কুঠার। কিন্তু সারা জীবন কোপাল সোনার মাটির জমিন। তারপর বুড়ো বয়সে বিমারে পড়ে গিয়ে জখম হয়ে গেল। ইদানিং ভাঙা লোহা বয়ে এনে জমা দেয় মহাজনের কাছে।

রোজগার ভাল না থাকায় মাথাটা তার মাঝে মাঝে একটু খারাপ হয়ে যায়। জাতভায়েদের গালি দিয়ে ফেলে। খুব মনটন খারাপ হলে সে দুচার গেলাস তাড়ি খেয়ে কাঁদে।

সেদিন ঘর থেকে বিবির চিঠি এল। লিখেছে মেজ ছেলে বেইল জোড়ার একটা বেচে দিয়ে হাজারিবাগ টাউনে ড্রাইভারি লাইসেন্স নিতে গেছে। বেইলটার নাম মোংরা। মোংরার জন্ত সে কাঁদল। টাণ্ডোবা গ্রামের রুক্ষ দুর্জরিত সংসারের মোংরা সে কান্না শুনতে পেল না।

পরের দিন সে দুঃখ ভুলে গেল কিছুটা। চোখে মুখে বাথা নিয়ে সামনের তিনটে দাঁত বার করে আবার ভাঙা লোহা কিনতে গেল। তা—ও লো—হা, তা—ও—

গেরস্থর বাড়ীর আনাচ কানাচ থেকে সে ভাঙা লোহা যোগাড় করে। বাঁকে বোঝাই করে। দাম দেয়। কাঁধে করে। হাঁটতে হাঁটতে কুঁড়িয়ায় ফিরে আসে। পথে দুএকবার শুধু বোঝা বানিয়ে খায়। খাটো ধুতি। খালি গা। শুকনো চামড়ার ওপরে পৃথিবীর বানান সংঘাতের চিহ্ন যেন।

বুড়ো সম্প্রতি একটা টেবিল ঘড়ির খোল কুড়িয়ে এনেছে। ভেতরে যন্ত্রপাতি নেই। সৌভাগ্যবশত: কাঁটা দুটো আছে। দশরথ এটা মহাজনকে জমা দেয় নি। সে জাতভায়েদের ঘড়িটা দেখায়। যা টাইম তুমি চাইবে তাই পাবে। সে ইংরিজি জানে না। অস্পষ্ট সংখ্যাগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে সে কাঁটা ঘুরিয়ে দেয়। টাইম পালটে যায়। কিন্তু সে বলতে পারে না টাইম কিতনা হ্যায়। ওরা কেউই পারে না।

একদিন বিকেলে একজন বিহারের সাধু এল। হাতে ত্রিশূল। কোমরে কৌপীন। দীর্ঘ জটা। মেদবিহীন দেহ। ওরা সবাই মিলে সাধুকে রোটি জল সবজি খাওয়াল। সন্ধ্যেতে সীতারাম গানা হল।

গানের শেষে সবাই নিজেদের মধ্যে বাতচিত করতে লাগল। হঠাৎ দশরথ সাউ একটা সওয়াল নিয়ে সাধুর কাছে হাজির হল। সে পুছল: কব মেরা দুখ হটেগা? সাধু হেসে বলল: সব টাইম আয়েগা।

দশরথ সাউ বিড় বিড় করে বলল: টা-ই-ম। সে কুড়িয়া থেকে খোল সর্বস্ব ঘড়িটা এনে কেবলই কাঁটাটা ঘুরিয়ে গেল। টাইম পালটে যায় ঘড়িতে, কিন্তু সে পড়তে জানে না। সে হাসে আপন মনে। পরদিন সাধু চলে গেল।

কিছুদিন পর সে একটা ছোট মজবুত লোহার বাক্স

যোগাড় করে আনল বাবুদের বাড়ীর আনাচ কানাচ থেকে। সেটাও সে জমা দিল না মহাজনকে। বিকেলে বসে বসে একমনে সেই বাক্সটা সাফ করল। পরের দিন রঙের দোকান থেকে সবুজ রঙ কিনে নিয়ে এল। বাক্সটাকে সে রং করল। এবার দেখে যাবার সময় সে এটাকে হাতে নিয়ে যাবে।

কিছুদিন পর সে একটা ভাঙা আয়না কুড়িয়ে নিয়ে এল। আজ কাল সে সকাল বিকাল মুখ দেখে আয়নায়। তার নিজেকে ভালই লাগে। তার মনে হয় তারও টাইম পালটে যাচ্ছে। ঘড়িটার কাঁটা সে ঘুরিয়ে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তিত টাইম মনেতে ঘোর আনে। সে হাসে আপন মনে।

একদিন সে একটা বড় খরচে পড়া বন্ধ ভাঙ্গা তালা কুড়িয়ে আনল। এটাও সে মহাজনকে জমা দিল না। বন্ধ তালার আংটা খোলে না। চাবি নেই। মাঝে মাঝে আছাড় মারে। লোহা দিয়ে পেটে। কিন্তু আংটা খোলে না। টাইম পালটে যায়। কিন্তু কবে তার দুভাগের বন্ধ ভাঙ্গা তালাটার আংটা খুলে যাবে? বুড়ো ডিনটে দাঁত বার করে ঘড়িটার কাঁটা আঙুল দিয়ে ঘোরায়। পরিবর্তিত ভিন্ন ভিন্ন টাইম মনেতে ঘোর আনে। সে হাসে আপন মনে।

With Best Compliments from

M/s POPULAR GATES & GRILLS CO.

Manufacturer of :
ALL TYPES OF
GATES, GRILL, COLLAPSIBLE GATES,
ROLLING SHUTTER ETC.
At a reasonable rate

Sodepur Amarabati
P. O. Sodepur, 24-Parganas

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগনা (ফোন : ৫৭-২৫৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed a/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারত পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

Vikrant Special Machines

Private Limited

8/5 F, Gariahat Road,

(MERLIN PARK)

CALCUTTA-700 019

PHONE :

Office : 47-0341 & 48-2930

Factory : 57-3070

GRAM : PLANWELL

Designers & Builders of :

★ SPECIAL MACHINES FROM IDEA TO EXECUTION

★ COIL WINDING MACHINES FOR ELECTRICAL INDUSTRIES

★ V-BELTS MANUFACTURING MACHINERY

★ SPECIAL PURPOSE MACHINES.

CALOREX INDIA Pvt. Ltd.

Industrial Boilers

GAGANTARA, 13 Camac Street
C A L C U T T A — 700017

PHONE : 43-4112, 43-3751, 43-3351

CRAM : " PROCESHEAT "

উজ্জ্বল ভারত

Joya Engineering Industries

Designers

&

Manufacturers of :

BULK & PACKAGE HANDLING
CONVEYORS & SYSTEMS

OFFICE & FACTORY NO. 1 : 6, GANGADHAR SEN LANE.
CALCUTTA-700 036

FACTORY NO. 2 : 13, B. T. ROAD, CALCUTTA-700 050

PHONE : 52-5572

প্রজাতন্ত্র দিবসে আবেদন

১। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।

২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ণ রাখুন।

৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

৪। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করুন।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৬। ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন।

৭। এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।

৮। জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুন।

৯। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

With Best Compliments Of

Phone : 35-684

Small Industries Corpn.

Manufacturers of Trolley Line Dogspikes

76/9, BELIAGHATA MAIN ROAD

CALCUTTA-700010.

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪·০০
বৃহৎ পকেট গীতা ৩·০০
সুলভ পকেট গীতা ২·০০
পদ্যগীতা ২·০০
নিত্য পাঠ্য গীতা ২·০০

সুলেখক শ্রী অনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাঙ্গালে বাঙালী ৫·০০
বীরত্বে বাঙালী ৬·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮·০০
বাংলার কবি ৬·০০
বাংলার বিদুষী ৭·০০

সহজ পাঠ্য গীতা ১·৫০
শিক্ষক ও ছাত্রের ধর্ম ১১·০০
কর্মযোগী ৩·০০
ভারত আত্মার বাণী ৭·৫০
Soul of India Speaks 7.00

রাজর্ষি রামমোহন ৭·০০
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ৭·০০
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ৩·০০
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ৭·০০
রবীন্দ্রনাথ ৬·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ ৫
মানুষের মত মানুষ ২
বিদ্যাসাগর ২

বাংলাসরকার শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি ৫
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন ৫
সরল যোগ ব্যায়াম ৫
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের ৫
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ৪
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম ৪
যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ ৬

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ৬৮.০০

সর্বদা ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় অভিধান। সদ্য সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

৮

উৎকল ভারত

৩১ বর্ষ
১০ সংখ্যা
কার্তিক '৮৬

সূচীপত্র

স্রষ্টা ও সৃষ্টের সম্বন্ধ—
পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। ৩৬৩
সম্পাদকীয়। ৩৬৫
স্নেহ। মুকুল দেব ঠাকুর। ৩৬৬
হৈমন্তী। গৌরচন্দ্র সাহা। ৩৬৬
জীবন যজ্ঞ। বাণী নাগ। ৩৬৮
নদী কিনারায়।
কণপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৬৯
একান্ত নিজস্ব।
গোপাল ভৌমিক। ৩৭১
ভাইওয়ানের যাদুঘর।
শঙ্খিন্দু সাহা। ৩৭৭
সেই দুরন্তের মধুর স্মৃতি।
স্বপন বুড়ো। ৩৭৯
নিমাই তার নাম। পরেশ সাহা। ৩৭৩
লালন ফকিরের জীবনে ধর্ম।
ডা: কহিদাস সাহা। ৩৭৮
সবজান্তার মা। দুর্গা গোস্বামী। ৩৮০
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী। ৩৮৪
দূরের আকাশ। অখিল রঞ্জন রায়। ৩৮৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ।
সুনীতি সান্যাল। ৩৮৯
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে।
শান্তনীল দাশ। ৩৯১
কৈফিয়ৎ। দীপেন রাহা। ৩৯২
বাদুর ঝোলা ট্রামে বাসে।
ভবানী প্রসাদ মজুমদার। ৩৯৩
জেনে রাখা ভাল। কৃষ্ণেন্দু দত্ত। ৩৯৩
অখিল বন্ধু স্বপন বুড়ো।
দেবেরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৯৪
সর্বনাশের দায়। অমিত রায়। ৩৯৫
সমাজে দেবিকা সুধারাণী দত্ত।
নারায়ণী মিত্র। ৩৯৬

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র
যুগ্ম- সম্পাদক—গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক : ১২ টাকা (সডাক)

স্রষ্টা ও সৃষ্টের সম্বন্ধ

'ঈশ্বর' যে বিশ্বের স্রষ্টা পালক ও সংহর্তা, সে বিশ্ব ইউক্লিডের জ্যামিতির মাপে গড়া। এই মাপে বিশ্ব নিতান্তই মৃত জড় (dead, inert matter); ইহার সঙ্গে উচ্চ আদর্শবাদের কোনও সামঞ্জস্য সম্ভব নয়। ইহাদের মাপকাঠি সব দেশে সব কালে সকল পাত্রে 'এক'ই। যাহা বিশ্বের এক স্থলে, গতির এক অবস্থায় পাঁচ হাত তাহা সকল স্থলে, গতির সকল অবস্থাতেই পাঁচ হাত ইহাই ছিল ইউক্লিডের জ্যামিতির কথা। আজ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মাপকাঠিও আপেক্ষিক; ঐ মাপকাঠি স্থলে স্থলে গতিবেগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। ...পুরুষোত্তম-বিধানে কাল দেশ জড় সাই নয়নধর্মশীল...। ... সব চেয়ে দূরই সব চেয়ে নিকট—ইহাই বর্তমানের জ্যামিতি।.. পুরুষোত্তমের মতে জাতি দেশ কাল, জন্ম কর্ম, পাপ পুণ্য, গুণ নির্গুণ সব আপেক্ষিক; উহারা সকলেই নয়নধর্মী। আইনষ্টাইনের বিশ্বই শ্রীকৃষ্ণ গড়িতে অবতীর্ণ।.. জাতি-দেশ-কাল যদি শুদ্ধ কঠিনই হয়, যদি ইহাতে নয়নধর্ম যাইই না থাকে, তবে উহাদের রূপ অতীতে যেমন ছিল, আজও তেমনই থাকিবে, ভবিষ্যতেও তেমনই থাকিবে। বিশেষ গতিক্ষেত্রে কি তাহা হইলে আজ মানুষের মত বাঁচিবার কোনই ভরসা আছে? মানুষ বিশ্বের স্রষ্টা ইহাই ব্রহ্মসূত্রের মূলকথা। যে শাসক শাস্ত্রের উপরে থাকিয়া নিজ শাস্ত্রে নিজে শাসিত না হইয়া শাস্ত্র রাখেন শুধু শাসিতদের জন্য, তেমন শাসকের শাস্ত্রকথা বেদব্যাস বলেন নাই, তেমন শাস্ত্রের প্রচারও করেন নাই, শাসিতের তেমন করুণ গাথাও গাহেন নাই। বেদব্যাস শাসনকে গড়িয়াছেন 'কলা'র সহজ স্বরাজ ছন্দে, যেখানে বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বের জীব স্ব স্ব ছন্দ বজায় রাখিয়া কাহারও উপর লেশমাত্র চাপ না দিয়া লীলারস আস্বাদন করিয়া ধন্য হইবেন।. যাহা পুরুষোত্তম সৃষ্টি করেন, কিন্তু যাহাদ্বারা তিনি সৃষ্ট হন না, তাহা বিদ্যা নিশ্চয়ই। প্রাণহীনতায় ঈশ্বর হন একান্ত স্রষ্টা, জগৎ একান্ত সৃষ্ট। সামান্যাধিকরণ্য ছাড়া কিছুতেই বিশ্ব ও ঈশ্বর সত্তা নয়। বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর, ঈশ্বরের স্রষ্টা বিশ্ব দুই-ই যেখানে দুইয়ের স্রষ্টা সেখানেই সত্তা সৃষ্টি। সৃষ্টিকে স্রষ্টার হাতে তুলিয়া দিয়া সৃষ্টিকে খেলিবার লীলাভূমি করিয়া দিতে বেদব্যাস শেষ উত্তর মীমাংসা দিতে আসেন নাই। বিশ্ব ও ঈশ্বর যেখানে সম স্রষ্টা এক্য সম সৃষ্ট, যেখানে তাহারা সমান কর্তা, সমান কর্ম, সমান সম্প্রদান, সমান অপাদান, সমান সম্বন্ধ, সমান অধিকরণ, সেখানেই উহার মীমাংসা।

বিশ্ব পুরুষ-বিশ্বাসী, প্রকৃতিতে তাহার মহা অবিশ্বাস। কৃষ্ণে তাহার বিশ্বাস, কৃষ্ণের জগতে অবিশ্বাস। কৃষ্ণ-বিশ্বাস ও বিশ্ব-বিশ্বাস যখন দুই-ই মিলিবে, তখনই হইবে 'যথাভূতার্থ' পরমার্থ জ্ঞান। পুরুষোত্তম দুইয়ের বিশ্বাসের উপর গড়িবেন নিজের সত্যতা।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়—

নূতন জীবনচেতনার প্রতীক পুরুষোত্তমানন্দ

নূতনের জন্য মানুষের আকুলতা আছে, কিন্তু নূতনকে বুঝতে পারা তার পক্ষে সহজ হয় না, নিতে পারা তো নয়ই। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের সবই ছিল নূতন। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই চলন্ত করা পথে তিনি চলেন নি। মানুষকে তিনি স্বভাবধর্মেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন—রাজনীতির জীবনে ও সন্ন্যাস জীবনে সহস্র সহস্র মানুষের সঙ্গে তিনি প্রাণখোলা স্বাভাবিক ভালবাসা নিয়ে মিশেছেন অথচ আশ্চর্য তিনি ছিলেন স্বভাব-সন্ন্যাসী। মানুষের দুঃখ-বেদনায় তিনি কেঁদেছেন, তাদের সে দুঃখ দূর করবার জন্য তিনি সাধ্যমত সহযোগিতা চেষ্টা করেছেন— তবু আর একটা অতি সত্য কথা এই যে বন্ধন ছিল তাঁর ভূষণ—কারো সাথে কোন বন্ধনই তাঁর কোন ক্ষতি করে নি ; কেননা দু'পাঁচ-দশজনের জন্যই তো তাঁর আকুলতা নয়— সব মানুষের জন্যই তিনি আকুল এবং তা-ও তাঁর ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া সুখের জন্য নয়—কোনরকম অস্তিত্বহীন নিছক ভালবাসার জন্যই ভালবাসা কিংবা ঐ ভালবাসার মধ্য দিয়ে মানুষকে একটা উত্তরোত্তর জীবনের খোঁজ দেওয়া। তাই তিনি যেমন সুন্দর তেমনি মহান।

জ্ঞানের আলোচনায় তাঁর তীক্ষ্ণতা সাধারণ নয়—বেদান্ত, উপনিষৎ, গীতার অবধূত ভাষ্য এবং তাঁর অন্যান্য অনেক রচনা তার প্রমাণ—তাঁর বক্তৃতা বা আলোচনাও তাঁর জ্ঞানের তীক্ষ্ণতার প্রমাণ দেবে—আবার এই মানুষটিই ভগবৎ প্রেমে বা ভক্তিতে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির আনন্দ বেদনায় অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন—তাতে অবাক লাগে জ্ঞান বা যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা তো তাঁর ভক্তি বা হৃদয়কে শুকিয়ে ফেলতে পারে নি সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে। আরও কথা আছে—ভগবানের জন্য তিনি যত না কেঁদেছেন তার থেকে অনেক—অনেক বেশী কেঁদেছেন মানুষের জন্য—মানুষকে মহত্তর, মহত্তর জীবনের পথে ইঙ্গিত করবার জন্য। পরস্পর বিরোধী মতাকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের যথাস্থান ও মান দিয়ে যে নূতন জীবন-চেতনা তাই দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য তিনি মানুষকে চেয়েছিলেন, ডেকেছিলেন। কিন্তু এক পক্ষকে অস্বীকার করে নিজ পক্ষকে যেনতেন প্রকারেণ প্রতিষ্ঠার সহজ পথ এ নয়—তাই তাঁর এ জীবন-চেতনা এখনও মানুষের ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

এই সঙ্গে দেখি ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী হয়েও কখনো তিনি বন্ধনের কারণ তো বলেনই নি, তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের শাস্ত্র-ব্যাখ্যার কার্যের স্থান পারমার্থিক ভাবে স্বীকৃত হয় নি বলেই আজ ভারতবর্ষ এত নীচে নেমে গেছে এবং আরও বলেছেন যে কর্ম না করলে ভগবানের করুণা থেকে মানুষ বঞ্চিত হবেই।

শ্রীমৎ স্বামীজীর ঘটনাগুলি থেকেও তাঁর জীবনের নূতনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আন্দোলনের অংশ হিসাবে তাঁর ছেলেমেয়েদের তিনি যে স্কুল ছাড়িয়ে এনেছিলেন, তাদের আর কখনও সেই প্রচলিত শিক্ষার স্কুল-কলেজে পাঠান নি। এরকম কি আমরা দেখে থাকি ? আমরা দেখি, তর্ক বা সত্যের খাতিরে পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করলেও নিজেদের সন্তানকে সেই শিক্ষা তো আমরা দেবই, বিলেতে পাঠাবার সামান্য সুযোগও নষ্ট করব না। স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্দোলনকে শক্তিশালিত করতে মানুষকে অর্থ, সোনা, গহনা দান করতে বলতেন—কিন্তু তার আগে তাঁর ঈষৎ সবটুকু সোনা এবং তাঁর ভাই-বৌর অনেকটা সোনা কংগ্রেস-ভাণ্ডারে দান করে তারপর মানুষের কাছে সেগুলি চাইতেন পুরুষোত্তমানন্দ।

এমনি করে তাঁর জীবনের ঘটনা ও তাঁর প্রবর্তিত চিন্তাধারা প্রমাণ করবে তিনি সব দিকে প্রচণ্ড ভাবে নূতন—তাই আমরা তাঁকে বুঝি নি, বুঝি না ; নিতে পারি নি, নিতে পারি না। তাঁর এই নূতন জীবন-চেতনা তিনি তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতাদ্বারা রাজনৈতিক এবং ধার্মিক মঞ্চ থেকে সারাজীবনে ১৪/১৫ হাজার বক্তৃতায় মানুষের কাছে উপস্থিত

করেছেন, হাজার হাজার মানুষ তাঁর বিনা মাইকের এক নাগাড়ে ২/৩ ঘণ্টার বক্তৃতা নিস্তব্ধ ভাবে শুনেছে—তাঁর সঙ্গে এসে শত শত লোক ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্রকে সর্বস্তরে নূতন ভাবে গড়বার এই সামগ্রিক সমন্বয়ের চিন্তাধারা নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছে—কিন্তু তাঁকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। তাঁর চিন্তাধারার নূতনত্বের একটু পরিচয় এইখানে রাখি—

"ঈশ্বরই যদি একমাত্র মালিক হন তবে জীব 'দাস' ছাড়া আর কিছুই নহে। 'তোরা শুধু চাষের মালিক গ্রামের মালিক নস'। জীব করে ক্ষেত চাষ, ফল ভোগ করেন ঈশ্বর এইরূপ ঈশ্বর হন শোষক। তবে কি ঈশ্বরকে সরাইয়া দিয়া জীবকেই ক্ষেত্রের একান্ত মালিক বলিতে হইবে? জীব যদি একান্ত মালিক হয় তবে অনন্ত ক্ষেত্রের অনন্ত মালিকের দল যে পরস্পরের ক্ষেত কাড়িয়া লইবার জন্য পাশবিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবে তাহা রোধ করিবে কে? ভিন্ন ভিন্ন মালিকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে এক করিয়া, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেককে সংহত করিয়া এক সমগ্র বিশ্ব গড়িবে কে? প্রতি খেতের মালিক যে প্রতি খেতের স্বয়ং মালিক ইহা তো প্রত্যক্ষ সত্য: তাহাদের যে লোভ রহিয়াছে ইহাও তো প্রত্যক্ষ সত্য। সেই জন্যই এমন একজন মালিকের প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে যিনি প্রতি খেতের ও প্রতি খেতের মালিকের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করিয়া প্রতি স্বয়ংমূল্যবান খেতগুলিকে সর্ব খেতের সমন্বয়ে গড়িয়া এবং স্বয়ংমূল্যবান ক্ষেত্রগুলিকে এক অখণ্ড ক্ষেত্রে সমন্বয় করতে পারেন। .. কোনও বিশেষ খেতের মালিকই নিজের খেতকে বিশ্ব খেতের সঙ্গে সমন্বয় না করিয়া নিজের খেতের একান্ত মালিক হইতে পারিবে না। মালিক হইতে হইলে চাই প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ খেতকে একজন পোষণপরম সর্বক্ষেত্রাধিপতির দেবায় সমর্পণ করা। এই সমর্পণের ভিতরেই প্রতি খেতের সত্য বাস্তব পারমার্থিক মালিক হইবার কৌশল নিহিত রহিয়াছে। তখন বিশেষ বিশেষ খেতগুলিও 'সামান্য বিশেষে একতাৎপ' প্রতি প্রাপ্ত হইয়া দিব্য খেতে গড়িয়া উঠে।"

—এই চিন্তাধারার মধ্যে যাহা সমষ্টি, অংশ সমগ্রের যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা আধুনিকতম, আবার মানুষকেই একমাত্র ক্ষেত্র করার ঐকদেশিকতা থেকেও এ মুক্ত। তিনি মানুষকেও চান, ভালবাসেন—ভগবানকেও। উপরের চিন্তাধারা যেদিন সমাজে রাষ্ট্রে সত্য রূপ পাবে—সেই দিনই হবে মানুষের সমাজে সত্যিকারের শান্তির সম্ভাবনা।

আধুনিকতম অথচ চিরন্তন এই পোষণধর্মী সামগ্রিক জীবন-চেতনায় মহনীয় মহৎ সরল আচরণে সুন্দর ও কমনীয় এই মানুষটী জীবনের সবস্তরে যে নূতন কথা বলে গেছেন ও আচরণ করে গেছেন, তাকে সর্ব ক্ষেত্রে রূপ দিতে এখনও অনেক দেরী। তাঁর সমাধিস্থানে তাঁর এই চিন্তাধারা রক্ষিত আছে—ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়বে। এই বৈপ্লবিক দর্শন ও জীবন তিনি পেয়ে ছিলেন তাঁর গুরু শ্রীশ্রী বিজয়গোপাল (যাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত) এর কাছ থেকে। শ্রীবিজয়-গোপালে একই সঙ্গে ছিল মুহুর্মুহু: নির্বিকল্প সমাধি এবং যাকে আমরা অবিদ্যা স্তর বলি সেই স্তরে অবতরণ করে সব মানুষের সঙ্গে পোষণ-ঘন প্রাণের স্তরে মিলবার ও চলবার অসাধারণ নিপুণতা। জীবন্মুক্তের স্তরের মানুষগুলিকে কিংবা যারা সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের—পণ্ডিত কুলীন ধনীর স্তরের নয়—মানুষগুলিকে একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করে উচ্চনীচ ভেদবোধ ভুলে দিয়ে সব মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করবার যে সহজ সরল জীবন চেতনা শ্রীবিজয়গোপালে ছিল সেটাই শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে রূপ পেয়ে ছিল তেমনি রাজনীতি বা পারিবারিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেছিলেন তিনি সেই সব কিছুর অতীতের স্তরের হয়ে নিয়েই। একদিকে প্রাণ-ঢালা প্রেমে সকলের সঙ্গে অবাধী যোগে যুক্ততার সুখ আর সেই সঙ্গেই আসক্তি বিদ্বেষমুক্ত সব মানবিক বস্তুতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি—এইই হচ্ছেন পুরুষোত্তমানন্দ। একটী মুক্ত প্রাণ কি করে সর্বত্র বিচরণ করতে পারে তার পথ-রেখাই পুরুষোত্তমানন্দ। পুরুষো-ত্তমানন্দ একটী তত্ত্বগত মুক্ত জীবন। এই পুরুষোত্তমানন্দ-কে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

কবিতা

ক্লেদ

মুকুলদেব ঠাকুর

প্রত্যহ কেউ না কেউ আত্মস্মৃতি লেখে :
কেউ গড়ে দেবীমূর্তি কল্পনায়, নিজস্বতা নিয়ে—
'পথের দাবী'র মতো উপন্যাস হয়না তবুও :
হয় না সে গান গাওয়া, যার নাম 'বন্দেমাতরম্' ।।

হৈমন্তী

গৌরচন্দ্র সাহা

দিন ছোট হয় হোক্,
কাক ক'মে আসা সোনালী মাঠের পানে
আনমনা চেয়ে আমরা কাটাব কাল ।
পানসভা সোনা জমা আছে ভাল ভাল ।

হৈম গলা রোদ কৌটায় কৌটায় ভরে
পাকা ধানের বরণী ঘাসের বুকে
ক'মে ক'মে আসে দিন
রাত ভ'রে উঠে ফসলের যৌতুকে ।

শুকনো শীতের টানে
মধু কাটে আর প্রজাপতি উড়ে ফিরে ।
আরও বড় বাড়ে কুয়াশা জড়ানো মাঠে
শিউলি ছড়ানো হিমেল সকাল বেলা ।

শুধু ফসলের ইঙ্গিত ভরা কাল
পানসে হলুদ শোনিত রিক্ত দেহ
তবুও বরণী ফসলের সোনা সুখে
প্রাণ চঞ্চল আগামীর আগমনী ।

তারা গণা গণা নিঝুম কালো রাত :
সোনালী স্বপনে জড়ানো চোখের ঘুম,
আক্ষেপ নেই, জীবন সুখের হাত ।

জীবন যজ্ঞ

বাণী নাগ

জীবন আছে, আছে জীবন-যন্ত্রণা
দৈনন্দিন পীড়ন আছে অজস্র,
প্রত্যহ ক্রুশ বিদ্ধ হচ্ছি, তবুও—
পুনরুত্থান ঘটাচ্ছে কার মন্ত্রণা ?
কোন্ পুরোহিত করছে বলে এত পাঠ—
বুকের ভিতর ? আর কেউ সে নয় গো নয়
সত্তা আমার এবং আমার আত্মা সে
জীবন-যজ্ঞে দু'জনে যাচ্ছে হোমের কাঠ !

নদী কিনারায়

ক্ষণপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয় আমার কেঁদে কেঁদে ওঠে
সংসার মরু মাঝে ।
সংসারে, সং সাজারে আমারে
রেখে গেলে কোন কাজে ।
ছুটোছুটি ক'রে ক্লান্ত হয়েছি
লাঠিটি হাবাল হাটে
নদী কিনারায় বসিয়া যে ভাবি
আকুল আঁধার বাতি ।

একান্ত নিজস্ব

গোপাল ভৌমিক

সে আমাকে জানে এবং জানে বলেই
সহজিয়া অনুরাগে উষ্ণ বুকের উপত্যকায়
উথাল পাথাল ভালবাসার বর্ণা নামায়.....
সে আমাকে জানে এবং জানে বলেই

তাইওয়ানের যাদুঘর

শরদিন্দু সাহা

চীন সাগরের বুকে সব চেয়ে বড় দ্বীপ আজকের তাই-ওয়ান যার পুরো নাম ছিল ফরমোজা। আয়তন ১৩,০০০ বর্গ মাইল। এখানে ছোট বড় বহু পাহাড়ের অবস্থান। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু যেটি তার উচ্চতা ১৩,০০০ ফুটের ওপর। এদের সাথে যে সব ঝরণা, নালা আর নদী মেশেছে তারা কেউ বিস্তীর্ণ ভূমে নয় সমুদ্রে বিলীন হয়েছে।

এই দ্বীপের আদিবাসীরা মালয়ী গোষ্ঠির। বহুকাল আগে এরা সুমাত্রা, বোর্ণিও ও ফিলিপিন থেকে এখানে এসে ঘর বেঁধে আছে। সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় এদের আদিম আচার আচরণে সভ্যতার ছাপ না পেয়ে চীনারা এটিকে তাই-ওয়ান বা বর্বর ভূমি বলতো।

আজ থেকে ৪০০ বছর আগে চীন সাগরে বাণিজ্য পথে দ্বীপটির নাতিশীতোষ্ণ মনোরম আবহাওয়া আর নিবিড় অরণ্য ঘেরা শৈলশ্রেণীর পাশে ফেনহীন সমুদ্রের সমারোহ দেখে পর্তুগীজ নাবিকরা এটিকে ফরমোজা বা সুন্দর দ্বীপ নামে চিহ্নিত করে। এর ভৌগোলিক অস্তিত্বের সুযোগ নিয়ে পর্তুগীজরা এটিকে দখল করে নৌবাণিজ্য পথে এটিকে তাদের একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতো। পরে চীন সাগরে মোজেটেজের ওপর অবতরণ করার প্রয়োজনে জাপান এটি দখল করে। পর বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী মিত্র পক্ষের সহযোগী হিসেবে চীন দ্বীপটি যুদ্ধে পরাজিত জাপানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এর চীনা নাম রাখে 'তাই ওয়ান'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও এর বিশেষ কোন গুরুত্ব বা আকর্ষণ ছিল না।

১৯৪৮ সনে চীনের জাতীয়তাবাদী সরকার মূল চীন থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে আশ্রিত হওয়ার পর থেকেই সারা বিশ্বের কৌতূহলী দৃষ্টি এই দ্বীপটির ওপর আকৃষ্ট হয়। [illegible] উপেক্ষিত নয়। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ বিদেশী পর্যটক এখানে পাড়ি জমায়।

স্থান হিসেবে তাই-ওয়ানের এমন কিছু নৈসর্গিক আকর্ষণ নেই যেটা বিপুল সংখ্যায় ভ্রমণ-বিলাসীদের হাতছানি দিতে পারে। তবু যে লাখে লাখে বিদেশীরা সেখানে হানা দেয় তার মূলে রয়েছে মার্শাল চিয়াং কাইশেক-এর অনন্য সাধারণ দূরদৃষ্টি ও কর্মনিষ্ঠার ফলশ্রুতি দুটি অবদান। প্রথমটি এই দ্বীপটির বিস্ময়কর দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি যার ফলে আজ সারা এশিয়ায় (তেলসমৃদ্ধ আরব অঞ্চল বাদে) জাপানের পরেই এর স্থান। এর রাজধানী টাইপে শহরের পথে পথে ৮০/৯০ তলা আকাশচুম্বী অট্টালিকার জটলা যে অভাবনীয় সমৃদ্ধির সাক্ষর বহন করে সারা এশিয়ায় তার তুলনা মিলবে না।

এই দ্বীপটির দ্বিতীয় আকর্ষণ এর জাতীয় যাদুঘর (National Palace Museum) যার বিপুল পুরাকীর্তি সঙ্কলনশালায় এমন সব দুর্লভ সংগ্রহের সমাবেশ রয়েছে যেটা তাকে দুনিয়ার বিরল সুধীবৃন্দের কাছে দ্বীপটিকে তীর্থস্থানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে রেখেছে।

১৪০ বিঘা জমির ওপর মনোরম পরিবেশে বিরাট বহুতল দুর্গ প্রাসাদে স্থাপিত এই যাদুঘরটি বয়সে অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও এর সংগ্রহশালাতে দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন দ্রব্যাদির সঙ্কলন মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এখানে সংরক্ষিত কালজয়ী ঐতিহাসিক ও শিল্প নিদর্শনগুলির মোট সংখ্যা আড়াই লক্ষের ওপর। এর সবচেয়ে বৃহৎ ও মূল্যবান সংগ্রহ হোল দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি, সরকারী দলিল, বিভিন্ন যুগের মনীষীদের রচিত দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি যার মোট সংখ্যা ষেড় লক্ষেরও বেশী। অবিস্মরণীয় বিরাট সঙ্কলনের মধ্যে মহাচীনের পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের একশ বছর পরে পৃথিবীতে যে মানব শুভ সর্বপ্রথম সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, অহিংসা ও সুকৃতির [illegible]

বিধান দিয়েছিলেন সেই মহা মনীষী 'লাউৎজু' প্রবর্তিত তাও ধর্মের সংহিতা "তাও-তে কিং" বা একমাত্র পথ-এর পাণ্ডুলিপিটি এখানে অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে। চীনের দর্শনজন পূজ্য মহর্ষি 'কুং ফুৎ জু" (রোমান ভাষায় যাকে কনফুসীয়াস বলা হয়) এর ১ খণ্ডে রচিত পৃথিবীর প্রথম ইতিহাস গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সহ তাঁর রচিত যাবতীয় দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও ঐতিহাসিক পুথির পাণ্ডুলিপিও এই যাদুঘরের অন্যতম পরম সম্পদ। কুং-ফুৎ-জু ভারতের বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। তা ছাড়া প্রাচীন চীনের প্রখ্যাত দার্শনিক "মোৎ জু", "হান জু" ও "মেনসিয়াসের" রচিত পুঁথির পাণ্ডুলিপিও এখানে রয়েছে।

এই যাদুঘরেই প্রাচীন চীনের "জিং", "চ্যাং" ও "হান" বংশীয় খ্যাতিমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা, যুদ্ধাস্ত্র ও কারুকার্য শিল্প ও ভাস্কর্যের অনবদ্য নিদর্শনগুলি রক্ষিত আছে। এদের সংখ্যা ৫০ হাজারের ওপর।

মৃৎ শিল্পের বিস্ময় চীনা মাটির তৈরী মূর্তি, বাসন, উদ্যান ও গৃহসজ্জার নানা চমকপ্রদ উপকরণ যেটা চীনাদের আবিষ্কার ও জাতীয় গৌরব। এখানে রক্ষিত তার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির সংখ্যাও ১০ হাজারের ওপর। এ ছাড়া হরেক চীনা কারু শিল্পীদের নিপুণ হাতে আঁকা ১০০০ এর ওপর কারুকার্য চিত্র সংগ্রহটিও এই যাদুঘরের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ।

এখানে উল্লেখ্য জার্মানীর গটেনবার্গ শহরে পনেরো শতকে মুদ্রিত বাইবেল গ্রন্থটি এতকাল পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত পুঁথিরূপে চিহ্নিত ছিল। কিন্তু তাই-ওয়ানের যাদু ঘরে রক্ষিত তেরো শতকে ছাপানো কিছু বই থেকে প্রমাণিত হয় চীনই বিশ্বে মুদ্রণ শিল্পের পথিকৃৎ।

এখানে স্মরণীয় তাই-ওয়ানে কোন কালেই যাদুঘর ছিল না। বর্তমান যাদুঘরের যা কিছু সকলন তার সবটাই মূল চীন থেকে উদ্ধার হয়ে এখানে এসে পুনর্বসিত হয়েছে।

১৯৪৮ সনে মূল চীনে শত্রুপক্ষের হাতে পরাজিত হয়ে মার্শাল চিয়াং জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী ও অনুগামী দেশপ্রেমিকদের নিরাপত্তার তাগিদে তাই-ওয়ানে হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেন। সমুদ্র পথে ১৫০ মাইল দুস্তর পারাবার পাড়ি দিতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবহনের ব্যবস্থা নেই। বিপুল সামরিক বাহিনী সরকার, সরকারী দলিল ও আসবাবপত্র সহ ৫০ লক্ষাধিক হিজরতী মানুষের ভীড়। পথত প্রমাণ সমস্যায় বিব্রত মার্শাল চিয়াং। তবু এই জাতীয়তাবাদী মহান নেতার বিরুদ্ধ চেতনায় চীনের যাদুঘরে রক্ষিত পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলির নিরাপত্তার গুরুত্ব তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। কেন না এগুলি চীনের পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার গৌরবদীপ্ত পরিচয় বহন করে। আজ পরিচয়ের এই কালজয়ী গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন ছাড়া তাই-ওয়ানের নতুন উপনিবেশে মূল পরিচয়-হীন আজ বিস্মৃত অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা একটা সভ্য জাতির পক্ষে অর্থহীন। প্রাচীন গৌরবের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে কোন জাতির সমাজ চেতনায় আজ প্রত্যয় সকালে যেমন সম্ভব নয় তেমনি সভ্য জগতে তার পক্ষে উচ্চ মর্যাদার হকদার হওয়াও চলে না।

উপরোক্ত চিন্তা ভাবনা ছাড়াও দূরদর্শী চিয়াং এর মনের কোণে যে আশঙ্কা উঁকি দিতে থাকে মূল চীনের পরবর্তী ইতিহাসে সেটি যে মোটেই অমূলক ছিল না তার প্রমাণ মেলে। তাঁর আশঙ্কা হয় মূল চীনের নয়া শাসকরা কটর বস্তুবাদী। তাদের হাতে পড়ে চীনের পুরাকীর্তির নিদর্শনগুলি নিছক পুঁজিবাদী মানসিকতার বিকৃত রুচির পরিচায়ক হিসেবে হয়তো বিলুপ্তির পথে সংগতি লাভ করবে। এরূপ আশঙ্কা তাঁর মনে বদ্ধমূল হওয়ায় মার্শাল চিয়াং শত অসুবিধে সত্ত্বেও প্রাচীন চীনের সভ্যতা ও কৃষ্টির নিদর্শনগুলিকেও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাঁর হিজরতের সামিল করে নিয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি তাই-ওয়ানের বর্তমান যাদুঘর। এখানেই মহান নেতার অনন্য দূর-দৃষ্টির যে অম্লান স্বাক্ষর মেলে মানবের ইতিহাসে অনুরূপ নজির আর নেই।

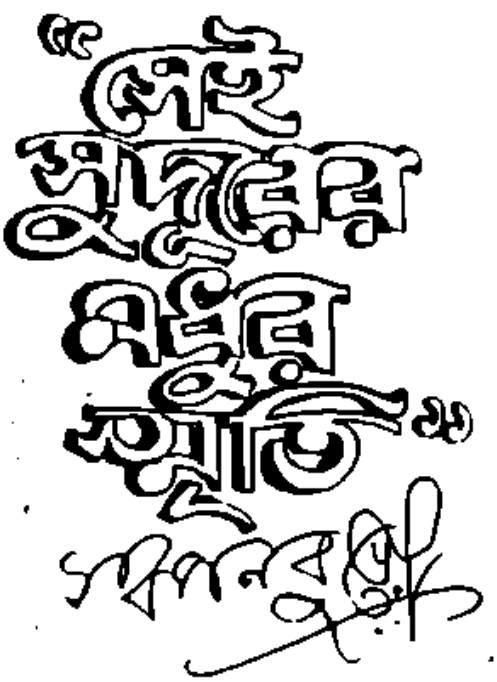

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(সাত)

আমরা আগে ছিলাম—ছাতুবাবুর বাজারের কাছে—কাশী ঘোষ লেনে।

এই ছোট গলিটি বিডনষ্ট্রীট থেকে বেরিয়ে মানিকতলায় পড়েছে। গোটাকয়েক বাড়ি শুধু এই গলিতে। আমাদের লাগোয়া বিডন ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে ডাঃ বটকৃষ্ণ রায় থাকতেন।

পরবর্ত্তী জীবনে এই বটকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে আমার খুব ছন্নাতা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য, আমাদের বয়সের অনেক তফাৎ কিন্তু বড় হয়ে আমি যখন ছোটদের জন্য গল্প লিখি, নাটক রচনা করি—তখন বটকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে ভালো করে মিশবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি সাহিত্য রসিক ব্যক্তি ছিলেন। ভালো অভিনয় করতে পারেন। ডাক্তার হয়েও সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন।

এক সময় সাহিত্যিকবৃন্দ 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করেছিলেন। তাতে এই বটু ডাক্তার আমাদের সঙ্গে নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেটা অবশ্য অনেক পরের কথা।

আমরা কিছুদিন কাশী ঘোষ লেনে থাকবার পর মামা স্থির করলেন, তাঁর কবরেজী ব্যবসা বাড়াতে হবে। বাড়ীতে চারজন ছাত্র রাখতে হবে। বাড়ীতেই নানা রকম শাস্ত্রীয় ঔষধ তৈরী করতে হবে। আমার মামা বিদ্যাভূষণ শ্যামাদাস কবিরাজের ছাত্র ছিলেন। সেই যুগে তিনি সুচিকিৎসক রূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন। আমরা আরো শুনলাম, মামা ঘোড়ার গাড়ী রাখবেন। সেই গাড়ী করে রোগীদের দেখতে যাবেন।

আমরাও মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই ঘোড়ার গাড়ীতে চাপতে পারবো। এই ভেবে কিশোর মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। গাড়ীতে চেপে মেসন্তর বাড়ীতে যাবার সুযোগও হবে।

ঘোড়ার গাড়ী চেপে রাস্তা দিয়ে টগবগ্ শব্দে গাড়ী কাঁপিয়ে এখানে ওখানে যাওয়া!

কল্পনা করেই মন আনন্দে নেচে উঠল। ব্যবসা বড় করতে হলে বড় বাড়ী দরকার। তখনকার দিনেও বাড়ী ঠিক করে দেবার জন্য লোক লাগানো হত। তাদের বলা হত বাড়ীর দালাল। তারা এসে খোঁজ দিত নানা রকমের বাড়ী খালি আছে। আজকালকার দিনে যেমন কলকাতার বুকের ওপর খালি বাড়ী মেলা ভারের কথা। তখনকার দিনে কিন্তু তা ছিল না। পথ চলতে গিয়ে—এখানে ওখানে, গলিতে কিম্বা বড় রাস্তায় সাইনবোর্ড হামেশা চোখে পড়ত—

"বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবেক।
তিতরে অনুসন্ধান করুন।"

এই ভাবে পথে পথে ঘুরেও বাড়ীর সন্ধান করা হত। এ ছাড়া বাড়ীর দালালরাও নানা রকম খবর নিয়ে আসত। বড়—তেতলা—কিম্বা দোতলা বাড়ী। সাত আটখানা বড় বড় ঘর—। সব ঘরে আলো হাওয়া খেলে। বড় রাস্তার ওপর—একেবারে দক্ষিণ খোলা। গাড়ী এসে একেবারে দরজায় দাঁড়াতে পারবে। মামা—মামী অমনি ছুটতেন বাড়ী দেখতে। কিন্তু খুঁত বেরোতই।

—বড় রাস্তার উপরে নয়—

—কিম্বা ঘরগুলো ছোট ছোট—

—জলের কল মাত্র দুটি! আরো কল চাই—

—দারুণার একান্ত অভাব—

—কবিরাজী ওষুধ তৈরী হবে কোথায় ?

এমনি নানা অসুবিধে মনে জাগত।

অনেক ঘোরাঘুরি, অনেক ছুটোছুটি, বহু দালালের আনাগোনার পর অবশেষে মনোমত একটি বাড়ী পাওয়া গেল।

বড় রাস্তার ওপর, ট্রাম রাস্তার ধারে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আলাদা বিরাট বাড়ী। অনেকগুলি ঘর—সামনে এক চলার দুপাশে দুখানি কামরা—। একটিতে মামা বসে রোগী দেখবেন, অন্যটিতে আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় খোলা হবে।

ভেতর বাড়ীতে দুটো উঠোন আছে।

সেখানে কবিরাজী ঔষধ জাল দেওয়া যেতে পারবে। আমরা থাকবো—দোতলার বিভিন্ন ঘরে। তেতলায় আলাদা ঘর আর ছাদও আছে। আসল কথাটাই বলা হয়নি।

এই বাড়ীর মালিক অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী। তাঁর নাম কে না জানে ?

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের প্রধানা শিষ্যা। এই বিনোদিনী দাসীর বয়েস তখন অনেক।

প্রতিদিন একটা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে এই বাড়ীর সামনে দিয়েই গঙ্গাস্নানে যেতেন।

কিশোর মন নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম। বিস্ময়ের সীমা থাকত না!

বড়দের কাছে গল্প শুনেছিলাম, এই বিখ্যাত বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে সে যুগের টার থিয়েটারের সামনে কত ল্যাণ্ডো, ফিটন, পালকী গাড়ী, ভাড়াটে গাড়ী এসে ভীড় জমাতো। দর্শক দল আসত দল বেঁধে।

কলকাতার নাচাগোদী মানুষেরা নাকি বিনোদিনী আর গিরিশ ঘোষের অভিনয় দেখে— "আহা মরি! আহা মরি!!" লোগান তুলিতে প্রেক্ষাগৃহ মুখরিত করে তুলতো।

শুধু কি তাই? কলকাতার বিলাসী-সৌখীন ধনী ব্যক্তিরা দামী দামী ফুলের তোড়া মঞ্চের ওপর ছুঁড়ে মারত। এই বিনোদিনী নাকি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে মঞ্চের ওপর অভিনয় করতে করতে নৃত্য করতেন হরিধ্বনি দিয়ে দর্শকবৃন্দকে ভক্তিরসে মাতিয়ে তুলতেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। চৈতন্যলীলার মনমুগ্ধকর অভিনয় দেখে অভিনেত্রী বিনোদিনীর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, "তোমার চৈতন্য হোক"। ঠাকুর পরে এই অপূর্ব অভিনয় সম্পর্কে শিষ্যদের সরস্বচ্ছলে বলেছিলেন সব সেই এক রকম দেখলাম। কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল বোঝার সাধ্যি নেই।

সতী আর সাধ্বী সব এক হয়ে গেল!

সেই আগের যুগের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকা এখন একা একা হেঁটে হেঁটে গঙ্গাস্নানে চলেছেন।

কেউ তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখছে না। মাস গেলে এই বিনোদিনী নিজেই এসে মামার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে রসিদ দিয়ে যেতেন।

যাই হোক—আমরা নতুন পাড়ায় এই নতুন বাড়ীতে এসে জাঁকিয়ে বসলাম।

বাড়ী অবশ্য নতুন নয়, তবে বিনোদিনী দাসী আগাগোড়া সারিয়ে রঙ্ করিয়ে ঝক্‌ঝকে করে দিয়েছিলেন। তেতলা পর্যন্ত অনেকগুলি কামরা। দুটো উঠোন, পেছন দিকে রান্নাঘর। একেবারে পেছনে ছোট একটু জমিতে একটা বাতাবী লেবু গাছ। সে শুধু একক দাঁড়িয়ে থেকে শোভা বর্দ্ধন করত, ফল ফলাতে তাকে কখনো দেখিনি।

পূর্ব পরিকল্পনা মত মামার শিষ্য ও ছাত্রের দল এসে গেল। এঁরা বাড়ীতেই থাকবেন, কবিরাজী ঔষধ তৈরী করবেন, হোমিও ফিল্টার নানাবিধ চূর্ণ প্রস্তুত করবেন, মকরধ্বজ, আসব, চ্যবনপ্রাশ, দ্রাক্ষারিষ্ট ইত্যাদি সালসা তৈরী করবেন।

সে এক এলাহী ব্যাপার।

সকাল থেকে রাবণের চুল্লী জ্বালানো হত। তাতে জাল চলছে ত' চলছেই।

এমনও দেখা যেত যে, সাত দিন ধরে সমান তাবে চুল্লী জ্বলছে—ঔষধ তৈরী হচ্ছে।

পালা করে ছাত্ররা সেই কাজে সজাগ-প্রহরী আছেন। আমার এই ছাত্রের দল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছিলেন।

টাঙ্গাইল থেকে এসেছিলেন দু'জন, সিরাজগঞ্জ থেকে একজন, আর বরিশাল থেকে একজন। এই চার মূর্ত্তি সারা-দিন ধরে অমায়ায়িক পরিশ্রম করে রাত্রিদিন ধরে ঔষধ প্রস্তুত করতেন। সকাল থেকেই তাঁদের নানাবিধ কাজ সুরু হত। আমরা একসঙ্গেই রান্নাঘরের পাশের ঘরে খাওয়া দাওয়া সারতাম দু বেলা।

সকালবেলা আমার কাছে নানা রকম রোগী আসতেন। আমা তাঁদের যথারীতি পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিতেন। ছাত্ররা সেই ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঔষধ পরিবেশন করতেন। উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করতেন।

অনেক বেলা পর্যন্ত এই কাজ চলত। তারপর স্নানাহার বিশ্রাম।

দুপুরের পর থেকে ছাত্রদল আমার কাছে বিধান, চক্র-দত্ত ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। প্রাচীন কালের টোলের মতো শিক্ষায় এটাও একটা বিশেষ অঙ্গ। অপরাহ্ণ পর্যন্ত এই শিক্ষাদান কার্য চলত।

আমি অবশ্য যথারীতি যথা সময়ে স্নানাহার শেষ করে ঘটিশ বিদ্যালয়ে চলে যেতাম।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ওপরেই ঘটিশ স্কুল। আমাদের এই নতুন বাসা থেকে খুব কাছে।

হেঁটেই যাতায়াত করা চলত।

তখনকার দিনে পথ চলবারও একটা বিশেষ আনন্দ ছিল। ফেরিওয়ালার চীৎকার, গাড়ীর ঘরঘর শব্দ আর দল বেঁধে ছেলেদের ইস্কুলের পথে যাওয়া—

তখনকার দিনে মেয়েরা এত ইস্কুলে পড়ত না। কাজেই তাদের ভীড় বিশেষ চোখে পড়ত না।

মেয়েরা অনেকে বাড়ীর গাড়ীতেই যাতায়াত করত। কিছু মেয়ে দারোয়ানের হাতে বই দিয়ে রঙীন ফ্রক পরে ইস্কুলে যেতো। বিভিন্ন স্কুলের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। নিজেদের পছন্দমত ফ্রক আর শাড়ী তাদের অঙ্গের শোভাবর্ধন করত।

ছেলেদের পোষাকের বিশেষ বালাই ছিল না। হাফ্ প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট—বছরের অধিকাংশ সময়। শীতের দিনে সোয়েটার অথবা কোট।

এই পাড়ায় এসে আমার এক বিশেষ বন্ধু জুটেছিল। রক্ষিতদের বাড়ীর ছেলে—নাম নীলমোহন রক্ষিত। হাতি-বাগানে ওদের বড় কাপড়ের দোকান ছিল। স্কুলে নীল-মোহনকে সবাই খুড়ো বলে ডাকত। বড়লোকের বাড়ীর গাবদা-গোবদা ভদ্রসা ছেলে—, কখনো টেরী বাগাতো না, খুবই ভালো মানুষ ছিল আমাদের এই সরকারী খুড়ো। পড়াশোনায় বেশ মনোযোগ ছিল। লেখাপড়ায় কখনো ফাঁকি দিত না। আস্তে আস্তে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলত।

সেই খুড়ো আমায় একদিন ডেকে বললে, অখিল, শোনো—আমি জবাব দিলাম, কি বলছ খুড়ো ?

খুড়ো বেশ ধীরে ধীরে কইলে, আচ্ছা, আমাদের মরণিং ওয়াক্ করলে কেমন হয় ? কাছেই ত হেদুয়া পুকুর রয়েছে—, তোর যদি আমরা শেষ রাত্তিরে উঠে হেদুয়াতে মরণিং ওয়াক্ করতে যাই, তাহলে স্বাস্থ্য ভালো হবে। পড়ায় বেশ মন বসবে। পরীক্ষার ফলও বেশ ভালো হবে। সব দিক দিয়ে সুবিধা।

শুনে একটু ভেবে নিয়ে আমি উত্তর দিলাম—, তোমার পরামর্শটা ত' মন্দ নয়। তবে শেষ রাত্তিরে আমায় ঘুম ভাঙবে কি করে ?

উৎসাহিত হয়ে উঠল খুড়ো।

বললে, সেজন্যে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমি শেষ রাত্তিরে এসে তোমার নাম ধরে ডাকবো। কয়েকদিন উঠলেই দেখবে অভ্যেস হয়ে গেছে। তখন আর ডাকাডাকির বালাই থাকবে না। দেখবে, না ডাকতেই আপনা থেকে ঘুম ভেঙে গেছে !

তারপর গলা খাটো করে খুড়ো একটু লজ্জা-জাগা সুরে জিজ্ঞেস করলে, খুব ভোরে ডাকলে তোমাদের বাড়ীর কেউ আবার রাগ করবে না ত' ?

আমি হেসে উত্তর দিলাম, না না, তোমার সে ভয় নেই। এ বাড়ীতে সারারাত ধরে অনেক সময় ওষুধ তৈরী হয়।

তুমি একবার ডাকলে আমায় ডেকে দেবার লোকের অভাব হবে না।

তারপর খুড়োর মহা উৎসাহে শুরু হয়ে গেল আমাদের রোজকার মর্ণিং ওয়াক।

সে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা।

শেষ রাত্রির ঝিমু ঝিমে থমথমে আবহাওয়া। গ্যাসের আলোগুলো কোথায়ও জোরালো, আবার কোথায়ও নিভু নিভু। কোন আলো চোখ টিপে যেন ইসারা করছে। আমরা দুই কিশোর বীর এগিয়ে চলেছি যাত্রার অন্বেষণে।

পথে একটি জন প্রাণী নেই।

কোথাও একটি কুকুর হয়ত আচমকা পায়ের শব্দ শুনে ভোক ভোক করে ডেকে উঠল।

আরো একটু এগিয়ে গেলে বিডনস্ট্রীটের মোড়ে হয়ত দেখা গেল লম্বা হোস পাইপ দিয়ে কর্পোরেশনের লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে। সঙ্গে আর একটি লোক জল বন্ধ করবার চাবি হাতে নিয়ে।

দু'চারজন বুড়ো নাম গান করতে করতে বিডন স্ট্রীট ধরে নিমতলার গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর আমরা চলেছি দুই কিশোর বীরদর্পে—কখনো কুকুরের ডাকে সন্ত্রস্ত হয়ে, কখনো কর্পোরেশনের জলে ভিজে যাবার ভয়ে, আবার কখনো পাহারাওলার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে। মোট কথা মর্ণিং ওয়াক করে আমাদের স্বাস্থ্য সুন্দর করতে হবে।

একদিন কিন্তু ভারি মজার ব্যাপার ঘটেছিল। খুড়ো এসে ডেকেছে। আমি ঘরবারীতি বেরিয়ে এসেছি। সেদিন দেখি—রাস্তা একেবারে শুনশান্।

কোনো জ্যান্ত প্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাসের আলোগুলো মাঝে মাঝে একচক্ষু দানবের মতো দাঁড়িয়ে ওরা দেখাচ্ছে।

আমাদের পায়ের শব্দ শুনে যেন আমরাই চমকে উঠছি। চলেছি ত' চলেছি—

(শেষাংশ ৩৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র ত্রিখণ্ডে	১৬.০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২.০০
৩।	শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫.০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩.০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২.০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫.০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২.০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	৪.০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪.০০

শ্রীপ্রতিভা রায় রচিত

১।	নারীপ্রগতির জয়কথা	৩.০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫.০০

রেণু মিত্র রচিত

১।	পরম পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল	২.০০
২।	পরমচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫.০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩।	রবীন্দ্র দর্শন	৪.০০
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪.০০

নরনারায়ণ আশ্রম

গ্রাম : বাগুইআটি / পো : অশ্বিনীনগর

কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৪৭ ২৫৪০

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ দাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বারো

'তুমি বললে তুমি এসেছো, দু-তার চরণের তলে গোলোকবিহারী নারায়ণ, নবরূপে তুমি এ ভুবনে জন্ম নিয়েছো। কিন্তু কোথায় তুমি ? কোথায় তুমি পতিত উদ্ধারণ নারায়ণ আমি চারদিক আঁতিপাঁতি করে খুঁজছি, কিন্তু কোথাও যে তোমার দেখা পাচ্ছি নে।

তবে কি, তবে কি তোমার আশ্বাস মিথ্যে প্রভু ? ছলনাময়, তবে কি তুমি আমার সঙ্গেও ছলনা করছো। বলো, সত্যি কথা বলো প্রভু। তোমার আশ্বাস কি তবে মিথ্যে ?'

'অদ্বৈত, আমি এসেছি।'

অদ্বৈতাচার্য ঠাকুর ঘরে ছিলেন। ঠাকুরের চরণে চোখের জল রাখছিলেন।

বাইরের শব্দে তিনি চমকে উঠলেন।

'অদ্বৈত, আমি এসেছি।'

সে শব্দে রোমাঞ্চিত হলেন তিনি। ধড়ফড় করে আসন ছেড়ে উঠলেন।

'প্রভো, তুমি এসেছো ? আমার দুলাল ঠাকুর তুমি এসেছো ?' বলে দৌড়ে বাইরে এলেন তিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে নিমাই।

নিমাই বললে, 'আমি এলাম আচার্যদেব। একটা কথা বলতে এলাম। আচ্ছা আপনার বোষ্টমেরা কেমন ধারার লোক বলুন তো ?'

অদ্বৈতাচার্যের মুখে কথা নেই। অবাক বিস্ময়ে তিনি নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। চোখে পলক পড়ছে না।

নিমাই আবার বললে, 'বোষ্টমেরা আমায় দেখে পালায় কেন ? আমি কি খারাপ ছেলে ? আমাকে দেখে ওদের অতো ভয় কিসের ?'

অদ্বৈতাচার্যের যেন ধ্যান ভাঙে। যে ছবি এতোক্ষণ তাঁর মনের পর্দায় এঁকে ছিল, বাইরের চাওয়ায়, রোদের আলোয় যেন সে ছবি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। সে ছবির সঙ্গে তিনি যেন পরলোকগত জগন্নাথ মিশ্রের কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইয়ের কোন মিলই খুঁজে পান না। নিমাইয়ের রূপ আছে, তার টানা টানা চোখ দুটিও উজ্জ্বল। কিন্তু সে চোখে সে গভীরতা কোথায় ? কোথায় সে প্রশান্তি ?

নিমাই সাধারণ। নবদ্বীপের আর দশটি ছেলে ছোকরার মতোই সাধারণ সে কি কোনদিন গোলোকপতি নারায়ণ হতে পারে ? অল্প বয়সে বিদ্যা সে অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু বিদ্যার ভূষণ যে বিনয়, সে বিনয় তার নেই। নিমাই কখনো গোলোকপতি হতে পারে না।

কিন্তু তবুও নিমাইকে দেখলে আনন্দ হয় আচার্যের। দুলাল জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র সে, পরম ভাগবত বিশ্বরূপের ভাই। তাকে দেখে যে তাঁর আনন্দ হবারই কথা। চপল বলেই তো আর তিনি তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। তার অভাবে আচার্য নিমাইকে দেখবেন, এই ভরসা নিয়েই না জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গে গেছেন।

আচার্য কি সে কথার খেলাপ করতে পারেন ?

পারেন না।

তাই নিমাইকে আজও কাছে ডাকলেন আচার্য। বসতে বললেন পাশে।

নিমাই বললে।

বলতে বলতে বললে, 'আপনার বোষ্টমেরা আমায় দেখে পালায় কেন আচার্যদেব ?

অদ্বৈতাচার্য হাসলেন।

বললেন, 'ছেলে বলেই যে তোর শিং হয়েছে রে। পাছে তুই তাদের গুঁতিয়ে দিস, এই ভয়েই তারা সবাই পালায়'।

আচার্যদেবের মুখে আবার সেই হাসি।

নিমাইয়ের অভিযোগ মিথ্যে নয়। রোজ বিকেলে গঙ্গার তীরে বেড়াতে যায় সে। কোন কোন দিন দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবও সঙ্গে থাকে। বৈষ্ণব দেখলেই তার মাথায় যেন একটা দুষ্টু বুদ্ধি চাড়া দিয়ে ওঠে। সে তাঁর কাছে যায়।

বলে, 'আপনাদের হরি কেমন মশাই ? দেখেছেন তাকে চোখে ?'

'রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ'—হাতের নামের মালাটা কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে বৈষ্ণব উত্তর করেন, 'সে ভাগ্যি কি আমার হবে বাবা, আমার মতো পাপাত্মা কি কোন দিন তাঁর দর্শন পাবে ?'

'তা কোন দিনই পাবেন না। কারণ হরি বলে কোন মহাপুরুষ নেই। কোনদিন ছিলেন ও না।' বলে নিমাই হো: হো: করে হেসে ওঠে।

'রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ' বলে বৈষ্ণবটি কানে আঙুল দিয়ে পালায়।'

শুধু এ কথাই নয়। নিমাইয়ের আরও অনেক জিজ্ঞাসা! অনেক তত্ত্ব কথা। প্রশ্নে প্রশ্নে বৈষ্ণবদের সে জর্জরিত করে ফেলে।

বৈষ্ণবরা তার সব কথার উত্তর দিতে পারেন না। পারেন না বলেই মাঝপথে তাঁরা কথা বন্ধ করেন। কথা বন্ধ করে পথ ছেড়েন।

নিমাইও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে-ও তাঁর পিছু নেয়। বলে, 'যা-রে! পালাচ্ছেন যে বড়ো, আমার কথার উত্তর দিয়ে যান।' বৈষ্ণব সে কথায়ও কান না দিয়ে হনহন করে কোন গলিতে ঢুকে পড়েন।

নিমাইয়ের মুখে আবার সেই হো:-হো: করা হাসি। আবার সেই ব্যঙ্গ। বৈষ্ণবের বুকে সে ব্যঙ্গ যেন কাঁটার মতো ফোটে।

কাজেই বৈষ্ণবেরা আজকাল আর নিমাইয়ের কাছে আসেন না। তাঁরা জানেন, নিমাইয়ের পেটে অনেক প্রশ্নের কণা গজগজ করছে। তাঁদের কাছে পেলেই সে সেগুলি ছুঁড়ে মারবে।

তার চেয়ে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো।

বৈষ্ণবেরা তাই তাকে এড়িয়ে যান।

নিমাই আচার্যের কাছে সেই অভিযোগই করলে। অদ্বৈতাচার্য বললেন, 'বিশ্বাস, বুঝলে নিমাই, বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেই সব হয়। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' তর্কে ধূলিরই ঝড় ওঠে, আসল বস্তু তাতে আরও ঝাপসা হয়ে যায়। বৈষ্ণব তাই যুক্তির চেয়ে, বুদ্ধির চেয়ে বিশ্বাসকেই বড়ো জ্ঞান করে। তাই তারা তর্ক এড়িয়ে যায়।

নিমাই বলে, 'বিশ্বাস তো অন্ধ। তার তালো-মন্দ জ্ঞান নেই। মানুষকে কি তবুও সেই অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই পড়ে থাকতে হবে ?

'অন্ধ বিশ্বাস কোনদিনই মনে গভীর দাগ কাটে না নিমাই। মনে সে দাগ ফেলতে পারে। সে দাগ টেঁকে না। ক'দিন পরেই আবার তা মুছে যায়। কিন্তু যা সত্য, যা শাশ্বত, তা মোছে না। জোর করেও তা মুছে ফেলার উপায় নেই। এই সত্য বিশ্বাসই মানুষের মনে জোর আনে। মানুষকে বড়ো করে। মহৎ করে।'

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'সে সব কথা বুঝবার বয়েস এখনও তোমার হয়নি নিমাই। বড়ো হও, তখন নিজেই তুমি সব বুঝতে পারবে।'

নিমাই আবার তর্ক জুড়তে গিয়েছিল।

কিন্তু আচার্যদেব তাকে বাধা দিলেন।

বললেন, 'ছি: ছি আর তর্ক নয় নিমাই। আমার পথ বিশ্বাসের পথ। বিশ্বাসের নাওয়েই আমরা বাধার উজিয়ে চলেছি। এই বিশ্বাস নিয়েই থাকতে চাই।'

'তাই বলে ভালো-মন্দ বিচার করে দেখবেন না? কোনটা সাচ্চা আর কোনটা ঝুটা, তা খতিয়ে দেখবেন না কোন দিন?'

আচার্য বললেন, 'না, তারও প্রয়োজন নেই।'

একটু থেমে আবার বললেন, 'আচ্ছা নিমাই, লেখা-পড়া তো অনেক করলে, কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলো দেখি এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কতোটুকু জ্ঞান তাতে আহরণ করতে পেরেছো? কতোটুকু তুমি জেনেছো? কিছু না—বুঝলে নিমাই, কিছুই না, জ্ঞান সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আমরা ক'টি বালু কণা হাতে নিয়েছি মাত্র, সামনে অন্তহীন পারাবার। সে পারাবার পেরোবার ক্ষমতা আমার তোমার কারো নেই।'

নিমাই নিশ্চুপ। দু'আনি টলটল করা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে আচার্যের মুখের দিকে। আচার্যের মনের গভীরে যেন সে ডুব দিয়েছে। আচার্য আবার বললেন, 'চাই বিশ্বাস, বুঝলে যে, চাই বিশ্বাস। জ্ঞান যেখানে ফতুর হলো, বিশ্বাসের জন্ম সেখানেই। জ্ঞানের পা যেখানে পড়ে না, বিশ্বাসের নৌকো সেখান দিয়ে ভর্ ভর্ করে বয়ে যায়। আমরা সেই বিশ্বাসের নায়ের সোয়ারী, কাজেই আমাদের তর্ক নেই, যুক্তি নেই। আমাদের পাণ্ডিত্যও নেই। আমরা সব ছেড়ে একটা ধরেছি। তারই নাম বিশ্বাস।'

নিমাই উঠলো।

আচার্য বললেন, 'কি উঠলে যে বড়ো।'

'কাজ আছে।'

'আমার কথাগুলি বুঝি মনে ধরলো না?

নিমাই সে কথার উত্তর দিলেনা। মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলো সে।

যতোদূর দেখা যায় অদ্বৈতাচার্য সে পথের দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

তের

দেখতে দেখতে দিন কাটলো।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠিতে নিমাইয়ের পড়া শেষ। গঙ্গাদাসের যা ছিল তার সব কিছুই নিমাইকে উজাড় করে দিয়েছেন তিনি। আর নেই, আর কিছু নেই।

গঙ্গাদাস একদিন নিমাইকে ডাই বললেন, আমার পুঁথি তো ফুরলো নিমাই, এবারে কি করবে বলে ঠিক করলে?

নিমাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

গঙ্গাদাস আবার বললেন, না, না, এতে তো লজ্জার কিছু নেই নিমাই, আমার যা কিছু ছিল, তার সবই তো আমি তোমায় দিয়েছি। দিতে পেরে আনন্দ পেয়েছি। ঈশ্বরাশীর্বাদ পেয়েছি, আমারই বা আর কি? আমার স্নেহের সঙ্গে আমার বিদ্যেও তো নষ্ট হতো। সেই বিদ্যেই আমি তোমার মধ্যে রেখে গেলাম। এ আমার আনন্দ, এ আমার সান্ত্বনা। বলতে বলতে গঙ্গাদাসের দু'চোখ ভরে জল এসে পড়েছিল।

উত্তরীয়ের এক প্রান্তে সে জল মুছে গঙ্গাদাস আবার বললেন, 'জ্ঞানের কোথাও শেষ নেই নিমাই। আমি যেখানে থেমেছি, তুমি কিন্তু সেখানে থেমে যেয়ো না। আরো চলো, চলো, এগিয়ে চলো। নতুন নতুন জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করো। নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করো।'

একটু থেমে হঠাৎ আরও উচ্ছ্বসিত স্বরে গঙ্গাদাস আবার বললেন, পারবে, তুমি পারবে। আমি যা পারিনি, তুমি তা পারবে। হ্যাঁ, আমি বলছি। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি পারবে। অগস্ত্যের মতো তুমি জ্ঞানের সমুদ্র শোষণ করবে। আবেগে গঙ্গাদাস নিমাইকে জড়িয়ে ধরেছিল।

নিমাই বললে, 'যদি আজ্ঞা করেন তো, 'ন্যায়'টা এবারে পড়ে নেবো।'

'বেশ তো। ভালো কথা। এতে সংকোচের কি আছে? জীবন্ত ন্যায়শাস্ত্র বলতে বাসুদেব সার্বভৌম। তুমি তাঁর কাছে যাও। ন্যায়ের পাঠ নাও। তোমার মতো ছাত্র পেলে তো তিনি লুফে নেবেন।'

বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে অনেক ছাত্র। নানান বয়সের। নানান দেশের।

নিমাই সেই টোলে গিয়েই ভর্তি হলো।

টোলেরই এক ছাত্র রঘুনাথ। নিমায়ের থেকে বয়সে একটু বড়।

কিন্তু তা হলেও নিমায়ের সঙ্গে তার গলায় গলায় ভাব। এক সঙ্গে ওঠা। এক সঙ্গে বসা। নিমাই আর রঘুনাথ — অভিন্ন হৃদয় দুই বন্ধু।

সেই রঘুনাথ একখানি বই লিখছিল। ন্যায়ের বই। আশা তার, এই বইয়ের ভেতর দিয়েই সে বেঁচে থাকবে। লোকে তার নাম বলবে। বলবে, রঘুনাথ অদ্বিতীয় ন্যায়ের পণ্ডিত। ন্যায়ের সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছে, রঘুনাথ সেই অমৃতই রেখে গেছে তার বইয়ের পাতায় পাতায়। রঘুনাথ অমর। রঘুনাথ অবিনশ্বর।

রঘুনাথ একদিন শুনলে যে নিমাইও একখানি ন্যায়ের বই লিখছে। শুনে মুখ শুকিয়ে গেলো রঘুনাথের। নিমাই তার বন্ধু। তার প্রতিভার কথা রঘুনাথের অজানা নয়। সেই নিমাই যদি ন্যায়ের বই লেখে, তা হ'লে রঘুনাথের বই আর কে পড়বে?

রঘুনাথের ললাটে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো। কথাটা সে নিজেই একদিন জিগ্যেস করলো নিমাইকে।

'হ্যাঁ রে, বই লিখছিস শুনলাম?' রঘুনাথের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হলো নিমাই। একবার কি যেন চিন্তা করলো।

তারপর মৃদু হেসে বললো, বই? ন্যায়ের বই? তা লিখবার চেষ্টা করছি ভাই। জানিনে কি হবে।

'আমায় একবার দেখাবি নিমাই।' রঘুনাথের দু'চোখে অসীম কৌতূহলের আলো জ্বলে উঠলো।

নিমাই বললো, 'তা দেখাবো না কেন? নিশ্চয়ই দেখাবো। কালই দেখাতে পারি।'

'হ্যাঁ কালই। কাল যখন গঙ্গার তীরে বেড়াতে আসবি, খাতাখানি তখন হাতে ক'রে আনিস। যেন ভুলিস নে যেন।'

নিমাই মাথা নেড়ে জানালো যে সে তা ভুলবে না।

একটা দুশ্চিন্তার রাত কাটলো রঘুনাথের। পরদিন বেলা পড়তে না পড়তেই সে গিয়ে হাজির হলো গঙ্গার তীরে।

নিমাই আগেই এসেছিল।

রঘুনাথ তাকে বললো, 'এনেছিস?'

'হুঁ।'

তবে চল একটা নৌকায় উঠি। নৌকোয় বেড়াতে বেড়াতে তোর পুঁথি শুনবো 'খন।'

'তাই চল্।'

বলে নিমাই একটি নৌকোয় উঠলো। উঠলো রঘুনাথও।

মাঝি নৌকোটিকে মাঝ গঙ্গার দিকে নিয়ে চলেছে। সূর্য গড়িয়ে পড়ছে পশ্চিমে। তবুও তার মুখে বিদায় মুহূর্তের রক্তিমাভা লাগেনি। এখনও তার মুখে আলো আছে। সোনার আলো। সে আলোতে গঙ্গার জল সোনার সোনা।

নৌকোয় দু'বন্ধু পাশাপাশি বসেছে। পাশাপাশি বসলেও দু'জনের মন এখন যেন আর কাছাকাছি নেই। একটা ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় দু'জনের মনই যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়েছে। সে দেশের কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

প্রথমে নীরবতা ভাঙলো রঘুনাথই। বললো, 'চুপ ক'রে রইলি যে বড়ো? তোর বই পড়বি নে?'

'হুঁ।, পড়ছি।' বন্ধুর কথায় নিমাই যেন কোন্ উচ্চ শিখর থেকে নেমে এলো।

'তা হ'লে পড় না। ও দিকে বেলা পড়ে এলো না?'

নৌকো চলেছে গঙ্গার জল কেটে। দু'পাশে তার ছপ্‌ছপ্ শব্দ।

নিমাই পড়া সুরু করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখ কালো হয়ে গেলো রঘুনাথের। তার মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা অস্বস্তির রেখা।

দু'চোখে জল।

নিমাইয়ের তা দৃষ্টি এড়ালো না।

পাঠ বন্ধ রেখে সে তাই বললো, 'কি রে, কাঁদছিস? চোখে তোর জল?'

সে জল লুকালো না রঘুনাথ। লুকাবার কোন চেষ্টাই করলো না।

নিমাইয়ের কথায় সে জল বরং বেড়ে গেলো।

বললো' 'ন্যায়ের পুঁথি আমিও একখানি লিখেছি নিমাই। সে কথা কাউকে এদ্দিন বলিনি। ভেবেছি,

হঠাৎ প্রকাশ করে সবাইকে আমি চমকে দেবো। সে পুঁথি আমায় অমর করবে। সবাই আমায় নাম করবে। কিন্তু—'

'কিন্তু' পর্যন্ত বলেই আবার থামলো রঘুনাথ। চোখের জল তার বাধ মানছে না। আবেগে গলাটা যেন ধরে ধরে আসছে।

একটু থেমে রঘুনাথ আবার সুরু করলো। 'কিন্তু আমার সব সাধ, সব আশা ধুলায় গড়ালো নিমাই। তোর পুঁথির পাশে তো আমার পুঁথির স্থান হবে না। এ যে নিছক ছেলেখেলা।'

'না।'

নিমাইয়ের কণ্ঠ থেকে এই 'না' কথাটা হঠাৎ যেন বেরিয়ে গেলো।

বললো, 'না, সৌড়ে তোর পুঁথিই শ্রেষ্ঠ ন্যায়ের পুঁথি হবে রঘুনাথ। তুই-ই শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রীর মর্যাদা পাবি।'

'কি করে?'

'এই ভাবে।' বলতে বলতে নিমাই তার হাতের খাতাটি সজোরে জলে ছুঁড়ে দিল। টুকরো টুকরো ঢেউয়ে বার কয়েক পড়িয়ে খাতাটা এক সময় অতলে তলিয়ে গেলো।

রঘুনাথ প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'নিমাই।'

'ও' থাক্ রঘুনাথ। যে তোর সাধ পুরবে বাদ সাধবে, তাকে ওখানেই যেতে দে।' বলে নিমাই একবার হাসলো।

রঘুনাথের বিস্ময়ের শেষ নেই।

রঘুনাথ দেখলো, নিমাই যেন আর সেই নিমাই নয়। তার ন্যায়ের টোলের বন্ধু নয়, যেন এক মহৎ প্রাণ তার বন্ধু হয়ে তারই পাশে বসে মিটি মিটি হাসছে।

ন্যায়ের মারি সব না বুঝলেও, দেখে-শুনে কিছু একটা ঠাহর করেছিল। সে-ও একটা গভীর বিস্ময়ে নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

স্রোতের টানে তাটির নাও, আপনিই তাটির দিকে এগিয়ে চলেছে।

"সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি"

(৩১২ পৃষ্ঠার পর)

যেন একেবারে নিষুম পুরী—

রাস্তায় জল দেবার মানুষ নেই—!

ঘুড়োবা কেউ গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে না—

একটা খেয়ো কুকুর পর্যন্ত পথের ধারে ডেকে উঠছে না।

হোটেলে ঢুকতে যাবো—

এমন সময় দেখি দুটো পাহারাওলা খৈনি টিপতে টিপতে ওইদিক দিয়েই যাচ্ছিল—

তাদের লাল বদানো শক্ত জুতোর কঠিন আওয়াজ খট্ খট্ শব্দ তুলছিল—ফুটপথের ওপর।

আমরাও দুই বীর ধমকে দাঁড়ালাম।

একটি পাহারাওলা শুধোলে, কাঁহা যায়েগা লেড়কা বাবু?

ঘুড়ো জবাব দিলে মনিং ওয়াক্—

পাহারাওলা দুটো হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর মুখ বেঁকিয়ে জবাব দিলে, রাত তিন বাজে মর্ণিং ওয়াক····· হা—হা—হা···

আর একজন রসিকতা করে বললে—

আরে লেড়কা লোক চোটা হ্যায়···! চুমি করকে ভাগতা হ্যায়—আবার সেই প্রাণ কাঁপানো হো-হো হাসি!!

[চলবে]

লালন ফকিরের জীবনে ধর্ম

ডা: হরিদাস সাহা

জন্মসূত্রে লালন হিন্দু। ১১৮১ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম এক কায়স্থ পরিবারে। বাল্যাবস্থা থেকেই তাঁর পরিচয় ধর্মভাবাপন্নরূপে। শুরু থেকেই তাঁর পথ চলা ধর্মের নামে। পাঠ্য পুস্তকীয় শিক্ষা তিনি লাভ করেন নি বলেই অনেকের ধারণা; কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা যে তিনি পর্যাপ্ত পেয়েছেন তা তাঁর পরবর্তী জীবনে সুস্পষ্ট। ধর্মের পথেই তিনি এগিয়ে চলেন। বাল্য বিবাহের যুগে বালোই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু ধর্মীয় পথ চলা ব্যাহত হয় না তাতে। এগিয়ে চলেন তিনি। গ্রামের প্রতিবেশীদের সঙ্গে একবার যাত্রা করেন অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। জগন্নাথদেবের দর্শন আকাঙ্খা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতবাদ নেই, যা রয়েছে তা ধারণা মাত্র। শ্রীক্ষেত্রে যাবার পথেই হোক বা সেখান থেকে ফেরার কালেই হো'ক এক অঘটন ঘটে যায়, পথিমধ্যে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সহযাত্রী পুণ্যার্থীরা মানবতার চরম অবমাননার মাধ্যমে সীমাহীন অপুণ্য সঞ্চয় নিয়ে পথিমধ্যে রোগাক্রান্ত অসহায় মানুষটিকে ফেলেই ফিরে আসে দেশে, সেখানে তারা প্রচার করে লালনের মৃত্যু সংবাদ। কিন্তু বিরাটত্ব যার তত্ত্বে অপেক্ষমান তাঁর মৃত্যু কি এত সহজে হয়। লালনের মৃত্যু হয়নি তখন, মৃত্যুহীন জীবনের সঙ্গে অপর এক জীবনের দেখা হয়, নাম তাঁর সিরাজ ফকির। সঙ্গে তাঁর ঐ। উভয়েই দয়াপরবশ হয়ে ধর্মের এক চূড়ান্ত উদাহরণ সৃষ্টি করে সঙ্গে নিয়ে যান রোগে অজ্ঞান অসহায় মানুষটিকে। গৃহে তাঁদের সেবা শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন লালন। সমবর্ণী দুটি মানুষের নাটকীয় মিলনে ঐ মানুষটির জীবন হয়ে ওঠে আরও গতিশীল—তখন থেকেই তাঁর পরিচিতি লালন ফকির রূপে।

এর পরেও লালন হিন্দু? না, তদানীন্তন তাবৎকর হিন্দু সমাজ স্বীকার করেনি তাঁকে হিন্দুরূপে। সুস্থ হয়ে একবার দেশে ফিরে ছিলেন লালন। অভ্যর্থনা পাননি, পেয়েছিলেন তিনি অবহেলনা, নিষ্করুণভাবে। জীবন ফিরে পাবার অপরাধে হয়েছিলেন ধর্মচ্যুত, ভিরস্কার জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে। সামান্য কারণেও শুধু পরিত্যাগ করতে জানতো যে নিষ্ঠুর সমাজ সেই সমাজ অপমানিত করেছিল তাঁকে।

চলাই লালনের ধর্ম, ফেরা নয়। ফিরতে যাননি লালন, গিয়েছিলেন চলতে, নিষ্পাপ সরল সুন্দর বালিকাটিকে সঙ্গে নিয়ে চলতে। কিন্তু সাথীকে জানেনি লালন, ঐ সঙ্গের সাথী হয়নি। ছোট্ট মেয়েটিরই বা দোষ কি তাতে। যে মানুষটির একবার মৃত্যু হয়েছিল তাঁর সাথী হবে সে কি করে। ছোট মেয়েটি ভুতুড়ে মানুষটির সাথী হবার সাহস পাবে কোথা থেকে। মৃত স্বামীর যে বিধবা বালিকা স্ত্রীকে শিশু হিইয়ে যুতি ধরিয়েছিল তাকে আবার স্বামীর সঙ্গিনী করে অধর্মই বা করে কি করে কঠোর সমাজ!

তবে কি লালন মুসলমান? অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর-উদ্দিন সাহেবের তাই অভিমত। সুর সাহেবের পরিচয়, লোকমুখে শোনা লালনের অনেক গান সংগ্রহ করে তিনি 'হারামনি' পুস্তকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করেছেন আর এভাবেই তিনি বহু সাহিত্যের প্রভূত উপকার করেছেন। সেই মনসুর সাহেব লালনকে মুসলমান আখ্যা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন—'লালন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।'

সত্যিই কি লালন মুসলমান ছিলেন? প্রকৃতই কি তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? এ সব প্রশ্নের উত্তর লালনের জীবন ও জীবনীতে মিলবে। লালনের জন্ম ১১৮১ বঙ্গাব্দে, দেহত্যাগ করেন তিনি ১লা কার্তিক, ১২৯৭ বঙ্গাব্দে—জীবিত ছিলেন ১১৬ বছর। এই সুদীর্ঘ জীবনে গান রচনা আর সেই স্বরচিত গান গেয়ে বেড়াই ছিল লালনের ধর্ম কর্ম। এই গানগুলোই ছিল তাঁর জীবনে ধ্যান ধারণা, এগুলোই তাঁর জীবনবাদ। এই গজীতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলোর অধিকাংশই দেহতত্ত্ব মূলক, মনকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া, উদ্দেশ্য অন্তরের গুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা। বাকী গানের খুব সামান্য কয়েকটিতে রয়েছে ধর্মস্থান বলা ও ধর্মগ্রন্থ কোরাণের দু'চারটি কথা। দু'একটি গানে ব্যবহৃত হয়েছে উর্দু, আরবী শব্দ। এরূপ একটি গানের অংশ বিশেষে তিনি গেয়েছেন—

রূপ-ডুবারী 'মানুষ'-রত্না,
ওরূপসাগরে ডুবে দেখ না
ধারা সামলারে।
ফকির লালন বলে সে যে গুরু মক্কা,
আদি ইমাম সেই ঘিজে ॥

অপর একটি গানের প্রথম কলি—

এমন দিন কে হবে আর।
যোগী সেই করে সেল গমুল রূপে অবতার ॥

এরূপ দু'একটি গান দিয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, লালন মুসলমান ছিলেন। মোহতর মুলক গানগুলোকে বাদ দিয়ে অপর গানগুলোর অধিকাংশ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান অসীম। হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা দেখে বলা যায়, তিনি একজন হিন্দু, শুধু হিন্দু নয় একজন উঁচুদরের হিন্দু। অবশ্য তাঁর এই হিন্দুধর্ম-প্রীতি বেদ-বহির্ভূত হিন্দুধর্ম-প্রীতি ছাড়া আর কিছু নয়। বেদের নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। দু'একটি গানের স্থানে স্থানে তার উল্লেখও তিনি করেছেন।

একটিতে বলেছেন—

বৈদিক বেদে ঘোর অন্ধকার,
উদয় হয় না দিনমণি।

কিন্তু অধিকাংশতেই রূপ তাঁর অন্য। একটি গানের এক অংশে তিনি গেয়েছেন—

প্রহ্লাদ চরিত্র দেখ, কত কষ্ট তার হলো,
কৃষ্ণ নামে তার আগুনে ফেলিল,
জলে ডুবাইল, তবু না ছাড়িল শ্রীনাম-সাধনা ॥

অন্য একটি গানের অংশ বিশেষে তিনি গেয়েছেন—

ধর্ম প্রভু জগন্নাথ
চায় না যে সে জাত-অজাত,
ভক্তের অধীন সে।

অপর গানের একটি অংশ—

গোপী প্রেম জানে কারা—
শুদ্ধ রসের ভ্রমরা যারা।

শ্রীকৃষ্ণের অবতারে তিনি বিশ্বাস করেন, গানে শ্রীকৃষ্ণকে তিনি 'অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি' বলে ডেকেছেন আর সেই কৃষ্ণ প্রেমের কীর্তন করেছেন একটি গানে—

কৃষ্ণ-প্রেম যার মনে,
তার বিচার সেই তা জানে।

এরূপ অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে লালনের হিন্দুত্ব প্রমাণ করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু একটু গভীরে গেয়ে পর্য্যালোচনা করলেই তাঁকে বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এক ধর্ম ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার মত মানসিক প্রবৃত্তির অধিকারী তিনি ছিলেন না। কারণ ধর্মে-ধর্মে তিনি কোন প্রভেদ দেখেননি, হিন্দু ও মুসলমান ধর্মে কোনো বিভেদ বোঝেননি।

লালন গেয়েছেন—

কে যে হিন্দু আর কে যবনের চেলা,
ওরে পথের পথিক চিনে ধর এই বেলা ॥

তাঁর অপর একটি গানের অংশ বিশেষ—

রোজা পুজা করলে পরে
আছে সুখের কার্য হয় রে।

লালন নিজের পরিচয় দিয়ে একটি গানে গেয়েছেন—

সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে।
লালন কয় জাতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।

এই গানের অন্যত্র তিনি বলেছেন—

কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে।
গর্ভে যেলে কুলজল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র অনুসারে ॥

(শেষাংশ ৩৮৩ পৃষ্ঠায়)

॥ ছোট গল্প ॥

সপ্তবালার মা

দুর্গা গোস্বামী

সপ্তবালার মা কল্যাণী দু'দিন হ'ল একটা নতুন ঘর বেঁধেছে।

এই নিয়ে সেদিন রেললাইনের ধারের বড় বস্তীটায় হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড।

প্রায় সমস্ত বস্তীটাই মোড়ল দুখীরামের চালাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সকলেরই দাবী এর একটা বিহিত করতেই হবে।

এই বস্তীর আলো, জোয়ান মদদের বুকের কল্‌তে কল্‌যাণী,—কল্‌যাণীলতা,—তাকে কী না একটা ভিন্‌দেশী গোরুমোষওয়ালা জব্দ করে নিয়ে গেল। এ অপমান বস্তীর জোয়ানমদদের প্রাণে সইছে না। সেলের মত সকলের বুকে বিঁধছে। সকলের মুখেই হায় হায় রব—যেন প্রত্যেকেই তার পেয়ারের প্রাণীটিকে এইমাত্র খুইয়ে বসেছে।

তা দুখীরামই বা কী করে? সঙ্গে সঙ্গে কি আর এর বিহিত করা যায়? এ কি একটা যা তা সমস্যা? এ একটা জটিল ঘোরতর জোরদার সমস্যা। হুঁ, বললেই কী এর বিহিত করে ওঠা যায়! আর—তাছাড়া দুখীরামেরও ত' কাজ একটা নয়। এই রেললাইনের মত সমান সমান লম্বা বস্তীটায় মেয়েমদ্দ, কচিকাচা আর বুড়ো হাবড়া মিলিয়ে মিশিয়ে কমকটা মানুষ বাস করে না এখানে। এখানকার সব জাতের সব রকমের মানুষের ভালমন্দ, ঘর-দশা সবকিছুর দায়দায়িত্ব যে বেড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে কার বিয়ে কথা বউ কার সঙ্গে নিকেয় বসবে, কার কোনপক্ষের কোন ছেলেমেয়েকটা কে পালনপুষ্যি করবে, কার ঘরের সোয়ত্ত মেয়ে-বোন মৌকাআড়িক কার চালার তলায় রাত কাটিয়েছে—এই রকম আরও নানান ধাঁচের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা আর তার নিষ্পত্তি করতে করতে দুখীরাম যেন বয়সের চেয়ে বেশী বুড়ো হয়ে পড়ছে। বস্তীতে বাসকরা সোজা। কিন্তু মোড়লগিরি সোজা কথা নয়। এর ঝক্কাটি ঝকমারি অনেক। কিন্তু তা হলে কি হয়—এই মোড়লগিরির ইজ্জত বড় দামী। পরে দুখীরামের কোলকুঁজো বুক চিতিয়ে ওঠে। দু'হাত তুলে সকলকে ঠাণ্ডা হতে বলে দুখীরাম। বুক চিতিয়ে চেঁচিয়ে বলে—ভাইসব, তোমরা মাজাজ গরম করো নি। ঠাণ্ডা পেরাণে ঘরে গো চান-আহার শ্যাষ করো। আর আহারেও মামাতা ঠাণ্ডা করি ভাবনের সময় দ্যাও দু'দণ্ড। এ মামলার ফয়সালায় এতেরে চুলচিরি বিচার দ্যাখাতি লাগবে। কল্যাণী ক্যান্ মদ্দ কাড়ি ঘর ছাড়ো যায়? দুষ্যতা কার? কল্‌যাণীর না উয়ার বুড়া ভাতারভার? এসাও ভাবনের বেষয়। অক্তের তুমরা ঘর যাও এ্যাখোন। আমি উয়ার বুড়া ভাতারডা আর বিটি সপ্তবালাডার সন্ধান করি গে। পরে তুমাগো জানান দিব সমাজ বসান কখোন হবো।

মোড়লের কথায় আশ্বস্ত হয়ে সকলেই যার যার দিকে চলে গেল। মুহূর্তে দুখীরামের চালার সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। এত লোকের চাপাগুঞ্জন আর ভীড়ে এতক্ষণ একটা শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। দুখীরাম এখন কয়েকবার সজোরে শ্বাস গ্রহণ করল। বুকের গোড়ার চাপ ভারটা একটু কম মনে হতে লাগল। দুখীরাম ভাবে, খাওয়ার কথা ভুলে আজকের সমস্যার কথাটাই ভাবতে বসল। কী করে? কোন দিকে যায় দেয়।

একদিকে নতুন গজানো কাঁচা কঞ্চির মত নধুজ যৌবনে হিল্‌হিলে কল্‌যাণী। আর অপরদিকে তার হেঁপো রুগী দুড়দুড়ে বুড়ো বর উখান আর সদ্য ফোটা ফুলের মত চল্‌চলে ওদের মেয়ে সপ্তবালা। কাকে কোন্‌দিকে রাখলে বিচারের কাঁটাপাল্লা তুলামূলা হয় এ কথা ভাবতে ভাবতেই দুখীরামের মনে হয়—বেশ করেছে কল্‌যাণী, খুব ভাল করেছে—ঐ হিন্দুস্তানী রামকেশব গয়লাটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে। ঐ গয়লাটার মত পাটাতন বুক মদ্দ না হলে কি

আর কল্‌মীর ঘাড়, হাবা দ'খবার ভারসা হয়? এই সব ভেতো বাঙালী হাড্ডিসার জোয়ানগুলোর বুকে—আর যাকেই আঁটুক আমাদের—এই কল্‌মীলতাকে আঁটে না। আর ঐ মুড়মুড়ে বুড়ো হেঁপোকণী উখানটা!—ওটা কী ই বা দিতে পারে কল্‌মীকে! না বুকের জোর—না ভাতের জোর! বেশ করেছে, খুব ন্যায্য কাজ করেছে কল্‌মী। মন্দ কেড়েছে—তা হয়েছেটা কী! তোদের বস্তীর কটা মরদের ঘুরোদ হবে ঐ শক্ত কাঁচা কলিখানাকে নরম করে দুইয়ে এনে বুকের দোড়ায় ঘোল আওয়াতে? দুখীরাম বস্তীর মানুষগুলোকে উদ্দেশ করেই বলে—যাঃ যাঃ এর বিচার হবে নি! তোদের ঘুরোদ থাকে—উদ্ধার করো নো আর কল্‌মীরে রামকেলবের মন্নর পো। যত সব ছিঁচকে নেড়িকুত্তার দল। সেই কথায় বলে না—বিষ নেই তার আবার কুলোপানা চক্কোর। তোরা সব কটা ছুঁচোর মতন বস্তির চালার তলায় ঢুকো পড়ে থাক গো। পাখি ম্যাখোন ফুড়ুৎ—ত্যাখোন তারে ধরো নো মেরে মোড়লমশাই। হুঁ হুঁ। রাগে আক্‌সোসে গজরাতে থাকে দুখীরাম।

আসল কথা কল্‌মী এ বস্তী ছেড়ে যাওয়াতে দুখীরামের বুকটাও খাঁ খাঁ করছে।

কল্‌মী ছিল এ বস্তীর আলো। গায়ের রঙ তার আলো কথার মত ছিল না মোটেই তবুও তার গায়ের একটু হাওয়া গায়ে লাগাবার জন্য এখানকার মরদগুলো হন্য হয়ে হনো কুকুরের মত ওর পিছু পিছু ঘুরত। নিকষ কালোবরণ কল্‌মী লতার শক্ত লম্বাটে ঘাড়ের ওপর তেলবিহীন অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলগুলো যখন ওর হাঁটার ঠমকে ঠমকে এলোমেলো হয়ে গলামুখ ঢেকে দিত তখন ওকে যেন ঠিক একটি কালো দুধের ঘোড়া বলে ভ্রম হত। কালো রঙের মধ্যে চেরা কাঁচা আমের কষির মত দাদা চকচকে দুটো টানা টানা বড় বড় চোখ কল্‌মীকে যেন এ বস্তির মাটি ছুঁতে দিত না। সে তার ঐ অপার্থিব চোখ দুটি নিয়ে ছিল্‌ছিলে দুল্‌দুলে হয়ে সবসময়েই সবপুরুষের চোখে নেশার আগুন ধরিয়ে বেড়াত। দুখীরামও সে আগুনের ছেঁকা থেকে বাদ যায় নি। দুখীরাম অস্বস্তি অনুভব করে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে কল্‌মীর বুড়ো বর উখানের চালার দিকে ছুঁটা দেয়। সমস্ত বস্তির লোকের দাবীর কথা হেঁপো কণীটাকে জানাতে হবে। সবাই এর একটা বিহিত চায়। কাজেই দুখীরাম নাচার। সমাজ একটা বসাতেই হবে। আর দুখীরাম বেশ ভালভাবেই জানে এ বিচারে উখান আর তার কচি মেয়ে সখবালাকে বস্তির এই আশ্রয়টুকু ছেড়ে একেবারে খোলা ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। উখানের করণক্ষি একেবারেই নেই। কল্‌মীর রোজগারেই ওর পেটে দু'বেলা না হক এক বেলা অন্তত দুটো দানা পড়ত। এখন উখানের একমাত্র ভরসা ঐ কচি মেয়েটা সখবালা। সখবালার কথাটা মনে হতেই দুখীরামের ভেতরটা একটু কাতর হয়। আহা বেচারী। মা থেকেও নেই। কী ই বা আর বয়স—নয় কি দশ হবে। এই বয়সেই মেয়েটাকে নিজের সব ঝায়ঝাপ্টির নিজেকেই বহন করতে হবে। সঙ্গে আবার বুড়ো বাপটাকেও দেখতে হবে। নাঃ—এসব কুটকাচালো দুখীরামের আর ভাল লাগে না। কল্‌মীর ব্যাপারটার ফয়সালা করে দিয়েই ও এ বস্তি ছেড়ে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

দুখীরাম আনমনে হাঁটতে হাঁটতে উখানের চালার সামনে এসে পড়ল। সখবালা ঠিকে কাজে গেছে। এখনও ফেরেনি। উখান দাওয়ায় মাটি ছুঁয়ে থাকা চালার খোপে বসে দুঃখে কাদ্‌ছে। কথা বলার সামর্থ্য নেই। কল্‌মীর কাছে উখান কতখানি সত্য সেটাই এখন বোঝাবার চেষ্টা করে মোড়ল। আবারও দুখীরাম ভাবে—নাঃ কল্‌মী ভালই করেছে—ন্যায্য কাজই করেছে মোড়ল আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না। সন্ধ্যায় সমাজ বসানোর কথা জানায়। উখান আর তার মেয়ে সখবালাকে হাজির থাকতে বলে যায় মোড়লের বাড়ীর সামনের খোলা জায়গাটায়।

সখবালা বেশ শক্ত মেয়ে। মা ওদের ফেলে চলে গেছে। কাজেই ওকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। কলমী থাকতে সখবালার নিজস্ব কোনও বাঁধা কাজ ছিল না। মার সঙ্গে হাত দুটকুট দু'একটা কাজ করলেই চলত। কিন্তু

এখন ওকে নিয়মিত দু'বেলা বাবুদের বাড়ী কাজে বেরোতে হবে। ও বেশ মন দিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে পারে। দেজন্য কাজ পেতেও অসুবিধা হয় না সখবালার। বিশেষ করে ছোটবেলে যখনি মাইনে কম এবং ঘরে-দুতোর বাবুদের ফাঁকি দেওয়ারও সুবিধে হয় বেশী। লেখাপড়া জানা বাবুরা কেমন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথায় কায়দায় ওদের মত গরীবদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে—সে সব অভিজ্ঞতা সখবালার আগেই হয়েছে—ওর মার সঙ্গে দু'চ বাড়ী ঘুরে ঘুরে। তবে ও প্রায়ই লক্ষ্য করত যে ওর মার সঙ্গে সব বাড়ীর গিন্নীদের চেয়ে ব্যবহারটা যেন একটু বেশী ভাল ব্যবহার করত। তাই ওর মার মাইনেতে ফাঁকি পড়ত না সহজে। তবে ওকে'ও আর তা করবে না। তাই ওকে শক্ত হতেই হবে।

সখবালা ওর মা কলমীকে দেখতে পায়ত না দু'চক্ষে। মা হলে কী হয়—সেটাও যেন কেমন একটু চলনসই। বাবুদের বাড়ী কাজের সময় ওর মা মাঝে মাঝেই বাবুদের সামনে কেমন যেন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে চোখ দুটিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত হুকারে অন্ধকারে। বাবুরাও কলমীর ঘরসংসারের খবরাখবর নিত। আর সখবালা অবাক চোখে দেখত ওর মাটা কখন যেন মন্ত্রতন্ত্র চোটে রঙের খেলার মাটির সাঁওতাল বউ হয়ে গেছে। সখবালা কোন্ ছোট-বেলা থেকেই ওর মার কাজে সাহায্য করত। ভাবত মা ওকে খুব ভাল বেসে। কিন্তু কলমীর সখবালার ওপর তেমন নজরই ছিল না। সখবালা যে ওর মেয়ে সেটা যেন নিতান্তই একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মার কথা মনে পড়তেই সখবালার ভেতরটা কেঁপে করে উঠল। বুড়ো বাপটার জন্য খুব কষ্ট হয় ওর। একে বুড়ো, তায় হেঁপো রুগী। খাটতে পারে না একদম। কলমী ত' দিনরাত গালমন্দ করত বুড়োটাকে। ওটা ত' ওর মা ছিল না—যেন একটা শাঁখচুন্নী। যেমন চেলাকাঠের মত শক্ত, লম্বা চেহারা—তেমন পোড়া কেলে হাঁড়ির তলার মত গায়ের রং। তার আবার ঝেমাক-ঠমক কত। গেছে না আপদ গেছে। বাপটা ওর দু'দণ্ড স্বস্তি পাবে এখন। তবে হ্যাঁ এই বস্তির জোয়ান মদগুলোই ওর মার মাথাটা খেয়ে-ছিল। ওর মাকে দেখলে সবাই এমন হ্যাংলা চোখে উঠত তা আর বলার নয়। এসব ব্যাপার, হাব-ভাব সখবালা এই বয়সেই বেশ বুঝে উঠতে পারত। ওর আজন্ম পরিবেশই ওকে—এত সহজে জীবনের সহজপাঠের মূল রহস্যগুলি অনায়াসে ধরতে শিখিয়েছে। ও জানে এই বস্তিতে বুড়ো-হাবড়া আর কচি-কাচ্চাদের কেউ আদর দেয় না তেমন। এখানে সোমত্ত জোয়ান মেয়েদের জাতির বেশী। ছোটগুলো যেন দু'পায়ের কাঁটা বাপ মায়ের। এগুলো যেন বস্তীর আবর্জনা। চোখ ধরে যায় সখবালার এই রেল লাইনের ধারের সমস্ত বস্তীটার ওপর। আজ সন্ধ্যাতেই পঞ্চায়েত বসবে। মানে মিটিং হবে সখবালার মাকে নিয়ে। ওকে থাকতে হবে সেখানে। সখবালার মন ভারী হয়ে ওঠে। বাড়ী ফিরতে মন চায় না। ও বস্তীর শেষে উত্তর প্রান্তের বটতলায় এসে বসে। এটাই বস্তীবাসীদের দেবস্থান। এখানে কাটাচটা এক টিনের ছাউনির তলায় কোন আদ্যিকালের রং চটা, হাড়গোড় ভাঙ্গা এক হর পার্বতী মূর্তি আছে। জন্ম মৃত্যু, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, মহামারীর বিনাশ ইত্যাদি নানা উপলক্ষে বস্তির বাসিন্দারা এই দেবস্থানে পূজা দেয়, উৎসব করে। সখবালাও বাপের আরোগ্য কামনায় মাঝেমধ্যে এক আধ পয়সা ছুঁড়ে দেয় দেবতাদের পায়ের কাঁকে। বস্তীর অন্যান্য ছেলেমেয়েরা আবার যার যার মত কাঁক বুঝে দেবতাদের পায়ের তলা থেকে পয়সাগুলো খুঁটে তুলে নেয়। সখবালা ত' কখনও এমন করে নি। তবে দেবতারা ওকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

সখবালার কান্না পায় না। তবুও বুকের বাঁয়াখানটা থেকে থেকে কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠিক ওর হেঁপো রুগী বাপের মত ধড়ফড়ানি ভাব। সখবালা ভয় পায়—বাপের রোগটা ওকে ধরবে নাকি? ও তাড়াতাড়ি জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস টানে। বুকটা হাল্কা বোধ হতে স্বস্তি পায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সূর্যঠাকুর দেবস্থানের বটগাছের মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে রেল লাইনের ওধারটায় চলে যাচ্ছেন। বটগাছের পাতায় পাতায় কে যেন আলতা গুলে ঢেলে দিয়ে গেল। তাদা টিনের ছাউনির ফাঁক দিয়ে সেই আলতা গোলা রংটা চটাওঠা দেবদেবীর গায়েও যেন

নবদম্পতির মনস্ক আড়া মাখিয়ে দিয়েছে। সখবালা অবাক চোখে আবক্ষিম দেবদেবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে দেখতে হঠাৎ সখবালা দেবতাদের মুখে ওর মা—কল্‌মী আর বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী গয়লা রাম কেশবের মুখ আবিষ্কার করে। ওরা দু'জন যেন সখবালার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে আর হাত নেড়ে নেড়ে ওকে কাছে ডাকছে। হতবুদ্ধি সখবালা যন্ত্রচালিতের মত দেবস্থানের মাটির চত্বরে উঠে যায়।

কল্‌মী অবশ্য এই বস্তী ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিতে চেয়েছিল সখবালাকে। তা ছাড়া সখবালা সঙ্গে থাকলে রামকেশবের গোরু মোষের কাজেরও একটু সুবিধা হত। বুড়ো বাপকে একা ফেলে রেখে সখবালা যেতে চায় নি। কষ্টই হোক, আর বুড়োই হোক্, সখবালার বাপ তো বটে উখানে। মন্দ লোকে দশবার কাড়তে পারে। কিন্তু বাপ! বাপ তো আর ইচ্ছেমত কাড়া যায় না। আর একটার বেশী বাপ হয়ও না কারও। সখবালা তাই কল্‌মীর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কল্‌মী অবশ্য সেজন্য পরোয়া করেনি। বাবুদের দেওয়া পুজোর শাড়ী দু'খানা গামছার পোঁটলায় জড়িয়ে নিয়ে গট্ গট্ করে বেড়িয়ে গিয়েছিল। দূরে রেললাইনের ধারে রামকেশব গয়লা কুচো কুচো সবুজ শ্যাওলার জামাপড়া একটা মোষের পিঠে বসেছিল। কল্‌মী গিয়ে মোষটার কাছে দাঁড়াতেই রামকেশব ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে কেমন কায়দায় কল্‌মীকে মোষের পিঠে আপটে ধরে তুলে নিল। আর কাঁচা কঞ্চির মত শক্ত কল্‌মীও রামকেশবের বুকের গোড়ায় কেমন যেন নেচ্‌কে বেঁকিয়ে পড়ল। মুহূর্তে রামকেশবের মুখে একটা বিচিত্র আওয়াজ উঠল—হ্যাঃ—হ্যাট হ্যাট হ্যাট, আঃ হাঃ হাঃ হুঃ বেঃ বেঃ বেঃ। মুখের শব্দের সঙ্গেই মোষের ল্যাজটা একটু নুইয়ে দিল রামকেশব। মোষটাকে সখবালার মা আর গয়লাটাকে পিঠে নিয়ে কেমন হেলেদুলে রেললাইনের ওপারে রামকেশবের খাটালমুখো চলতে সুরু করল। অসহ্য, অসহ্য লেগেছিল সখবালার।

সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। হর-পার্ব্বতীর মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়ে গেল। সখবালার আর বটতলা ভাল লাগছে না। ও পা বাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাড়ীর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে কী ভেবে ও ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ভীষণ বিরক্তিতে বটতলার দেবতাদের দিকে মুখ করে ও থুঃ থুঃ থুঃ করে তিনবার থুথু ছিটোল।

মোড়লের চালার সামনে এতক্ষণে বোধহয় সমাজ বসে গেছে। সখবালার মা কল্‌মীকে নিয়ে আজ মিটিং হবে যে।

লালন ফকিরের জীবনে ধর্ম

(৩৭৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এই জনের ধর্মই লালনের ধর্ম। এ ধর্ম হিন্দু ধর্মও নয়, ইসলাম ধর্মও নয়—এ ধর্ম সব ধর্মের ঊর্দ্ধে যার নাম মানব ধর্ম। এ ধর্মে নিয়মের কঠোরতা নেই, আছে মানবতার কোমলতা। মানুষের হৃদয়বত্তার শ্রেষ্ঠত্ব এখানে স্বীকৃত, মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখরিত। তাই তিনি নিজেকে নিবেদন করেছেন মানবপ্রেমী শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্যে, প্রাণভরে গেয়েছেন—

জানবো হে এই পানী হইতে
যদি এস হে গৌর জীবকে তারিতে।
নদীয়া নগরে যত জন,
সবারে বিলালে প্রেমধন,
আমি নয় অধম
না জানি ভজন,
চাইলে না হে গৌর আমা' পানেতে॥

মানব ধর্মের মূর্ত প্রতীক শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তিনি তাই আবার গেয়েছেন—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়,
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়।

শ্রীমৎ
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাগুইআটিতে নিজের জলের বন্দোবস্ত নাই, তবু যাইব। বিনা তপস্যায় তো জীবনে কিছু পাই নাই। তবও পাইব না। দুঃখই আমার গর্ব। নিতাগোপাল আমার দুঃখ-মধুসূদন। ১০টার পূর্বে বেণু প্রেসে যায়। ..... বেণু ২॥ টায় এ মুখার্জী, সুবোধ মুখার্জী প্রভৃতির ওখানে যায়, ফেরে ৭ টায়। সন্ধ্যায় পীযূষবিন্দু ঘোষ আসে। মঠের সম্বন্ধে অনেক বলে। ১১ই এপ্রিল

আমি সম্পর্কের ভাগবত মূল্য দিতে চাইলে কি হইবে? মানুষ সম্পর্ককে পঙ্কিলতে বিপর্যস্ত না করিয়া ছাড়িবে না। তাহাদের দোষ কি? প্রতি সম্পর্ক যে ভাগবত সম্পর্ক, ইহা আমিই বলিতেছি। তাহাদের অন্তরতম প্রদেশের ধারণা সম্পর্ক মাত্রিক। তাই কোনও সম্পর্কের প্রতিই মানুষের অন্তর্হৃদয়ের কোন আস্থা নাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, নরের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ভাগবত। ইহা আস্বাদন করিতে হইলে চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে যে বিপ্লব থাকা দরকার, তাহা যোগাইবে কে? আমি তাহা বলিতে গিয়াই তো একা। মানুষ সম্পর্ককে নোংরা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। আমি সত্যেন পাত্রীর ঘর করার কি হইল, কত দূর হইল জানিতে চাই। সে তাহার গতি-বিধি আড়াল করিতে চায়। আজ বোধ হয় তাহার নূতন বাসায় সে আলোচনা করিবে 'বিশ্ব সমস্যার সমাধানে ভারতের দান' সম্বন্ধে। আমি কিছুই জানি না। জানাইলে দোষ ছিল কি? না জানানোতে আমার আর তাহার সম্বন্ধে দায়িত্ব রহিল না। বেশ হইয়াছে। বেণু বিশ্বভারতী, বাসন্তী বাইণ্ডিং-এ যায়, জে. সি. মুখার্জীর ওখানেও যায়, প্রেসে যায়। বৈকালে অনেক দিন পর বরিশালের রাধাল-চন্দ্র ঘোষ আসে, ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইন্‌স-টিটিউট অব কালচারে আমার বাগুইআটি যাইবার কথা শুনিয়া আসে। লীলা আগামী মঙ্গলবার ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে আসিবে লিখিয়াছে। উত্তর দেওয়া হইল। সন্ধ্যার পূর্বে চৈত্রের উজ্জ্বল ভাবও আসে যাহা বাহির হইবার কথা ছিল চৈত্র মাসের প্রথম ৫ দিনের মধ্যে। যেখানে 'কর্ম' যাহাদের দেবতা নয়, সেখানে তাহাদের সঙ্গে কাজ করা কি আমার পোষায়? আমি যেন ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। জে. সি. মুখার্জীর সঙ্গে টিউবওয়েলের কথা হইয়াছে বেণুর। পূজার মধ্যে হইবে বলিল। ম্যাট্‌স 6 × 3 ম্যাগ্‌স 6×alternatively ৬ বার করিয়া খাওয়ার উপকার বুঝিতেছি ...। ১২ই এপ্রিল

জগতের যে শ্রী, তাহা দেখিলে কি মনে হয় যে এই জগতের নাথ কেহ আছেন এবং যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি সচ্চিদানন্দঘন? জগন্নাথের জগতের উপর পূর্ণ আধি-পত্য আছে, এবং সব কিছু তাঁহার সত্তা চৈতন্য আনন্দের ছাঁচে গড়া হইলে, ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বের সুখ-দুঃখ দেখিয়া তো মনে হয় না যে, এ জগতের নাথ সচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মবস্তু। জগতে অসত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দ দেখিলে কি সত্যই মনে হয় না যে জগন্নাথ জগতের ওপারেই, এবং জগৎটা অবিদ্যারই খেলা? ইহাই আচার্য শঙ্কর তাঁহার দর্শনে কথায়িত করিয়াছেন। জগন্নাথ=জগৎ+নাথ। জগৎ যদি নাথেরই অপরার্দ্ধ হইত, নাথ যদি জগতের মধ্য দিয়াই তাঁহার সচ্চিদানন্দত্ব আস্বাদন করিয়া চলিয়াছেন, জগৎকে সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন, তবেই বটে তাঁহাকে এই জগতের নাথ বলার একটা অর্থ থাকিতে পারিত। জগৎ যদি 'already made', তবে তো তিনি জগতের ওপারে, নয় তিনি নাই। জগৎটা devil's dance মাত্র। যিনি জগতের ওপারে তিনি অভর্তা, তিনি নাই। তাঁহাকে থাকিতে হইলে তাঁহার স্বরূপ ও রূপ-জগতের অনন্যত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞান ভক্তির প্রয়োজন মায়ার জগৎকে জগন্নাথের জগতে গড়িয়া তোলায়। ইহাই নিতাগোপালের দর্শন। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১টায় আসিয়া কিছু বই নরনারায়ণ আশ্রম লাইব্রেরীতে দিয়া যান। 'চৈতন্য ভাগবত' খানা ভাল। অনেক আলোচনা হয় গুহাতত্ত্ব গুহাতত্ত্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে। বেণু ২॥ টায় পর অপেন যোষের ওখানে যায়। সকালে যায় সত্যেন ঘোষক ও পুণ্ডরীকবাবুর ওখানে। পুণ্ডরীকবাবু চাঁদা আদায়ের খাতা বাবদ ৩০৲ টাকা দেন, আরও ২২৲ টাকা দিবেন।

সত্যেন শাহী সকালে আসে। আজও রাত্রিতে ৩॥ টায় উঠি. ইহা নিঃসংশয়ে প্রস্রাবের উত্তি। চিঠিকে লিখিয়া দেওয়া হইল তাহার টিউবওয়েল যদি উঠানো সম্ভবপর হয় তবে যেন উহা বিক্রী করে। অগেনবাবুরা উহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ৪মে instalment এ, কিছু donationও মিলিবে। ১৬ই এপ্রিল

শ্রীনিত্যগোপাল, তুমি মৃত্তিমান সেই intelligence, যে intelligence is equivalent to readiness for any human situation—যাহা মানুষের যে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াইবার, তাহাকে পরিপাক করিবার মত 'প্রস্তুতি' ছাড়া আর কিছুই নহে। তুমি প্রকৃতির সর্ববিধ সুখের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছ। অথচ তাহা তোমার জীবনে কণ্ঠ রাগ স্থাপন করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গোপী সঙ্গ, মথুরায় কুব্জা সঙ্গ, দ্বারকায় রুক্মিণী সঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে অর্জুন-সঙ্গ, সর্ব দেব মানব পশু-সঙ্গ করিয়াও তুমি অসঙ্গী। তোমার মত অসঙ্গ থাকিয়া সঙ্গ সুখ কে আস্বাদন করিয়াছে? অসঙ্গী বা সঙ্গী কেহই ব্রহ্ম সংগ সুখ আস্বাদনে সমর্থ নয়। 'Readiness for any situation'—ইহাই তো পুরুষোত্তম-প্রতিভা। আমাকে তাহা দেও। কাহাকেও তো এড়াইয়া যাওয়া এ বিশ্বে চলিবে না। 'যঃ অন্যত্র অস্মন: সর্বং বেদ সর্বং তং পরাদাৎ'—আত্মা যখন combustible, সর্বভূত তখন supporters of combustion—ইহাই আত্মরামতা, পক্ষান্তরে সর্বভূত যখন combustible, আত্মা তখন supporters of combustion—তখনই সর্ব সংগ সুখ আস্বাদন। পুরুষোত্তম এই বিবিধ প্রাপ্তে ঘোল খাইতে খাইতে চলিয়াছেন। আমি পুরুষোত্তম-সাধনা লাভ করিব। জয় নিত্যগোপাল। সকালে মায়া ভব ও তাহাদের পুত্র আসে। .... সুব্রত আসে। তাহার পর নগেন্দ্র বিশ্বাস (মিহির ভাস্কর) আসে, মাথা মাটিতে রাখিয়া প্রণাম করে। ২টি টাকা ও ২টি কমলা প্রণামী দেয়। ১০॥টার পরে নীলু আসে। ২ টাকা দেয়। নগেন বিশ্বাস উদ্বোধন বাবদ ৪ টাকা দেয়। মাখনবাবু আসেন কমলা দেই। উহাদের যাওয়ার পর নীরদবরণ দে আসে। নীচে আসি.....। ৪॥ টার পর আমি ও রেণু বিমলার নীলরতনবাবুর বাড়ীতে যাই, প্রসাদ পাই। রেণু তখনই চলিয়া আসে। আমি ও নীলরতনবাবু মঠে যাই। ৭ টার পর চলিয়া আসি।.....তিনদিন রাত্রিতে প্রস্রাবের উদ্বেগ নাই। মায়ার থাকাকালীন সত্যেন শাহী আসে। ঠাকুরের দর্শন লইয়া কলিকাতায় একটা ঠেলাঠেলি এবং মহানির্বাণ মঠ বিক্রয় করিতে না পারিলে আমার মরিয়া শান্তি নাই—ইহা সত্যেনকে বলি। ১৭ই এপ্রিল

ঠাকুর, কলিকাতায় তোমার দর্শন লইয়া একটা আলোড়ন এবং তাহার মাধ্যমে মহানির্বাণ মঠকে তোমার দর্শন ও জীবনাদর্শনী চালাইবার শক্তি পাওয়ার পূর্বে আমার মরিয়া শান্তি নাই—ইহাই আমার পরলা বৈশাখের ঘোষণা। তোমার দেওয়া স্বপ্ন মনে পড়িতেছে—'ঠাকুর ভাবাবেশে বলিলেন, সবং মনোহরপুর এসে থাকুক'। তোমার সবং সহজ সরলভাবে মহানির্বাণ মঠে আসিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কাহারও অনাদর আমি করি নাই। তোর করিয়া কাহাকেও দিয়া কিছু করাইয়া লইতে চাহি নাই। আলোচনা চালাইয়াছি, তোমার জীবন ও দর্শন ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাই ইহারা সহ্য করিতে পারে নাই। সব মাধ্যমুখী হইয়া বসিয়াছে। তোমাকেই ইহারা চাহে না। তুমি জোর দিয়াছ জীবনের উপর, উপাধির উপর নয়। আর ইহারা উপাধিকে জীবনের উপর চাপাইয়া উপাধির সেবা করিতেছে। আমি ইহা বহিতে পারি নাই, পারিব না। ইহারা আমাকে অবমাননা করিয়াছে, আমি করি নাই। সারা জীবনেও কাহাকেও অবমাননা করিয়াছি মনে হয় না। যত দূর পারিয়াছি মানুষকে তাহার scope দিয়াছি; তাই তাহারা পাইয়া বসিতে চাহিয়াছে, তাহা আমি হইতে দেই নাই। তুমি আমার সত্তা। আমি exploit করি নাই, exploited হই নাই। সকালে বিমল আসে; তাহার নিকট আমার দর্শন বলি। এবারকার পত্রিকায় বরিশালের ইতিহাসে আমার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে পড়িতে দেই। বিষ্ণুপদ আসে ৯টার পর, রাত্রি ৮টায় যায়। অনেকগুলি বই বাঁধে।

দূরের আকাশ

অখিলরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন পার্থের সঙ্গে দেখা হোয়েছিল সৈকতের ডালহাউসীতে। সৈকত ওদিকে গিয়েছিল ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই। আজকাল সরকারী অফিস থেকে নানা জিনিষ কেনা হয় ছোট ছোট ফ্যাক্টরী থেকে। ছোট শিল্প উদ্যোগী-দের একটা বিশেষ ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা। সরকার থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা করা হোয়েছে যাতে বেশী পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য আসে স্মল স্কেল ইউনিটগুলো থেকে। যারা ক্ষুদ্র শিল্প তৈরী করবে তাদের এজন্য বিভিন্ন সরকারী অফিসে আগে থেকেই যোগাযোগ করতে হয়।

বিজন বলেছিল সৈকতকে ডালহাউসীতে বিভিন্ন অফিসে কনটাক্ট করতে। কারণ ঐটাই অফিস পাড়া। পার্চেজ ম্যানেজার কিংবা অফিস সুপারিনটেনডেন্টদের সাথে কথা বলে আগে থেকেই মাল বিক্রির একটা চ্যানেল তৈরী করার জন্যেই ওর ঐদিকে যাওয়া।

এ অফিস সে অফিসে বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে ও দেখা করে। কেউ কিছু কিছু হোপ দিলেও এ পথে মাল বিক্রি করা যে খুব সহজসাধ্য নয়, এটা এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে সৈকত।

বড্ড ক্লান্ত ও। এ পর্যন্ত কেউ ওকে অফার করেনি এক কাপ চা কিংবা কোনও পানীয়, যদিও ও দেখেছে ওকে সামনে বসিয়ে এ যুগের সাহেবরা গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ব্যবসায়িক হোয়ে গেছে। পার্শ্বের জগতে থেকেও অপার্থিব চোখে ওকে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। উপদেশ দিয়েছে। বাঙালী ছেলেরা বড় অলস কিংবা ব্যবসা করার জন্যে ওরা সিরিয়াস নয় এমন ধরণের মন্তব্যও করেছে কেউ কেউ। উপদেশ দেওয়া এক কথা আর কাউকে সত্যিকারের কাজে উদ্যোগী করা আর এক কথা।

কিন্তু অত সময় চিন্তা করার সময় কোথায় ?

তাইতো এখন যিনি পত্রিকা, যিনি উপন্যাস মানে যতো সংক্ষেপে জীবনের চাহিদাগুলোকে মোকাবিলা করা যায়। চিন্তা করাও যত কমানো যায়, বিশেষ করে যাতে নিজেদের কোনও স্বার্থ জড়ানো নয়। সংক্ষিপ্ত করার আর্টটাই এখন বড় আর্ট।

শুধু ভাবার জন্যে ভাবাই এখন ফ্যাশন।

চায়ের দোকানে যত ধরণের আলোচনা শোনা যায় তা অনেক ক্ষেত্রেই অতি তাৎক্ষণিক কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়, চলে যদিও জীবনের সমস্ত দিক নিয়ে।

কিন্তু ওদের আলোচনা থেকে বিশেষ কোনও আলাদা নয় অফিসের আলোচনাও। লোকে গভীরভাবে ভাবতে ভুলে যাচ্ছে কিংবা ভাবতে চাইছে না এখন।

আরও একটু সিরিয়াসলী যদি ভাবতো তাহ'লে অনেক ক্ষেত্রেই গোলমালটা একটু কমার দিকে যেতো।

কিন্তু ওরকম ভাবে এখন আর নিজেকে কেউ জড়িয়ে ফেলতে চাইছে না।

'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এখনই একটা ভাব। তাই ঘাসও কাটে না কারও মনে কিংবা সত্যিকারের কোন উপকার কারও হচ্ছে না।

নইলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যত উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তার সামান্যতম অংশও যদি কেউ শুনতো তাহ'লে এতদিনে আমাদের দেশের চেহারাটা অনেকটাই হয়তো পালটে যেত।

এ ব্যাপারে উপদেশ দাতারা যদি একবারও পরখ করে দেখে তাদের কথাটা কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে তাহ'লে ভবিষ্যতে তারা আর উৎসাহিত বোধ করতো না।

অনেকদিন বাদে আবার বিজনের অফিসের দিকে চলেছে সৈকত। বৌবাজারের কাছাকাছি এসে ট্রামটা পেয়ে গেল। তার ছিঁড়ে গেছে। হুদ্ধুড় তো লেগেই আছে আজকাল। ট্রেন পাবে যখন তখন। চলতে চলতে হঠাৎ কানে আসে পথ অবরুদ্ধ, সুতরাং ট্রেন চলবে না। কারণ কী?

দাবী নিয়ে যাত্রীরা ট্রেন লাইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পথে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে কারও হুঁস নেই, নিজেদের দাবীটাই এখন বড়। অন্যের দিকে ফিরে তাকাবার সময় কোথায়?

যারা সমাজের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের জীবন-যাত্রার ইতিহাস জানলে চমকে উঠতে হয়। সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের যেটুকু সম্পর্ক তাতো শুধু নিজেদের উপরে উঠার সময়ের। উপরে উঠে গেলে তখন পৃথিবীর নীচের তলাকার লোকেরা তাদের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারে। কাছে যাওয়া আর তাদের হয় না। যারা নীচু তলার লোক তারাও আজ পিছিয়ে নেই।

সূর্যানাথের কথাটা আজ আবার হঠাৎ মনে পড়লো সৈকতের। চলতে চলতে বাধার সামনে এলেই নানা কথা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। সূর্যানাথ পড়তো সৈকতের সঙ্গে এক ক্লাসে। স্কুলটা ছিল ওদের বাড়া থেকে কিছুটা দূরে, হেঁটে যেতে হোত অনেকটা পথ। একদিন ওদের স্কুলের এক টীচার সূর্যানাথকে বলেছিলো, হ্যারে সূর্যা, তুই এই ছেঁড়া চটিটা পাল্টাতে পারিস না? তোর বাবাকে বলবি জুতো কিনে দিতে। চটপট সূর্যানাথের উত্তর, এ আবার কেমন কথা স্যার? আপনাদের স্কুলে আসতে আমার জুতো ছিঁড়লো। আমার বাবা কেন মেরামত করে?

টীচারদের কষে গিয়ে এ কথাটা বলেছিলেন ওদের বাংলার টীচার। সকলে বলল, সাবাস ছেলে তাই। এ না হোলে কী আর এ যুগে চলে?

ওদের ভূগোলের স্যার একটু গম্ভীর প্রকৃতির। ভূগোল পড়িয়ে পড়িয়ে এ মাটির পৃথিবীর গতি প্রকৃতি নিয়ে সারা-ক্ষণ তিনি চিন্তা করেন। তাকে সকলেই একটু সমীহ করে।

তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে আজ একটা ছোট গল্প, বলছি। গল্পটার নায়ক একটি ছোট ছেলে। বয়েস দশ কিংবা এগারো। এই বয়সে সে কী রকম চতুর হয়ে উঠে-ছিল তা তার উদ্ভাবনী বুদ্ধি থেকেই আপনারা বিচার করবেন। তাকে কেউ কিছু আনতে দিলে সে কিছু না কিছু লাভ করতো। কখনও দাম বাড়িয়ে বলে, আবার কখনও জিনিষ কম এনে। ওকে জব্দ করার জন্যে একদিন ওকে আনতে দেওয়া হোল একটা পোষ্ট কার্ড। অর্থাৎ এ হেন ট্রাংকজাংশনে হেড কেস করার কোনও উপায় নেই। দাম যা তাই দিতে হবে। লাভ রাখার আর কোনও পথ খোলা নেই। সবাই খুব খুশী মনে মনে। কারণ এবার বাছাধন কী করে দেখা যাক। চালাকী করার আর কোনও সম্ভাবনা না থাকায় সকলে ভাবলো এবার দেখা যাক ওর বুদ্ধির দৌড়।

যথারীতি পোষ্ট কার্ড হাসি মুখে এগিয়ে দিল ছেলেটি। এই পোষ্ট কার্ড কেনা থেকে কোনও কিছু লাভ করতে পারে যে নিশ্চয়ই। সুতরাং জব্দ করা গেল ভেবে সবাই একটা করুণা নিয়ে ওর দিকে তাকালো। কিন্তু ছেলেটির মুখে কোনও ভাবান্তর না দেখে ওরা সকলে অবাক হোল একটু। একজন প্রশ্নই করে ফেললো এবার তো আর কিছু হাতড়াতে পারনি চাঁদ।

কেন? ছোট উত্তর তার। এবার চোখ দুটো একটু বড় করে কয়ে সে বললো, আপনারা ভেবেছিলেন আমাকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছেন: যদি লাভ রাখার ইচ্ছে থাকে তাহলে কারও সাধ্য নেই সেই লাভটুকু হাতছাড়া করার। প্রথমে সে দশ পয়সা দিয়ে লজেন্স কিনে নেয়। লজেন্স কিনে উপর উপর জিহ্বা দিয়ে চেটে কিছুক্ষণ খেয়ে নিয়ে আবার দোকানীর কাছে গিয়ে ঐ লজেন্স একটু অদ্ভুতভাবে দেখিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে ঐ দশ পয়সা নগদ ফেরত নিয়ে আসে ও পরে ঐ দশ পয়সা দিয়ে পোষ্ট কার্ড কেনে।

বুঝুন বুদ্ধি? অর্থাৎ যেনতেন প্রকারেণ কিছু হাতড়ানোই যখন মূল উদ্দেশ্য হয় তখন তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কী এতই সোজা? এই লাভ রাখার খেলা চলছে যেন এখন সারা সমাজের দেহ ঘিরে। সকলেই তারিফ করছিল ওর বুদ্ধির। আর হবেই বা কেন ও ওরকম?

কোন বাড়ীর ছেলে দেখতে হবে তো? ওর এক কাকা চাকরি করে গভর্ণমেণ্ট অফিসে। বড়বাবু সাত্বিক লোক। গলায় মালা। হাসি হাসি মুখ। উদার মন। সকলেই তার বিনয়ের প্রশংসা করত। জি, এ, ও এবিষয়ে বিশেষ টাকাটা যাতে তাড়াতাড়ি বেরোয় তদবির করতে ঐ ভূগোলের টীচার গিয়েছিলেন সেই অফিসে। কাছাকাছি বাড়ী এদের। পরিচয় খুব গভীর না হোলেও মুখ চেনা। কলকাতার অনেক লোকেরা ত বছরের পর বছর একই বাড়ীতে বাস করে অথচ তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠে না।

কারণ ওরা আধুনিক সভ্যতার চরম পর্যায়ে উঠে গেছে। প্রয়োজন হোলে আবার ঐ মুখ চেনা লোকেরা অন্তরঙ্গও হোয়ে উঠে। সেই রকম একটু আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেন সেনবাবু। সেনবাবু মানে আমাদের গল্পের নায়ক তরফদারের কাকা সনানন্দ সেন। ভূগোলের টীচার অমিয়বাবুও পিছিয়ে রইলেন না। যেন কতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু এমনি ভাব নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেনবাবুর চেয়ারের কাছে।

এখানে আসার কারণ জানালেন। একগাল হাসি হেসে আপ্যায়িত করলেন তিনি। বললেন, কোন চিন্তা করবেন না। আমি যখন আছি সাতদিনের মধ্যেই আপনার বিল পেমেণ্ট করার ব্যবস্থা করে দেবো।

কেমন যেন মনে হোল সেনবাবুকে। এত কাছে থেকে এ হেন ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না করায় নিজেকে বড় অপরাধী মনে করছিলেন তিনি। আরও একটু ইনিসিয়েটিভ নিয়ে এর আগেই আলাপ করা উচিৎ ছিল।

খুশী মনে বললেন তিনি, আপনার সেবার জন্য কী করতে পারি বলুন ?, কিছু না কিছু এতো আমার ডিউটি। বিশেষ করে কাছাকাছি থাকি আমরা। একটা কর্তব্যও তো আছে ?

এ কি রামরাজত্বে ফিরে এলেন ? এত ভাল লোক এখনও আছে কলকাতা শহরে,। বড় ভাল লাগলো সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অমিয়বাবুর।

একটু অন্তত: ভদ্রতা দেখানোর দরকার ভেবে আবার এগিয়ে গেলেন তিনি সেনবাবুর দিকে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে এগিয়ে দিলেন। মিষ্ট কেটে সেনবাবু বললেন, ও সমস্ত চলে না ভাই, নেহাতই যদি না ছাড়েন তাহলে আমাদের অফিসের নীচে পানের দোকান আছে। একটা পান দিয়ে যেতে পারেন। পানের অভ্যেসটা এখনও ছাড়তে পারি নি। বলেই একটু হাসলেন।

অমিয়বাবু নীচে গিয়ে পানের দোকানের পাশে দাঁড়ালেন। দেখলেন, বেশ ভীড় দোকানে।

একটা পান চাইলেন তিনি। অর্থপূর্ণ হাসি খেলে গেল দোকানীর মুখে। দোকানী তাড়াতাড়ি একটা পান এগিয়ে দিলো।

মানিব্যাগ বের করে দাম দিতে গেলেন অমিয়বাবু। বললেন, পানের দাম কত ?

৫০ টাকা।

পানের দাম কত বললে ? আরও একবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আবার উত্তর এলো, ৫০ টাকা।

একটু বিরক্ত হোয়ে অমিয়বাবু দোকানীর দিকে তাকালেন। একটা পানের দাম ৫০ টাকা। এটা কি মগের মুল্লুক ?

এটা বড়বাবুর পান যে !

এতক্ষণে বড়বাবুর বিনয়ী মুখটা সমস্ত ধীভৎসতা নিয়ে এগিয়ে এলো অমিয়বাবুর দিকে। পানটা বড়বাবুর হাতে পৌঁছে দিয়ে এক লাফে লিফটে উঠলেন অমিয়বাবু। পেছন ফিরে নমস্কার জানালেন ঐ অফিসের দিকে তাকিয়ে, উপেক্ষা কে বোঝা গেল না।

মনে মনে ভাবলেন এক মুহূর্তও নয় এখানে।

ট্রামের ঘন্টিটা আবার বেজে উঠলো। সৈকতও একটু চাঙ্গা হোয়ে এদিক ওদিক তাকালো, দেখলো ট্রামটা আবার গতি নিল।

সৈকত ভাবলো বিজনের অফিসেও কি ঐ রকম কেউ জাল পেতে আছে ?.....

(ক্রমশ:)

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

সুনীতি দাশগুপ্ত

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ আজ থেকে ৯৬ বৎসর আগে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলার কাঁকরদা পল্লী গ্রামে কার্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন পিতা নীলকমল ঘোষ, মাতা মুক্তকেশী দেবীর সার্থক সন্তান রূপে, গড়ে উঠেছিলেন বাংলা মায়ের তথা ভারত মাতার সার্থক সন্তান রূপে, জীবনকে ধন্য করেছিলেন ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সার্থক শিষ্য রূপে। শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের বাণী—'এই বিশ্বই আমার মঠ, আমি বিশ্ব নাগরিক'—এই বাণী কেমন করে জীবনে মূর্ত হয় নতুন চিন্তা ধারায় মধ্য দিয়ে তা তাঁর প্রাণের ভাষায় বিশ্ব মানবের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন আজও বিশ্বের কাছে অপরিচিত। তিনিও নিজ মুখে স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন—"ওরে বিলে, আমি এবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁথা মুড়ি দিয়েই যাব।" সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থা জীবনে সমন্বিত হয়ে কী করে সুস্থ শান্তিপূর্ণ জীবনে উত্তরণ করা যায় শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন ও দর্শন তার মূর্তিমান পথ প্রদর্শক। একটা যুগ সন্ধিক্ষণে শ্রীনিত্যগোপাল আবির্ভূত হয়েছিলেন ব্যাপকতর ও গভীরতর সমন্বয়ের তত্ত্ব নিয়ে। যে কালে তিনি এসে ছিলেন সেই কালে তাঁর তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য সময় হয়ত ছিল না বলেই তিনি নিজের জীবনকে কাঁথায় মুড়ে রেখে বহু গ্রন্থে রেখে গেছেন বর্তমান ও ভাবীকালের সমস্যা জর্জরিত সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্য এক চিন্তাধারা। বাস্তব জগতে জড় অজড়ের, নিত্য অনিত্যের, জ্ঞান অজ্ঞানের, আকার নিরাকার সাকারের বিরুদ্ধ ধর্মীতার মধ্যে সমন্বয়ের বাস্তবতা বিজ্ঞান সম্মত দার্শনিক ভাষায় প্রমাণ করে তিনি এক আশ্চর্য সমন্বয়াচার্য। সত্যের দুই দিককেই স্বীকার করে তিনি হেগেল, মার্ক্স, শঙ্কর, বুদ্ধ, রামানুজের আলিঙ্গন বদ্ধ মহামিলনের খবর রেখে গেছেন। গণতন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল পণ্ডিত, কুলীন, ধনী যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। তিনি একেবারে সাধারণ মানুষকে তাঁর কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সমাজে যারা পতিত, কোথাও আশ্রয় পায়নি, ছেলে, মুচি, আবদ্ধ, চরিত্রহীনের দল—তাঁর কাছে স্থান পেয়ে জীবনকে নতুন করে মনুষ্যত্বের অধিকারী করে ধন্য হয়েছিল। এই জন্যই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'নিত্য কি আর বেছে গুছে নেবে? নিত্য পড়া গোবরে মুঁচে ঘেবে।" তাই পোষণ-মুক্তি শ্রীনিত্যগোপাল বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান মূর্তি। মুহুর্মুহু: সমাধি মগ্ন মানুষটী যখন ব্যবহারিক জগতে বিচরণ করতেন তখন তাঁর ব্যবহার-কুশলতায় মানুষ বিস্ময় বোধ করত। যে পেন্সিলটী তিনি লেখার ব্যবহার করতেন তা অতি ছোট হয়ে গেলেও কাগজ জড়িয়ে যত দিন পারতেন কাজ চালাতেন এবং অবশিষ্টটুকুও ফেলে দিতেন না। মাঠের ঘাস শুকিয়ে বর্ষার দিনে জ্বালানীর কাজ করতেন। ধনীর ছেলে হয়ে তিনি সকলের সাথে তরকারীর অভাবে মসলার ঝোল আনন্দের সঙ্গে খেতেন। নিজের প্রাপ্য ধন দরিদ্রে বিলিয়ে দিতেন। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী হয়েও হুগলী মঠে থাকাকালীন সাদা ধুতি চাদর পরিহিত হয়ে এই অবধূত সন্ন্যাসী ভোট দিতে যেতেন। জীবনের কোন একটা অবস্থাকেই একমাত্র অবস্থা তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি লিখলেন "পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান, সর্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।"

এমনই একজন পূর্ণজ্ঞানের অবতার শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের চরণে আলোকিত পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের জীবন। জন্মের পর ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কথা বলতে পারেননি। কেন কিছুটা বয়স পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত লাজুকও ছিলেন—দুইজন পুরুষ মানুষের কাছে যেতে তাঁর পা জড়িয়ে যেত লজ্জায়। কিন্তু সন্ন্যাসই কেমন একটা ভাব-ভোলা অবস্থা কিসের যেন বেদনা তাঁকে দূরে রাখত মানুষের সঙ্গ থেকে। সেই মানুষটীই কিন্তু অতীত বাংলায় বাগ্মী সরৎকুমার ঘোষ, যাঁর বাগ্মীতায় হাজার হাজার মানুষ সে দিন দেখেছিল পরাধীনতার দুঃখন মোচনের আলোর পথ, ব্রিটিশ সিংহের পোষণে পীড়িত ভারতবাসী পোষণের অভয় মন্ত্রের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ

সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশ রাজ বরিশালের শরৎকুমার ঘোষকে কয়েকবার জেলে পুরে রেখেছিল। কিন্তু যে আলোর শিখা পুরুষোত্তমানন্দ-হৃদয়ে তাঁর আচার্য্যদেব প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন সে শিখা কোন দিন কারো দ্বারা তো নির্বাপিত হবার নয়। তিনি জেলে বসেই স্বাধীনতা যে সুরে এবং স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, পরিবার নীতি, রাষ্ট্রনীতি কোন্ ছাঁচে গড়ে উঠলে ভারতবর্ষ হবে সমগ্র বিশ্বের আদর্শস্থল তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিখলেন সহজ সরলের ভাষায় উপনিষদ, গীতা, বেদান্তের অবধূত ভাষ্য। একান্ত স্থিতি প্রধান ভারতীয় দর্শন, যা দীর্ঘ যুগ ধরে ভারতের মজ্জাগত, তাকে গতির সঙ্গে সমন্বিত করতে না পারলে, চিন্তাধারায় দার্শনিক বিপ্লব আনতে না পারলে সকল ক্ষেত্রের বৈষম্য যে সমানতালেই চলবে, কোনো আইন তাকে ঠেকাতে পারবেনা একথা তিনি মানুষের কাছে শত শত বক্তৃতায় আর তাঁর অগণিত লেখাতে বলে গেছেন। অতীত ভারতবর্ষ এক সময়ে যে রকম করে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিকতার সমাধানে ব্রতী ছিল আজকের দিনে ও প্রায় অচল হয়ে গেছে। আজ অগ্রগতির নামে আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কম্যুনিজম্ প্রভৃতি নিয়ে নতুন করে অগ্রগতির ভাবনা করছি। একই সঙ্গে এসেছে বিশ্বে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি। কিন্তু তবুও জাতীয় দৈনন্দিন জীবনে সমস্যার পীড়া দিন দিন মানুষকে অশান্তি, অনিশ্চয়তার মধ্যেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যে প্রাণধারাকে অবলম্বন করে মানুষ ধার্মিক, গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও বৈজ্ঞানিক হতে পারে এবং যার ফলে বিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমাধান সম্ভবপর হয় তারই চিন্তাধারা পুরুষোত্তমানন্দ রেখে গেছেন। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ গোলোক বৈকুণ্ঠের সাধনার ধাঙ্গী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তব জগতের মাটীর মানুষের সুখ দুঃখের সাথী। তাই তাঁর কথা ছিল "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে"র বদলে কবে এ তৃষিত এ মরু পড়িয়া তুলিব তোমারই রসাল নন্দনে; তাঁর প্রার্থনা ছিল " ধরার ধূলি হোক স্বর্ণধূলি, ধরার মানুষ হোক স্বর্গ মানুষ"।

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ কী ছিলেন তা ভাবতে গেলে দেখি তিনি শ্রীনিত্যগোপাল প্রসাদে আলোকিত একটি স্বচ্ছ জীবন-প্রবাহ। একদিকে পুরুষোত্তম দর্শনের সমন্বয় ভিত্তিতে সমস্ত অগ্রগতির এক আশ্চর্য বিপ্লবী পথপ্রদর্শক, আবার দেখি মাটীর জগতে প্রতিটী হীন মানুষের জন্য তাঁর কী আকুল কান্না; তাদের জীবন-চেতনাকে জাগ্রত করবার জন্য কী আকুলি বিকুলি। আবার দেখি পরাধীন ভারতে ব্রিটিশের শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর কঠিন, তেজোদৃপ্ত মূর্তি। পুত্রহারা মায়ের কাছে দেখি মৃত পুত্রের স্থানে নিজেকে বসিয়ে মায়ের শোক হরণের চেষ্টায় আকুল কান্না। আবার দেখি রাধাকৃষ্ণ বলতে বলতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অনাকেও কাঁদিয়ে দিচ্ছেন। ভারতের অস্পৃশ্যতা রূপ মহাব্যাধি নিরসনের জন্য তাঁর বিপ্লবী চেষ্টার বিরাম ছিল না। সন্ন্যাসী হয়ে বৃন্দাবন থাকা কালীন অস্পৃশ্যদের জন্য পানীয় জলের কূয়া প্রভৃতি স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল দেখে তিনি বিচলিত হলেন। তাঁর চেষ্টায় অস্পৃশ্যরা পানীয় জল গ্রহণ করবার, স্পর্শ করবার অধিকার পেয়ে তাঁকে আপনজন বুঝে ধন্য হয়েছিল। কোন মানুষের জাতি জিজ্ঞাসা করাকে তিনি নিজেকেই অপমানিত বোধ করতেন। এমনই একখানি প্রাণের মানুষ ছিলেন পুরুষোত্তমানন্দ। তিনি লিখেছেন, 'হোটরাও যে অন্তরে অন্তরে পুরুষোত্তম একথা তাহারা হৃদয়ে হৃদয়ে বুঝিয়াছে। তাহারাও at heart, in essence পুরুষোত্তম। এ জ্ঞান আকাশের দেবতা তাহাদের প্রাণে inject করিয়া দিয়াছেন। তাই আজ নূতন করিয়া শাস্ত্র দিতে হইবে, new social order, new religious order সৃষ্টি করিতে হইবে।'

পরিশেষে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের আজ থেকে বাইশ বৎসর আগের লেখা প্রবন্ধ থেকে কিছুটা অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করছি "বিশ্বে রাজনীতিক্ষেত্রেই যে শুধু ধনীয় তারতম্যে কলুষিত ও ভণ্ডতা বিবর্জিত ন্যায়ানুরঞ্জনক, সমগ্র মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হইয়াছে তাহাই নয়, বিশ্বের সব দর্শনশাস্ত্র ধনীয় দর্শনে পরিণত হইয়া কেদাক্ত, সুস্থ জীবন্ত মানুষের গ্রহণের অযোগ্য। বিশ্বের সমাজ দলের টানা-টানিতে অচল। মনের চিন্তাধারার পঙ্গুত্বের ফলে আজ সত্য

অনুসন্ধানের পথ বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহিতেছে। সঙ্ঘ-দল আজ পরস্পর দ্বারা অভিভূত হইয়া সমগ্র মানুষের সমাজ গড়িয়া তুলিবে। ধর্ম হউক, রাজনীতি হউক, সমাজ হউক কোন ব্যাপার লইয়াই সতীনের ঝগড়া আজ আর চলিবে না। সতীন কখনও বস্তুতন্ত্র হয় না—নিজের স্বার্থের সঙ্গে সে এমন একাত্ম হইয়া গিয়াছে যে বস্তুকে সে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে পারে না। শ্রীনিতাগোপাল এই Method of Research অবলম্বনে লিখিতেছেন "আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দীক্ষি আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড্ না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক তপতপ পূজার্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কানে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলেন। এমন কোন দলে তো আমাকে লইবে না, আমিও দল চাইনা। দল সেতো ডোবাতেই পচিল শত পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পঙ্কলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবর, প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলের ভিক্ষা পাই সেই জন্য আমার সকল দল লয়ে কি অখণ্ড দল। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন।" সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল—শ্রীনিতাগোপালের প্রদত্ত এই বাণী শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই তো আজ আর নাই, ইহা পরিবারে সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। শ্রীনিতাগোপালই বর্তমান যুগের আদি পথিকৃৎ। এই পথ শুধু toleration-এর নয়। ইহা সকল তত্ত্বকে লইয়া, সকল সম্প্রদায়কে লইয়া সকল রাজনৈতিক দলকে লইয়া একটি সামগ্রিক সত্তা গড়িয়া তুলিবার

(শেষাংশ ৪০০ পৃষ্ঠায়)

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ : স্মরণ

শান্তনীল দাশ

চলার পথে ক্লান্তি যখন পীড়ণ করে মন
চলতে গিয়ে থেমে পেয়ে যায় এ দু চরণ,
খুঁজে ফেরে একটু আশ্রয়
যেটুখানেতে এ মন তৃপ্ত হয়
পেয়ে কিছু স্নিগ্ধ শীতল আনন্দ বিশ্রাম ;
তোমার হৃদয় ছিল তেমনি একটি পুণ্য ধাম।
ওই চরণের কাছে এসে দূর হত সব ক্লান্তি অবসাদ
চলার পথে পেয়ে তোমার স্নিগ্ধ আশীর্বাদ।

আনন্দময় তোমার জীবন, প্রাণের তাপে ভরা,
বাক্য তোমার সকল ভ্রান্তিহরা,
অপূর্ণতার অস্তি দূর ক'রে
দিত আলো ; সেই কথা সব নিয়ে হৃদয় ভ'রে
মনে হত, জীবন তো নয় মিথ্যা অর্থহীন,
আমি তো নই দীন ;
আমার আছে কত না বৈভব,
চলবো আমি, চলার পথে জাগবে মহোৎসব।

এমন মানুষ পাইনে কোথাও আর,
তোমার কথা তাই তো মনে পড়ে বারংবার :
সেদিনের কত কথাই না মনে জাগে,
যেতাম ছুটে কতই অনুরাগে,
পেতাম তোমার স্নেহের পরশ, প্রাণে তোমার বাণী ;
আজকে তোমার শূন্য আসনখানি ;
নেইকো তুমি, নেই সে প্রাণের ভাষা :
তবুও ওই চরণ পীঠে আসা
বৎসরে বৎসরে,
দিতে প্রাণের অর্ঘ্যখানি সশ্রদ্ধ অন্তরে :
নিতে আশীর্বাদ
মহৎ প্রাণের প্রসন্ন প্রসাদ।

———

চৈকিৎসক

হীরেন রাহা

হাজির বহুদাসেও বহুরূপ বহুলায় না। সমাজের ঊর্ধ্বগতির উন্নতি হলেও সামাজিক সংস্কার নির্মূল হয় না। সদ্য বিবাহিত বর যতই আধুনিক হোক না কেন শ্যালিকাদের ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র হতেই হবে।

শত আপত্তি সত্ত্বেও সোমেশ এ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল না। বিয়ের পরই তাকে শ্যালিকারা ঘেরাও করে বোকা বানাবার চেষ্টা করতে লাগল।

স্বল্পভাষী বিজ্ঞানী বর। তাকে জ্বালানো ও কথা আদায় করা শ্যালিকাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ সবকিছু নূপা বরের মাথার পেছন দিকটা লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই বর 'চারশ বিশ'।

আর সকলে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল তাই নাকি?

প্রমাণ করবার জন্য নূপা সোৎসাহে উঠে দাঁড়াল। সোমেশের মাথার পিছনটা অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে বলল, এই যে বরের মাথায় পাকা চুল। নিশ্চয়ই বয়স লুকিয়েছে। কলপ লাগাবার সুযোগ পায়নি।

দ্বিতীয়া শ্যালিকা বিষয়টিকে লঘু করার জন্য বলল, বেশী মাথার কাজ করলে অনেক সময় অল্প বয়সে চুল পাকে। বিশেষ করে গবেষকদের, তা'ছাড়া বর বিজ্ঞানের ডকটরেট। কাজেই .....।

অন্যান্য মেয়েরা প্রায় ঝলসে উঠল। তুমি চুপ কর। চৈকিৎসক দিক।

সোমেশ, মৃদু হেসে হাত জোড় করে বলল, বিশ্বাস করুন, এ পাকা চুল ক'টি বয়সের পাকা নয়। আমি বেশী জল খাই। জল কারবাইড দিয়ে পাকানো হয়, কাজেই মাথার চুল ক'টি কারবাইডে পাকা বলতে পারেন।

UJJWAL BHARAT	*From IV (See Rule 8)*
1. Place of Publication	—Baguiati, Po. Ashwininagar, Calcutta-59 West Bengal
2. Periodicity of its Publication	—Monthly
3. Printer's Name	—Bimal Kumar Chakravarty
Whether citizen of India ?	—Indian
Address	—Rabindra Pallee, P.O. Jangra, 24 Parga.
4. Publisher's Name	—Bimal Kumar Chakravarty
Whether citizen of India ?	—Indian
Address	—Rabindra Pallee, P O. Jangra, 24 Parga
5. Editor's Name	—Renu Mitra
Whether citizen of India ?	—Indian
Address	– Naranarayan Ashram, P. O. Ashwininagar, Calcutta-59
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	—Naranarayan Ashram, P.O. Ashwininagar, Calcutta-59

I, Bimal Kumar Chakravarty, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 15th January, 1980

Sd / Bimal Kumar Chakravarty
Signature of Publisher

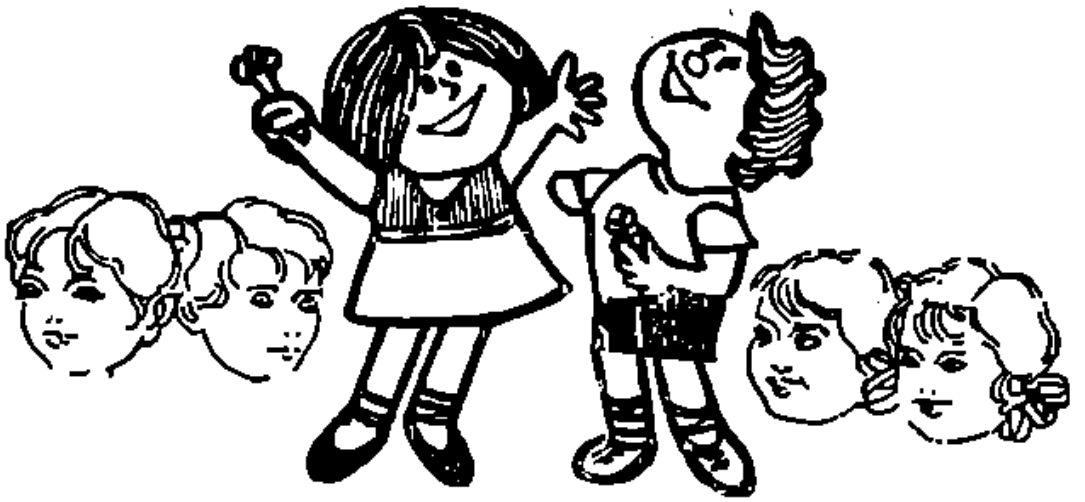

শিশু জগৎ

বাদুর-ঝোলা ট্রামে-বাসে

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

আতাগাছে তোতাপাখী
ডালিমগাছে বেল !
ট্রামে-বাসে ভীড়ের চাপে
দারুণ মজার 'খেল'!!
ট্যাকসি-মিনি-ডবল ডেকার
স্পেশাল কিংবা 'এল'!
সবথে নিয়ে উঠুন দাদা
দেখেই পাবেন তেল !!

জেনে রাখা ভাল

কৃষ্ণেন্দু দত্ত

প্রচলিত কাহিনী অনুসারে রাহুনামক এক দৈত্য সূর্য এবং চন্দ্রকে গ্রাস করে। সূর্যকে গ্রাস করলে হয় সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রকে গ্রাস ক'রলে চন্দ্রগ্রহণ। প্রকৃত ঘটনাটি হল সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে যখন একই সরলরেখায় এসে পড়ে তখন চন্দ্র আড়াল করায় সূর্যকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়না বা আংশিকভাবে দেখা যায়। তাই হল সূর্যগ্রহণ। এইভাবে পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে। তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ।

অমাবস্যার পর থেকে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা এই সময়ের মধ্যে আকাশে চাঁদের আয়তনের যে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে আপাতদৃষ্টিতে তা দেখে মনে হয় চাঁদই যেন ছোট বড় হয়। আসলে ঘটনাটা কিন্তু অন্য রকম। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবী আবার সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের আলোতেই চাঁদ আলোকিত। ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে থেকে পৃথিবী চাঁদের যেটুকু অংশ আড়াল করে রাখে সেটুকু অন্ধকার থাকে, অবশিষ্ট অংশ আলোকিত হয়। পূর্ণিমাতে সূর্যের সম্পূর্ণ আলোই চাঁদ পায়, অমাবস্যায় মোটেই পায় না। চাঁদ কখনও ছোট বড় হয় না।

তোমরা নিশ্চয়ই রামধনু দেখেছ। আসলে রামধনু হচ্ছে সূর্যরশ্মির বিচ্ছুরণ। সূর্যরশ্মিতে বেগুনী, ঘন-নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল এই সাতটা রঙ থাকে। বৃষ্টির জলকণার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় সূর্যের আলো এই সাতটি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে আকাশের গায়ে পড়ে। তখনই রামধনু দেখা যায়।

অখিলবন্ধু : স্বপন বুড়ো

দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

৯ই কার্তিক রবিবার (১৩০৪ বঙ্গাব্দ) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার লাকুটিয়া গ্রামে নিয়োগী বাড়িতে ভবতারিণী দেবী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। বেজে উঠলো শাঁখ। মা সরস্বতী নবজাতকের কপালে এঁকে দিলেন তার যশের আশীর্বাদ। পিতা দীনবন্ধু নিয়োগী দেখলেন সন্তানের কচি মুখে সুন্দর মুখ। ছেলের নাম রাখা হলো অখিলবন্ধু। মামা কবিরাজ

স্বপন বুড়ো

মধুনাথ সেনগুপ্তের কাছে মানুষ হতে লাগলো অখিল। গ্রামের পাঠশালায় বন্ধী সময়টুকু ছাড়া বাকী সময় কাটতে লাগলো এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে, ছোট নৌকা বেয়ে খালে-বিলে, আর দু চোখ ভরা মায়াবী স্বপ্ন নিয়ে মধুনাথের আশ্রয়ে। বেশ কাটছিল দিনগুলো। ষষ্ঠীশ-চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য গ্রামের মায়া কাটিয়ে চলে আসতে হলো কলকাতায় মামার বাড়িতে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিটি কলেজে আই এস সি পড়তে ভর্তি হলো অখিল। আই-এস-সি পাশ করার পর বি এস সি আর পড়া হলো না নিজের খেয়ালের জন্য। ভর্তি হলো 'গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে'। কোথায় বিজ্ঞান আর কোথায় শিল্পকলা !! ছোটবেলা থেকেই একটা চাপা ঝোঁক তাকে নিয়ে এলো শিল্পের অঙ্গনে। শিল্পকলার সাথে যুক্ত হলো আরো একটি অভিজ্ঞতা নাম শ্রী অখিলবন্ধু নিয়োগী (শ্রীঅ)। সেই সঙ্গে শুরু সাহিত্য সাধনা। তার লেখা ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশ পেল শিশুসাথী পত্রিকাতে। সেই কিশোর উপন্যাসটির নাম 'বেপরোয়া'। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট হিসাবে তিনি বহু কাজ করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞাপন, চিত্রনাট্য রচনাও করেন। যেমন ডকুমেন্টারী ফিল্ম 'শ্রীনিকেতন'-এর চিত্রনাট্য রচনা তাঁরই। সে সময়ে তাঁর লেখা 'স্বপনবুড়ো' নামে একটি শিশু নাটিকা রেকর্ড হওয়ার পর বাজারে হৈ চৈ পড়ে যায় যা শুনতে শিশু বুড়ো কেউ বাদ ছিল না। 'স্বপনবুড়ো' নামের রূপকটিতে তিনি নিজেই স্বপনবুড়োর চরিত্রটি অভিনয় করেন।

১৯৬১ সালে যুগান্তর পত্রিকাতে যোগ দেন 'ছোটদের পাতাড়ি' বিভাগটির পরিচালক হিসাবে। রেকর্ডে যে সেই স্বপনবুড়ো নামটি তিনি তখন ছদ্মনাম হিসাবে গ্রহণ করেন। নিজের কথা বলতে পারি, ছোটবেলায় আমি কবে রবিবার আসবে 'ছোটদের পাতাড়ি' পড়ে নিয়ে সে আশায় বসে থাকতাম। রবিবার সকলের আগে কাগজটি নিয়ে 'ছোটদের পাতাড়ি' যেন গোগ্রাসে গিলে খেতাম। পাতাড়ির সভ্যও হয়েছিলাম। এখনোও সেই সভ্য-কার্ড আমার কাছে আছে। তিনিই 'সব পেয়েছির আসর'-এর প্রতিষ্ঠাতা। কি প্রচণ্ড সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় তিনি রেখেছেন তার ব্যাখ্যা চলে না। তাঁর লেখা বনপলাশীর ফুলে ডাকাত, যাদুছায়া, পাখী শ্যামলের সাঁকো, আমার মায়ের মুখ, কিশোর অভিযান, গল্প থেকে গল্প আগে, বাঘুই বান্দা বোষ্টিং, যন্ত্র ছেলে পড়তে পড়তে সময়ের কথা খেয়ালই থাকে না! মধুমালতের জন্য প্রথম শিশু নাটিকা 'হিজু পাখী' লেখেন। মহাপুজা, বাঙ্গা'ইতা, বাণী দেশে দেশে মোর ঘর আছে, পালোপার্বণ ছড়া গল্প, স্বপনবুড়োর ছড়া, স্বপনবুড়োর ছড়োর, আরো কত কি যে

তিনি শিশু-সাহিত্যের তা ওাতে জমা করেছেন বা এখনোও করে চলেছেন তা ভাবতে অবাক লাগে !! শিশু সাহিত্য সেবী স্বপনবুড়ো ১৩৪২ সালে "আন্তর্জাতিক শিশু রক্ষা সমিতির"র ডাকে জিনেভা যান। 'লাভ সমুদ্রের তের নদীর পারে' তাঁর সেই ইউরোপ দেখার সার্থক রূপদ। স্বপন-বুড়ো যে শিশুদের, তার জাজ্বল্য প্রমাণ তাঁর বাড়ির নীচে অগুণতি উলঙ্গ, ছেঁড়া জামা প্যান্ট পরা কচি কাঁচার দল। সারাক্ষণ কিচ মিচ্ করছে, ওরা জানে এই শিশু-দরদী ভারী ভারী সাহিত্যের কথা স্বপনবুড়ো ওদের শোনাবে না। যে যাই বলুক, স্বপনবুড়ো ওদের তাড়াবে না। ও জাদুমাটি ওদের পরম নিশ্চিন্ত খেলার স্থান।

শিশু সাহিত্য পরিষদের 'ফটিক স্মৃতি' পুরস্কার ও এম দি সরকারের 'মৌচাক' পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হ'য়েছেন। কিন্তু এটাই কি সব? মনে প্রশ্ন জাগে!

জীবন সায়াহ্নে স্বপনবুড়োকে দেখলে মনে হয় না অর্থ তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছে!

এখনোও সভা সমিতি, শিশু উৎসব যেখানেই ডাক আসুক না কেন সেখানেই সর্বাগ্রে পা-বাড়িয়ে আছে সেই চিরনবীন শাকবাইলের অখিলবন্ধু স্বপনবুড়ো !!

সম্ভায়ের দাম

অমিত রায়

হাস বাবুর বই পড়ার ভারুন নেশা। তিনি অফিস থেকে ফিরে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় বই কিনতে বেরোন।

প্রতিদিনের মত সেদিনও হাসবাবু বই কিনতে বেরোলেন। একটা মাঝারি গরণের দোকানে ঢুকলেন। দোকানদার হাসবাবুকে ডেকে সব ধরণের বই দেখাতে শুরু করল। হাসবাবু একটা নভেল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ নভেলটার দাম কত?" দোকানদার বলল, "পাঁচ টাকা"।

হাসবাবুর স্বভাব কোন জিনিষ কেনার আগে সব খুঁটিয়ে দেখে কেনা। দোকানের ঠিক পশ্চিম কোণের দিকে হাস বাবুর নজর গেল। ঐদিক থেকে পাঁচ ছয়খানা বই আনিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। হাসবাবু দোকানদারকে ঐ বইগুলোর দাম জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

আধঘন্টা পরে তিনি দোকানদারকে বললেন, 'আচ্ছা ঐ নভেলটার দাম পাঁচ টাকা তো'! দোকানদার উত্তর দিল 'হাঁ'। হাসবাবু বললেন, "তাহলে ওটার দাম কত?" দোকানদার জানাল, "পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা"। হাস বাবু বললেন, "এটা কিরকম হল? আপনি একটু আগে বললেন পাঁচ টাকা আর এখন বলছেন পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা"। দোকানদার গম্ভীর মুখে বলল, "বাঃ আপনার সাথে এতক্ষণ কথা বললাম। আপনি আমার কত সময় নষ্ট করলেন। সময়ের কি আর দাম নেই?"

হাসবাবু অবাক হয়ে শুধু দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

With Best Compliments of :

Phone : 34-3202

BENGAL AGRICO

Manufacturers of—

SHOVEL & KODALI

Office :—

187 Chittaranjan Avenue

Calcutta-7

নারী জগৎ

যেন না ভুলি

সমাজ সেবিকা সুধারাণী দত্ত

নারায়ণী মিত্র

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে যে সামান্য কয়েকজন বাঙালী মহিলা মেয়েদের ক্রীড়া সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনাত্মক সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য খেলাধূলা, এথলেটিক্স্ এর প্রথম আয়োজন পক্ষে তিনিই ছিলেন অন্যতম পুরোধা। শ্রীমতী তাঁরই চেষ্টায় প্রথম কলকাতায় রাজ্য ভিত্তিক মহিলা স্পোর্টস্ এর অনুষ্ঠান হয়েছিল।

জন্মসূত্রে কলকাতার দুই প্রখ্যাত প্রাচীন বনেদী তথা সংস্কৃতি জগতে সুপরিচিত দুইটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগ। পিতৃকুল কলকাতার বিখ্যাত মিত্র পরিবার মাতুলালয় শোভা-বাজারের দেব পরিবার রাজা নবকৃষ্ণের বংশ। সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের ডিরেক্টর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডাঃ সুবোধ মিত্র মহাশয়ের তিনি ছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী, পিতা সুরেশচন্দ্র মিত্রের তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কলিকাতার সাংস্কৃতিক জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হারাণচন্দ্র দেব ছিলেন তাঁর মাতুল। এলাহাবাদ শহরে

সুধারাণী দত্ত

তাঁর মায়ের মাতুলালয়ে ১৯১৭ সালের ৮ই অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ক'লকাতার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডিরোজিয়ো ইনষ্টিটিউশনে তিনি প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রী অবস্থায় গান শেখাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। প্রাথমিক চিকিৎসা ও খেলাধুলায় তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। এই দব বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতাও অর্জন ক'রেছিলেন। সেই যুগে মেয়েদের জন্য খেলাধুলার কোই বা আয়োজন ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও তিনি যতটা পেরেছিলেন শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে মেয়েদের খেলাধুলার প্রসারের আগ্রহ তখনই তাঁর অর্জন হচ্ছিল। বিধাতাপুরুষও হয়তো তার এই ক্রীড়ানুরাগ লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাঁর বাসনা পূরণে এগিয়ে এসেছিলেন। ছাত্রী অবস্থায়ই প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মোহনবাগান ক্লাবের এবং পরবর্তী কালে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক তা: মন্মথ দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯৩১ সালে। পরে তিনি স্বামীর কাছেই পড়াশুনা করেন।

কিন্তু সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সুধারাণীর কর্মোদ্যম সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। এক একটি মানুষ থাকে যাদের কাছে জগৎ সংসারই আপন সংসার হ'য়ে ওঠে—তাঁদের হয় "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। সুধারাণী ছিলেন সেই জাতের মানুষ। দিনে দিনে তাঁর সমাজ সেবা মূলক কাজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল নব নব দিগন্তে। উত্তর কলিকাতা সমাজ সেবা সমিতির (মহিলাবিভাগ) তিনি ছিলেন সাধারণ সম্পাদিকা। এই সমিতি শিশুদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দরিদ্র শিশুদের বিনা খরচে পড়াশুনার ব্যবস্থা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রেছিল। তৎকালে এই সমিতি উত্তর কলিকাতার জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ ক'রেছিল। শিশুদের দৈহিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য বহু শিশুকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলা শিশু উৎসবের কার্য্যকরী সমিতির তিনি সভ্যা ছিলেন। তিনি উত্তর কলিকাতা মহিলা সমিতি ও সারাভারত মহিলা সংগঠনের সদস্যা ছিলেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাজেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা উপসমিতির সভ্যা ছিলেন। কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমে তিনি সর্ব্বদাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে এসেছেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা তিনি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হন। সে সময় কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে সমাজ সেবা মূলক কর্মীদের মধ্যে সুধারাণী দত্ত ছিল এক বিশেষ নাম। তার স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাঁকে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভা নির্ব্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল। এ মনোনয়ন তিনি নিজে চেয়ে নেন নি। তার উপর অর্পিত হ'য়েছিল। আর ক'লকাতা থেকে বহুদূরে পল্লী বাংলার এক কেন্দ্র থেকে তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিতও হ'য়েছিলেন। এতেই বোঝা যায় যে তাঁর জনসেবার খ্যাতি শুধু ক'লকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিলনা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে প'ড়েছিল। তাঁর কর্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ কলিকাতা মহানগরীতে হ'লেও গ্রাম- বাংলার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক কম ছিল না। ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে পর পর তিন বার তিনি বিধান সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন বাঁকুড়া জেলা থেকে: প্রথম দু'বার ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে রায়পুর থেকে এবং ১৯৬৭ সালে ওন্দা থেকে। এর মধ্যে একবার অর্থাৎ প্রথম বার তিনি নির্ব্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এমনি ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা। পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অন্যতম অর্থনগরী অকল বাঁকুড়া জেলার এই দুই কেন্দ্রের মানুষেরা বছরের পর বছর তাঁর কল্যাণ স্পর্শ পেয়েছে। নিজের কেন্দ্রে তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। আজন্ম সহরে মানুষ হলেও সেখান থেকে ডাক এলে তিনি অস্থির হ'য়ে প'ড়তেন। তাই বুঝি ১৯৬৭-এর বিধানসভা নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরাডুবির দিনেও বাঁকুড়া জেলার ওন্দা কংগ্রেস প্রার্থী সুধারাণীকে নির্ব্বাচিত করতে দ্বিধা করেনি।

কিন্তু খ্যাতির শিখরে উঠলেও সুধারাণীর স্বভাবের কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। তাঁর মিষ্ট ব্যবহার

ও ধরণী প্রাণের স্পর্শে বিযুক্ত বিরাট জনসমষ্টির কাছে তিনি ছিলেন সুধাদি, সুধাবৌদি, সুধাদিদি, বা সুধারাণী। এই সদা হাস্যময়ী মহিলা সবারই ছিলেন একান্ত আপনজন। গঠনমূলক কর্মে তাঁর উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল অপরিসীম। যিনিই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাকেই তিনি তাঁর স্বভাবের এক অপূর্ব চৌম্বক আকর্ষণে তাঁর গঠনমূলক কর্মের শরীক করে নিয়েছেন। তাঁর স্বামী, ছেলেমেয়েদেরও তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর এই কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।

স্বামী ডাঃ সমর গুহ বাড়ী ক'রে উঠে এলেন পূর্ব কলিকাতায় বেলিয়াঘাটায়। নূতন বাড়ীতে এসে যথারীতি সুধারাণী এই এলাকায় নূতন ক'রে সংগঠন ক'রতে শুরু করলেন। এপাড়াটা ছিল একটু সেঁতা রক্ষণশীল প্রকৃতির। মেয়েদের সংগঠন বড় একটা ছিল না। সুধারাণী বাড়ী বাড়ী ঘুরে গৃহকর্তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা ব'লতে শুরু ক'রলেন। অচিরেই দেখা গেল যে তাঁর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাড়ীর কর্তারা তাঁদের মেয়েদের অনুমতি দিলেন সুধারাণীর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে। এমনি ক'রে তিনি "বৈঠকী" নামে এক সমাজ কল্যাণ ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের পর বছর অনেক কল্যাণ মূলক কাজ করা হ'য়েছে। দুঃস্থ মেয়েদের বিবাহে সাহায্য, মেধাবী দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা, বস্ত্র বিতরণে সাহায্য, শিশু হাসপাতাল ও পোলিও হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদের সাহায্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সেবামূলক কাজ ছাড়াও ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি, ভারতসেবাশ্রম সংঘ, মাদার টেরেসার মিসনারী অফ্ চ্যারিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে তাদের সেবা কার্যের জন্য এই বৈঠকী থেকে আর্থিক সাহায্য করা হ'য়েছে। এমনকি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে জোয়ানদের জন্য খাদ্য সরবরাহও এর কর্মতালিকায় রয়েছে।

সুধারাণী ছিলেন আদর্শবাদী। কোনও প্রলোভনই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। কংগ্রেস বিভাজনের পর ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পশ্চিমবঙ্গের সংগঠনে সুধারাণী দত্তকে সামিল করার উদ্দেশ্য বারবার তাঁর ব্যক্তিগত দূত পাঠাতে লাগলেন। সুধারাণী অটল। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ ক'রলেন না। হয়তো নব কংগ্রেসে প্রবেশ ক'রলে বেশ কিছু দায়িত্ব বা ক্ষমতা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন না। তবে কংগ্রেস বিভাজনে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বোধ ক'রলেন। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সাময়িক ভাবে তিনি তাঁর স্বামীর অসুস্থতার অজুহাতে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন তাঁর মেজ মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। বেশ কিছুদিন পরে ফিরলেন সেখান থেকে ১৯৭৩ সালে ততদিনে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটা স্তিমিতলাভ ক'রেছে। তিনি অবশ্য ক্ষয়িষ্ণু আদি কংগ্রেসেই র'য়ে গেলেন। এই সময় তিনি তাঁর ছোটবোন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্ম বিভাগের রীডার শোভারাণীর সঙ্গে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে ক'লকাতায় ফিরে এসে কিন্তু তিনি আর বেশী দিন ধরাধামে রইলেন না। সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৪ সালের ২০ শে জানুয়ারী এস্. এস্. কে হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর গুণমুগ্ধ এবং তাঁর সমাজ সেবামূলক কর্মের অন্যতম সহযোগী দেবীপ্রসন্ন রায় মহাশয় তাঁর মনোবেদনা একটি সুললিত পদ্যে প্রকাশ ক'রেছিলেন। এতে স্বর্গতা সুধারাণী দত্তের বাক্তিত্ব ও কর্মের বিভিন্ন দিক খুব সরলভাবে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে ব'লে সেটা এই সঙ্গে সংযোজিত ক'রে নিবন্ধ শেষ ক'রছি—

সহসা ধরণী উঠিল চমকি শুনি নিদারুণ ধ্বনি
দারুণ বারতা কর্ণে পশিল নাই—নাই সুধারাণী
মনে হ'ল ইহা হয়তো ঘটনা, কখনো সত্য নয়,
শঙ্কা দোলায় কম্পিত বুক, যদি সে সত্য হয়।
বেলা বেড়ে চলে সবে হাঁকি বলে, একি নিদারুণ বিধি
বিনামেঘে বাজ, কোথা গেলে আজ আমাদের সুধাদিদি
আঁখি পল্লব সিক্ত সবার' হিয়া বেদনায় ভরা
কাঁদিছে সকলে হারায়েছি আজ আমাদের সহোদরা
অবশ চরণে ছুটিয় যেথায় ছিলেছে সকল জন
নয়ন ধারায় হ'তেছে ধৌত সেথায় ধরণী তল।

জিজ্ঞাসাবাদে থামিল এবার, চুকে গেল সংসার
সবাকারে দেহ রয়েছে শয়ান, মুদিত নয়ন-দ্বয়।
জীবন প্রদীপ নিভে গেছে,তবু মলিন হয়নি দেহ,
সহাস বদন দেখিয়া সবার মনে জাগে সন্দেহ।
মনে হ'ল যেন হয়তো ক্ষণিকে কহিবেন আঁখি মেলি,
সোহাগে সবারে ডাকিবেন পুন: ভ্রাতা ও ভগিনী বলি।
জমাট রক্ত হইবে তরল, সচল হইবে নাড়ি,
লাজ বিজড়িত মৃদু হাসি হেসে উঠিবেন তাড়াতাড়ি।
ভ্রান্ত মনের অলীক বাসনা মিথ্যা হইল সব
দেবতা কখনো ফিরে নাহি দেন অপহৃত বৈভব।
দেখেছো কি কভু কৃতান্তে কেহ হইতে করুণাময় ?
পাষাণ হৃদয়ে দৌহ কপাট সদাই বন্ধ রয়।
কুয়াসাবৃত মাঘের প্রভাত, সিক্ত শিশির প্রাতে,
ধরণীও বুঝি মর্মে আহত ভাসিছে শোকাশ্রুতে।
সিঁদুরের রেখা ভাতিছে সিঁথিতে চির নিশ্চিন্তা সতী,
ওমর, ওমরা, বধূরা কাঁদিছে, বিরহে কাঁদিছে পতি।
কপালেতে কর হানিছে জননি শোকে মূর্চ্ছিতা মাতা,
যেন গো তাহার বুকের মাঝারে জ্বলিছে শ্মশান চিতা।
চলে গেলে হায়, সব মায়াজাল ছিঁড়ি নিমেষ ভরে,
চির বিস্মৃত অজানা, অদৃষ্ট, অদৃষ্টচক্রের পারে।
সাংগঠনিক ক্ষমতা তোমার ছিল সকলের চেয়ে,
পাবেনা এদেশ তোমার মতন করিৎকর্মা মেয়ে।
কভু কোন কাজে, স্বদেশে বিদেশে যেখানে গিয়াছ তুমি,
মর্ম্ম মাঝেতে ভাবিয়াছ সেটা তোমার কর্ম্ম ভূমি।
রাজনৈতিক মঞ্চে তোমায় দেখিয়াছি নিরবধি
তুমি ছিলে সদা সত্যাশ্রয়ী, তুমি অহিংসাবাদী।
স্বরাজ আনিতে, বিদেশী রাজের ঘুচাতে প্রবঞ্চনা
করিয়াছ পণ, দিয়াছ ভাষণ, সহিয়াছ লাঞ্ছনা।
দেখেছি তোমায় বিধান সভায় যশের মুকুট শিরে,
দুর্গতজন পার্শ্বে দেখেছি ভাসিতে অশ্রুনীরে।
ক্রীড়া প্রাঙ্গণে দেখেছি বালক বালিকা মাঝে,
যুবীগণ মাঝে দেখেছি তোমায় ধনী, লীলাবতী সাজে।
শান্তিসংঘে দেখেছি তোমায় জাতীয় পতাকা তলে,
অধিনায়িকার বেশেতে দেখেছি ভারত সাঁতাক দলে।
গৃহপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছি যেন, লক্ষ্মী স্বরূপিণী মাতা
অনাথআশ্রমে দেখেছি তোমায় সেবাব্রতা নিবেদিতা,
'বৈঠকী' মাঝে দেখেছি তোমারে সন্তানেরই পরে,
দিয়েছ তাঁদের করে প্রেরণ সতত নির্ব্বিবাদে।
আমাদের মাঝে পেয়েছি তোমায় মোদের মনের মত
কার্যক্ষেত্রে দেখেছি সতত সাধিতে কঠোর ব্রত।
তোমা হারা হ'য়ে হয়েছি আমরা সর্ব্বহারার দল,
কে যোগাবে আজ মোদের শিরায় সাহস, শক্তি বল।
জনগণ সেবা ছিল যে তোমার জীবনের ধ্রুবতারা
সেই সাধনায় কত না সময় থাকিতে আত্মহারা।
সমাজের সেবা মাধ্যমে দেশে করিতে দেশের সেবা,
সবারে সেবিতে করিলে গঠন তুমি "বৈঠকী সভা"।
চিরদিন ছিলে তুমি সত্যের শান্তির পূজারিণী,
তাই তোমা দিল মহিলামহলে শ্রেষ্ঠ আসন খানি।
ভুবনমোহন মাধুরী যে ছিল তব সাম্যের গানে,
সে মধুময় ঢালি দিয়েছিলে সখীদের কানে কানে
ধরায় প্রেমের অনুরাগে মন বেসেছিলে সবে ভাল,
আঁধারেতে পথ দেখাত সতত তোমার আঁখির আলো।
ক্ষুধিতেরে দিতে ক্ষুধার অন্ন নিয়েছিলে মহাব্রত,
ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছ অবিরত।
ছুর্দ্দিনহত সুধারানে সবে করেছিলে আপনার
তাই তোমাবিনে সকলের প্রাণে উঠিতেছে হাহাকার।
বিগত জনমে ছিলে তুমি কোন দেবতার পূজারিণী
অমরা হইতে বুঝি ধরাধামে এসেছিলে সুধারাণী।
তাই বুঝি আজি আসি দেবদূত দেবতার প্রয়োজনে
সঙ্গে করিয়া নিয়ে গেল তোমা সাদর সম্ভাষণে।
মোরা দলে দলে মিলিয়া সকলে গিয়া দেখি হায়, হায়,
শূন্য স্বর্গভাণ্ড হয়েছে, সুধা নাই সুধা নাই।
মহানিদ্রায় মুদিত নয়ন, শিয়রে ধূপের শিখা,
অগুরুগন্ধে সাজায়ে, ললাটে আঁকি চন্দন-রেখা,
পুষ্পমালো ঢাকি তনুখানি, পদে প্রণমিয়া তবে,
নয়নের জলে করি তর্পণ ফিরিয়া আসিনু সবে।

বেদনা বিধুর, বড় বাথাতুর নগরীর জনগণ,
ফিরিলাম ফিরা নদীর তলে প্রতিধ্বনি বিসর্জন।
যাহারে হারায়ে, আজ আমাদের ফিরা ওরা বেদনাতে,
যার তরে আজ মোদের নয়ন বহে ধারা আঁখি পাতে,
আজি মোরা হারা হীরে কোহিনুর, মোদের মুকুটমণি,
হারিয়েছি আজ সে সন্তানেরই আমাদের সুধারাণী।
ক্ষুদে হাসি শেষ নিয়াছে বিদায় সেই প্রিয়া নয়োদয়া
মনে পড়ে তার অমিয় মাখান প্রীতিভরা আঁখিতারা।
মনে পড়ে সেই উৎসদীপ্ত মোহের আনন খানি
কর্ণে ধ্বনিতে লোহাগসিক্ত সেই কণ্ঠের বাণী।
বেসেছিল ভাল "বৈঠকীদলে" সঁপি দিয়া মনপ্রাণ
তোমার পতাকা উড়াতে সকলে গাহি যাবে জয়গান।
হেথা চলাচলে যে পথে আঁকিল তোমার চরণ-রেখা,
যদিও সে পথ কঠিন কঠোর শত কণ্টকে ঢাকা।
হোক্ দুর্গম আমরা চলিব সেই রেখা অনুসারি
অলক্ষ্যে হতে পড়িবে তোমার অযুত আশীষ ঝরি।

(৩২১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমৎপুরুষোত্তমানন্দ

উপযোগী সময়ের। যুগধর্মকে ডিঙ্গাইয়া কোন জনীয় ধর্ম, জনীয় শাস্ত্র ব্যবস্থা, জনীয় তর্কবিদ্যা, জনীয় পদার্থবিদ্যা, জনীয় জীবন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম, জনীয় রাজনীতি-সমাজনীতি কিছুই চলিবে না। যত বিরুদ্ধই হউক না কেন সমগ্রের মধ্যে তাহারও একটি স্থান আছে। Thesis, antithesis দুইই synthesis-এর মধ্যে সত্য। প্রত্যেকের প্রত্যেক বাধিয়া প্রত্যেকের সঙ্গে অভিন্ন হইবার যুগই বর্তমান যুগ। "তোমার মহাবিশ্বে প্রভু হারায় না তো কিছু"। যাহারা নিজেদের বিপক্ষের কথা বলিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে অপরের দোষ কীর্তনের অধিকার নাই। নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সম্যক চেতনা না রাখিয়া যাহারা অপরের দোষ সম্বন্ধেই শুধু সচেতন, তাহারা মিথ্যাচারী, তাহারা বিশ্বতেই বিশ্বে সাম্যবাদ আনিতে পারিবে না। বিশ্বনাথের ব্যবস্থায় ইহাদের মরণ অনিবার্য্য। সর্বক্ষেত্রে সব পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল অযুক্ত হউন। বিশ্বের বুকে সর্বক্ষেত্রে সাম্যবাদ জন্মিয়া উঠুক।

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের শেষভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৪৭-২১৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed *a/c* Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সঙ্গে উজ্জ্বল ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ করবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে হওয়া প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

With Best Compliments FROM

M/s. Accurate Engineering Industries

208/2, Rash Behari Avenue
C A L C U T T A - 700 029

Leading Folding Umbrella
F r a m e & Different
Engineering Items
Manufacturer.

UJJWAL BHARAT Registered WB/NP-34 Central Regd. No. R. N. 2571/57

SUPER SHELVINGS CORPORATION

23A NETAJI SUBHAS ROAD
Floor No. 10, Room No. 24
C A L C U T T A - 700 001
PHONE : 22-0236

Manufacturers of :

STEEL SLOTTED ANGLES
CONSTRUCTION SYSTEM.

বিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ প্রেস, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অফিস বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯ (ফোন : ৫৭-১৪৮

৫৯ বর্ষ । ১১শ সংখ্যা । আগস্ট, ১৯৮৬

উজ্জীবন ভারত

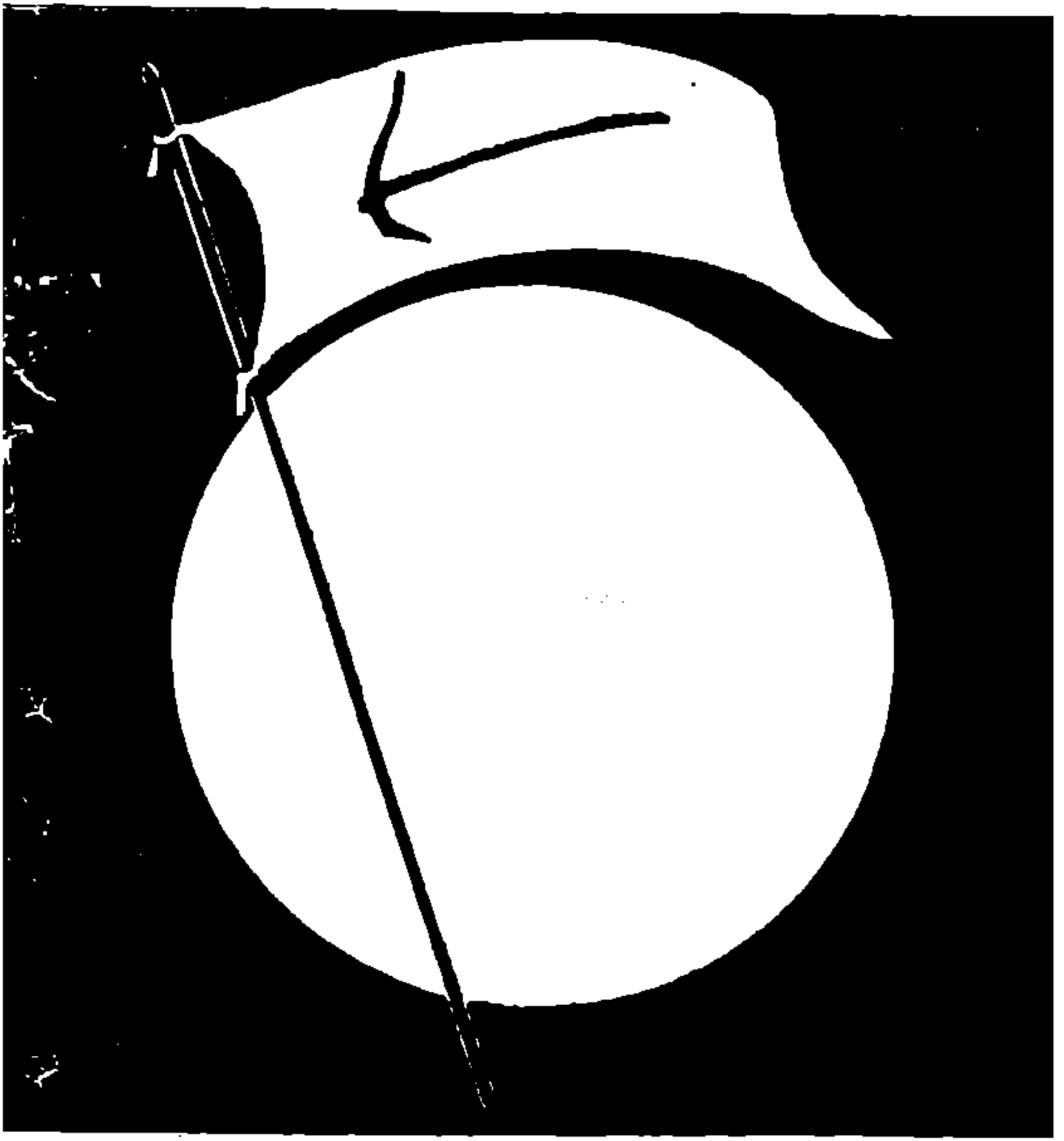

প্রবর্তক আচার্যদেব স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদিকা—রেণু মিত্র

DIAL : 22-5618

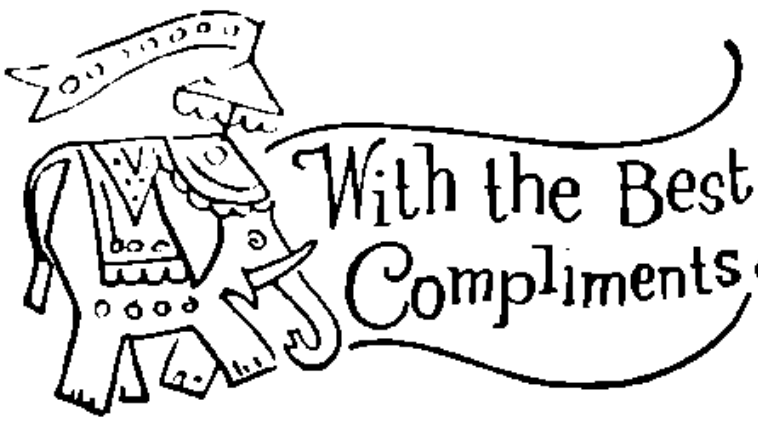

B. S. INDUSTRIES

ENGINEERS & CONTRACTORS

16, Princep Street, 2nd. Floor,

CALCUTTA-700072

SPECIALIST IN :

AUTOMOBILE SPARES & ACCESSORIES.

DEALERS IN :

FAIR MOUNT MOTOR TROLLY. TOWER WAGON, JUMBO ELECT. PLATFORM TRUCK. LISTER BATTERY OPERATED PLATFORM TRUCK COLE'S CRAIN ETC.

স্বল্প সঞ্চয় করবেন কেন ?

কারণ ঃ—

* উচ্চতম হারে সুদ
* সঞ্চয়ের নিরাপত্তা—আপনার টাকা সরকারের হাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ
* জীবন বীমা ও কর রেহাই-এর সুবিধা
* অনুমোদিত প্রতিনিধি মারফৎ সেবার ব্যবস্থা
* মনোনয়নের সুবিধা
* জামিন হিসাবে অথবা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য সঞ্চয় সার্টিফিকেট বা মেয়াদী জমার আমানত বন্ধক রাখার সুযোগ
* পোষ্ট অফিস সেভিংস এ্যাকাউন্টে মাত্র ২০০·০০ টাকা জমা থাকলে বছরে দুবার ১ লাখ টাকা জেতার সুযোগ ও অন্যান্য আরও ১১০০০ টির বেশী পুরস্কার
* আরও বহু আকর্ষণীয় প্রকল্প—বিশদ জানতে হলে যোগাযোগ করুন ঃ—

পোষ্ট অফিস, অনুমোদিত এজেন্ট, জেলা সঞ্চয় আধিকারিক, জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭২, স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, মহাকরণ, কলিকাতা-১।

২৪ পরগণা জেলা তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত

নং ৩৮৩ (৪০) তাং—৩. ৩. ১৯৮০

With Best Compliments of :

Phone : 34-9728

BANDHU ENTERPRISE CORPORATION

ENGINEERS & FOUNDERS

Office :—

207 Chittaranjan Avenue
Calcutta-700006

Factory :—

74/A/1 Benaras Road
Howrah

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সহজ পাঠ্য গীতা	১·৫০
বৃহৎ পকেট গীতা	২·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০
সুলভ পকেট গীতা	৩·০০	কর্মবাণী	৩·০০
পদ্যগীতা	৩·০০	ভারত আত্মার বাণী	১·৫০
নিত্য পাঠ্য গীতা	১·০০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	স্বামী রামমোহন	৬·০০
বীরত্বে বাঙালী	৬·০০	আচার্য জগদীশচন্দ্র	৬·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩·০০
বাংলার কবি	৬·০০	যুগাচার্য বিবেকানন্দ	৮·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০
মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিজ্ঞানের	৩·০০

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৪·০০
নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০
যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের	৪·০০
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০
নৈতিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·৫০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০

সর্বদা ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় অভিনব অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী ● ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

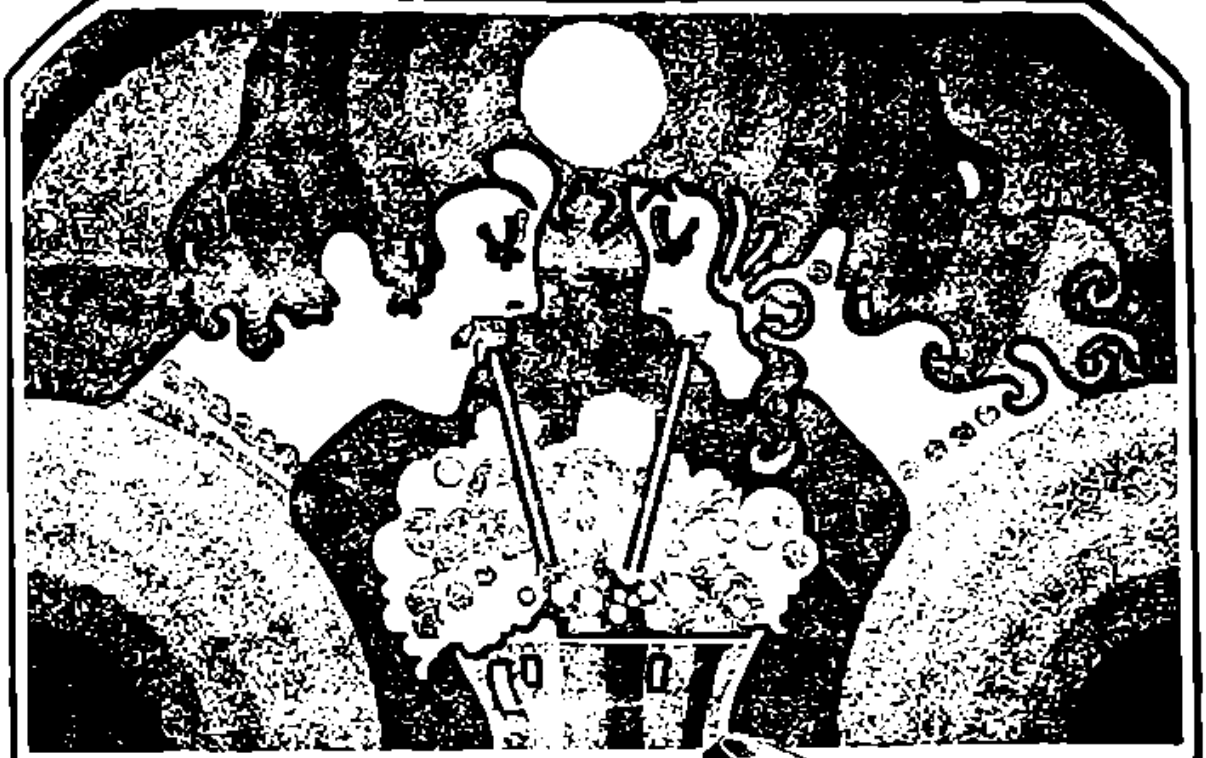

গ্রীষ্মের গরমে বাটা পায়ে হাঁটা যায় আরামে

বাটার আকর্ষণীয় সব নতুন চপ্পলের সারি। হাল্কা, অথচ নির্ঝঞ্ঝাটে টেকে অনেকদিন। খোলামেলা এই আরামটুকুইতো চাই গরমের ভীষণ দিনগুলিতে।

পিয়া ১০
সাইজ ৩-৭

সিল্‌ভিয়া ০১
সাইজ ৩-৭

টপাস ০০
সাইজ ৮-১০

ক্যাওডাদিস ০৫
সাইজ ৮-১০

Bata

Gram : STERILIZER

Phone : 35-3861

Automatic Scientific Supply

Manufacturers of :

HOSPITAL EQUIPMENTS

&

LABORATORY APPLIANCES

Banker :

[P. N. B. (Beleghata Br.)]

Office & Works :

149/1, BELEGHATA MAIN ROAD

CALCUTTA-700010

উদ্বোধন

৩২ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ '৮৬

সূচীপত্র

এ বিশ্বে অল্পও পূর্ণ | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৪০৫

শুদ্ধ পথই শুদ্ধ পরিণতি আনতে পারে | সম্পাদকীয় | ৪০৬

নূতন দিনের আলো | গৌরচন্দ্র সাহা | ৪০৭

মিত্রতা | রমেন্দ্রনাথ মল্লিক | ৪০৭

দারিদ্র্য | মুকুলদেব ঠাকুর | ৪০৭

ভোট রঙ্গ | এম, এ, রহমান | ৪০৮

সেই সুরের মধুর স্মৃতি | স্বপন বুড়ো | ৪০৯

যেখানে ঘরে ঘরে দ্রৌপদী | শরদিন্দু সাহা | ৪১৩

নিমাই ভার নাম | পরেশ সাহা | ৪১৭

মথুরাদার মা | দুর্গা গোস্বামী | ৪২৪

পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ৪২৭

কেষ্ট ঠাকুর | কুমারেশ ঘোষ | ৪২৯

গণ সংস্কৃতি ও গণ মাধ্যম | পার্থ চট্টোপাধ্যায় | ৪৩০

হাঁচ্চো ! হাঁচ্চো ! হাঁচ্চো | ভবানী প্রসাদ মজুমদার | ৪৩৩

জেনে রাখা ভাল | অনিরুদ্ধ মিত্র | ৪৩৩

আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ | অন্নপূর্ণা গুপ্ত | ৪৩৪

ভারতে বিদেশিনী | শেফালী সেন | ৪৩৬

ভারত অষ্ট্রেলিয়ার সপ্ত সমাপ্ত টেস্ট সিরিজ | তপন ধর | ৪৩৯

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র

যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা

মূল্য : এক টাকা মাত্র

বার্ষিক ১২ টাকা (সডাক)

এ বিশ্বে 'অল্পও পূর্ণ'

'এই বিশ্ব ব্রহ্মরূপ। আমি বিশ্বকে ছাড়িতে গেলে বিশ্ব আমায় ছাড়িবে না। আমি আমার বাহিরের জগৎ ও অন্তরের মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার সব ভগবানকে দিয়া মুক্ত হইতে পারি। আত্ম-সমর্পণের লালসা যদি জাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে ত্যাগ করিতেও কোন কষ্ট হইবে না। তখন অদ্বৈত সাধনা যে অধ্যাসের নিবৃত্তি চায়, তাহা কি সহজেই হয় না? ত্যাগ করিতে যাইয়া জীব ভোগের সূক্ষ্ম অবস্থাকেই মানিয়া লইতেছে যার ফলে জীবন হইয়া দাঁড়ায় প্রচ্ছন্ন ভোগী। অবশ্য বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর যে এক অদ্বৈত—এ ধারণা সহজে আসেও না। দুই ভক্তিযোগ আশ্রয় দুই ভাবের এক ভাবুক রচিয়াছে অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করিতে, অপর ভাবুক রচিয়াছে বাহিরের জগৎকে প্রণাম করিতে। ভক্তিবাদ ব্রহ্ম, ও জগতের অদ্বৈতও প্রচার করেন, আবার ভক্তের খণ্ড অভিমানকেও খণ্ডিত বা বিভক্ত করেন। পক্ষান্তরে প্রচলিত অদ্বৈতবাদ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদে বিশ্বকে করেন দুই ভাগ, যার ফলে সাধকের মন প্রাণ অধ্যাস হইতে মুক্ত হইবার সুযোগই পায় না। + +

সব মীমাংসার শেষ মীমাংসা বলিয়া ব্রহ্মসূত্রের অপর এক নাম 'উত্তর মীমাংসা'। আচার্যগণের মতে কর্ম-মীমাংসার শেষই ব্রহ্ম-মীমাংসা। কিন্তু যেখানে 'শেষ' বলিয়া কিছু নাই, সকলই যেখানে অশেষ, সেই অশেষের দেশে শেষ মীমাংসার অর্থ কি? কর্মের শেষ নাই, জ্ঞানেরও শেষ নাই। কর্ম ইঁহাদের মতে অনাদি, কিন্তু বিনাশধর্মশীল। তাই ইঁহারা কর্মের 'শেষ' মানিতে পারেন। লীলাবাদীর কাছে কর্ম অনাদি অনন্ত; জ্ঞানও অনাদি অনন্ত। অনাদি কাল হইতে কর্ম জ্ঞান যুগপৎ হাত ধরাধরি করিয়াই চলিয়াছে। অনন্ত ভবিষ্যতেও চলিবে; কেহই ফুরাইবে না। 'অন্ত ফল' বলিয়া কর্মের শেষ হইবে, অনন্ত অক্ষয় ফল বলিয়া জ্ঞান অবশেষ থাকিবে ইহা পুরুষোত্তম-মীমাংসা নয় ইহা উত্তর মীমাংসা নয়। কর্ম ও জ্ঞান যুগপৎ —ইহাই উত্তর মীমাংসা, উত্তম মীমাংসা। কর্মের অনন্তর জ্ঞান কিংবা জ্ঞানের জন্য কর্ম—ইহাই ছিল এতদিনের মীমাংসা। কিন্তু বর্তমান যুগের মীমাংসা কর্মের অন্তরে অন্তরে জ্ঞান, জ্ঞানের অন্তরে অন্তরে কর্ম। 'অনন্তর'-এর অর্থ—যাহার অন্তর, ব্যবধান নাই। পুরুষোত্তমে অল্পও 'পূর্ণ'। শ্রীনিতাইগোপাল লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ'। যে মীমাংসায় 'অন্তবৎ' কর্ম ও 'অনন্তাক্ষয় ফল' জ্ঞান দুই-ই সমভাবে পূর্ণ, সেই মীমাংসা-সূত্রই এই উত্তর মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র।

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শুদ্ধ পথই শুদ্ধ পরিণতি আনতে পারে

বহু কাল ধরে ভারতবর্ষের বহু দার্শনিক জগৎ ও জীবনের বহু সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন এবং বিভিন্ন সমাধান দিয়েছেন। প্রত্যেকেই অপরের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রত্যেকেই বলতে চান অপর মত গুলি অপেক্ষা তাঁর মত শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর মতেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান রয়েছে। ওদিকে ঈশ্বরবাদও বলে থাকে তাঁর মতেই শুধু স্বর্গ প্রাপ্তি সম্ভব, ইসলামীয় মতেও ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া আর সকলেই কাফের। এই মনোভাবটা আজ রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রবল। যখন রাজরাজড়ার ব্যাপার ছিল তখনকার কথা ছেড়েই দিলাম, রাশিয়ার কম্যুনিজম থেকে যদি ধরি তাহলে দেখি তারা বলল আমরাই একমাত্র সমাধানদাতা এবং আমাদের পথে যে আসবে না সে বর্বর। তারপর চীন এসে বলল কম্যুনিজমের সে যে রূপ দিয়েছে তাই সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে—অন্য সব কিছুকে বাতিল করতেই হবে। বর্তমানের ভারতবর্ষের বহু রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকে বলছে গণতন্ত্রের সেই একমাত্র ধারক ও বাহক এবং অপর কেউ দেশের কোন কল্যাণই করতে পারবে না। আসলে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে দলের হাতে ক্ষমতা যতক্ষণ, ততক্ষণ অপর সকলের ভাগ্য তার হাতে। গণতন্ত্র কি এই কথা বলেছিল?

কি ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে এ কথা কেউ বলছে না যে সকলের দৃষ্টিভঙ্গিরই সত্যতা আছে এবং আমরা সবাই মিলে মিশে দেশের কল্যাণ করব, সেবা করব। আমার (সে আমি ব্যক্তি আমি হোক বা একটি দলবদ্ধ আমি হোক) বাইরে অপরকে স্বীকার না করবার মানসিকতা সর্বত্র। কিন্তু ভারতবর্ষেরই প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সকলের সব মতবাদকে 'সর্বং স্বাহ্যং মুক্তিমত্বাৎ বিদ্বাং কিমশোভনম্' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অপরকে স্বীকার করাই অহিংসা। সে মতবাদের মূলে রয়েছে আমিই একমাত্র—আমার বাইরে যা কিছু তার অস্তিত্ব থাকাই যে অন্যায়, সে অপরকে স্বীকার না করার এই হিংস মানসিকতাদ্বারা বিশ্বের সত্য ধর্মের প্রতি আঘাত হেনেছে। এ বিশ্বে প্রতি ব্যক্তি প্রতি দলের মত প্রতি মতবাদেরও তার স্থানে দাঁড়িয়ে তার সত্যতা রয়েছে, অনন্যতা রয়েছে, বিশ্ব-সভ্যতার কাছে নিশ্চয়ই তার কিছু অবদানও রয়েছে। কিন্তু সমস্ত মানুষকে তার মতবাদই নিতে হবে নইলে সে শাস্তি পেতে বাধ্য, এ চিন্তাধারা আজকের বিশ্বে পুরণো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেকে যদি মনে করতে পারত যে আমার কথা আমি সকলের সামনে উপস্থিত করব হৃদয়ের দ্বার দিয়ে—অস্ত্রের সাহায্যে নয়—এবং অপর মতবাদগুলির সঙ্গে মিলে মিশে করব, কারণ সকলের সব দেখা ও সব করা নিয়েই সমগ্র সত্য প্রকাশিত—তাহলে এত ব্যক্তিগত ও দলগত সঙ্ঘর্ষ চিরন্তন হয় না। সকলকে তার তার মূল্যে স্বীকার না করার মানসিকতায় কোনদিন বিশ্বে শান্তি আসবে না। সকলের হাত ধরাধরিদ্বারাই শুধু সকলের কল্যাণ ও শান্তি হতে পারে—এই কথাটাই শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বলেছেন তাঁর প্রস্থান ত্রয়ের ভাষ্যে এই ভাবে যে শঙ্কর বুদ্ধ জৈন বৈশেষিক আস্তিক্যবাদী নাস্তিক্যবাদী হেগেল মার্ক্স বাস্তববাদী আদর্শবাদী সবাই গৃহীত-কণ্ঠ হয়ে দার্শনিকদের এক মহারাস সংগঠন করতেই হবে আগামী বিশ্বে মানুষী সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে। হয় আমি আছি, নয় তুমি আছ এ ধারণা মনে থাকলে চিরন্তন বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য। তুমি আমি মিলে যে সমগ্র বস্তুর মধ্যে আমরা সবাই বিধৃত, সেই সমগ্রের ভাল মন্দ একসাথে ভাবতে হবে। তথাকথিত গণতন্ত্রের 'মেজরিটি' যে অসত্যের পথে যে ভাবে গণতন্ত্রকে রূপ দিচ্ছে তা মনুষ্যত্বের কলঙ্ক।

আজ তাই পথ বদলাতে হবে—শুদ্ধ পথই শুদ্ধ পরিণতি দান করতে পারে। বিরুদ্ধ বিপরীত সকলে মিলে এক মনুষ্য সমাজে দেশ কাল পাত্র ভেদে সকলের মঙ্গল একই নীতিতে আসবে—চিরন্তন সংঘর্ষের পথ সর্বথা পরিত্যাজ্য।

———

কবিতা

নূতন দিনের গান

গৌরচন্দ্র সাহা

পৃথিবীর মাটি হেরি পদধূলিময়।
লেগে গেছে হেথা মহাপুরুষের মেলা,
আকাশে বাতাসে ধ্বনির বজ্রনাদ।
পতাকার তীরে পরাণে লেগেছে ভয়।

পৃথিবীর ধূলা আঁখির অলেতে ভেজা।
গড়িতেছি ঢেলা প্রাণের পলিতে ভরা।
ভাঙনের স্রোতে নামিয়া আসিছে ধীরে
নরনারায়ণ অধীর অমিত তেজা।

নূতন পৃথিবী গড়ার মসলা মাখি।
পুরোণোর বুকে নেমেছে বিরাট ক্ষয়,
কোথাও লেগেছে অন্তরহীন ফাঁসা।
নূতন জনতা নীরবে মেলিছে আঁখি।

সঙ্কোচ ভুলি অবগুণ্ঠন খুলি
প্রকৃতি মেতেছে প্রাণের আবেগ ভরে;
প্রথম প্রেমের আবেশে আপন হারা
নবজীবনেরে উর্ধ্বে ধরিছে তুলি।

অঘটন ঘটে কালের শঙ্খনাদে,
হাজার বছর মর্মের কোণে রাখা
মুর্ত্তিরে ভাঙে এক নিমেষের ফোঁকে
বিধবার মত অতীত কুহকী কাঁদে।

গম্ভীরে গাহি মহা সত্যের জয়।
আপনারে আমি চিনেছি নূতন করি।
সুন্দর আসে চক্র পাঁচনী ধরি
পরশে তাহার কেটেছে সকল ভয়।

মিত্রতা

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

মিত্রকে কখনো আর শত্রু করা নয়—
প্রাণের কৃষণ চায় মিত্রের প্রণয়,
জীবনের খাঁটি সোনা উৎসমুখ হলে
আলোয় প্রভাত আনে ঐক্যের অনলে।

ভেদ বুদ্ধি জাগে যদি মন্ত্রণার বিষে
নিঃশেষ চেতনা হবে। শুভ্রধান শিষে—
ধনলক্ষ্মী বাঁধা থেকে প্রাণলক্ষ্মী জাগে
জাগৃতি চৈতন্যে এক নিখিল ভূভাগে।

চেনা তারা আলো দেয় স্নিগ্ধতা সুনীল,
অচেনা তারারা কেন আলাময় ঝিল?
শরীরে যন্ত্রণা দিয়ে ফোস্কা ফোটে আর
প্রেমের আসল ছবি খোলে না বাহার।

প্রত্যাশিত প্রার্থনায় অভিজ্ঞান আসে—
যখন অজানা মন জানার উল্লাসে।

দারিদ্র্য

মুকুলদেব ঠাকুর

বড়ো বেশী কোরে একলা ছিলেন অন্ধকারে;
শুধা রুটি তিনি চিবোতেন শুধু ক্ষিদের সময়।
প্রতি সন্ধ্যায় ঘরে এসে কেউ বাজাতো না শাঁখ—
অথবা, ভুলেও জ্বালিয়ে দিতো না প্রদীপের আলো:
লোকে বলে: "তিনি ভালোই ছিলেন, আছেন ভালো।"

• উজ্জল ভারত অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত

ভোট রঙ্গ

এম, এ, ছাত্তার

দীর্ঘ দিনের পর আবার ভোট এসেছে। জনগণের মুখে নতুন করে মিষ্ট মধুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। এবার নতুন করে তারা সরকার গঠন করবেন। যে সরকার তাঁদের সুখ দুঃখ বুঝবেন তাঁকেই তাঁরা ভোট দেবেন।

শরতের শিউলি ঝরা পুলক ভরা সুমধুর দিনটি আজ। বড়ই ভাল লাগছে গফুর বুড়োর। ঠিক এই সময় একটা দাঁড় কাক ফুল দোলানো শিরীষ গাছটার কোন্ পত্রের অন্তরালে থেমে থেমে কা—কা—কা রবে ডেকে উঠছিল তা-ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

এমন শিউলি ফোটা সুন্দর দিনে কাকের ঐ কর্কশ রব গফুর বুড়োর শুনতে ভাল লাগে না। বুড়ো, কাকের ঐ কু-রব শুনে মন্তব্য করেন, দীর্ঘ পাঁচ বছরের পর আবার ভোটের দিন এসেছে। 'ওর' মনে কি আনন্দ লাগে না? না লাগে লাগুক, ওর তো কাজ হচ্ছে পরের জিনিষ ছো মেরে নিয়ে যাওয়া।

চারিদিক ভোটের ক্যানভাসের কান ফাটানো মাইকের শব্দে কান ঝালা-পালা করে যাচ্ছে। মানুষের মন অস্থির হয়ে উঠেছে। সুখার কাতর অভাবী গরীব দুঃখীদের মনে কিছু ভাল লাগে না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন,—ভোট দে আর কি হবে—যে ব্যাটা আসে যে কথা দে ভোট নে চলে যায়, শেষে এ গরীবদের কথা আর মনে করে না। আবার তাঁদের মধ্যে দু-একজন বলছেন,—যা হউক আর একবার দে-খেখি,—কদ্দুর কি দাঁড়ায়।

পর দিন সকাল। সবাই ভোট দেওয়ার জন্য আনন্দে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। আজ তাঁদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দিন। ভোট দেওয়ার জন্য সকাল থেকে জনগণ লাইন দিয়েছেন। আশি বছরের বুড়ো গফুর—পাকা দাড়ি মুখে হাসতে হাসতে বলেন,—আমার তিন কাল গে এক কালে ঠেকেছে; আল্লা যা রেখেছে কুল ক-পালে এবার শেষ বারের মত ভোট দে মরবো।

আশী বছরের বুড়ো, কত স্বপ্ন, কত আশা নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি ধরে ভোট দিতে গেলেন।

একটু পরে বুড়ো ভোট দিয়ে বাইরে এলেন। যাঁদের ভোট দিয়েছেন, তাঁরা বুড়োকে এক বোতল লেমনেড পানি খেতে দিলেন। লেমনেড বোতল ভাঙার সময় তা থেকে একটা গ্যাস্ ফ—চ্ করে শব্দ হলো। বুড়ো সেটা ভাল ভাবেই লক্ষ্য করলেন।

কিছুক্ষণ পর বুড়োর আর একবার লেমনেড পানি খাওয়ার লোভ জাগল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো ভোট দেওয়ার জন্য ঘরে ঢুকলেন। প্রিজাইডিং অফিসার বুড়োকে দেখে হেসে উঠে বললেন,—ও-দাদু! একটু আগেই তো আপনি ভোট দিয়ে গেছেন। আবার কেন?

সরল প্রাণ বুড়ো, দাড়ি মুখে একটু মৃদু হেসে বললেন—বাবা, বুড়ো হয়ে গেছি—সাত কাল গে এক কালে ঠেকেছে। ফ—চ্ খাবার লোভে আর একবার ভোট দিতি এয়িচি।

উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে মন্তব্য করলেন—আচ্ছা, আপনি বাইরে যান, আমরা বলে পাঠাচ্ছি। ওঁরা আপনাকে লেমনেড খেতে দেবেন।

বুড়ো বাইরে এসে লেমনেড ওয়ালার কাছে গিয়ে মৃদু হাসি মুখে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধের মুখ পানে চেয়ে ওঁরা সবাই হেসে উঠে বললেন,—আচ্ছা যাও দাও, বুকস্কিকে আর একটা লেমনেড ভেঙে যাও। ওঁদের মধ্যে একজন রসিকতা করে কলের জল পুরে লেমনেডের বোতলটা বৃদ্ধের সামনে ভেঙে ধরলেন। কিন্তু বোতল ভাঙার সময় সেই আগের মতো আর ফ—চ্ করে শব্দ হলো না।

গফুর বুড়ো বললেন—বাবা, বোতলের মুখ সেই সব পেথমের মত আর তো ফ—চ্ করো না।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সবাই এক যোগে হেসে উঠে বললেন—বুঝলেন বাবাজী—! একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে বোতলের মুখ আর ফ—চ্ করে না। ভোট দেওয়ার আগে পর্যন্তই যা গ্যাস থাকে—ভোটের পরে আর গ্যাস থাকে না।

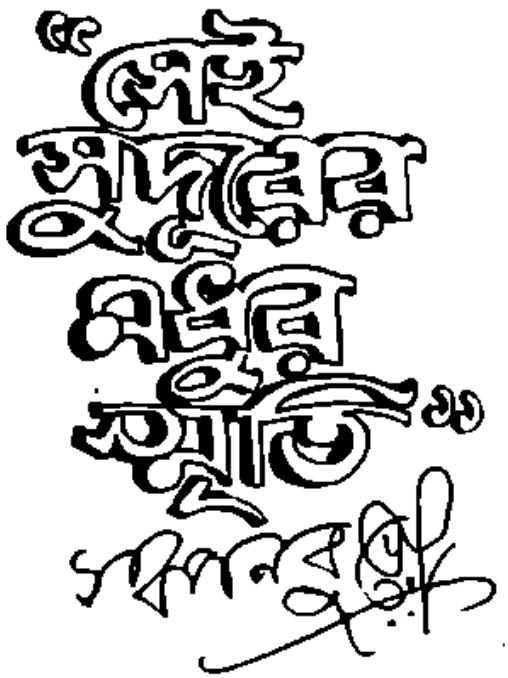

[আট]

আমাদের ছেলেবেলায়—

স্কটিশ বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য কি কিছু ছিল ?

আজ বৃদ্ধ বয়েসে বসে বসে তাই ভাবি।

তখনকার দিনে মাস্টারমশায়রা যা পড়াতেন—বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে শেখাতেন। কখন ঘণ্টা বাজবে, আর কখন খাতা-পত্র নিয়ে পালিয়ে যাবেন,—এ তাড়াহুড়ো ছিল না।

আজকের দিনের মাস্টারমশায়দের প্রাইভেট টিউশনির দিকে বিশেষ নজর।

আমাদের ছেলেবেলায় কিন্তু এ ব্যাপারের দিকে শিক্ষকদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না।

তাই বলে সেকালে শিক্ষকদের অভাব কি কিছু ছিল না ? ছিল ঠিকই।

কিন্তু বিদ্যাদান যাঁরা করতেন - তাঁদের একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল সমাজে। তার ওপর স্কটিশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেন একটা আলাদা আভিজাত্য ঘিরে রাখতো।

সেই জন্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ছাড়া তাঁরা যখন তখন যে কোনো বাড়িতে বাড়তি উপার্জনের জন্য প্রাইভেট টিউশনী করতে নারাজ ছিলেন।

ফলে এই দল—বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার যাতে সুনাম বৃদ্ধি পায়—তাঁরা প্রাণপণে সেই পথেই চলতেন। প্রতিটি ক্লাশে তাঁদের গুণপণা ও শিক্ষায় ছাত্রেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁদের বক্তব্য শুনতো।

সেই কালে যিনি আমাদের ইংরেজী শিক্ষক ছিলেন—তাঁর নাম হেম বাবু। তাঁর গলার স্বর এত গম্ভীর ছিল যে, যখন তিনি পাঠ্যপুস্তক থেকে ইংরেজী বাক্য পাঠ করতেন, মনে হত যেন মেঘগর্জন হচ্ছে।

সেকালে "LEGENDS OF GREECE & ROME" বলে একটি ইংরাজী বই আমাদের পড়ানো হত।

এই হেমবাবু ক্লাশের বাইরে থেকেই হুঙ্কার ছাড়তেন - "Long long ago—there lived in Rome……" আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্লাশ একেবারে নীরব হয়ে যেত ! মনে হত না সেই বিরাট ঘরে ছাত্রদল বসে আছে। তাদের সমবেত নিঃশ্বাস শুধু যেন শোনা যেত।

এই হেমবাবু যতক্ষণ ইংরেজী পড়াতেন, গোটা ক্লাশ একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতো। হেমবাবুর উচ্চারণ বিধি অতি উচ্চাঙ্গের ছিল। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী মোটেই সাধারণ ছিল না। তিনি যা নিজে ভালো করে পড়াতেন,—তাই আবার খাতায় লেখাতেন। ফলে আমাদের ইংরেজী বানানগুলো চমৎকার শেখা হয়ে যেতো, আর কখনো ভুল হত না।

ছেলেবেলায় স্কটিশ বিদ্যালয়ে যে ইংরাজী শিখেছি—সেটা হেমবাবুর কাছ থেকেই শেখা। বানানের দিকে এই হেমবাবুর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

আরো পরে এক সময় স্কটিশের হেডমাস্টার ছিলেন আলেকজাণ্ডার সাহেব। তিনি বোধ হয় স্কটল্যাণ্ডের লোক ছিলেন। তাই তাঁর ইংরেজী উচ্চারণগুলি খুব পরিষ্কার ছিল না। একটু জড়ানো জড়ানো ছিল। তাই হেমবাবুর উচ্চারিত ইংরাজীই ছাত্রদের ভালো লাগত।

আমাদের সেই আমলে B. M. Bose নামে এক শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। ইনি ভূগোলের এক মোট বই রচনা করেছিলেন। ছাত্র-

বহুলে সেই ভূগোলের নোট খুব জনপ্রিয় ছিল। অধিকাংশ ছাত্রই এই নোট বই কিনতো। এই বি. এম. বোস ভূগোল পড়াতেনও খুব সুন্দর করে। ভূগোল ছিল আমার প্রিয় বিষয়। দেশে কোথায় কি আছে—জানবার জন্য আমার মন খুব উৎসুক ছিল। ছেলেবেলায় আমি ম্যাপ পয়েন্টিং এ ওস্তাদ ছিলাম। তাছাড়া আমার ছবি আঁকার একটা নেশা ছিল বলে ম্যাপও আমি মনোমত আঁকতে পারতাম। নানা জাতের ফুলের রস দিয়ে আমি ম্যাপের বিভিন্ন অংশ রঙীণ করে দিতাম। তাতে শিক্ষক খুব পছন্দ করতেন, আর ভূগোলে বেশি নাম্বর পেতাম।

এই বি. এম. বোসের ভাইপো চিত্ত বোস—আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। চমৎকার ছবি আঁকতে পারতো। তাকে নিয়েই আমি "নিবাকর" কাগজ প্রকাশ করেছিলাম। বি. এম. বোস খৃষ্টান ছিলেন বলে ছাত্ররা বলাবলি করত তিনি এই ধর্মের দোহাইয়ে এত বড় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে পেরেছেন। অর্থাৎ পেছন থেকে মরুব্বীর জোরে উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। এই বি. এম বোস মাঝে মাঝে আমাদের বাইবেল পড়াতেন কিন্তু বাইবেলের শিক্ষনীয় গল্পগুলি খুব চিত্তাকর্ষক করে পড়াতে পারতেন না। সেই জন্যে বহু ছেলে এই বাইবেল ক্লাশ থেকে দূরে সরে থাকত। এই বাইবেল সম্পর্কে একটি "সানডে ক্লাশও" নেয়া হত। যারা সারা বছর ধরে এই সানডে ক্লাশে যোগদান করত,—তারা বছর শেষে ভালো ভালো বই উপহার পেতো।

ছেলেদের "বালক" কাগজের গল্পও আমাদের এই ক্লাশে শুনিয়ে দেওয়া হত। এই বালক কাগজ পড়ে পড়ে আমাদের শিশু বয়সেই একটা সাহিত্য প্রীতির ভাব জেগেছিল। তখন আমরা আপন মনে ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখতাম।

বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য আমাদের আর একজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল অরবিন্দবাবু। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন।

আমাদের নীচু ক্লাশ থেকেই তিনি বাংলা পড়ে সেইটে নিজের ভাষায় লেখবার জন্য খুব উৎসাহ দিতেন। এই অরবিন্দবাবুর কাছেই আমরা প্রথমে রচনা লেখা শিখি।

খুব পাওয়ারফুল চশমা তিনি পরতেন। হয়ত তার চোখ খারাপই ছিল। অনেক সময় তিনি চোখ দুটো পিট পিট করে তাকাতেন।

কিন্তু সেই আমলেই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর যে দরদ দেখেছি—তাতে বলা চলে—সেই শৈশবেই তিনি মাতৃ-ভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে ছিলেন। মিশনারী ইস্কুলে এই কাজটা বড় কম সাহসের ব্যাপার ছিল না।

সেই জন্য আমি অন্তত অরবিন্দবাবুর খুব ভক্ত ছিলাম। তিনিও বরাবর আমায় বেশ স্নেহ করতেন।

তিনি সব সময়ই আমাদের মাতৃভাষায় লিখতে প্রেরণা যোগাতেন। প্রকৃত পক্ষে অরবিন্দবাবুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েই আমি প্রথম বাংলা ভাষায় মৌলিক লেখা লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করি।

এই ভাবে ধীরে ধীরে বাংলা রচনা করার একটা উৎসাহ মনে জাগে।

বাংলা ভাষার দিকে তিনি অধিক দৃষ্টি দিতেন বলে তাঁর সহকর্মীরা বোধহয় বক্র দৃষ্টিতে তাকাতেন।

কিন্তু তিনি মোটেই সে সব গ্রাহ্য করতেন না।

মিশনারী খৃষ্টান বিদ্যালয়ে কেউ মাতৃভাষার সম্যক চর্চা করলে বোধহয় কর্তৃপক্ষ খুশী হন না। অরবিন্দবাবুর ক্ষেত্রেও বোধ করি স্কুল কর্তৃপক্ষের একটা 'অ্যালার্জি' ছিল।

তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন আমরা ছাত্রদল বিশেষ বিমর্ষ হয়েছিলাম।

এরপর পথ চলতে রাস্তাঘাটে যদি কচিৎ কদাচিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো তা হলে তিনি মাথার ছাতাটা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে কুশল প্রশ্ন করতেন। বাংলা ভাষার চর্চা করছি কিনা, সেকথাও তিনি বার বার আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা সব সময় দেখা হলেই ভক্তি ভরে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতাম। পরবর্তীকালে আমি যখন

ছোটদের জন্যে লেখা বিভিন্ন কাগজে সুরু করি—তিনি তা রেখে যেতে পেরেছেন কিনা—আমার স্মরণে নেই। দেখলে, নিশ্চয়ই তিনি খুব খুশী হতেন, আর আমাকে আশীর্বাদ করতেন।

আর একজন খুব মোটা মাস্টারমশাই ছিলেন। দেখতেও লম্বা চওড়া, খুব লম্বা ঝুলের লম্বকের পাঞ্জাবী পরতেন। তাঁর নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু কিনা ভুলে গেছি। তিনি ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশতেন, আর তাদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি কখনো কখনো আমাদের ক্লাসে বাংলা ও ভূগোল পড়াতেন। ছেলেরা যাতে তর্ক ও আলোচনা করে সে দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি ছাত্রদের দুটো ভাগে ভাগ করে দিতেন। একটা বিষয় বস্তু নিয়ে পক্ষে ও বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। যে পক্ষ জয়লাভ করবে—তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। তর্কে জিতলে তিনি খুব তারিফ করতেন। পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিতেন।

ম্যাপ আঁকার দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। আমরা কেউ ভালো ম্যাপ আঁকলে তাঁকে দেখাতাম। তিনি দেখে খুশী হয়ে ছাত্রদের খুব উৎসাহ দিতেন। আমাদের স্কটিশ বিদ্যালয় বিল্ডিংএর পেছন দিকে একটা রিলিফ ভারতবর্ষের ম্যাপ তৈরী করা ছিল। সিমেন্ট দিয়ে এই ম্যাপটি বিশেষ যত্ন নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাহাড়ের উচ্চতা, নদী ও সাগরের গভীরতা এবং উপত্যকা ইত্যাদি খুব কৌশলে দেখানো হয়েছিল। এই রিলিফ ম্যাপের সঙ্গে এক কোণে একটি জলের কল ছিল। সেই কল ছেড়ে দিলে নদীগুলি জলে ভরে যেতো। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর জলে পূর্ণ হয়ে যেতো। এই জলে খানিকটা নীল গুলে দিলে ঠিক নীল সাগরের মতো দেখাতো। ছেলেরা ভীড় করে এই রিলিফ ম্যাপ দেখতো।

স্কটিশ বিদ্যালয়ের খেলাধুলার মাঠ কিন্তু বিদ্যালয় সংলগ্ন কোনো স্থানে ছিল না।

এই বিদ্যালয়ের খেলাধুলার মাঠ ছিল মাণিকতলা খালধারের ওপারে।

এখন যেখানে "কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ" সেই খালের ওপারে একটি মাঠ ছিল,—হয়ত এখনো আছে,—সেই খানে স্কটিশ স্কুল ও কলেজের ছেলেরা খেলতে যেতো।

বিভিন্ন দিনে স্কুলের ও কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে ফুটবল নিয়ে খেলতে যেতো।

যাদের খেলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না—মানে, আমরা - তারা সাহিত্যের কথা নিয়ে বিকেল বেলা কাটাতে ভালো বাসতাম। আমাদের মধ্যে বেশ একটা দল গড়ে উঠেছিলো। তারা রোজ ইস্কুলের ছুটির পর বাড়ি গিয়ে জল খাবার খেয়ে হেদো পুকুরের চারপাশে এসে সমবেত হত। তখন হেদোতে এত লোকের ভীড় ছিল না।

ছাত্রদেরই ভীড় হত বেশী। তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বসে সাহিত্য আলোচনা করতো, কবিতা আবৃত্তি করতো। কেউ কেউ নিজের পাঠ্যপুস্তক থেকে লেখা মুখস্থ বলতো।

আমরা প্রথমেই হেদোতে গিয়ে বড় বড় মাছ দেখতাম। প্রচুর বড় বড় রুই মাছ তখন হেদোর জলে ঘুরে বেড়াতো, একটাও ভয় করত না। পুকুর থেকে মাছ ধরা নিষেধ ছিল। আমরা খৈ-মুড়ি মাছেদের উদ্দেশ্যে পুকুরের জলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতাম। আর মাছদের খাওয়া দেখতে বহু ছেলে-বুড়ো এসে জমায়েৎ হত। তখন মহিলারা কেউ হেদোতে বেড়াতে আসতেন না।

একদল বুড়ো রোজ দল বেঁধে হেদোর বেঞ্চে এসে বসতো, কেউ ক্রমাগত হেদোর চারদিকে চক্কর খেতো। এরা প্রায় সবাই অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ।

এঁরা নিজেদের অফিসের সুখের দিনের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। কোন্ সাহেব কাকে সব চাইতে বেশী ভালো বাসতেন,—তাই নিয়ে গর্ভরে গল্প করতেন। সেই সাহেব বিলেত যাওয়ার ফলেই যে তাঁকে অবসর নিতে হল, নইলে তিনি অফিসে বড় কর্তা হতে পারতেন।

কেউ কেউ নিজের রোগের কথা সাত কাহন করে

বলতে ভালো বাসতেন। কিভাবে অঙ্কের বাধার কষ্ট পাচ্ছেন—তাই সবাইকে ঘটা করে শুনিয়ে দিতেন। কত রকম ভাবে চিকিৎসা করেছেন, কত ডাক্তার ডেকেছেন, কত টাকা খরচ করেছেন,—আশেপাশের মুরুব্বীদের সেই সব কাহিনী বলতেন।

আমাদের মজলিসে কিন্তু ঘন ঘন হট্টোল উঠত। কে কত ভালো কবিতা মুখস্থ বলতে পারতো—তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত। কেউ কবিতার লাইনে ভুল করলে সবাই শুধরে দিত, অনেক সময় তাই নিয়ে বাজিও রাখা হত।

পক্ষের দিন সেই সব স্কুলের মীমাংসা হত। বিচার হত। যে দল হারত তাদের চানাচুর বাদাম ভাজা খাওয়াতে হত। তখনকার দিনে ছাত্র ছাত্রীদের মুখরোচক খাদ্য "ফুচকা"—কিন্তু আবিষ্কৃত হয় নি। ফুচকার যুগ এলো আরো অনেক পরে।

কবিতার কোন্ লাইন কোন বইতে আছে তাই নিয়েও অনেক সময় দারুণ তর্কাতর্কি হত।

আমাদের মণী অর্থাৎ মণীমোহন বোস অনেক ইংরাজী কবিতা মুখস্থ বলতে পারত।

পরবর্তী জীবনে সে স্কটিশ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিল। মণী পরবর্তী জীবনে ভালো হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাও করতে শিখেছিল। আমি এক সময় তার ওষুধও খেয়েছিলাম।

আমাদের এক ক্লাশ ওপরে পড়তো B.D. Chatterjee অর্থাৎ বলাই দাস চ্যাটার্জি। সে পরবর্তী জীবনে মোহন বাগানের দারুণ খেলোয়াড় হয়েছিল। সে ঐ সময়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় অনেক কাপ মেডেল জয় করে আনতো। ইস্কুল ছুটি হয়ে যেতো। আমরা মজা করে পরেশনাথের মন্দিরে বেড়াতে যেতাম।

আমাদের স্কটিশ বিদ্যালয়ে যে দুই ডানপিটে ছেলে আদৌ ছিল না, আর মজাদার ঘটনা আদৌ ঘটত না,—সে কথা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়।

একটা মজাদার ঘটনার উল্লেখ করছি।

সেই সময়কার বিখ্যাত ডাক্তার কেদার দাসের কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল আমাদের সঙ্গে পড়ত। সে মাঝে মাঝে এক একটা কাণ্ড করে প্রচুর হাসির খোরাক জোগাতো।

এই হাসির ব্যাপার তৈরী করা হত আমাদের কেদার পণ্ডিতকে কেন্দ্র করে।

এই কেদার পণ্ডিতকে ছাত্রদল কেউ মানত না। তার ক্লাশেই ছাত্রদের যত গোলমাল—যত কোলাহল।

একদিন ডানপিটে ছেলে প্রফুল পায়ে আলতা মেখে কেদার পণ্ডিতের ক্লাশে হট্টোলের সৃষ্টি করল।

এদিকে আর এক বেপরোয়া ছেলে সত্যানন্দ কেদার পণ্ডিতের জামার পেছনে লিখে দিয়েছে—গুরু—না গরু?

যথাসময়ে আর একটি ছেলে কেদার পণ্ডিতের কাছে সে কথা প্রকাশ করে দিল।

কেদার পণ্ডিত একেবারে রেগে আগুন। তিনি ক্লাশে দারুণ গালাগাল সুরু করে দিলেন।

তারপর কয়েকটি ছেলের পরামর্শে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ জানিয়ে দিলেন।

সত্যানন্দ হচ্ছে ইংরেজী শিক্ষক হেম রায়ের ভাইপো। সুতরাং তার কাছেও নালিশ গেল।

হেম রায় বড়া রাগী মানুষ।

তিনি সত্যানন্দকে ডেকে নিয়ে আচ্ছা করে আগা পাশতলা বেত মেরে ওকে প্রায় কাবু করে ফেল্‌লেন।

সেদিন সারা ছাত্রমহলে দারুণ উত্তেজনা! কিন্তু আজকের দিনের মতো তখন ত ছাত্র পরিষদ—কিংবা ছাত্র ইউনিয়ন ছিল না! তাই শেষ পর্যন্ত পর্বতের মূষিক প্রসব হল।

কিন্তু ছাত্রদল যে খুব দুঃখিত মনে সেদিন ঘরে ফিরে গেল—সে কথা মনে আছে।

কেদার ডাক্তারের ছেলে প্রফুল বন্ধুবর সত্যানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ডিসপেনসারীতে ঔষধ আর মলম লাগিয়ে বন্ধুকৃত্য সমাধা করেছিল। তাতে ছাত্রমহলে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল।

[চলবে]

যেখানে ঘরে ঘরে দ্রৌপদী

শরদিন্দু সাহা

কিছুদিন পূর্বে প্রখ্যাত স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায় ভারতের লাদাক অঞ্চলে শ্রীযুতি কমলা দেবী নামে জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা মহাভারতের দ্রৌপদীর মতোই পাঁচ ভাই এর যৌথপত্নীরূপে দিব্যি ঘর করছেন। এখানে স্মরণীয় প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা যখন তার স্বরচিত আইনের শাসনে ধর্ব হয়নি তখন দুনিয়ার সর্বত্র পুরুষের বহুপত্নী আর নারীর একাধিক পতি গ্রহণে বাধা ছিল না। তবে প্রাচীন ভারতে পুরুষের পক্ষে এটা যেমন সহজ ছিল নারীর পক্ষেও সেরূপ ছিল তা নয়। কেননা তা হলে মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই এর যৌথপত্নীরূপে দ্রৌপদীর বিবাহে সমাজে যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সেটা অনুপস্থিত থাকতো। মহামান্য বিদুর, রাজকুমার বিকর্ণ এমন কি দ্রৌপদীর পিতা পাঞ্চাল রাজও অনুরূপ বিবাহের তীব্র বিরোধিতা করেন। মহাবীর কর্ণ রাজসভায় দ্রৌপদীকে "বারাঙ্গনা" বলে উপহাস করতেও কুণ্ঠিত হন নি। এই সব ঘটনার মোকাবিলায় প্রাচীন ভারতে দ্রৌপদীর যৌথপত্নীর ব্যতিক্রম মনে হয়। তবে লাদাকের কমলা দেবীর পঞ্চ-স্বামী গ্রহণ মোটেই কিছু ব্যতিক্রম নয়। সেখানে ঘরে ঘরে এদের দেখা মিলবে। এরাই আজকের দ্রৌপদী।

ভারতের উত্তর সীমান্তে লাদাক, তিব্বত, ভূটান, সিকিম ও নেপালে মহাযান পন্থী বৌদ্ধ সমাজে নারীদের বিবাহিত জীবন মহাভারতের দ্রৌপদীরই অনুগামী। যেটুকু অমিল সেটা পতির সংখ্যায়। মূলে নয়। পাঞ্চাল রাজ-কুমারীকে স্বনির্বাচিত স্বামীর সঙ্গে তাঁর বড় ছোট চার ভাইকেও পতিত্বে বরণ করতে হয় আর আজকের দ্রৌপদীরা বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে দুজন ছোট ভাইকেও পতিরূপে গ্রহণ করে থাকে। এই প্রথা ঐ সব অঞ্চলে শুধু সচল নয় সামাজিক বিধানে বাধ্যতামূলক। তবে দেবরের সংখ্যা কম হলে পতির সংখ্যাও সেই অনুপাতে কম হয় আবার আশপাশে বেশী হতেও বাধা নেই।

ঐ সব অঞ্চলে বিশেষ করে তিব্বতের মহাযানী বৌদ্ধ সমাজের পুরুষের পক্ষে বিবাহের সুযোগ সীমিত। পিতৃ-সম্পত্তির ওপর যার হক্ নেই তার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়। পরিবারে জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার সম্পদের একমাত্র অধিকারী হওয়ায় বিবাহ করার অধিকার তার। তবে পিতৃ ধনের একক মালিক হলেও তার বিবাহিতা পত্নীর একমাত্র স্বামী হওয়ার এক্তিয়ার তার নেই। ছোট দুই ভাইকেও তার পরিণীতা স্ত্রীর পতিত্বের অংশীদার করে নিতে হয়। এটাই সামাজিক বিধান। শুধু পিতার একমাত্র পুত্রের পক্ষেই এক সঙ্গে পিতৃ সম্পদ আর বিবাহিত পত্নীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বামী হতে বাধা নেই। জ্যেষ্ঠ পত্নীকে অনেক সময় তার চেয়ে পাঁচ দশ বছর কম বয়সী দেবরকেও পতিত্বে বরণ করতে হয়। তবে না বালকের সীমানা অতিক্রম না করে তাদের পক্ষে পতিত্বের গদীলাভ ঘটে না।

তিব্বতী বৌদ্ধ পরিবারে তিন জনের বেশী ভাই থাকলে প্রথম তিন ভাই ছাড়া তার কারও পক্ষে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে পত্নী লাভের সম্ভাবনা নেই। তবে কোন দেবর পতির অকাল মৃত্যু ঘটলে চতুর্থ ভাই মৃত পতির জন্য পদটি পূরণ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। বাকী ভাইদের বিবাহের মাধ্যমে পত্নী লাভ করে সংসারী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তারা মনের দুঃখে বনে না গিয়ে বৌদ্ধ মঠে লামার খাতায় নাম লেখায়। সেখান থেকে ভরণ পোষণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আজীবন ধর্মচক্র ঘুরিয়ে তারা নির্বাণের পথে এগিয়ে যায়। পূর্বোক্ত অঞ্চলের মহাযানী বৌদ্ধদের একটা বিপুল অংশ যে লামাব্রতী হয়ে থাকে তার মূলে রয়েছে অনুরূপ সীমিত বিবাহের সুযোগ। বিবাহে বঞ্চিত হয়ে অজীবন ব্রহ্মচর্য পালনে যারা গড়রাজী তাদের

পক্ষে কোন বিত্তশালিনী কুমারী নারীর "মেথাপা" বা যৌন বিলাসের সহকর হয়ে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপনে বাধা নেই। তবে সামাজিক জীবনে তাদের কোনরূপ মর্যাদার স্বীকৃতি নেই। তিব্বতে পুত্রহীন পরিবারে প্রথমা কন্যা পিতৃ সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হয়। এরূপ সম্পত্তি সম্পন্না মেয়েদের সংসার জীবনে প্রবেশের মুখে দুইটি পথ খোলা থাকে। হয় যথারীতি বিবাহিতা হয়ে একাধিক পতিকে নিয়ে ঘর করা, নয় একটা "মেথাপা" নিয়োগ করে স্বাধীন জীবন উপভোগ করা। সমাজে মেথাপার কোন ইজ্জৎ না থাকলেও তার যৌন সহচরীর মর্যাদা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। সহচরী নারীর ওপর মেথাপার স্বামীত্বের দাবি নেই। তাদের মিলনজাত সন্তানদের পিতৃত্বের হকদারও সে নয়। কেন না যাহ পরিচয়ে অনুরূপ সন্তানদের সমাজে সনাক্ত হওয়ার অসুবিধে নেই। সচরাচর স্বচ্ছল মেয়েদের কাছে শেষোক্ত পথটিই আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। খেয়াল মতো মেথাপাকে বিদায় করে দিতেও বাধা নেই। খেসারত বাবদ বড় জোর একটা ভেড়া অথবা বিকল্পে কিছু পশম দিলেই চলে। পরে নতুন মেথাপার নিয়োগেও অন্তরায় নেই।

ঐ সব অঞ্চলের বৌদ্ধ নারীদের বিবাহিতা জীবন মহাভারতের দ্রৌপদীর অনুগামী হলেও তাদের বিবাহ রীতির মধ্যে মোটেই মিল নেই। স্বয়ম্বর সভায় পতি নির্বাচনের সুযোগ সেখানে নেই। হোমাগ্নি সাক্ষী রেখে কোন পিতা পাঞ্চাল রাজার মতো একাধিক পতির হাতে তাদের সম্প্রদানও করে না। সেখানে বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর মিলনে গুরুজন, জ্যোতিষী ও লামা পুরোহিতের মিলিত সমর্থন প্রয়োজন।

জ্যোতিষী নির্ধারিত শুভদিনে একদল লামা পুরোহিতের নেতৃত্বে আত্মীয় স্বজন সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে বৌদ্ধ গোম্ফায় (মঠে) যায়। সেখানে সমাগত অতিথিদের ছুটন্ত গরম জলে চা, মাখন আর লবণ সহযোগে তৈরী পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। শুভলগ্নে গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের পর মঠাধ্যক্ষ প্রধান লামা ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকে সাক্ষী রেখে বর ও কনের হাতের আঙ্গুলে একটি মাঙ্গলিক সুতা বেঁধে তাদের উদ্বাহ বন্ধন সম্পন্ন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিবাহ বাসরে সমবেত অতিথিদের আশীর্বাদ কামনা করে নব দম্পতি কনের বাড়ীতে তৈরী "ছ্যাং" নামীয় এক প্রকার উগ্র সুরা পান করার পর এটি অভ্যাগতদের মধ্যে পরিবেশন করা হয়।

ঐ অঞ্চলের মহাযান-পন্থী বৌদ্ধদের বিবাহ বাসরে সুরাপানের দৃশ্য কিছুটা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। সমাবেশে সুরা পরিবেশনের ভার পড়ে একদল নির্বাচিত সুন্দরী তরুণীর ওপর। অধরে টুকরো হাসি নিয়ে এরা অতিথিদের কোলে বসে একহাতে জড়িয়ে ধরে অপর হাতে তাদের মুখে সুরাপাত্র উজার করে দেয়। লাস্যময়ী সুন্দরীদের সাবলীল সান্নিধ্য আর যৌবনদীপ্ত দেহ দোলে হিল্লোলিত নিতম্বের ইশারা যৌন আবেদনে অতিথিদের বেভাবে মোহাচ্ছন্ন করে তাতে তাদের পক্ষে সুরা পান অনিবার্য হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্ববিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মনীষী ডা: ভেরিয়ার এলুইন নেফাকলে নৃতাত্ত্বিক গবেষণারত থাকাকালে অনুরূপ এক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে আপ্যায়নরতা তরুণীদের হাতে সুরা পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে যারা সুরাপানে একান্ত নারাজী তারা আঙ্গুলের ডগায় কিছুটা সুরা নিয়ে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তিনবার তর্পণ করে সুরাপান থেকে রেহাই পেতে পারে।

সুরাপান পর্ব শেষে কনেসহ বর আপন ঘরে চলে যায়। স্বামীর ঘরে এসে নববধূ তার দুই দেবরকে যখন পতিত্বে বরণ করে তখন পুরোহিত বা কোনরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদির প্রয়োজন হয় না।

তিব্বতে বৌদ্ধ পুরুষদের পক্ষে যেমন খুশী মতো বিবাহ করা সম্ভব নয় তেমনি বিবাহিতা মেয়েদেরও সহজে স্বামী ও দেবর পতিদের নাকচ করাও সম্ভব নয়। তবে বিবাহিত প্রথম স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সদ্য বিধবা যদি চায় দেবর পতিদের ত্যাগ করতে পারে। লামা পুরোহিতকে দিয়ে মৃত স্বামীর ও নিজের হাতের আঙ্গুলে একটা সুতা বেঁধে

মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে পুরোহিত সেটা কেটে দিলেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত নারীর ওপর দেবর পতিদের পতিত্বের দাবি থাকে না। তখন সেই নারীর দ্রৌপদী জীবনেরও অবসান ঘটে।

যৌথ পত্নীর জীবনে নারীত্বের চরম অবমাননার যে স্বীকৃতি রয়েছে আধুনিক সমাজে এটা যতই অরুচিকর হোক না মহাযানী বৌদ্ধ সমাজে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। দিনের পর দিন বিভিন্ন পুরুষের বিচিত্র রুচি ও কামনার দাবিকে কবুল করে আত্মদানে যৌথপত্নীকে যেরূপ মানসিক ভারসাম্য ও সন্দেহাতীত সমর্পিতার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয় তা সত্যিই বিস্ময়কর। অপর দিকে একাধিক পতিদেরও নির্বিরোধ আচরণ ও সহনশীলতার মাধ্যমে পারিবারিক সহাবস্থানের পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখতে যেরূপ কঠোর মিতাচার ও সংযমের পরিচয় দিতে হয় তাও কিছু কম বিস্ময়কর নয়।

যৌথপত্নীর সন্তানদের ওপর তার তিন স্বামীরই পিতৃত্বের সমান অধিকার সমাজে স্বীকৃত। তবে যৌথপত্নী ও সন্তানদের ভরণ পোষণের দায় দায়িত্ব প্রথম স্বামী বহন করায় গোটা পরিবারের ওপর তার পক্ষে কিছুটা খবরদারি করার সুযোগ থাকে।

এখানে স্মরণীয় পুরুষের বহুপত্নী আর নারীর একাধিক পতি গ্রহণ কোনটাই নারীর ইচ্ছা-নির্ভর নয়। উভয় ব্যবস্থাই পুরুষের প্রয়োজনের হুতাশনে নারীত্বকে আহুতি দানের পুরুষ-নির্দেশিত প্রথা মাত্র। এতে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। সভ্য সমাজের বিচারে এটা নারীর উপর নির্লজ্জ ব্যভিচার ছাড়া কিছু নয়। বর্তমান যুগে এরূপ প্রথার অবসান কাম্য। তবে সমাজ-পণ্ডীর সীমানা প্রসারিত অথবা সমাজে নর ও নারীর সংখ্যার সমতা না ঘটলে এই অবাঞ্ছিত রীতি বিলোপ করা সহজ হবে না। একই কারণে আজকের দ্রৌপদীদের চূড়ান্ত আশ্রয় তিব্বতে মাতৃ জাতির পক্ষে এতোকাল যৌথপত্নী-ত্বের কলঙ্ক মোচন সম্ভব হয় নি। তবে আশার কথা স্বাধীন তিব্বতে যা সম্ভব হয় নি আজকের পরাধীন তিব্বতে ঘটনাচক্রে নারীদের দ্রৌপদী জীবন থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য একটা জাতির পক্ষে পরাধীনতা চরম অভিশাপ। তবে বাইরের জগৎ-এর সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বাধীনতা কোন জাতির পক্ষে অমিশ্র আশীর্বাদ এমন নয়। অনুরূপ স্বাধীন অস্তিত্বের সংকীর্ণ পরিবেশে পুঞ্জীভূত জড়তা ও মূঢ়তায় পশু বহু জাতি সাম্রাজ্য-লোভী শক্তির সহজ শিকার হয়ে স্বাধীনতা হারিয়েছে। এরূপ নজির ইতিহাসে বিরল নয়। বর্তমান তিব্বত তার আধুনিকতম দৃষ্টান্ত। অপর দিকে পরাধীন কিছু জাতি বিজেতা শাসকদের শোষণ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও কল্যাণের নবদিগন্তের চদিস পেয়েছে এমন ঘটনাও ইতিহাসে কিছু কম নেই। ভারতের মতো দীর্ঘকাল পরাধীনতার অভিশাপে কোন জাতিই বিড়ম্বিত হয়নি। তবু বিজেতা আর্যদের কালজয়ী দর্শন, গ্রীকদের নিপুণ ভাস্কর্য, মোগলদের রক্তমাখি শিল্প শৈলী আর ব্রিটিশদের সমাজ সংস্কারের সুমহান অবদান ভারতীয় সমাজ-জীবনে কল্যাণের যে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছে সেটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। আজকের নির্মম সাম্রাজ্য লোভী চীন তিব্বত দখল করার পথে যে নারকীয় নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা চিরদিন ধিক্কৃত হবে। তবু স্বীকার করতে বাধা নেই স্বৈরাচারী চীন শাসকচক্র তিব্বতে তাদের শোষণের পথ সুগম রাখার তাগিদে সেখানে এমন কিছু আইন কায়েম করেছে যার ফলে মহাযান-পন্থী বৌদ্ধ নর নারীদের জীবনে অভাবিত পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। খাস চীনের নয়া বিবাহ বিধি তার অন্যতম। এতে নর নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত থাকায় নারীরা যেমন দেবরদের পতিত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে তেমনি বিবাহে বঞ্চিত লাখো পুরুষদেরও বিবাহের মাধ্যমে পত্নী লাভ করে সংসার ধর্ম পালনের প্রতিশ্রুতি মিলেছে।

তিব্বতী নর নারীদের সামাজিক বঞ্চনা থেকে নিষ্কৃতি দানের মহান উদ্দেশে চীনা শাসকচক্র তিব্বতে তাদের উদার বিবাহ বিধি বহাল করেছে এমন নয়। এখানে

স্মরণীয় চল্লিশ শতকের সূচনায় জাপানীরা কোরিয়া দখল করার পর সেখানে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটা দেশান্তরবোধহীন সঙ্কর সমাজ গড়ে তাদের সাহায্যে দেশপ্রেমী কোরিয়াবাসীদের মুক্তি-প্রয়াসকে বার বার প্রতিহত করেছিল। বিজিত তিব্বতীদের উগ্র দেশপ্রেমের মোকাবিলায় শাসনের স্বার্থে সচল রাখতে চীনারাও সেখানে অনুরূপ একটি সঙ্কর গোষ্ঠী গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর যারা তিব্বতীদের মুক্তি-প্রয়াসকে বানচাল করতে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। বিজিত ও বিজেতার রক্ত সংমিশ্রণ জাত সঙ্কর গোষ্ঠীর এটাই বৈশিষ্ট্য। ভারতেও অনুরূপ নজির দুর্লভ নয়।

তিব্বতে অনুরূপ মিশ্রজাতি গঠনের উদ্যোগে চীনা শাসকদের প্রধান হাতিয়ার তিব্বতের উদ্বৃত্ত পুরুষ আর চীনের বাড়তি মেয়েরা। সরকারী নির্দেশে খাস চীন থেকে হাজার হাজার কুমারী ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের তিব্বতে আমদানী করে তাদের সঙ্গে বিবাহে বঞ্চিত তিব্বতী পুরুষ লামাদের পাইকারী হারে বিবাহ ঘটিয়ে আজ চেতনাহীন চীনাপ্রেমী সমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনেই সেখানে চীনের নতুন বিয়ের আইন চালু করা হয়েছে। নইলে স্বদেশে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে সেই অধিকারের বিনিময়ে চীনা মেয়েরা হয় তো তিব্বতী স্বামীর ঘর করতে রাজী হোত না। তারই ফলশ্রুতি তিব্বতী লামাদের যেমন পত্নীলাভ করে সমাজ জীবনে পুনর্বাসনের সুযোগ মিলেছে তেমনি যৌথপত্নীত্বের দায় থেকে মুক্ত নারীদেরও দ্রৌপদী জীবনের অভিশপ্ত অস্তিত্বের অবসান ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়া, আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, বেলুচিস্তান, ভারতের কুর্গ ও পাঞ্জাবের কোন কোন সমাজে নারীকে একাধিক পতি নিয়ে ঘর করতে হয়। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে নারীদের একাধিক পতি গ্রহণের রেওয়াজ থাকলেও সেখানে নারীকে পতির ঘরণী হতে হয় না। বরং পতিদেরই পালাক্রমে পত্নীর ঘরে যেতে হয়। সেখানে অনুরূপ প্রথা বাধ্যতামূলক নয়। প্রয়োজনের তাগিদে আপসে এটা মেনে নিতে হয়। সংকীর্ণ সমাজ গণ্ডীর মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে কম হলে নারীকে একাধিক পতি গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তথ্যাহরণে যাদের কাছে ঋণী—

১। Marriage—By E, Westermark (E, Ben edition)
২। Studies in the Psychology of Sex—By Havlock Elis (vol.6)
৩। History of Prostitution in India—By Sinha & Bose. (vol I).
৪। Tribal world—By Dr V. Elween.
৫। Caravan (Magazine)—September, 1968.

নরনারায়ণ আশ্রম রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত

১।	ব্রহ্মসূত্র তিনখণ্ডে	২৬·০০
২।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১২·০০
৩।	শ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে ও জীবনে	৫·০০
৪।	ঈশোপনিষদ্	৩·০০
৫।	কেনোপনিষদ্	২·০০
৬।	কঠোপনিষদ্	৫·০০
৭।	প্রশ্নোপনিষদ্	২·০০
৮।	ঐতরেয় ও মাণ্ডুক্যোপনিষদ্	২·০০
৯।	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	৪·০০
১০।	তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডকোপনিষদ্	৪·০০

প্রতিভা রায় রচিত

১।	নারীপ্রগতির জন্মকথা	৩·০০
২।	শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ	৫·০০

রেণু মিত্র রচিত

১।	সময়ের মূর্তি শ্রীনিত্যগোপাল	২·০০
২।	শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন	৫·০০

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী প্রকাশিত

৩।	রবীন্দ্র ছন্দ	৫·০০
৪।	প্রাথমিক শিক্ষা	৪·০০

নরনারায়ণ আশ্রম
গ্রাম : বাগুইআটি / পো: অশ্বিনীনগর
কলিকাতা-৫৯ / ২৪ পরগণা, ফোন : ৫৭-২৫৪০

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(চৌদ্দ)

মুরারি গুপ্তের আবার অন্য কথা।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের ছাত্র মুরারি। শ্রীহট্টের ছেলে। কথায় এখনও পূর্ব বঙ্গের টান আছে। 'খাবো'-কে বলে 'খাইবাম', 'যাবো'-কে বলে 'যাইবাম'।

আর তা নিয়েই নিমাইয়ের যতো ঠাট্টা। যতো রহস্য। মুরারিকে দেখলেই তার পিছু নেয় নিমাই।

বলে, এই যে পণ্ডিত, 'খাইবাম', 'যাইবাম'। 'খাইবাম' ও 'যাইবাম' এই দু'টি কথা সে একটা বিকৃত স্বরে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করে।

মুরারির রাগ হয়।

সে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'হ্যাঁ, 'খাইবাম' বলি, বেশ করি। যে ভাষের যেমুন কথা। আমার ভাষের কথা আমি কই, তাতে তোমার এ্যাতুন গা পিত্তি জ্বলে ক্যান গো?'

নিমাই আবার ঠাট্টা করে বলে, 'না না। তা জ্বলবো ক্যান! কও, কও 'খাইবাম', 'যাইবাম'।'

বলতে বলতে নিমাই আবার হো হো করে হেসে ওঠে। মুরারিও কম যায় না।

রেগে গিয়ে সে বলে, 'হেসে যে বাঁচে ভাষা শিখাইতে আইচে, আসো না। ভাষার মানে বোঝে নুনি। বলি, তুমি নিজে কোন্ ভাষের ছাওয়াল হে? তোমার বাপ-ঠাকুর্দা আইলো কৈ থিকা? তেনারা কোন্ ভাষায় কথা কইতেন?'

নিমাই মাথা দুলিয়ে, একটা ছন্দের সুর টেনে বলে, 'খাইবাম, যাইবাম।'

আবার নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে। নালিশ যায় শচীদেবীর কাছে।

শুনে তো তিনি হেসেই কুটি কুটি।

বলেন, 'নিমাই, এ সব কি হচ্ছে? মুরারির পেছনে তুই অমন করে লাগতে যাস কেন? অমন ভালো ছেলে!'

'ভালো ছেলে না, আমার মাথা। ভালো ছেলে তো অমন কথায় কথায় চটে কেন? কথায় কথায় অমন রাগায় কেন?'

মুরারি নিজেই সে কথার উত্তর দেয়।

বলে, 'চটুম না কেন? চটবার কারণ থাকলেই চটি। আহা রে, ধন আমার পিছে পিছে ফোড়ন কাটবেন, আর আমি চটুম না?'

নিমাই বলে, 'তা হলে আমিও কথা কমু না ক্যান? আমিও কমু 'খাইবাম', 'যাইবাম'। বলতে বলতে নিমাই আবার হাসিতে গড়িয়ে পড়ে।

নিমাইয়ের ঢঙ দেখে শচীদেবীর নিজেরও হাসি পায়। কিন্তু সে হাসি চেপে তিনি একটা কৃত্রিম ক্রোধের সঙ্গে বলেন, 'দ্যাখ নিমু, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। মুরারির সঙ্গে অমন করে লাগতে আসবি নে।'

'ওকেও একটু চটতে বারণ ক'রে দাও মা। উপদেশটা একা শুধু আমাকেই পালন করতে হবে, ও কিছু করবে না, সেটা তো কোন কাজের কথা নয়।'

মুরারি চট করে চটে উঠে বলে, 'আমি চটলাম কোহানে? আমি চটলাম কোহানে?'

মুরারির ভাব-সাব দেখে শচীদেবী আর হাসি চেপে

রাখতে পারলেন না। হাসতে হাসতেই মুরারিকে ডেকে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন।

নিমাইয়ের সঙ্গে কোন কোন দিন শাস্ত্রালোচনাও হয় মুরারির। হয় ব্যাকরণ-অলংকারের অনুশীলন।

মুরারি কোন শ্লোকের এক অর্থ করলে, নিমাই করে তার অন্য অর্থ।

মুরারির যুক্তির ছড়ানো জাল কেটে কেটে নিমাই বারেবারেই বাইরে বেরিয়ে যায়।

হেসে বলে, 'কেমন হল গো? জাল যে তোমার ফুটো হয়ে গেলো?'

মুরারি বিস্মিত হয়ে নিমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিমাই আবার বলে, 'বৈদ্যি, কাব্য-ব্যাকরণ আয়ত্ত করা তোমার কাজ নয় বৈদ্যি। তোমার কাজ লতা-পাতা দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা। যাও, তুমি তাই করো। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তো আর কফ পিত্ত বা অজীর্ণের ব্যবস্থা নেই। এ নিয়ে তুমি পড়ে থাকবে কেন?'

বলতে বলতে নিমাই নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে।

কিন্তু মুরারি হাসে না।

বরং নিমায়ের হাসির উত্তরে সে প্রশ্ন করে, 'নিমাই, তুমি অমন কইরে কথা কও ক্যান? তুমি যা শিখাইচো, তার কোন্ প্রশ্নের উত্তর না দিছি আমি? কোন্ উত্তরটা আমার ঠিক হয় নাই?'

নিমাই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কারণ সে জানে, মুরারি গুপ্তেরও পাণ্ডিত্য আছে। নিমাই তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না।

কাজেই এ দিকে আর কথা না বাড়িয়ে মুরারি গুপ্তকে নিয়েই সে গঙ্গা স্নানে যায়।

সূর্যটা তখন মাথার উপর অনেকখানি উঠে এসেছে।

সেদিন গঙ্গার জলে স্নানের পুঁথি ভাসিয়েই কান্ত হয় নি নিমাই। সে স্নান পাঠই ছাড়লে। সার্বভৌমের টোল থেকে বিদায় নিলে।

রঘুনাথ তার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরে বললে, 'আর যা করিস্ না করিস, পড়াটা তুই এ ভাবে ছাড়িস্ নে নিমাই। তোর দিকে সারা নবদ্বীপ চেয়ে আছে। তুই তাদের সে আশা নষ্ট করিস্ নে'।

নিমাই মৃদু হেসে বললে, 'টোল ছাড়লাম বলে পড়া ছেড়েছি এ কথা তোকে কে বলে? টোল ছাড়লাম, নিজে টোল খুলবো বলে। আমাদের সংসারের অবস্থার কথা তো তুই জানিস্ ভাই, সুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এ অবস্থায় কি আর টোলে যাওয়া চলে? তাই নিজেই আমি টোল খুলতে চাই। যদি টোল করে দু'চার পয়সা রোজগার করা যায়'।

রঘুনাথের মনের দ্বন্দ্ব তবুও যেন কাটে না।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বলে, 'দ্যাখ, আমায় তুই অপরাধী করিস নে নিমাই। আমার আশা পূর্ণ করতে তুই ন্যায়শাস্ত্র পাঠ ছেড়ে দিস্‌নে।'

'দূর বোকা, তোর জন্যে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ ছাড়বো কি? বললাম না, নিজে আমি টোল খুলবো। নিজে টোল খুলে কি আর অন্যের টোলে পড়া যায়? যায় না। তাই না আমায় বাসুদেব সার্বভৌমের টোল ছাড়তে হলো।'

কয়েক ফোঁটা জলের সঙ্গে রঘুনাথ আবারও একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

এবারে সত্যি টোল খুললে নিমাই।

প্রতিবেশী মুকুন্দ সঞ্জয়। ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিমাই তার ছেলেকে পড়াতো। সেই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপেই নিমাইয়ের টোল বসলো। সুপণ্ডিত বলে নাম ছিল তার। কাজেই টোলে ছাত্রের অভাব হলো না। দেখতে দেখতে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপ পড়ুয়াতে ভরে উঠলো।

মুকুন্দ সঞ্জয় তো ভারি খুশি।

নিমাইকে ডেকে তাই সে বললে, 'বাহবা, বাহবা, বাহবা পণ্ডিত, যেনে যাদুমন্তর গো। টোল খোলা মাত্রই

ছায় যেন উপচে পড়লো। ··এই ধরো না, এই নবদ্বীপেই কতো ব্যাটা টোল খুলে ফ্যা ফ্যা করছে, উঁহুঁ, পড়ুয়ারা সে পথে পথ হাঁটে না। আর তোমার টোলে যে ঠাসা-ঠাসি। টোল খোলা মাত্রই বাজীমাৎ করলে। পারবে, পারবে, মিশ্রদা'র সুনাম তুমি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।'

নিমাই মৃদু হাসলে। বললে, 'তা আর কৈ পারলাম মুকুন্দকাকা?' 'পারো নি মানে?' মুকুন্দ সঞ্জয় যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললো, 'দেখাও দেখি আর একটি, তোমার মতো বয়সে যে টোল খোলার সাহস রাখে? যেখানে পড়ুয়ারা এখন ভীড় করে আসে!'

'সবাই আমায় ভালোবাসে তাই।'

'না না, বিদ্যার ক্ষেত্রে ঐ ভালোবাসা-টালোবাসার কথা নেই। সেখানে উপযুক্ত অধিকারীর প্রশ্ন। যে উপযুক্ত, তার কাছেই পড়ুয়ারা পাঠ নিতে যায়।'

মুকুন্দ সঞ্জয় আরও খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে কতো কি যেন বলে যায়। নিমাই সে দিকে বড় একটা কান দেয় না। তারপর মুকুন্দ সঞ্জয়ের কথা শেষ হলে এক সময় সে নিজের কাজে চলে যায়।

কিন্তু সবাই তো আর মুকুন্দ সঞ্জয় নয়।

নবদ্বীপে এমন লোকের অভাব ছিল না, নিমাইয়ের এই টোল খোলাটাকে যারা সুনজরে দেখেনি। তাদের মধ্যে প্রধান হল নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ। এর কারণ আছে।

নিমাই পণ্ডিত হলেও, বয়েস তার একেবারেই কম। সে যখন পড়াতে বসে, তখন কে পড়ুয়া আর কে অধ্যাপক তা বুঝে নেয়াটা শক্ত। তা ছাড়াও এই তরুণ অধ্যাপকের অনেক কথা-বার্তাই হজম করতে পারে নি ওরা।

তাদের কাছে নিমাই অহংকারী, বাচাল।

নিমাই একচেটে পাকা।

তাই নিমাই সম্বন্ধে কথা উঠলেই, তাকে নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করতো।

কেউ বলতো, 'মুণ্ড ভাঙের শখটা বেশী, বুঝলে না বিদ্যাবাগীশ, মুণ্ড ঘড়ার জলই ছলাৎ ছলাৎ করে। নিমাই, ঐ নিমাই পণ্ডিতেরও সেই অবস্থা। দু'পাত পুঁথি পড়েই সে আর কাউকে গেরাহ্যির মধ্যে আনতে চায় না।'

বিদ্যাবাগীশ মশাই নাকে এক টিপ নস্যি ঠেসে উত্তর করলে 'তা ঠিক, তুমি ঠিক কথাই বলেছো তর্কচূড়ামণি। কটি দাঁতেরই কচকচি বেশী। সে যা পায়, তা ই কামড়াতে চায়। ঐ নিমাই পণ্ডিতেরও ঐ কামড়ানি রোগটি এখনো সারে নি'।

তর্কচূড়ামণি মাথা নাচিয়ে বললে, 'উহু, ও রোগ দুরারোগ্য। সারবার নয়। নিমাই পণ্ডিতের ও রোগ সারবে না।'

একটু থেমে আবার বললে, 'পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে।' ঐ নিমাই পণ্ডিতও মরবে, বুঝলে বিদ্যাবাগীশ। ওর অহংকারই ওকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারবে। তখন দেখো, এই তর্কচূড়ামণি ঠিক কথাটি বলে ছিল কিনা!'

বিদ্যাবাগীশ মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দেয়।

অবশ্যি এরূপ বিরূপ সমালোচনার জন্যে নিমাই নিজেও কম দায়ী নয়। সে স্পষ্টাস্পষ্টিই সবাইকে চ্যালেঞ্জ করে বলতো, 'সে লোক সত্যি কার্পটিও জানে না, কলিযুগে সে-ই ভট্টাচার্য পদবী নিয়ে বসেছে। কৈ আসুক দেখি তারা, আমার ফাঁকির অর্থ বলুক। তবে বুঝবো তাদের ভট্ট মিশ্র প্রভৃতি পদবীর সার্থকতা'।

কিন্তু কেউ আসে না নিমাইয়ের সঙ্গে তর্ক করতে। বরং নিমাইকে দেখলেই অনেকে মুক্ত কচ্ছ ছুটে পালায়। কি জানি, শেষে নিমাইয়ের কাছে যদি পরাভব স্বীকার করতে হয়।

তর্কচূড়ামণির জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে।

পথ দিয়ে চলেছিল তর্কচূড়ামণি। দূরে নিমাইকে দেখেই সে বাঁকা পথ ধরলে।

নিমাইয়ের সেটা দৃষ্টি এড়ালো না।

সে ছুটলে তর্কচূড়ামণির পিছু পিছু। তর্কচূড়ামণি মশাই, এই তর্কচূড়ামণি মশাই, পালাচ্ছেন যে বড়ো।

শুনে যান, কথা আছে।

তর্ক চূড়ামণি একটু দাঁড়ালো। পিছন দিকে একবার তাকালো। তারপর আর হাঁটা নয় সোজাসুজি দৌড় সুরু করলো। তার মুক্ত কচ্ছ যে ধূলায় গড়াতে গড়াতে তার সঙ্গে দৌড় সুরু করেছে, সে দিকে তার খেয়ালই নেই।

তর্ক চূড়ামণির এই চূড়ান্ত অবস্থা দেখে নিমাই করতালি দিয়ে হেসে উঠলো। আশে পাশের বাড়ীর ছেলে ছোকরারাও সেদিন পথে নেমে নিমাইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েছিল।

একা তর্ক চূড়ামণির নয়, এ তিক্ত অভিজ্ঞতা নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিতেরই হয়েছে।

নিমাইয়ের নামে তাই এই পণ্ডিতকুল ভীত।

আর ভীত বলেই নিমায়ের নিন্দায় তারা পঞ্চমুখ। নিমাইয়ের নিন্দা করে তারা নিজেদের মনের দুর্বলতাটাকে ঢেকে রাখতে চায়।

কিন্তু নিমায়ের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

তার টোলে পড়ুয়াদের ভীড় বেড়েই চলে। নবদ্বীপের মানুষের কাছে তার মর্যাদাও বাড়ে।

ধনী ব্যবসায়ীরা পাল্কী চড়ে যেতে যেতেও নিমাইকে দেখে পাল্কী থেকে নামে।

বলে, 'এই যে পণ্ডিত, দণ্ডবৎ।'

নিমাই হাসে। বলে, 'কোথায় চললেন দত্তমশাই'?

'দোকানে। লোকজন দিয়ে কি সব সময় সব কাজ হয় পণ্ডিত? কাজেই নিজেকেও মাঝে মাঝে যেতে হয়। কাজ কারবার দেখতে হয়।'

নিমাই বলে, 'তা দেখবেন বৈ কি? নিজের কাজ নিজে না দেখলে চলবে কেন?'

'এই ছাখো, কথাটা তুমি ঠিক ধরেছো পণ্ডিত। কিন্তু আমার গিন্নিকে আমি এ কথাটা কিছুতেই বুঝাতে পারি নে। তিনি বলেন, যা লক্ষ্মী তো আমাদের দশ হাতে দিয়েছেন, এর বেশী আবার লোভ কেন? এ বয়সে আর দোকানে যাওয়া কেন! তুমিই বলে ছাখো তো পণ্ডিত ওটা কি আর কথা হলো? বসে খেলে মা লক্ষ্মী রাগ করবেন না? তিনি চঞ্চলা হবেন না?'

বলতে বলতে উত্তরের অপেক্ষা না করেই দত্ত মশাই গিয়ে পাল্কীতে ওঠে। বাহকরা পাল্কী উঠিয়ে হেইয়ো হো রবে দোকানের দিকে এগিয়ে যায়।

নিমাই আবার পথ চলে। সে জানে, পথে এ ধরণের আরও বহু 'দণ্ডবৎ' সে পাবে। অনেকে করবে কুশল প্রশ্ন। সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাড়ি ফিরতে তার বিলম্ব হবে।

সে তাই তাড়াতাড়ি পা চালায়।

রোজই গঙ্গায় দেখা হতো তার সঙ্গে।

বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী। সেই লক্ষ্মী সখীদের সঙ্গে গঙ্গায় আসতো। গঙ্গা স্নান করতে। গঙ্গাপূজো করতে। নিমায়ের সঙ্গে এখানেই তার প্রথম সাক্ষাৎ।

দুষ্টু নিমাই ছোট বেলা থেকেই তাদের উপর হামলা করতো।

মেয়েরা ভোগ সাজিয়েছে। পূজোয় বসেছে। নিমাই সেখানে হঠাৎ গিয়ে হাজির, দে, দে, ভোগ দে আমায়?

'বা-রে! তোমায় ভোগ দিতে যাবো কেন? এ ভোগে পূজো হবে।'

'ইস্, পূজো হবে? কার পূজো হবে রে? দেবতার? দে, ও ভোগ তোদের দেবতাকে দিতে হবে না। আমায় দে'। বলে নিমাই নিজেই পূজোর ফল-পাকুড় উঠিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাতো।

মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠলে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের হাঁসিয়ার করতো নিমাই। 'ভাখ, চেঁচাবি নে বলছি। বেশী চেঁচালে পা ধরে টেনে নিয়ে গঙ্গায় ডুবিয়ে দেবো। হুঁ, তখন টের পাবি মজাটা'।

ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যেতো মেয়েদের। তারা জানতো, এ দস্যি ছেলের যে কথা সে-ই কাজ। এমন ছেলেকে কে ঘাটাতে যাবে বাবা। তার চেয়ে গঙ্গা জলেই আজ গঙ্গা পূজো সারি।

মেয়েরা তাই করতো।

কোন কোন দিন এখনও হতো—

মেয়েরা স্নানে নেমেছে গঙ্গায়।

নিমাইও তার দল বল নিয়ে হাজির।

মেয়েদের স্নানের ঘাট আলাদা। পুরুষদের ঘাটের চেয়ে খানিকটা দূরে। কিন্তু তাতে কি হয়?

নিমাইয়ের মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপলো। মেয়েদের আর ভয় দেখাতে হবে। সে-ই কথা, সে-ই কাজ।

নিমাই ডুব দিয়ে সলিলে গিয়ে ভেসে উঠলো ঠিক মেয়েদের সামনে। ও মাগো, ম'লাম গো'—বলে মেয়েরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাড়ের দিকে ছুটেছিল।

নিমাই তাদের ডাকলে। 'এই শালারি নি বলছি।' মেয়েরা থমকলো। নিমাইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। বললো, 'ও বাবা! তুমি। তোমার পেটে পেটে এতো'

নিমাই বললো, 'স্থাখ্ না, তোদের কেমন ভয় খাইয়ে দিলাম?' একটু থেমে আবার বললো, 'তোদের মাথায় একেবারে কিছু নেই, তোরা একেবারে বোকা।

'বোকা আছি তো তোমার কি? তুমি মেয়েদের ঘাটে আসবে কেন? দাঁড়াও না, আজকে ঠাকুরমাকে বলে দিচ্ছি।' বলে একটি ঠোঁট কাটা মেয়ে আগে গজ গজ করতে করতে পাড়ের দিকে উঠে গেলো।

নিমাই চেঁচিয়ে বললো, 'স্থাখ্ ভালো হবে না, ভালো হবে না, বলে রাখছি। যার কানে এ কথা দিবে, তোর চুল ধরে জলে ডুবিয়ে দেবো।

'ইস্, একবার দিয়েই স্থাখো না।'

নিমাই সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু হিঃ হিঃ করে হাসে। মেয়েদের মধ্যেও তখন হাসির ঘুম পড়ে যায়।

পড়বে না কেন?

মুখে রাগ দেখালেও নিমাইয়ের এ চাপলা মেয়েদের ভালো লাগে। এক পক্ষের হাসিতে অন্য পক্ষের নকল হাসির ফানুসটা তাই ফেটে যায়।

ছেলেবেলার সেই জল খেলা থেকে সুরু।

লক্ষ্মীকে ভালো লেগেছিল নিমাই নিজেও যেন তা টের পায়নি।

টের পেলো সে দিন, শচীদেবী যে দিন পুত্রের বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

মাত্র ষোল বছর বয়সে সংসার ছেড়েছে বিশ্বরূপ। সে কাঁটাটা শচীদেবীর মনে আজও গভীরভাবে বিঁধছে।

সেদিনও ছেলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন মিশ্র পুরন্দর। বিশ্বরূপ সে প্রস্তাব মানে নি। সংসারের শেকলে সে বাঁধা পড়ে নি। শেকল কেটে পালিয়ে গেছে। কোথায় সে আছে, কেউ জানে না। কিন্তু নিমাই?

নিমাইও কি সেই পথে যাবে? বড়োর পথই নাকি ছোট ধরে। নিমাইও কি তবে বিশ্বরূপের পথ ধরবে? শচীদেবীর চোখে তাই ঘুম নেই।

নিমাই টোল খুলে বসতেই তিনি তার কাছে তাই বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

'বিয়ে?'

কথাটা প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল নিমাই।

বলেছিল, 'এক্ষুণি বিয়ের কি হলো মা? সবে তো টোল খুলেছি। আগে কটা বছর যেতে দাও। টোলটাকে একটু গুছিয়ে নিই, তখন বিয়ের কথা ভাবা যাবে'।

'না রে!'

কথা আরম্ভ করে শেষ করতে পারেন নি শচী দেবী। চোখ থেকে তাঁর ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়েছিল। গলাটা এসেছিল ধরে।

একটু থেমে, অ বেদনাকে একটু কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'না-রে! আর দেরী নয়। আমার বয়েস হয়েছে না? আমি কি আর পারি সংসারের ঝামেলা বইতে? এবারে আমায় মুক্তি দে নিমু। জীবনের বাকী কটা দিন একটু নিশ্চিন্তে রঘুনাথের নাম করি। বল্, আমার কথা রাখবি।'

বলতে বলতে শচী দেবী নিমাইয়ের একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর টেনে নিয়েছিলেন।

নিমাইয়ের চোখের সামনে লক্ষ্মীর মুখখানি তখন বড়ো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে।

লক্ষ্মী, সেই বল্লভাচার্যের মেয়ে লক্ষ্মী। গঙ্গার তার জলখেলার সঙ্গী। লক্ষ্মী যে তার জন্যেই অপেক্ষা করছে, নিমাই বুঝি সেটা টের পেয়েছিল।

যার কথায় তাই আর আপত্তি করে নি সে। মাকে সে কথা দিয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি যদি সুখী হও, কথা দিলাম,আমি বিয়ে করবো। তুমি পাত্রীর খোঁজ করো।'

শচীদেবী সে দিন গভীর আনন্দ নিয়ে পুত্রের কাছ থেকে ফিরেছিলেন।

নিমাই বিয়ে করবে খবরটা রটে গেলো চার দিকে।

শচীদেবী নিজেই অনেককে বললেন পাত্রীর খোঁজ করতে।

যেমনি রূপ, তেমনি তার গুণ—এমন গুণবর পাত্রী ক'টা মিলে?

কাজেই কন্যা পক্ষের বহু লোক এসে ধর্না দিল শচীদেবীর আঙিনায়।

না, কাউকে কথা দিতে পারেন না শচীদেবী।

কথা দিবেন কি করে?

কোন পাত্রীই যে নিমাইয়ের পছন্দ নয়। পক্ষ মুখে পাত্রীর রূপ-গুণের ফিরিস্তি দিলেও নিমাই মুখ ভার করে থাকে।

শচীদেবী একটু দুশ্চিন্তায়ই পড়েন।

সে দিন দুপুরে বাড়ি ফিরছিল নিমাই।

পথে বনমালীর সঙ্গে দেখা। বনমালী বিয়ের ঘটকালি করে।

নিমাইকে দেখেই যেন সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, এই যে নিমাই, বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীকে তো তুমি জানোই হে। গঙ্গার তীরে তোমরা তো একত্রেই খেলা করতে।'

বনমালীর কথায় একটু বিস্মিত হয় নিমাই।

বলে, 'তা হঠাৎ লক্ষ্মীর কথা এলো কেন ঘটকঠাকুর?'

'এলো তোমার মায়ের কথায়। হ্যাঁ হে, এই তো এলাম তাঁর কাছ থেকে। বললাম, বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে নিমায়ের বিয়ে দিন। অমন মেয়ে লাখোতে একটা মিলে। লক্ষ্মী রূপে গুণে স্বয়ং লক্ষ্মী। কিন্তু তোমার মা তাতে নারাজ। বলেন, চেনা মেয়ের সঙ্গে তিনি কাজ করবেন না। তা সে যতো রূপবতী গুণবতীই হোক।'

একটু থেমে বনমালী ঘটক আবার বললে, 'কি হে, লক্ষ্মীকে তোমার পছন্দ নয়? অমন মেয়ে আর কোথাও পাবে নাকি খুঁজে?'

লক্ষ্মীর কথায় নিমাইয়ের মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল।

হ্যাঁ লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর সঙ্গে যেন তাঁর জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। লক্ষ্মীকেই যে তার চাই।

কিন্তু বনমালী ঘটককে কিছু বললে না সে।

বনমালী নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, 'কি হে, কিছু বলছো না কেন? অমন পাত্রী গোটা নবদ্বীপে আর কটা আছে?'

'তা আমি আর কি বলবো। সবই তো মায়ের হাতে। আপনি বরং মায়ের সঙ্গেই আবার কথা বলুন।'

'হ্যাঁ, আমি তাই বলব। কাল আবার যাবো তাঁর কাছে। আরে অমন লক্ষ্মীকে কি কখনও হাত ছাড়া করতে আছে?' বলে বনমালী ঘটক আবার হন্‌হন্‌ করে চলে গেলো।

বাড়ী ফিরলো নিমাই।

কিন্তু বার বার লক্ষ্মীর মুখখানা অমন করে তার মনে ভেসে উঠছে কেন? অমন করে তাকে সব কাজ ভুলিয়ে দিচ্ছে কেন?

লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী।

নিমাইয়ের মনে বার বার লক্ষ্মীর নামটি উচ্চারিত হয়ে উঠলো।

যেন একটি প্রবল আকর্ষণ তাকে লক্ষ্মীর দিকেই টেনে নিচ্ছে।

ছেলের পাতে ভাত দিতে দিতে শচীদেবীই কথাটা পাড়লেন, 'বনমালী ঘটক এসেছিল রে।'

ভাতের দিকে চোখ রেখেই নিমাই উত্তর করলে, 'হুঁ'।

'তোর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে।

নিমাই চোখ না উঠিয়েই আবার বললো, 'হুঁ'।

'আমি তাকে না-ই করে দিলাম। অতো চিনেজানার কাজ কি রে? তু ভাবতে কি মেয়ে নেই? তাদের একটিকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে আনতে পারবো না?

খেতে খেতে হঠাৎ থেমে গেলো নিমাই।

মাথাটা একটু নুইয়ে চুপ করে বসে রইলো।

শচীদেবীর তা দৃষ্টি এড়ালো না।

বললেন, 'হ্যাঁ রে নিমু, লক্ষ্মীকে তোর পছন্দ হয়?' সলজ্জ ভীরু দৃষ্টি তুলে মায়ের মুখের দিকে চাইলো নিমাই। একটা প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখমণ্ডলে।

বললো, 'বনমালী ঘটককে তুমি ওভাবে ফিরিয়ে না দিলেও পারতে মা।'

মা ছেলের ইঙ্গিত বুঝলেন।

বললেন 'তা ফিরিয়ে দিয়েছি বলেই তো আর মুখ ফিরিয়ে নিই নি রে। আমি কালই আবার তাকে ডাকিয়ে আনছি। লক্ষ্মীকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করবো সেটা তো আমার আনন্দের কথা।'

'মা।'

নিমাই আবার মায়ের দিকে চেয়েছে।

শচীদেবী বললেন, 'কি রে?'

'তুমি রাগ করলে না বলো?'

'শোন ছেলের কথা! আমি রাগ করতে যাবো কেন রে? তোর পছন্দেই আমার পছন্দ। সেখানে কি আমি রাগ করতে পারি? না আমার রাগ করা সাজে?

নিমাই বললো, 'না, তবুও তুমি বলো যে তুমি রাগ করো নি।' শচীদেবী এবারে হেসে ফেললেন।

বললেন, 'করি নি, করি নি, করি নি। নে হলো তো? একটু থেমে আবার বললেন, 'লিখেপড়ে পণ্ডিত হলি, এতো তোর বয়েস হলো। পাগলামী কিন্তু তোর এখনও গেলো না নিমু। গেলে দারা নবদ্বীপের লোক তোকে পাগল পণ্ডিত বলে না ডাকে।' বলতে বলতে শচীদেবী আবার হাসলেন।

মায়ের হাসির সঙ্গে ছেলের হাসিও যোগ হলো।

একটা থমথমে ভাবও কাটলো।

নিমাই আবার খাওয়ায় মন দিলে।

তার মনে তখনও লক্ষ্মীর গোপন আনাগোনা চলছে।

শুভ দিনে, শুভ ক্ষণে বিয়ে।

বিয়ের আয়োজনে ত্রুটি করেন নি শচীদেবী। নৃত্য-গীত বাদ্য-বাদ্যের আয়োজন করেছেন।

স্বামীর কথা ভেবে, বিশ্বরূপের কথা মনে পড়ে, চোখ দু'টি তাঁর ছলছল করে উঠেছিল।

কিন্তু না, কাঁদলেন না শচীদেবী। এ শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই, মঙ্গলের পথকে চোখের জলে পিছল করতে নেই।

শচীদেবী তাই চোখের জল মুছে নিলেন।

মনের দুঃখকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে রেখে নিমাইকে তিনি বল্লভাচার্যের গৃহে পাঠালেন।

'নিমু, নিমু আমাদের বিয়ে করতে চলেছে। ওগো, তোমার কতো সাধ ছিল গো। ঘরে টুকটুকে বউ আনার সাধ ছিল। তুমি তাই বিশ্বরূপের বিয়ে দিতে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমার সে সাধ পূর্ণ হলো না। সে পাখি তোমায় ফাঁকি দিয়ে পালালো। আর নিমু, নিমু আমাদের ঘর আলো করা বউ আনতে চললো। আমাদের সাধ পূর্ণ করতে চললো। গোলোক থেকে তুমি তাকে আশীর্বাদ করো।'

মিশ্রের কথা মনে পড়ে শচী দেবীর চোখ দু'টি আবার জল ছলছল হয়ে উঠেছে।

আকাশে সবে দু' চারটি তারা ফুটেছে। নবদ্বীপে সন্ধ্যের ছায়া ঘুচে সবে রাত নামলো।

(শেষাংশ ৪২৬ পাতায়)

সখবালার মা (২য় পর্ব)

দুর্গা মোদ্দার্ণী

সখবালার মা কলমী এখন হিন্দুস্থানী গয়লা রামকেশবের জন্ম অর্ধাং ঘরণী। কলমীকে রেলবাজার বস্তী থেকে ঘোষের পিঠে চাপিয়ে রামকেশব ওর খাটালের খোলার খাপরায় এনে তোলার পর থেকে দু'জনে বেশ সুখে - স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়। হিলহিলে দুলদুলে চেহারার মেয়াকী কলমী এখন একেবারেই পাল্টে গেছে। খুব মনোযোগ দিয়েও এখন ঘরকন্না করছে। রামকেশবের নোংরাটে গোয়াল ঘরের মত চেহারার খুপরিটায় এখন একটা ঝাঁটোপাটো পরিচ্ছন্ন ঘর গেরস্থালীর ছাপ ফুটে উঠেছে। রামকেশবের একটা নড়বড়ে খাটিয়া ছিল। কলমীর ব্যবস্থাপনায় একটা লম্বার কাঠের চৌপাই এনেছে রামকেশব। কলমী নিজের কিছু সঞ্চিত পয়সায় ওকে দিয়ে একটা মোটা মাদুর কিনিয়েছে। রামকেশবও কলমীর আব্দারগুলো রক্ষা করবার চেষ্টা করে প্রাণপণে। পাছে কলমীকে জব্দ করে এনে শেষে ভালবাসা দেখানোয় ঘাটতি পড়ে এই ভয়ে। কেননা রামকেশবের অভিজ্ঞতায় বলে যে—স্ত্রী, ভক্ত আর গরু—এই তিন বস্তু যখন যার কাছে থাকে, তখন তার। আর তখন তাদের যত্ন আত্তি না করলে—তাদের থেকে কোনও ফায়দা উঠান যায় না। তাই রামকেশব কলমীর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হয়ে ওঠে। রামকেশব যখন ওর পাটাতন বুকে কলমীকে সাপ্টে ধরে আদর করতে থাকে—তখন পরম নিশ্চিন্তে—আরাম আর পরিতৃপ্তিতে কলমী ওর বুকের সঙ্গে আঠার মত লেপ্টে থাকে। ভাবতে থাকে এই সুখ, এই আনন্দ এতদিন পৃথিবীর কোন্ অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল। ওর রেলবস্তীর দুড়দুড়ে হেঁপো রুগী বুড়ো বর উথান আর কচি মেয়ে সখবালা স্বপ্নে দেখা কোনও এক অস্পষ্ট কাহিনীর মত ঝোঁয়া হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়।

বাড়ী বাড়ী আর দোকানে দোকানে যোগানের দুধ দিয়ে আসা ছাড়া রামকেশবের এখন আর বিশেষ কাজ-কাম থাকে না। আগে দু'বেলা খানা পাকাতে হত। গায় ভঁইসের তদারকি করতে হত। এখন কলমীই ত' সব করে। কলমী বলে—দেশমুলুক ছেড়ে এখানে একা একা ত' বড়ত কষ্ট করেছ। আরও যদি কষ্ট করবে তবে এ বাঙালী বিটি কলমী তোমাকে কী ভালবাসলো? হিন্দুস্থানী গয়লাও বাঙালী প্যারীর স্বামীর ঘর বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। রোজ সন্ধ্যায় কলমী আজকাল রামকেশবকে রেলবস্তীর চুনুর ঠেকে আর জমতে দিতে চায় না। চুনুর ঠেকটা যত অকথ্য মাস্তি-মিস্তির আড়ৎ। অবশ্য কলমীও রেলবস্তীতে থাকতে যে ওখানে যেত না তা নয়। ওখানে না গেলে আর রামকেশবকে পেত কী করে? পাটাতনবুক, বলিষ্ঠ পেশল বাহুর লম্বচওড়াই একটা লোককে চুনুর ঠেকে ভাঙাই বাংলায় দু' বোতল চোলাই খেয়ে আর এক বোতল পাব নাকি,—কী করে চুপ থাকি—ভাই, বলনা,—কী করে চুপ থাকি? —এই গান গেয়ে টলে টলে পড়তে দেখে কলমীই ওকে সেই আড্ডা থেকে টেনে এনে কসে ধমক দিয়ে ওর খাপরায় ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছিল। এই রকম পাটাতন চেহারার মদ্দকে মাতাল হতে দেখলে কলমীর অসহ্য ঠেকত। কলজের জোর না থাকলেই মদ্দরা বেহেড হয়ে খানাখন্দরে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে। কলজের জোরওলা মদ্দরা বুকচিতিয়ে যা চাইবে মন্তরের মতন তাই তাদের কব্জার মধ্যে পাবে। কলমীই রামকেশবের ভেতরের মরদটাকে চাগাড় দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল। যাকে মধ্যে রামকেশব চুনুর ঠেকে গেলেও আগের মত আর গেলে না। কলমী যে ওকে খুব সোহাগ করে। চৌপাই এর ওপর বসে সন্ধ্যায় পরম কড়ুয়াতেল রামকেশবের খাবড়া পায়ের চাপা আঙুলের ডাণ্ডায় মালিশ করতে করতে কলমী যখন ওর দেশমুলুক, গায় ভঁইস, খেত-খামার গোরু-কলাইয়ের নানা গল্প শোনে তখনও অবাক বিস্ময় বোধ করে। ধীরে ধীরে রামকেশবের ভারী ভারী উরুতের ওপর ওর নিজের

লম্বা গলাটা ছড়িয়ে দিয়ে রামকেশবের খড়ের মত খরখরে রোমশ দু পায়ে আমেরুমাখানো হাতে আদর বুলিয়ে দিতে থাকে। রামকেশবের শক্ত হাতখানাও এক সময় কলমীর হিল্‌হিলে শরীরের শিরদাঁড়াটার ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত একছড়া ধানের শীষের মত সুড়সুড়ির আবেশে ডুবিয়ে দেয় ওকে।

কলমী তখন বিহারের কোনও দেহাতী গ্রামে মস্তবড় রূপোর নাকফুল নাকে, হাতে মোটা রূপোর বাঘমুখো কালা আর পায়ে মল, লাল হলুদ রঙের জংলা ছাপাশাড়ী হিন্দুস্থানী চঙে পরে পড়ন্ত বেলায় মোটা মোটা গবের ঝাঁটি মাথায় করে মাঠের আলপথ বেয়ে ঘরে ফিরছে। সূর্যাস্তের লাল ওকে সোহাগের আবিরে রাঙিয়ে দিয়েছে। কিংবা এমনই সন্ধ্যায় কলমী বাড়ীর মেয়েদের আর পড়শীদের সঙ্গে আস্ত আস্ত কলার কাঁদি, আরও আরও কী কী সব জিনিষ নিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে চ্যাপ্টা চওড়া কুলো মাথায় ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে - অদ্ভুত সুরে গান গাইতে গাইতে কোনও বিল বা নদীতে ছটপুজো দিতে চলেছে। আবার বালবাচ্চারা ছটপুজোয় ঠেকুর খাবার আবার ধরে। কলমী একা কত দিক সামাল দেবে। কত কাজ। কত তাড়া। রামকেশবের বাড়ীর আর সব বহু বিটিরা ওর কাজে হাত লাগাতে আসে। ও সবাইকে হটিয়ে দেয়। নিজেই ভারী ভারী, মোটা মোটা ধাঁতার মুখের ছুটোয় আস্ত আস্ত মুগকলাইগুলো গুঁজে দিয়ে সজোরে কাঠিটা ঘুরিয়ে দেয়। ধাঁতার কাঠির তালে তালে বাঘমুখো বালাজোড়া রামকেশবের বলিষ্ঠ বাহুর মত ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে থাকে। ধাঁতা ঘোরানো থামিয়ে নির্বাক বিস্ময়ে বালাজোড়ার দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যায় কলমী। সম্বিৎ ফিরে আসে। আবার ধাঁতার কাঠি পড়ে। ভারী পাথরের দু'কল বেয়ে সোনারঙের মুগকলাইগুলো দু'ভাগে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে। কলমীর কলজে ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এমন নেশা-ধরানো পাগল পাগল স্বপ্ন কেন ভাবে ও? হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ে কলমী, বলে খানা পাকাতে হবে।

রামকেশবও সুযোগ ছাড়ে না। ওর দুই পেশল শক্ত হাতে কাঁচা কঞ্চির মত নরম হিল্‌হিলে তলতলে কলমীকে জাপটে ধরে চৌপাইতে শুইয়ে দেয়। এখনই ওকে উলটে পালটে, চটকে পিষে দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে রামকেশবের। ছোট খুপরীর ভেতর লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় আভায় কলমীকে আরব কাহিনীর পুতলীর মতই লাগছে। রামকেশবের কলজের খুন ছলাৎ করে ওঠে। কলমীকে সাপ্টে বুকের গোড়ায় টেনে নেয়। ঘন ঘন চকাচক্ শব্দে চঞ্চুটি ঠুকে কলমীর ছোট পুতলীর মত মুখখানাতে ডুবারুর মত ডুলডুলি কোটাতে চায় ও। কলমী তার হিলহিলে দুই অবশ হাতে প্রিয়তমের গলা আঁকড়ে আঁকড়ে ধরে ওর পাটা ভন বুকের ভেতর নিজেকে মিশিয়ে ফেলে। সুদক্ষ বাজীকরের মতই রামকেশব এক হিংস্র বিষধর নাগিনীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে আপন ইচ্ছেমত খেলাতে থাকে। কখন অনমনীয় শক্ত সবুজ কাঁচা বাঁশের কঞ্চিখানা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়।

রামকেশবের বুভুক্ষু শরীরের দহন শান্ত হতে বেশ সময় লাগে।

কলমী পোয়াতী। মুখে কিছু রোচে না। রামকেশব প্রথম প্রথম কলমীর দিকে খুব নজর রেখেছিল। এখন কলমী একটু ধাতস্থ। এ ধাতটা ওর সখবালার বেলাতেই ধরা পড়েছিল। কলমীর চেহারা এখন অনেক পাল্টে গেছে। শক্ত শক্ত ভাবটা ওর শরীর থেকে মুছে যাচ্ছে। একটা নরম চক্‌চকানি ঝিলিক্ দিচ্ছে ওর সারা দেহ ঘিরে। যেন কালো দিঘীতে নতুন বর্ষার ঢল নামছে। পোয়াতী হওয়ার পর প্রায়ই সখবালার কথাটা মনে পড়ে যায় কলমীর। মেয়েটাকে দেখতে ভারী ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে। ঐ ত দু'পারের রাস্তা ফেলবস্তী। গেলেই হয় একদিন কিন্তু ওরা এখানে আছে কি না কে জানে?

এতদিনে সখবালাকে পথেঘাটেও একটি দিনের জন্যও দেখতে পায় নি কলমী। মনটা বেশ ভার ভার ঠেকে।

এদিকে দিনে দিনে, মাসে মাসে সময় এগোয়। কলমীর শরীরটাও বেশ ভার হয়ে উঠেছে। ও বেশী

নড়াচড়া করতে পারে না। খাপরার চালায় পা ছড়িয়ে বসে চাপাটি আর লক্ষি বানায়। আশপাশের হিন্দুস্থানীদের কাছে থেকে অনেক হিন্দী বুলি শিখেছে।

রামকেশবের মুলুক গেলে ত' নইলে লোকে ওকে কলকাতার আসল চিড়িয়া ভাববে না! ও যে এখন মনে প্রাণে রামকেশবের ঘরণী।

কদিন ধরেই রামকেশব বেশ বিমর্ষ আর গম্ভীর। গায় ভঁইসগুলোও দুধ দিচ্ছে না। রোজগারপাতিও নেই। তথা-গায় ভঁইসগুলাকে শহরে বসে বসে বেমক্কা খেতে দেওয়া বোকামি। সেগুলোকে মুলুক ছেড়ে না দিলে স্বস্তি নেই। এইসব কামকাজে রামকেশবকে কতবার হাওড়ার টিশানে দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে। কলমীর দিকে নজর দেবার সময়ই নেই এখন ওর। একদিন সন্ধ্যায় কোন এক দেশোয়ালী ভাইয়ের হেপাজতে গায়ভঁইসগুলোকে ট্রেনের ওয়াগনে ভরে পাচার করে দেয় রামকেশব। খাটালটা সুদ্ধ খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কলমীর বুকের ভেতরটাও ঠিক সুদ্ধ খাটালের মতই হা—হা করে উঠল। কলমী প্রশ্ন করে—মুলুকসে নয়া গায়ভঁইস আসবে না? রামকেশব বলে—না, হামি ত ইধর না রহিব। গায়ভঁইস লানেসে কা ফায়দা। হামারা তী কলই মুলুক যানা চাহিয়ে। টিকট তী কর লিয়া।

রামকেশবের কথায় কলমীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চোখের সামনে পৃথিবীটা গাঢ় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। একটু সামলে নিয়ে বলে—তুমি হামাকে ফুর হটাকে চলা যেতে পারো—মগর তুমার জো লড়কা হোগা—উস্‌কা কা? রামকেশব পরম নিশ্চিন্তে ওপর ঠোঁটের ফুলে পড়া চওড়া মোচগুলোকে দুহাতে পাকিয়ে পাকিয়ে গালের দু'পাশে ঠেলে তুলে দেয়। তারপর মোটা মোটা ঠোঁট দু'খানা ফাঁক করে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে হাসতে বলে—উত হামি তোকে বখশিস দিনুঙ্গা না,—পাগলী। না সমঝালী তু। ইয়ে বখশিস যিতনা রোজ তুহারে পাশ রহেগা—তু হামকো—কভী—ভুল ন সকভী।

রামকেশবের বৈশাখীর ছোপধরা কালো কালো দুপাটি দাঁত ধীরেধীরে কলমীর চেরা আমের কষির মত কালো কালো চোখের সামনে এক বিকট হাঁ করা দৈত্যের রূপ নিতে লাগল।

———

নিমাই তার নাম

(২২৩ পাতার পর)

বল্লভাচার্যের গৃহ তখনই উৎসবমুখর। উৎসবমুখর, কারণ গোধূলি লগ্নেই বিবাহ।

অনেক ভেবে চিন্তেই বিবাহের লগ্ন স্থির করেছেন বল্লভাচার্য। নবদ্বীপের সেরা ছেলে নিমাই। আর বিয়েতে লোক হবে। কাজেই লগ্নটি গোধূলিতে না হলে সকলেরই অসুবিধে।

বল্লভাচার্য তাই গোধূলি লগ্নেই বিয়ের আয়োজন করেছেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়ই বর এলো।

শাঁখ বাজলো। মেয়েরা দিলে হুলুধ্বনি।

বল্লভাচার্য ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে জামাতাকে বরণ করতে গেলেন। 'এসো বাবা, এসো।'

পাল্কী থেকে নামলো নিমাই।

রাঙা ধোতি পরণে। চন্দন চর্চিত প্রশস্ত ললাট। দীঘল দু'টি চোখে কাজলের রেখা।

নিমাইয়ের মোহন রূপ আরও মোহনীয়।

একটু পরেই আসরে আনা হলো লক্ষ্মীকে। সব অলংকার ভূষিতা।

লোক যেন ভেঙে পড়েছে আসরে। চারদিকে উল্লাস। একটা কলগুঞ্জন।

এবারে পিঁড়ি ধরে উপরে তোলা হলো দু'জনকে। নিমাই আর লক্ষ্মীকে।

নিমাই হাত জোড় করে বসে রইলো।

লক্ষ্মী তাকে করলো সাতবার প্রদক্ষিণ। করার পর মালা বিনিময়। ফুল বিনিময়।

এক সুতোয় বাঁধা পড়লো দু'টি প্রাণ।

নিমাই আর লক্ষ্মী। (ক্রমশঃ)

শ্রীমৎ
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাহিরের আবেষ্টনে যেরূপ এবং আমার দেহের অংশ যেরূপ তাহাতে কি শুধু হৃদয়ের উন্মত্ততা লইয়া আশা করিতে পারি যে আমি একটা আন্দোলন প্রবর্তিত করিতে পারিব? আমার ধন নাই, জন নাই। লক্ষ লক্ষ লোক এই বৈপ্লবিক দর্শন শুনিল অথচ সাড়া দিল না, তবু কি আশা করার কোন অবসর আছে? নিত্যগোপাল আছেন —এই মাত্র বল। তাঁহার সব কিছুই আছে, তাঁহাকে যদি জীবনে বরণ করিতে পারি, সকল দুর্যোগ প্রতিহত হইয়া সুযোগে গড়িয়া উঠিতে পারে। আমি তো অল্প। তিনিই সমগ্র। আমি জীব, তিনি শিব। শিব স্পর্শে জীবও শিব হয়। শিবোঽহম্'—আমি শিব হইব। স্বরূপে শিব আছি বলিয়াই প্রকৃতির ক্ষেত্রেও শিব হইতে পারি। শিবই সব প্রতিকূলতাকে পরিণাক করিয়া অনুকূলে পরিবর্ত করিতে পারেন, জীবের পক্ষে উহা অসাধ্য। তাহাকে প্রতিকূল ছাড়িয়া অনুকূল লইয়া চলিতে হয়। ফলে প্রতিকূল অনুকূলের অতীত অবস্থা লাভ করিতে হয়। কিন্তু শিব-কৃষ্ণের সাধনায় প্রতিকূল ও অনুকূল succession-এর ক্ষেত্রেই সম, বিষ অমৃতে সম, সংসারে সন্ন্যাসে সম, ঘরে অঘরে সম। আমি এই অবস্থাতীত অবস্থাই চাই। শ্রীনিত্যগোপাল অনুযুক্ত হউন। রেলু ১১ টার পর প্রথম P.M.G অফিসে পোষ্টাল্ড পরিবর্তনের দরখাস্ত দেয়, পরে রাইটার্স বিল্ডিংস এ উজ্জ্বল-ভারতের বিল ও নূতন গ্রাহক হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন দেয়, পরে বাসন্তীবাইণ্ডিং-এ যায়। ষ্টাম্প দুইটির শেষ অর্ডার দিয়া আসে। ৬ টায় আমি ও রেলু ঘরে যাই। যাওয়ার কিছু পূর্বে অবনী চট্টোপাধ্যায় আসে, সোঽহম্ স্বামীর গীতার সমালোচনা দিয়া যায়। 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে'—গীতার এই শ্লোকের তাহে আত্ম-জ্ঞান ও স্বধর্মের মাঝে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান সমস্ত ভাষ্য টীকাকারগণ তুলিয়াছে 'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ'—শ্লোকগুলিকে 'লৌকিক ন্যায়ের' ও 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া তাহাতেই এ দেশ ও দেশ একান্ত পৃথক হইয়া পড়িয়াছে; এ দেশকে কর্মযোগ দ্বারা গড়িয়া তোলার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে। অবনী আমাদের দলে ঘটে যায়। যগেনবাবু আমাকে বুধবার সভার আরম্ভে সভাপতি ও অতিথিকে অভ্যর্থনা করা, introduce করিয়া দেওয়া ও ধন্যবাদ দেওয়ার কথা বলেন। আমি অস্বীকার করি। ইহা লইয়া অনেক লাঞ্ছনা হইয়াছে, ঠেলাঠেলি করিয়া কাজ হয় না— non-violent non-co-operation। রেলুকে প্রবন্ধ লিখিয়া দিতে তারিণীবাবু বার বার অনুরোধ করেন, তারিণী বাবুর নামে ছাপাইবেন বলেন। রেলুর নামেই মত আপত্তি। ঠাকুরের ফটো ৫, টাকায় ঘটে কেনা হয়। ৫, টাকায় বাঁধাইতে দিয়া আসা হয়। ১৬ই এপ্রিল

ঠাকুর, ঘটে একজন কেহ নাই যে বিশিষ্ট লোকদের সামনে তোমার দর্শন ও জীবন বর্তমান যুগের উপযোগী করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারে, একজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে তোমার দর্শন ও জীবন কথা আলোচনা করিতে পারে, অথচ ইহারা সম্প্রদায়ের নেতা, গুরু। সাধারণ লোক হইতে ইহারা দূরে সরিয়া থাকে পাছে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয়। তুমি তোমার 'দর্শন' রাখিয়া চলিয়া গিয়াছ। কবাট পোহাইতে হইতেছে আমাকে। সমস্ত ঠেলা আমার উপর। ইহারা সংসারী সন্ন্যাসী জেনারেটর কায়েম করিতে চাহিতেছে। 'জীবন' বলিয়া কিছু ইহাদের নাই, সকলেই অতীত সংস্কারের পুটুলি। বর্তমান যুগের সঙ্গে ইহারা অপরিচিত। ইহারা যদি যুগীয় জীবন ধারা লইয়া বাঁচিবে কেমন করিয়া? অথচ ইহাদের অস্তিত্বের উপর তোমার তো অনেক নির্ভর করিতে হইতেছে। এখন ইহাদের হাতেই তো তোমার মঠ

ভক্ত। যাহা ভাল বোঝ কর। ইহারা অন্ধকার দেখিতেছে। সম্প্রদায়ের গৌরব জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিবার মত কেহ নাই? তোমাকে চাপিয়া কেহ রাখিতে পারিবে না ইহা আমি স্থির জানি। তোমার জয় হউক। রেণু ৩ টার পর সুধীন গাঙ্গুলীর ওখানে যায়। টিউবওয়েলের জন্য ২০০ টাকার বন্দোবস্ত সে করিয়াছে। সন্ধ্যার পর খগেনবাবু ও গাঙ্গুলী পুনরায় আসে। বিষ্ণু আসে ৯ টায়, তখনই পাঠাতে হয় মেসবন্ধুনগরে জিতেনবাবুর কাছে চিঠি দিয়া গোষ্টমাস্টারকে 'উদ্বোধন ভারত' সেখানে সেট করিবার সম্মতি দিতে যদি পি. এম. জি. জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যায় বিষ্ণুসহ মঠে যাই। তারিণীবাবু শ্রীকুমার ব্যানার্জী নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পা ধরেন, খগেন বাবুও যতকাল খুব অনুরোধ জানান। আমার বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়, আমি তো চলিয়াই যাইতেছি। প্রকাশানন্দের সঙ্গে অনেক কথা হয়। সে বলে, আপনার চিন্তা প্রণালী নিত্যগোপাল সম্বন্ধে মৌলিক। আপনাকে accomodate করিতে না পারা এ সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকর। লীলারা আসে। নরেনের সঙ্গে ৯॥ টার পর মঠ হতে ফিরি। রেণু বাজার হতে এটা ওটা কেনে।

১৭ই এপ্রিল

ঠাকুর, তোমাকে লইয়াই তো আমার দুঃখ। মঠের ওরা বলে, আমি যেন তাহাদের উপর অভিমান না করি। আমার কাহারও উপর অভিমান নাই তোমার উপর ছাড়া। মানুষের সঙ্গে অভিমান কাম ক্রোধ কিছুরই কোন মূল্য নাই। তুমিই 'মান' ভঞ্জন করিতে পার। মানের মর্যাদা কামের মর্যাদা, ক্রোধের মর্যাদা, লোভের মর্যাদা জীব কি জানে? 'কামক্রোধাদিকং তন্নিষেব করণীয়ম্'—ঠিক কথা। স্বামি আমার, তোমার উপর আমার অভিমান জীবন। তুমি নিজ জীবন ও দর্শন আমার উপর চাপাইয়া আমাকে পথে বসিয়া গিয়াছ। আমি একা সপ্তরথী পরিবেষ্টিত। তোমার মঠেও আমার স্থান নাই। তোমার বিপ্রবয়র জীবন ও দর্শন কি উহাদের হাতে নির্যাতিত হইতেছে না? আমি যে তোমার কিছুই করিতে পারিতেছি না। ধর্ম অর্থ কিছুই চাহি নাই। চাহিয়াছিলাম তোমার সেবা। তাহাও তো পারিলাম না। ছাড়িতে তো পারিবনা তোমাকে। কি লইয়া থাকিব তাহা হইলে? জয় হউক তোমার। নরেন ও শৈলাকে দীক্ষা দেই শ্রীনিত্যগোপাল মন্ত্রে। প্রণামী ১ টাকা করিয়া দেয়। আমি নীলু বাসে মঠে যাই। বাসে উঠিবার কালে বিপদ হইবার সম্ভাবনা ছিল। আমি হাতল ধরিয়াছি, ওদিকে বাস ছাড়িয়া দিয়াছে। ভিতরের লোকেরা আমার হাতটা টানিয়া ধরিয়াছিল। পরে রেণু গোপা যায়। সুব্রত আসে। তারিণীবাবু শ্যামসুন্দরানন্দও আমাকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য কিছু বলিতে বিশেষভাবে আজও বলে। বাসা ভোগের প্রণাম পাই। ৪॥ টার পর আমি গোপা স্বপ্না রিকসায় যাই। রেণু বিষ্ণু পরে যায়। ৫ টার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়। শ্রীকুমার ব্যানার্জী সভাপতি, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, (উপাচার্য) প্রধান অতিথি। প্রথমে আমার অভ্যর্থনা। বক্তা নির্মল সিদ্ধান্ত, পরমানন্দ, পুলিনবিহারী, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল দত্ত। পরে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এবারকার আলোচনা উচ্চ মানের। পুলিনবাবু বলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ বাছিয়া বাছিয়া নিয়াছেন, নিত্যগোপাল যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকে নিয়াছেন। যেমন গৌর নিতাই, তেমন রামকৃষ্ণ নিত্যগোপাল। আবার বলেন—নিত্যগোপাল গৌর নিতাই দুই-ই ছিলেন। ধীরেনবাবু ও আমি নিত্যগোপাল বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়মূর্তি বলি। শ্যামল দত্ত নিত্যগোপালের মানব পূজার দিক বলে। খগেন বিনোদ সিংহ আমার আলোচনা সম্বন্ধে বলেন—splendid!...বিষ্ণুপদ আজ এখানে রহিয়াছে। সকালে সত্যেন শাস্ত্রী প্রণাম করিয়া যায়। সুবোধ মুখার্জী সকালে আসে।

১৮ই এপ্রিল

———

কেষ্ট-ঠাকুর

কুমারেশ ঘোষ

গ্রামে সারা রাত ধরে যাত্রা হলো।

'সুবল-সখা' অভিনয়।

তাতে যে ছেলেটি কৃষ্ণ সেজেছিলো, তার দল পোষাকে নাচে গানে আসর মাত করে গেলো।

আহা, ঠিক যেন সেই কৃষ্ণ। পরণে পীত-ধড়া, চাঁচর কেশে শিখি-চূড়া, গলায় ফুলের মালা, হাতে বাঁশি। সেই বাঁশি মুখে লাগিয়ে সে কী মোহন ভঙ্গীর নাচ। আর নূপুর পায়ে কী চমৎকার নেচে নেচে গান গাওয়া।

দর্শকরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো।

বেশি মুগ্ধ হলেন বুঝি পাড়ার দত্ত গিন্নী! আহা, কেমন ছোট মিষ্টি কেষ্টটি! কোলে করতে ইচ্ছে করে, আদর করতে ইচ্ছে করে। নিজের হাতে ক্ষীর-ছানা খাওয়াতে ইচ্ছে করে। আহা, যদি একবার তাকে কাছে পেতাম!

কথাটা দত্তমশায়কে বলাতে তিনি বললেন, এ আর এমন কথা কি? দলটা তো আজ রাত্রেও গাইবে, কালেই গাঁয়েই আছে। আচ্ছা দেখি, যাত্রার অধিকারী মশায়কে বলে যদি ছেলেটাকে আনাতে পারি।

দত্ত মশায়ের অনুরোধে অধিকারী মশায় ছেড়ে দিলেন ছেলেটাকে—যা, বাবুর সঙ্গে ঘুরে আয়। তোর নাচ গান ওঁদের ভাল লেগেচে। তবে দেরি করিস নে যেন।

ছেলেটি গেল দত্তমশায়ের সঙ্গে। পরণে হাফ-প্যান্ট, গায়ে একটা আধময়লা হাফ-সার্ট, পায়ে ছেঁড়া চটি।

দত্ত মশায় বাড়িতে এসে ছেলেটাকে গিন্নীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার কেষ্ট ঠাকুর। ধরে এনেছি।

কিন্তু গিন্নী ঝাঁতকে উঠলেন, এ তুমি কাকে ধরে এনেছো? না, না, এ নয় এ নয়। একে নিয়ে যাও। যাও। যতো সব!

দত্ত মশায় ভাবলেন, ঠিকই তো। গোড়ায় গলদ হয়ে গেচে। তিনি আর দেরি না করে ছেলেটার হাত ধরে টেনে নিয়ে বললেন, এই চল্। আয় আমার সঙ্গে।

দত্তমশায় ছেলেটিকে নিয়ে ফিরে এলেন অধিকারীর কাছে। বললেন হেসে, মশায় বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ছেলেটাকে দিন তো কালকের রাতের মত কেষ্ট ঠাকুর সাজিয়ে। এই কিছুক্ষণের জন্যে। আমি সেজন্যে কিছু খরচা করতেও রাজি।

অধিকারী মশায় প্রথমে কিছুটা আপত্তি করবার পর, রাজী হয়ে গেলেন, টাকার লোভেই।

এবার দত্তমশায়ের সঙ্গে তাঁর হাত ধরে চললেন সেই শ্রীকৃষ্ণ। পীতবসনধারী, মাথায় চাঁচর, কেশে শিখিচূড়া, হাতে পেতলের বাঁশি, গলায় কাগজের ফুলের মালা, পায়ে নূপুর। শ্যামল রূপ।

ঝুন ঝুন করে নূপুর বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণ চললো দত্ত-মশায়ের হাত ধরে দত্ত বাড়ির দিকে। তা দেখে পাড়ার ছেলে মেয়েরা ছুটে গেল, তাঁদের পিছু-পিছু চললো। বয়স্করা হেসে বললেন—কী ব্যাপার? উত্তর দিলেন, গিন্নীর আবদার। জানলা দিয়ে মেয়েরা দেখে মনে মনে বললেন, দত্তগিন্নীর কী ভাগ্যি।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই দত্তগিন্নী ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর তাকে রান্নাঘরে দাঁড় করিয়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন।

রান্নাঘর থেকে এক থালা ফল মিষ্টি ক্ষীর দই এনে ছেলেটির পায়ের কাছে রাখলেন। পরে গলায় আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ গড় হয়ে প্রণাম করলেন একটা। উঠে বসে বললেন, বোসো ঠাকুর, নৈবেদ্যটুকু খাও।

কেষ্ট-ঠাকুর খেতে লাগলো। দত্তগিন্নী খাওয়াতে লাগলেন।

উঠোনে জড়ো হওয়া ছেলে-মেয়েরা বললো, আমরা কিন্তু কালকের মত কেষ্টঠাকুরের নাচ দেখবো, গান শুনবো মাসীমা, নইলে ছাড়বোনা কিন্তু।

মাসীমা হেসে বললেন, সে হবে খন। আমার বাড়ির

(শেষাংশ ৪০২ পাতায়)

গণ সংস্কৃতি ও গণ মাধ্যম

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ইদানীং সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে গণ প্রকাশ মাধ্যমের (mass media) ভূমিকা নিয়ে নানান ধরণের কথাবার্তা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, নাটকে, চলচ্চিত্রে ও গণ প্রকাশ মাধ্যমে একধরণের মৌলতা ও চারুতা ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। জীবন চর্যার ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও নানান ভ্রষ্টাচার প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন অপ সংস্কৃতি এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

সমাজতন্ত্রের অভিধানে counter culture বা প্রতি সংস্কৃতি বলে শব্দ আছে অর্থাৎ প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার বিরোধী কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আচরণ। প্রচলিত সাংস্কৃতিক চিন্তাকে নস্যাৎ করে প্রথাবিরুদ্ধ আচরণকে সমাজতত্ত্ববিদরা প্রতি সংস্কৃতি বলে থাকেন। কিন্তু অপ সংস্কৃতি শব্দটি অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজতত্ত্ববিদরা সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতিরও শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। অর্থাৎ উচ্চ সংস্কৃতি, নিম্ন সংস্কৃতি। অপ সংস্কৃতি সেই অর্থে এক বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর জীবন চর্যা ও দৃষ্টি ভংগিরই পরিচায়ক। যে কোন সমাজ দেহের মধ্যেই এই বিশেষ দৃষ্টি ভংগি ও জীবন চর্যা লালিত হয়ে থাকে। সুতরাং সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা না করে শুধু মাত্র অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলাটা হাস্যকর। তেমনি কোন সমাজের সাংস্কৃতিক গতি প্রকৃতির রূপরেখা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তথাকথিত 'অপসংস্কৃতি'র মূলোচ্ছেদ করা অবাস্তব পরিকল্পনা।

সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণ মানুষেরা শুধু জীবন চর্যার রূপরূপ বহিঃ প্রকাশকে বুঝে থাকি। যেমন নৃত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, নাটক ললিত কলা সাহিত্য। কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃতি অর্থে সমাজ বদ্ধ মানুষের সমগ্র জীবন—তার জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প-বোধ, আচার আচরণ প্রকাশ এমনকি মানুষের নানান কর্মকুশলতার সম্মিলিত প্রকাশই হল সংস্কৃতি। স্যর এডওয়ার্ড টাইলর (১৮৭১) একে বলেছেন সামগ্রিক সংমিশ্রণ বা complex whole।

এই সংস্কৃতি মানুষ কিছুটা লাভ করে উত্তরাধিকার সূত্রে। এক সমাজ পরবর্তী সমাজের কাছে এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তুলে দিয়ে যায়। বাকীটাকে সে অর্জন করে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রের ফল হিসাবে সংস্কৃতিরও রূপান্তর বা পরিবর্তন ঘটে। এক কথায় সংস্কৃতি হল কতগুলি নিয়ম কানুন আর কতগুলি মূল্য বোধের সংমিশ্রণে গঠিত এক আচরণ পদ্ধতি, এক জীবন চর্যা ও জীবন ভাবনা—Patterned ways of thinking and feeling and doing that man himself has developed and made part of his environment.

এই প্যাটার্ণ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকমের। তাই সংস্কৃতিও এক সমাজ থেকে আর এক সমাজে আলাদা। এমনকি একই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একই সংস্কৃতি ভাবনার সামিল নাও হতে পারেন। কারণ একজন মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তা তাঁর নিজস্ব পরিবেশের উপর (অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, পারিবারিক বা গোষ্ঠিগত বিন্যাস) নির্ভরশীল। তাই একই সমাজে বিভিন্ন উপসংস্কৃতি (sub culture) থাকা স্বাভাবিক। উপসংস্কৃতির বৈষম্যের আরও একটা কারণ বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকাচার (Folkways) বা নীতি বোধ (morals) আলাদা। লোকাচার রীতি নীতি, আদব কায়দা ও নীতি বোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য থাকলেও তা পরিবর্তনশীল। কোন সমাজে মদ্যপান নিষিদ্ধ, কোন সমাজে তা সামাজিক প্রথাসিদ্ধ। শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমা রেখাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে বিভিন্ন রকমের। এমনকি বিভিন্ন উপসংস্কৃতির মধ্যেও এ ব্যাপারে দৃষ্টিভংগি আলাদা। একজন উচ্চ মধ্যবিত্তের শ্লীলতা সম্পর্কে যে ধারণা একজন নিম্ন বিত্তের ধারণা তা থেকে স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ কোন সমাজের শিল্প, (সাহিত্য ও ললিত কলা) ও গণ মাধ্যম (তথ্য সম্প্রচার ও বিনোদন) মুক্ততার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হতে পারে না। ঐ সমাজের সামাজিক ধ্যান ধারণা, চাহিদা, সমাজের ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেন্দ্র করেই এই শিল্প ও গণ মাধ্যম গড়ে ওঠে এবং তার চরিত্র নিরূপিত হয়। কাজেই কোন সমাজের নন্দনতত্ত্বমূলক মান (Aesthetic standard) বিভিন্ন বস্তুর উপর নির্ভরশীল।

এই সব কারণে সমাজ-তাত্ত্বিকরা আধুনিক শিল্প-সমাজকে রুচিভেদে কতগুলি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে ভাগ করেছেন। এগুলির নাম 'টেস্ট কালচার'।

এই টেস্ট কালচারের কষ্টি পাথরে ঘষে সমাজে আমরা নিম্নলিখিত সাংস্কৃতিক শ্রেণী-বৈচিত্র্য দেখতে পাই। এগুলি হল হাই কালচার, হায়ার মিডল ক্লাশ কালচার, লোয়ার মিডল ক্লাশ কালচার, লো কালচার ও কোয়াসি ফোক কালচার। একমাত্র মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দ্বারা সৃষ্ট বিষয়ের চেয়ে স্রষ্টার মহত্বকে বেশি করে মূল্য যেন তারাই হাই কালচারের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মানসিক ক্ষুধা মাস মিডিয়া থেকে নিবৃত্ত হয় না। এদের জন্য আছে লিটল ম্যাগাজিন, আরট ফিল্ম, আধুনিক চিত্রকলা। হায়ার মিডল ক্লাশ কালচার : এরা উচ্চ বেতন ভোগী ও উচ্চ শিক্ষিত প্রফেশনাল সম্প্রদায়। যে সংস্কৃতি তাদের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির সহায়ক তাঁরা সেই সংস্কৃতির সন্ধানী। উপন্যাসে চরিত্র চিত্রণের চেয়ে প্লটই তাঁদের পছন্দ। হাই কালচারের সাহিত্যের নায়কেরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী কিন্তু হায়ার মিডল ক্লাশ কালচারের উপন্যাসের নায়কেরা প্রতিযোগিতামুখী ও সংগ্রামী।

লোয়ার মিডল ক্লাশ কালচার : এঁরাই মাস মিডিয়ার বড় অনুগ্রাহক। এঁদের প্রিয় হল উপন্যাস। যৌনতার ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও এদের মধ্যে মতভেদ থাকে। একদল যৌনতাকে পছন্দ করেন। আর একদল যৌনতা বিরোধী। এঁদের দৃষ্টিভংগী দ্রুত পরিবর্তনশীল, আজ যা এঁরা পছন্দ করেন কাল তা করেন না। এর ফলে মাস মিডিয়াকে বার বার এঁদের রুচির মত করে নিজেকে ঢেলে সাজাতে হয়। কাজেই এঁদের শ্লীলতা অশ্লীলতার চিন্তাও পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে এই কালচার পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

লো-কালচার : শ্রমিক ও স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই সংস্কৃতি চেতনার অন্তর্ভুক্ত। এঁরা পছন্দ করেন অতি নাটকীয় ঘটনা। পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয়। স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টিই এদের কাছে বড়। ন্যাটাকারের চেয়ে নাটকের চরিত্রগুলির প্রতি এঁদের বেশি আগ্রহ। অভিনেতার এঁদের মতে লেখকের চেয়েও বড়। তাই এঁরা বিভিন্ন 'ফ্যান ম্যাগাজিনে'র ভক্ত।

সবশেষে যে সমাজ শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণীর জন্য গণপ্রকাশ মাধ্যম কোন চিন্তা করে না তারা কোয়াসি ফোক কালচারের (Quasi Folk Culture) অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের ক্রয় ক্ষমতা সামান্য তাই তাঁরা খবরের কাগজ, টিভি ও রেডিও কিনতে পারেন না। কাজেই তাঁদের মত করে কোন উপাদানও গণ মাধ্যম তৈরি করে না। এই অবজ্ঞাত অবহেলিত বিরাট শ্রেণী লোক-সংস্কৃতি থেকে নিজেদের শিক্ষা ও বিনোদনের উপকরণ সংগ্রহ করেন। প্রয়োজনে লোক-সংস্কৃতির উপাদানকে তাঁরা নিজেদের মত করে পরিবর্তন করে নেন।

কাজেই যে ধরণের রুচিকে আজ 'অপসংস্কৃতি' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা এক বিশেষ শ্রেণীর সংস্কৃতি ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। সমস্ত সমাজেই এই শ্রেণীর লোকেরা থাকেন একমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী সমাজ ছাড়া। কারণ ওই সমাজে রাষ্ট্র পুষ্টীমত সংস্কৃতির গতি পথ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

এ ছাড়াও শিল্পোত্তর সমাজে গণ সমাজের লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গণ সমাজ বলতে আমরা বুঝি সেই সমাজ যে সমাজে ব্যক্তি ডুবে যায় গোষ্ঠীতে। ব্যক্তির আত্ম প্রকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া প্রাথমিক সম্পর্কগুলি শিথিল হয়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে

তৈরি সম্পর্কগুলি সমাজে বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগাযোগ স্থাপনের মূলসূত্র রচনা করে গণ প্রকাশ মাধ্যমগুলি। ফলে এই গণ প্রকাশ মাধ্যমগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি তখন এক বিরাট সেতু হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে এই প্রকাশ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রারা ইচ্ছা করলে গোটা সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। গণ সমাজের আর একটা প্রবণতা হল গণ সংস্কৃতির প্রচার। এই গণ সংস্কৃতি হল সেই সংস্কৃতি যা এমন একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপাদেয় ভোজ্য বস্তু তৈরি করে যা সমস্ত সাংস্কৃতিক উপযোক্তার সমান প্রিয়। এক কথায় যা বিভিন্ন মানুষের রুচির লব্ধির সাধারণ গুণিতক। যেহেতু গণ মাধ্যম এর ধারক ও বাহক সেইহেতু একে আমরা গণ মাধ্যম বাহিত সংস্কৃতি (man mediated culture) বলতে পারি। কাজেই গণ সংস্কৃতির বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশকে অপসংস্কৃতি বলে অভিহিত করা সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। রাষ্ট্র এ সম্পর্কে যদি বার বার নিষেধবাণী উচ্চারণ করে তাহলে সন্দেহ হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হয়ত এখানে তার স্থূল পরুষ হস্ত অবলেপন করতে এগিয়ে আসছে। গণ সংস্কৃতির প্রভাবে জনরুচি বিকারের ভীতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় জটাজুটে সাংস্কৃতিক প্রবাহ অবরুদ্ধ হয়ে যাবার আশংকাও কম নয়।

তাহলে জনরুচি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণ মাধ্যমের কি ভূমিকা নেই, রাষ্ট্রেরও কি নেই কোন পবিত্র কর্তব্য?

নিশ্চয়ই আছে। ছোট ছোট পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন সংঘ, সংগঠনদ্বারা তাঁরা সুকুমার সংস্কৃতির প্রতি জনসাধারণকে আগ্রহী করে তুলতে পারেন। সরকার রুচির উন্নতি ঘটাতে পারেন লেখা পড়ার প্রসার ঘটিয়ে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন তরান্বিত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সমস্ত মানুষ যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট হবে না এমন প্রত্যাশা করাটা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক হবে। কারণ শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ দেশগুলি জুড়েও তথাকথিত 'অপসংস্কৃতির' নিত্যলীলা চলছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে সব দেশের উন্নতি যে থেমে নেই তার প্রমাণ সমাজের উপরের দিকের তরল স্তরের নিচে আর একটি পলটা স্রোতও প্রবহমান। সে সমাজে যাই কালচার বা উচ্চ সংস্কৃতিমনা লোকজনের সংখ্যাও কম নয় তাই ক্যাবারেতে যত ভিড় আরট গ্যালারিতেও সে দেশে তত ভিড়। পেপার ব্যাকের যেমন বিক্রি—ক্লাসিকসেরও তেমন। হয়ত কিছু কম বেশি। কিন্তু বৈষম্য কোথাও সমাজের সাংস্কৃতিক ভারসাম্যকে বিপদজনক ভাবে নষ্ট করে দেয় না।

কেষ্ট-ঠাকুর

(৪২৯ পাতার পর)

উঠোনে কেষ্ট-ঠাকুর নাচবেন। এতো ভাগ্যর কথা।

অতএব খাওয়ার পর কেষ্ট-ঠাকুরকে উঠোনে নাচতে বলো, গাইতে বলো।

ভদ্র মশাই দেখতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, সত্যিই কী চমৎকার লাগছে! আর সাজটাই তো আসল। বাঁশ-খড় মাটি দিয়ে তৈরী প্রতিমাকেই তো আমরা মনে-প্রাণে পুজো করি। সাধুকেও ভক্তি করি তাঁর জটাজাল গেরুয়া বসন কমণ্ডলু···

একটা কথা বলবো?

হঠাৎ নাচ থামিয়ে কেষ্ট-ঠাকুর ভদ্রমশায়ের কাছে এসে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো অত খাওয়ার পর আর নাচতে পারছি নে। আর একটা পোটলা করে কিছু ঐ সব খাবার দিন না বেঁধে। নইলে আমাদের অন্য ছোড়ারা আমাকে ধরে মারবে।

অনিবার্য কারণ বশতঃ ধারাবাহিক উপন্যাস 'দূরের আকাশ' এ সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। সে জন্য আমরা দুঃখিত। সম্পাদক, উজ্জ্বল ভারত

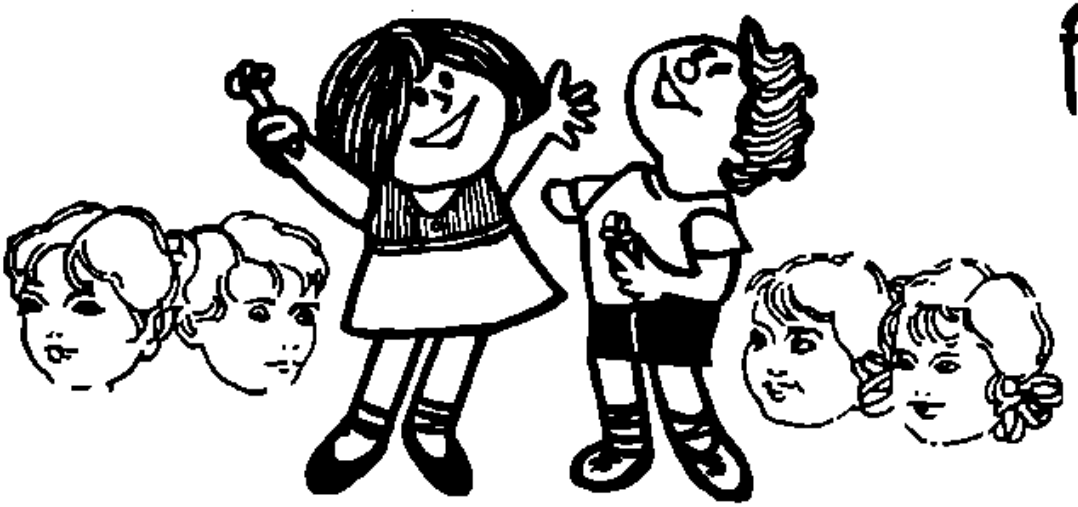

শিশু জগৎ

হ্যাঁচ্চো ! হ্যাঁচ্চো !! হ্যাঁচ্চো !!!

ভবানী প্রসাদ মজুমদার

হাঁচি-কাশি-টিকটিকি,ছুঁচ-কলা-হ্যাচ্চো !
নিশ্চয়ই তুমি কোনও শুভ-কাজে যাচ্ছো !
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !!!

চলেছো কি চাকরীর 'ইন্টারভিউ' তে ?
কেন মিছিমিছি গিয়ে দাঁড়াবে যে 'কিউ' তে ?
আগে থেকে জেনে রাখো, গোল্লা'ই পাচ্ছো !
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !!!

থলি-হাতে কোথা' যাও ? মিষ্টির দোকানে ?
পাকা-দেখা ? জেনে-শুনে মেয়ে দেবে ওখানে ?
বলছো কি, ভালো ছেলে ? হাতে চাঁদ পাচ্ছো ?
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !!!

বুট পরে চলেছো কি ফুটবল খেলতে ?
কেন মিছিমিছি যাও দমটুকু ফেলতে ?
জেনে রাখো, নির্ঘাৎ দশ গোল খাচ্ছো !
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !!!

যাও কোথা' ? হাই-কোর্টে ? পড়েছো কি কামেলায় ?
আজ বুঝি বিচারক মামলার দেবে রায় ?
আগে থেকে জেনে রাখো, ফেলে তুমি চারছো !
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !

চলেছো কি 'কাইন্ডে—একতালে' বসতে ?
কেন মিছিমিছি যাও কলমটা ঘষতে ?
জেনে রাখো, নির্ঘাৎ 'ফেল' তুমি মারছো !
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !

যাও কোথা ? অফিসেতে ? 'প্রোমোশন' পাবে আজ ?
তাই এতো হাসি-খুশী ? চেকনাই-রেওয়াজ ?
খুব ভালো, খুব ভালো, করে কি খাওয়াচ্ছো ?
হ্যাচ্চো ! হ্যাচ্চো !! হ্যাচ্চো !!!

———

জেনে রাখা ভালো

অনিরুদ্ধ মিত্র

১ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মৎস্যাধারের কোন্‌টি জানো কি ? মৎস্যাধারটির নাম 'জন, কি, লেক প্রাক্যুরিয়াম'। এটির অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে। ৩১০ রকমের মাছ রয়েছে সেখানে ; জলাধারের জলের পরিমাণ কুড়ি লক্ষ লিটার !

২ জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগামী হচ্ছে চিতাবাঘ। দেখা গেছে যে চিতা ঘণ্টায় ১২৮ কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

অন্নপূর্ণা গুপ্ত

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জ ১৯৭৯ সালকে চিহ্নিত করেছেন, তার সঙ্গে তাঁরা কতকগুলি কর্মসূচিও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেছেন আমরা আমাদের কর্তব্য করি। আমরা অর্থে আমি বলতে চাইছি মায়েদের। আমরা মায়েরা শিশু শিক্ষা, শিশু-গঠন, শিশুর চরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ—এসব সম্বন্ধে কি চিন্তা করেছি? কতকগুলি কর্মসূচি কি আমাদের বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ নয়? না কেবল মুখে বললেই শিশু মানুষ হয়ে যাবে "একটা ভাল বিদ্যালয় কোথাও নেই যে ছেলে ভর্তি করি"। এখানে একটা প্রশ্ন যদি তুলে ধরা যায় ভাল বিদ্যালয় বলতে কী বোঝায়? কোন্ বিদ্যালয়কে ভাল বলতে চাইছেন? তাহলে কিন্তু অবশ্যটা আমতা—আমতা ছাড়া আর কিছু হবেনা, কারণ হাজারে একটি মায়ের হয়ত শিশুগঠন করার সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা আছে। যেমন ধরুন পরিবেশ—এটি একটী শিশুর চারিত্রিক গঠনে বিরাট বর্ম, তারপরে আসছে সাংসারিক আবহাওয়া। বড়দের জীবন যাত্রার খুঁটিনাটি কর্মসূচি অর্থাৎ শিশুর জাগরণ থেকে তার রাত্রে ঘুমানো অবধি পারিবারিক জীবন যাত্রার যান,—যেটি শিশুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার দেহের ও মনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়—আপনারা সেই ভাঙ্গা পাখর বাটির কাহিনী নিশ্চয় জানেন—সেই বিস্তারিত কাহিনী এখানে অবান্তরীয়। কিন্তু কাহিনীটি যে কত মর্মান্তিক এ সম্বন্ধে কেউ দ্বি-মত হবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার একান্ত ভাবে যে কথা মনে হয়, সেটি হচ্ছে যে শিশুরা বড় একা, তারা পায় না একান্ত আপন জন। আপনজন ভাবে একমাত্র মাকে, বাবাকে নয়। মায়েদের নিকট আমার (আমিও একজন মা) একান্ত অনুরোধ, তারা যেন দৈনন্দিন সকল কাজের সঙ্গে এটাও বাধ্যতামূলক করেন যে পাড়ার এবং নিজের নিজের শিশুদের নিয়ে দিনান্তে ঘন্টাখানেক অন্ততঃ তাদের সঙ্গে একান্ত আপন জন হয়ে কাটান। আপন জন কথাটা বলতে কিছু সংখ্যক মায়েরা হয়ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন, বলবেন, সমস্ত ক্ষণই ত ওই অপোগণ্ডগুলির সঙ্গে রয়েছি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে মায়েরা যে শুধু শাসক নয়, তারা একাধারে সন্তানের বন্ধু, খেলার সাথী এবং হিতৈষী এই বোধ ওদের মধ্যে বাস্তব আচরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করা। এ সময়টিতে তাদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করার চেষ্টাকে উৎসাহিত করা এবং তাদের নিজেদের সত্তাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে দু'একটি সত্য উদাহরণ এখানে উল্লেখ অবান্তরীয় হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

একসময় আমার ৫/৬ বছরের শিশুপুত্র এবং পাড়ার কতকগুলি শিশুদের নিয়ে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় আধঘন্টাটাক একান্ত আপন জন হয়ে বসতাম—সেদিনও বসেছি, সেদিনের বিষয় বস্তু ছিল বড় হয়ে কে কী হবে। বলত চণ্ডী তুমি বড় হয়ে কী হবে? আমি পুলিশ হবো। তুমি বাবুজী? আমি ইনজীনিয়ার হবো? তুমি গিরি? আমি ত বড় হয়ে গবর্নর্ হবো। আর লিলি তুমি? আমি ত জ্যোতিষী, মানুষের নাম্বা বলবো। আর যখন তুই বড় হলে কড়ো হবু? যু ত বড় হ'লে বুড়া হবি"—এ ছেলেটি উড়িষ্যাবাসী।

শিশুদের এই স্বতঃপ্রবৃত্ত চিন্তাধারা আর স্বাধীন উত্তর দেওয়ার নির্ভিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু একদিন খেলার ছলে বসলে ত হবে না, দৈনন্দিন সকল কাজের মাঝে এই একান্ত ভাবে "বসা টা" বাধ্যতামূলক করতে হবে, ওদের (শিশুদের) স্বাধীন সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আর এক দিনের ঘটনা, সেদিন ছিল গল্প বলার আসর—একটী বাদে সবাই অকৃতকার্য হয়ে ছিল। যে ছেলেটা আমি গবর্নর্ হবো বলেছিল সেই এগিয়ে এসে নির্ভিক ভঙ্গিতে বললে—"রাজা বন্দুক নিয়ে বনে গেলো কুড়ুম করে গুলি করলো—বাঘ মরে গেল"—তার পরেই

হাততালি—বলাবাহুল্য সেই প্রথম হয়ে প্রথম পুরস্কার অর্জন করলো (১টি টফি ও ২টি বাইসবিস্কুট)।

এ সবই উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা আর ঘটনাগুলি সত্য বলে আরও মনে গেঁথে আছে আমার। শিশুদের নিয়ে বলা, তাদের ভিতরের শুভ সত্তাগুলিকে জাগিয়ে তোলা, সম্পূর্ণ আপনজন হয়ে তাদের আত্মার সঙ্গে মিশে যাওয়া—ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের কতখানি পাথেয় সঞ্চয় হচ্ছে সেটা কর্মক্ষেত্রে পরে বোঝা যাবে। এর পরে আসছে পরিবেশ—এটি একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল—কোন শিক্ষাই সার্থক রূপ নেবে না বিপরীত পরিবেশে—যে বাড়ী বা বংশের ধারা পড়াশুনার, সে বাড়ীতে দেখবেন ছোট ছোট শিশুরাও পড়াশুনায় আগ্রহী। আর যে বাড়ীতে পার্টি পিকনিক্ সাজগোজ, যে বাড়ীতে মানুষজন সর্বদাই ব্যস্ততায় চঞ্চল, সে বাড়ীর শিশুরাও মনে প্রাণে সেইটাই গ্রহণ করে। আর যে সব বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত—বিগ্রহকে সকল খাদ্য নিবেদন করে গ্রহণ করে—সে বাড়ীর শিশুরা কোন অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণে সংযমী ও ধৈর্যশীল হয়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনে (তারা) কতবড় মূল্যবান গুণাবলীর অধিকারী হয় সে সব পরে বোঝা যাবে।

আবার মায়েদের অবিবেচনার ফলে (এ উদাহরণও বিরল নয়) নিরপরাধ শিশুরাও অজ্ঞাতে বিপথে চালিত হয়। যথা মা বললেন, কাল লক্ষ্মীপূজা আমার ফুল দূর্বা ইত্যাদি সব এনে পূজার ঘরে রাখবি—কোথা থেকে আনবে কী করে আনছে তার জিজ্ঞাসা মায়েদের মনে নেই—ফলে শিশুরা মায়েদের (এই ইচ্ছাকৃত) উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে পরের বাড়ী নিঃশব্দে প্রবেশ করে বাড়ীর মালিকের চক্ষু এড়িয়ে মায়ের ফরমাশি সব কিছু এনে মন ভরিয়ে দিলে। আবার কতক্ষেত্রে দেখা গেছে মা বলছেন "হ্যাঁরে, দেখতে পাসনি ও"? কী শেখাচ্ছি আমরা মায়েরা এ থেকে শিশুদের? আরও আছে। কত ধনীর প্রাসাদে বা বাগানে পিকনিক করতে গিয়ে আমরা দেখেছি মালি এসে বললে "ফুলে হাত দেবেন না ওই দেখুন লেখা আছে"—সত্যিই ত বড় বড় করে কার্ডে লেখা "ফুল ছিঁড়িবেন না"—মালি পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পিকনিকে সমাগত বর্ষীয়ান মহিলাদের একজন অত্যন্ত নিপুণ হাতে একটি সুদৃশ্য ফুল নিজের শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে ফেললেন—সমাগত সাথী সবাইএর মুখে জয়ের হাসি কিন্তু সঙ্গী কতিপয় শিশুর মনে সেই মুহূর্তে কতবড় অন্ধকারের বীজ বপন হল তার হিসাব কে দেবে?

গত ১লা জানুয়ারী শ্রী অতুল্য ঘোষ শিশুদের সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতার আলোচনা করেছেন। আমি বলি তিনি বৃহত্তর ভাবে সমস্যার সমাধানের চিন্তা করেছেন তা' করুন, সরকার তাঁর কাজ করুন, আরও অনেকে বক্তৃতা দিয়ে শিশু মানুষ করার চেষ্টা করুন আপত্তি নেই (ভালো কথা বারে বারে বলতে হয়)—আমরা মায়েরা যারা শিশুদের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আমরা কী করছি শিশু-গঠন করার? শিশু মানুষ করার ভিত্তি তো আমাদের মায়েদের হাতে। সকল দেশে সকল রকম বিভিন্ন জাতিতে যেখানেই সন্তান সুখ উজ্জ্বল করেছে বংশের দেশের ও দশের—সেখানেই মায়ের অবদান সকলের শীর্ষে।

ধনী মা, মধ্যবিত্ত মা আর ভিখারিণী মা, সকল মায়ের চোখেই সন্তানের জন্য একই আকুলতা একই অস্থিরতা, একই চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়—কোন ভেদ নাই। ধনী মা, মধ্যবিত্ত মা, সকলেরই এই দুই মায়ের সঙ্গে পরিচয় আছে। কিন্তু ভিখারিণী মা—ধনীর প্রাসাদের পরিত্যক্ত বইএর হাঁড়ি পথেরই কলে ঘুরে ভিক্ষালব্ধ পাঁচমেশালি চাল দুখানি ইঁট পেতে পথ থেকে কুড়িয়ে টুকরো কাগজ শুকনো পাতা জেলে ভাত বসিয়েছে—হয়ে যাওয়া ফেনা ভাত তুলে দেবে তাদেরই মুখে—যারা তারই সামনে লোলুপ দৃষ্টিতে বসে আছে—মায়ের সেই শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখের অস্থিরতা আর ধনী বা মধ্যবিত্ত মায়ের অস্থিরতায় কোন তফাৎ নেই।

তাই আজকের আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে আসুন আমরা

(শেষাংশ ৪৪০ পাতায়)

নারী জগৎ

ভারতে বিদেশিনী

শেফালী সেন

ভাবতে অবাক লাগে এ দেশের দুঃখে বিদেশিনীদের প্রাণ এতো কাঁদলো কেন? কেন কয়েকজন বিদেশিনী ভারতে এসে আর ফিরে যেতে পারলেন না? কেন তাঁরা এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে এতো ত্যাগ, এতো কষ্ট স্বীকার করে গেলেন এবং এখনও করছেন। এখনও এই বিংশ শতাব্দীর শেষে বসেও আমাদের দেশের মেয়েরা কুসংস্কার কাটিয়ে ওঠার মত জোর পাচ্ছে না কেন? কিছু সংস্কার হয়তো কমেছে কিন্তু সে তো সিন্ধুতে বিন্দু।

বিদেশিনীদের কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে আসছে ভগিনী নিবেদিতার নাম। তাঁকে প্রথম দেখেই স্বামিজী তাঁর মধ্যে ভাবী ত্যাগ-বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম তিনি খুব শুদ্ধসত্ত্ব, আমার কলিকাতার কার্যের জন্য আমি তাঁহাকে চাই।" স্বামিজীর সঙ্গে এদেশে এসে যেটা তাঁকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল তা হলো এদেশের মেয়েদের নিরক্ষরতা। তখনকার দিনে আমাদের দেশের মানুষ চিন্তাই করতে পারত না যে মেয়েরা লেখা পড়া শিখবে। একটা অন্ধ ধারণা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বৈধব্য অবধারিত। কিন্তু একটা ১০ বছরের মেয়ের সঙ্গে একটা ৩০ বছরের লোকের বিয়ে দিলে যে বৈধব্যের রাস্তা প্রশস্ত করে দেওয়া হয় সে জ্ঞানের দীপ জ্বেলে দেবার কেউ ছিল না। সে যুগের সেই মানসিকতার মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা কিভাবে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিভাবে কত প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্কুলে মেয়ে সংগ্রহ করতেন সে কাহিনী সবার জানা। কাজেই সে কাহিনী আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমার আলোচ্য বিষয় হলো আমরা নিজেরা তো কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু বিদেশিনী যে আত্মত্যাগ করে গেলেন তার কতটুকু মূল্য আমরা দিতে পেরেছি? আমরা হয়তো আক্ষরিক অর্থে শিক্ষালাভ করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলো ডিগ্রী নিয়ে আসছি কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা কি আমরা পাচ্ছি? আমার তো মনে হয় একটুও না। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি উদ্ধৃতি মনে আসছে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'সাধনা না করলে কোন কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। চাকিমীর কেতাব পড়ে পেটের অসুখ সারে না, পালোয়ানের উপদেশ পড়লে মাংসপেশী সবল হয় না।' আমারও তাই মনে হয়। শুধু বই পড়ে পাশ করে গেলেই শিক্ষা হয় না। জীবনে যদি কিছু করতেই না পারলাম, তবে কি শিক্ষা পেলাম? বিবেকানন্দ বলেছেন, "আসল শিক্ষার অভাবেই আমাদের আজ এতো দুর্দশা। যে শিক্ষায় মানুষকে জীবন সংগ্রামে জয়ী

করে না, যাতে চরিত্রের বিকাশ হয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।"

আর এক নমস্য বিদেশিনী পণ্ডিচেরী আশ্রমের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমা। বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী এই নারী তাঁর সম্পদের একটা বড় অংশ ভারতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে দান করে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবী ছিলেন, তাঁর অর্থবল ছিল কিনা জানি না। তাঁর অসাধারণ জ্ঞান অসাধারণ ভগবদ্ভক্তির বাস্তব রূপায়নের পেছনে শ্রীমার অসাধারণ দানের তুলনা মেলে না। পণ্ডিচেরী আশ্রম যে কি জিনিষ নিজের চোখে দেখে না এলে তার কিছুমাত্র অনুমান করা অসম্ভব। এখানে সে বর্ণনা দিতে গেলে এ লেখা আরও চার পাতা বেড়ে যাবে। শুধু এইটুকু বলি আশ্রমের ভেতরে চতুর্দিকে প্রচুর সাহেব মেমরা যখন চোখ বুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন, তখন বুঝতে হবে নিশ্চয়ই সেখানে কিছু আছে। আমাদের সেখানে গেলে ঠিকই একই অনুভূতি হয়, মনে হয় ওখানেই চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকি। সামান্য পয়সা দিয়ে আশ্রমে রোজ হাজার হাজার লোক খেয়ে যায়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের সবকিছুই মায়ের দানে পুষ্ট। ওখানে কোন জিনিষ কেনার নিয়ম নেই। ধান, সব্জি, ফল, দুধ পাউরুটি সব নিজেদের তৈরী, জামা কাপড় পর্যন্ত। আমাদের দেশে 'সহধর্মিণী' কথাটা সাধারণতঃ স্ত্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসল সহধর্মিণী বলতে কি বোঝায় তার জলন্ত উদাহরণ শ্রীমা। তাঁর নিজের স্বামী সন্তান সবই ছিল, তিনি তাঁদের ত্যাগও করেন নি। তা সত্ত্বেও শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত শিষ্যার মত তাঁর সব ধর্মের পথে সহায় হয়ে আজীবন তাঁর সেবা করে গেলেন। সেই সঙ্গে এই ভারতেরও। শ্রীঅরবিন্দকে তিনি ভগবানের একটি অংশ বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বেলুড়মঠ বিদেশিনীর অর্থেই তৈরী।

আর এক বিদেশিনীর কথা মনে পড়ছে ভারতের পরাধীনতার গ্লানি যাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। তিনি হলেন এ্যানি বেসান্ত। জন্ম লণ্ডনে। খৃষ্টধর্মের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারান এবং প্রকাশ্যে বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রহ্মবাদী এবং রাজনীতিবিদ্। ভারতকেই তিনি তাঁর প্রধান কর্মভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হন। ধর্ম তাঁর জীবনে প্রধান হলেও রাজনীতির সঙ্গে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে এতো বিচলিত করেছিল যে একজন বিদেশিনী হয়েও এর প্রতিকারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'কমন-উইল', 'নিউ-ইণ্ডিয়া,' 'সিটিজেন' প্রভৃতি তাঁর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ ইংরেজ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে। ফলে পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করুক এই ছিল তাঁর বাসনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি হোমরুল নামে একটি রাজনীতিক দল গঠন করেন। সরকার বিরোধিতার অপরাধে তিনি অন্তরীণ হন এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে সে বছরই মুক্তি পেয়ে যান। তারপর কলকাতায় কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীর বক্তৃতায় তিনি ইংরেজ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। শেষ বয়সে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন শুরু করেন। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ তো বটেই আহারাদির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন হিন্দু-ভাবাপন্ন। তাঁর লেখা The religious problem in India একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই রকম নানা ভাবে এ্যানি বেসান্ত ভারতের সেবা করে গেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তাকারী আর এক বিদেশিনী নেলী সেন গুপ্তা। বিদেশীর অত্যাচারে আমরা যখন জর্জরিত, পশুর মত জীবন কাটাচ্ছি, তখন নিজে বিদেশিনী হয়েও তিনি এ দেশের দুঃখ দুর্দশা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর যোগ্য সহধর্মিণী স্বামীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সমানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

পরদেশীদের জন্য তাঁর ত্যাগ, বিনয়ে সক্রিয় ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ভারতীয়দের মনে।

এ দেশের মেয়েদের যত অপমান, যত লাঞ্ছনা, যত লজ্জা সমস্ত কিছু যেন বুক দিয়ে আগলে রাখছেন আর এক বিদেশিনী মাদার টেরেসা। যারা অনাচারের স্রোতে ভেসে যেত, যারা অমানুষ হয়ে বড় হয়ে উঠতো, যারা নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিত, যারা পথে ঘাটে অবহেলিত হয়ে মরে পড়ে থাকতো, তাদের তিনি নিজের বুকে আশ্রয় দিয়ে, সুস্থভাবে বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমাদের সমাজের একটা দুষ্ট ক্ষতের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। ৪০ বছর আগে মাদার টেরেসা কলকাতায় আসেন। জন্ম ১৯১০ ২৭শে আগষ্ট যুগোস্লোভিয়ায়। ১৯৪৮ সালে তিনি সরকারীভাবে ভারতের নাগরিক হন। তখন থেকে ভারতই হল তাঁর স্বদেশ। তিনি একদিন বলেছিলেন—I am more Indian than you are. কালীঘাট মন্দিরের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নির্মল হৃদয়' মুমূর্ষু নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল, এ ছাড়া যারা ভারত ছুড়ে পরিত্যক্ত অবহেলিত পশু শিশুদের জন্য আশ্রয় গড়ে, কুষ্ঠ রোগীদের কুষ্ঠাশ্রম যত কিছু তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাদার বলেন "মৃত্যুর পর বিচার হবে একটি জিনিষই, তা হলো আমরা দরিদ্র, অবহেলিত মানুষদের জন্য কি করতে পেরেছি?" এই মহীয়সী নারী ১৭ই অক্টোবর ১৯৭৯ আর্ত মানবতার সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন।

এর আগেও তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী 'খেতাব দেন। সেই বছরই পান 'ম্যাগসেসাই' পুরস্কার। বিশ্বভারতী থেকে পেয়েছেন দেশিকোত্তম। ১৯৭২ সালে পেয়েছেন জহরলাল নেহরু পুরস্কার। আর এবার পেলেন পৃথিবীর সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার। কিন্তু মাদার টেরেসা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অনেক আগেই পেয়ে গেছেন। সে হলো অবাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষের ভালবাসা।

আর এক বিদেশিনী ভারতে না এসেও ভারতের সেবা করেছেন। তিনি হলেন নেতাজী-জায়া এমিলি শেঙ্কল। নেতাজী চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় গিয়ে ছিলেন, তখন এমিলির সঙ্গে পরিচয়। নেতাজীর কাছে এমন কিছু দরকারী ডকুমেন্ট ছিল যা বৃটিশ সরকার হাতে পেলে বাজেয়াপ্ত করতো। এমিলি শেঙ্কল এই সব দরকারী ডকুমেন্ট নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতেন। এইভাবে নেতাজীর ভেতর দিয়ে তিনি ভারতেরই সেবা করে গেছেন।

কিন্তু দুঃখ এই, চোখের সামনে এই সব জলন্ত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা জ্বলে উঠতে পারছি না? কেন আমাদের মধ্যে একজনও কেন মহান আদর্শ নিয়ে এমনি করে এগিয়ে আসতে পারছি না। আমরা এখনকার মেয়েরা আগেকার তুলনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়েছি অথচ বাইরে বেরিয়ে এসেও কোন গঠনমূলক কাজ করছি না। শুধু বেরিয়ে আর লেকচার দিয়ে কি নারীর ভাগ্য জয় করা যায়? এদেশের মেয়েদের নীচু করার উদ্দেশ্যে আমার এ লেখা নয়। আমি নিজেও তো এ দেশেরই একজন মেয়ে। আমার প্রশ্ন আমরা পারছি না কেন? এদেশের অসহায়তায় এতো বিদেশিনীর প্রাণ কেঁদেছে, আর আমাদের কি কাঁদছে না? নিশ্চয়ই কাঁদছে, কিন্তু আমরা প্রতিকারের রাস্তা ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো কেউ কেউ যে পথে এগোচ্ছি সেটা ঠিক পথ নয়। আবার হয়তো অন্য নানাদিক থেকে নানা রকম বিপত্তি আসছে, যার ফলে অনেকের কিছু করার ইচ্ছে থাকলেও করতে পারছি না।

এদেশে কোন কল্যাণমূলক কাজ করতে যাওয়া খুব সহজ নয়। তবু যত বাধাই আসুক এইভাবে চেষ্টা করতে করতেই আমাদের এগোতে হবে। উপরোক্ত মহিলারা তো একদিনেই মহীয়সী হয়ে যান নি। অনেক কষ্ট স্বীকার করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, অনেক বাধা বিপত্তি জয় করে তবেই তাঁরা বড় হয়েছেন। আমরাও কি আন্তরিক চেষ্টা করলে কিছু করতে পারবো না? মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন, "কোন কোন মানুষের জীবনই তো দীপ বা অন্যের পথে আলো ফেলে, পৃথিবীকে চিনতে শেখায়।" কাজেই এই সব দীপের আলো ধরে আমরা কি অন্ধকার পার হয়ে যেতে পারবো না?

ক্রীড়া-জগৎ

ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার সদ্যসমাপ্ত টেষ্ট সিরিজ

তপন দত্ত

গত ৭ই নভেম্বর বম্বের ওয়ান-খাড়ে stadium এ কপিল দেবের সোজা বলটা অষ্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটস্‌ম্যান Higgs এর off stump উপড়ে দেবার সাথে সাথেই ভারত অষ্ট্রেলিয়ার পর্যায়ের ছয় ম্যাচে Test series এ ভারত অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২—০ ম্যাচে জয়লাভ করে সর্বপ্রথম রাবার জিতে নিলো। ইদানিং কালে কোন বিদেশী দলের বিরুদ্ধে ভারতের এতবড় জয়লাভ আর ঘটে নি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে ভারতের এই সাফল্যের কারণ কি? কে বিশ্বরেকর্ড করলো বা যান অফ দি সিরিজ হলো তার আলোচনা না করে ভারতের এই সাফল্যের বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করা যাক।

প্রথমত: ক্রিকেটের অকাল-বোধন সুরু করতে Carry Packer এর আক্রমনে বিধ্বস্ত চ্যাপেল ব্রাদার্স লিলি, টমসন, খাঁরস-হীন অষ্ট্রেলিয়ার দল ছিল। বহু নতুন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত যাঁরা Test match এর আঙিনায় এখনও প্রবেশ করবার সুযোগও পাননি. পক্ষান্তরে Botham, Boycott, Willis, Gower নিয়ে গঠিত দলের সঙ্গে চার ম্যাচের Test Series খেলে ভারতীয় দল ছিল অনেক balanced ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তাই এই সিরিজে কোন সময়েই কিম্ হিউজের অষ্ট্রেলিয়া দল ভারতীয় দলের উপর তেমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত: কথায় আছে Batsmen save matches and Bowlers win them—ভারতীয় বোলাররা বিশেষ কপিলদেব ও মোশী সেকথাটা বার বার প্রমাণ করেছে। বহু বছর থেকে আসছি প্রসন্ন, বেদী, চন্দ্রশেখর ও ভেঙ্কটরাঘবনের স্পিনের চাতুরী ভারতকে অনেক পথে নিয়ে গেছে। ভারতীয় দলের পক্ষে নতুন বলে বল করাটা আনুষ্ঠানিক রূপে দাঁড়িয়েছিল যা করা হতো গাভাসকার বা অন্য কোন ব্যাটস্‌ম্যানকে দিয়ে। কিন্তু রেকর্ডের দিকে তাকালে দেখতে পাই একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। এবারের Test series এ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ২৪ টি উইকেট নিয়ে কপিল কোন সময়েই অষ্ট্রেলিয়াদলের গোড়াপত্তন সুবিধাজনক হতে দেয় নি। ফলে পরের batmanদের দলকে জেতাবার থেকে বাঁচাতেই বেশীক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কপিলের সঙ্গী হিসাবে শিনার মোশী, যাদবের সাফল্যও ভারতের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে স্পিনারদেরও এই অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে বল করার সুযোগ করে দিয়েছে কপিলদেবই। অপরদিকে, অষ্ট্রেলিয়ার Hogges তার খ্যাতি অনুযায়ী বল করতে পারেন নি।

এরপর আছে ভারতীয় batmanদের সাফল্য। প্রায় প্রত্যেক Test match-এই ভারতের প্রথম পাঁচজন batsman—গাভাসকার, চৌহান, শ্রীকান্তসরকার, বিশ্বনাথ ও যশপাল শর্মা সাফল্যের সঙ্গেই ব্যাট করেছে। এরমধ্যে গাভাসকার ও চৌহান opening দুটি গোড়াপত্তন করেছে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। ফলে পরবর্তী batsmanরা খেলেছে স্বচ্ছন্দ ভাবে আর রানও উঠেছে পরিকল্পিত ভাবে। এ ছাড়া অনেক বছর পরে দল থেকে বাদ পড়ার ভয়ে প্রথম সারির ব্যাটস্‌ম্যানদের মাটি কামড়ে খেলতে হয় নি, সবাই খেলেছে আত্মবিশ্বাসের সাথে।

তবে সামগ্রিকভাবে ভারত অষ্ট্রেলিয়ার এই Test series টি উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হয়েছে। এই series এর পরই শক্তিশালী West Indies এর বিরুদ্ধে

অষ্ট্রেলিয়াদলে কিম্ হিউজ, বর্ডার, ডাইমক ও হগ্ দল-ভুক্ত হয়েছে। আবার আমরাও সেপাল শর্মা, শিবলাল যাদব, দিলীপ দোশীর মত নতুন সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দেরও সন্ধান পেয়েছি।

Australia Test Serice শেষ না হতেই আসিফ ইকবাল, জাহির আব্বাস, মুদ্দিস খাঁ, ইমরানকে নিয়ে গঠিত শক্তিশালী ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে ছয় ম্যাচের Test series সুরু হয়েছিল—এবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক তীব্র, অনেক কঠিন। কিন্তু শক্তিশালী England দলের বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় খেলে ও বর্তমান অষ্ট্রেলিয়াদলের বিরুদ্ধে series জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গাভাসকারের নেতৃত্বে ভারতীয় দল আশাকরি লড়ে খেলে পূর্ব পরাজয়ের উচিত জবাব দেবে।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

(৪৩৯ পাতার পর)

যারেরা প্রতিশ্রুতি দি শিশুমানুষ করার। তাদের ভিত্তি সংঘমে সত্যবাদিতায় নির্ভিকতায় আর ঋজুতে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের—সরকার ও সাধারণ আমাদের সকল বিবরে সাহায্য করুন।

পরিশেষে মাননীয় রাষ্ট্রপুরুর নিকট এই আবেদন ও অনুরোধ আমার, কোন মহান উচ্চাসের সু-চিন্তিত চিন্তাকে একবার রূপায়িত করলেই হয় না—বারে বারে তাকে স্মরণ করতে হয়। অতএব প্রত্যেক ৫ বৎসর অন্তর এই শুভ বৎসর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ রূপে চিহ্নিত হয়ে ফিরে আসুক —প্রথম বারের ভুলত্রুটী গুলি তাহলে পরের বারে সংশোধনের পথ খুঁজে পাবো আমরা।

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পো: অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা : ২৪ পরগণা (ফোন : ৫৭-২৫৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক অবশ্যই হওয়া চাই Crossed a/c Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গণের লেখার সঙ্গে উজ্জ্বল-ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ ক'রবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারত পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

Young Bengal Engineering Works

ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS

FACTORY : Ultadanga Main Industrial Estate
Shed No.-12 Calcutta-67

OFFICE : 219, Manicktala Main Road,
Calcutta-54

UJJWAL BHARAT Registered WB/NP-34 Central Regd. No. R. N. 2571/57

Sawalka KEL Private Limited

23A, Netaji Subhas Road,
7th. Floor,
C A L C U T TA - 700 001.

OLDEST MANUFACTURERS OF ORIGINAL EQUIPMENTS FOR CARS & TRUCKS

TELEPHONE NO : 22-7167 (3 Lines)
TELEX : (021) 2754 KEL

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম : বাগুইআটি, পোঃ অফিস নগর, কলিকাতা-৫৯ ফোন : ৫৭-২৫৫৮ হইতে প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্টার্স, ১১২/১১ (বেলেঘাটা) মেইন রোড, কলিকাতা ৭০০০১০ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণে : পি. কে. প্রিন্টার্স, ৯৯এ এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা ৯।

৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা

উজ্জ্বল ভারত

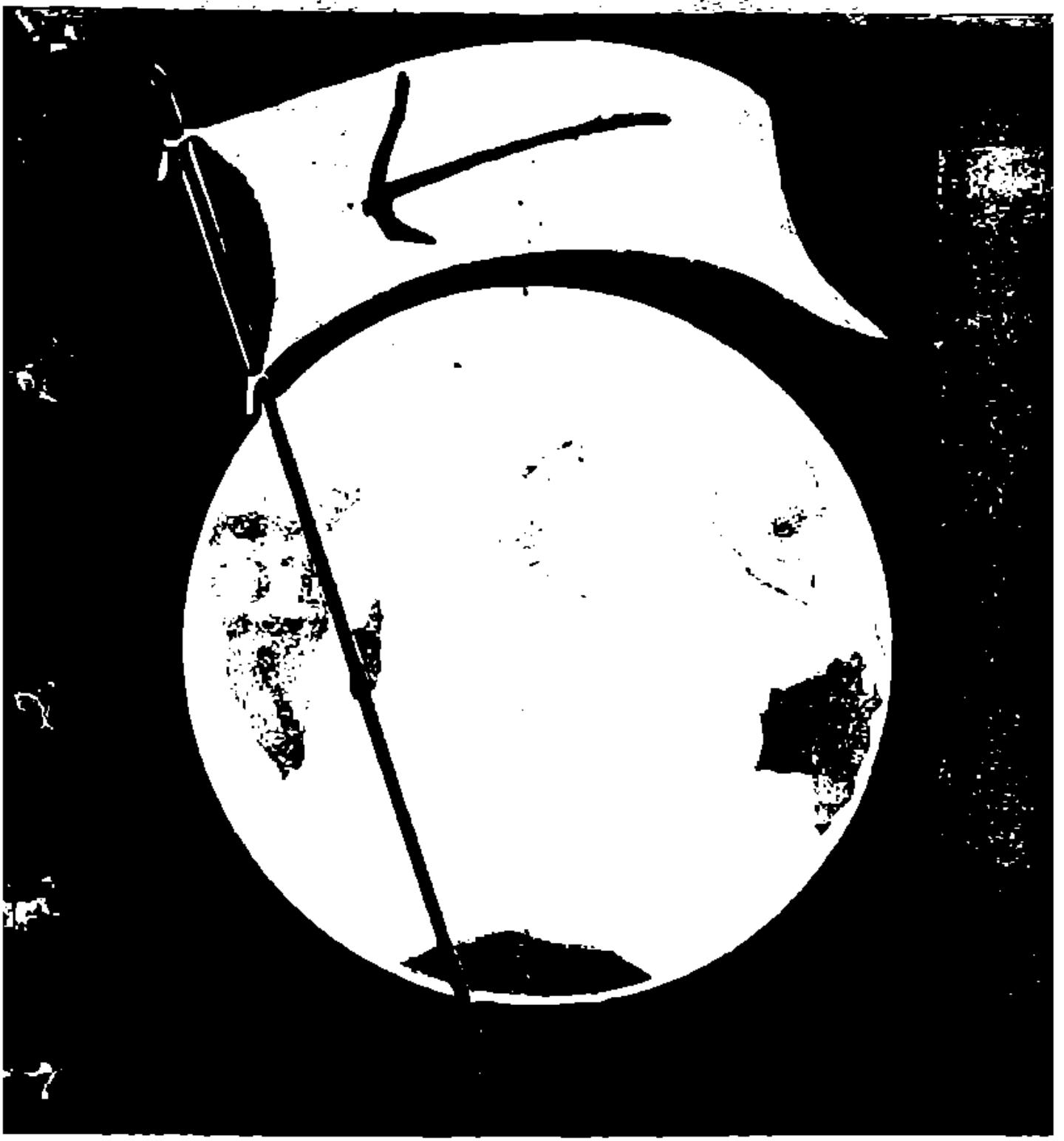

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

For the safety of your Car

USE

LMP AUTO PARTS
A N D
ACCESSORIES

LAKSHMI MOTORS

37B, A. J. Bose Road,
CALCUTTA-17

Phone : 21-2651 & 43-1600
Grams : " ELLEMPEE "

MANUFACTURERS OF LMP AUTO PARTS & ACCESSORIES

আমরা মনে করি

- কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে।

- সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।

- কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যই দাবী করিতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমগ্র ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং—৮৬১ (৩০) ডি, আই, ও, তাং ২৩. ৫. ৮০

SPECIAL QUALITY

গীতাশাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০

ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ	১৪·০০	সহজ পাঠ্য গীতা	১·৫০
বৃহৎ পকেট গীতা	২·০০	শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	২২·০০
সুলভ পকেট গীতা	১·০০	কর্মবাণী	৩·০০
পদ্যগীতা	৩·০০	ভারত আত্মার বাণী	৯·৫০
নিত্য পাঠ্য গীতা	২·০০	Soul of India Speaks	7·00

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ব্যায়ামে বাঙালী	৪·০০	রাজর্ষি রামমোহন	৪·০০
বীরত্বে বাঙালী	৪·০০	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র	৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৮·০০	আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র	৩.০০
বাংলার ঋষি	৬·০০	যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ	৪·০০

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ.বি.টি

ছোটদের গল্পগুচ্ছ	৪·০০	মানুষের মত মানুষ	১·০০
বিদ্যাসাগর	৩·০০		

ব্যায়ামবীর শ্রীনীরদ সরকারের

শরীর ও শক্তি	৪·০০	নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন	৪·০০
সরল যোগ ব্যায়াম	৪·০০	যোগ ব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	৪·০০
ছাত্রদের স্বাস্থ্য আসন ও ব্যায়াম	৪·০০	যৌগিক নিয়মে রোগ নিবারণ	৬·০০

কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত ও শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০

সর্বদা ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় অভিধান। শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার।

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

চঞ্চল ভারত

৩২ বর্ষ
১২ সংখ্যা
পৌষ '৮৯

সূচীপত্র

ধর্মঘট । পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ৪৪৩
সম্পাদকীয় । ৪৪৪
ক্রম বিবর্তনে মানব বিকাশের ভূমিকা ।
ড. শুকদাস কুমার । ৪৪৫
পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী । ৪৫৭
নববধূ । গৌরচন্দ্র সাহা । ৪৪৯
কার্তিকের চালচিত্রে । কল্যাণ দে । ৪৫২
অজানা । বুলু ঘাটুয়া । ৪৪৯
চাঁদির খুতোয় জাতির বন্ধন ।
কালোধন মুখোপাধ্যায় । ৪৬২
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি ।
স্বপনবুড়ো । ৪৫০
নিমাই তার নাম । পরেশ সাহা । ৪৫৪
শিশু সাহিত্য । বীরেন্দ্র লাল ধর । ৪৫৮
জমি । কিংশুক ভাদুড়ী । ৪৬৪
দূরের আকাশ ।
অখিলরঞ্জন রায় । ৪৬৬
লোড শেডিং । বাণী নাগ । ৪৬৮
অরণ্যের হাতছানি । সুব্রতা দে । ৪৬৯
রূপদ শিল্পী ও বীণা বাদক হরপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায় ।
আর্যাকুমার মুখোপাধ্যায় । ৪৭৩
ব্যানচাঁদ—"হকির যাদুকর" ।
তপন ধর । ৪৭৬
বর্ণানুক্রমিক সূচী—৩২তম বর্ষ । ৪৭৮

সম্পাদিকা : রেণু মিত্র
যুগ্ম-সম্পাদক : গৌরচন্দ্র সাহা
মূল্য : এক টাকা মাত্র
বার্ষিক : ১২ টাকা (সডাক)

ধর্মঘট

সমগ্র সৃষ্টি না হারাইলে, জাতীয়তাবোধ হইতে, সমষ্টিবোধ হইতে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্ন স্বার্থের মধ্যে না নামিলে বিচ্ছিন্নভাবে এত 'ধর্মঘট' করা সম্ভব হইত না। সমষ্টির স্বার্থরক্ষার ভিতরই যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া পূরণ করিতে হইলে যে কোনও রাষ্ট্রের পক্ষে দেউলিয়া হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তাহা বুঝিবার মত সহজ বুদ্ধিটুকু ইহাদের নাই। একটি পরিবারের প্রতিটী ব্যক্তি যদি প্রত্যেকের পরিচ্ছিন্ন দাবী পূরণের জন্য পরিবারের কর্তার উপর ক্রমাগত চাপ দেয় একে যদি অপরের স্বার্থের সঙ্গে নিজ স্বার্থের সামঞ্জস্য না করিয়া নিজের দাবীটুকু আদায়ের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে, তবে কি সে পরিবারের অস্তিত্ব টিকিতে পারে? আজ শুনিতেছি সমাজ তান্ত্রিক সমাজ গড়িবার জন্য প্রচেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব হইবে যদি না সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি 'সমাজ' বনিয়া না যায়? প্রতিটী ব্যক্তি যদি জাতীয়তাবোধে না হয়, তবে স্বার্থপর কতকগুলি ব্যক্তির গোঁজামিলে কি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া উঠিবে? সকলের স্বার্থের সমন্বয় সাধিত হইবে? গোঁজামিলে মিল হয় না, সমন্বয় হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িতে প্রতি ব্যক্তিকে এমন দাবীই করিতে হইবে যাহাতে কাহারও দাবীর সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়। ... জীবনে প্রতিটী অংশ জীবনধর্মী বলিয়াই উহাদের মিলনে ইহা অখণ্ডত্ব বজায় রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। যে জাতির জীবন নাই, সামগ্রিকতা নাই তাহাকে সংঘর্ষে সংঘর্ষে ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইবে। ধর্মঘট ভারতবর্ষকে সেই নির্বীর্যতার দিকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দিবে।—...

যাহাদের 'চাপ' দিয়া আদায় করিবার সুযোগ আছে, সেই সবই শহরবাসী বা কেন্দ্রস্থিত বা বড় বড় শহরের আশে পাশে অবস্থিত। অথচ সুবিধার অধিকারোন্মত্ত লোক ছাড়া কোটি কোটি লোক অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে যাহাদের চাপ দিবার সুযোগই নাই: ইহাদের ঘরে অন্নবস্ত্র পৌঁছাইবে কে বা কাহারা? ধর্মঘটীরা তো নিজ নিজ দাবী লইয়াই মশগুল। 'চাচা, আপন বাঁচা'—এই তো ইহাদের নীতি। কিন্তু চাচা আপন বাঁচাইলে তো জাতি বাঁচে না, জাতি না বাঁচিলে চাচার বলের বাঁচিবার কি কোন অর্থই হয়? সকলকে লইয়াই বাঁচিতে হইবে, নচেৎ কেহই একা বাঁচিবে না। সুযোগ যাহাদের আছে তাহারা যদি সেই সুযোগ সর্বসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া না দেয় তবে সে সুযোগদ্বারা যে ধন বা শক্তি লাভ হইবে তাহা কি অপরের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হইবে? এইভাবে 'সুযোগ' প্রাপ্তদের কাছে কি সব কিছু পুঞ্জিত হইয়া একটি top-heavy সমাজ গড়িয়া উঠিবে না? যাহার ফলে ধীরে ধীরে সুযোগকারীদের দ্বারা কি লক্ষ লক্ষ লোক শোষিত হইবে না?.....

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

সম্পাদকীয়—

সংঘর্ষ, সংগচ্ছধ্বম্

ভারতবর্ষের তথা সমস্ত বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রের দিকে তাকালে শুধু দেখা যাবে স্বার্থ লোভ ক্ষমতার কাড়াকাড়ির বীভৎস চিত্র যেটা জঙ্গলের পশু-চরিত্র থেকে এইটুকুই শুধু তফাৎ যে পশুরা সোজাসুজি নিজের স্বার্থের জন্য কাড়াকাড়ি করে আর মানুষেরা বেশী সময়েই মুখে পরার্থপরতার মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করে যদিও তার সমস্ত কাজকর্ম স্লোগেরাঙ্গপেষনের প্রবৃত্তি পশু-স্তরেরই জীবন্ত। অথচ আমরা মানুষ। মানুষ তো শুধু জীব নয়—তার মধ্যে তো আরও কিছু থাকবে? মনুষ্যত্ব তো থাকবে? আজ এই মনুষ্যত্বের বড় অভাব হয়ে পড়েছে। জীবত্বের মধ্যে মিলবার প্রবণতা দেহগত, তাই তার শক্তি বেশী, কিন্তু মানুষের মিলনাকাঙ্ক্ষা শুধু দেহগত বা জৈবিক প্রয়োজনগত হলে তাকে মনুষ্যত্ব বলব কেমন করে? মানুষ মিলবে হৃদয় দিয়ে। আজ হারিয়ে যাওয়া সেই হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে হবে।

আজকালকার হৃদয়হীন রাজনীতিবিদ্‌দের চরিত্রের মুখোশ অন্তত যদি বা রক্ষা পায় কিন্তু বিধান সভায় পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সময় অনেক সময়ই তাদের মধ্য থেকে যে ভাষা বা ব্যবহার প্রকাশ পায় তা মানুষকে স্তম্ভিত করে দেয়। মানুষ মানুষকে যদি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখে তাহলে তাকে মানুষের সমাজ বলব কেমন করে? গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী এই সব জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে যে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা, দলীয় বা নিজের স্বার্থে সত্যের অপলাপের চেষ্টা বা ঘটনাকে সেই ভাবে পরিচালনার চেষ্টার যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে মানুষের আশা করবার আর কিছু থাকে না। এই বিকার যদিও শুধু ভারতবর্ষে নয়, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরে এ ধারা পৃথিবীময়ই চলছে।

শুধু জড়বাদী দেশগুলি নিজের দেশের স্বার্থ বোঝে, বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা ঐ দেশের স্বার্থের অনুযায়ী হয়ে পড়ে, কিন্তু অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ প্রতিক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী এত দুঃসিৎ হয়েছে যে দেশের স্বার্থ বলেও তার কোন বোধ জন্মায় নি। পারস্পরিক হানাহানির এই সংঘর্ষমূলক ব্যক্তি বা দলের স্বার্থসর্বস্ব এই মানসিকতা দিয়ে দেশের দশের বিশ্বের সত্যিকার কল্যাণ কিছু হবে কি?

বর্তমান বিশ্বের এই সংঘর্ষময় চিত্রের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বৈদিক মন্ত্রে মানুষকে জীবনে চলার পথের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা যদি তুলে ধরি তাহলে এই দুই চিত্রের পার্থক্য আমাদের বুঝিয়ে দেবে আমরা কি হয়েছি, আর আমাদের কি হওয়া উচিত ছিল।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী বঃ আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

—তোমরা সম্মিলিত হও, এক কথা বল, একমত হও, যেমন পূর্ববর্তী দেবগণ একমত হইয়া (হবির) ভাগ লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মন্ত্র সমান চিত্ত ও মন সমান। তোমাদের সমান মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি, তোমাদের সমান হবির দ্বারা আমি হোম করিতেছি। তোমাদের সংকল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক যাহাতে তোমাদের সুন্দর সাহিত্য (অর্থাৎ মিল) হইতে পারে। সংসারে চলতে হবে সমান চিত্ত, সমান মন, সমান হৃদয়, সমান সংকল্প নিয়ে—সাধনা যদি এই রকম হয় তাহলেই মানুষের সমাজ তৈরী হতে পারে যাতে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের গোড়া থেকে ভাবতে হবে। একটি মাত্র দল থাকবে তা-ও যেমন স্বাস্থ্যকর হয় না তেমনি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রত্যেকে তার স্বার্থটুকুতে রাজা হতে চাইবে আর অপর দলগুলির সঙ্গে মারামারি দলাদলি করে চলবে এ-ও কোন স্বাস্থ্যকর বা সুখকর অবস্থা নয়। সকলের সঙ্গে সমান চিত্ততা, সমান হৃদয়, সমান সংকল্প নিয়ে শিশু কাল থেকে যদি আমরা ভাবতে অভ্যাস করি তাহলে আমাদের সত্তার মধ্যে যে ঔদার্য ও ব্যাপকতা আসবে তাতে সকল মানুষ বা সকল দলের বৈচিত্র্যপূর্ণ অস্তিত্বকে মেনে নিয়েই আমরা সমান চিত্ততা রক্ষা করতে শিখে উঠতে থাকব। শিশু বয়স থেকে সমান চিত্ততার সাধনা ছাড়া পারস্পরিক সংঘর্ষ দূর করবার আর পথ নাই। পাশ্চাত্যের অনুযায়ী হয়ে আজকের আমাদের চিন্তাধারা সংঘর্ষমূলক, বৈদিক মন্ত্রের অন্তরে মিলন শান্তি ও আনন্দের উৎস রয়েছে। সম্মিলিত হওয়ার এই মন্ত্র আজ ছড়িয়ে দিতে হবে। এই পথে লক্ষ্য রচনা দ্বারা বর্তমান দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ক্রম বিবর্তনে মানব বিকাশের ভূমিকা

ডঃ গুরুদাস কুমার এম. এস. সি ডি ফিল

বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানের এক জটিল তত্ত্ব। ক্রমবিকাশ বা সরল অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে জটিল রূপে উন্নয়ন ও ক্রমাবয়বের খেলা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আদিযুগকাল হইতেই চলিতেছে। বিবর্তনের ভূমিকায় চলিতেছে এক অবিশ্রান্ত-ধারা, অবিরাম গতি ও জৈবিক প্রক্রিয়ার নানা বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র—ঋকবেদ ও উপনিষদে ক্রম-বিকাশের ধারা সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে খৃঃ পূঃ ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিলমুনিই সর্ব্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ঐতরেয় উপনিষদে (৩/১/০) উল্লেখ আছে জীব চারি প্রকারের যথা—অণ্ডজানিজ, জারুজানিজ, স্বেদজানিচোদ্ভিজ্জানি অর্থাৎ জীব চারিশ্রেণীর—অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। বেদান্ত সূত্রে (৩/১/২১) স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রীমৎ ভাগবতে বিশ্বসৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভগবান পরমেশ্বর নিজশক্তির দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, হংস, মৎস্য প্রভৃতি বিবিধ জীব-শরীর সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন মানব শরীর সৃষ্টি করেন।

বিশ্বের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস অনুসরণে দেখা যায় অষ্টাদশ শতকে কাণ্ট ও লাপ্লাস প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা তাহাদের সুবিখ্যাত নীহারিকা তত্ত্ব প্রবর্ত্তনে পূর্ব্বকালের নিউটন প্রস্তাবিত নিয়মের শৃঙ্খল ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর অভিব্যক্তি মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ক্রম-বিবর্ত্তন তত্ত্ব সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন উনবিংশ শতকে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) হেকেল, লামার্ক (১৭৪৪-১৮১৯) প্রমুখ জীববিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায়। ডারউইনের (১৮৭১) ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রধানতঃ তিনটি সূত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয় যথা—বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণতা, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জীবন সংগ্রাম। বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীতে (১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে) ওয়াটসন এবং ক্রীক মানবের বংশগতির মূল উপাদান নিউক্লীক অ্যাসিড আবিষ্কার ও জীনতত্ত্ব প্রবর্ত্তনে বংশ-গতির এক যুগান্তরী অধ্যায় সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে জীববিজ্ঞান গবেষণার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল হইল সৌরজগতে জীবের উৎপত্তি, অজৈব বস্তু হইতে আদি জৈব প্রাণের সৃষ্টির অনুসন্ধান। বিজ্ঞানীদের ধারণা সূর্য্যালোক রূপান্তরিত হয় তাপে, তাপ রূপান্তরিত হয় বিদ্যুৎ শক্তিতে। জীবন বা প্রাণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শক্তির প্রভাবের সহিত জড়িত।

এই তাপের প্রভাবেই পৃথিবী সূর্য্য হইতে জলন্ত গ্যাসের পিণ্ডরূপে বাহির হইয়া ঘুরে ঘুরিয়া সূর্য্যের আয়তনের মধ্যে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন অগ্নিময় গ্রহের আকারে সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণী শক্তির সামনে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তেজ হারিয়ে শীতল হইতে থাকে। তখন পৃথিবীর আদি জড়কণাগুলি আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে প্রথমে উত্তপ্ত (অগ্নি) বায়বীয় ও পরে শীতল বা তরল (অপঃ) পদার্থে পরিণত হয় এইরূপে জড়কণাগুলি সন্নি-বিষ্ট হইয়া ক্ষিতি বা আদি পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। পৃথিবী আরও শীতল হইলে জীবের মূল উপাদানগুলি যেমন প্রোটিন পদার্থের আদি কণাগুলি লালরভূমি ইত্যাদির জৈবনিক ঘনীভূত বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া মিথেন অ্যামাইনো অ্যাসিড বা 'প্রাক জৈব' (Prebiotic) পদার্থে পরিণত হয়। এইরূপে জীব গঠনের এই সকল মূল উপাদানগুলি অজৈব রাসায়নিক পদার্থেরই এক বিশেষ সংগঠনে উৎপাদিত। উহারা এই পৃথিবীরই অংশ, নির্দ্দিষ্ট এক পর্য্যায় হইতে উদ্ভূত। একই পদার্থের ক্রমিক বিকাশ মাত্র। অজৈব জড় পদার্থ হইতে প্রাণবন্ত জীবের উৎপত্তি ও উহার বিভিন্ন রূপে রূপান্তর ও অস্তিত্বের বিকাশ হইলে চলে এক অখণ্ড প্রাণের প্রবাহ। জীবকোষেও চলে এক অবিচ্ছিন্ন ধারা, বংশগতির অখণ্ড চাঞ্চল্যমান প্রবাহ। কোথাও অতি প্রকট, অল্প প্রকট, কোথাও সংবৃত বা বিবৃত। আধুনিক বিজ্ঞান মতে জড়পদার্থের অভিব্যক্তির ফলে প্রাণের আবি-র্ভাব যাহাকে 'কাদার ডিলার্ড দ্য শার্দেন' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে 'ওমেগা বিন্দু' বলিয়াছেন উহা একটি ব্যাপকতর

অভিব্যক্তির সূত্র অবলম্বনে ভবিষ্যৎ দুইটি এক মহৎ ইঙ্গিত ও প্রচেষ্টা জীববিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে।

সুদীর্ঘকাল জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির সমবায়, বিনিময়, বিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় অতি সূক্ষ্ম ভাইরাস জাতীয় জননে অক্ষম পরোপজীবী জীবাণু সৃষ্টির সূচনা হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান ১১০ কোটি বৎসর পূর্বে ভূতাত্ত্বিক প্রাচীনতম 'প্রোটারোজোইক' যুগে মহাসমুদ্রে অজৈব ভাইরাস স্যাওলা জাতীয় জীবাণুর সৃষ্টি পর্যায় হইতে এক-কোষী 'অ্যামিবা' জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর ও নানা প্রকার জলজীবের আবির্ভাব ঘটে। এইরূপ 'আর্কিওজোইক' যুগের পর আসে 'প্যালিওজোইক' বা পুরাজীবীয় যুগ, এই যুগের স্থিতিকাল প্রায় ৩৭ কোটি বৎসর। ইহার আদিতে আবির্ভাব হয় বহুকোষী অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী, যেমন প্রবাল, স্পঞ্জ, শামুক ইত্যাদি। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক মাছ জাতীয় জীব ও আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব দেখা যায়। স্থলচর প্রাণী ও উদ্ভিদেরাও এই যুগে প্রাধান্য লাভ করে। প্যালিওজোইক যুগ শেষ হইলে আরম্ভ হয় 'মেসোজোইক' বা মধ্যজীবীয় যুগ। এই যুগ চলে প্রায় ১৫ কোটী বৎসর।

এই যুগে আবির্ভাব হয় অতিকায় সরীসৃপ জীব ও শেষ পর্যায়ে মৎস্যাকৃতি সরীসৃপ প্রাণী, পক্ষী ও অতিকায় কচ্ছপের। ইহার পর আসে 'সেনোজোইক' বা নবজীবীয় যুগ। এই যুগটি চলে প্রায় ৭ কোটী বৎসর। ইহার প্রারম্ভে আবির্ভাব হয় আদিম স্তন্যপায়ী জীব, অষ্টগর্ভীয় প্রাণী ও পরিশেষে সূচনা হয় প্রকৃত দ্বাদশগর্ভীয় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের। এই যুগের শেষ ভাগে উদ্ভব হয় আধুনিক স্তন্যপায়ীর প্রধান প্রধান শাখার অন্তর্ভুক্ত প্রাণী ও শেষ ভাগে উদ্ভব হয় আদিম প্রাইমেটসদের ও প্রাইমেটের অন্তর্ভুক্ত লেমুর জাতীয় জীবের আদি পুরুষ 'প্রোসিমাই' বানর ও বনমানুষের আদি পুরুষ 'প্যাথাপিথেকাস' ও মানব গোষ্ঠীর আদি পুরুষ 'ড্রায়োপিথেকাস' প্রভৃতি দ্বিপদী ভূচলনশীল নরাকার 'এপ' প্রাইমেটসদের।

অতএব পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা এক বিবর্তনের নিয়মে চলিতেছে। বৃহৎ সৌর জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু ও জীব পর্যন্ত সকলেই বিবর্তনের ফলপ্রসূত। এই ক্রমবিবর্তনের ফলেই জন্ম লইয়াছে সূর্য, চন্দ্র, অসংখ্য নক্ষত্র, নীহারিকা ও গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি। মানবজাতি মানবরূপ ধারণ করিবার পূর্বে ও পরোক্ষে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীর শরীরের বহুজাতি যোনীর স্তর সমূহের অতিক্রমে বর্তমান 'বিজ্ঞমানব' বা 'হোমো স্যাপিয়েনস' এ পরিণত হইয়াছে। বিবর্তনের পটভূমিকায় মানবের আবির্ভাব হয় সুদূর অতীতের ভূতাত্ত্বিক টার্শিয়ারী যুগে মায়োপ্লায়োসিন পর্বে নীলিভূত আদিম মানবাকার প্রজাতির জাতি যোনীর শাখা হইতে। সৃজনকারী অভিব্যক্তির ভূমিকায় মানবের 'হোমিনাইডি' ধারাটী 'এপ' মানব খাড়া মানব, উপমানব প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের জৈব স্তর অতিক্রমে প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশগতির নির্ভরযোগ্য জীবকণা ও উহার যুগ উপাদানের সংগঠন এবং বিস্তারের ফলে একক প্রজাতি বিশিষ্ট আধুনিক শ্রেষ্ঠ, মানব সৃষ্টি হইয়া বিভিন্ন জাতির বিভেদন ও অসংখ্য জনগণের উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রতিটি জীব ক্রমবিকাশের সোপানে নিম্নতর হইতে ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে চরম লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত। ধীরে ধীরে সকলেই চরম মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া একদিন লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছাইবে। মানুষই ক্রম-বিবর্তনের শ্রেষ্ঠ পরিণত জীব। দৈহিক বিকাশের চরম জৈব প্রাণীর শরীরের পূর্ণ পরিণতি লাভ করা ছাড়াও বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশে মানবের বৌদ্ধিক (Intellectual) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে পরিপূর্ণতা হয়। শুদ্ধঘন জাগতিক সমস্ত বস্তুর যথার্থ রূপ, শাশ্বত নিত্য মুক্ত, চির পবিত্র পরমার্থের সন্ধান সত্য স্বরূপ আত্মসত্তার উপলব্ধি করা যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও সত্তার প্রকাশেই ক্রমবিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

—

পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯৫৬

ঠাকুর, তোমাকে বুকে লইয়া আমি সমস্ত পথের বাধা পরিপাক করিয়া চলিয়াছি। তুমি কি আমার কে কে? মা তা? তুমি আমার জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। কেহ আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কিছু করিতে পারিবে না। তোমার জয় হইবেই। মহানির্বাণ মঠের দল আমাকে চাপিয়া রাখিতে চায়, তাহা তো তাহারা পারিবে না। আমি যে তোমার বীর্যে বীর্যবান। আমার নাম বক্তার মধ্যে না থাকার জন্য তারিণীবাবুদের উপর ভিতর ও বাহির হইতে চাপ পড়িয়াছে। অগেনবাবু প্রভৃতি আমার পক্ষে। আমাকে লইয়া তোমার খেলা চলিতেছে বেশ। আমি অগ্রসর হইবই তোমার কৃপায়। এত ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া তাহারা আমার সঙ্গে পারিবে কেন? আমি অর্থ তুমি। আমার মস্তক যতদিন তোমার পাদপদ্মে আছে ততদিন আমি invinsible। তোমার জয় হউক। কিতিশ চক্রবর্তী ১০টায় আসে। আজিকার মঠের সভায় ঘোষিত সভাপতি শ্যামসুন্দরানন্দ অসুস্থ (?) হওয়ায় আমাকে সেই কাজ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। আমিও রাজী হই। কিন্তু কিতীশবাবু আসিবার পর সভা হইবে এইরূপ বলিয়াছে বলিয়াই আমার মনে ছিল—কিন্তু সভা ৫.২০তে আরম্ভ হয়। আমি গোপা ও বুনু সহ ৪টার পর বাহির যাই। একটু অপ্রস্তুত হই। আমারই হয়তো ভুল ধারণা হইয়াছিল। যাহা হউক, তোমারই ইচ্ছা নয় যে আজ আমার বক্তৃতা হয়। বাগুইআটি যাল লইবার লরী ১১৷৷টায় পর আসে। ১.৩০ মিনিটে বেণু বিষ্ণুপদ ও নরেন আলমারী চেয়ার টেবিল ড্রাম হোগলা বই সহ রওনা হইয়া যায়। ২-১০এ পৌঁছায়। বেণু ৭টার পর ফেরে। আমি মঠ হইতে ফিরিয়াছি পর। পরশু (৫ঠা) শেষ রাত্রিতে নাকে আঘাত লাগার ফলে প্রতিবার বাগুইআটিতে নাক হইতে রক্তপাত হয়। আর পড়ে নাই। নীরোদ বাবুকে বলিয়াছিল আমাকে চিঠি দিয়া জানাইতে বা নিজে আসিয়া জানাইয়া যাইতে। সে ২ মাসা ঔষধ দিয়াছিল আর খবরও দেয় নাই। চিঠিও দেয় নাই। রাজেনই বাধা করিয়াছে। সেই জন্য ঠাকুরের উৎসবে আসা হয় নাই। জ্যোতিপ্রিয়বাবু শ্যামসুন্দরানন্দের স্থলে সভাপতি হন। আজ নীচে ও উপরে সকলেই ম্যাটিতে শুইয়াছি। প্রসাদের অবস্থা ভাল চলিতেছে। ৮টায় হরিদাসী আসে, ৫ টাকা ও মোয়া দেয়। ৯৷৷ টায় পাঁচু আসিয়া দিয়া যায়। দীর্ঘদিন পরে রসিকলাল গুহ ৫, টাকা m-o করিয়া পাঠাইয়াছে। ১৯শে এপ্রিল

এই সংসারে পথ-চলা খুবই জটিল। Fourth dimension-এ time-interval ও space-interval-এর সঙ্গে পরিচিত না হইলে মহাদেশ ও মহাকালের সঙ্গে ঠোকর খাইয়া মরিতেই হইবে। এই চতুর্থ মাত্রিক দেশ-কালের মানুষ প্রতি বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালে বিচরণ করিবার যোগ্যতা রাখে। অথচ প্রতিটি মানুষের দেশ ও কাল আপেক্ষিকতাবশতঃ পৃথক পৃথক। পৃথক পৃথক দেশ-কালবিশিষ্ট অনন্ত মানুষের সঙ্গে বিচরণ করার ক্ষমতা পুরুষোত্তম-সাধকদেরই আছে। Interval-এর খবর যাহারা জানেন, তাঁহারাই পরকীয় রসের উপাসক। Interval third dimension-এর লোকদের 'দূরত্ব' নয়। উহার অনুভূতি ও আস্বাদন ভিন্ন জাতীয়। যাহারা পরকীয় রসের উপাসক, তাহাদের কাছে সংসারের ক্ষেত্র অবাধ। ঠাকুর, তোমার আশীর্বাদে আমার অবাধ বিচরণ হউক। সকালে লিখিত দরকার আছে। নিত্যগোপালের উপর ছাড়া কাহারও উপর অভিমান আমার নাই। বিনা তপস্যায় কিছুই পাই নাই। বাগুইআটির জলের জন্য তপস্যা করিয়া তাহা পাইতে হইবে। মঠের ভাইদের সঙ্গে কোন ঝগড়া আমার নাই। উহাদের নিত্যগোপাল ঠাকুর-বাড়ীর, আমার নিত্যগোপাল জগন্নাথ। গত বুধবার সভার শেষে 'জয় জগন্নাথ নিত্যগোপালকী জয়' এই জয়ধ্বনিতে সভা মুখরিত হয়। পোস্টাফিসে দরখাস্ত করা হয় আগামী সোমবার হইতে যেন চিঠি পত্রাদি redirect করা হয়। ব্যাঙ্কে একাউন্ট transfer করার জন্যও দরখাস্ত করা হয়। বেণু অগেনবাবুর ওখানে যায়। ৫ টার পর ফেরে। আশা আসে বৈকালে। ৬ টার পর আমি বিকাশ মঠে যাই।

ত্রিপুরারীবাবু ৭টায় রামায়ণী কথা বলেন. 'অস্তিত্বং ত্রিজগৎ ৪ পরস্পরার্থম্'। ত্রিপুরারীবাবু 'ভগবান নিত্যগোপাল' কয়েকবার উল্লেখ করেন। চৈত্র মাসে রাম জন্মান, নিত্যগোপালও। বক্তৃতার শেষে বলিবার ইচ্ছা ছিল, 'রাম-রাজা স্থাপন করিতে রাম আসিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যগোপাল সেই রাম-রাজ্যের দর্শন দিয়া গিয়াছেন'। আরতির সময় ঠাকুরের সামনে বসিয়া ছিলাম। সভাস্তে চলিয়া আসি বিকলায়। ..... ২০ শে এপ্রিল।

'হয় অথণ্ড পাওয়া, নয় অথণ্ড হারানো'—ইহাই আমার সারা জীবনের নীতি। Party-line-এ চলিয়া কোনও বস্তুর মীমাংসা হয় না, কোনও দিন সমগ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। রাম অখণ্ড হারাইয়াই অখণ্ড রাজ্য পাইলেন। মহানির্বাণ মঠে বর্তমানে যে দুই দল হইয়াছে, কোনও দলের কাছে আত্মসমর্পণ করা আমার ধাতুবিরুদ্ধ। ওখানের কাহারও বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার অধিকার নাই। তাহা তো ঠাকুরের পক্ষে অবমাননাকর হয়। কাহারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কাছে কিছু করিবনা, অথচ তাহাকে সমগ্র ভাবেই পাইতে হইবে। ওখানে দলাদলি বৃদ্ধি আমি চাই না। আমি দুইয়েরই উপর, ঠাকুরের স্তরের। সমগ্র বাঙ্গলায় যদি নিত্যগোপালের প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহাতে যে শক্তি-সঞ্চয় হইবে, তাহা লইয়া মহানির্বাণ মঠে গেলে সেখানে সমগ্রভাবে সকলকে পাইব। ভাই-এর বিরুদ্ধে বলিলে বাবার বিরুদ্ধেই বলা হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হইলে কাঁকি দিয়া বাবাই পলাইয়া যান। সকালে মলিনী ঘোষ আসেন। পূর্ব হইতে আমাদের দর্শন তিনি অনেকটা বুঝিয়াছেন। তিনি বক্তৃবিহার মিলন সমর্থন করেন। 'কর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'গিরিধারী'র উপাখ্যান বলি। বাঙ্গলায় কেহ 'কর্ম' করে না ইহা তিনিও বলেন। বেণু খোঁড়া পা (পায়ে একটা লোহা পড়ায় বেশ যন্ত্রণা হয়) লইয়াই মণি সেন, সত্যব্রত যায়, বিশ্ববাণী দাদা ও ব্যাণ্ড হইয়া ১৷৷৹ টায় আসে। সন্তোষ আসে। তাহাকে লইয়া ৷৷৹ টায় পর মঠে যাই। ঠাকুরের সামনে বসিয়া থাকি, তখন আরতি হইতেছিল; কত দূরে যাইব, দুঃখ হইতেছিল। পূর্বে ঠাকুরের প্রকট থাকাকালীন হুগলী হইতে আসার সময় যেমন বেদনা বোধ হইত, তেমন একটি হৃদয়-বেদনা কাল বোধ হইতেছিল। ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'পরম তুমি কি জাননা যে তুমি যখন যেখানে থাক সঙ্গে সঙ্গে আছি'। সতীলীলা কীর্তন চলিতেছিল। দক্ষিণদিকের ফটক দিয়া আসিতেছিলাম, যদি বা পরে আর একবার মুখ দেখা যায়। লোক ছিল, দেখা হইল না। জিনিষপত্র গুছানো হইতেছে—বাগুইআটি যাইবার জন্য। বেণুদার আসে, দুপুরে প্রসাদ পায়। ২১শে এপ্রিল

স্বামী আমার, মহানির্বাণ মঠে তোমার দেহ বর্তমান। উহা আমার প্রিয়তম স্থান। সেখান হইতে তোমার কথা বলিতে পারিলেই শোভন হইত, গৌরবের হইত। তাহা তো হইল না। কাল সন্ধ্যার পর মহানির্বাণ মঠ হইতে আসার সময় বড় দুঃখ হইতেছিল। এমন তো কোনদিন হয় নাই। শতবার্ষিকীর সময় এত ঘাতপ্রতিঘাত করিয়াছি কি না, তাই একটা 'মায়া' লাগিয়া গিয়াছে ঐ স্থানের উপর। তোমার তো ওখানে আদর হয় না। কোনওদিন তুমি আদর পাও নাই। তোমার আদর করিবার কেহ যোগ্য ছিল না। আজও নাই। অনাদরের অনাদৃত তোমায় গ্রহণ করিতে হয়। তোমায় কি ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আদরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না? তোমাকে লইয়া উহারা একটা তামাসা করিতেছে। তোমার সত্য বাস্তব রূপে কি তোমায় প্রতিষ্ঠা গড়িয়া তুলিতে পারিব না? হৃদয়ের মধ্য দিয়া দেবার ভিতর প্রতিষ্ঠাই তো সত্য প্রতিষ্ঠা। বর্তমান মহানির্বাণ মঠে তাহা নাই। আমাকে বল দেও আমি তোমার চতুর্দিকে যেন হৃদয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। তোমার জয় হউক আমার জীবনে। রাখালবাবু আসে। বৈকাল ৫টায় পাঠ আরম্ভ হয়। মধু আসে ....., জয়া আসে। পাঠের পর বীরেন চৌধুরী আসে। পাঠের মধ্যে আমার বাগুইআটি যাওয়ার কথা বলি। প্রফুল্ল সান্যাল পাঠের শেষে আসেন—তিনি একদিন কম্যুনিজম পছন্দ করিতেন—আজকাল গতির সঙ্গে স্থিতি চান। Synthesis চান। সত্যেন শাস্ত্রী সকালে আসে। এক জায়গা হইতে স্থানান্তরে যাওয়া কি সোজা কথা। বেণুই সব করিতেছে। লীলারা মঠে যায় - এ কয়দিন নরেন বাগুইআটি ছিল। সে এখানে রান্না করিতেছে, বেশ গুছাইয়া রান্না করে। সে আমার উপর প্রীতিপরায়ণ। প্রথমবার শতবার্ষিকী উৎসবে সে আমার কাছ হইতে ঝাড়ু কাড়িয়া লইয়া মঠ ঝাড়ু দিয়াছিল। পাঠের পর বেণু ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা ও কিছু ফল কিনিয়া আনে। ঠাকুরের কটোর পিছনে garland লাগাইয়া আনে। পাঠের পর কালবৈশাখীর কিছু ঝড় বৃষ্টি হয়। ২২শে এপ্রিল। (ক্রমশ.)

কবিতা

নববধূ

সৌরচন্দ্র সাহা

অনেক স্বপন অনেক সাধনা শেষে
রামধনু আঁকা স্বরগের সিঁড়ি বেয়ে
সলাজ চরণে নেমে এল মৃদু হেসে
অমরা পুরীর সোনালী বরণ মেয়ে।

অনেক গানের অনেক কবির চেয়ে
তাহার মুখের কবিটি যে লাগে ভালো।
অনেক জোছনা অনেক চাঁদের মেয়ে
তার হাসিখানি আরো বেশী দেয় আলো।

তারি আবাহনে সুরভির কানে কানে
গাহিতেছে অলি গুঞ্জন সুরে মাতি।
প্রতি দিবসের প্রখরতা অবসানে
তারি লাগি আসে মধুরা মোহিনী রাতি।

সে যে শাশ্বতী স্বপনী, সে যে নববধূ,
মধুময় এই ভূলোকের সার মধু।

কার্তিকের চালচিত্রে

কল্যাণ সে

সোনালী চাঁদের ভেতর কপালী ওষার :
মাটি চষে চাষা রেখে
গর্ভিণী ধানের কন্যা ঘরকন্না গৃহস্থালী সেতে
বন্দর ছেড়ে চলে গেল নীল সমুদ্রের গভীরে কোথায় .....
মাছের শরীর ছুঁড়ে লোনা ঘ্রাণ
ঘ্রাণের শরীরে জমা অখণ্ড ঈশ্বর
ধনজ উদ্ভিদ যেন ভেসে যায় কুয়াশায়
পায়রিতা পৃথিবীর নৈঋতিক অন্বেষণে
গাছ, গাছের শেকড়, কচি কাচ ডাল পালা
অক্ষর, শব্দ, বাক্য-বিন্যাস ধ্যান মগ্ন অবস্থায়
ভ্রূণ, ফুল, ফল চালচিত্রে ভেসে আসে
কার্তিকের নবান্নের কাক ডাকা ভোরের প্রান্তর
এই যে বাংলা এখানেই শিল্পীর ইজেলে
ছড়িয়ে যায় রঙ—বাদামী, হলুদ, সবুজ, আধো নীল
আর কোটা সূর্যের মতন
জীবনের যে স্বপ্ন আকাশ-নীলিমায়
বুদ্বুদ্ বিপুর মতন শুকতারায় রেখে গেল
জন্মান্তরের বাসনার আলো।
এই বাংলায় ফিরে এসে যার শিশির হয়ে
জীবনের ছন্দ খুঁজে পেল !

অজানা

বুলু ঘাটুয়া

বিপুল তোমার বলয়ের কী বা
জানি আমি, হে ধরণী !
বিস্মিত চোখে নেহারি তোমায়
অম্বরে আমি নমি ॥
তোমার লালিত আপনার জন
সুখী দুঃখী যত সব,
তোমার স্নেহের সাগরে যে তোলে
জন কল্লোল রব ॥
মোদের জন্ম, মোদের মৃত্যু
তোমার শীতল কোলে,
আসা ও যাওয়ার সেই পথে জানি
যাব মোরা একা চলে ॥
তোমারে যে তাই, জানিবারে চাই
আমার সাধ্য মত,
আর অজানার রহস্য যাতে
রাখিও না অবিরত ॥

চাঁদির জুতোয় জাতির বলেদ

কালোদন মুখোপাধ্যায়

দুপুর গড়িয়ে বিকেল
বিকেল গড়িয়ে সন্ধে
কোলকাতায় আলো নেই—
অন্ধকার . —..... ।
মেয়েটা .....পেটের জ্বালায়
জাতির বলেদকে কলা দেখিয়ে
চাঁদির জুতোয়
ভাইবিনের আড়ালে
জাতককে জন্ম দিল ফুটপাতে !

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(নয়)

ধীরে ধীরে আমার মন আরো সাহিত্যের দিকে চলে গেল। বাড়ীতে সেই সময় তিনটি নামকরা মাসিক কাগজ আসত।

- প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও মানসী ও মর্ম্মবাণী এই তিনটি মাসিক কাগজেই মনের খোরাক দিয়ে ঠাসা।

প্রবাসী কাগজের সম্পাদক সুখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ভারতবর্ষ কাগজ স্থাপন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু তাঁর অকাল বিয়োগ হওয়াতে জলধর সেনকে সম্পাদক করে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্স এই কাগজ চালাতেন। আসল কাজের কাজি ছিলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

মানসী ও মর্ম্মবাণী হচ্ছে মহারাজ মণীন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মিলিত সাহিত্য কমল।

এই তিনটি কাগজেই নানারকম পড়িবার মতো বস্তু থাকত। নানারকম গল্প বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দেশ বিদেশের কথা, নামকরা লেখকের উপন্যাস, আবিষ্কারের কাহিনী, সারগর্ভ নিবন্ধ, কবিতা, আলোচনা, কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

এই কাগজগুলি কিন্তু ছোটদের জন্য নয়। আর ছোটদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হত। কিন্তু অভিভাবকেরা যখন অনুপস্থিত থাকতেন তখন আমি লুকিয়ে এই মাসিকপত্রগুলি অধিকার করতাম। তখনকার দিনে 'প্রবাসী' কাগজ পড়তে না পারলে মনে হয় যেন জীবনে কি একটা বাকী রয়ে গেল। বিশেষ করে "বিবিধ প্রসঙ্গ" না পড়লে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেতো। এছাড়া প্রবাসীতে আবার ছোটদের জন্যে একটি বিশেষ বিভাগ প্রকাশিত হত। তার নাম দেওয়া হয়েছিল— "ছেলেদের পাতাড়ি"।

আমার বন্ধু সুনির্মল বসু এই ছেলেদের পাতাড়িতে কবিতা লিখত। আমরা অবাক হয়ে পড়তাম আর ভাবতাম,—ছাপার অক্ষরে ওর নাম বেরিয়েছে! সুনির্মল একেবারে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে।

মোটকথা—প্রবাসী, ভারতবর্ষ এবং মানসী ও মর্ম্ম-বাণী সেই সময়ে আমাদের মন গঠনে যে দায়িত্ব নিয়েছিল, —সে কথা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

সেই সময় পাঠ্য বইয়ের চাইতে অপাঠ্য বই-ই আমাদের মন কেড়ে নিত বেশী।

ওদিকে তিনটি মাসিক পত্রিকা—আর এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে শরৎচন্দ্রের বই, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্দাকিনীর সব গল্পের বই পড়তাম।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পেলেই পড়তাম। সেগুলো এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যেতো।

আর পড়তাম কবি সত্যেন দত্তের কবিতা। এই সময়ে প্রবাসীতে তাঁর অনেক কবিতা ছাপা হত। আর একটা নেশা তখন হয়েছিল।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে নানা সভা-সমিতিতে যোগদান করা।

কোথায় কোন সাহিত্যিক বক্তৃতা দিচ্ছেন, কোথায় কোন মনীষী বা ঐতিহাসিক কোন্ আবিষ্কারের কথা বলছেন, কিম্বা কোন্ হলে কোন্ নামকরা ব্যক্তির স্মৃতিসভা হচ্ছে, এই সব সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া একটি অবশ্যকর্ত্তব্য বলে পালনীয় ছিল।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" অনেক সাহিত্য সভা হত। ওখানে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি বক্তৃতা করতেন।

সুযোগ পেলেই ওখানে গিয়ে হাজির হতাম। অনেক কাগজপত্র, মাসিক আর বই দেখবার সুযোগ পেতাম। তা ছাড়া নাম করা লোকদের বক্তৃতা শোনারও দুর্লভ সৌভাগ্য হত। অনেক ছবি থাকত দেয়ালে।

কোন্ সাহিত্যিক দেখতে কেমন—সে সম্পর্কেও ওই বয়েসে দারুণ কৌতূহল ছিল।

একজন বাবরী চুলওয়ালা মানুষকে আমি ধরে নিয়েছিলাম—ইনি কবি সত্যেন দত্ত।

পরে জানতে পারলাম—ইনি একজন গায়ক। উপাধি বড়াল।

এই জাতীয় ভ্রান্তি-বিলাস প্রায়ই ঘটত। প্রতিদিন হেদুয়াতে একটি গল্পের আসর বসত। তিনি খুব মজা করে গল্পকথা বলতেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তাঁর গল্প বলার ধরণটি চিত্তাকর্ষক। আজ এতদিন বাদে তাঁর নামটি ভুলে গেছি। তাঁর গল্প বলা কিন্তু একদিনে শেষ হত না। সে ছিল ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মতো। রাজপুত্র, রাজকন্যা, কিংবা দৈত্যিদানব যে গল্পকে কোথায় উধাও করে নিয়ে যেতো সে কথা ভাবতে খুব মজা লাগত।

সন্ধ্যা উতরে যেতো, রাত্রি গভীর হয়ে আসত। তখন তিনি তাঁর ঝুলি-ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে বলতেন, আজ এই পর্যন্ত। আবার কাল বিকেলে গল্প শুরু করা যাবে।

সারা রাত আমাদের দারুণ চিন্তায় ঘুম হতো না। পক্ষীরাজ ঘোড়া রাজপুত্র-রাজকন্যাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে! দানবটা ওদের পেছন পেছন ধাওয়া করবে কিনা! ধরে ফেললেই তো সব মাটি!

অনেক শ্রোতা সেই বুড়ো কথকের গল্প শোনার জন্য হেদুয়াতে প্রতিদিন বিকালে জড় হত।

সেই বুড়ো মানুষটি একটি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করতেন।

অতি সহজেই তাঁর গল্প জমে উঠত। ক্রমশ তাঁর শ্রোতার সংখ্যা বাড়তে লাগলো। শেষে এমন দাঁড়ালো যে, ছেলেমেয়ে, বয়স্কলোক, এমন কি প্রবীণ মহিলারা অবধি ভীড় করতেন।

আরো একজন বুড়ো মানুষ হেদোতে এসে বক্তৃতা দিতেন। তিনি বেদ সম্পর্কে বলতেন।

এই ভদ্রলোকের বক্তৃতা শুনতেও অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এসে জড় হতেন।

গোল দীঘিতেও আমরা অনেক বিচিত্র ব্যক্তির সন্ধান পেতাম। তাঁরা কেউ পাঁচালী শোনাতেন, কেউ গান শোনাতেন। কেউ বা রাজনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করতেন।

আসল রাজনীতির আসর ছিল মির্জাপুর ফোয়ার, এখন যে স্থানের নাম শ্রদ্ধানন্দ পার্ক।

এখানে আমরা অনেক রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনেছি। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা প্রথম আমি এইখানেই শুনি। তখন তিনি তরুণ যুবক।

তাঁর সম্পর্কে অনেক কাহিনী ছাত্রমহলে শোনা যেত। তিনি আই.সি.এস পাশ করেছেন, কিন্তু বৃটিশের গোলামী করবেন না বলে চাকরী গ্রহণ করেন নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্য হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ওটেন সাহেব ভারতবর্ষের ছেলেদের গালাগাল করেছিলেন বলে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই সব মজাদার কথা আমরা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে শুনতে পেতাম।

এই শ্রদ্ধানন্দ পার্কেই আমরা ভাগবতজ্বর চক্রবর্তীর বক্তৃতা শুনেছি। তিনি একটি উড়নী গায় দিয়ে আসতেন বক্তৃতা দিতে। বলতে বলতে ভাবাবেগে তিনি কেঁদে ফেলতেন। তারপর সেই উড়নী দিয়ে বারে বারে চোখের জল মুছতেন।

একবার শোনা গেল, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মারা গেছেন। বিডন স্কোয়ারকে তখন কোম্পানীর বাগান বলা হত। সেইখানে শোকসভা হবে। ছাত্রদল খালি পায়ে সেই বিডন স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হল।

আমরা স্কটিশের ছেলেরাও সেই দলে গিয়ে যোগদান করলাম।

সারা বিডন স্কোয়ার মানুষের কালো মাথায় ভরে গেল।

বিপিন পাল এসে একটা বেঞ্চের উপর উঠে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

তখনকার দিনে মাইক ছিল না।

কিন্তু দীর্ঘদেহী বিপিনপালের কণ্ঠস্বর একেবারে গম্‌গম্‌ করতে লাগ্‌লো।

তখনকার দিনে লাল-বাল-পাল ওই তিনটি নাম রাজনীতির জগতে খুব প্রচলিত ছিল। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক—আর আমাদের বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিন পাল তিলক সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। এখন আর সে সব কথা মনে নেই। শুধু এই কথাটা মনে আছে—সেই সময় কলকাতার ছেলেরা অশৌচ পালন করেছিল।

এই লোকমান্য তিলকই যে শিবাজী উৎসবের সূচনা করেছিলেন—সে কথা সকলেরই মনে আছে।

রবীন্দ্রনাথ শিবাজী মহারাজ সম্পর্কে এক দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। তবু মারাঠার ওপর বাংলার লোকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন না—বর্গীদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করে। অনেকে তাই মহারাষ্ট্রের নিন্দা করতেন।

আর একদিন হঠাৎ শোনা গেল—গান্ধীজী কল্‌কাতায় আসছেন। বক্তৃতা করবেন।

আমরা কয়েকজন মিলে হাওড়া ব্রীজের ওপর বসে রইলাম।

চারদিক লোকে লোকারণ্য। এই আসছেন এই আসছেন ধ্বনি শোনা গেল। ক্রমশ রাত বাড়তে লাগল।

তখনকার দিনে বাড়ীর ভয় ছিল। এত রাত পর্যন্ত বাড়ীর বাইরে থাকা—না জানি কপালে আজ কি উত্তম-মধ্যম আছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমরা কয়েকজন হতাশ হয়ে গেলাম।

তারপর কয়েকজন চীৎকার করতে লাগল, ওই ত গান্ধীজীর গাড়ী চলে গেল—

একদিকে মহম্মদ আলি—একদিকে সওকত্‌ আলি—! আমরা কিন্তু সেই জনারণ্যে কিছুই দেখতে পেলাম না। তাই হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

আরও কয়েক বছর পরের ঘটনা।

তখন [illegible] অসহযোগ আন্দোলন চলছে। হঠাৎ শোনা গেল গান্ধীজী হাওড়া ষ্টার থিয়েটারে আসবেন মেয়েদের কাছ থেকে গহনা, টাকা সংগ্রহ করবেন।

তখন আমি হাওড়া ষ্টার থিয়েটারের উল্টো দিকে একটি বাড়ীতে থাকি।

দেখলাম, দলে দলে মেয়েরা সব হাওড়া ষ্টার থিয়েটারে গিয়ে ঢুকছে।

আমি দেখতে খুব ছোট-খাটো ছিলাম। সেই মেয়েদের ভিড়ে হাওড়া ষ্টার থিয়েটারে ঢুকে পড়লাম।

গিয়ে বারিদের পেছন পেছন গিয়ে একেবারে দোতলায় গিয়ে হাজির হলাম।

কিছুক্ষণ বাদে কয়েকজনের সঙ্গে গান্ধীজী এসে মঞ্চে হাজির হলেন।

তাঁর সামনে একটি লাল সুন্দর চাদর বিছিয়ে দেয়া হল। গান্ধীজী হিন্দীতে মেয়েদের বললেন।

মেয়েরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সেই চাদরের ওপর গহনা খুলে খুলে দিতে লাগল।

প্রচুর ভীড় হয়েছিল।

যারা দূরে দূরে ছিল তারা সেইখান থেকেই চুড়ি, সোনার বালা, তাবিজ, অনন্ত সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। মঞ্চের লোকগুলো সেই গহনা কুড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের চাদরের ওপর রাখতে লাগলো।

এই দৃশ্য দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েরা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু গহনার মায়া কাটানো মুস্কিল!

এই মানুষটির মধ্যে কি মন্ত্র লুকিয়ে আছে যে, মেয়েরা এমন করে গহনাগুলো দান করতে পারল?

অবশ্য ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের পায়ে নৃপতিরা রাজত্ব পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেন।

যাই হোক মহিলাদের স্বর্ণ দান দেখে আবার লুকিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। আমার কাছে কোন স্বর্ণালঙ্কার ছিল না। তাছাড়া আমি নারীও নই। মনে মনে ভাবলাম আমি খুব বেঁচে গেছি।

যাক, যে কথা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।—বিভিন্ন নেতার মুখে বক্তৃতা শোনা।

কলেজ ষ্ট্রীটের অ্যালবার্ট হল ছিল এমনি এক বক্তৃতার আখড়া।

ওখানে যে কত জ্ঞানী-গুণী-মনীষীর বক্তৃতা শুনেছি—সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

—সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা শুনেছি—

—আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বক্তৃতা শুনেছি—

—মহম্মদ আলি-সৌকত আলির বক্তৃতা শুনেছি—

—বিধান রায়ের বক্তৃতা শুনেছি—

—সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছি—

জহরলালের বক্তৃতা প্রথম কোথায় শুনেছি ঠিক মনে নেই,

এই কলকাতার বুকে বিপিনপালের বক্তৃতা শুনেছি—

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর বক্তৃতা বহু জায়গায় শুনেছি—

এ ছাড়া—

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—

রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর বক্তৃতা—

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তৃতা—অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতা—

যে এল বাসান্তীর বক্তৃতা—সুনীতি চাটার্জির বক্তৃতা—

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা—বীরেনের বক্তৃতা—

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বক্তৃতা—

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা—হরেকৃষ্ণ মুখোর বক্তৃতা—

জ্যোতিষ্মতী গাঙ্গুলীর বক্তৃতা—নানা স্থানে শুনেছি।

সাহিত্যিকদের বক্তৃতা পরবর্তী জীবনে শুনেছি—

কবিশেখর কালিদাস রায়ের বক্তৃতা—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা—গুণধর সেনের বক্তৃতা

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বক্তৃতা—মন্মথমোহন বসুর বক্তৃতা

মোহিতলাল মজুমদারের বক্তৃতা—প্রিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

সজনীকান্ত দাসের বক্তৃতা—অচিন্ত্যকুমারের বক্তৃতা।

তারাশঙ্করের বক্তৃতা—সৌম্যেন ঠাকুরের বক্তৃতা

বনফুলের বক্তৃতা—অনেক শুনেছি—

কিন্তু তুমি কি পশুপতির বক্তৃতা!!!

বাজশেখর বসুকে কখনো মুখ খুলতে দেখি নি—

তিনি শুধু গোপনে কলম চালাতেন। [ক্রমশঃ]

Cable : SCRAPIRON

Phone : 22-8596

With Best Compliments Of

S. R. SYNDICATE

HOUSE FOR ALL TYPES OF SCRAPS

OFFICE :
5, CLIVE ROW, P.O. BOX No. 2502
CALCUTTA-700 001

নিমাই তার নাম

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

পরেশ সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(আঠারো)

একজন লোক এসেছে অদ্বৈতপুরীতে।

কেউ চেনে না তাকে। কোত্থেকে সে এসেছে, তাও কেউ জানে না। তবে লোকটিকে দেখলে ভক্ত বলেই মনে হয়। সে যেন ছাই চাপা আগুন। বাইরে ছাই থাকলেও তারই ভেতর থেকে আগুন যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

খবর পেয়ে অদ্বৈতাচার্য এলেন তার কাছে।

বললেন, মহাশয়ের নাম ? দেখে তো মনে হচ্ছে মহাশয় ভক্ত বৈষ্ণব।

জিভ কাটলে লোকটি। বললে, না, না, আমি অধম। অধমাধম।

আমি এলাম আপনার দর্শনে। আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনাকে দেখলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

কাছেই বসেছিল মুকুন্দ।

লোকটির কথা যেন তার বিশ্বাস হলো না। পরখ করার জন্য সে একখানা গানে টান দিলে। কৃষ্ণ গুণগান।

হঠাৎ যেন কি হলো ;

মুকুন্দর মুখে কৃষ্ণনাম শুনে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে। দু' চোখে বইলো জলের ধারা।

অদ্বৈতাচার্য তাকে টানলেন। মাথাটা তার নিজের কোলে নিলেন। লোকটির সঙ্গে তিনি নিজেও কাঁদলেন।

জলে জল মিললো।

মুকুন্দর গান তখনও সমান তালে চলেছে।

লোকটি আর কেউ নয়। ঈশ্বরপুরী।

ঈশ্বরপুরী হলেন বৈষ্ণবাচার্য মাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য। পরম ভাগবত, পরম বিদ্বান। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

দেশে দেশে ফিরেন তিনি কৃষ্ণকথা নিয়ে। কৃষ্ণের নাম প্রচারে। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর নবদ্বীপে আগমন।

সেদিন বেলা হয়েছে। ভোরের সূর্যটা পড়িয়ে পড়িয়ে আকাশের অনেকটা উপরে উঠেছে।

নিমাই তার টোল থেকে ফিরছিল।

পথে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে দেখা।

নিমাইকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন ঈশ্বরপুরী। থমকে দাঁড়ালো নিমাইও।

ঈশ্বরপুরী বললেন, ঠাকুর, তোমার নাম ?

এ প্রশ্নের জবাব নিমাইকে দিতে হলো না। জবাব দিলে আশ পাশের আর দশজন।

বললে, নিমাই পণ্ডিত।

তুমি সেই ? বলেই হঠাৎ থমকে গেলেন ঈশ্বরপুরী। মুখ থেকে আর তাঁর কথা বেরুলো না।

অনিমেষে তাকিয়ে রইলেন তিনি নিমাইয়ের মুখের দিকে।

নবদ্বীপে পা দিয়েই নিমাইয়ের কথা শুনেছেন ঈশ্বরপুরী। শুনেছেন, ঐ এক টুকরো ছেলের ভেতর রয়েছে পাণ্ডিত্যের অগাধ সমুদ্র। স্বভাবধর্মে সে সমুদ্র ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হলেও, তার গভীরতা অসীম।

এমন কি অদ্বৈতাচার্যও দুঃখ করে বলেছেন, অমন ছেলেকে যদি আমাদের মধ্যে পেতাম, তাহলে প্রেমভক্তির বান ডাকতো এ নবদ্বীপে। কিন্তু তা-কি হবে ? নিমাই যে চঞ্চল, বড়ো চঞ্চল।

নিমাইকে দেখেই অদ্বৈতাচার্যের এই আপশোষের কথা মনে পড়লো ঈশ্বরপুরীর।

তিনি দেখলেন, এই তরুণ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের আড়ালে প্রেমভক্তির এমন এক বলিষ্ঠ রয়েছে যা সারা দেশকে প্লাবিত করবে।

ঈশ্বরপুরীকে দেখে নিমাই নিজেও মুগ্ধ হয়েছিল।

তাই কথায় কথায় ঈশ্বরপুরীকে বললে সে : মহাশয় যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমি একটি প্রস্তাব করতে চাই।

ঈশ্বরপুরী একবার হাসলেন : নিঃসংকোচে সে প্রস্তাব তুমি করতে পারো।

নিমাই বললে, আমি তো বাড়ী ফিরছি। মহাশয়ও যদি এই দীনের পর্ণকুটীরে পা দিয়ে দুটো শুদ্ধ অন্ন গ্রহণ করেন তো ধন্য হই।

নিমাইয়ের আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে যেন তৈরী হয়েই ছিলেন ঈশ্বরপুরী। নিমাইয়ের প্রস্তাবে তাই তিনি বললেন, আনন্দে। আনন্দে আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম পণ্ডিত। চলো, একবার মায়েরও চরণ ধূলি নিয়ে আসবো।

নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। বাড়ির দরজায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই শচীদেবীকে ডাক দিলে সে, মা দেখো, আজ কাকে ঘরে নিয়ে এসেছি।'

কে রে? কাকে নিয়ে এলি? বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন শচীদেবী। নিমাইয়ের সঙ্গে সন্ন্যাসীকে দেখে ঘরকে দাঁড়ালেন। সন্ন্যাসীর মুখের সঙ্গে হয়তো একবার বিশ্বরূপের মুখটাকে মিলিয়ে দেখলেন। কিন্তু না, সন্ন্যাসী বিশ্বরূপ নয়। অন্য কেউ।

মায়ের অনন্ত স্নেহসিন্ধু হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়েই আবার নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

শচীদেবী সন্ন্যাসীর আপ্যায়নের আয়োজন করতে গেলেন।

(ঊনিশ)

নবদ্বীপে প্রায় মাসখানেক রইলেন ঈশ্বরপুরী। রইলেন গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে।

কিসের আকর্ষণ? কিসের আকর্ষণ এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে নবদ্বীপে বেঁধে রাখলো? সে কথা জানলো না কেউ। বুঝলো না কেউ। ঈশ্বরপুরী তাঁর সে উদ্দেশ্যটিকে মূল্যবান রত্নের মতো মনের গভীরে লুকিয়ে রাখলেন। বাইরের কেউ তা টের পেলো না।

প্রতি সন্ধ্যায়ই সভা বসে গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে। ধর্মসভা। সভার হন ঈশ্বরপুরী।

ঈশ্বরপুরী নিমাইকেও এ সভায় আসতে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

বলেছিলেন, এসো পণ্ডিত এসো, সন্ধ্যাবেলা এসো। নীরস ব্যাকরণ নিয়েই তো তোমার সময় কাটে। এসো, একটু কাব্যরস আস্বাদন করা যাবে।

কাব্য?

চোখ তুলে ঈশ্বরপুরীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, নিমাই। বলেছিল, কাব্য? কি কাব্য পড়েন আপনি?

আমারই লেখা—বলে হেসেছিলেন ঈশ্বরপুরী। বলেছিলেন, আমিই একখানি কাব্য রচনা করেছি পণ্ডিত। 'কৃষ্ণলীলামৃত' নাম। আমার বড়ো ইচ্ছে, তোমাকে শোনাই সে কাব্য। কি গো, আসবে নাকি?

যাবো। বলে যাবো নেড়েছিল নিমাই।

শুনে খুশী হয়েছিলেন ঈশ্বরপুরী। বলেছিলেন : হাঁ, আসবে বৈ কি! তোমার কতো বিদ্যে, কতো পাণ্ডিত্য! এ বিদ্যে আর পাণ্ডিত্য যদি রসধারায় স্নিগ্ধ না হলো তো কি পেলে তুমি পণ্ডিত? বলতে বলতে ঈশ্বরপুরীর গলাটি বুঝি একবার ধরে এসেছিল।

হাঁ, কথা রেখেছে নিমাই।

প্রতি সন্ধ্যায়ই সে গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে আসে। থাকে অনেক রাত পর্যন্ত।

ঈশ্বরপুরী কাব্য পাঠ করেন। নিমাই তা শোনে। তন্ময় হয়ে শোনে।

কথায় কথায় ঈশ্বরপুরীই একদিন বললেন, পণ্ডিত, আমার কাব্যে যদি কোন দোষ থাকে, তবে নিশ্চয়ই তুমি তা বলবে। সে দোষ জানবার জন্যেই তো তোমাকে এ কাব্য শোনাচ্ছি গো।

পুরীর কথায় জিব কাটলো নিমাই।

বললো ছিঃ, এ কি কথা বলছেন আপনি? আপনার রচনায় দোষ থাকবে কেন? আপনার কাব্যধারা তো

ভাগীরথীর মতো ছন্দে ছন্দে বেঁচে চলেছে। তা ছাড়া—, বলতে বলতে থামলো নিমাই। কি যেন ভাবলো।

তারপর বললো : তা ছাড়া ভক্ত যেখানে কৃষ্ণের বর্ণনা করেন, সেখানে পাপী ছাড়া কে আর তার দোষ ধরবে? ভক্ত যা রচনা করবে, তাতেই কৃষ্ণের প্রীতি। সেখানে 'বিকৃবে'র জায়গায় 'বিকায়' বললেও ক্ষতি নেই।

তা আমি জানি পণ্ডিত।

তবে?

তবে কি জানো পণ্ডিত, যে কাব্য আমি লিখেছি, তাতে দোষ থাকলে মনটায় খোঁচা লাগবে হে।

একটু থেমে ঈশ্বরপুরী আবার বললেন, না, না, দোষ যদি কিছু থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি তা বলবে। তাতে তোমার কোন দোষ হবে না।

একদিন।

ঈশ্বরপুরী তাঁর কাব্য পাঠ করছেন। সন্ধ্যা উতরে গিয়ে রাত অনেকটা হয়েছে। নবদ্বীপের পথ প্রায় জন শূন্য। দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসছে। বোধ হয় মঙ্গলচণ্ডীর গান। কোথাও গানের আসর বসেছে।

তন্ময় হয়ে কাব্য পাঠ করছেন ঈশ্বরপুরী।

শুনছ।

নিমাইয়ের কথায় পুঁথি থেকে চোখ তুললেন ঈশ্বরপুরী। নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

বললেন, কিছু বলবে পণ্ডিত?

হাঁ।

বলো।

যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলতে চাই।

নিমাইয়ের কথায় হাসলেন ঈশ্বরপুরী। সে হাসির ঢেউ ছড়িয়ে গেলো তাঁর মুখমণ্ডলে।

বললেন, কথা বলবে? একটা কেন, হাজারটা বলো না। তাতে মনে করার কি আছে?

কাব্যের একটি অংশের প্রতি ঈশ্বরপুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নিমাই বললো, এই যে, এখানটায় আপনি আত্মনেপদী ধাতু করেছেন। কিন্তু সেটা কি ঠিক? ধাতু এখানে পরস্মৈপদী হবে না?

পুঁথি থেকে আবার চোখ তুললেন ঈশ্বরপুরী।

বললেন, এই কথা? তা বেশ তো, আজ তো অনেক রাত হলো। কাল এ নিয়ে আলাপ হবে। কাল এসো তুমি।

নিমাই সেদিনের মতো বাড়ি চলে এলো।

এই যে, এসো পণ্ডিত।

গোপীনাথ আচার্যের বাড়িতে পা দিতেই হেসে নিমাইকে আহ্বান করলেন ঈশ্বরপুরী।

বসতে বসতে নিমাই বললো, আজ একটু তাড়াতাড়িই এলাম। সেই ব্যাকরণের খটকাটা এখনও মনে খচ্‌খচ্‌ করছে।

তাই নাকি হে!

বলে হাসলেন ঈশ্বরপুরী।

হেসে বললেন, তোমার ব্যাকরণের বেড়া কিন্তু আমি ডিঙিয়ে এসেছি।

কি রকম? নিমাইয়ের চোখে কৌতূহল-দৃষ্টি।

এই দ্যাখোনা, কাল তুমি যাকে পরস্মৈপদী বলে গেলে আজকে আমি তাকে আত্মনেপদী করে ফেলেছি। বলে ঈশ্বরপুরী সেই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা শুরু করলেন।

বিস্মিত, বিমোহিত হয়ে ঈশ্বরপুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নিমাই। নির্বাক। নির্বিকার। ঈশ্বরপুরীর যুক্তগুলি যেন তার মনের উপর দিয়ে ঝরণার মতো ঝরে চলেছে।

(ক্রমশঃ)

ঘর ছাড়া যে মন, কোনো ঘরে সে শোয় মানে না। বাঁধন ছেঁড়া যে পা, কোথাও আর সে শেকল পরে না। নীল আকাশের মুক্ত বিহঙ্গের মতো সে পথের নেশায় চলে। এই চলাতেই তার আনন্দ।

নবদ্বীপ থেকেও তাই আবার পাততাড়ি গুটোলেন ঈশ্বরপুরী। কিন্তু যাবার আগে তিনি কি নিমাইয়ের মনের রং বদলে দিয়ে গেলেন?

সেদিন এ প্রশ্ন উঠেছিল অনেকের মনে। অদ্বৈতাচার্যের। শ্রীবাসের। আরও অনেকের।

কিন্তু সেদিনও এর সহজ জবাব খুঁজে পায় নি কেউ। তবে জবাব খুঁজে না পেলেও আশা জেগেছিল সকলের মনে। গোপীনাথ আচার্যের আঙিনায় একটি মনের নিশ্চয়ই শুভবদল হয়েছে। নইলে প্রতি সন্ধ্যায় সে সেখানে গিয়ে ভীড় জমাবে কেন? আর কৃষ্ণ-কথাই বা শুনবে কেন প্রহরের পর প্রহর?

অদ্বৈতাচার্য সেদিন শ্রীবাসকে সেই কথাটাই বললেন। শ্রীবাস এসেছিল সন্ধ্যায়। চোখ-মুখে একটা উদ্বেগের ছাপ। কপালে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

সেই শ্রীবাসই আচার্যকে বললো, আচার্য দেব! মন্দিরের দাওয়ায় প্রায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন অদ্বৈতাচার্য। চোখ বুজে কি যেন চিন্তা করছিলেন। শ্রীবাসের ডাকে চোখ খুললেন।

বললেন, কে? শ্রীবাস? এসো, বসো এখানে। বসতে বসতে শ্রীবাস বললো, কতোদিন? আর কতোদিন অপেক্ষা করবো আচার্য? মানুষের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে?

হাসলেন অদ্বৈতাচার্য।

বললেন, শ্রীবাস, যে সয়, সে-ই রয়। আমাদেরও সইতে হবে। আরও আরও সইতে হবে।

কিন্তু আর যে পারি নে আচার্য।

আচার্য বললেন, পারতে হবে শ্রীবাস। ঝড় দেখে হাল ছাড়লে তরাডুবি অনিবার্য। হাল সেখানে শক্ত করে ধরতে হবে। ঝড় তবেই হার মানবে। তরী গিয়ে তীরে লাগবে।

তারপর একটু থেমে একটু ভেবে অদ্বৈতাচার্য বললেন, বড় অধীর শ্রীবাস, প্রশান্তি চিরদিনের। মন বাঁধো, মন বাঁধো শ্রীবাস, আমি কূল পেয়েছি। আলো দেখছি। আর আমাদের ভয় নেই।

অন্ধকার পথ দিয়ে কে যেন আসছে। অদ্বৈতাচার্য দেখছেন, অথচ চিনতে পারছেন না।

কে? কে আসছে এ সময়?

বললেন, কে?

নিমাই।

নিমাই! আরে, এসো। কি ব্যাপার? তুমি এ সময়ে? তোমার দাদা আসতো। তুমি তো এখানে আসো না।

আচার্যের কথা ঠিক। অদ্বৈতাচার্যের কাছে যায় না নিমাই। তাঁকে সে ভাল চোখে দেখে না। নিমাইয়ের ধারণা, আচার্যের পরামর্শেই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়েছে। তাদের ছেড়ে গেছে। কাজেই আচার্যকে সে ভালবাসে না।

আচার্যের প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে গিয়ে সে তাই বললো, পুরীজী চলে গেছেন?

হুঁ।

ও: ..... বলে নিমাই যে পথে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে চললো।

অদ্বৈতাচার্য ডাকলেন, নিমাই, শুনে যাও।

নিমাই সে ডাকে সাড়া দিলো না। একটা বকুল গাছের পাশ দিয়ে পথটা বাঁক নিয়েছে। সেই গাছের সামনে বাঁক নিয়ে সে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

অদ্বৈতাচার্য চোখ ফিরালেন সে দিক থেকে।

পিদিমের ম্লান আলো জ্বলছে। সে আলোর সামনে পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে শ্রীবাস।

আচার্য এবার শ্রীবাসের মুখের উপর তাঁর দৃষ্টি ফেললেন। হাসলেন।

বললেন, শ্রীবাস, কিছু বুঝলে?

পাথরের মূর্তি যেন নড়ে উঠলো।

বললো, কি?

নিমাই?

সে তো চলে গেলো।

আচার্য তাঁর কাশফুলের মতো পাকা চুলে ভরা মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'রং ধরেছে শ্রীবাস, এবার রং ধরেছে'।

শ্রীবাস কিছুই বুঝতে পারলো না। হা ক'রে শুধু তাকিয়ে রইলো অদ্বৈতাচার্যের মুখের দিকে।

অদ্বৈতাচার্যই আবার বললেন, 'সব জারিজুরি স্রোতের কুটোর মতো ভেসে গেলো শ্রীবাস, দেখলে না, নিমাইয়ের দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে? সেখানে কিসের ছায়া? দুটি চোখের দৃষ্টি কতো দূরে উড়ে গেছে?

শ্রীবাস বললো, 'কৈ, আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি।

বুঝবে, শ্রীবাস ক'দিন পরেই বুঝবে। মনের রংয়ে রং খেলতে সে-ও আমাদের সঙ্গে আসবে।

একটু থেমে, দু'হাতে বার করেক করতালি বাজিয়ে আচার্য আবার বললেন, 'আনন্দ করো শ্রীবাস, আনন্দ করো। অন্ধকারের পথে আলো, রাতের শেষে দিন। নবদ্বীপে এবার সুদিন আসছে। নবদ্বীপ এবার কৃষ্ণ নামে, কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা।' বলতে বলতে অদ্বৈতাচার্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে আনন্দে নৃত্য শুরু করলেন।

শ্রীবাস এই আপন ভোলা আচার্যকে জানে। অদ্বৈতাচার্যের নৃত্য দেখে তাই সে একটুও বিস্মিত হলো না।

(ক্রমশঃ)

শিশু-সাহিত্য

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

শিশু-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার আগে ভাবতে হবে শিশু-সাহিত্য সৃষ্টি হলো কেন? শিশুমনে অবিরত নানা প্রশ্ন জাগে। সেই কৌতূহলী মনের চাহিদা মেটাতে এবং শিশুকে সংস্কৃতিবান নাগরিক করে গড়ে তুলতেই শিশু সাহিত্যের সৃষ্টি। ছোটরা পড়াশুনা করতে চায় না। তাদের মন সেই পড়াশুনার দিকে আকৃষ্ট করতেই গল্প ও ছড়া রচিত হয়েছে, ছবি যুক্ত করা হয়েছে তাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য।

শিশুর যখন পড়ার বয়স নয়, শুধু শোনার বয়স, কথার সুরটুকুই যখন তার কানে আনন্দের ঢেউ পৌঁছে দেয় তখনই তার জন্য ঘুমপাড়ানী ছড়ার সৃষ্টি। কোন্ অতীতের নাম-না-জানা ঠাকুরমা, দিদিমা আদরের নাতি-নাতনিদের এই ছড়া শুনিয়েছিলেন তা আজ আমরা জানি না। মুখে মুখে সেই ছড়া ঘরে ঘরে চলে আসছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

তারপর শীতের আলোছায়ার অন্ধকারে বসেছে রূপকথার আসর। ঠাকুরমার কোলে মাথা রেখে উদ্গ্রীব শিশুমন পক্ষীরাজে চেপে ছুটেছে কল্পনার তেপান্তরে—ঘুমপরীর দেশে। সে-ও শিশুসাহিত্য, তবে কথকতা-সাহিত্য, বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে তা ধরা পড়েনি।

আমরা যে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি, তা বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরে যা ধরা পড়েছে, তা ই।

শিক্ষাবিদ্ মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—"শিশুমন বড় চঞ্চল, তারা পড়তে চায় না—অক্ষর চিনতেও চায় না। সেইজন্য শিক্ষাবিদেরা নানা উপায় উদ্ভাবন করেন শিশুচিত্তকে পুস্তকের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য।" আমাদের দেশেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো শিশুসাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে পাঠ্য বই থেকেই। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও তত্ত্বনারায়ণের 'হিতোপদেশ' ছোটদের শিক্ষার জন্যই রচিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের জাতকের গল্পগুলিও লোকশিক্ষার জন্যই কথিত।

সে হলো আগেকার কালের সংস্কৃত ও পালি-প্রাকৃতের কথা। এখনকার বাংলাভাষায় ছোটদের বই প্রথম প্রকাশিত হয় 'স্কুল বুক-সোসাইটি' থেকে। প্রথম উল্লেখযোগ্য বই রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (১৮২০)। তারপর বিদ্যাসাগর মশাইয়ের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) বাংলা গদ্যকে একটা বলিষ্ঠ রূপ দিল। ছোটদের জন্য গদ্যে লেখা প্রথম অতি সহজ সরল গল্প বর্ণপরিচয়ের 'ভুবন'। এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার লেখা দিলেন ছোটদের শিক্ষার জন্য তিনখণ্ড 'শিশুশিক্ষা' নিয়ে (১৮৪৯)।

এবার 'বঙ্গভাষা অনুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হলো। তাঁরা 'রবিনসন ক্রুসো' ও 'পেন্সপীরেরে' অনুবাদ করলেন। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'হানস এণ্ডারসেনে'র যে অনুবাদ করলেন তাতে একটা নতুন ব্যাপার দেখা গেল, বইয়ের মধ্যে রামধন দাসের 'উদ্ভট্ কাট্' ছবি (১৮৬০)।

প্রথম কিশোর পাঠ্য উপন্যাস বেরুলো কাশীদাস হালদারের 'বিজয় বসন্ত'। মৌলিক রচনা। সে সময় বইখানির ১৪টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ছোটদের শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানের বই ও জীবনচরিতও বেরুচ্ছে। বেরুচ্ছে প্রাণীতত্ত্ব ও জীববিদ্যার বই। ছোটদের প্রাথমিক বিজ্ঞান শেখানোর চেষ্টা চলছে ১৯ শতকের গোড়া থেকেই।

তখনকার কবিতার বইয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। ফার্সী কবিতার এক অনুবাদ বেরুলো 'হিতোপাখ্যানমালা'। এ সময়কার বেশীর ভাগ কবিতাই ছোটদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্য। তবে রাজকৃষ্ণ রায়ের রচিত 'শিশু কবিতা' একটু ভিন্ন ধরনের ছন্দে লেখা দিল,—সে সব কবিতা ছোপাও কলম কালি কাগজ বইয়ের উপর লেখা (১৮৮১)।

এরপর রজনীকান্ত গুপ্তের 'আর্যকীর্তি' (১৮৮৭) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পদ্মমধু' (১৮৮৯) খুব জনপ্রিয় হয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকার নতুন প্রচেষ্টা করলেন 'হাসি ও খেলা' বইয়ে (১৮৯১)। লেখক ভূমিকায় বললেন—'এ বই স্কুলে পড়ানোর জন্য নয়, ছেলেরা বাড়ীতে পড়বে।' বইখানি লেখা হয়েছিল কথ্যভাষায়, যা এ পর্যন্ত হয় নি।

এই যুগের শিশুসাহিত্যে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য,

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ সেন, রাজকৃষ্ণ রায় ও যোগেন্দ্রনাথ বসু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলেদের রামায়ণ' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' তখন ঘরে ঘরে সমাদর পায়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'সাতভাই চম্পার' নামকরণ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য লিখলেন 'শিশু' এবং ছোটদের রাজা সাজবার সুযোগ করে দিলেন 'মুকুটে'।

যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি' বেরুলো (১৮৯৯)। ছড়া দিয়ে ছোটদের অক্ষর চেনাবার এই চেষ্টা শিশুসাহিত্যে বিস্ময় সৃষ্টি করলো।

১৯শতক পার হয়ে আমরা ২০ শতকে এসে পৌঁছালাম।

এবার সহজভাষায় 'জীবজন্তুর' কথা শোনালেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৯০১)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'আষাঢ়ে গল্পের' আসর জমালেন (১৯০১)। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রায় ঐতিহাসিক কাহিনী বললেন 'সেকালের কথায়' (১৯০৩)। মনোমোহন সেন অতি সরল যুক্তাক্ষর বর্জিত ছড়ার বই লিখলেন 'খোকার দপ্তর' প্রথমভাগে (১৯০৭), আর দ্বিতীয়ভাগে ছড়ার মাধ্যমে যুক্তাক্ষর শেখালেন। তারপর হাসির ছড়া লিখলেন 'মোহনভোগ'।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' বেরুলো যত রাক্ষস-খোক্কসের গল্প নিয়ে (১৯০৭)। অপরূপ ছবিসহ সাবলীল লেখা। প্রথম রঙীন ছবি ছাপা হলো এই বইয়ে। দক্ষিণারঞ্জনের অনুসরণে বেরুলো সীতাদেবী ও লাবণ্যদেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা'। গ্রিম ও এণ্ডারসেনের গল্পের ভাবানুবাদ বেরুলো শিবনাথ শাস্ত্রীর 'উপকথা' (১৯০৮) এবং জাপানী গল্পের ভাব নিয়ে লিখলেন যমিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 'জাপানী কানুন' (১৯০৮)। উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' বেরুলো (১৯১০) সালে। তারপরেই ছোটদের আসরে দেখা দিলেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, বরদাকান্ত মজুমদার, সত্যচরণ চক্রবর্তী, কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, অবিনাশ চন্দ্র দাশগুপ্ত ও শতদলবাসিনী বিশ্বাস। শতদলবাসিনীর 'বেহুলার কাহিনী' তখনকার দিনে বেশ নাম করেছিল।

রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র নিয়েই এতদিন লেখালেখি চলছিল, এবার 'ভারত গৌরব গ্রন্থমালা' বেরুলো মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে—বুদ্ধ, অশোক, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি।

হরপ্রসন্ন দাশগুপ্তের হাসির কবিতার বই বেরুলো —রাঙ্গলা (১৯১৬)। এই সময়েই অনুবাদের আসরে দেখা দিলেন তুলসীচরণ রায় 'টমকাকার কাহিনী', 'ওডিসি' ও 'ইলিয়াড' নিয়ে। প্রিয়ম্বদা দেবী কার্লো কলোডির 'পিনোকিওর' ভাবানুবাদ করলেন 'পঙ্কুলাল' নামে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপলের গল্প' ও 'ক্রিসমস ক্রুসো' প্রকাশিত হলো। সুখলতা রাওয়ের 'আরো গল্প' ছোটদের হাতে এলো (১৯১৭) সালে।

জলধরানন্দ রায় দেখা দিলেন বিজ্ঞানের কথা নিয়ে। তাঁর প্রথম বই বেরুলো 'গ্রহনক্ষত্র' ১৯১৮ সালে। তারপর বেরুলো 'লোকামাকড়' (১৯১৯), পাখপাখালী (১৯২১), ব্যাঙ ব্যাঙাপাখা (১৯২২) ও বাংলার পাখী (১৯২৩)। অনেক ছবি দিয়ে সাজানো সব বই, ছবিগুলি আঁকলেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্র। এঁর ধারাই পরে অনুসরণ করেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ক্ষিতীন্দ্রবাবু বিজ্ঞানকে গল্প বলার ধরণে নিয়ে আসেন, আর দেবীবাবু সবটাই বলেন গল্পচ্ছলে।

এবার রূপকথার আসর জমিয়ে তুললেন সত্যচরণ চক্রবর্তী 'ঠাকুরমার ঝোলা' (১৯১৬), 'ঠাকুরদার ঝোলা' (১৯২০) ও 'ঠানদিদির গল্প' নিয়ে। শিবরতন মিত্র এলেন 'পাখীর কথা' (১৯১৯), 'বিশির কথা' (১৯৩৩) ও 'বনকথা' নিয়ে—সবই গ্রাম্য লোককথার সংগ্রহ। কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত পর পর সাতখানি রূপকথার বই করলেন পূর্ববঙ্গের লোককথা সংগ্রহ করে (১৯২৩-১৯৩১)। এসবকার সব বইয়েই ছবির প্রাচুর্য। এঁদের ধারাই পরে অনুসরণ করেন নরেন্দ্র দেব, প্রিয়ম্বদা রায়, অমিয় নিয়োগী ও রাধারাণী দেবী।

১৯২৪ সালে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত দশ খণ্ডে ছোটদের জন্য বিশ্বকোষ বের করতে সুরু করলেন—'শিশু ভারতী'।

কয়েক বছর পরে তার সঙ্গে একত্রিশ খণ্ডটি সংযোজন করেন। প্রায় চল্লিশ বছর পরে আর একখানি 'ছোটদের বিশ্বকোষ' পাঁচ খণ্ডে সম্পাদনা করেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

অপরূপ মিত্র তাঁদের ঐতিহাসিক কাহিনী লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—'রাজকাহিনী'। পরে রাজস্থানের কাহিনী নিয়ে আরেকখানি বই বেরোয় সতীশচন্দ্র ঘটকের 'রাজপুত কাহিনী' নামে। তারপর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'রাজা বাহাদুর' (১৯২১), 'হরকরা' (১৯২২) ও 'শিবাজী' (১৯২৩)। আরো পরে এলো যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'যাঁরা ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী' ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পঞ্চনদের তীরে' ও 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাত'। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শিবাজীর সমকালীন গল্প লিখলেন 'সবাসিরের কাণ্ড'।

সাধারণ এক গ্রাম্য ছেলের জীবনের চিত্তাকর্ষক কাহিনী লিখলেন অখিল নিয়োগী—'বেদেরোজা' (১৯২৮)। তারপর খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখলেন 'তোফল সর্দার'। লাল ও কালো পিঁপড়েদের নিয়ে একখানি চমৎকার বই বেরুলো গিরীন্দ্র শেখর বসুর 'লাল কালো' (১৯৩০)।

এই সময় জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব এসে পড়লো শিশুসাহিত্যে। বিমল সেন ইংরাজের নির্যাতনের কাহিনী নিয়ে বের করলেন—'কুলকুরী'। বইখানি বাজেয়াপ্ত হলো। তিনি ম্যাকসিম গর্কির 'মাদার'-এর ভাবানুবাদও করলেন। দেশপ্রেমের কাহিনীতে শিশুসাহিত্যে তিনিই পথপ্রদর্শক। পরবর্তীকালে তাঁর ধারা অনুসরণ করেন মনীন্দ্র দত্ত ও হাসিরাশি দেবী।

সুকুমার রায় ছড়া, গল্প ও নাটিকার যে হাস্যরস পরিবেশন করেন, সেই ধারারই অনুসরণ করেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রলাল রায়, শিবরাম চক্রবর্তী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মনোরঞ্জনবাবুর অকাল মৃত্যু তাঁকে বেশী লেখার অবকাশ দেয়নি। রবীন্দ্রলালের হাসির গল্পের সঙ্কলন মাত্র চারখানি, কিন্তু শিবরামবাবুর গল্প বহু। শিবরামবাবুর গল্পের দুর্বর্ষন ও গোবর্ধন এবং নারায়ণবাবুর পটলডাঙ্গার টেনিদা ছোটদের কাছে অবিস্মরণীয়। শিবরামবাবু কয়েকখানি কৌতুক নাটিকাও লিখেছেন। তাঁর ঘরোয়া কাহিনী 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'ও নাম করা বই।

এযুগের কাহিনী রচনায় পরিচয় হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর 'যখের ধন' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। সাহিত্যের এই দিকটা দ্রুত পুষ্ট হয়ে ওঠে মৌনীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতির লেখনীতে। এখন সত্যজিৎ রায় ও রবিদাস সাহারায় এই দিকের খ্যাতিমান লেখক।

বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় অনেক সামাজিক ও করুণ রসের গল্প লিখেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণাদেবী, লীলা মজুমদার, আশা দেবী ও নলিনী দাস সরস ঘরোয়া কাহিনীতে এদের সমগোত্রীয়। নলিনী দাসের সব গল্পই নায়িকাপ্রধান।

জীবজন্তু-পাখী নিয়ে অরণ্য কাহিনীতে সুকুমার যে সরকারের তুলনা নেই। তাঁর অনুসারী লেখক এখনও দেখা দেয় নি।

সুকুমার রায়ের পদ্য ছড়া ও কবিতায় দীর্ঘদিন ছোটদের আসর জমিয়ে রাখেন সুনির্মল বসু। সেই ধারার অনুসারী উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, তবে তিনি বেশী লেখেন নি। সম্প্রতি দেখা দিয়েছেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাগুলি মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, তবে তিনি বেশী লিখে যেতে পারেন নি।

শিয়াল-পণ্ডিতের ছড়ায় নাম করতে হয় হরেন ঘটকের।

সাধারণ নানা ধরণের ছড়া ও কবিতায় দেখা দিয়েছেন অনেক নতুন প্রতিভা। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিভূষণ বিশ্বাস, সুকোমল দাসগুপ্ত, সরল দে, অশোক মুখোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত, প্রীতিভূষণ চাকী, সুধীন্দ্র সরকার, শৈল মিত্র, অশোক মিত্র, শৈলেন দত্ত, রাধা বসু প্রভৃতি।

ছোটদের অভিনয় করার সুযোগ কিন্তু এর মধ্যে কম হয় নি। ছোটদের জন্য বহু নাটিকা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত, মন্মথ রায় ও সুনির্মল বসু। দু-একখানি ছোটদের

নাটিকা লিখেছেন অনেকেই। রূপকথার নাটকে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন 'অরুণ-বরুণ-কিরণমালা'র লেখক শৈলেন ঘোষ।

কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী নিজেদের লেখা নিজেদের ছবি দিয়ে বের করেছেন : যতীন সাহা, নন্দু সাহা, বিভূতি রায়, শৈল চক্রবর্তী, ধীরেন বল ও সত্যজিৎ রায়। এরা যে শুধু শিল্পী নন ভাল লেখকও, এদের বইগুলিই তার প্রমাণ।

'অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট'-এর ভাবানুবাদ করেছিলেন মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর বিশ্ব-সাহিত্যের বহু বইয়ের ভাবানুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অনুবাদ করেন যতীন্দ্রনাথ মিত্র, ভাবানন্দ রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, অশোক গুহ, গিরিশ চক্রবর্তী, প্রভাতরঞ্জন দে, অমলকুমার ভাদুড়ি ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। জীবন কাহিনী লেখায় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।

ছোটদের জন্য সম্ভবতঃ প্রথম ভ্রমণকাহিনী বেরোয় মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চরকিক'। তারপর প্রবোধ-কুমার সান্যাল একে একে অনেকগুলি বই লেখেন। তারপর অন্নদাশঙ্কর রায়, রাধানাথ বিশ্বাস ও সুবোধ চক্রবর্তী। রাধানাথের বইগুলিই জনপ্রিয় হয় বেশী। সমসাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু ভ্রমণকাহিনী বেরোয়, তবে ছোটদের বই এদিকে বড় কম।

কথায় কথায় আমরা এই শতকের সপ্তম-অষ্টম দশকে এসে পড়লাম। শত বছর আগে শিশুসাহিত্যের যে ধারা নবে দেখা দিয়েছিল আজ তা পূর্ণ বেগে প্রবাহিত। বহু প্রতিভাধর এই ধারা পুষ্ট করে চলেছেন, কোন দিকই আজ ক্ষীয়মান নয়।

শুধু বই নিয়ে আলোচনা করলে শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে সব কথা বলা হয় না। সাময়িক পত্রিকা নিয়েও আলোচনা করা দরকার। ১৮১৮ সাল থেকে ছোটদের পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন থেকে—দিগ্‌দর্শন। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তারপর একে একে প্রায় ৫৮ খানি ছোটদের পত্রিকার নাম পাওয়া যায়। শিশুসাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করতে প্রতিটি সম্পাদকই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এক একখানি পত্রিকায় সমকালীন এমন অনেক লেখক লেখিকার সমাবেশ হয় যাঁদের সব লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

'পশ্যাবলি' পত্রিকায় প্রথম কাঠের ব্লক করে ছবি ছাপা হয় ১৮১২ সালে।

কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'বালক বন্ধুতে' প্রথম গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা ছাপা হয় ১৮৭৮ সালে।

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' প্রথম গ্রাহকদের চিঠিপত্রের জবাব ছাপতে শুরু করেন ১৮৮৪ সালে।

'বালক বন্ধু' প্রথম ছোটদের পাক্ষিক পত্রিকা (১৮৭৮)। তারপর আর তিনখানি পাক্ষিক পত্রিকার নাম পাওয়া যায়—'আদর্শ' (১২৩১) 'কিশোর অশিয়া' (১২৩৯) ও 'কিশোর বার্তা' (১২৪১)।

ছোটদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'রবিবার' প্রকাশিত হয় ১২৩৯ সালে। তারপর বেরোয় 'ছোটদের মহল' (১২৪৮), 'নতুন যাত্রা' (১২৫০), ও 'জানলিটের আসর' (১২৫৬)। এদের কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বর্তমানে একখানি ছোটদের সাপ্তাহিক পত্রিকা চলছে—কিশোর জগৎ। এটি শুরু হয়েছে প্রায় বছরখানেক আগে থেকে।

ছোটদের একখানি দৈনিক পত্রিকাও বেরিয়েছিল ১২৬৮ সালে যতেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পাদনায়, নাম 'কিশোর'। আটমাস চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ভারতে এইটিই ছোটদের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি ছোটদের মাসিক পত্রিকা বেরিয়েছে, সেগুলির মধ্যে এখন চলছে কলমল, পক্ষিরাজ, তেপান্তর, আনন্দমেলা, চাঁদমামা ও ছোটদের কথা। পুরানো পত্রিকাগুলির মধ্যে আছে মৌচাক, সন্দেশ, রামধনু, শুকতারা ও কিশোর ভারতী। রঙীন ছবি থাকে আনন্দমেলা ও চাঁদমামায়। কিশোরদের জন্য বলিষ্ঠ লেখা থাকে কিশোর ভারতীতে।

প্রতিটি পত্রিকার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাকে গায়কদের ভাষায় বলা চলে—'ঘরানা'। প্রতিটি পত্রিকায় কিছু কিছু প্রতিভার স্বাক্ষর দেখা যায়। শিশুসাহিত্যের অনেক খ্যাতিমান লেখক-লেখিকা এই সব পত্রিকায়

মাধ্যমেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিশোর সাংবাদিক তৈরীর কাজে 'দৈনিক কিশোর', সাপ্তাহিক 'রবিবার' ও 'কিশোর জগৎ'-এর প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে। সবচেয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য সবচেয়ে সস্তার মাসিকপত্র ছিল 'ছাপা-পয়সা,' দাম ছিল মাত্র ছয় পয়সা (১২২৮)।

আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী ও সত্যযুগ সংবাদপত্রে সপ্তাহে একদিন ছোটদের পাতা থাকে, তাতে বেশীর ভাগ ছোটদের লেখাই ছাপা হয়।

আজকের মাসিক পত্রিকাগুলি থেকে আমরা অনেক প্রতিভাবর লেখককে পেয়েছি।

'কিশোর ভারতী'র মাধ্যমে পেয়েছি জীবেন চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্প 'কালের অরুণ রাগে', 'নীলপুরী ও দুরন্ত ইগল' এবং শ্যামাদাস দে, বীরু চট্টোপাধ্যায় ও অরুণ আইনের সামাজিক গল্প।

'সন্দেশের' মাধ্যমে পেয়েছি শিশিরকুমার মজুমদারের 'তুফান দরিয়ার পরাণ মাঝি' ও 'সিন্ধুতলের সন্ধানী', অজেয় রায় ও মলিন সেনের এডভেঞ্চার গল্প, রেবন্ত গোস্বামী, ভবানীপ্রসাদ দে ও নবনীতা দেবসেনের ঘরোয়া গল্প।

'আনন্দ মেলার' মাধ্যমে পেয়েছি মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও বিমল মিত্রের সামাজিক গল্প।

'শুকতারার' মাধ্যমে পেয়েছি মধুসূদন মজুমদারের ঐতিহাসিক জীবনী ও ডাক্তার বিশ্বনাথ রায়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও মনুখ চৌধুরীর এডভেঞ্চার গল্প।

'পক্ষিরাজের' মাধ্যমে পেয়েছি শৈলেন মুস্তাফা সিরাজের গল্প।

'তেপান্তরের' মাধ্যমে পেয়েছি নির্মলেন্দু গৌতমের ঘরোয়া গল্প ও ডঃ শচীন্দ্রনাথ হালদারের শিকারের গল্প।

'কলরব'-এর মাধ্যমে পেয়েছি নবীগোপাল আইচের ইতিহাসের গল্প, দেবরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের অলৌকিক গল্প ও নারায়ণ চক্রবর্তীর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প।

শিশুসাহিত্য সম্পর্কে এই আলোচনা প্রসঙ্গে চারজনের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। প্রথম নাম খগেন্দ্রনাথ মিত্র যিনি শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশের এক ইতিহাস রচনা করে গেছেন, বইখানির নাম 'শতাব্দীর শিশুসাহিত্য'। বহু শিশু সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত পরিচয় তিনি লিখে গেছেন আর একখানি বই এ 'যাঁদের লেখা তোমরা পড়ো'। তারপর ডক্টর আশাদেবী খগেনবাবুর আলোচনার জের ধরে শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর বইখানির নাম 'শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ'। তারপর প্রভাতরঞ্জন দে লিখেছেন—'শিশুসাহিত্য ও সাহিত্যিক' এবং আকাডেমি অব গুডুকেশনটেশন এণ্ড রিসার্চ অব চিল-ড্রেন্‌স লিটারেচার থেকে প্রকাশ করেছেন ইংরাজী বই 'চিলড্রেনস লিটারেচার অব বেংগল'। বাণী বসু বহু পরিশ্রম করে সংকলন করেছেন—'শিশু সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী'। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে এই প্রতিটি গ্রন্থই মূল্যবান।

সাহিত্য হবে বয়োত্তীর্ণ। যাদের জন্য লিখছি তারা শুধু আনন্দই পাবে না। কিছুটা মনেরও খোরাক পাবে, যা মনকে উন্নত করবে, চরিত্রও গড়ে তুলবে। সেইখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। বয়স্কদের জন্য কলম চালানো যায় সব দিকেই কিন্তু শিশুসাহিত্যে তা চলে না। কলমকে সংযত করতে হয়। অপরিণত কিশোর মনের কথাটাই তখন সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

শিশুসাহিত্য রচনা করা সহজ নয়। ছোটদের মনস্তত্ত্ব ও ভাবপ্রকাশ জানা না থাকলে সার্থক শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। এই কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে"।

এই কারণেই বয়স্ক সাহিত্যের অনেক প্রতিষ্ঠাবান লেখক ছোটদের জন্য দু একখানি বই লিখেই নিজেদের সামর্থ্য বুঝতে পেরে আর অগ্রসর হন নি।

রবীন্দ্রনাথ আমার এই কথাও বলেছেন—"ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই"। এই কথার তাৎপর্য অনেক গভীর।

শিশুসাহিত্য কি হবে আর কেমন করে তা নিয়ে যত বিতর্কই থাক ছোটদের মন তৈরী করা—কল্পনা ও সংবেদন-

শীলতার বিকাশ ঘটানোই যে শিশুসাহিত্যের লক্ষ্য হবে একথা সর্বজনস্বীকৃত। ভয়, হিংস্রতা, গোঁড়ামি প্রভৃতি যেসব কাহিনীর মধ্যে ব্যক্ত হয় সে কাহিনী শিশু মনকে দুর্বল করে। ছোটরা রোমাঞ্চ ভালবাসে সেজন্য রোমাঞ্চের নামে তাদের কাছে অবিবেচনা প্রসূত রচনা করে দেওয়া অনুচিত, তাতে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। ব্যবসার দিক থেকে সেই ধরণের বই অর্থপ্রাপ্তি ঘটায় সত্য কিন্তু অপরিণত শিশু মনের বিকার ঘটায়, জাতির ক্ষতি করে।

ছোটদের চিন্তা ভাবনা সংকীর্ণতার উর্দ্ধে। ছোটদের মন দেশ কাল ও ধর্ম-নিরপেক্ষ। সব দেশের শিশুসাহিত্য ছোটদের কাছে সমভাবেই আনন্দদায়ক। গালিভারের ট্রাভেলস, রবিনসন ক্রুসো, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা, সো-হোয়াইট, মংস্যকুমারী, পিনোকিও, সিন্ডারেলা, পিটারপ্যান ও এলিসের কাহিনী সব দেশের সব ছেলেমেয়েরই সমান প্রিয়। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমানা বা বর্ণের গণ্ডী দিয়ে এই সব রচনার সার্বজনীনতা খর্ব করা যায় না।

শিশু-সাহিত্যিকরা জাতীয় চরিত্র ও সংস্কৃতির ভিত্ তৈরী করেন, তবুও বয়স্ক সাহিত্যিক মহলে তাঁরা প্রায় উপেক্ষিত। অধুনা বয়স্ক সাহিত্যিকরা গোষ্ঠিগত প্রচারের প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন। নিজ গোষ্ঠীর বাইরের লেখক-লেখিকাকে স্বীকৃতি দিতে তাঁরা কিন্তুবোধ করেন। শিশু-সাহিত্যিকদের তেমন কোন গোষ্ঠী নেই। তার উপর এই অর্থকৌলীন্যের যুগে শিশুসাহিত্য তেমন অর্থকরীও নয়। কোন শিশু সাহিত্যিক ছোটদের জন্য একটি গল্প লিখে কখনও একশো টাকা পান না। ছোটদের বই থেকে প্রাপ্য রয়্যালটি বয়স্কদের বই থেকে অনেক কম। বোধ হয় এই সব কারণেই আজকের বাস্তববাদী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিশু-সাহিত্যিককে সমবর্মী সমাজের এই উপেক্ষা স্বীকার করে নিতে হয়।

কিছুদিন যাবৎ শিশু-সাহিত্যিকদের মর্যাদা দেবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হয়েছেন। 'শিশুসাহিত্য পরিষদ' কয়েক বছর ধরে শিশু-সাহিত্যিকদের 'ভুবনেশ্বরী স্বর্ণপদক' দিচ্ছেন প্রতি বছরে। এই পদকের প্রথম প্রাপক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তারপর দক্ষিণারঞ্জন, হেমেন্দ্রকুমার, সুনির্মল বসু প্রভৃতি অনেকেই এঁরা সম্মান দিয়েছেন। এঁরা আবার প্রতি বছর শিশুসাহিত্যের যে কোন একটি 'শ্রেষ্ঠ স্মৃতি পদক' দেন। মৌচাক পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট শিশু-সাহিত্যিককে বছরে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারের নাম 'সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার'। শিশু-সাহিত্যিককে বছরে আর একটি পুরস্কার দেন শৈব্যা পুস্তকালয়, নাম 'রজিত বসু স্মৃতি পুরস্কার'। শিশুসাহিত্য সংসদ ১০০০ টাকা করে বছরে দুটি পুরস্কার দেন, একটি ভালো লেখার জন্য আর একটি ভালো ছবির জন্য, লেখক ও শিল্পীকে। 'কার্তিক দাশগুপ্ত স্মৃতি পদক' কয়েক বছর শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিককে দেওয়া হয়েছিল, বর্তমানে তা বন্ধ আছে।

পরিশেষে বলি, যে দেশে ১০ শতাংশ মানুষ নামটাও সই করতে পারে না সে দেশে সাহিত্য তো মুষ্টিমেয় সৌখীন বুদ্ধিজীবীর অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র। সে ক্ষেত্রে শিশুসাহিত্য আরো অনেক দূরের কথা। সেই কারণে এদেশের শিশুসাহিত্যিককে শুধু ছোটদের জন্য বই লিখলেই হবে না অর্ধশিক্ষিত শিক্ষাবঞ্চিত শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার কথাটাও ভাবতে হবে। বাংলা শিশুসাহিত্য ছোটদের শিক্ষা দেবার জন্যই তো প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, সে প্রয়োজন আজও রয়েছে।

With the compliments of

TATA STEEL

॥ ছোট গল্প ॥

জমি

কিংশুক ভাদুড়ী

দুলাল জমিতে লাঙল দিচ্ছে।

কড়া রোদ্দুর। বোশেখ মাস। একফোঁটা বৃষ্টি নেই। দুলালের গা বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে। সঞ্চিত শক্তির শেষ বল। গরু দুটোও আর পারছে না। হাঁপাচ্ছে, মুখ দিয়ে ফেনা।

শ্রীমতী দুলালের জন্য ভাত আর জল নিয়ে এসে দাঁড়ালো মাঠের ধারে। বাবলা গাছের সরু ছায়া যেখা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ও, চোখ কুঁচকে তাকালো চারদিকে।

ওদিককার জমিগুলোতে লাঙল দেওয়া হয়ে গেছে, দুলালের এখন শ্রীমতীর জমিতে লাঙল দিচ্ছে।

আটকাঠা জমি শ্রীমতীর। বিয়ের সময় পেয়েছে। যৌতুক নয়—এদেশে মেয়েরা যৌতুক পায় না, ওটা ছেলেদের একচেটিয়ার। মেয়ের বাবারা তাই মেয়ের জন্ম দিয়েই মুষড়ে পড়েন তারপরই শুরু করতে থাকেন মেয়ের বিয়ের যৌতুকের জোগাড়ের চেষ্টা।

শ্রীমতী পেয়েছে অন্যভাবে। শ্বশুর দিয়েছে পাঁচ আর বাবা তিন। লেখাপড়া করেই দিয়েছিল ওরা, কিন্তু—

মাথায় বাঁধা গামছাটা দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে দুলালের নজরে পড়ে শ্রীমতীকে। একটা মিষ্টি আনন্দের ঢেউ ওঠে ওর বুকের ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয় শ্রীমতী কেন? রতন কোথায়?

প্রত্যেক দিন তাই রতনই দুলালের খাবার নিয়ে আসে। রতন স্কুলে পড়ে। টিফিনবেলা বাড়ীতে আসে খেতে। নিজে খেয়ে স্কুলে যাবার পথে দুলালের খাবারটা দিয়ে যায়। আজ শ্রীমতী কেন?

কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে গরুদুটোকে ছেড়ে দিল দুলাল। নিজে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এল শ্রীমতীর দিকে।

তুমি—কাছে এসে প্রশ্ন করে দুলাল?

—আইলাম।

—রতন কই?

উয়ার স্কুলে দেরী হইয়া যাছে। তাই—

কথা বলতে বলতে বাবলা গাছের ছায়ায় দুলালের খাবার বেড়ে দেয় শ্রীমতী।

প্রচণ্ড খিদের মুখে নিমেষের মধ্যেই দুলালের খাওয়া হয়ে যায়। তাছাড়া খাবারগুলোও এমন কিছু লোভনীয় নয় যা অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া চলে। সাদামাটা ভাত, কড়াই ডাল আর উচ্ছে আলুর তরকারী।

খাওয়া শেষ করে দুলাল হাত বাড়ায় জলের ঘটিটার দিকে। মুখ তুলে আকণ্ঠ জল পান করে ঢক্ ঢক্ করে ঘটিটা ফিরিয়ে দেয় শ্রীমতীর হাতে।

শ্রীমতী অন্যান্য হাতে গুছিয়ে নিতে থাকে বাসন।

দুলাল টাঁক থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বার করে একটা বিড়ি ধরায়। তাকায় শ্রীমতীর দিকে—এখুনি বাড়ী যাবা—কানে

একটু বোসো না গল্প করি।

শ্রীমতী বসে। দুলাল কি বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দুলাল বলে—কাইল তুমার বাপ আইছিল মোর কাছে।

জানি—শ্রীমতী বলে।

কে কইল?

বাপই কইছে।

ক্যান আইছিল জান?

শ্রীমতী ঘাড় নেড়ে জানায়, জানে। বলে—জমির লগে তো?

হ। আমারে কইলো তুমার বিয়ার সময় শ্রীমতীরে তিনকাঠা জমি দিছিলাম। আমি কইলাম—হ জানি। উনি কইলেন, তুমার বাপের তো অনেক জমি, আমার আরও দুটি মাইয়া আছে তাদের বিয়া দিতে লাগবো। তুমি বাপ ওই জমিটা আমারে ফিরত দিয়া দাও।

আমি কইলাম দিয়ে আবার ফিরত নিবেন?

তুমার বাপ চুপ কইরা থাকলেন। আমি কইলাম—উ জমি তো আমার নয় যে দিয়া দিমু। শ্রীমতীর জমি। উ-কে আপনি দিছেন উ যদি ফিরত দেয়—দিব। আমার কি?

তুমার বাপ কিছু কয় নাই।

শ্রীমতী উঠে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবে। বলে—আমি যাই।

যাও।

তুমায় একটা পেন্নাম করি।

ক্যানে—অবাক হয়ে প্রশ্ন করে দুলাল—আজ কিছু আছে নাকি ?

দুলাল জানে কোন উৎসব অনুষ্ঠানেই সাধারণত শ্রীমতী ওকে প্রণাম করে।

এমনি ইচ্ছে হইছে তাই—শ্রীমতী বলে।

কর।

শ্রীমতী গলায় আঁচল দিয়ে দুলালকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। বলে আজ বেশী দেরী কইরো না, তাড়াতাড়ি ঘর যাইও।

ক্যানে ?

কাম আছে।

আচ্ছা।

শ্রীমতী থালা বাসন নিয়ে চলে যায়। দুলাল মাঠে।

• • • •

দুলালের বিয়ে হয়েছে বছর খানেক হল। বিয়ের আগেই ওর সাথে শ্রীমতীর জানাশোনা ছিল। শ্রীমতীদের বাড়ী আর ওদের বাড়ী একই পাড়ায়।

জানাশোনা মানে বেশ ভালরকম জানাশোনা। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। প্রথমে জানাশোনা তারপর প্রাকৃতিক নিয়মে ভাব এবং ভালবাসা।

শ্রীমতী জানতো দুলাল ওকে বিয়ে করবে আর দুলালও জানতো যে ও শ্রীমতীকে বিয়ে করবে। কিন্তু হঠাৎ কি যে হল দুলালের মনটা ঘুরতে আরম্ভ করলো।

শ্রীমতীর বাড়ীতে ওর বাবা-মাও জানতেন ওদের সম্পর্কের কথা। শ্রীমতীর বাবা দেখেছিলেন ছেলে হিসেবে দুলাল মন্দ নয়। বাপের জমিজমা আছে তা ছাড়া দুলাল কিছু লেখা পড়াও করেছে। তাই হঠাৎ দুলালের মতিগতির পরিবর্তন হতে দেখে উনি বাধায় হাত দিয়ে বসলেন। সযত্নে লালিত আশার সৌধটা ভাঙবার উপক্রম করতেই অবশ্য হলেন পাড়ার পঞ্চায়েতের।

পাড়ার পাঁচজনে মিলিয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় অতিরিক্ত লোক ওরা সবাই। তাই এ রকমের বিয়ে যদি না টেঁকে তাহলে শ্রীমতীর যাতে খাওয়া পরার অভাব না হয় তার জন্য যৎপক্ষ থেকেই কিছু জমি আদায় করে শ্রীমতীর নামে করে দিয়েছিলেন।

বিয়ের সময় সানন্দেই শ্রীমতীর বাবা রাজী হয়েছিলেন। এখন আবার সেটা ফেরৎ নিতে চাইছেন উনি, এর জন্য শ্রীমতীর ওপর যত রকম চাপ প্রয়োগ করা যায় তাও করছেন।

বিকেল বেলা।

অন্য দিনের চাইতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে দুলাল। গরু দুটোকে গোয়ালে বেঁধে জাব না দিয়ে ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়, ডাকে রতন।

রতনকে ডাকা মানেই শ্রীমতীর দেখা পাওয়া, আজ কিন্তু তা হল না। দাদার সাড়া পেয়ে রতনই বেরিয়ে এল। রতনকে দেখে দুলাল জিজ্ঞেস করে তোর বৌদি কই রে রতু।

কি জানি ঘরে আছে বোধ হয়।

একটু ডাইকা দে তো, আমারে কাপড় দিক, স্নানে যামু। রতন ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘরের দরজা ভেজানো। ঠেলা দিতেই খুলে যায়—রতন চমকে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ওঠে—ও দাদাগো।

ধক্ করে ওঠে দুলালের বুকের ভেতর। ছুটে যায় ঘরের দিকে। টাঙির ছাদের বাঁশ থেকে শ্রীমতী ঝুলছে।

দুলাল আর্তনাদ করে ওঠে। দুলাল আর রতনের চিৎকারে লোকজন ছুটে আসে। শ্রীমতীর আঁচল থেকে পাওয়া যায় ছোট্ট একটা চিঠি —

আমার জমি আমি কাউকে দিমু না। তোমারে কইছি, তুমিও দিবা না। আমি থাকলে বাপ আমার কাছ থেকে জমি কাইড়া লিবেই তাই আমি মরি দিলাম। তুমি আর একটা বিয়া কইরা এ জমিটা নতুন বৌকে আমার সুখ দেখুনি দিও। ইতি শ্রীমতী

দূরের আকাশ

অনিলকুমার সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিজনের অফিসে ঢুকেই সৈকতের মনে একটা আশার জোয়ার বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছিল।

যা সাধারণতঃ পাওয়া যায় না তাই বিজনের কাছ থেকে পেয়ে আসছে সৈকত। যতদিনই এগেছে আলোর ঝক-মকানি না হোক কিছু কিছু বেঁচে উঠার বাণী ও শুনেছে। বিজনের কথা বলার ভঙ্গিতে একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ লক্ষ্য করে এসেছে সৈকত।

বিজন সেদিন একটু ব্যস্ত ছিল। পীরপীরই একটা অল ইণ্ডিয়া কেন্ডারেশনে ও যোগ দিতে যাচ্ছে। দারা ভারত জুড়ে যখন ইণ্ডাষ্ট্রি বাড়াও একটা রব উঠেছে তারই পরি-প্রেক্ষিতে ইণ্ডাষ্ট্রি কনসালটেন্টরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসতে চাইছে শিল্পিকারের কতটুকু ওরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালি এডভান্স তার হিসাব নিকেশ নিতে। ঘরোয়া আলোচনা। যে যার বক্তব্য রাখবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। তাই থেকে ওরা সরকারী ইন্ডোগের মূল্যায়ন করতে এগিয়ে আসবে সংঘবদ্ধ ভাবে। একক ভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না সে যত শক্তিধরই হউক না কেন? তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেলিগেটরা যাচ্ছে। আগামী মাসেই মিটিং বসবে আমেদাবাদে।

নোট লিখছিল ওর পি. এ কে। পি. এ. নতুন join করেছে। আজই প্রথম ভদ্রলোককে দেখল সৈকত।

যেমন হোলসে তেমনি চেহারাটাও। এক মাথা চুল। পুরু চশমা। ফোলা প্যান্ট হলেও হাওয়াই শার্টটা চকচক করছে নয়। ফিকে গোলাপী রং-এর শার্ট'টা জড়িয়ে আছে ওর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে।

হাতে দামী ঘড়ি। ফেটওয়াচ ঘড়িই। এখন এটাই ফ্যাশন। দৌড়ে চলতে হয় বলেই হয়তো বারেবার ক্যালেণ্ডারের দিকে না তাকিয়ে নিজের হাতের দিকে চোখ বুলিয়েই তিথি দিনটা ঠাওর করে নেয়।

এখন দিন, বার, মাস মনে রাখা কী আর সোজা কথা। এত ব্যস্ততায় নিজের নামই অনেক সময় অনেক চৌকস ব্যক্তিরা পর্যন্ত ভুলে যায়।

একজন নামকরা consultant-এর পি. এ—বেশ আকিয়েই চাকরী করছে ভদ্রলোক মনে হোল। বলার ভঙ্গী, নোট বই ধরার ভঙ্গীতেও স্পষ্ট পারসন্যালিটীর ছাপ রয়েছে ভদ্রলোকের।

সৈকতকে দেখে বিজন হাসিমুখে বলল, বস ভাই, এই ডিক্টেশনটা সেরেই কথা বলছি।

পাশের চেয়ারে বসতে বললো। ভালোভাবে চোখা-চোখি হোল নতুন পি. এ.র সঙ্গে।

আকাশে বিদ্যুত চমকালো আচমকা। সেই বিদ্যুত চমকালো সৈকতের মনের আকাশেও। চোখটা ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ও ঘরে আলো থাকলেও কেমন যেন আবছা আবছা আঁধার ঘনিয়ে এলো ওর চোখে।

ভালো করে চোখ রগড়ালো। ঠিক দেখছে তো সৈকত?

হ্যাঁ ঠিকই তো।

যে ভদ্রলোক এতক্ষণ পেন্সিল হাতে গম্ভীর মুখে নোট নিচ্ছিল সেই তো সৈকতের কলেজে পড়ার সময়কার অতি দুর্ভাগা ডাকসেটে পাওা শ্রীঅনাথবন্ধু। এতক্ষণে অনাথের দৃষ্টিও পড়লো সৈকতের দিকে। সৈকতকে চিনতে সময় লাগলো না অনাথবন্ধুরও। কিন্তু কিছু বলল না। হাজার হউক এরাই হচ্ছে এ যুগের আসল ম্যাগনেট। লোক দেখেই বুঝে নেয় কার ভিতরে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তারই সদ্ব্যবহার করে নিজেদের কাজটুকু গুছিয়ে নিতে।

সৈকত এ অবস্থায় অনাথবাকে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো।

দেখে মনে হচ্ছে তো বেশ ভালোই আছে অনাথবা। অন্ততঃ ওর মত এ জায়গা থেকে ও জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেনা কোনও কিছু একটা ধরবে বলে। জীবন নদীর জোয়ারে নৌকা ভাসিয়ে একটা চড়ায় এসে কিছুক্ষণের জন্য যখন কেউ একটু জিরিয়ে নেয় তেমনই একটা চিলে ঢালা নিশ্চিন্তি হওয়ার শান্তি যেন অনাথবার মুখে একটা বাড়তি শ্রী এনে দিয়েছে। সেই কলেজে পড়ার সময়ে ওকে দেখে ভয় পেতো ছোট ছোট ছেলেরা। হাবভাব ছিল অনাথবার। ভয়ে ওর ধারে কাছে কেউ আসতে চাইতো না। যেমন তাকাতে চেহারা তেমনি রুক্ষ ব্যবহার। অথচ এরই মধ্যে কী সুন্দর জীবন গুছিয়ে নিয়েছে ও।

মানুষের মুখ দেখেই তার জীবন যাত্রার ধারটাও কিছুটা আঁচ করা যায়।

বেশ ভালো যে আছে তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যায়। এত বড় একজন কনস্যালটান্টের P.A. যখন, মাইনেও নিশ্চয়ই ভালোই।

ভিক্টোরিনটা একটুক্ষণের জন্যে থামিয়ে বিজন বলল,

অনাথবাবুকে তুমি প্রথম দেখছ। Last month এ join করেছে। ভারী efficient ও energetic, তবে বলার আগেই ধরে নেয় কী বলতে চাই। বেশী প্রশংসা করতে চাইছি না সাধনা সামনি তবু যার যা গুণ তা মাঝে মাঝে মুখে প্রকাশ করার একটা দুর্বলতা আমার চির-কালই। এমনই honest ও diligent ছেলেরাই তো আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই ওকে recruit করে মনে হচ্ছে একটা talent কে কাজে লাগাতে পারলে ওরও যেমন উপকার হবে তেমনি আমারও, কী বল হে youngman ?

বেশ অন্ধকারো একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো বিজনের সারা মুখে আর হাঁ হোয়ে তাকিয়ে রইলো সৈকত অন্যলোক ওরা অনাথবার দিকে।

অনাথবা হয়তো চিনেছে সৈকতকেও কিন্তু চেনা মুখকে ওরা বেমালুম ভুলে যায়। ভুলে যাওয়াই তো ওদের ধর্ম। ওরা যে সকল ব্যক্তি।

হঠাৎ বেশ কয়েক বছর আগের জীবনে ফিরে গেলো সৈকত।

তখন 3rd year এ পড়ে। পড়াশুনায় তো খারাপ ছিল না। কাজেই এরই মধ্যে পড়ে ফেলেছে ইংরেজী syllabus এর অধিকাংশ। অর্থনীতি পড়তে খুব ভালো লাগতো বলে যাও জেগে জেগে কঠিন কঠিন থিওরিগুলো ওর এরই মধ্যে মুখের তলায় এসে গেছে। সময় পেলেই আবৃত্তি করতো জুলিয়াস সিজার কিংবা রায়রন।

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তখনও রাজনীতি খুব বেশী ঢোকেনি। কাজেই পড়াশুনায় কিছুটা বেগবান ছিল।

অবশ্য অনাথবারা চিরকালই আলাদা। বেশ কয়েক বছর ফেল করে করে শেষকালে পাগলা হয়ে উঠলো বি. এ. পাশ ওকে করতেই হবে তা যে পথ দিয়েই হউক। টুকে পাশ করা যেতো। তাতেও অসুবিধে অনেক। কোনও সময় কমন পড়ে, আবার প্রফেসাররা মাঝে মাঝে বড় বিপদে ফেলে ছাত্রদের কোশ্চেন বিট্ করে। তাঁর থেকে আরও একটা সোজা পথ বেছে নিলো অনাথবা। বি. এ. পাশ না করলে দাঁড়াবে কী ভাবে জীবনে ?

সুতরাং গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই।

যথারীতি পথও বের করলো। বেশ কিছু টাকা এদিকে ওদিকে দিয়ে ইউনিভারসিটি থেকে অনুমতি আদায় করল যেহেতু তার হাতে একটা ক্যামেরা সুতরাং scriber এর সাহায্যে পরীক্ষা দেবে অনাথবা। আসলে হাতে ক্যামেরা নয়। ওটা অস্ত্রশস্ত্র। খোঁজা খুঁজি পড়ে গেলো কোথায় ভালো ছাত্র পাওয়া যায়। যে ইংরেজিতে ও ইকনমিক্সে-এ ভালো তাকে ঠিক করা হোল ইংরাজীর জন্যে। আবার সংস্কৃত ও বাংলার জন্য ঠিক করা হ'ল সেই বিষয়ে ভালো ছাত্রকে।

সৈকতের উপর ভার পড়লো ইংরাজী ও ইকনমিক্সের। সরোজের উপর সংস্কৃতের, নির্মলের উপর বাংলার।

পার্টের বাপেরও সাধ্য নেই বোঝে কী ভাবে খাতায় লেখা হোচ্ছে। মুখে কিছু মুখস্থ করা বুলি চালিয়ে গেলো

(শেষাংশ ৪৭২ পাতায়)

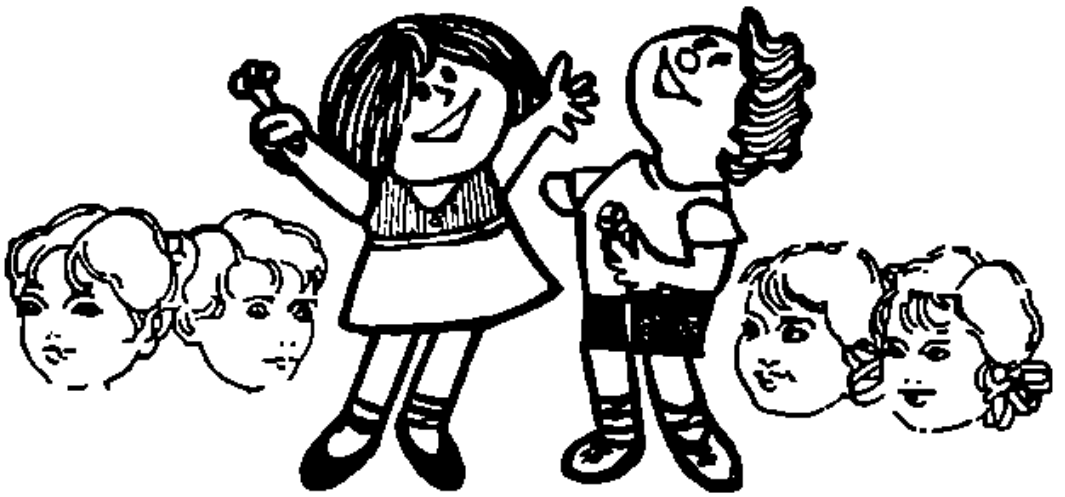

শিশু জগৎ

লোড শেডিং (ছড়া)

বাণী নাগ

লিখতে বসেই লোডশেডিং
বলতো তোরা মোর লেখাটার
দেবো এখন কোন হেডিং
লোডশেডিং ?

ঠিক বলেছিস ধারণ হবে
অন্ধকারে বেশ মানাবে
লেখার মাঝেও পাবে সবাই
লোডশেডিং এর গন্ধ
অন্ধকারে কাঁচা লেখা
নেই মিল, নেই ছন্দ।

জেনে রাখা ভাল

অনিরুদ্ধ মিত্র

একটা হাতীর জন্মের সময় কত ওজন থাকে জানো? একশো আশি কিলোগ্রাম—একটা স্বাস্থ্যবান লোকের তিন গুণ বেশী।

একটু বিস্ময়কর বোধ হতে পারে যখন তুমি শুনবে যে, এক পাউণ্ড মাকড়সার জাল খুলে লাইনের মত করে দিলে সেটি পৃথিবীর বিষুব রেখার ওপর পুরো একবার ঘুরে আসবে।

কখনো বিশ্বাস করতে পারবে যে ইংল্যাণ্ডের রাজা ইংরাজি বলতে পারেন না? এটা জেনে রেখো যে জর্জ প্রথম, যিনি ১৭১৪ থেকে ১৭২৭ রাজত্ব করেন, জার্মান রাজপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন ও কোনদিন ইংরাজি শেখার চেষ্টাও করেননি।

মিসিসিপি—যা এত লম্বা আর চওড়া একটা নদী—সেটিও এক লাফে পার হতে পারা যায়। এটি কিন্তু গল্প নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটাতে, লেক ইটাস্কার কাছে এক জায়গায় এরকম ভাবে যে কেউ পার হতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ায় 'ইউকালিপ্‌টাস' বলে একজাতের গাছ আছে যা এদেশেও দেখা যায়। গাছেদের মধ্যে এই জাতের গাছই সবচেয়ে বেশী লম্বা হয় এগুলো ৩০০ ফিটের (৯০ মিটার) বেশী লম্বা হামেশাই হয়। কতগুলো ইউকালিপটাস্ আবার ৪০০ ফিটের (দেড়শো মিটার) ওপরেও চলে যায়। তার মানে প্রায় ষাট তলা বাড়ীর মতো উঁচু।

অরণ্যের হাতছানি

সুব্রতা দে

নিবিড় অরণ্য। সবুজে সবুজ। একপাশে নীল পাহাড়। মাথার ওপর নীল আকাশ। ছোট ছোট মেঘগুলো পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অপর প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার তাগাদায়। নীল পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝরণাধারা কর্ণা ঝির্ ঝির্ করে বয়ে চলেছে প্রভাতের ভৈরব রাগিণীর মধুর ঝংকারে।

এমন মধুর পরিবেশে একটি হরিণ শিশু নাচতে নাচতে এসে দাঁড়ালো ঝর্ণার ধারে। তার পায়ের স্পর্শে কয়েকটা নুড়ি আনন্দে টুং টাং আওয়াজ তুলে গড়িয়ে পড়লো ঝর্ণার জলে।

এক সময় তার নাচ থামলো। চকিতে একবার দেখলো এপাশ ওপাশ। জল খাবার জন্যেই যেই সে পা দিলো জলে অমনি ঝুপ্ করে শব্দ হলো. তড়িৎ বেগে সে ঘুরে দাঁড়ালো পালাবার জন্যে। দেখলো,—মধুর। নীলাভ সবুজ পেখম অর্ধচন্দ্রাকারে ছড়িয়ে সে ঘুরে ঘুরে নাচছে। পুচ্ছগুলো কাঁপছে থর্ থর্ করে। তার থেকে ঝংকার উঠছে ঝর্-ঝর্ ঝর ঝর। পেখমের গায়ে যেন সহস্র নয়ন মেলে আছে সবার নয়নের পিপাসা মেটাতে।নীল আকাশের রামধনুর শোভা সবুজ বনানীর মধুরের পেখমের শোভা সত্যি অপূর্ব, অতুলনীয়।

হরিণ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলো মধুরের দিকে। ভুলে ছিলো নিজের কথা। এক সময় মধুরের নাচ থামলো। সে পাখীর রাজা। রাজার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো হরিণকে—'কি বন্ধু, কি দেখছ'? মধুরের কথায় বিস্ময় কাটলো হরিণের। জবাব দিলো—'তোমায় বন্ধু, তোমায়. সত্যি তুমি কত সুন্দর।' 'তুমি বা কি কম,'—

—'তোমার মতো আমার সুন্দর পেখম তো নেই।

প্রশংসা শুনলে কার না গর্ব হয়। মধুরের তাই হলো। নাচার গলা দুলিয়ে ঝুলে পড়া পেখম চামরের মতো দুলিয়ে নিলো। প্রকৃত গুণী গুণের প্রশংসা করে। মধুরও হরিণের প্রশংসা করে বললো— 'তা- তাই, তোমার টানা টানা চোখ তো কম সুন্দর নয়।'— মধুরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে হরিণ খুশীতে একটু তিড়িং তিড়িং করে নেচে নিলো। মধুর এবার প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করলো—এবার বল, পালাচ্ছিলে কেন?'—মধুরের প্রশ্নে হরিণের নাচ গেলো থেমে। মুখ থেকে খুশীভাব মিলিয়ে জেগে উঠলো ভয়ের ছায়া। টানা টানা চোখ বড় বড় করে কিস্ ফিসিয়ে বললো—'ভয়ে বন্ধু ভয়ে, হঠাৎ করে শব্দ হতেই আমি ভাবলাম 'বাঘ'। তা-ই পালাচ্ছিলাম।'—

—'দূর' ভয় কিসের'।—মাথার নীল ঝুঁটি দুলিয়ে তাচ্ছিল্যে বললো মধুর।

মধুরের কথায় হরিণের চোখ উঠলো ছলছলিয়ে। কঠিন আঘাতের ঘটনা মনে পড়লো। ও আর ওর ভাই দু'জনে ঝর্ণার জল খেতে আসছিল। কোথা থেকে একটা বাঘ এসে ওর ভাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। শ্রাবণের ধারার মতো হরিণের দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো।

বন্ধুর চোখে জল দেখে মধুরের দুঃখ হলো। কান্না পেলো। নিজেকে ধিক্কার দিলো। ছিঃ—ছিঃ সব জেনে বন্ধুকে দুঃখ দিয়েছে, আঘাত করেছে। যাই হোক, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে পড়েছে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিজের ডানা বন্ধুর পিঠে বুলিয়ে সে বললো—'কেঁদো না বন্ধু, কেঁদো না। তোমাদের যখন এতো বিপদ একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো'

মধুরের কথায় আশ্চর্য হলো হরিণ, কাঁদবে না হাসবে। মধুর তাই বলে কি! অরণ্যে শুধু হরিণদেরই বিপদ, হিংস্র পশুরা চিরকাল নিরীহ পশুদের ওপর অত্যাচার করে আসছে। হরিণের কান্না গেলো থেমে. গালে একটা হাত তুলে সে বললো—তুমি কি বলছো বন্ধু? তোমাদের বিপদ নেই?—

আমাদের? আমাদের কিসের বিপদ? ভয়ের কোন কারণ ঘটলে কিঁয়াও, কিঁয়াও ডাকে বিপদ সংকেত জানিয়ে দিলেই সবাই কোপে জংগলে লুকিয়ে পড়ে। আর সাপ? আমরাই তাদের যম।'—

—'চিতাবাঘ'—

চিতাবাঘের নাম শুনে মধুরের মুখ গেলো চুপসে। ঠিক,

খেয়াল ছিলো না। ওই দুই জীব ওদের বড় শত্রু। হলুদ গায়ে কালো কালো বিন্দু অপূর্ব সুন্দর আকর্ষণীয়। এই আকর্ষণ ওদের বিপদ আনে। লজ্জায় মাথা নীচু করলো মধুর।

হরিণ এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বললো—'যাক বন্ধু যাক, ও সব ছেড়ে কাজ নেই। তুমি এক কাজ করো। ওই গাছের ছায়ায় গিয়ে বসো, আমি একটু জল খেয়ে আসি, তারপর একটু নাচ গান করা যাবে।'—অপেক্ষা না করে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেলো ঝর্ণার দিকে।

নাচে, গানে, গল্পে দুজনের আসর বেশ জমে উঠেছিলো। হঠাৎ মধুর দেখলো, ফুলের রাণী গোলাপ রক্তবর্ণ মুখে ওদের দিকেই আসছে। কাছে আসতে মধুর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো 'কি হয়েছে গোলাপ বোন ?

উত্তর না দিয়ে বিষণ্ণ বদনে দাঁড়িয়ে থাকলো গোলাপ। এলিয়ে পড়া পাপড়ি দিয়ে ঝরে পড়লো দু'ফোঁটা শিশির বিন্দু, এ গভীর দুঃখের প্রতীক। সহানুভূতি কণ্ঠে হরিণ বললো—
—'আমাদের বলো না কেন কি হয়েছে তোমার ?'—
—'আমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভাই'—
—'সেকি ! আত্মহত্যা ! কারণ ?'—
—'আমার সখা মৌ আমাকে ছেড়ে অন্য ফুলে চলে যাচ্ছে।'
—'কেন ? কি করেছো তুমি ? —'
—'ও বলে আমার নাকি আগের মতো মধু নেই,— সৌরভ নেই, কাঁদতে কাঁদতে বললো গোলাপ।
—'এ-মৌ-এর ভারী অন্যায়'—মন্তব্য করলো হরিণ।

এমন সময় ওদের কানে এলো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। মৌ আসছে গুনগুনিয়ে। নেচে নেচে, দু'পাক ঘুরে কোন দিকে না তাকিয়ে বললো ওদের পাশের। ভাবটা এমন—'আমি কারুর নাকি যে,—যে তোমাদের সঙ্গে আগে কথা বলবো একটা ঠ্যাং তুলে ঘুরে লেগে থাকা বেণু টুক টুক করে বাড়লো। বার কয়েক ডানা দুটো মেলে শুটিয়ে ঠিক করলো। একটা ছোট হাই তুললো। এবার গোল গোল পুঞ্জাক্ষী অবহেলা ভরে ঘুরিয়ে দেখলো ওদের।

ওরা এতক্ষণ রসড় দেখছিলো মৌ-এর। গোলাপ মাথা নীচু করেই ছিলো। হরিণ ও মধুর পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। হরিণ টানা টানা চোখে ইশারা করলো মধুরকে। অর্থাৎ তুমি সুরু করো। মধুর গলা ছেড়ে তুলি টানা সাদা ডুক বকের মতো বেঁকিয়ে রাজার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো
—'কি মৌ, কোথায় চললে ?
'মধুর খোঁজে অন্য বনে'—জবাব দিলো মৌ।

'কেন ? অন্য বনে কেন ? এ বনে তো অনেক ফুল'—
—ফুল থাকলে কি হবে তেমন মধু নেই। ঠাকুমার মুখে শুনেছি তা আগে একটা ফুলে এক পেয়ালা মধু হতো—এখন আধ পেয়ালাই হয় না। কি দিন ছিলো, কি দিন কাল এলো।'—
'তা হলে সত্যি, তুমি গোলাপকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো ?'—

'সত্যি নয় কি মিথ্যে। পেটে খিদে থাকলে মনুষ্য হয় না মু-ক-লে। —ডানা ঝন্ ঝনিয়ে বললো মৌ। মনে বললো ফুটনি কম নয়, দেখলে বোঝা যায় না'। এতক্ষণ হরিণ শুনছিলো ওদের কথা। এবার সে বললো—বন্ধু, অন্য বনে গেলে সত্যি তুমি কি অনেক মধু পাবে ?'
'চেষ্টা করতে দোষ কি ?'
'তা বটে, তা বটে।' বলার মতো কথা খুঁজে না পেয়ে অবশেষে হরিণ গোলাপকে বললো—'তুমি কিন্তু বলো বোন।'

গোলাপের সাদা ধব ধবে পাপড়ীগুলো অভিমানে লাল হয়ে উঠেছিলো। দু'ফোঁটা শিশির ঝরে পড়লো তবুও সে নিজেকে সংযত করে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললো—'একদিন বাতাস আমায় বলছিলো—মানুষেরা কি সব বোমা ফাটাচ্ছে, তার সেই বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, তাই বাতাসে আজকাল গা জ্বালা করে, সেই বাতাস তো আমরা নি। মাটিও একদিন এমনি কথাই বলছিলো। সেই মাটির রস আমরা খাই। এখন বলো— খারাপ জিনিষ খেলে কেমন করে অনেক মধু হবে, সৌরভ থাকবে ?

এ সব কি বলছে গোলাপ। মধুর, হরিণ কৌতূহল অনুভব করছে বটে, মাথায় কিন্তু ঢুকছে না। ওরা একটু এগিয়ে এলো গোলাপের দিকে। কিন্তু মৌ-এর একটুও ভালো লাগছিলো না। এসব শুনে ওর কি লাভ। শুধু সময় বয়ে, যাওয়া। এতক্ষণে অনেক মধু সংগ্রহ হয়ে যেতো।

রাগে গজর গজর করতে করতে তারা সবকিছুতে উড়ে গেল সে। গোলাপ তখনও বলছিলো,—আমি যখন কুঁড়ি ছিলাম, আমার মাকে দেখেছিলাম, কি রূপ তার, তবে না যা কেন? আঁটি আঁটি জিনিস ছিলো। এখন ...

কথা শেষ হলো না গোলাপের। ভন্ ভনিয়ে চিৎকার করতে করতে ফিরে এলো মৌ—'তোমরা সবাই সাবধান, লুকিয়ে পড়ো। একটা মানুষ আসছে। খুব দুষ্টু ওরা, বেইমান—আবার উড়ে গেলো সে। মধুর, হরিণ ও গোলাপ ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

টগ-বগ, টগ বগ, টগ-বগ .....

একটা ঘোড়া এসে থামলো ঝর্ণার ধারে। ঘোড়ার পিঠে একটি সুন্দর ছেলে, গায়ে ঝলমলে পোষাক, হাতে তীর ধনুক, মাথায় হীরে বসানো সোনার মুকুট, তার থেকে নানা রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখে খুব ক্লান্ত লাগছিলো। একবার এদিক ওদিক দেখলো সে। কোথাও কেউ নেই, নির্জন বনভূমি। সবুজে সবুজ। গাছগুলোর পাতায় পাতায় মাতামাতি। ফুলেফুলে কানাকানি, ঝর্ণার ঝির্ ঝির্, ঝংকার। এবার সে ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়াটা সঙ্গে নিয়ে জল খাবার জন্যে ঝর্ণার দিকে গেলো। নিজে জল খেয়ে ঘোড়াকে জল খাইয়ে ওপরে উঠে এসে একটা গাছের গোড়ায় ঘোড়াটা বেঁধে নিজে নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সহজেই তার চোখে ঘুম জড়িয়ে পড়লো।

হঠাৎ 'সে বাবাগো মাগো' বলে চীৎকার করে, ঘাসের ওপর ছটফট করতে লাগলো। ব্যাপারটা হয়েছে কি—মৌ মানুষদের একটুও পছন্দ করে না। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে মৌচাকে মধু সংগ্রহ করবে, মানুষগুলো মধু চুরি করে নিজেদের ছেলেদের চুলিতে লাগিয়ে চুকচুক করে খাওয়াবে আর নিজেরা খাবে।' সেই রাগে মৌ ছেলেটির ঘাড়ে হুল ফুটিয়েছে।

ছেলেটি যত ছটফট করতে লাগলো ওত মজা হতে লাগলো মৌ-এর। মধুর, হরিণের আনন্দ কম নয়। সত্যি মানুষগুলো খুব দুষ্টু। ওদের চিড়িয়াখানায় খাঁচায় বন্দী করে রাখে। খাঁচার বাইরে থেকে আঙুল দেখিয়ে দাঁত বের করে হাসে। মজা লোটে। গোলাপও খুশী। যখন তখন ওদের গায় থেকে ছিঁড়ে নেয়। একটুও কষ্ট দেয় না। বেশ হয়েছে, মৌ হুল ফুটিয়েছে। এই অযোগে গোলাপের সঙ্গে মৌ-এর ঝগড়া গেলো মিটে।

এদিকে অসহ্য যন্ত্রণায় ছেলেটি জ্ঞান হারিয়েছে। তাই দেখে ওদের মনে মমতা জাগলো। মধুর বললো—চলো বেচারাকে একটু সেবা করে সুস্থ করা যাক। মধুরের প্রস্তাবে সবাই রাজী হলো সেবার উদ্দেশ্যে সবাই ছেলেটির দিকে পা বাড়ালো।

ওদের সেবায় ছেলেটির জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ খুলে সে দেখলো—

—'তোমরা কারা ভাই? আমার কি হয়েছিলো?'

'ভাই—আহা কি মধুর আহ্বান' একে ওরা খারাপ ভেবেছিলো। ছিঃ, ছিঃ, না বুঝে মৌ হুল ফুটিয়েছে। কটমট চোখে তাকালো মধুর মৌ-এর দিকে। অর্থাৎ তুমি ভারি দুষ্টু।

মৌ-ও গোল গোল নিষ্পাপ চোখ ঘুরিয়ে শুড় দুলিয়ে দেখলো মধুরকে। বেশী ভেংচোমো করো না। হুল ফুটিয়ে বুঝিয়ে দেবো। অবশ্য কষ্ট করে ঠোঁট নেড়ে কেউ কাউকে কিছু বললো না। ওদের চুপ করে থাকতে দেখে হরিণই সব বুঝিয়ে বললো —ওরা কারা? ছেলেটির কি হয়েছিলো ইত্যাদি।'

ছেলেটি কে? কোথা থেকে এসেছে, এ কথা জানার প্রয়োজন বোধ করলো মধুর। তাই সে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলো—'তুমি কে ভাই, কোথা থেকে এসেছো'—

মধুরের প্রশ্নে ছেলেটি একটু কিছু ভাবলো। তারপর বললো—'আমি কনকপুরের রাজকুমার। রাজপ্রাসাদে আমার থাকতে একটুও ভালো লাগে না, সেখানে শুধু দ্বন্দ্ব আর দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব আমার ভালো লাগে না। এই নিবিড় অরণ্যের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আমায় এতদিন হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। আমি সেখানে কোনদিন ফিরে যাব না। যদি দয়া করে তোমরা আমাকে তোমাদের সঙ্গে থাকতে দাও খুব ভালো হয়। তোমাদের উপকার কোনদিন ভুলবো না।'—

রাজকুমারের কথায় ওরা খুব সমস্যায় পড়লো। একটা

মানুষ থাকবে ওদের সঙ্গে। কেমন কেমন যেন লাগছে। কি করবে ভেবে পেলো না। অবশেষে বৌ এ চিন্তার অবসান ঘটালো। বললো—'চলো রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বনদেবীর কাছে যাই। তিনি বলে দেবেন—আমরা কি করবো।

ঠিক। ঠিক বলেছে বৌ। ওরা রাজি হলো বৌ-এর প্রস্তাবে। রাজকুমারকে নিয়ে ওরা যাত্রা করলো বনদেবীর উদ্দেশ্যে।

একটা পাথরের টুকরোর ওপর বসেছিলেন বনদেবী। সবুজ বসন। নানা অঙ্গে ফুলের গহনা। ঘনকালো চুল, বাতাসে এলো মেলো উড়ছে। তাঁকে ঘিরে বসে আছে নানা জাতের পশুপাখী, গাছ-গাছালী, লতা-পাতা।

রাজকুমারকে নিয়ে ওরা হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো বনদেবীর সম্মুখে। টানা টানা চোখে ওদের দিকে তাকালেন বনদেবী। ময়ূর এবার পেখম ছড়িয়ে বার কয়েক ঘুরে আবার হাত জোড় করে দাঁড়ালো। বনদেবী খুশী হলেন মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমাদের সব কুশল ?'

'হ্যাঁ দেবী'—বললো ময়ূর।

'মানুষটা এলো কোথা থেকে'—

দেবী নিজে এ প্রশ্ন করায় ময়ূরের সুবিধে হলো। কেন না ও ঠিক করতে পারছিল না কি ভাবে সুরু করবে। খুব সহজ ভাবে ওদের সমস্যার কথা জানালো। বনদেবী সব শুনলেন মুচকি হেসে বললেন—'এ এমন কি সমস্যা। মিলে মিশে থাকবে সবার সঙ্গে। তবে একটা শর্ত—আমি একটা শাস্তি দেব রাজকুমারকে, যদি সে তা মানতে রাজি হয়, তবেই এ অরণ্যে রাজকুমার থাকতে পারবে—'শাস্তি' ! কি শাস্তি দেবেন তাকে দেবী। শুনে ওদের মুখ গেলো শুকিয়ে। সকলে নীরব। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো ওরা।

বনদেবী বুঝলেন সব। নীরবতা ভেঙে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আমার এই অরণ্যে নিরীহ পশুদের রক্ষা করতে হবে। সবাইকে ভালবাসতে হবে। বন্ধু ভাবতে হবে। এখানে সবাই সবার রাজা। এই হলো আমার শাস্তি। হৈ হৈ রব উঠলো। আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। ময়ূর, হরিণ, বৌ ও গোলাপ আনন্দে নেচে উঠলো। রাজকুমারের শুকনো মুখ আনন্দে চক্ চক্ করে উঠলো, বললো—'দেবী তোমার শাস্তি আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।' —সকলে একত্রে করতালি দিয়ে সমর্থন জানালো বনদেবী ও রাজকুমারকে।

এমন বিস্ময়কর ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। মানুষ হবে পশুদের বন্ধু। এতদিন ওরা জানতো মানুষরা খুব দুষ্টু। এখন ওদের ধারণা গেলো পাল্টে।

ময়ূর, হরিণ, গোলাপ ও বৌ তো নাচছিলো। বাকি যারা উপস্থিত ছিলো তারাও অংশগ্রহণ করলো ওদের। রাজকুমার গলা ছেড়ে গান সুরু করলো—

'আমরা সবাই রাজা..... রাজার রাজত্বে।'

বাতাসে বাতাসে ভেসে গেলো সেই সুর অরণ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সুরের বেহীতে বসে বনদেবী হাসতে লাগলেন মুচকি মুচকি।

দূরের আকাশ

(৪৬৭ পাতার পর)

অনাথদার আর দিদি কলম চলল নির্বাচিত scriberদের নিজস্ব মাথা থেকে।

পরীক্ষার পরে বেষ্ট্ সেন্টে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে খাইয়ে সন্তুষ্ট করতো সৈকতদের। ভবিষ্যৎও পরিষ্কার হয়ে এল অনাথদার।

অন্যের বিশ্বের সাহায্যে তরী ভেড়ালো অপর পারে। আর যারা সেদিন কাণ্ডারী হয়েছিল তাদেরই একজন সৈকত এখনও তরী নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি পালে হাওয়া এসে লাগে।

সেই আশায় বসে আছে সৈকত।

অথচ ওর সামনে সুন্দর ভাবে তরী বেয়ে চলেছে ওই অনাথদারা —···।

(ক্রমশঃ)

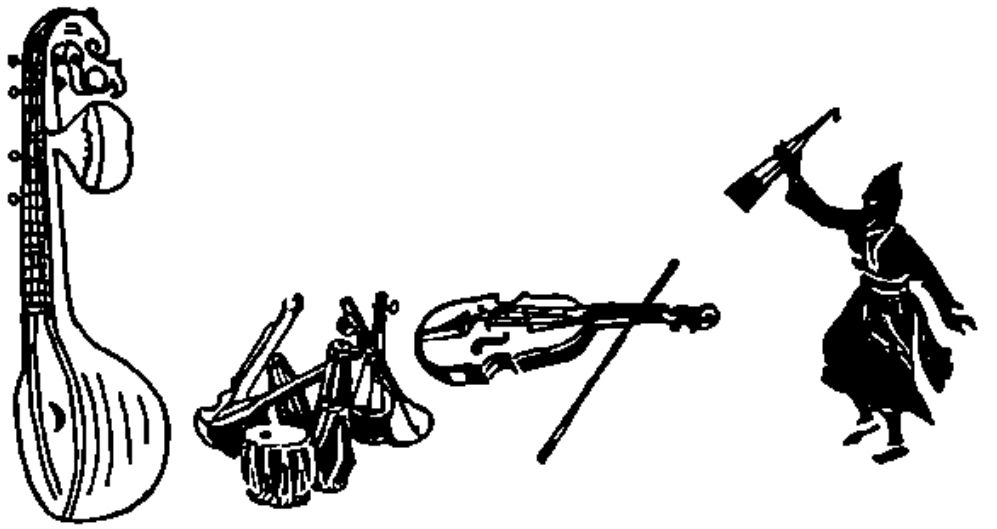

সঙ্গীত জগৎ

ধ্রুপদ শিল্পী ও বীণাবাদক হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩০-১৮৯০।

আর্যকুমার মুখোপাধ্যায়

কোলকাতা। চিরযৌবনের লীলানিকেতন এই কোলকাতার অণুতে অণুতে বৈচিত্র্যভরা। চিরযৌবনা পশ্চিমবাংলার এই নগরীর সব কিছুই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। যুগের পর যুগের সংগে সেও তার রূপের পসরা বদলে চলেছে সন্তর্পণে। তাই আজকের এই বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কোলকাতার সংগে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতার কোনখানে কোন মিল নেই। সব বদলে গেছে। পোষাক চাল চলন খাওয়া দাওয়া বাড়ী ঘর রাস্তা গলি আলো ফুর্তি ব্যবহার এমন কি কথাবার্তার ধরণ ধারণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তবু কবিগুরুর ভাষায় বলি—

হে অতীত তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে
সুখের দিনের চলা-তারি মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।

উত্তর কোলকাতার পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আজ মনের বীণার তারে তারে কবিগুরুর ওই কবিতার সুর বার বার ঝংকার তুলে বলে—

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি

সত্যিই সেই সময় পাথুরিয়াঘাটার প্রায় প্রতিটি প্রাসাদের বড় বড় জলসা-ঘরে গান শোনাতেন ভারতের বড় বড় সাধক সংগীতাচার্যেরা। তাঁদের গানের সুরে সুরে মুখরিত হয়ে থাকতো আকাশ বাতাস। সে সুরে মানুষ কেঁদেছে হেসেছে, ভালবেসে সব ভুলেছে, বিশ্ব ছেড়ে বৈরাগী হয়েছে। সে সুর মানুষের মনকে নিয়ে গেছে আনন্দের অপরূপ নন্দন-কাননে। সে সুর শুনে মানুষ তাই বিগলিত হয়ে বারবার বলেছে—শুনি, আমি অবাক হয়ে শুনি।

আজ থেকে প্রায় একশো পঁচিশ বছর আগে এই পাথুরিয়াঘাটার একটি প্রাসাদের একটি কক্ষে এক যুবক বসে বসে আপন মনে তানপুরা বাজিয়ে বিভোর হয়ে সাধনা করছিলেন রাগ-সংগীত। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। কেরোসিনের আলো জ্বলছে গলির মোড়ের মাথায়। প্রাসাদে প্রাসাদে জ্বলতে শুরু হয়েছে দেওয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠন। রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে মন্থর গতিতে আনমনা হয়ে পথ দিয়ে চলেছেন ভারতের অদ্বিতীয় প্রবীণ ধ্রুপদী আর বীণাবাদক যৌলাবন্ধ। হঠাৎ চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেই জায়গায়। একটা সুন্দর সুরেলা কণ্ঠ তাঁর চলার সেই মন্থর গতিকে একেবারে থামিয়ে দিয়েছে। কয়েক মিনিট

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুর শুনলেন ওস্তাদ মৌলাবক্স। তারপর একটুও দ্বিধা না করে প্রবেশ করলেন সেই বিশাল প্রাসাদের সেই কক্ষে, যেখানে বসে গান করছিলেন সেই যুবক। তাঁকে ওই ভাবে আসতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক, হয়ে যুবক গান বন্ধ করে তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের মুখের দিকে। মৌলাবক্স বল্লেন তুমি যদি শিখতে চাও তাহলে আমি তালিম করবো, শেখাবো। ধ্রুপদ শেখাবো বীণা শেখাবো। এমনি ভাবে মৌলাবক্সের মত ওস্তাদকে ঘরে বসে যিনি অযাচিত ভাবে গুরুত্বেরে লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম হচ্ছে হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন বর্ধমানের লোক। বর্ধমান জেলার কেশেরা বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেছিলেন দেওয়ান রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যাকে। রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে নিজের টাকায় বিরাট প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন পরে তিনি তাঁর একমাত্র জামাই ঈশানচন্দ্রকে দান করেছিলেন। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের নাম গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গঙ্গানারায়ণের ছেলের নাম হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৩৭ সালের ৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে হরপ্রসাদ জন্মেছিলেন ৫৭নং পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে বিরাট ধনীঘরে ঐশ্বর্যের মধ্যে। ইংরাজি তারিখ কি ছিল ঠিক মনে নেই, কিন্তু সেটা যে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ ছিল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। বড় ঘরের ছেলে। তাই তাঁর লালনপালন হয়েছিল বড়লোকের মতই। সবার স্নেহমমতা আর ভালোবাসায় ধীরে ধীরে তিনি স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে যখন একটু বড় হলেন, যখন জ্ঞান হলো তখন শুরু হলো তাঁর লেখাপড়া শেখা। বাড়ীর কাছাকাছি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বলে একটি স্কুল ছিল, সেখানে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল। ওই স্কুলেই তিনি মন দিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন। বাড়ীতে বারমাসে তেরপার্বণ লেগেই থাকতো। সেই সব পার্বণকে উপলক্ষ্য করে নানারকম গান বাজনা আর উৎসব তাঁদের বাড়ীতে প্রায় প্রতি মাসেই হত। হরপ্রসাদ সেইসব উৎসবের গান শুনতে খুবই ভালবাসতেন। এইভাবে গান শুনতে শুনতে একটু একটু করে সুর তাঁর মনের পৃথিবীর সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছিল। তাছাড়া হরপ্রসাদের রক্তে ছিল গানের সুরের রক্ত। কারণ তাঁর বাবা গঙ্গানারায়ণ ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ধ্রুপদাচার্য কিদো সিং এর ছাত্র। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে গঙ্গানারায়ণ দেহত্যাগ করেন। হরপ্রসাদ বাবার অতুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে তাই পেয়েছিলেন বাবার প্রাণের সম্পদ সুরের অনুরাগ। সেই অনুরাগের ফলে ধীরে ধীরে তিনি গান গাইতে শুরু করেছিলেন। তারপর আরম্ভ হয়েছিল তাঁর গুরুর কাছে শিক্ষা।

যখন ওস্তাদ মৌলাবক্সের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে, তার অনেক আগে থেকেই হরপ্রসাদ গান শিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। প্রথমে খেয়াল আর টপ্পা শিখেছিলেন তিনি সে যুগের স্বনামধন্যা গায়িকা নবরত্নী বাইএর কাছে। তারপর তিনি ধ্রুপদ শিখেছিলেন বহুভট্টের গুরু প্রসিদ্ধ খাণ্ডারবানীর ধ্রুপদ গায়ক গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। যে গান শুনে মৌলাবক্সের মতন ওস্তাদ অযাচিত ভাবে গিয়েছিলেন হরপ্রসাদের কাছে সে গান ছিল ঈশানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শেখা ধ্রুপদ।

গান ছাড়াও তিনি বীণা আর সেতার বাজাতেও পারতেন আর সে শিক্ষাও তিনি পেয়েছিলেন ওস্তাদ মৌলাবক্সের কাছে। ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের স্টাফনোটেশনও শিখেছিলেন উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে।

উত্তর কোলকাতার হাটখোলায় থাকতেন হরপ্রসাদের মামা ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বাপ পিতামহের সম্পত্তি ছাড়াও হরপ্রসাদ পেয়েছিলেন মামার অনেক বিষয় ও টাকাকড়ি। একদিকে কণ্ঠ সংগীতে ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী, যন্ত্র সংগীতে বীণা সেতার বিদ্যার অগাধ জ্ঞান লাভ, আবার অন্য দিকে পৈতৃক আর মামার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন বলে অনেকে তাঁকে বলতেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর

বয়সুন। কিন্তু তাঁর চালচলনে কথায় ব্যবহারে এক কোঁটা অহংকারের চিহ্নমাত্র ছিল না। লম্বা দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা গায়ে একটা সাধারণ চাদর দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতন।

সে যুগে সাধারণতঃ বেশীর ভাগ বড়লোকের ছেলেদেরই বিলাসী, উদ্ধত, ভোগী ও অহংকারী হ'তে দেখা যেত কিন্তু হরপ্রসাদ ছিলেন ঠিক তার উল্টো। সব দেয়েও তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত। সংগীতকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সাধনার জন্য। তাই আজীবন তিনি সাধনা করে গেছেন মুনি ঋষির মতন। যে সংগীতকে যখন যে শুনতে চেয়েছে তখন তাকেই তিনি শুনিয়েছেন খুসী হয়ে। আবার যে শিখতে চেয়েছে তাকেও শিখিয়েছেন প্রাণভরে। শিক্ষাদানে কোন কৃপণতা তাঁর ছিল না কোন দিন।

ভোবায় কার অভাব, কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কোন আত্মীয় বন্ধু বিপদের মধ্যে পড়ছে, হরপ্রসাদের কাছে যাও সব সমাধান হয়ে যাবে।

হরপ্রসাদের হৃদয় ছিল মমতায় আর করুণায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি সংগীতের মতন মানুষকেও ভালোবেসেছিলেন সারা মন প্রাণ দিয়ে। এর জন্য কেউ তাঁকে বোকা, কেউ তাঁকে নির্বুদ্ধি পাওয়ার অযোগ্য আবার কেউ বা তাঁকে মহাত্মা বলেছে, কিন্তু তিনি ছিলেন নিন্দা আর প্রশংসার অনেক ওপরে। তাই কোন কিছুতেই তাঁকে বিচলিত হতে কেউ দেখেনি। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করে যে নিজেকে কর্মে নিয়োগ করে তাকে ভগবানই আশীর্বাদ করেন। সেই আশীর্বাদ পেয়েছিলেন হরপ্রসাদ। তাই তিনি ছিলেন অত উদার আর মহৎ, তিনি মানুষকে জয় করেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে, সংগীত দিয়ে—অর্থ দিয়ে নয়।

তিনি যখন গান গাইতেন, তখন তাঁর মনপ্রাণকে কণ্ঠস্বরে, গাহাড়িয়া ঝর্ণার মত সহজ সরল সুন্দর অবিরল সুরে উদ্ভাসিত হয়ে, দর্শক শ্রোতাদের মনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে অসীমের অসীমায়। গানের মতন তাঁর ব্যবহার ও বাচন ভংগীর মধ্যেও এমন একটা মধুরতা ছিল যা সহজেই মানুষের মনকে জয় করে নিত।

কিন্তু আজকের এই বিংশ শতাব্দীর কোলকাতার কাছে পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট একটা ধাঁকাচোরা অপরিচয়ের গলি ছাড়া আর কিছুই না। যাঁরা সে যুগের খবর রাখেন না তাঁদের কাছে এই গলির ইতিহাস অলীক আর অবাস্তব। এ যুগের মানুষেরা তাই হরপ্রসাদের কথা কেমন করে জানবে? তবে এখনও ওই রাস্তায় গেলে চলতে চলতে একটু নজর করলে হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে একটা চূণকামহীন কালো অন্ধকার বাড়ীর দেওয়ালে পাথরে লেখা আছে 'হরদুটির'। কালের রথের চাকার তলায় আর বাকী সব চাপা পড়ে গেছে। শুধু লেখা আছে সাধারণের অপাঠ্য কোন পুস্তকে তাঁর জীবনের একটু আধটু টুকিটাকি গল্প।

কিন্তু তার কথা কে মনে রাখবে, এ কথা ভেবে কোন সাধক কোন কালে সাধনা করেন নি করতে পারেনও না। সে যুগে তো নয়ই, এ যুগেও নয়, বোধ হয় কোন যুগেই নয়। যিনি সাধক তিনি যুগাতীত। যুগ যুগান্তরের সংগে তাঁর সম্পর্ক আপনি তৈরী করে নেন বিধাতা। তাই হরপ্রসাদের মত আমরা আজও অনেককেই ভুলতে ভুলতেও ভুলতে পারি না। এক সময় না এক সময় সে প্রকাশ হয়ে পড়ে আপন মহিমায়। কোন অলক্ষ্যের ইশারায় তাঁর কাজ করতে কে যে এগিয়ে আসবে তা কেউ বলতে না পারলেও এটা দিনের আলোর মতই সত্য। তাইতো কবিগুরু বলেছেন—

জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
ছড়ায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।

হরপ্রসাদের আরও একটি গুণের কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি যে শুধু উচ্চাংগের হিন্দুস্থানী গানই গাইতেন তা নয়, তাছাড়া তাঁর আরও একটি গুণ ছিল। তিনি ছিলেন কবি। বাংলা ভাষায় সুন্দর সুন্দর ভক্তিমূলক গান রচনা করে তাতে নিজেই সুরের অলঙ্কার পরিয়ে গাইতেন। তাঁর সেই গান অজস্র মানুষের

(শেষাংশ ৬১৭ পাতায়)

ক্রীড়াজগৎ

ধ্যানচাঁদ—"হকির যাদুকর"

তপন বসু

ক্রিকেট খেলার নামে যেমন ব্রাডম্যানের নামটি জড়িয়ে আছে তেমনই হকি খেলার আলোচনার সবার আগে মনে পড়ে ধ্যানচাঁদের নামটি। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত। ধ্যানচাঁদই খেলাধূলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভারতের নাম অঙ্কিত করেন। প্রতিপক্ষের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। তাই তাঁকে বলা হতো "হকির যাদুকর।" এই যাদুকর খেতাব তিনি প্রথম পেয়েছিলেন ১৯২৬ সালে সুদূর বিলাত শহরে পাঞ্জাব-ইণ্ডিয়ান infantry tournament এ। তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ খেলা, খেলা শেষ হতে আর মাত্র চার মিনিট বাকী। কিন্তু ধ্যানচাঁদের দল তখন দু' গোলে পিছিয়ে আছে। ঠিক সেইসময় ধ্যানচাঁদের কোচের Commanding officer ধ্যানচাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন ধ্যান, প্রাণ মনে খেল—আমরা এখনও দু'গোলে হারছি, আমাদের জন্য কিছু একটা কর।" ঠিক তারপর ধ্যানচাঁদ তার stick-এর অপূর্ব কলাকৌশলে অনবদ্য ভাবে শেষ চার মিনিটে একাই তিনটে পর পর গোল করে তার দলকে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে জয়মাল্য পরালেন।

অথচ এই কৃতী centre forward ধ্যানচাঁদ যার হাতের hockey stick থেকে মাঠের মধ্যে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়তো, তিনি মাঠের বাহিরে ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, নম্র ও ভদ্র। সামরিক বাহিনীর Captain আর হকি দলের অধিনায়ক ধ্যানচাঁদ ছিলেন ভারতের এক আদর্শ দূত। আজ যখন মাঠের মধ্যে বা বাইরে খেলোয়াড়দের অভদ্র ও উদ্ধত আচরণ দেখা যায় তখন ধ্যানচাঁদের মত বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়ের খেলোয়াড়ী মনোভাবের কথা স্মরণ করে বিস্মিত হতে হয়। খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি বা sportsman spirit সম্বন্ধে ধ্যানচাঁদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

"খেলার মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। সেই সময় সকলের মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি ও প্রতিপক্ষের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত—আর তখনই খেলাটা হয়ে ওঠে আনন্দময় ও সুখকর। কিন্তু এ সময় একটা ভুল করলেই সমস্ত মাঠের পরিস্থিতি হয়ে উঠবে নোংরা ও দুঃসহ। তখনই খেলোয়াড় ও মানুষ হিসাবে আর কোন মূল্যই থাকবে না। তাই আমি আবার বলি খেলার মাঠে অভদ্র বা প্ররোচনামূলক কিছু করা উচিত নয়।"

১৯০৫ সালের ২৯ শে আগষ্ট এলাহাবাদে ধ্যানচাঁদের জন্ম হয়। বাবা ছিলেন সৈনিক দাদাও সৈনিক হলেন। পরে তিনিও যোগ দিলেন সামরিক বাহিনীতে। এই সামরিক বাহিনীতে এসেই আকস্মিকভাবে শুরু হলো তাঁর হকি খেলার অধ্যায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি Brahmin regiment-এ যোগ দিয়েছিলেন। এই regiment এর হকি খেলার বেশ সুনাম ছিল। Brahmin regiment এ Bale Tewari নামে এক সুবেদার মেজর ছিলেন। হকি খেলায় তাঁর ছিলো যাদুর মতো। তাঁর কাছেই ধ্যানচাঁদের হকিতে হাতে খড়ি। ধ্যানচাঁদের খেলার কৌশল তাঁর নজরে পড়ে। ক্রমে ধ্যানচাঁদ Centre forward হিসাবে tournament এ খেলার সুযোগ পান এবং তাঁর দলকে বহু খেলায় সাহায্য করেন।

ধ্যানচাঁদ বলেন,—সুবেদার মেজর Bale Tewari হলেন আমার হকির গুরু। তাঁর মতে, হকি হলো কৌশলের

খেলা। সুন্দরভাবে খেলতে পারলে একে যেন একটা আর্ট বলে মনে হয়।

বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সুঠাম কচ্ছি, সবল শরীর এবং দেহ-স্নায়ুর গতির একাগ্রতা প্রয়োজন এ খেলায়। ধ্যানচাঁদের ধ্যান ও জ্ঞান ছিলো হকি। বারবার তিনি বিদেশ সফরে গেছেন ক্যাপ্টেন হয়ে, অলিম্পিকে যোগদান আর সগৌরবে বিজয় মুকুট নিয়ে এসে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ১৯২৬ সালে ভারতীয় হকি দল প্রথমে হকি খেলতে বিদেশ সফরে যায়, সে খেলায় ধ্যানচাঁদ যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি হকি খেলেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে ৪৩ বছর বয়সে খেলা থেকে প্রায় অবসর নেবার পরও ধ্যানচাঁদ ভারতীয় হকি দলের পূর্ব আফ্রিকা সফরের নেতৃত্ব করেন। কারণ ও দেশের হকির কর্তৃপক্ষের প্রধান শর্ত ছিল যে, ধ্যানচাঁদকে এ সফরে দলভুক্ত করতে হবে। কারণ সেখানকার জনসাধারণ হকির জাদুকরের খেলা দেখতে অধীর আগ্রহী। এই সফরে ধ্যানচাঁদ ১১টি খেলায় ৬১টি গোল করেন এবং প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এবার তোমাদের একটা মজার ঘটনা বলি কেমন? ১৯৩২ সালে Los Angeles অলিম্পিকে U. S. A কে ২৪-১ গোলে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ান হয়। এই ২৪টি গোলের মধ্যে ধ্যানচাঁদ করেছিলেন ৮টি গোল। খেলার শেষে দর্শকরা ধ্যানচাঁদের hocky stick-এ হাত দিয়ে পরীক্ষা করে "gum" মাখানো আছে কি না। ধ্যানচাঁদের খেলা দেখে Amsterdam অলিম্পিকের আগে ইংলাণ্ডের সংবাদ পত্রে তার নাম দেওয়া হয় "Humao eat" ও "Hocky Wizard".

সবার জীবনেই একটি স্মরণীয় মুহূর্ত থাকে। ধ্যানচাঁদের জীবনেও এমন একটা স্মরণীয় মুহূর্ত ছিলো। তাঁর মতে তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও স্মরণীয় মুহূর্তটি হলো যখন ১৯৩৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেডে তিনি ক্রিকেটের ডন ব্র্যাডম্যানের সাথে পরিচিত হন। দুই খেলার দুই দিক-পালের এই সাক্ষাতের ছবিটি ক্রীড়া-রসিকদের কাছেও চির সুন্দর।

আগেই বলেছি ধ্যানচাঁদ খেলাধুলার মানচিত্রে সর্বপ্রথম ভারতের নাম অঙ্কিত করেছেন। একের পর এক জয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন দেশমাতাকে। তাঁর মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হ'লো নিঃসন্দেহে। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই তাঁর অমর আত্মার প্রতি।

ধ্রুপদশিল্পী ও বীণাবাদক

(৭৭৪ পাতার পর)

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। এমন কি যুগাবতার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হরপ্রসাদের কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত গান 'কি হেরি নটবর রূপসুন্দর' গানটি শুনে ভাবে বিগলিত হয়ে তাঁকে প্রশংসা করেছিলেন। শুধু সাধনা করে শুধু নিজে গান গেয়েই তিনি থেমে থাকেননি। সে গান শিখিয়েও ছিলেন অনেককে। তাঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, গোপাল চন্দ্র দত্ত, কানাইলাল দে আর তাঁর নিজের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণ করা হয়। কারণ তাঁর পরে তাঁর এই সব ছাত্ররাই তাঁর সংগীতধারাকে বহুকাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

সে সময়ের ভারত-বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মুরাদআলি খাঁ, স্বনামধন্য যদুভট্ট, আলিবক্স, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কাশীপ্রসাদ, শিবনারায়ণ মিশ্র, জোয়ালাপ্রসাদ, কেশব মিশ্র, গোপাল মল্লিক, নত্যচরণ গুপ্ত, বসন্ত হাজরা, অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী গোস্বামীর মত শিল্পীদের সংগে তাঁর অন্তরংগতা ছিল। সুরের পূজারী হরপ্রসাদ সুরের সাধকদের সেবাও করতেন মনপ্রাণ ঢেলে।

এই মহাসাধক সুরের পূজারী হরপ্রসাদ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুরের সাধনায় নিরত থেকে এই পৃথিবীর খেলা শেষ করে বিদায় গ্রহণ করেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। বিদায় নেবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

উত্তর ভারত ৩২তম বর্ষ

মাঘ ১৩৮৫ – পৌষ ১৩৮৬ ইংরাজী (১৯৭৯)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অখিলবন্ধু স্মরণবুকো | দেবরঞ্জন সন্তোপাধ্যায় | ৩২৪
অজানা | বুলু ঘাটুয়া | ৪৪৯
অভিজ্ঞতা | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ৯
অমৃতের খোঁজে | লোপা মজুমদার | ৮২
অরণ্যের হাতছানি | সুব্রতা দে | ৬৯২
অল্প নয় প্রেমই শক্তি | সম্পাদকীয় | ২০৯
আজ চাই একটা বার্ষিক বিপ্লব | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৪৫
আতঙ্ক | তারা ভট্টাচার্য | ২৪৯
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ | অন্নপূর্ণা গুপ্তা | ৪৩৪
আর্টের ব্যক্তিচার | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৫৫
আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে দূর সংযোজনের প্রচেষ্টা | দুলাল কুমার সাহা | ৭৩
ইঁদুর | সুব্রতা দে | ১৮১
উজ্জ্বল ভারতের আদর্শ | রেজাউল করিম | ৭
উজ্জ্বল ভারত | স্মরণ বুকো | ৩৩
উজ্জ্বল ভারত | দিলীপ ধাপগুপ্ত | ১২৭
উষাস্ত | অজু হালদার | ২৩৪
উপহার | দুর্গা গোস্বামী | ২০৭
উনআশি | অসীমা সাহুলী | ১২৩
এ বিশ্বে অল্পও পূর্ণ | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৪০৬
এক আধটা পায়রা | দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ২০৭
একান্ত নিজস্ব | শ্রীগোপাল ভৌমিক | ৩৬৬
কার্তিকের চালচিত্র | কল্যাণ দে | ৪৪৯
কেষ্ট ঠাকুর | কুমারেশ ঘোষ | ৪২৯
কৈফিয়ৎ | দীপেশ রাহা | ৩২২
ক্যারিবিয়ান কাব্য | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ২৮৯
ক্রমবিবর্তনে মানব বিকাশের ভূমিকা | ডঃ ভজহরি কুমার | ৪৪৫
ক্ষুদ্র শিল্পে আধুনিকীকরণ | শৈলেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত | ২৮
খেদ | মুকুলদেব ঠাকুর | ৩৬৬
খেলা ও দুর্ঘটনা | রাখাল ভট্টাচার্য (আগরি) | ৩১
গণ সংস্কৃতি ও গণ মাধ্যম | পার্থ চট্টোপাধ্যায় | ৪৩০
গৃহরাজ্য | মন্মথ রায় | ২৯৬
ঘর | সুচিত্রা গুহঠাকুরতা | ৪৭
চাহিদা পূরণের জাতির বন্ধন | কালোবরণ মুখোপাধ্যায় | ৪৪২
চীনের কূপে বিজ্ঞানী | শরদিন্দু সাহা | ৩৪
ছড়াগেয়া | উমা সরকার | ১৫১
জরি | কিংশুক ভাদুড়ী | ৪৬৪
জীবন যজ্ঞ | বাণী বাগ | ৩৩৬
জেনে রাখা ভাল | গণেশ চক্রবর্তী | ৩৩, ৭৩
জেনে রাখা ভাল | মন্মথ রায় | ১৫৬, ১২৩, ২৩৩, ২৭৩
জেনে রাখা ভাল | কৃষ্ণেন্দু দত্ত | ৩২৩
জেনে রাখা ভাল | অনিরুদ্ধ মিত্র | ৪৩৩,৪৬৮
জেলা শিল্প কেন্দ্র | অরুনাভ মৈত্র | ২৩৩
তথাগতের প্রতি | গৌরচন্দ্র সাহা | ১২৭
তফাৎ | মানসী রায় | ২৩৩
তাইওয়ানের যাদুঘর | শরদিন্দু সাহা | ৩৬৭
তুমি | কৃষ্ণ দত্ত | ৪৭
তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ | মানসী সাহুলী | ২৩৩
দাদু | আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় | ২৭৭
দারিদ্র্য | মুকুলদেব ঠাকুর | ৪০৭
দিবা বর্ণাশ্রম প্রথা | দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ৪৩
দীপক মল্ল | প্রেমেন্দ্র মিত্র | ৯
দুর্বাসার অভিশাপ | সুনীতি দাস্তাল | ১৪৪
দূরের আকাশ | অখিলরঞ্জন রায় | ১০২, ১৪৮, ১৮৯, ২৬৮, ৩৮৬, ৪৬৬
ধর্ম এক বিশ্বসংসারধর্ম জীবন | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ১৬৫
ধর্মঘট | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৪৪৩
প্রখ্যাত শিল্পী বীরেশ্বর রায় | আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় | ১৯৮
প্রখ্যাত শিল্পী ও বীণাবাদক হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় | ৪৭৩
ধ্যানচাঁদ—হকির যাদুকর | তপন বসু | ৪৭৯
ন যযৌ ন তস্থৌ | সুচিত্রা গুহঠাকুরতা | ১২৮

নজরুল স্মরণে | গৌরচন্দ্র সাহা | ২০৭
নদী কিনারায় | অপরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩৮৬
নব পর্যায় | সম্পাদকীয় | ৬
নব বধূ | গৌরচন্দ্র সাহা | ৪৪৯
নমো নমঃ | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ২৮৩
নিজেকে নিয়ে | অমিত কামরুল | ২৪১
নিমাই তার নাম | পরেশ সাহা | ২০, ৬২, ৯৯, ১৩৯, ১৭৪, ২০১, ২৫৭, ৩১৩, ৪১৭, ৪৫৪
নিষ্টীকরণই বিশ্বশান্তির পথ | রাজিপারঞ্জন বসু | ১৬
নূতন জীবন চেতনার প্রতীক পুরুষোত্তমানন্দ | সম্পাদকীয় | ৩১৪
নূতন দিনের গান | গৌরচন্দ্র সাহা | ৪০৭
নূতন যুগের নূতন মানুষ শ্রীনিত্যগোপাল | সম্পাদকীয় | ৮৬
টাইম | হিমাংশু সেন | ৩৬১
ট্র্যাফিক জ্যাম | হেনা চৌধুরী | ২৪০
পরমাণু | সন্তোষকুমার অধিকারী | ৮৮
পরলোকের পথে আত্মার বিড়ম্বনা | শরদিন্দু সাহা | ১৭২
পশ্চিমবঙ্গে মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণ | গৌরচন্দ্র সাহা | ৭০
পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা বাহুল্য | ডঃ আভা শেঠ | ২৭৪
পাহাড়ে ভ্রমণ | অংশুমান মিত্র | ১২৪
পাহাড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত | অনিরুদ্ধ মিত্র | ২৭৩
পূজোর কথা | সম্পাদকীয় | ২৮৪
পূজোর ফুল | কুমারেশ ঘোষ | ২৭০
প্রতীক্ষা | শান্তশীল দাশ | ১৬৯
প্রথম বাঙালী নেতার শিল্পী | আর্যকুমার মুখোপাধ্যায় | ১৫৮
প্রসঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা | গৌরচন্দ্র সাহা | ৮৭
ফাটল | মীরা দেবী | ১২৯
ফোটে ফুলরা | গৌরচন্দ্র সাহা | ১০
বঙ্গেমাতরম্ ও বঙ্কিমচন্দ্র | ফণিবুড়ো | ৩৫৪
বন্যার গান | মৌসুমী সাহা | ১১৪
বলাইচাঁদ অস্তাচলে | প্রণব রঞ্জন কাব্যতীর্থ | ৪৮
বর্ষা হল হল | অমর বসু | ২৭২
বাইসে শ্রাবণে | গৌরচন্দ্র সাহা | ২৪৯
বাদুড় ঝোলা ট্রামেবাসে | ভবানী প্রসাদ মজুমদার | ৩২৩
বাস্তবে পৃথিবী | অজু হালদার | ১৪২
বালক শিবনাথ শাস্ত্রী | বীণেন রায়া | ১১৪
বাসন্তী দেবী | হেনা চৌধুরী | ১৪৩
বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারাবাহিকতা | সুধা ঘোষ | ১৬১
বিজ্ঞান জড় ও অজড়ের সমন্বয় | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ১০৫
বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনা | সন্তোষকুমার অধিকারী | ১৮৫
বিশ্ব হিন্দু সম্মেলন প্রসঙ্গে | সুনীতি সান্যাল | ৬৮
বিশ্ব-শিশুবর্ষের ভাবনা | গৌরচন্দ্র সাহা | ২৮৫
বীণা দাস | হেনা চৌধুরী | ১২৫
বেকার মিছিল | কুমারেশ ঘোষ | ১৩২
বোকারায় | গৌতম সাহা | ১২৩
বুদ্ধ ভাবনা | পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ১২৫
ভট্টাচার্যের টিকি | বাণী নাগ | ২১৩
ভারত অস্ট্রেলিয়ার সদ্য সমাপ্ত টেষ্ট সিরিজ | তপন ঘর | ৪৩৯
ভারতে বিদেশিনী | শেফালী সেন | ৪৩৬
ভাষা প্রসঙ্গ | ডাঃ ধীরেন চৌধুরী | ৯৮
ভোট যুদ্ধ | এম. এ. হান্নান | ৪০৮
মহৎ শিক্ষার মহান পরিণতি | শরদিন্দু সাহা | ২৭
মহাকবি বাল্মীকি কৃত্তিবাস ও তুলসী দাস | নিখিল রঞ্জন রায় | ২১৮
মানুষের মন | মীরা দেবী | ৩০৫
মিত্রতা | রমেন্দ্রনাথ মল্লিক | ৪০৭
মুকুন্দ দাস | প্রণবরঞ্জন কাব্যতীর্থ | ১৩৭
মুক্তি পূজার দিন | মরিচিকেতা ভরদ্বাজ | ৮৮
যেখানে ঘরে ঘরে দ্রৌপদী | শরদিন্দু সাহা | ৪১৩
রবীন্দ্র মানস | সম্পাদকীয় | ১২৬
রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে | ডাঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী | ১৬৭
রূপায় কাশ | বীণেন রায়া | ২২৮
লাঞ্ছিত লাঞ্ছিত সৈনিক পতাকা | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত | ৫
লণ্ডন বিমান বন্দরে অপমানিতা ভারতীয় নারী | সুনীতি সান্যাল | ৩৬

লালন কবিরের জীবনে ধর্ম | ডা: করিদাস সাহা | ৩৭৮
লোভ শেডিং | বাণী বাগ | ৪৬৮
হাতপাখার পাঁচালী | শরদিন্দু সাহা | ১৩২
হিমালয়ের আহ্বানে | অরুণমা সেন | ৭৬, ১১৬
হৈমন্তী | গৌরশুভ্র সাহা | ৩৬৬
হাচ্ছো ! হাচ্ছো ! হাচ্ছো | ভবানীপ্রসাদ মজুমদার | ৪৩৩
শতবর্ষের স্মৃতিসায়রে সরোজিনী | হরপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ | ১০৮
শিক্ষাকালের গুরুত্ব | সম্পাদকীয় | ১৬৬
শিশুর প্রতি কর্তব্য | রেহকা সেন | ৩৭
শিশু সাহিত্য | বীরেন্দ্রলাল ধর | ৫৪৮
শুদ্ধ পথই শুদ্ধ পরিণতি আনতে পারে | সম্পাদকীয় | ৪০৬
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ | সুনীতি সান্যাল | ৩৮২
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের দিনপঞ্জী | ১৬, ৮০, ১০৭, ১৪৬, ১৮৭, ২২২, ২৭১, ৩৮৪, ৪২৭, ৪৪৭
সকলেই সম্রাট এখন | শ্রীগোপাল ভৌমিক | ২৪২
সধবাবালার মা | দুর্গা গোস্বামী | ৩৮০, ৪২৪
সমস্যার গোড়ায় | সম্পাদকীয় | ৪৬
সময়ের দাম | অমিত রায় | ৩২৪
সমাজ সেবিকা সুধারাণী দত্ত | নারায়ণী মিত্র | ৩২৬
সবার উপরে মানুষ সত্য | স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অনুধৃত | ৮৪
সরকারী উদ্যোগে নকলের কারবার | শরদিন্দু সাহা | ২৪৭
সংখ্যার রাজনীতি | সম্পাদকীয় | ২৬৬
সংঘর্ষ, সংগচ্ছধ্বম্ | সম্পাদকীয় | ৪৭৪
সুন্দর বনের মানুষ | শক্তিপদ রাজগুরু | ১১, ৩২
সেই সুদূরের মধুর স্মৃতি | স্বপন বুড়ো | ৫৬, ১০, ১৩৪, ১৭০, ২২৪, ২৫৩, ৩৬২, ৪০২, ৪৫০
সোনার অন্নপূর্ণা | হারীতকৃষ্ণ দেব | ১
সৃষ্টির নব নাট্যে | নচিকেতা ভরদ্বাজ | ১৬২
স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ | সম্পাদকীয় | ২৪৬
স্বপনবুড়োর শুভেচ্ছা | স্বপনবুড়ো | ৭৩
স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে | শান্তশীল দাশ | ৩২১

"উজ্জ্বল ভারত" পত্রিকার নিয়মাবলী

১। উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশিত হয়। মাঘ মাস থেকে এর বর্ষারম্ভ।

২। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা (সডাক)। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণতঃ মাসের শেষভাগে গ্রাহকদের নিকট ডাকযোগে পাঠানো হয়।

৩। টাকা, চেক্, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি সম্পাদিকা, উজ্জ্বল ভারত, নরনারায়ণ আশ্রম, গ্রাম—বাগুইআটি, পো:-অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯, জেলা—২৪ পরগণা (ফোন : ৪৭-২৪৪০) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। চেক্ অবশ্যই হওয়া চাই Crossed *a/c* Payee Payable to UJJWAL BHARAT.

৪। গ্রাহকগণ চিঠিপত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

৫। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের সঙ্গে উজ্জ্বল ভারত উপযুক্ত মানের নবাগত লেখক লেখিকাদের রচনাও প্রকাশ করবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে হওয়া প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে লেখা পাঠাবেন, কারণ অমনোনীত লেখা সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। রচনার মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশ বিশেষের পরিবর্জন, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।

৬। উজ্জ্বল ভারতে পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

GRAM : SATAPURTI

Phone : Office : 26-6397
Works : 61-9410

LUNA SURGICAL INDUSTRIES

Manufacturers of :

QUALITY SURGICAL DRESSINGS

Office :

56/1 BIPLABI RASH BEHARI BOSE ROAD,
CALCUTTA-700001

Works :

LASKARPUR, 24 PARGANAS (SOUTH)
WEST BENGAL

With Best Compliments FROM

BANSAL ENGINEERING WORKS

23A, Netaji Subhas Road,
4th. Floor, Room N. 6

Manufacturers of :—
BLACK & G. I. PIPES, TUBULAR & HAMILTON
POLES & STRUCTURAL FABRICATORS.

FACTORY : 228/1 G. T. ROAD,
GHUSURI (HOWRAH)

TELEPHONE 22-0643 } OFFICE
22-5384 }
66-2699 FACTORY

5 AUG 1980

শ্রীবিমল কুমার চক্রবর্তী কর্তৃক নবনারায়ণ প্রেস, গ্রাম+পো:বাগআঁচড়া, পোঃ অশ্বিনী নগর, কলিকাতা-৫৯ (ফোন: ৫৭-) হইতে প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্টার্স, ১১২/১২ বেলেঘাটা মেইন রোড, কলিকাতা-৭০০০১০ হইতে মুদ্রিত।
প্রচ্ছদ মুদ্রণে : পি. কে. প্রিন্টার্স, ১নং এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।